গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬১

সম্পাদক :

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন : পূর্ণেন্দু রায়

মুদ্রণ : সিল্ক স্ক্রীন

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও বাণী মুদ্রণ, ১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীবংশীধর সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

উপকণ্ঠে

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

সেবার আশ্বিনের প্রথম থেকেই মহাশ্বেতার শরীরে একটা কি গণ্ডগোল দেখা দিল। দিনরাতই গা-বমি-বমি করে, কেমন যেন টিশ্-টিশ্ করে শরীর—কিছুই ভাল লাগে না। কেবল শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। দিনকতক এইভাবে যেতে যেতেই সত্যিকার বমি শুরু হল। যা খায় কিছু পেটে তলায় না। মহাশ্বেতার স্থির বিশ্বাস হল এবার সে মারা যাবে।

স্বামীকে ডেকে এক দিন বললেও, 'হ্যাঁ গো, তোমরা কি ডাক্তার-বদ্যি দেখাবে না, আমি এমনি বেঘোরে মারা যাব?'

ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে-জড়িয়েই অভয়পদ সাড়া দেয়, 'ও, তুমি মরছ নাকি? তা তো জানতুম না।'

'তা জানবে কেন। তোমার আর কি, আমি মলেই তো তোমার সুবিধে। আমি কালো পেঁচী—আমাকে তোমার মনে ধরে নি, তা কি আর আমি জানি না। সেইজন্যেই বুঝি আমার চিকিচ্ছে করাচ্ছ না? মরতে তর্ সইবে না—আর একটা বিয়ে করে আনবে!'

'তা তো সত্যিই—নইলে আমার চলবে কি করে বল!'

পরক্ষণেই অভয়পদ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। নিঃশ্বাসের শব্দ গভীর হয়ে আসে।

মহাশ্বেতা যেন কিছু বুঝতে পারে না। লোকটা তো সত্যি এত খারাপ নয়। যা করা উচিত বলে মনে করে—তা তো কোনটা পড়ে থাকে না। তবে ওর এমন অসুখ দেখেও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে কি করে?

শাশুড়ীও তেমনি নির্বিকার। তিনিও তো দেখছেন—কৈ কখনও তো বলেন না—যে একটা ডাক্তার ডাক্, কি হাসপাতাল থেকে এক মোড়া ওষুধ এনে খাওয়া। বরং আজকাল যেন একটু বেশী টিক্‌টিক্ করেন—চলাফেরা সবেতেই টিক্‌টিক্। সন্ধ্যের পর বড়-একটা ঘরের বার হতে দেন না, ঘাটে যাওয়া তো একেবারে বারণ হয়ে গেছে, বাইরের কারুর সামনে পর্যন্ত যেতে দেন না—তাতে নাকি নজর লাগবে। আর এক নতুন উপসর্গ হয়েছে, সন্ধ্যার আগেই খোঁপাতে একটা খড়কে কাঠি গুঁজে দেন। এ আবার কি অদ্ভুত ব্যাপার বোঝে না মহাশ্বেতা। দু-একদিন জিজ্ঞাসাও করেছে শাশুড়ীকে, জবাব পায় নি, মুখ টিপে হেসেছেন ক্ষীরোদা।

অবশেষে একদিন আর থাকতে না পেরে সে শাশুড়ীর মুখের ওপরই বলে বসল, 'মা আমাকে একবার বাপের বাড়ি পাঠাবেন?'

'তা কেন পাঠাব না বৌমা? কিন্তু হঠাৎ এ খেয়াল কেন গা বাছা!'

'মনে হচ্ছে আর তো বেশী দিন বাঁচব না। শেষ দেখা দেখে আসি!' মুখখানাকে যতটা সম্ভব গিন্নীবান্নীর মত গম্ভীর করে বলে মহাশ্বেতা।

'ষাট্! ষাট্! ওমা ও কি অলুক্ষুণে কথা গা বৌমা। ষাট্—তুমি মরতে যাবে কি দুঃখে মা? ষাট্! ষাট্! অ মেজবৌমা, পাগলীর কথা শুনে যাও মা।'

প্রমীলা এসে দাঁড়ায় কিন্তু কোন কথা কয় না। মুখে আঁচল দিয়ে ফুলে ফুলে হাসে। মহার হাড় জ্বালা করে ঐ হাসি দেখলে!

সে বলে, 'আপনাদের আর কি মা—একটা বৌ যাবে আর একটা আসবে।... আমি তো আমার শরীর বুঝি! কিছুই পেটে তলাচ্ছে না—এমন করে ক'দিন বাঁচব? মার কাছে গিয়ে পড়লে মা যেমন করেই হোক—ধার দেনা করে, ভিক্ষে করেও ডাক্তার দেখাবে! তার তো আমি বড় মেয়ে!'

শাশুড়ী রাগ করেন, 'সে দরকার বুঝলে আমরাও দেখাব বৌমা। কিন্তু ডাক্তার দেখাবার মত হয়েছেই বা কি? এ অবস্থায় বমি হবে না? এ আবার কি ছিষ্টিছাড়া কথা বাছা?'

মাথাটা আরও গুলিয়ে যায় মহাশ্বেতার। সে কিছুই বুঝতে পারে না— ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। হয়তো আরও কিছুই বলত কিন্তু প্রমীলা ওকে টানতে টানতে নিয়ে যায় রান্নাঘরে। তার পর গলায় আঁচল দিয়ে ওকে বার বার নমস্কার করে, 'ধন্যি বাবা ধন্যি! এই গড় করি তোমার পায়ে। সত্যি দিদি, তোর জন্যে আমি কোনদিন হাসতে হাসতে পেট ফেটে মরে যাব!'

আরও রেগে যায় মহাশ্বেতা।

কারুর সর্বনাশ কারুর পৌষ মাস—এদের হয়েছে তাই। তার এত বড় একটা অসুখ হয়েছে—অন্য কারুর হলে তো ছুটোছুটি পড়ে যেত—এরা সবাই মিলে এমন করছে যেন কি একটা হাসির ব্যাপার।

'আ মর্। অমন করিস্ কেন? আমার যা হয়েছে তা আমিই বুঝি! আমি মরব বলে তোদের সবাইকার ফুর্তি পড়ে গেছে খুব—না?'

'তোর কি হয়েছে তাই বল্ তো দিদি?' কোনমতে জিজ্ঞেস করে মুখে কাপড় গুঁজে দেয় প্রমীলা। ছুটির দিন, ভাসুর বাড়িতে আছেন, বাগানে খুট্ খুট্ করে কি কাজ করছেন। ভাদ্র-বৌয়ের চটুল হাসির শব্দ ভাসুরের কানে যাওয়া বড় নিন্দের কথা।

'কী হয়েছে তাই যদি জানব তো আর ভাবনা কি। তবে মরতে চলেছি এটা তো বুঝি! যা খাচ্ছি উঠে যাচ্ছে, কী খেয়ে বাঁচব বল্। ছেলেবেলায় শুনেছি পিঁট্কীর অমনি হয়েছিল। কোন্ দরগা থেকে জলপড়া এনে খাইয়ে দিতে পেট থেকে দুটো এত বড় বড় কির্মি বেরিয়ে গেল—তবে ভাল হল। আমারও বোধ হয় তাই হয়েছে।...এরা তো কথাটা গেরাহ্যি করে না, হেসেই উড়িয়ে দেয়। নইলে না হয় আনারসের গর্ভপাতা রস করে খেতুম—শুনেছি ওতে কির্মি বেরিয়ে যায়। খাব নাকি, হ্যাঁলা মেজ বৌ?'

'হ্যাঁ, তা খাবে না! নইলে আর চলবে কেন! তা হলে শাশুড়ীতে আর

তোমার মায়েতে মিলে জ্যান্ত পুঁতবে উঠোনে।'

কথাটা আরও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে মহাশ্বেতার কাছে। সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে।

অকস্মাৎ প্রমীলা উনুনের পাড় থেকে ছোট একটা মাটির ডেলা ভেঙে ওর হাতে দিয়ে বলে, 'খাবে দিদি ?'

'মাটি খাব কি লো ?'

'খেয়ে দ্যাখ না। আচ্ছা, গন্ধটা শুঁকে দ্যাখ—খেতে ইচ্ছে করবে।'

আস্তে আস্তে নাকের কাছে ধরে মহাশ্বেতা। বেশ লাগে গন্ধটা।

'সত্যিই খেতে ইচ্ছে হচ্ছে যে লো !'

'খেয়ে দ্যাখ না। ভাল লাগবে।'

একটু ভেঙে মুখে দেয় সে। বেশ লাগে। ক্রমে ক্রমে সবটাই খেয়ে ফেলে। ছেলেমানুষের মত সকৌতুক ঔৎসুক্যে চেয়ে থাকে প্রমীলার মুখের দিকে।

আর এক বার হাসিতে ভেঙে পড়ে প্রমীলা। তার পর হাসির ধমক থামলে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা তুমি কি সত্যিই কিছু বুঝতে পার না ?'

মহাশ্বেতার এবার যেন কি একটা সন্দেহ হয়। এরা সবাই এমন করছে তার মানেটা কি ? তবে কি তার আচরণ সত্যিই হাস্যকর হয়ে উঠেছে ? সে কি আবারও কিছু বোকামি করেছে ?

প্রমীলা ইতিমধ্যে বেশ ঢ্যাঙা হয়ে উঠেছে। দীর্ঘাঙ্গী কিশোরী, সুরূপা না হলেও সুশ্রী। বেশ চটক আছে ওর চেহারায়। মহাশ্বেতা বেঁটে। প্রমীলার চেয়ে অনেকখানি মাথায় নিচু। প্রমীলা হঠাৎ হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠে দু হাতে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে, 'ওগো নেকী, তোমার ছেলে হবে—ছেলে ! বুঝেছ ?'

অকস্মাৎ চোখের ওপর থেকে কালো পর্দাটা সরে যায় মহাশ্বেতার। একঝলক আলো—আশারও বটে, সুখেরও বটে। একসঙ্গে যেন কানের কাছে অনেকগুলো বাজনা বেজে ওঠে—আনন্দের একটা দমকা বাতাস বয়ে যায় মনের ওপর দিয়ে।

ছেলে হবে ওর ? ছেলে ?

কিন্তু এ কি সত্যি ! এবার ওর শাশুড়ীর আচরণ, স্বামীর নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্য, প্রমীলার হাসি—সবেরই একটা অর্থ খুঁজে পায় সে।

তবু সংশয়ও ঘোচে না। সন্দিগ্ধ সুরে প্রশ্ন করে, 'তুই কি করে জানলি ? তোর তো হয় নি !'

'আ মর্ ! আর কারুর দেখি নি বুঝি ? আমার ভাই বোন নেই ? কাকী জেঠি পিসী—আমাদের তো রাবণের গুষ্টি।...তোমারও তো মায়ের অনেকগুলো হয়েছে। তাঁর অরুচি হয় না ? দ্যাখ নি কখনও ?'

'অ—মানে ঐ বমি ?' একটু থমকে ভেবে নেয় মহাশ্বেতা, 'না, মা দুটো-একটা দিন বমি করে বটে দেখেছি। কিন্তু সে কি এই জন্যে ? কে জানে ! কৈ, বেশী বমি-টমি করে না তো আমার মত !'

'সকলের কি হয় ? এই আমার ছোট পিসী—মোটে কিচ্ছু হয় না। আমরা

টেরই পাই না।'…

প্রমীলা আরও বহু গল্প করে। মহাশ্বেতা হাঁ করে শোনে—যেন গেলে কথাগুলো।

যাই বল বাপু, মেজ বৌ জানে ঢের। মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয় সে।…

সেদিন রাত্রে কি ভাগ্যি মহাশ্বেতা যখন শুতে গেল অভয়পদ তখনও জেগে। পিদিমের আলোতেই কী একটা করছিল খুট্‌খাট করে। দুজনে প্রায় একসঙ্গেই শুল।

এমন দুর্লভ সুযোগ কদাচিৎ আসে। স্বামীর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে একথা সেকথার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁ গো, একটা কথা বলব রাগ করবে না ? আচ্ছা মেজ বৌ যা বলছিল তা কি সত্যি ?'

'কী বলছিল মেজ বৌমা ?'

তবু কথাটা বলতে পারে না চট্‌ করে মহাশ্বেতা। স্বামীর দাড়ির একটা প্রান্ত ধরে টানাটানি করে।

'কি গো—বললে না ?' অভয়পদই তাগাদা দেয়।

'মেজ বৌ বলছিল, আমার—আমার নাকি ছেলেপুলে হবে ?'

'ও, বলছিল বুঝি ? তোমার কি মনে হয় ?' অভয়পদ মুখ টিপে হেসে প্রশ্ন করে।

'জানি না, যাও।…আমি বোকা বলে তোমরা সব বুঝি মজা দ্যাখ, না ? কেন, তুমি বলে দিতে পার নি ?'

'আমি কি করে জানব, বা রে ! এ বুঝি পুরুষের বলবার কথা ?'

'তুমি সব জান। কেবল আমার সঙ্গে বদমাইশি কর।'

সে অভ্যাসমত স্বামীর দেহের খাঁজে মুখটা লুকোয়।

অভয়পদ সস্নেহে তার গায়ে একটা হাত রাখে শুধু—কিছু বলে না।

খানিক পরে আবার মুখ তুলে বলে মহাশ্বেতা, 'আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে বাপু, যাই বল !'

'ভয় কিসের। ছেলেপুলে তো লোকের হামেশাই হয়।'

তারপর হঠাৎ বলে বসে অভয়পদ, 'কিছু যদি খেতে-টেতে, ইচ্ছে করে তো মাকে বলো।'

'হ্যাঁ বয়ে গেছে। মাকে বুঝি বলতে পারি ? আমার লজ্জা-ঘেন্না নেই ?'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে, 'হ্যাঁ গো, কী হবে—ছেলে না মেয়ে ?'

'তা কি জানি।'

'ছেলে হয় তো বেশ হয়।…কিন্তু মেয়েই বা মন্দ কি ? সকাল করে কুটুম হয়—কি বল ?'

কিন্তু ততক্ষণে অভয়পদ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছে। ওর গভীর নিঃশ্বাসের শব্দেই বুঝতে পারে মহাশ্বেতা। সেও একটা নিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফেরে। এ দুঃখের নিঃশ্বাস নয়—বরং বলা যেতে পারে, তৃপ্তির, ভরসার নিঃশ্বাস। স্বামীর ওপর

আজকাল ওর একটা ভারী ভরসা এসেছে। সবেতেই, সব অবস্থাতেই লোকটার ওপর ভরসা রাখা যায়, এই বিশ্বাসটা বদ্ধমূল হয়েছে।

মহাশ্বেতা দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত ঘুমোতে পারে না। ওর সন্তান হবে, ও হবে মা—এ কথাটা এত দিন যেন কল্পনাই করে নি। আজ সব কথাটাই তার নতুন বোধ হচ্ছে, আশ্চর্য মনে হচ্ছে। মনে মনে যতই আলোচনা করে, ভবিষ্যতের যত ছবিই আঁকে—অবাক লাগে ওর। আনন্দে—? সবই কি আনন্দ? ওর যেন সত্যিই একটু ভয়-ভয়ও করে।

॥ ২ ॥

সাত বছরের মেয়ে মহাশ্বেতা এ-বাড়িতে এসেছে। ওর স্বামী অভয়পদর তখনই বাইশ বছর বয়স।

এ রকম অ-সম বিবাহ না দিয়ে ওর মা শ্যামার উপায় ছিল না। শ্যামার স্বামী নরেন একেবারেই অমানুষ। কতকগুলি সন্তান ছাড়া সে ইহজীবনে স্ত্রীকে কিছুই দিতে পারে নি কিন্তু নিয়েছে ঢের। এখনও—দৈবাৎ যখন সে এসে পড়ে—বলতে গেলে শ্যামার ভিক্ষান্নের সঞ্চয় থেকেও—চুরি বা জুচ্চুরি করে কিছু নিয়ে সরে পড়তে তার এতটুকু বাধে না। তাই তার আশ্রয়দাতা সরকারদের গিন্নী মঙ্গলা যখন এই বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন, সে আর 'না' বলতে পারে নি। ভিখারীর আবার বাছ-বিচার কি? একটা মেয়ে কোনমতে পার হয়ে যাচ্ছে—এই ঢের। শ্যামার ভয় ছিল—তবে সে অন্য কারণে—বয়স বেশী-কম নিয়ে মাথা ঘামানো তার পক্ষে অকারণ বিলাস। সে শুধু ভেবেছিল নিজের অদৃষ্টের কথা, মা কালীর কাছে, সত্যনারায়ণের কাছে শুধু এই কথা বলেই মাথা খুঁড়েছিল—জামাই না অমানুষ হয়। মা কালী ঐটুকু মুখ তুলে চেয়েছেন—অমানুষ সে হয় নি। বরং বুদ্ধি বিবেচনা ঔদার্য প্রভৃতি বহু গুণ তার মধ্যে আছে। অমন জামাই পাওয়া সৌভাগ্য। বড় জামাইয়ের জন্যেই আজ সে খেতে পাচ্ছে—ছেলে হেমকে অভয়পদই চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তারই ভরসাতে মেজ মেয়ে ঐন্দ্রিলার সুদ্ধ বিয়ে দিতে পেরেছে শ্যামা।

কিন্তু বয়স যা—সে তুলনাতে ঢের বেশী গম্ভীর, বেশী ভারিক্কী অভয়পদ। সুতরাং বাড়িতে এসে পর্যন্ত স্বামীকে ঠিক স্বামী বলে ভালবাসতে পারে নি মহাশ্বেতা। ভয়? হয়তো ঠিক ভয় নয়—গুরুজনের মত সমীহ করেছে। বিপদে ভয়ে ভরসা করেছে তার ওপর, জড়িয়ে ধরেছে পরম ও নিরাপদ আশ্রয় জেনে। কিন্তু প্রেম-বিহ্বল আকুলতাতে স্বামীকে আলিঙ্গন করা যে কি তা মহাশ্বেতা বোধ হয় কল্পনাও করতে পারে না।

স্বামী শাশুড়ী সবাইকেই সে সমীহ করে এসেছে। বাপের বাড়িতে মা, সরকারগিন্নী বার বার এই উপদেশই দিয়েছেন, 'সকলকার কথা শুনবি, কাজকর্ম করবি, শাশুড়ীর সেবাযত্ন করবি—যেন শ্বশুরবাড়িতে দুর্নাম না হয়। আমরা তা হলে মুখ দেখাতে পারব না। শ্বশুরবাড়ি নিন্দে হলে আগে বাপ-মার ওপর টান

পড়ে। বলবে মা-মাগী কিছু শেখায় নি, মেয়েটাকে ধিঙ্গি বেহায়া ঢ্যাটা করেছে !"

সে-উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে সে। বালিকা বধূ তাই কোনদিনই গৃহিণী হবার সুযোগ পায় নি। বয়স বেড়েছে, যৌবন যথাসময়ে তার কাজ করে চলে গিয়েছে—কিন্তু সে শুধু দেহেরই ওপর। মন আজও বালিকা আছে। আজও আছে তার চোখে সেই প্রথম দিনের অসীম কৌতূহল এবং অগাধ বিস্ময়। আজও ঘোচে নি তার পরনির্ভরতা এবং ভয়ের ভাব। এমন কি তারই চোখের সামনে—তার অনেক পরে মেজ জা প্রমীলা এসে কেমন সহজভাবে তাকে ডিঙিয়ে অনায়াসে, জ্যেষ্ঠার মর্যাদা—প্রায় গৃহিণীর মর্যাদাতেই কখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তা জানতেও পারে নি মহাশ্বেতা। অথচ সেটা যে খুব প্রীতির সঙ্গে বা অনায়াসে মেনে নিয়েছে সে তাও তো নয়। কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারে নি, প্রতিকারও করতে পারে নি—ছেলেমানুষের মত আড়ালে আমড়াগাছ বা পুকুরপাড়ের সুষুনি লতাগুলোকে শুনিয়ে মনের নিষ্ফল ও নিরুদ্ধ আক্রোশ প্রকাশ করেছে মাত্র—আর কিছুই করতে পারে নি।

সুতরাং আজ যদি তার সন্তান-সম্ভাবনার সংবাদটা তাকে পরের মুখ থেকে সংগ্রহ করতে হয় তো দোষ দেওয়া যায় কি ?

এর পরেও কয়েকদিন ধরে যেন বিস্ময়ের ঘোরটা কাটে না মহাশ্বেতার। বরং বলা চলে সে-ই কাটতে দিতে চায় না। সংবাদটার অভাবনীয়তাটুকু যেন চেখে চেখে একটু একটু করে অনুভব করতে চায় সে।

এমনভাবে অনুভব করার আর একটা কারণও আছে। সে যেন এর ভেতর—কতকটা নিজের অবচেতনেই—একটা প্রতিহিংসার আনন্দও টের পায়।

প্রমীলা সবেতেই তাকে ডিঙিয়ে গেছে—এটা ঠিক। কিন্তু এই একটা দিকে তো পারল না। তার পেটেই প্রথম সন্তান এল, বংশের প্রথম সন্তান। আর, আর যদি—ভাবতেও যেন ভরসায় কুলোয় না, এত সৌভাগ্য কি সত্যিই কোন দিন হবে তার ?—যদি ছেলে হয় তা হলে তো কথাই নেই—ভবিষ্যৎকালে সে-ই হবে বাড়ির কর্তা। উত্তরপুরুষের সে-ই হবে জ্যেষ্ঠ !

আর সেই জ্যেষ্ঠের, এই বাড়ির কর্তার—মহাশ্বেতাই হবে মা। প্রমীলা নয়।

মহাশ্বেতা আজকাল সন্ধ্যার সময় ঠাকুরঘরের বন্ধদ্বারের (এ বছর ওদের পালা নয়, জ্ঞাতি ভাসুরদের পালা—তাই ওদের দিকের দরজা এখন বন্ধই থাকে) সামনে পিদিম রেখে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করে, ঠাকুরকে ডাকে—ঠাকুর আমার একটা ছেলে দাও, যেমন করে হোক ছেলে দাও। মেজ বৌ-এর থোঁতা মুখ ভোঁতা হোক !

বিধিনিষেধগুলো বেশী করে মানে সে। সন্ধ্যাবেলা উঠোনে পর্যন্ত নামতে চায় না। যদি কিছু ভালমন্দ একটা হয় ? বাপ্‌রে !

॥ ৩ ॥

শাশুড়ী পাড়ার একটি বয়স্কা স্যাক্‌রাদের বৌকে দিয়ে খবর পাঠালেন। বোধ হয় বেয়ানকে অপ্রস্তুত করার একটা গোপন অভিসন্ধি ছিল তাঁর। নইলে অম্বিকা এমন কি দুর্গাপদকে দিয়েও খবর পাঠাতে পারতেন। কিন্তু শ্যামা এ ইঙ্গিত বোঝে, সেও ঠক্‌বার মেয়ে নয়। স্যাক্‌রা-বৌকে দাওয়ায় বসিয়ে ছুটে গিয়ে মঙ্গলাকে খবরটা দিয়ে আট আনা পয়সা ধার করে আনে। সরকারগিন্নীও বিনা ওজরে আধুলি একটা বার করে দেন। একে তো আনন্দের খবর—খুবই আনন্দের, মঙ্গলাই ঘটকালি করেছিলেন এ বিয়ের—সে জন্য তিনি একটু গৌরবও অনুভব করেন এবং সেই সঙ্গে এটাও বোঝেন যে কুটুমের কাছে কোনমতেই ছোট হওয়া চলবে না—তার ওপর আজকাল আর শ্যামা ঠিক সেই আগের নিঃস্ব পুজুরী বামুনের বৌ নেই। ওঁদের বাড়িতে বিনা ভাড়ায় থাকে, ওঁদের বিগ্রহের পুজো করে ঠিকই—এখনও লুকিয়ে-চুরিয়ে বাগানের ফলপাকুড় ঝ্যাঁটাকাটি বেচে খায় এও ঠিক—তবু হেম রোজগার করে এখন, ধার দিলে পয়সা তাড়াতাড়ি আদায় হবে—এ বিষয়েও তিনি নিশ্চিন্ত। 'এই একটা গুণ আছে বামনীর—তাগাদা করতে হয় না—মনে করে শোধ দিয়ে যায়।' মেয়েকে শুনিয়ে আজও একবার কথাটা বললেন মঙ্গলা।

পয়সা আট আনা চেয়ে এনে সবটাই স্যাক্‌রা-বৌয়ের হাতে দেয় শ্যামা।

'এ আবার কেন আঁবুই মা, এ আবার কেন?' বার দুই বলে স্যাক্‌রা-বৌ।

'ওমা সে কি কথা। আনন্দের খবর দিলে, সুখবর! এ তো তোমার পাওনা বাছা। ছেলেপুলেদের জন্য মিষ্টি কিনে নিয়ে যেও।'

তাই বলে তাকেও অমনি ছাড়ে না শ্যামা। আগের দিনই কারা যেন মানসিকের পুজো দিয়ে গেছে ঠাকুর-ঘরে, সেই দুটি মোণ্ডা তোলা ছিল সযত্নে। দুই জামাই হবার পর এই ধরনের মূল্যবান মিষ্টি কিছু এসে পড়লে প্রাণে ধরে শ্যামা তা ছেলেমেয়েদের তখনই খেতে দিতে পারত না। যদি কেউ এসে পড়ে তো মানরক্ষা হবে। একেবারে গন্ধ হয়ে গেলে বা ছাতা ধরে গেলে তবেই তা ছেলেদের ভাগ্যে জুটত। আজও সে দুটি কাজে লেগে গেল। দুটি মোণ্ডার সঙ্গে খানকতক বাতাসা একটা কলাপাতায় সাজিয়ে স্যাক্‌রা-বৌয়ের সামনে ধরে দেয় শ্যামা। সন্ধ্যা অবধি থেকে ভাত খেয়ে যেতেও অনুরোধ করে—কিন্তু স্যাক্‌রা-বৌ রাজী হয় না কিছুতেই।

'ওমা না না। সন্ধ্যের পর একা কখনও এতটা পথ যেতে পারি? আমাকে এখুনি উঠতে হবে মা। একটু পরেই চাক্‌রে বাবুরা ফিরতে থাকবে—তাদের সামনে দিয়ে যাওয়া—সে বড় লজ্জার কথা মা! হাজার হোক এখনও তো বুড়ো-হাবড়া হই নি!'

শ্যামা মনে মনে হাসে। স্যাক্‌রা বৌয়ের বয়স পঞ্চাশের কম নয়।

'তবে যাও মা—কি আর বলব।'

'একটা পানও সেজে দেয় শ্যামা। পানটা হাতে দিয়ে বিদায় দেবার সময় কুট্ করে একটা কামড় দিতে ছাড়ে না কিন্তু। মুচকি হেসে বলে, 'বেয়ানকে বলো মেয়ে—এমন সুখবরটা দিয়ে পাঠালেন তোমাকে শুধু-হাতে। তাঁর তো ছেলের ছেলে, আসল নাতি, বংশরক্ষের কথা—আমাদের জন্যে দুখানা বাতাসাও পাঠালেন না। পাড়ার লোককে কি বলব ?'

অপ্রতিভ স্যাক্‌রা-বৌ ঢেকে নেয়, 'সে এখন কি গা আঁবুই মা—একেবারে ছেলে হবার খবর যখন আনব—তখন হাঁড়ি ভরে মিণ্টি আনব !'

ভাল দিন দেখে শ্যামা মেয়েকে আনতে পাঠায় হেমকে দিয়ে।

অনেক মতলব করেই পাঠায় সে। এখন না আনালে পরে আনাতে হবে অর্থাৎ আঁতুড় তোলার কাজটা তাকে সারতে হবে—একরাশ খরচ। তার চেয়ে এখন দু মাস এনে রাখাই সুবিধা।

কিন্তু দেখা গেল ক্ষীরোদাও তার চেয়ে কম বোঝেন না, তিনি বললেন, 'এখন আর কেন—আবার দু-চার দিনের জন্যে সুস্থ শরীর ব্যস্ত করা। এখন এই অবস্থায় তো হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। পাল্‌কি করতে হবে, অন্তত আট গণ্ডা দশ গণ্ডা পয়সা খরচা। এখন পাঠালে আবার এই মাসেই আনতে হবে। সামনের মাস জোড়া মাস, তার পরই পঞ্চামৃত, কাঁচাসাধ, ভাজাসাধ—সব পর পর আসছে। আমি বলি কি, একেবারে ন-মাসে সাধ দিয়ে তোমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেব। প্রথম পোয়াতি, মার কাছে গিয়ে বিয়োনোই ভাল। ছেলে-মানুষ ভয়-টয় পাবে ! আর সে তোমার মা'র মনও মানবে না নইলে···কেমন ? মাকে গিয়ে বুঝিয়ে বলো !'

অগত্যা হেম ফিরে আসে। শ্যামা সব শুনে গজ্ গজ্ করতে থাকে, 'মিটমিটে ডান, ছেলে খাবার রাক্কোস ! মাগী কম ফম্‌বাজ !···দিলে বিয়েন-তোলার খরচাটি আমার ওপর চাপিয়ে !'

মঙ্গলা সব শুনে হা-হা করে হেসে ওঠেন।

'তা রাগ করিস কেন বামনী। তুইও তো সেই চাল চালতে গিয়েছিলি। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি যে—অমনিই হয়।—নে মন খারাপ্ করিস নি। যা-হয় করে হয়েই যাবে। এখন সাধের কাপড়খানার যোগাড় দ্যাখ্। ওইখানেই সাধ দিক আর যাই করুক—তোকেও তো দিতে হবে একটা। সে শাশুড়ী মাগী ঠিক বুঝে নেবে এখন। গিয়ে দাঁড়ালেই আগে প্যাঁড়া খুলবে—দেখি তোমার মা কি কাপড় দিলে বৌমা !'

তিনি আর এক দলা দোক্তা তাঁর মসীকৃষ্ণ মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করেন।

শ্যামার অঙ্গ হিম হয়ে যায় কথাটা শুনে। একখানা ভাল কাপড়—যেমন-তেমন করে হোক—আড়াইটে টাকা দাম। তার ওপর পাঁচ ব্যান্নন করে খাওয়ানো আছে। আবার আঁতুড় তোলার খরচ।

মনে মনে একটা হিসাব করতে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখে শ্যামা।

॥ ৪ ॥

এ সংসারে, কোন দুই পক্ষ যখন একই সুবিধার জন্য বিধাতার শরণাপন্ন হয়—তখন সাধারণত দেখা যায় বিধাতা এক পক্ষের প্রতিই প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করলেন—অপর পক্ষ হতাশ হল। কিন্তু দৈবাৎ এর ব্যতিক্রমও হয় বৈকি! সেক্ষেত্রে দুই পক্ষেরই মনস্কামনা পূর্ণ হয়—বঞ্চিত হয় কোন বেচারী তৃতীয় পক্ষ।

শ্যামা ও ক্ষীরোদার বেলাও তাই হল।

বিধাতা এক বিচিত্র কৌশলে দুই পক্ষকেই খুশী করলেন।

মহাশ্বেতার সেটা আট মাস—সবে আট মাসে পড়েছে সে। হঠাৎ এক দিন খবর এল ওর বড় ননদের খুব অসুখ—বাড়াবাড়ি চলছে। অফিস থেকে যেতে-আসতে চার ক্রোশ, রাত্রে ফিরতে পারে কিনা সন্দেহ। অথবা ফেরবার মত অবস্থা থাকবে কিনা তা-ই বা কে জানে? সুতরাং অভয়পদ বলে গেল, 'আমাদের জন্যে বসে থেকো না মা—আজ রাতে খুব সম্ভবই ফেরা হবে না। মাকড়দার ওদিকে পথঘাটও ভাল নয়। বেশী রাত্তিরে না ফেরাই ভাল। সেই কাল ভোরে—অফিস যাবার সময়ে ফিরব। যদি খুব দেরি হয়ে যায় তো আমি সোজা অফিস চলে যাব, খোকা ফিরবে—ওর মুখেই খবর পাবে।'

অম্বিকাপদর অফিসের কাজ—সাড়ে নটায় ওর হাজরে। সে দাদার বেশ খানিকটা পরে অফিসে রওনা হয়। তা ছাড়া এখন গাড়ি হয়েছে—সে উনসানি স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরে। অভয়পদ চিরদিনই হেঁটে যায়—এখনও সে হাঁটা বজায় রেখেছে।

সে যাই হোক—বাড়িতে রইল এরা ক-টি প্রাণী। ক্ষীরোদা, মহাশ্বেতা এবং দুর্গাপদ। মহাশ্বেতা প্রসব হতে বাপের বাড়ি গেলে অন্তত চার-পাঁচ মাস আটকে পড়বে, এই অজুহাতে প্রমীলা একরকম ঝগড়াঝাঁটি করেই বাপের বাড়ি চলে গেছে। তাকে কোনমতে আটকাতে না পেরে প্রতিশোধস্বরূপ অম্বিকাপদ সুকৌশলে বোন বুড়ীকে ওর সঙ্গে দিয়েছে—অর্থাৎ বাপের বাড়ি যাতে বিষময় হয়ে ওঠে। গোপনে মাকে বলেছে, 'বুড়ীটার শরীর তো মোটে ভাল থাকছে না—ওকে মেজ বৌয়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও না, একটু ঠাঁইনাড়া হয়ে আসুক?'

'ওমা—সে আবার বেয়াইরা কি মনে করবে! আচ্ছা, মেজ বৌকে বলে দেখি—'

তিনিও প্রকাশ্যে না বলে মেয়ে বুড়ীকে টিপে দিলেন। সে সোজা বায়না ধরল, 'আমি মেঁজবৌঁদির সঙ্গে যাঁব—মাঁ।'

'ওমা, ওমা, ও কি কথা রে। ও যাচ্ছে দুটো মাস জুড়োতে—তুই যাবি কি?'

অম্বিকাপদ ভেতর থেকে বললে, 'তা যাক না—ছেলেমানুষ বায়না নিচ্ছে। পরের বাড়িতে পাঠাতেই তো হবে দু বছর পরে। তার চেয়ে বড়লোকের বাড়ি ভাল-মন্দ খেয়ে শরীরটা সেরেই আসুক না। ও আর এত কি জ্বালাবে সেখানে?'

এই বলেই অম্বিকাপদ বেরিয়ে গিয়েছিল, স্ত্রীর অগ্নি-দৃষ্টি অনুভব করলেও

চোখ দিয়ে দেখে ন। এখন মাসদুই দেখতে হবেও না—সে নিশ্চিন্ত হয়েই কথাটা বলেছিল।

অগত্যা প্রমীলাকে বলতে হয়েছিল, 'তা চলুক না মা।…আমাদের অবিশ্যি গরীবের সংসার—সবাই তা জানে, তাই বলে অমন খোঁটা দিয়ে কথা বলবার কি আছে তাও জানি না। তবে হ্যাঁ—ডাল ভাত আমাদের সংসারেও খেতে পাবে। বাগানে ডুমুর-থোড়-মোচা-কাঁচকলারও অভাব নেই। বুড়ী চলুক না!'

'ওমা—সত্যিই যাবে নাকি?' যেন আকাশ থেকে পড়েছিলেন ক্ষীরোদা, 'তা যাক তা হলে। খুব লক্ষ্মী হয়ে থাকবি কিন্তু, সেখানে যেন চাট্টি নিন্দে কুড়োস নি!'

সুতরাং প্রমীলা বুড়ী কেউ নেই।

শাশুড়ী অনেক ভেবে-চিন্তে বললেন, 'যে দিনকাল, ঘরগুলো এমনি ফেলে রাখা ঠিক নয় বৌমা—কি বল? দুগ্গো না হয় মেজ বৌয়ের ঘরে শুক, তুমি তোমার ঘরে থাক—আমি এ ঘর চৌকি দিই!'

মহাশ্বেতার মুখ শুকিয়ে উঠল, 'আমার যদি ভয় করে মা—আমাশা মত হয়েছে—'

'ওমা, ভয়ের কি আছে মা?…এই তো গায়ে-গায়ে ঘর। ডাক দিলেই উঠে পড়ব। তুমি কিচ্ছু ভয় করো না বড় বৌমা, তুমি ঘর থেকেই ডেকো, আমি ঠিক উঠে যাব। আমার সজাগ ঘুম—।'

তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে দোর দিয়ে শুয়েছিলেন।

মহাশ্বেতার ঘুম আসে নি। এতখানি বয়স পর্যন্ত কোন দিন তাকে একা শুতে হয় নি—না বাপের বাড়ি, না শ্বশুর বাড়ি। আজ একা শোবার প্রস্তাব থেকেই গা ছম্‌ছম্ করতে লাগল। বাইরে গাছের পাতা নড়লে মনে হয় কে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'আর তেমনি কি নানা রকম শব্দ এ পোড়ার দেশে!' আপন মনেই গজ্‌গজ্ করে মহাশ্বেতা, 'ভাম আছে, ভোঁদড় আছে, কাঠবেড়াল আছে—ইঁদুর বেড়াল—নেই কি? জাজ্বল্যমান সংসার! মুখে আগুন তোদের, কেবল সব শব্দ করে বেড়াবে!'

অবশেষে আর থাকতে না পেরে উঠে হাতড়ে হাতড়ে লণ্ঠনটা জ্বাললে—এটা নতুন সম্পদ ওদের ঘরে, পিদিম ঘুচেছে। অভয়পদ অফিস থেকে এনেছে গোটা-তিনেক, কেরোসিন তেলে জ্বলে। কিন্তু আলো জ্বালতে যেন আরও ভয় বাড়ে। মনে হয় জানলার পাশে বাইরে কারা সব দাঁড়িয়ে আছে এদিকে চেয়ে, তারা দেখছে অথচ সে দেখতে পাচ্ছে না। মরীয়া হয়ে উঠে গিয়ে একসময় জানলাটা বন্ধ করে দিলে। অসহ্য গরম, তা হোক—গরমে কিছু মানুষ মরে যায় না।…

কিন্তু জানলা বন্ধ করেও স্বস্তি পায় না। ঘরের মধ্যেই যেন কারা সব ঘাপ্‌টি মেরে রয়েছে মনে হয়। হেঁট হয়ে তক্তপোশের তলা দেখে। তাই কি ছাই—দেখবার জো আছে? যত রাজ্যের ডেয়ো-ঢাক্‌না, যার যা আছে আপদ-বালাই সব এই ঘরে রাখবার জায়গা হয়েছে।…লাঠি দিয়ে এটা ওটা সরিয়ে দেখে। না,

কেউ তো নেই বলেই মনে হচ্ছে।...

এরই মধ্যে একসময় পেটটা মুচড়ে ওঠে।

ওর যেন কান্না পেয়ে যায়।

বন্ধ দোরের ভেতর থেকে ডাকে, 'মা, ওমা—মা শুনছেন?'

ক্ষীরোদার 'সজাগ' ঘুম ভাঙে না।

তখন নিজের দোরেই গুম্ গুম্ করে ঘুঁষি মারে। এইবার শুনতে পান ক্ষীরোদা—তাড়াতাড়ি উঠে দোর খুলে বাইরে আসেন, 'কি হয়েছে বৌমা, বাগানে যাবে? চল না মা। দোরটা খোল।'

দোর খুলে যেন বাঁচে। কিন্তু বাগান থেকে ফিরে এসে আবার সেই সমস্যা।

ভয়ে ভয়ে বলে, 'এ ঘরে তো বিশেষ কিছু নেই মা। চাবি দিয়ে আমি আপনার কাছেই যাই না?'

'ওমা কিছু নেই—বল কি?' শাশুড়ী অবাক্ হয়ে গালে হাত দেন, 'ছিষ্টির জিনিস রয়েছে যে! তা ছাড়া এই তো ডাকলে আর উঠে এলুম। এত ভয়েরই বা কি হয়েছে তাও তো বুঝি না। বেশ তো, লণ্ঠনটা না-হয় জ্বালাই থাক।...তবে কমিয়ে দিও বৌমা, মিছিমিছি তেল নষ্ট।'

অগত্যা দোর বন্ধ করে এসে আবার শুয়ে পড়তে হয়।

প্রাণপণে ঘুমোবার চেষ্টা করে চোখ বুজে; না, ভয় কি? সে ঘুমোবেই। রাম-রাম-রাম—দুর্গা-দুর্গা-দুর্গা—রাম-রাম—

বোধ হয় শেষ অবধি ঘুমিয়েই পড়েছিল, অকস্মাৎ কি একটা বিকট আওয়াজে চমকে ঘুম ভেঙে গেল ওর—চিৎকার করে উঠে বসল।

চালটা কাঁপছে—। দরজা জানলার পাল্লাগুলোয় কে অমন করে লাথি মারছে—?

ভয়ে দম বন্ধ হয়ে যাবে নাকি মহাশ্বেতার? প্রথম চিৎকারের পর ভয়ে গলা দিয়ে আওয়াজও বেরোয় নি আর। দু হাতে বুকটা চেপে ধরে কাঠ হয়ে বসে ছিল।

ও, ঝড় উঠেছে। তাই বল!

মহাশ্বেতা হাঁফ ছাড়ে। দোর-জানলায় তারই আওয়াজ। গোঁ গোঁ করছে বাতাস চালের বাতায় আর কপাটের খাঁজে খাঁজে। বাঁশ-বনে কট্‌কট্ করে উঠছে বাঁশগুলো—ভীষণ দুর্যোগ।

প্রথমকার ভয়টা কমলেও দুর্যোগের ভয়টা একটু একটু করে পেয়ে বসে ওকে। অভয়পদ যদি থাকত, তার বুকের মধ্যে মুখটা গুঁজে আরামে ঘুমোতে পারত সে। মুখে আগুন মুখপোড়ার, বোনের উপর দরদ উথলে উঠল একেবারে!

ঝড় যেন বাড়তেই থাকে। গোঁ-ও-ও করে হাওয়ার দমক যখন আসে—মনে হয় ঘরটা কাঁপছে। চালাটা উড়িয়ে নিয়ে যায় যদি? শাশুড়ী মাগী তো বেশ ঘুমোচ্ছে, ওর আর কি—পাকা ঘর, ছেলে আবার সেদিন সারিয়ে দিয়েছে—

ইস্! পেট্‌টা আবার মুচড়ে ওঠে দারুণ।

বাইরে এ কী কাণ্ড চলছে, যেন অনেকগুলো বুনো মোষ ক্ষেপে উঠেছে। বাগানে যাবে কি করে ? নারকেলের পাতাগুলো খসে পড়ছে—গাছই হয়তো কত উপড়ে ফেলবে—

কিন্তু আর থাকতেও পারে না সে। পেট্‌টা বড্ড ব্যথা করছে। এবার হয়তো সে মরেই যাবে, ইস্‌—পেট কেটে কেটে দিচ্ছে যেন কে—

'মা ওমা, মা আমি মরে গেলুম যে—'

দুম-দাম কিল মারতে থাকে সে।

কিন্তু ঘুম ভাঙে না ক্ষীরোদার। অথবা ঝড়ের আওয়াজে শুনতে পান না।

'মা আমি মরে যাব যে—কেউ জানতেও পারবে না। ওমা—'

মরীয়া হয়ে, যন্ত্রণায় থাকতে না পেরে দোর খুলে বেরিয়ে আসে সে। পাগলের মত শাশুড়ীর দোরে ঘা মারতে থাকে।

দেখতে দেখতে জলের ছাটে ওর গা মাথা ভিজে ওঠে। বাইরে প্রলয় কাণ্ড চলছে। লক্ষ লক্ষ অগ্নিময় সর্পশিশু ছুটোছুটি করছে আকাশে—নীচে মত্ত মাতালের মত বাতাসের চলছে দাপাদাপি।

'মা, ওমা—'

ক্ষীরোদা শশব্যস্তে দোর খোলেন।

'ওমা, এ কি মা! এসো এসো। ইস্‌ ভিজে গেলে যে মা। আলোটা—তাই তো, দেশলাইটা আবার কোথায় ফেললুম দ্যাখ। অ দুগ্‌গো—এ আবার কি বিপদ হল—'

'মা, বড্ড—বড্ড পেট ব্যথা করছে, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। উ—মাগো মরে গেলুম—'

ধনুকের মত বেঁকে ঝুঁকে পড়ে সে সামনে—

'তুমি ভেতরে এসো বৌমা, নইলে এখানেই বরং বসে পড় মা, আমি মোক্ত করব এখন—এই ঝড়ে মাঠে আর যায় না—'

কিন্তু কোথাও বসবার আগেই এক বিপর্যয় ঘটে যায়।

কি যে হয় তা বুঝতে পারে না মহাশ্বেতা। ওটা কি পড়ল!

'মা—গো!'

অসহ আর্তনাদ করে ওঠে মহাশ্বেতা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা বিদ্যুৎ-স্ফুরণে ক্ষীরোদাও দেখতে পান।

'ওমা, এ কী সর্বনাশ হয়ে গেল মা! তোমার যে ছেলে পড়ে গেছে। অ দুগ্‌গো!'

সে চিৎকারে দুর্গাপদরও ঘুম ভাঙে। সে ছুটে বেরিয়ে আসে।

'ওরে শিগ্‌গির, ঐ তোর বড়দার ঘরে আলোটা আছে—নিয়ে আয়, নিয়ে আয়।'

মহাশ্বেতার সব চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে আসছে তখন। কি এক মহা শান্তি ও শ্রান্তিতে হাত-পা অবশ হয়ে এলিয়ে আসছে। সে টলে পড়েই যাচ্ছিল, অন্ধকারেই কেমন করে বুঝতে পেরে ক্ষীরোদা বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাড়াতাড়ি।

'আহা তাই তো মা। তুমি এখানে এইখানটায়—এই মেঝেতেই শুয়ে পড়।'

কোনমতে ওকে শুইয়ে দিয়েই ছুটে গিয়ে শিশুটাকে তুলে নেন কোলে।

ততক্ষণে দুর্গাপদ আলো নিয়ে এসেছে। আটমাসের অপুষ্ট শিশু, তার ওপর মাথায় চোট লেগেছে পড়বার সময়। তবু কিন্তু প্রাণ আছে মনে হচ্ছে।

'ওরে অ দুগ্‌গো—দাইকে ডাকার কি হবে বাবা?'

'সে আমি পারব না। এই ঝড়জলে! আর সে-ই বা আসবে কেন?'

তাও তো বটে!...

সেই ভাবেই কাটল বাকী রাতটুকু। মহাশ্বেতা মেঝেতে পড়েই অঘোরে ঘুমোতে লাগল আর ক্ষীরোদা শিশুটাকে বুকে করে বসে রইলেন। মহাশ্বেতাকে একটা শুকনো কাপড় পরাবার কথাও তাঁর মনে পড়ল না।

শেষরাত্রে ঝড় থামতে দুর্গাপদ গিয়ে দাই ডেকে আনল। তখন ক্ষীরোদা তাড়াতাড়ি পুকুরে একটা ডুব দিয়ে এসে গরম জল চাপালেন। আঁতুড় ঘরেরও ব্যবস্থা হল—ছেঁড়া মাদুরের ওপর একটা ছেঁড়া কাঁথা পেতে।

দুর্গাপদ তারই ফাঁকে দাইকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে শশীর মা, খোকা না খুকী?'

'খোকা হয়েছে গো ছোড়দা, খোকা।' একরাশ পান-দোক্তার মধ্যে থেকে কোনমতে উত্তর দেয় শশীর মা।

'বেঁচে যাবে তো?'

'কেন যাবে না! ষাট্ ষাট্—ও কি অলুক্ষুণে কথা? তবে শশীর মা আছে কী করতে! বলি তোমরাও তো ক-ভাইবোন এই শশীর মা'র হাতেই—'

তা সত্যিই শশীর মা তার হাতযশ দেখালে। ভোরবেলা অভয়পদ যখন এসে পেঁছিল তখন ক্ষীণ হলেও—শিশুকণ্ঠের কান্না পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, ওঁয়া-ওঁয়া—ওঁয়া-ওঁয়া।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

মহাশ্বেতার যে এক মামাশ্বশুর আছেন, সেটা বিয়ের দিন থেকেই আকারে-ইঙ্গিতে শুনে আসছে সে। আকারে-ইঙ্গিতে বলাও হয়তো ভুল, স্পষ্ট উল্লেখও শুনেছে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই দেখেছে যে কথাটা চেপে যায় সবাই। অভয়পদ যদিও কোনও দিনই নাম করে নি—এক বারও না, কিন্তু ক্ষীরোদা করে ফেলেছেন—আর করবার সঙ্গে-সঙ্গেই, মহাশ্বেতা দেখেছে যে তাঁর মুখখানা কেমন হয়ে যায়, কথাটা ঘুরিয়ে নেন তৎক্ষণাৎ। ব্যাপারটা বোঝে না সে—অবশ্য এর ভেতর যে বোঝবার কিছু আছে তাও হয়তো মহাশ্বেতা কোনদিন বুঝত না যদি না প্রমীলা তাকে বুঝিয়ে দিত। সে-ই প্রথম বলে, 'হ্যাঁরে দিদি—কী ব্যাওরাটা বল্ দিকি এদের? মামার নাম করে না কেন? নাম যদি বা মা করে ফেলেন, পুরুষরা কী রকম কট্‌মট্

করে চায় মা'র দিকে তা দেখেছিস ? অমনি যেন মা গুটিয়ে এতটুকু হয়ে যান, কেন্নোর গায়ে হাত লাগার মত অবস্থা হয়। কেন বল্ দেখি !'

মহাশ্বেতা বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকে। সত্যিই তো—এ কথাটা তো কোনদিন ওর মাথায় যায় নি। মেজবৌটার বুদ্ধি কিন্তু খুব, পুরুষমানুষ হলে লেখাপড়া শিখে 'জজ মেজেস্টার' হত ! সে সপ্রশংস মুঢ় দৃষ্টিতে মেজবৌয়ের দিকে খানিক চেয়ে থেকে বলে, 'তা কি জানি—কেন বল্ না !'

'তাই যদি জানব তা হলে আর তোমাকে জিজ্ঞেস করব কেন ? বটঠাকুরকে শুধিও না এক বার কথাটা। আমাদের এ মিনসেকে বললে চোখ পাকিয়ে বলে—সব তাতেই তোমাদের মাথা ঘামানোর দরকারটা কি ? মামা আছে একজন এই পর্যন্ত। আমার বাবার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির বনত না—যাওয়া-আসা নেই তাই—এই বলে উড়িয়ে দেয়, বোঝ না ? যাওয়া-আসা নেই তো—বিয়েতে নেমন্তন্ন করে কেন ?'

'নেমন্তন্ন করে বুঝি ?' মহাশ্বেতা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, 'কৈ, এসেছিল তোর বিয়েতে ?'

'নেকু ! বাড়িতে থাক তুমি, খবর রাখ না ? আমি তো নতুন বৌ, বৌ সেজে বসে আছি, আমি জানব কেমন করে ?…তবু আমি খবর রেখেছি। তোমার বিয়েতেও তো করা হয়েছিল। কখনও আসে না, কে এক জন সরকার না গোমস্তাকে পাঠায়। তা তোমার বিয়েতে নাকি একটা টাকা ঠক্ করে দিয়ে গিয়েছিল—আমার ভাগ্যি ভাল—আমাকে মুখ-দেখানি দিয়েছিল চার টাকা। সেই কথা নিয়ে ভাসুরে আর শাশুড়ীতে কথা হচ্ছিল, ওরা বলছিল, আগের বার হয়তো সে লোকটাই কিছু সরিয়ে থাকবে, তাই তো আমি শুনলুম !'

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ—তাই তো ! মহাশ্বেতার মনে পড়ে যায় কথাটা। কে এক জন তাকে একটা টাকা দিয়ে গিয়েছিল বটে, তখন অতটা সে খেয়াল করে নি। শুনেছিল কলকাতার কে এক আত্মীয়—এই পর্যন্ত।

'ও, তা হলে সে-ই মামাশ্বশুরের লোক !'

'হ্যাঁ গো সীতে—সে-ই !' প্রমীলা হেসে লুটিয়ে পড়ে, 'তুমি কোন্ জগতের লোক দিদি, তাই ভাবি।'

'নে বাপু, তোর রঙ্গ রাখ। অত-শতয় কী দরকার আমার !' মহাশ্বেতা মুখটা ঘুরিয়ে নেয়।

কিন্তু প্রশ্ন সে করেছিল ঠিকই। এক দিন অভয়পদর জেগে থাকার এক দুর্লভ সুযোগে সে কথাটা বলেই ফেলেছিল, 'আচ্ছা তোমাদের তো এক মামা আছেন, না ? তা তোমরা মামার বাড়ি যাও না কেন ?'

'কেন বল দেখি—হঠাৎ এ খোঁজ !' অভয়পদর প্রশান্ত কণ্ঠস্বরে একটুখানি কি কৌতূহল ধরা পড়ে ?

পড়লেও মহাশ্বেতার তা টের পাবার কথা নয়, সে পায়ও না। সে বলে, 'না তাই বলছি। শুনি কিনা—এক জন আছেন, অথচ তোমাদের তো কখনও যেতে

দেখি না। তাঁরাও তো আসেন না!'

'কথাটা কি তোমার মাথাতেই গেছে বড় বো '

'মাথাতে যাওয়া-যাওয়ির আর আছে কি? সোজা কথা জিজ্ঞেস করছি, পছন্দ হয় উত্তর দিও, না হয় দিও না।'...রাগ করে বলে মহাশ্বেতা, 'মেজবৌও বলছিল বটে—'

'তাই বল!' অভয়পদ হাসে একটু, তার পর বলে, 'যাই না, আসা-যাওয়া নেই। নিজেদের দুঃখের ধান্দায় ঘুরব, না অত দূরে উজোন ঠেলে যাব!'

'তা কৈ, তাঁরাও তো আসেন না!'

'বড়লোক আর কবে গরীব আত্মীয়ের খবর নেয় বল!'

'তাঁরা বুঝি খুব বড়লোক?'

'খুব!'

খানিকটা চুপ করে থাকে মহাশ্বেতা। তারপর বলে, 'বড়লোক তো তোমাদের কিছু দেয় না কেন? তোমাদের অভাব তো! আমাদেরও তো গয়নাগাঁটি দিতে পারত!'

'অত দিলে-থুলে কি বড়লোক হতে পারে মানুষ? পয়সা জমালেই বড়লোক হয়!'

যুক্তি অকাট্য—অন্তত মহাশ্বেতার তাই মনে হয়েছিল। সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছিল।

কিন্তু অত সহজে ভোলে নি প্রমীলা। মহাশ্বেতার মুখে কথাগুলো শুনে বলেছিল, 'উঁহুঁ। কথাটা অত সোজা নয় ভাই, তা তুই যতই বলিস। এর ভেতর আরও কথা আছে।'

'আবার কি কথা থাকবে?' অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করে মহাশ্বেতা।

'আছে বাবা, আছে। সে আমি ওদের ঐ ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় ভাব দেখেই বুঝতে পারি। আচ্ছা আমিও রইলুম—মামাশ্বশুরও রইল। এক দিন আমি কথাটা বার করবই। আমাকে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা নয়।'

তবু কথাটা ঐখানেই চাপা পড়ে গিয়েছিল।

এসব মহাশ্বেতার ছেলে হওয়ার আগেকার কথা। ছেলের অন্নপ্রাশনে ঘটা হয় নি—দেইজিদের বাড়ি আর পাড়া-ঘরে বলা হয়েছিল দু'চার জনকে। অপুষ্ট রুগ্ন ছেলে, বারো মাসই ভোগে। ওর ওপর কারুর আশা-ভরসা নেই। নেহাত নিয়ম-রক্ষা করা তাই। সুতরাং সেক্ষেত্রে মামাশ্বশুরকে নিমন্ত্রণ করার প্রশ্নই ওঠে নি।

তার পরও কথা তোলবার ফুরসুত পায় নি মহাশ্বেতা। কারণ ছেলে হবার পর থেকে স্বামী তার কাছে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। সাধ্যমত অভয়পদ সে-ঘরে শোয় না। ওদিকে একটা আধ-চালা মত করে নিয়েছে—গরমের সময় সেইখানে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমোয়। বেঞ্চিটাও নিজে তৈরী করেছে—কতকগুলো ভাঙা

কাঠ জোড়া দিয়ে। হঠাৎ ঝড় জল হলে কোনদিন ঘরে আসে—নয়তো বেঞ্চিটা তুলে নিয়ে চলনে এসে শোয়। মহাশ্বেতা অনুযোগ করলে বলে. 'যা তোমার ছেলের ঘ্যান্‌ঘ্যানানি—খাটিখুটি, ঘুমটা ভাল না হলে চলে ?'

মহাশ্বেতার কান্না পায় যেন। এর চেয়ে—ওর মনে হয়—ছেলে না-হওয়া ভাল ছিল। ছেলে তো ভারি—এক-এক সময় হতাশ হয়ে পড়ে সে। এ ছেলে কি বাঁচবে শেষ অবধি, কোনদিন মানুষ হবে ?

এক-এক দিন ছেলেকে নিয়ে সারারাত জেগে বসে থাকতে হত। কিন্তু আশ্চর্য, সে-সব রাতগুলোতে যেন ঘুমের মধ্যেও টের পেত অভয়পদ—ওর অবস্থাটা। না ডাকতেই এসে বলত, 'তুমি একটু গড়িয়ে নাও, আমি বসছি ওর কাছে।' কিংবা কোনদিন ঝড় উঠলে, কি বড় রাস্তা দিয়ে মড়া নিয়ে গেলে—ঠিক উঠে এসে নিচু গলায় ডাকত, 'বড় বৌ, ভয় পেও না। আমি জেগে আছি।' ঝড়ের সময় সোজাসুজি ঘরে এসেই শুত। ওর রকম-সকম দেখে মহাশ্বেতার এক-এক সময় সন্দেহ জাগত—লোকটা কি তা হলে জেগেই থাকে সারারাত ? ··

যাই হোক—এর ভেতরেই হঠাৎ এক দিন মামাশ্বশুরের কথাটা উঠল ! কারণটাও বড় অদ্ভুত।

রাজা আসবেন, রাজা আসবেন, চারিদিকে রব উঠেছে। কাটা বাংলা আবার জোড়া লাগবে। বাংলার লড়াই মিটেছে—জয় হয়েছে বাঙালীরই, তাদেরই জেদ বজায় থেকেছে। সেই উপলক্ষে নতুন রাজা—মহারাণীর নাতি—ভারতবর্ষে আসবেন, কলকাতাতেও আসবেন। মহারাণীর বড় নাতি নন—তিনি মারা গেছেন। বিয়ের সব নাকি ঠিক-ঠাক, এমন সময় মারা যান বেচারী. সেই কনের সঙ্গেই এই নতুন রাজার তখন বিয়ে হয়। কনে এসে গিয়েছিল—তখন তো আর তাকে ফেরত দেওয়া যায় না। আরও কত কি গল্প – কেন কনেকে ফেরত দেওয়া গেল না, সে সম্বন্ধে মনগড়া অবাস্তব যত কাহিনী। কত কথাই যে মানুষের উর্বর মাথায় গজিয়ে উঠল। রাজা নাকি বাঙালীদের বড় ভালবাসেন ('ভারতীয়' শব্দের তখন ব্যবহার ছিল না, ব্যাপক অর্থেও বাঙালীকে বোঝাত, আবার হিন্দু শব্দের বদলেও বাঙালী কথার ব্যবহার ছিল), তিনি এখানেই থাকতে চান। কিন্তু তা হলে বিলেতে চলবে না। তাই তারা আসতে দিতে চায় না। অনেক বলে-কয়ে এবার রাজা আসতে পেরেছেন। আমাদের ভালবাসেন বলেই সাহেবদের রাগ—তাতে নাকি তাদের ইজ্জৎ থাকে না। এইসব নানা অবান্তর এবং অসম্ভব কাহিনী লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে এই সুদূর পল্লীগ্রামের ডোবার জলেও যেন তরঙ্গ তুলেছে, এখানকার শান্ত নিরুদ্বিগ্ন কূপমণ্ডূকের জীবনেও জাগিয়েছে বহির্বিশ্বের কৌতূহল।

রাজাকে দেখতে হবে।

এ দুর্লভ সুযোগ ছাড়া হবে না। আর কি এ সুযোগ মিলবে ?

কোন্ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে থাকেন এই রাজা। দয়াময়ী মহারাণীর নাতি। এর আগে আর কোন রাজা এদেশে আসেন নি। এঁর বাবা এক বার

এসেছিলেন, তবে তখনও তিনি রাজা নন—যুবরাজ মাত্র। তাও সে বহুকালের কথা—মহাশ্বেতার জ্ঞানে দেখে নি, হয়তো জন্মেরও আগে। তা ছাড়া শুধু তো রাজা দেখাই নয়—রাজা আসা উপলক্ষে শহর সাজানো হবে—আলো দেওয়া হবে। ভারতবর্ষের অন্য রাজা-রাজড়ারাও এখানে আসবেন। রাজধানী জায়গা, এখানে এসেই মহারাজারা সেলাম জানাবেন তাঁদের রাজচক্রবর্তীকে। তাঁদেরও দেখা পাওয়া যাবে—সেই বা কম কথা কি? লোকে বলে রাজদর্শনে মহাপুণ্য।

মহাশ্বেতা যে মহাশ্বেতা—সে-ও বায়না ধরে বসল, 'আমাদের বাপু রাজা দেখাতে হবে, তা বলে রাখছি।'

অভয়পদ চমকে ওঠে, 'পাগল নাকি? সেই ভিড়ে তোমরা কোথা থেকে দেখবে? গোটা দেশটা ভেঙে পড়বে ক'দিন কলকাতায়। তার মধ্যে আমরা কেমন করে যাব?'

'তা জানি না। যেমন করে হোক্ ব্যবস্থা কর। তুমি সব পার।'

অভয়পদ তখনও উড়িয়ে দেয় কথাটা।

কিন্তু অবিরাম নানা কাহিনী এসে পৌঁচচ্ছে। পাড়া-প্রতিবেশী কারুর মুখেই আর অন্য কথা নেই। পুকুরে বাসন মাজতে কি গা-ধুতে গেলেও এ-ঘাটে ও-ঘাটে ঐ প্রসঙ্গ।

'মহারাণী মরবার আগে পই-পই করে বলে গেছেন, আমার বংশের যে যবে রাজা হোক—বাঙালীদের ভাল করে দেখবে। ওরা আমার বড় প্রিয়।'

'তা তো বলবেনই ন-খুড়ী। আহা, এরা যে তাঁর প্রাণ ছিল। যে দিন দেখলেন যে কোম্পানির হাতে ঠিক শাসন হচ্ছে না, সেইদিনই তো ওদের তাড়ালেন। তিনি তো তাই বলেছিলেন, ওরা সবাই আমার সন্তান। শাসন করতে হয় আমি করব—কোম্পানি কে?'

'তিনি মা সাক্ষাৎ ভগবতী ছিলেন। বলে রাজার পুণ্যে রাজ্য। নইলে আর আজ ইংরেজ রাজত্বের এমন দবদবা—সুয্যি কখনও পাটে বসে না এদের রাজত্বে।'

'তা ছাড়া তিনি নাকি বলে গিয়েছেন সবাইকে—ওটা হল ধম্মের দেশ। অধম্ম করে শাসন করলে আমাদের রাজত্ব থাকবে না। সাবধান!…সেই জন্যেই তো শুনেছি রাজা এসে বাংলো আবার জোড়া দিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ দিদ্‌মা, রাজা আমাদের মত ভাত খায়?'

'ওমা তা খায় না! এখানকার যা সরেস চাল সবচেয়ে তাই-ত ওখানে যায়। আগে কি খেত—আগে খেত না। শুধু মাংস, তাও শুনেছি ঝল্‌সানো মাংস খেয়ে থাকত! মহারাণীই পেরথম নিয়ম করলেন, আমার প্রেজারা যা খায় আমিও তাই খাব! তার পর থেকেই তো হন্দর হন্দর চাল যাচ্ছে ওদেশে। নইলে বালাম চালের এত দর কেন? সাহেবরা যে আজকাল সবাই ভাত খাচ্ছে!'

দিনরাত এই চলছে।

সে নূতন হাওয়া এসে ক্ষীরোদাকেও লাগে। তাঁর সেই একান্ত স্তিমিত ও সীমিত জীবনেও নাড়া দেয় সে হাওয়া। অতীত জীবনের রোমন্থন-করা চিত্তে

স্মৃতির তরঙ্গ তোলে।

তিনি ঠাকুরঘরের বন্ধ দরজায় ঠেস দিয়ে বসে বলেন, 'আমরা তখন সবে হয়েছি কি হই নি—মনে নেই, মা'র মুখে শোনা—জানো মেজ বৌমা, কথাটা উঠল যে সেপাইরা নাকি সায়েব দেখছে আর কাটছে। ইংরেজ-রাজত্ব আর থাকবে না। আমার মামারা, দাদামশাই সব পশ্চিমে চাকরি করতেন। কথা উঠল যে বাঙালীদেরও কাটছে. ওরা সায়েবদের দিকে বলে। সে এক-এক দিন এক-এক কাণ্ড মা। মা গল্প করত আর হাসত এদান্তে। এক দিন রান্না চড়ানো—এক জন এসে দিদিমাকে বলে গেল, অ বামনি হাঁড়ি নামা. হাঁড়ি নামা। শুনিস নি? বেজাকে আর তোর বেটাদের সব কেটে রেখে গেছে সেপাইরা? ওমা, তখনই উনুনে জল ঢেলে দেওয়া হল—বাড়িতে মড়া কান্না। আমার মা'র ঠাকুর্দা তখন বেঁচে ছিলেন। তিনি কোথায় যেন গিছলেন, বাড়ি এসে কান্না দেখে তিনিও প্রথমটা আছড়ে পড়েছিলেন, তার পর খানিক পরে খেয়াল হল—খবরটা দিলে কে? ঐ যে ওপাড়ার দত্তগিন্নী। দত্তগিন্নী খবর পেল কোথায়? আজ সাত দিন কোন ডাক আসে নি, খবর আসে নি।...খোঁজ খোঁজ—দত্তগিন্নী পালিয়ে বেড়ায়...শেষে সটেপটে ধরতে বললে, আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম। এমনি নিত্যি মা নিত্যি—এক-এক দিন এক-এক ঢেউ।'

তার পর খানিক থেমে ছড়ানো পায়ে নিজেই হাত বুলুতে বুলুতে বলেন, 'তা জানো গা মেজ বৌমা, সেই সব খবর মহারাণীর কানে পেঁছিল। সেপাইরা হেরে যেতে গোরাগুলো বললে, আমাদের যত সায়েব মরেছে এদের পেত্যেকের জন্যে আমরা এক হাজার করে বাঙালী কাটব। কথাটা শুনে মহারাণী বললেন, কখ্খনো না। ওরা সব আমার ছেলে, কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কদাচ নয়। দাওয়ানকে তখুনি ডেকে হুকুম দিলেন, কোম্পানির কাছ থেকে সব বুঝে-পড়ে নাও। আজ থেকে আমার লোক শাসন করবে। সেই জন্যেই তো বৌমা, মহারাণী যখন মারা গেলেন, সব্বাই দেশসুদ্ধ অশৌচ নিলে! গাঁয়ে গাঁয়ে ছাদ্দ হল। অমন রাণী আর হবে না। সেই সেকালে শুনেছি রাণী ভবানী, একালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া!'

রাণী ভবানীর কথায় মহাশ্বেতার একটা কথা মনে পড়ে যায়।

সে হি-হি করে হেসে বলে, 'জানেন মা—আমার দিদিমার ওখানে এক বুড়ো আমওলা আম দিতে আসত, সে যা মজার কথা বলত। বলত, রাণী ভবানীরে মুই চিনি নে? ইয়া মোচ, ইয়া দাড়ি, চারদিকে চার গ্যার্দা বালিশ, তার মধ্যে বসে আছেন মা যেন গজেন্দ্রগামিনী। আবার তার দুদিকে চ্যানির হাঁড়ি, ফ্যাচ্ছে ম্যাচ্ছে চ্যানি খাচ্ছে!...হি হি!'

সেই প্রসঙ্গে হঠাৎ বলে বসেন ক্ষীরোদা, 'তোমার মাসী তো কলকাতায় থাকেন বড় বৌমা, সেখানে গিয়ে উঠলে কি হয়—রাজা দেখা যায় না?'

মুখ ম্লান হয়ে আসে মহাশ্বেতার। সে বলে, 'সেদিন কি আর আছে। দিদিমা মারা গিয়ে তাদের এখন হাড়ির হাল। একখানা ঘর ভাড়া করে থাকে

তিনটি প্রাণী, সেখানে গিয়ে কি ওঠা ভাল দেখাবে ? আর তাদেরই বা কী ব্যবস্থা হবে কে জানে ! তারা কি আর আমাদের রাজা দেখাতে পারবে ?'

হঠাৎ দুম্‌ করে প্রমীলাই কথাটা বলে ফেলে, 'আপনার তো ভাই-ই রয়েছেন মা, শুনেছি তিনি খুব বড় মানুষ—সেখানেই চলুন না কেন ! আমাদের তো মামা হন – আমাদেরও তো জোর আছে খানিকটা !'

মুখখানা নিমেষে যেন বিবর্ণ হয়ে যায় ক্ষীরোদার, কেমন যেন অপ্রতিভ ভাবে বলেন, 'ওমা, সে কি হয় ?'

'কেন হবে না মা। এক দিন ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে ওঠা যায় না ? তবে আর আত্মীয়তা কিসের ?···বড়লোক, এক বেলা খাওয়াতে কি এত কষ্ট হবে ? তা না হয় আমরা চাল-ডাল বেঁধে নিয়ে যাব।'

মহাশ্বেতাও জোর দেয়, 'তাই চলুন মা, সে বেশ হবে।'

বিষম বিব্রত হয়ে পড়েন ক্ষীরোদা। সেটা তাঁর ভাব দেখেই বোঝা যায়। তিনি কথাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বলেন, 'দেখি না অভয়পদ কী ব্যবস্থা করে !'

'ও আপনি কথা চাপা দিচ্ছেন মা।' প্রমীলার দয়া-মায়া নেই।

'কে জানে বাপু। ছেলেরা একথা শুনলে রাগ করবে।' অসহায়ভাবে বলেন ক্ষীরোদা।

'ওমা, এ আবার কি কথা ! জন্মে একদিন মামার বাড়ি যাবার কথায় রাগ করবে ? আপনি বুঝিয়ে বলবেন, তা হলে আর রাগ করবে না।'

ক্ষীরোদা বিপন্ন মুখে বলেন, 'আমার কি, আমি না-হয় বলব—কিন্তু – না মেজ বৌমা, অম্বিকে অভয় সবাই রাগ করবে !'

মহাশ্বেতার পক্ষে এই ক-টি কথাই হয়তো যথেষ্ট হত কিন্তু প্রমীলা সে মেয়েই নয়, সে তার ডাগর ভাসা চোখদুটির দৃষ্টি শাশুড়ীর দৃষ্টিতে স্থির করে বললে, 'কেন বলুন তো মা—বুঝি কোন গোলমাল আছে ?'

ক্ষীরোদার মুখ সেই সায়াহ্নবেলার আকাশের মতই রক্তিম হয়ে ওঠে। সেটা, এমন কি মহাশ্বেতার চোখেও, চাপা থাকে না।

তিনি তাড়াতাড়ি বলেন, 'গোলমাল আবার কি থাকবে ! তোমার বাপু এক কথা ! না—মানে, ওরা পছন্দ করে না তাই। আচ্ছা আজ ছেলেরা আসুক, বলি কথাটা—'

তিনি উঠে যান তাড়াতাড়ি।

রাত্রে রান্না করতে করতে প্রমীলা বলে মহাশ্বেতাকে, 'ঐ মামার বাড়ি গিয়ে তবে ছাড়ব। দেখিস্—নইলে আমি বাপের বেটী নই। মা বেটা সবাইকেই তুরকী নাচন নাচিয়ে ছাড়ব।'

'কে জানে বাপু। তোর খুব সাহস। আমি হলে কিছুতেই ও কথাটা বলতে পারতুম না।' স-প্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মহাশ্বেতা।

'হুঁ ! সাহস ! অত ভয়ই বা কিসের ?'

উনুনে একটা হাল্‌কা দেখে কাঠ গুঁজে দিয়ে প্রমীলা বলে, 'কাঁদি নামলে তো আর আমরা একটা কলাও চোখে দেখতে পাব না—দুটো পাকা কলা পেড়ে রেখেছি দিদি, একটু কাসুন্দি বার কর্‌ দিকি, কলা-কাসন খাব।'

'ওমা, রাত্তিরে কাসুন্দির হাঁড়িতে হাত দোব কি লো?'

'রাখ দিকি তোমার শাস্তর। কাচা কাপড়ে বার করলেই তো হল!'

॥ ২ ॥

পরের দিনটা কী একটা ছুটির বার। দুই ভাইকে একসঙ্গে খেতে দিয়ে ক্ষীরোদা কথাটা পাড়লেন, 'বৌমারা ধরে পড়েছে মামার বাড়ি গিয়ে ঐখানে থেকে রাজা দেখবে।'...তার পর একটু থেমে কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'ওদের বোঝানো যাচ্ছে না, বলে মামার বাড়ি—নিজের মামা—সেখানে যাব না-ই বা কেন! কী এমন হয়েছে তাদের সঙ্গে?'

অভয়পদ ভাতে ডাল মাখতে মাখতে সংক্ষেপে জবাব দিল, 'না, সে হয় না। তুমি বলে দিও, সেখানে যাওয়া আমরা পছন্দ করি না। ব্যস! অত কৈফিয়তে কী দরকার।'

কিন্তু বোঝা গেল যে প্রমীলা শুধু শাশুড়ীর ওপর বরাত দিয়ে বসে থাকে নি। সে যে 'বাপের বেটী' তা প্রমাণ করার জন্য রাত্রে অন্য ব্যবস্থাও করেছে। অম্বিকাপদ এতক্ষণ হেঁট হয়ে একমনে ভাতের মধ্যে থেকে ফড়িং চোষা দানাগুলো বাছছিল, সে একটু কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে বললে, 'কিন্তু আমি বলছিলুম যে তাতে দোষই বা কি? কথাটা কিছু চিরদিন চাপা দিয়ে রাখতে পারবে না। বরং বেশী ঢাকাঢাকি করতে গেলেই সন্দেহ বাড়বে। তারা চেষ্টা করবে বাইরে থেকে খবরটা যোগাড় করতে।...তাছাড়া বৌয়েরা তো আর এখন কচি খুকী নেই। অত চাপবার দরকারই বা কি?'

অভয়পদ তার নিরাসক্ত চোখ দুটি তুলে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বড় বৌয়ের জন্যে কোন চিন্তাই নেই। সে অত বুঝতেও পারবে না। বৌমার জন্যেই আমি ইতস্তত করছিলুম। তুমি যদি অসুবিধা বোধ না কর তো আমার আপত্তি কি?' সে আবার ভাতের থালায় মন দিলে।

'না,'—অম্বিকাপদ তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করে, 'আমি বলছিলুম যে, আগে থাকতে খবর দিয়ে রাখলে তারাও কি একটু সতর্ক থাকবে না? তাদেরও তো একটা বিবেচনা আছে?'

'তাদের বিবেচনাটা আশা করতে পারো কিন্তু তার ওপর ভরসা করাটা কি ঠিক হবে? কোন কাজ করার আগে খারাপ ফলটা ভেবে নিয়ে করাই ভাল। যাক্‌, তুমি যদি ভাল বোঝ তো তাদের খবর দাও, আমার কোন আপত্তি নেই!'

ক্ষীরোদারও তখন রাজা দেখার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছে। ধনী ভায়ের বাড়িতে গেলে সেদিকে সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা বেশী—এটা তিনিও বুঝেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি অম্বিকাপদকেই সমর্থন করলেন, 'না না। তাদের আক্কেল-

বিবেচনা না থাক, লজ্জাও তো আছে। তুই তাই কর,—ওদের একখানা চিঠি দে। নইলে না হয়—কাল অফিস ফেরতা দেখা করে মতটা নিয়ে আয়।···যদি তেমন বোঝে তো ওরাই বারণ করে দেবে। ওরা তো আর ছেলেমানুষ নয়!'

অম্বিকাপদ আড়-চোখে দাদার মুখের দিকে চাইল, কিন্তু সে-মুখ পাথরের মুখ। সেখান দিয়ে একটা কথাও বার হওয়া যে আর সম্ভব নয় তা সে জানে। অভয়পদর হিসেবে সে অনেক কথা বলে ফেলেছে। সুতরাং সেও চুপ করে গেল।

চিঠি লেখার চেয়ে হেঁটে গিয়ে খবরটা নিয়ে আসা সোজা।

এই সোজা পথটাই ধরল অম্বিকা।

অভয় এখনও তার হাঁটা-পথ অব্যাহত রেখেছে কিন্তু অম্বিকা যাতায়াত করে ট্রেনে। সেইটেই নাকি সুবিধে। মাত্র তিন পোয়া পথ হেঁটে গেলেই স্টেশন, আর হাওড়ায় নামলে তো কথাই নেই। আধ ক্রোশের ভেতরেই অফিস। মিছিমিছি অত হাঁটা—দাদার মত—ও তার ধাতে সয় না।

অম্বিকা ফেরে সাধারণত সাড়ে পাঁচটার ট্রেনে, বড় জোর ছটা। সেদিন আটটার গাড়ি এমন কি সাড়ে আটটার গাড়িও পার হয়ে যেতে শাশুড়ী প্রমীলাকে ডেকে বললেন, 'হাঁড়ি-হেঁসেল তুলে ফ্যালো মেজ বৌমা, খেয়ে-দেয়ে নাও তোমরা। অম্বিকা বোধ হচ্ছে খেয়েই আসবে।'

'খেয়ে আসবে?···তার মানে?' মহাশ্বেতা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

'মামার বাড়ি গেছে—এটা বুঝছ না দিদি? মামার বাড়ির আদর খেয়ে আসছে।···নইলে এত রাত হয়! কান পেতে শোন না—সাড়ে আটটার গাড়ি সাঁকরেলের পোলে উঠেছে—তার মানে নটা বেজে গেছে কখন!'

'যদি না খেয়ে আসে?'

'ভাত ডাল তো সবই রইল। কেউ তো আর কারুর ভাগের খাচ্ছে না।··· চল চল আমরা ভাত বেড়ে নিই। এমনিই সারতে সারতে রাত এগারোটা বাজে।'

দেখা গেল প্রমীলাদের অনুমানই ঠিক। রাত এগারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে অম্বিকা বললে, 'আজ রাত্তিরে আর খাব না মা। খেয়ে এসেছি।'

'তা বুঝিছি। মানিকতলা গিয়েছিলি বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

সাগ্রহে প্রশ্ন করেন ক্ষীরোদা, 'কী খেলি রে? ভালমন্দ খাওয়ালে তো খুব?'

প্রমীলা ঘরের মধ্যে থেকে ফিস ফিস করে মহাশ্বেতাকে বলল, 'কেমন আছে তারা, কাজের কথার কী হল—এসব চুলোয় গেল—আগে ওঁকে কৈফিয়ত দাও, কী ভালমন্দ খাওয়ালে!'

অম্বিকাও সেইখানে মায়ের পাশে বসে পড়ে ফিরিস্তি পেশ করে, 'তা খুব। পরোটা করেছিল, সে পরোটা লুচির বাড়া, পাটে-পাটে ঘি আর এ-ই পাতলা— তার সঙ্গে সুতোর মত আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, শোল মাছের কালিয়া—

পাকা শোল মাছ, কী বলব মা যেন খাসি খাচ্ছি—আলুবখরার চাটনি, আর রাবড়ি। রাবড়ি নাকি ওদের ঘরে তৈরী হয়।' বলতে বলতেই যেন অম্বিকাপদর রসনা লালাসিক্ত হয়ে ওঠে।

ক্ষীরোদা ছেলের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'তা ভাল, ভাল। পেট ভরে খেয়ে নিয়েছিস তো। বারো মাস এই ডাঁটা-চচ্চড়ি খাওয়া, একঘেয়ে—পেটে চড়া পড়ে গেল!'

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা ওরা কী বললে রে? রাজী হল?'

'হ্যাঁ—তা হয়েছে। মামার খুব ইচ্ছেটা ছিল না, রতন বললে—তা কী হয়েছে, আসুক না। আমাদের তো গাড়ি রয়েছে, দেখার সুবিধা হবে।'

'তখন তোর মামা কি বললে?'

'আর কিছু বললে না। আমিও আর ঘাঁটাই নি। আমারই যখন গরজ— তখন অত খুঁচিয়ে লাভ কি? কথা আছে আগের দিন গিয়ে ওখানেই থাকব।'

'তা ভাল।'

অন্ধকারে ক্ষীরোদার মুখ দেখা গেল না। তবে কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল যে তিনি খুশীই হয়েছেন।

সে রাত্রিতে প্রমীলা ও মহাশ্বেতা অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারল না। রান্নাঘর সারার নাম করে বসে বসে গল্প করতে লাগল। কলকাতা যাবে, আলো দেখবে, ভিড় দেখবে, রাজা দেখবে—কিন্তু সেটাও বুঝি সব নয়, মামাশ্বশুরদের রহস্যটা পরিষ্কার হবে, কেন এরা তাদের প্রসঙ্গ তোলে না, কেন এরা যেতে চায় না সেখানে—তারাই বা কেন আসে না, এতদিন পরে সেইটে জানা যাবে—এই-ই বোধ হয় সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ।

জল্পনা-কল্পনারও অন্ত থাকে না। মুখখানা খুব গম্ভীর করে ভুরু দুটো কুঁচকে ভাববার ভঙ্গী করে মহাশ্বেতা বলে, 'আমার মনে হয় ওরা কেরেস্তান হয়ে গেছে।'

'দূর! তা হলে আর এত ছাপাছাপির কী ছিল! আমার মনে হয় তা নয়— মামা বোধ হয় নোট জাল করে জেল খেটেছে। আমি মা'র মুখে গল্প শুনেছি, কে একজন নোট জাল করে খুব বড় মানুষ হয়েছিল। লোকে সন্দেহ করে নি আগে, কিন্তু একদিন হল কি জানিস—জানবাজারের রাজবাড়িতে খেতে এল শালের জোড়া গায়ে দিয়ে। ফেটিং গাড়ি থেকে নামতে যাবে—কোন্ খোঁচায় আট্‌কে গেল। একটু থেমে ছাড়িয়ে নিলেই হত, তা সে বাবু থামলেন না। বরাবর সটান চলে গেলেন, শালও ছিঁড়তে ছিঁড়তে গেল। যখন অনেকখানি ছিঁড়েছে তখন শালখানা খুলে ফেলে দিলেন গা থেকে। আড়াই হাজার টাকার শাল! পয়সায় এত দুখদরদ কম—আলটপ্‌কা টাকা না হলে তো হয় না। তখনই পুলিসের সন্দ হল, সটেপটে ধরলে চেপে। ব্যস্—একেবারে দ্বীপান্তর হয়ে গেল।…আমার মনে হয় এ-ও তেমনি কিছু হবে!'

'কে জানে বাপু !'

আরও বহুরাত্রি অবধি জেগে বসে রইল ওরা। শেষে এক সময় অম্বিকা বেরিয়ে ধমক দিতে তখন রান্নাঘরের কপাটে তালা লাগিয়ে শুতে গেল।

কিন্তু তবুও কি ঘুম আসে।

শুধু সে রাত্রি কেন—তার পর বহু রাত্রিই ভাল করে ঘুম এল না। সেই অত্যাশ্চর্য রাত্রি যেদিন ওরা গিয়ে মানিকতলায় মামাশ্বশুরের বাড়ি রাত কাটাবে, সেই রাত্রিটির জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

॥ ৩ ॥

হাওড়ায় নেমে একখানা থার্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে অম্বিকাপদ। হেঁটে যাওয়ার কথাই ছিল ওদের, কিন্তু ঠিক বেরোবার মুখে অভয়পদ ভাইকে ডেকে সংক্ষেপে বলে দিল, 'নেমে একখানা গাড়ি নিও, হাঁটিয়ে নিয়ে যেও না।

কথাটা বিশেষ করে অভয়পদর মুখে এমনই বেমানান যে অম্বিকা হাঁ করে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুকাল। তখন অভয়পদই ব্যাখ্যা করে দিল, 'যেখানে যাচ্ছ, তাদেরও সম্মান আছে তো! হেঁটে গেলে তাদের চাকর-বাকররা মানতে চাইবে না যে!'

তা বটে। কথাটার যৌক্তিকতা অম্বিকাপদও স্বীকার করে। যদিচ গা কর-কর করে তার এই বাজে খরচে। হাওড়া থেকে ওর মামার বাড়ি আট আনার কম রাজী হল না কোন গাড়োয়ানই। অগত্যা তাতেই রাজী হয়ে সমস্ত পথটা গজ্ গজ্ করতে করতে যায় সে, 'ডাকাতি, ব্যাটাদের স্রেফ দিনে ডাকাতি।··· এইটুকু পথ আট আনা! রাজা আসবে তো—ভিড় হয়েছে শহরে, ব্যাটারা অমনি হাতে মাথা কাটছে!'

মহাশ্বেতা ও প্রমীলার এদিকে কান ছিল না। শাশুড়ী যে সমানে বকবক করে চলেছেন তাতেও না। তারা অবাক্ হয়ে কলকাতার বাড়ি-ঘর দেখছিল। গাড়ি বড়বাজার পেরিয়ে সিঁদুরেপটি হয়ে একসময় নতুনবাজারে পড়ল। গাড়ি-ভাড়ার শোক ভুলে অম্বিকাপদ ওদের দিকের খড়খড়িটা ভাল করে খুলে দিয়ে বললে, 'ভাল করে দেখে নাও, রাজেন্দর্ মল্লিকের নতুনবাজার।'

মহাশ্বেতা বললে, 'জানি জানি। ছোটবেলায় গিরি ঝিয়ের সঙ্গে এখানে বাজার করে গেছি কতদিন। গিরি বলত টাকা ফেললে নতুনবাজারে আর্ধেক রাত্তিরে বাঘের দুধ মেলে। দিদিমা বলতেন, এই নতুনবাজার ঝেঁটিয়েই ওঁদের চিড়িয়াখানার খরচ চলে।'

এবার প্রমীলার অবাক হবার পালা, সে বলে, 'চিড়িয়াখানা?'

'কে জানে বাপু। গিরিও বলত ঝিয়েদের আর চোখ রাঙিও নি বাপু, খেতে না পাই রাজেন মল্লিকের চিড়িয়াখানা তো কেউ ঘোচায় নি!'

তখন ব্যাখ্যা করেন ক্ষীরোদাই, 'হ্যাঁ হ্যাঁ—রাজেন মল্লিকের জন্তু-জানোয়ার পোষার যে ভারি শখ, তাই ওর বাগানকে চিড়িয়াখানা বলে। ঐখানেই আবার

ওর আতিথ্শালা। দুপুরবেলা অবারিত দ্বার—যে যাবে ভাত ডাল আর একটা ঘ্যাঁট তরকারি বাঁধা। হপ্তায় নাকি এক দিন মাছও দ্যায়। নতুনবাজারের তোলা তুলেই ওর খরচ চলে। এসব দাদার মুখে কতদিন গল্প শুনেছি।'

হঠাৎ হি হি করে হাসতে হাসতে মুখে কাপড় চাপা দেয় মহাশ্বেতা, 'হ্যাঁ মা, রাজেন মল্লিকের মা নাকি একটা করে কলা খেয়ে থাকেন? রাজেন মল্লিক মরবার পর নাকি কিছু খান নি আর? গিরি বলত।'

'কে জানে বাছা, ওসব কথা কখনও তো শুনি নি।'

ততক্ষণে গাড়ি ছাতুবাবুর বাজার পেরিয়ে চলেছে। মহাশ্বেতা খোলা জানলা দিয়ে দেখে বলে, 'ওমা, এই তো ছাতুবাবুর বাজার। এ তো আমার দিদিমাদেরই পাড়ায় এসে গেলুম সব। এই তো এইখানে কোথায় থাকতাম আমরা—'

অম্বিকা এইবার ওদের দিকের জানলাগুলো আবার তুলে দেয়। বৌ-রা জানলা খুলে এসেছে—এ ভারি লজ্জার কথা।

মহাশ্বেতা কিন্তু খড়খড়ি ফাঁক করে দেখে। মানিকতলা স্ট্রীট পেরিয়ে সংকীর্ণ গলিতে ঢোকে গাড়ি, তা থেকে পাশ কাটিয়ে আরও একটা—। দু পাশে মেয়ে-পুরুষ রাস্তায় বসে বসে বাঁশের চ্যাঁচাড়ি বার করে চুপড়ি বুনছে। নিকষ কালো তাদের দেহ, যদিও স্বাস্থ্যের খুব চিহ্ন নেই কোথাও। বরং যেন কেমন কেমন। কে জানে কী জাত!···

অবশ্য ভাববারও সময় পায় না বেশী, এরই মধ্যে একটা প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ির সামনে এসে অম্বিকা হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই গাড়োয়ান, রোকো রোকো। এই যে, এই বড় বাড়ি—।'

তার পর অকারণেই মেয়েদের ধমক দ্যায়, 'নাও, সব নামো। জড়ভরত হয়ে থেকো না। বৌদি তোমার কাঁদুনে ছেলে সাবধান!'

যদিও মহাশ্বেতার ছেলে তখন অগাধে ঘুমোচ্ছে মা'র কোলের ভেতর।

গাড়ি থেকে নেমে কিন্তু সত্যিই হকচকিয়ে যায় মহাশ্বেতা। বিরাট বাড়ি। বাইরেই এক বিশালকায় দারোয়ান বসে (পরে শুনেছিল—ওরা ভোজপুরী দারোয়ান). সে তাড়াতাড়ি সেলাম করে এসে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াল।··· বাইরের রক থেকে শুরু করে চলন, মায় ওপরের সিঁড়ি পর্যন্ত সব কেমন একরকম চকচকে পাথরের। টালির মত চৌকো চৌকো—কোনটা সাদা কোনটা কালো। অবাক হয়ে পা বুলিয়ে বুলিয়ে অনুভব করছে দেখে অম্বিকা ফিস্ ফিস্ করে বললে, 'দেখছ কি, সব মার্বেল পাথর। এই পাথরের দামে আমাদের একটা দোতলা বাড়ি হয়ে যায়!'

চলন পেরিয়ে উঠানের আগেই সিঁড়ি। কিন্তু অম্বিকা সেদিকে গেল না। রক দিয়ে গিয়ে বাঁ পাশের একটা ঘরে ঢুকল। সেখানে চৌকিতে ধপ্‌ধপে ফরাস পাতা, তাতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে ফরসিতে তামাক টানছেন বিশালকায় এক প্রৌঢ় পুরুষ। তাঁর শুভ্র গৌরবর্ণের সঙ্গে মাথার শুভ্র কেশ এবং বিস্তৃত বক্ষে শুভ্র যজ্ঞোপবীত—ভারি মানিয়েছে। যদিও চুল যতটা সাদা ততটা বুড়ো হয়তো

না—কারণ গায়ের চামড়া এখনও টান্-টান্ আছে, কপালেও তেমন রেখা পড়ে নি। সামনে একখানা বই খোলা—সম্ভবত তামাক খেতে খেতে ঐখানাই পড়ছিলেন।—পায়ের আওয়াজ পেয়ে এবার মুখ তুলে চাইলেন।

ক্ষীরোদা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর বৌদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'তোমাদের মামা—পেন্নাম কর। দাদা, বৌদি কোথায় গো?'

মামা বসন্তরঞ্জন ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করেই ছিলেন, তেমনি অবস্থাতেই সংক্ষেপে জবাব দিলেন, 'কালীঘাট গেছে। ফিরতে দেরি হবে।'

তার পরই প্রণত বৌদের উদ্দেশে—'থাক্-থাক্' বলে হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গী করে বললেন, 'রতনের সঙ্গে দেখা করে নেবে তো এই বেলা নাও গে।··· জামাই আসবার সময় হল।···তোমাদের জন্যে তিনতলার ঘর বোধ হয় ঠিক করে রেখেছে। সেইখানে চলে যেও। জামাইয়ের সামনে আর বেরুবার দরকার নেই। যা বেশভূষা!'

শেষের কথাটা খুব আস্তে বললেও মহাশ্বেতার কান এড়ায় নি। তারা দূরে থেকেই চৌকিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছিল—মামাশ্বশুরের পায়ে হাত দেবার রেওয়াজ নেই—তবু মনে হল যেন ওদের জামা কাপড়ের গন্ধ এড়াবার জন্যেই তিনি আর কিছু না পেয়ে ডিবে থেকে একখিলি পান তুলে নিয়ে শুঁকতে লাগলেন।

মহাশ্বেতা যতই বোকা হোক্—অনাদর না বোঝবার মত বোকা নয়। অপমানে তার কান মাথা গরম হয়ে উঠল। ছেলে কোলে করে সে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়াল। অভয়পদর কেন আপত্তি ছিল এখানে আসতে—এবার যেন সে একটু একটু বুঝতে পারলে।

অম্বিকাপদও এক রকম মাকে ঠেলেই বার করে আনলে সে ঘর থেকে। বসন্ত-রঞ্জন আবার তাঁর নভেল ও আলবোলায় মন দিলেন।

এবার সোজা দোতলায়। নিচের দুটি ঘরের ওপর একটা টানা বড় ঘর।

বিরাট ঘর কিন্তু সবটাই যেন আসবাব ঠাসা। ঘরে কোথাও একটু জায়গা নেই। অন্তত মহাশ্বেতার তাই মনে হল। আর এইসব আসবাবের মধ্যে তারা যে একান্ত বেমানান—সেটাও কেমন করে যেন অনুভব করতে লাগল মনে মনে।

চৌকাঠের বাইরেই বড় পাপোশ। অম্বিকাপদ চাপা ধমক দিয়ে বললে, 'পা মুছে নাও ভাল করে।' যদিচ ওরা আসবার আগে নিচের কলতলা থেকে পা ধুয়ে এসেছিল; পায়ে ময়লা থাকবার কথা নয়।

মহাশ্বেতা প্রমীলা ওরা দু'জনেই একটু পিছনে রইল, ক্ষীরোদা এবং অম্বিকাপদই আগে। তবু তাদের ফাঁক দিয়ে দেখতে কোন অসুবিধা নেই। কৌতূহল মহাশ্বেতারই বেশী। আধা-ঘুমন্ত ছেলেটাকে ট্যাঁকে নিয়ে ঘাড়টা বাড়িয়ে দেখে নেয় সে। প্রকাণ্ড ঘর, তার একপ্রান্তে তেমনি প্রকাণ্ড খাট। বিচিত্র কারুকার্য সে খাটের, গাঢ় কাল্‌চে বাদামী রঙ—কত টাকাই না জানি দাম নিয়েছে! তার ওপর প্রায় দেড় হাত পুরু বিছানা। ওপর নিচে ঝালর দেওয়া

বালিশ, দু' পাশে বিরাট পাশ-বালিশ। মাথার দিকে (অথবা পায়ের দিকে কে জানে !) এক ফালি জায়গা, তাতে ভারী একটা লোহার সিন্দুক, তার ওপর কাচের ঢাকার মধ্যে ছোট্ট একটা ঘড়ি। তার নিচে একটা পুতুল। ঠিক তখন সাড়ে পাঁচটা বাজার সময়, পুতুলটা এগিয়ে গিয়ে একটা ঘা মারলে কিসে, ঠুং করে একটা আওয়াজ হল। আরও কত কি এটা-ওটা জিনিস লোহার সিন্দুকের ওপর, এত দূর থেকে ঠাওর হল না। খাটের পাশে একটা পাথরের টেবিল। তাতে সোনালী রঙের আলো। তার পাশে আর একটা ঘড়ি, সে আবার ঘণ্টা বাজায় না, বাজনা বাজে তাতে, পনের মিনিট অন্তর। ফুলদানিও একটা আছে সেখানে, তাতে টাটকা ফুল সাজানো। এদিকে বিরাট আলমারি দুটো। একটার পাল্লায় আয়না বসানো। আর একটা কাঁচের পাল্লা। তার ভেতর দিয়ে সারি সারি বই দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া আছে বিরাট দাঁড়া-আয়না। তার গিলটির ফ্রেমে অজস্র শৌখীন কাজ। ওপরের দেওয়ালে তেমনি ফ্রেমে আঁটা বড় বড় ছবি—কিন্তু মহাশ্বেতা এক বার সেদিকে চেয়েই আপনা-আপনি জিভ কাটলে, গুরুজনদের পাশে দাঁড়িয়ে ওদিকে তাকানো যায় না। এই সব ছবি মানুষ ঘরে টাঙায়—ছি ! আর এ ছাড়া আছে খাটের নিচে মেঝেতে বিরাট একটা ঢালা বিছানা—ধপ্‌ধপ্‌ করছে ফরসা, তার চার দিকে গোটা বারো বড় বড় তাকিয়া। এবং সেই তাকিয়ারই একটাতে ঠেস দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় শুয়ে আছে পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে—তার পায়ের ওপর খানিকটা পর্যন্ত একখানা শাল চাপা, তাতে আগাগোড়া সূক্ষ্ম সূচের কাজ, তাকিয়ায় আধ-কাত হয়ে শুয়ে পাশের একটা টেবিল-ল্যাম্পের আলোতে একখানা বাংলা বই পড়ছে।

সে মেয়েটি এদের দেখতে পায় নি, পায়ের আওয়াজও পায় নি বোধ হয়। অথবা হাতের বইখানাতেই ডুবে গিয়েছিল। সে মুখ তুললে না। অগত্যা ক্ষীরোদাই ডাকলেন, 'রতন !'

রতন এবার বই নামিয়ে মুখ তুলে তাকাল, 'কে, পিসীমা ? এসো এসো। কী ভাগ্যি ! রাজদর্শনে যে পরম পুণ্য সেকথা মিছে নয়—তার নামেই তোমার পায়ের ধুলো পড়ল।… বাব্‌বা, আট বছর পরে তোমাকে দেখলুম।'

একটু কষ্ট করেই উঠে বসে রতন। বয়স এখনও অল্প, তবু এরই মধ্যে যেন ভারী হয়ে পড়েছে সে। যতটা পর্যন্ত মেদ থাকলে ভাল দেখায়, তার চেয়েও বেশী জমেছে তার দেহে।

সন্তর্পণে শালখানা সরিয়ে উঠে এসে একটা প্রণাম করে সে। ক্ষীরোদা তাতেই যেন অভিভূত হয়ে পড়েন, 'থাক্ থাক্ মা, হয়েছে হয়েছে। বেঁচে থাকো, গতরখানি সুখে থাকুক। রাজরাজেশ্বরী হও।'

খট্ করে কথাটা কানে লাগে—এমন কি মহাশ্বেতারও। সধবা মেয়ে মাত্রেই প্রণাম করলে ক্ষীরোদা হয় বলেন, 'সাবিত্রীসমান হও মা, নোয়া-সিঁদুর বজায় থাক্'—নয়তো বলেন, 'হাতের নো ক্ষয় থাক, পাকাচুলে সিঁদুর পর।' এইসব। মহাশ্বেতা তাকিয়ে দেখলে প্রমীলাও বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

ততক্ষণে রতন এগিয়ে এসেছে।

'এইটি বুঝি আমাদের বৌদি? আর ইটি? অম্বিকের বৌ? বেশ বেশ। বসবে একটু? আমি বলি কি এখন আর বসে কাজ নেই। এখনই হয়তো তোমার জামাই এসে পড়বেন, তখন লজ্জায় পড়ে যাবে।···অম্বিক, বরং এদের নিয়ে সোজা তিনতলায় চলে যাও। মোক্ষদা কোথায় গেল, সে সব জানেশোনে, দেখাশুনো করবে।'

এই বলে গলাটা একটু চড়িয়ে ডাকে, 'অ মুকি, মোক্ষদা—!'

'কী গো দিদিঠাকরুন!' বেশ শক্ত-সমর্থ খাণ্ডারনী গোছের এক ঝি এসে দাঁড়ায় কোমরে হাত দিয়ে। চওড়া পাছাপাড় শাড়ি পরনে—গাছকোমর করে বাঁধা, তার ওপর রুপোর গোট ঝুলছে।

'এই আমার পিসীমা এসেছেন। ওপরে নিয়ে যা। এঁদের খাওয়া-দাওয়া বিছানা পত্তর,—সব ভার তোর। দ্যাখ, এখন কী দরকার। খোকার দুধ চাই কি না সব দ্যাখ। আর যেন আমাকে কোন খবর নিতে না হয়!'

অকারণে এতখানি জিভ কাটে মোক্ষদা, 'ওমা পিসীমা বুঝি? কী হবে মা।'

সে গড় হয়ে প্রণাম করে ক্ষীরোদাকে, পায়ের ধুলো নিয়ে কপালে জিভে দেয়। তার পর উদ্দেশে সবাইকে একটা করে প্রণাম সেরে বলে, 'আশীর্বাদ করো যেন ধম্মে মতি থাকে। আর জম্মে কত পাপ করে এসেছিলুম তাই এ-জম্মে ভুগতিছি। আবার যেন সামনের জম্মে ভুগতে না হয়!'

রতন হেসে একটু ধমক দেয়, 'ঐ শুরু হল মুকির বক্তৃতা। ওদের নিয়ে গিয়ে কোথায় বসাবি একটু, তেতেপুড়ে এল সবাই—না বক্‌বক্ শুরু করলে। যা পালা, এখুনি তোর দাদাবাবু এসে পড়বে।'

'যাচ্ছি গো যাচ্ছি। তুমি খালি বকতেই দ্যাখো। চল গো পিসীমা, ওপরে চল। এসো বাপু বৌদিরা—'

মহাশ্বেতা এতক্ষণ অবাক হয়ে রতনকে দেখছিল, বলা যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়েই। মাসীরও খুব রূপ, তার মাও ফেল্‌না নয় কিন্তু এ যেন আর-এক রকম। তাদের গরীবের সংসার বলেই হয়তো অতটা বোঝা যায় না। এরা বড় মানুষ, সাতজম্মে কাজকর্ম করে না—তাই হয়তো এতটা জেল্লা আছে। তবু চোখ ফেরানো যায় না বাপু এটা ঠিক। চোখ, ভুরু, কপাল, নাক, গলা—সব নিখুঁত, একটার সঙ্গে আর একটা যেন ওজন করে বসিয়েছে ভগবান। আর তেমনি কি গায়ের রং—যেন দুধে-আলতা!

ওর সেই শ্রদ্ধা-তদ্‌গত বিস্মিত দৃষ্টির দিকে চোখ পড়তে রতন হেসে ফেলে বললে, 'কী দেখছ গা বৌদি? ভাবছ এমন জানোয়ারটা কোথা থেকে এল, না কি?···তোমাকে বাপু আর পেন্নাম করলুম না, তুমি আমার চেয়ে বয়সে ঢের ছোট।···অভয়দা আমার চেয়ে নাকি মোটে দু' বছরের বড়। অম্বিক আমার সমবয়িসী, বয়সে ছোটকে পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম করতে নেই, অকল্যেণ হয়।'

তিনতলার ঘরে পোঁছে দিয়ে মোক্ষদা বললে, 'ঐ হোথাকে ছাদের ওপরই গঙ্গাজলের চৌবাচ্চা। হাত পা মুখ সবই ধুতে পারবে। স্যেতখানা কিন্তু নিচে। বিছানা-পত্তর সব করাই আছে। খোকার দুধ নিয়ে আসছি। চা জলখাবার ঠাকুর ওপরে দিয়ে যাবে'খন।'

প্রকাণ্ড ঘর। একপাশে কিছু কিছু ডেয়োঢাকনা সরিয়ে রাখা হয়েছে। মাঝখানে তোশক পেতে দুটো ঢালা বিছানা।

'এ কার ঘর গা, মা মোক্ষদা ?' ক্ষীরোদা প্রশ্ন করেন।

মোক্ষদা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কেন যেন খুব খানিক হাসে।

বলে, 'এ এমনি খালিই পড়ে থাকে। কেউ এল-গেল তবেই ব্যাভার হয়। নইলে এটা-ওটা থাকে। আর মুখপোড়া ঠাকুর আত দুপুরে মাঝে মাঝে এখানে এসে শোয়।'

'কেন গা, তার ঘর নেই ?'

'থাকবে না কেন। নিচে সব আলাদা আলাদা ঘর। ঐ যে আর-এক ঝি এসে জুটেছে গোলাপী বলে—। দিদিঠাকরুনের পেয়ারের—আর বল কেন !'

আভাস দেওয়া ইঙ্গিতটাকে শেষ না করেই বলে মোক্ষদা, 'ঐ দ্যাখ আমার মনের ভুল ! চা খাবে, হ্যাঁ গো পিসীমা ?'

'সে আবার কী মা ? জানি নে তো !'

'আ আমার পোড়া কপাল ! এখন তো ঘর ঘর চলতেছে। এক রকমের গাছের পাতা মা, দুধ চিনি দিয়ে তৈরী হয়। দিব্যি খেতে, এই শীতে বেশ লাগবে !'

লোভে ও কৌতূহলে ক্ষীরোদার চোখ দুটি উৎসুক হয়ে ওঠে। তবু তিনি বলেন, 'কে জানে বাপু কখনও তো খাই নি। বিধবা মানুষ—! বোরা না হয় থাক।'

'ওমা, চায়ে কোন দোষ নেই। গিন্নীমার মা-গোঁসাই আসেন, কী নিষ্ঠে তাঁর —তিনিও খান। রবিশ্যি তাঁর চা গঙ্গাজলে হয়। তা তিনি তেমনি গঙ্গাজল ছাড়া কিছুই খান না।'

'তা তবে না হয় নিয়ে এসো বাপু। দেখো কোন দোষ হবে না তো ?'

মোক্ষদা চলে গেল। ক্ষীরোদা গেলেন ট্যাঙেকর জলে মুখ-হাত ধুয়ে দশ বার জপটা সেরে নিতে। অম্বিকা নিঃশব্দে একতলার উদ্দেশে সরে পড়ল।

প্রমীলা যেন এতক্ষণে হাঁপিয়ে মরছিল, মুখের ঘোমটা খুলে ফিস্ ফিস্ করে প্রশ্ন করলে, 'ওলো দিদি, ঠাকুরঝির কপালে সিঁদুর কৈ লো ? ওধারে তো ঠাকুর-জামাই রয়েছে জলজ্যান্ত !'

'ও মা, নেই বুঝি ? কী করে দেখলি তুই ? আমি তো অত লক্ষ্য করি নি।'

'তুমি যা নেকু। নোয়াও তো দেখলুম না।'

'কেন বল দিকি? এইস্ত্রী মানুষ—!'

'মাকে জিজ্ঞেস কর না।'

'ও বাবা, সে আমি পারব না। আমার অত সাহস নেই। তুই জিজ্ঞেস কর, বুকের পাটা থাকে তো!'

'করবই তো। সোজা কথা জিজ্ঞেস করব অত ভয় কিসের?'

আর করলেও প্রমীলা! ক্ষীরোদা আহ্নিক সেরে ঘরে ঢুকতেই প্রমীলা সোজা প্রশ্ন করে বসল, 'হ্যাঁ মা, ঠাকুরঝির সিঁথেয় সিঁদুর নেই কেন?···নোয়াও তো দেখলুম না।'

নিমেষে যেন কেমন হয়ে যান ক্ষীরোদা। শেজ-এর ম্লান আলোতেও সে বিবর্ণতা ধরা পড়ে।

আহ্নিক হয়ে গেছে কিন্তু জপের মালা তখনও হাতে। তাড়াতাড়ি সেটা মাথায় ঠেকিয়ে একটা পেরেকে টাঙিয়ে বলেন, 'কে জানে বাপু, হয়তো মা-কালীর কাছে নোয়া-সিঁদুর বাঁধা রেখেছে!···জিজ্ঞেস করব না হয়!'

প্রমীলার তীক্ষ্ন চোখ দুটো এড়াতেই বোধ হয় আবার বাইরে বেরিয়ে পড়েন। ততক্ষণ ঠাকুর চা নিয়ে এসেছে, এদের সব কাপে—ক্ষীরোদার জন্যে পাথরের বাটিতে, তার সঙ্গে দুখানা করে হিংয়ের কচুরি। একটা কাঁসার বাটিতে খোকার দুধ।

একেবারে রাত সাড়ে আটটায় মোক্ষদা আবার এল। একবাটি খয়ের গোলা গরম করে এনে চৌকাঠটার কাছে পা ছড়িয়ে বসল, 'হেসো নি বাপু বৌদিরা, ভেবো নি যেন আলতা পরতিছি। পাঁকুইয়ের জ্বালায় মরে গেলুম, তাই একটু খয়ের দিচ্ছি!'

ক্ষীরোদা তখন সেখানে নেই। তাঁর বৌদি ফিরেছেন কালীঘাট থেকে, দেখা করতে গিয়েছেন নীচে। কে জানে কেন বৌদের নিয়ে যাবার কথা তিনি তোলেন নি। অম্বিকাও কী একটা কাজে গিয়েছে যেন। খোকা ঘুমিয়েছে। শুধু দুই বউ বসে মৃদু স্বরে গল্প করছিল।

মহাশ্বেতা বললে, 'এখন শীতকালে পাঁকুই কী গো?'

'আমার কথা আর বলো না বড় বৌদি। আমার বারো মাস হাজা।···আমায় তো দিনেরেতে অর্ধেক সময় ভিজে কাপড়ে থাকতে হয়।···তাও সে তেমন তেমন ভিজে কাপড় নয়, টপ্ টপ্ করে জল ঝরে পড়া চাই!'

'কেন গো মোক্ষদা!'

'আর কেন, পাপের ভোগ।···গিন্নীমার যে দুর্দান্ত ছুঁচিবাই।···আমি ছাড়া অত কষ্ট করবে কে বল? পুরোনো লোক বলতে তো এক আমিই।···আমার নইলে আর কারুর কাজ পছন্দও হয় না!···তাও ভাবি মানুষটা না খেয়ে মরে যাবে হয়তো—আমিই না হয় একটু কষ্ট করি।'

'এমন ছুঁচিবাই?'

'আর বল কেন। মাথা খারাপ। আর মাথা খারাপ হবার অপরাধ কি বল: এত পাপ কি সহ্য করতে পারে? হাজার হোক বামুনের মেয়ে তো!'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই মোক্ষদার মুখখানা কেমন হয়ে যায়। অকস্মাৎ নিজের দুই গালে নিজেই ঠাস্‌ঠাস্ করে চড় মারে, 'এই এই!…দ্যাখ; কী বলতে কী বলে ফেলেছিলুম!…একে মনিব তায় গুরুজন—মহাপাপ! মহাপাপ!'

মহাশ্বেতা তো অবাক।

প্রমীলাই কিন্তু কথাটা ঘুরিয়ে দেয়, 'কাজ চুকল তোমার?'

'এই এখনকার মত চুকল। কত্তাবাবুর খাবার হয়ে গেল। ঠাকুরকে যোগাড় দিয়ে এলুম।…এখন তোমাদের—সে ঠাকুরই করে নিতে পারবে, নয়তো গোলাপী আছে।…আবার সেই দিদিঠাকরুনের খাবার সময় হলে আমার ডাক পড়বে। কত্তাবাবুর ঠিক সাড়ে আটটা, দিদিঠাকরুন আর দাদাবাবুর রাত এগারোটায়—এ একেবারে ঘড়িধরা। একটু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই।

অকস্মাৎ এই সময় নীচে থেকে ঝন্‌ঝন্ করে বাসন ছুঁড়ে ফেলবার শব্দ পাওয়া গেল, আর তার সঙ্গে চাপা গালাগালের আওয়াজ। মোক্ষদা 'ঐ—আবার বাধল আজ!' বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে নীচে ছুটল।

মহাশ্বেতা অবাক হয়ে প্রমীলার মুখের দিকে তাকাল।

'ও দিদি, বুঝলে কিছু?' মুখ টিপে হেসে প্রমীলা প্রশ্ন করলে।

'না ভাই। অত চট্ করে আমার মাথায় কিছু আসে না।'

'আমি বুঝেছি।'

'তুই বুঝ গে যা। আমার অত ভাল লাগে না।'

সত্যিই তার ভাল লাগছিল না। আসলে মাসীদের জন্য মন কেমন করছিল তার। এই কাছেই তারা কোথায় আছে। এদিকের পথঘাট দেখেই সে চিনেছে। বিশেষ ঐ নতুনবাজার যখন অত কাছে তখন ওদের সিমলের বাড়ি দূর হবে না। তবু দেখা হবে কি না কে জানে! তারা কি এই সব আলোটালো দেখতে পাবে? কে-ই বা দেখায়! মা-বেচারী পড়ে রইল কোথায়। অনেক বার মনে হয়েছিল—তবু শেষ পর্যন্ত মুখ ফুটে অভয়পদকে মা'র কথাটা বলতে পারে নি।…

একটু পরেই মোক্ষদা আবার এল, হাঁপাতে হাঁপাতে চাপা গলায় বললে, 'ধন্যি নোলা বুড়োর বাবা, নিত্যি নিত্যি এই কেলেঙ্কার! পান থেকে চুন খসলেই থালা বাসন ছোঁড়াছুঁড়ি হবে, আর বামুনের বাপান্ত!'

'কী হল গো মোক্ষদা?'

'আর কী হবে বল। আত্তিরে কত্তাবাবুর পরোটা হয়, তা সে পরোটা তো নয়, লুচির বাড়া। ওঁর ছ'খানি পরোটাতে পুরো এক পোয়া ঘি লাগে। মচ্‌মচে হবে কিন্তু কালো দাগ পড়লে চলবে না। বাসিধোপ কাপড়ের মত ধপ্‌ধপে হওয়া চাই। বল দিকিন বাপু, বারো মাস তিরিশ দিন অত নিক্তির রোজনে করা যায়? পাতলা কাপড়ের মত হবে, অথচ ভাঁজে ভাঁজে খোলা যাবে—কত নটখটি! আমি ছাড়া রমন কেউ বেলতেই পারে না, তা বেলে-টেলে দিয়ে এসেছি, ঠাকুর ভেজে

ভেজে দিচ্ছে, একখানা বুঝি একটু কাঁচা থেকে গেছে, রমনি থালা বাসন ভাঙল, ঠাকুরের চোদ্দপুরুষ স্বগ্গে উঠল !···আর পারা যায় না বাপু !'

'ঠাকুর সহ্য করে ?' প্রমীলা প্রশ্ন করল।

'এমনি কি আর করে! এক দিন করে ঐ কাণ্ড হয় আর পরের দিন দিদিঠাকরুন মোটা বখশিশ দিয়ে ঠাণ্ডা করেন। মাইনেও তো মোটা। পেটে খেলে পিঠে সয় এই আর কি !'

'মামাবাবু রাত্তিরে কী খান ?'

'ঐ তো। পরোটা হবে—চার-পাঁচ রকম ভাজা। দুটো ডালনা চাই, তা শীতকালে এঁচোড় আর গরমকালে কপি না খেলে চলে না। এ ছাড়া হয় মাগুর মাছ না হয় শোল মাছের কালিয়া—আত্তিরে মাংস চলে না ওঁর। এর রোপর আছে রাবড়ি আর সন্দেশ, বাঁধা বরাদ্দ। শেষের পরোটাখানি কড়া করে ভাজতে হবে, সেইটি গুঁড়িয়ে রাবড়ি আর সন্দেশ মেখে খাবেন। গরমকাল হলে তাতেই পড়বে ন্যাংড়া বোম্বাই আম। দাদাবাবুর আত্তিরে কোনদিন কোর্মা হবে, কোনদিন দো-পেঁয়াজি। আবার কত্তাবাবুর যেদিন ইচ্ছে হবে সেদিন দিনের বেলায় মাংস চাই।'

'একটা ঠাকুর পারে এত ?' মহাশ্বেতা অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করে।'

'আঃ পোড়া কপাল! ঠাকুর তো দু'জন। ঠিকে একজন আছে, সে আমাদের সাজার রান্না রেঁধে চলে যায় দু' বেলা।···এর তো কত্তাবাবুর আর দিদিঠাকরুনের আন্না করতেই বাজিভোর হয়ে যায়! ওর সময় কখন ?'

প্রমীলা আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে, 'মামাবাবু দিনের বেলা কী খান ?'

'সে আর বলো নি। শুক্তো ঘণ্ট চচ্চড়ি ডালনা ডাল ভাজা—কী নয় ? দু' রকম মাছ চাই-ই। তার সঙ্গে পোস্ত চাই, সেও বাঁধা একেবারে। কালিয়ে পোলাও যাই হোক না কেন—পোস্তটি চাই। চিরকালের রব্যেস, মাছ মাংস তো জোটে নি কখনও, ঐ পোস্ত দিয়েই ভাত ঠেলতে হয়েছে! শুধু কি তাই—যেদিন মাংস খাবেন সেদিন আবার সাদা ভাতের সঙ্গে এত কটি পোলাও চাই। সে পোলাও যেমন তেমন করে আঁধলে চলবে না। তা হলে থালা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন!···মুয়ে আগুন নোলার! ঐ নোলার জন্যেই তো এত বড় পাপ করা। নইলে এ কী ভদ্দর লোকের কাজ, না বামুনের কাজ ?'

'কী করেছেন গা মোক্ষদা ? সেই থেকে বলছ ?' প্রমীলা গা টিপে দেবার আগেই মহাশ্বেতা দুম করে প্রশ্ন করে বসে।

'ঐ দ্যাখ !—কী বলতে কী বলে ফেলেছিলুম !—বুড়ো হয়ে মরতে চললুম, জিভ এখনই শায়েস্তা হল না।···না বৌদি, আমরা হলুম হাজার হোক ঝি চাকর। তোমরা হলে আপনার লোক!···আমাদের ওসব কথায় থাকবার দরকার কি ? যা মেজাজ, শুনতে পেলে বুকে বসে জিভ রোঁপড়াবে। গরীব মানুষ গরীবের মত থাকাই ভাল। এই এই—নাক কান মলা—এসব কথা আর ওঠাব নি !'

সত্যি-সত্যিই নাক কান মলে মোক্ষদা।

প্রমীলা কথাটা ঘুরিয়ে নেয় তৎক্ষণাৎ, 'তোমার আর কে কে আছে মোক্ষদা ?'

'কেউ নেই গো বৌদি—শুধু এক মেয়ে, শিবরাত্তিরের সলতে। কেমন কপাল দ্যাখ না। বলতে গেলে বিনা পণে মেয়েটাকে ছেড়ে দিলুম—জামাই ভাল হবে মনে করে। কলকাতার কোন্ দোকানে কাজ করে, মোটা মাইনে, মনিবের বাড়ি খায়—নিখরচার বারো টাকা মাইনে।...তা আমার এমন কপাল, জামাইটা রেঁড়েল মাতাল হয়ে উচ্ছন্নয় গেল !...কখনও-কখনও বাড়ি আসে—কালে ভদ্দরে। একগাদা ছেলেমেয়ে, মেয়েটা যে কী করে দিন চালায় তা সে-ই জানে। এই আমি গুঁজছি এখান থেকে, নিহাত দিদিঠাকরুন ভালবাসে তাই—নইলে মাইনে আর কি বল না ? নিজের তবু এক পয়সা জমে না, বুড়ো বয়সে যে কার দোরে গিয়ে দাঁড়াব তা জানি না। আমদের যতক্ষণ গতর ততক্ষণ রাদর। ছ' মাস পড়ে থাকলে ভাত জুটবে ?...তাও কী বলব বৌদি, আজ তিন মাস ধরে এমন অক্ত-আমাশা ধরেছে মেয়েটার—পাত হয়ে গেল একেবারে, বাঁচে কিনা সন্দেহ !'

প্রমীলা বলে, 'ওমা, ও তুমি ভেবো না মোক্ষদা। রক্ত-আমাশার খুব ভাল ওষুধ আছে আমার বাপের বাড়ি, আনিয়ে দেব। এক দিন খেলেই সেরে যাবে !'

'আহা, তা হলে তো বেঁচে যাই। তাই দিও বৌদিদি, তাই দিও।...ভাগ্যিস কথাটা উঠল।'

নীচে থেকে কে যেন কী বলে ডাকলে, মোক্ষদা 'আসছি ভাই বৌদি' বলে দ্রুত নেমে গেল।

মহাশ্বেতা ঈষৎ অভিমানের সুরে বললে, 'তোর বাপের বাড়ি এত ভাল ওষুধ আছে মেজ বৌ, কই গত মাসে আমার খোকাটা যখন অত ভুগল, তখন তো তোর মনে পড়ল না !'

'তুই থাম দিকি দিদি। তোর বোকামি দেখলে আমার গা-জ্বালা করে। ওষুধ কোথা পাব ? ওকে এখন বললুম—আসল কথাটা তো ওর পেট থেকে টেনে বার করতে হবে !'

মহাশ্বেতা অবাক হয়ে গালে হাত দেয়।

॥ ৫ ॥

এরা দু'জনে বসে গল্প করছিল। প্রমীলা রতনদের কথাই বলছিল। মহাশ্বেতার মনটা কিন্তু বারবারই শ্বশুরবাড়ি চলে যাচ্ছিল কথার ফাঁকে ফাঁকে। মানুষটা একেবারে একা থাকবে। বুড়ীটা পর্যন্ত ওখানে নেই। যদি অসুখ-বিসুখ করে।

অবশ্য বেশীক্ষণ নয়—দশ মিনিট পরেই মোক্ষদা ফিরে এল।

'আজ আবার বিলিতী হোটেল থেকে খাবার এল দিদিঠাকরুনদের। তা এক রকম ভাল। আজ ঐ খেয়েই চলবে—এধারে আর রাঁধতে হবে না ; উলটে মাংসটা আমাদের ভোগে লাগবে।'

প্রমীলা সে কথায় কান না দিয়েই বলে, 'তোমার মেয়ের বয়স কত আমাকে বলো—সেটাও জানাতে হবে কিনা—আর একখানা পোস্টকার্ড এনে দিও।

তাহলেই আমি চিঠি লিখে দেব।···আহা, দু' মাস ধরে ভুগছে, তার দেহে রইল কি ?

'তবেই বল বৌদি। তুমিই বুঝে দ্যাখ। তোমরা হলে মানুষের ঘরের মেয়ে তোমরা বলবে না তো কে বলবে বল। কত মায়া দয়া তোমাদের! এখানে যাঁরা আছেন, তাঁরা একটা কথা বলেও উদ্দিশ করেন না—তোর মেয়েটা রইল কি মল। দিদিঠাকরুনের কাছে কান্নাকাটি করলে বড় জোর পাঁচটা টাকা ফেলে দেবেন—যা তোর মেয়েকে পাঠাগে যা!'

'হ্যাঁ গো মোক্ষদা দিদি', প্রমীলার কণ্ঠস্বর যৎপরোনাস্তি কোমল হয়ে ওঠে, 'আমাদের ঠাকুরঝি বুঝি নোয়া-সিঁদুর বাঁধা রেখেছে ঠাকরুনবাড়ি ?'

'পোড়া কপাল! ওষ্ঠাধরে বিচিত্র বক্রহাসি ফুটে ওঠে মোক্ষদার, 'নোয়াসিঁদুর হল কবে যে বাঁধা পড়বে!'

'সে কী গো ? কী ব্যাপার দিদি বল তো।'

হঠাৎ চমকে ওঠে মোক্ষদা, 'ঐ দ্যাখ আমার বুদ্ধির ছিরি! কী বলতে কি বলে ফেললুম দ্যাখ!···এই, এই!'

আবারও নিজের গালে মুখে চড় মারে মোক্ষদা। কিন্তু তার পরই কেমন এক রকম যেন মরীয়া হয়ে ওঠে সে, বলে—'তা দোষই বা কি! তোমরা হলে আপনার লোক, জানতে পারবেই এক দিন না এক দিন। পিসীমা তো জানেই, দাদাবাবুরাও সব জানে—তোমাদের কাছে বুঝি বলে নি এত দিন ? তা চাপা কথা কত দিন চাপা রাখবে তাই শুনি! জানতে তো পারবেই। তবে বাপু একটা কথা—বলো নি যেন আমি বলেছি, তা হলেই অমনি তোমাদের শাশুড়ী টুনটুন্ করে লাগাবে, মাঝে থেকে আমার চাকরি যাবে। তবে এটাও ঠিক—আমি গেলে এক দিনও চলবে না এ সংসার। এত টেনে করবে কে ? গিন্নীমাকে সামলাবে কে ?'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে যেন দম নেবার জন্যেই থামে এক বার মোক্ষদা। তারপর গলা নামিয়ে বলে, 'ঐ মিন্‌সে, ঐ যে কত্তাবাবু—ঐ হ'ল গো যত নষ্টের মূল। ও'র ঐ আখাম্বা নোলা। নোলাই কাল হ'ল একেবারে। মুয়ে আগুন নোলার! ভদ্দরলোকের ছেলে, বামুনের ছেলে—এই কি পিরবিত্তি তোর!···এমন্ খাওয়া মুখে তোলার আগে নিজের মুখে নিজেরা নুড়ো জেবলে দিতে পারলি না ?···আমরা তো ছোটলোক, তবু আমরা কখনও এমন পয়সায় নবাবি করতে পারতুম না।'

আরও এক পর্দা গলা নামায় মোক্ষদা। প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলে, 'কত্তাবাবুর কী ছেল ? কাটা-কাপড়ের দোকানে চাকরি করত, আট টাকা মাইনে—এদিক ওদিক দু-চার পয়সা উপরি, এই তো। রবিশ্যি বোনের বে দিতে হয় নি, সে ওনার বাবাই দিয়ে গেছল—যা শুনেছি তাই বলছি বৌদিদি—সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন—তা বোনের বে নাই বা দিতে হ'ল, চারটে প্রাণীর সংসারই কি কম ? কত্তা-গিন্নী, দুই মেয়ে—আট আনা ভাড়ায় খোলার ঘরে থাকত। তা এখন কি আর থাকে না ? ক্রেমশ তো মাইনেও বাড়ত, শুনেছি ছাড়বার আগে বারো টাকা অবুদি

উঠেছেল। কিন্তু পোড়াকপাল আমার—নোলার জন্য দেনায় দেনায় মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে থাকত বারো মাস, বারো মাসই পাওনাদারদের তাগাদা শুনতে হত। এখন ভগবানেরও বলিহারী কীত্তি—মেয়ে দুটো হল—মানুষ তো নয় একেবারে পরী। যে দেখত চোখ ফেরাতে পারত না—এমন রূপ। ঐ রূপ আর বাপের নোলা—কাল হল। বস্তিতে থাকে তো, দিদিঠাকরুনের যখন সবে বারো-তেরোবছর বয়স, রাস্তার কলে জল নিচ্ছিল গামছা পরে—কে এক হালদার সায়েব ব্যালেস্টার যাচ্ছিল ঐ পথে গাড়ি করে। কী যে চোখে লাগল। ব্যস্—দালালও ছিল হাতধরা, কুট্‌নী লাগালো। এসে বললে হাজার টাকা নগদ আর এক গা গয়না দেবে—সায়েবের বাগান বাড়িতে যেতে হবে!…এমন কথা আমাদের বললেও আমরা মাগীকে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতুম! ওমা—তা নয়, মিনসে বললে, আচ্ছা ভেবে দেখি দু'দিন। তারপর বললে, তা হবে না, আমার মেয়ে যাবে না, ভাল দেখে বাড়ি ভাড়া করে ঘর সাজিয়ে দিক্, আমার মেয়ের ঘরেই আসবেন সায়েব। আর, হাজার নয়—দশ হাজার টাকা, আশি ভরি সোনা। সায়েবেরও তখন রোখ্ চেপেছে—সে তাতেই আজী হয়ে গেল। টাকা-কড়ি সোনা-দানা তো দিলেই, বাড়ি ভাড়া করে রাসবাবপত্তরে সাজিয়ে দিলে, মাসে মাসে দেড়-শ টাকা মাইনেও বরাদ্দ হয়ে গেল। ব্যস্, বুড়ো নিশ্চিন্তি—এসে বসে পায়ের ওপর পা দিয়ে খেতে শুরু করলে—মচ্ছি-মুলোয় পাঁচ বেন্নন! মুয়ে আগুন অমন বামুনের!'

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিল মহাশ্বেতা। তার চোখ দুটো যত দূর সম্ভব বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে ততক্ষণে, মনে হচ্ছে যেন ঠিক্‌রে বেরিয়েই আসবে। কিন্তু প্রমীলা আশ্চর্য রকম স্থির হয়ে বসেছিল, সে শুধু প্রশ্ন করলে, 'সেই হালদার সায়েবই বুঝি এলেন এখন?'

'না না। তিনি এই পাঁচ বছর হ'ল মারা গেছেন। কী নাকি মদের বোতলে হাত কেটে বিষিয়ে উঠে মারা গেলেন দু' দিনে। তা এতকাল যার কাছে রইল, দেঁড়ে-মুষে দুয়ে নিলে—তাই কি দুটো দিন তার জন্যে শোক, করলে না বুড়োরই সবুর সইল! এ যেন কোথাকার রাজা বাপু—শামপুকুর না ঝামাপুকুর, না কি ঐ রকম কোথাকার। রাজা খেতাব—তবে ঐ পর্যন্ত। হালদার সায়েবের মত কাঁচা পয়সা এর নয়। এই যে বাড়ি ঘরদোর দেখছ—এসব সেই তার পয়সায়। কী দিল-দরাজ মানুষ ছেল বাপু কী বলব! তা হ্যাঁ, বলছিলুম, এ মিনসে যেন ওৎ পেতে ছেল! সাত দিনের মাথাতেই এসে বসল। পাঁচ হাজার টাকা নগদ, দু'শ মাইনে, জড়োয়া গয়না। তবে হ্যাঁ—লোকটা ভদ্দর, হালদার সায়েবের মত মদ খায় না, চেঁচামেচি হুল্লোড় নেই। খেলেও সে কোন কোন দিন একটু-আধটু—যেমন আজ! সে কেউ টের পায় না।'

'আর-এক ঠাকুরঝির কী হল?' প্রমীলা প্রশ্ন করে।

'হুঁ—হুঁ, সে বড় শক্ত মেয়ে বাবা। সেও যেমন তেরো বছরেরটি হ'ল, কত্তাবাবু কোন্ এক মারোয়াড়ী বাবু জুটিয়ে আনলে। সেও মোটা টাকা কবুল

করেছিল। মেয়ে সটান বাবুর সামনে বেরিয়ে এসে বললে,—মাল আমার, বেচতে হয় আমি হাত পেতে তার দাম নেব। তুমি বাড়ি ভাড়া কর, লোক রাখ আমাকে নিয়ে চল। নিজে হাতে আমি টাকা গুনে নেব। বাবার হাতে টাকা দিলে আমি কিছু জানি না। জোর করতে এলে এই ক্ষুরে নাক কান কেটে দেব—তা বলে রাখছি। এই বলে সে কোমর থেকে ইয়া এক ক্ষুর বার করে দেখালে!··· মারোয়াড়ী খুব খুশী—সে তিন দিনে সব ব্যবস্থা করে দিলে। উঃ, সে বুড়োর কী আক্রোশ! চেঁচিয়ে, গাল দিয়ে, চুল ছিঁড়ে বাড়ি মাথায় করলে একেবারে। কিন্তু মেয়ে একবগ্গা ঘোড়ার মত জেদ ধরেই রইল—এতটুকু নুইল না। বললে, আমি দিদির মত অত বোকা নই। তুমি আমার যদি এত বড় সব্বনাশ করতে পারো তো তুমি আমার কিসের বাবা, কিসের গুরুজন! টাকার ওপর বড় যদি কিছুই না থাকে তো টাকা আমিও চিনব এখন থেকে, তোমাকে দেব কেন? তা সে বেশ আছে,—এরই মধ্যে দুখানা বাড়ি করে ফেলেছে, মারোয়াড়ীর দেখা-দেখি নাকি ফাট্‌কা খেলে, তাতেও অনেক পয়সা কামিয়েছে!'

'তার নাম কি দিদি? কৈ, তার নাম তো কখনও শুনি নি।'

'শুনবে কি করে! কত্তা বলেন, সে মরে গেছে। তার নান ধনু,—রতনমণি আর ধনমণি, আদর করে নাম রাখা হয়েছিল।'

মোক্ষদা এতক্ষণ পরে একটু চুপ করে থাকে। এরাও নিঃশব্দে বসে যেন কথাটা সম্পূর্ণ বোঝবার চেষ্টা করে কিছুক্ষণ ধরে। তার পর প্রমীলাই আবার প্রশ্ন করে, 'তা মামীমা কিছু বলেন নি?'

'বলে নি আবার! কান্নাকাটি উপোস মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি অনেক কিছুই করেছিল। কিন্তু এ দস্যির সঙ্গে পারবে কি করে? চণ্ডাল রাগ—এখনও, ঘেন্নার কথা বলব কি, এই ঝি-চাকরদের সামনেও, ধরে ধরে চোরের মার মারে। এইসব জন্যেই তো কতকটা গিন্নীমায়ের মাথাটা কেমন হয়ে গেছে। ঐ দেবতাধম্ম বারব্রত নিয়ে থাকে, ছুঁচি-বাই বেড়েছে। আদ্দেক দিন তো খাওয়াই হয় না। আমি ভিজে কাপড়ে সব যোগাড় করে দেব, উনি নিজে দুটো ফুটিয়ে খাবেন! খাওয়া তো ছাই, এক বেলা শুধু দুটো ভাতে ভাত; তাও দুধ নয়, ঘি নয়, কিছু নয়। তাই কি সব দিন পেটে যায়? বাড়িময় মাছ-মাংসের হুল্লোড়, কাকচিলেরও অভাব নেই। উনুনের ধারে মাছের কাঁটা এসে পড়ল কি জলের ছিটে লাগল—একটু সন্দ হলেই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। বলে তো—নিহাৎ আত্ম-ঘাতী হওয়া পাপ তাই—নইলে কবে গলায় দড়ি দিতুম! এমনি করে যদ্দিন যায় যাক্—আমার আর ভালমন্দ খেয়ে বাঁচবার সাধ নি। তা বলবেই না বা কেন বল—গিন্নীমা যে খুব বড় বংশের মেয়ে। কী রূপ ছেল বয়েসকালে। আমরাও দেখেছি সোনার পিতিমে। এখন অবিশ্যি তার কিছুই নেই। না খেয়ে আর কেঁদে কেঁদে পোড়া কাঠ হয়ে গেছে!'

বলতে বলতেই কান খাড়া হয়ে ওঠে মোক্ষদার। অভ্যস্ত কানে অতি ক্ষীণ পদশব্দও বুঝি পেঁছয়। তাড়াতাড়ি নিজের কান নিজে মলে ফিসফিসিয়ে বলে,

কি বলতে কি সব বলে ফেললুম দ্যাখ। দেখো বৌদিরা, জানে মেরো নি যেন!'

সিঁড়ির কোণ থেকে ছাদের অন্ধকারেই সাদা কাপড় পরা দুটি মূর্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্ষীরোদা আসছেন—তাঁর সঙ্গে আর এক জন।

ক্ষীরোদা হেঁকে বলেন, 'কৈ গো বৌমারা, কোথায় গেলে গো সব। তোমাদের মামীমা এসেছেন—পেন্নাম করোসে—'

অত্যন্ত শীর্ণ—প্রায় ছায়া-মূর্তির মতই একটি মহিলা এসে দাঁড়ালেন। মূর্তিমতী বিষাদের মত মুখখানি। এ মুখ যে এককালে অত্যন্ত সুশ্রী ছিল, প্রায় রতনের মতই ছিল—অনেকক্ষণ চেয়ে দেখলে তার একটা আঁচ পাওয়া যায় মাত্র। টানা চোখ দুটিতে আগের সে আবেশ আর নেই—তবু বিস্তৃতিটা আছে। গায়ের রং পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। বেশভূষাও তেমনি, কঙ্কালসার হাত দুটিতে শুধু শাঁখা আর কড়। দেহের কোথাও একরত্তি সোনা নেই। পরনেও সাধারণ কস্তাপাড় নতুন-ওঠা দেশী মিলের মোটা গুণচটের মত শাড়ি।

মহাশ্বেতা গিয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলোর জন্যে হাত বাড়াতেই তাড়াতাড়ি হাত দুটো ধরে বুকে টেনে নিলেন তিনি, মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ছি মা, পায়ে হাত দিতে নেই। সতীলক্ষ্মী তোমরা, তোমরা পায়ে হাত দিলে সে পাপ রাখার যে ঠাঁই থাকবে না মা!'

ততক্ষণ কিন্তু প্রমীলা এক ফাঁকে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে নিয়েছে। তাকেও বুকে টেনে নিয়ে দু হাতে দু জনকে চেপে ধরে বললেন, 'সীতা সাবিত্রীর মত স্বামীপুত্র নিয়ে ঘর করো মা, বংশের মুখ উজ্জ্বল করো, সন্তানদের কল্যাণ করো। আমাদের আশীর্বাদের কোন মূল্য নেই মা, হয়তো অধিকারও নেই। মা সতীকুলরাণী তোমাদের রক্ষা করুন—এইটুকুই শুধু তাঁকে কায়মনোবাক্যে জানাই প্রতিদিন—'

বলতে-বলতেই তাঁর দুই চোখের কূল ছাপিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়ল।

ক্ষীরোদা তাড়াতাড়ি ওঁর বাহুমূলটা একটু টিপে দিতেই যেন অনেকক্ষণের চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'তোমরা এইবার নীচে যাও মা, ঠাকুরঝির জল খাওয়া হয়ে গেছে। তোমরা যাহোক দুটো মুখে দিয়ে নাও।···মোক্ষদা মা, এদের নিয়ে যাও—'

মহেশ্বেতা বললে, 'কিন্তু ঠাকুরপো এল না যে—।'

ক্ষীরোদাই বৌদির হয়ে জবাব দিলেন, 'সে গেছে গড়ের মাঠে আলো দেখতে, তার ফিরতে অনেক রাত হবে। তোমরা খেয়ে নাও গে, তাতে কোন দোষ নেই! সে যখন হোক এসে খাবে'খন। ঠাকুরের হাঁড়ি হেঁসেল তুলতে তুলতে যার নাম রাত বারোটা। ততক্ষণে সে এসে পড়বে।'

মোক্ষদা তাড়াতাড়ি ওদের প্রায় টেনে নিয়েই নীচে নেমে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

শ্যামার মা রাসমণি জমিদারের স্ত্রী হয়েও ভাগ্যচক্রে একই সঙ্গে স্বামী শ্বশুরবাড়ি এবং স্বামীর ঐশ্বর্য সব হারিয়ে বসেছিলেন। শুধু পেয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব অলঙ্কার এবং কাঁঠালকাঠের দুই বড় সিন্দুক বোঝাই কাঁসার বাসন। তাইতেই তিনি দীর্ঘকাল স্বতন্ত্রভাবে আলাদা বাড়িভাড়া করে থেকে সম্ভ্রান্ত বংশের গৃহিণীর মর্যাদাতেই জীবন কাটিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তবে তিনি বেঁচেও ছিলেন অনেকদিন। তাই তাঁর মৃত্যুর সময় বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। ফলে তিনি যেদিন চোখ বুজলেন সেদিন তাঁর স্বামী-পরিত্যক্তা কন্যা উমা চোখে অন্ধকার দেখল। তার স্বামী শরৎ এক বিচিত্র মানুষ। সে ফুলশয্যার রাত্রে প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণের পরিবর্তে শুনিয়ে দিয়েছিল যে সে এক রক্ষিতাকে ভালবাসে—এবং তাকে ছাড়া আর কাউকেই ভালবাসতে সে পারবে না। মা জ্বালাতন করছিল বলেই শুধু সে উমাকে বিয়ে করেছে। এবং সত্যিসত্যিই তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক সে রাখে নি। শাশুড়ীর নির্যাতন অসহ্য হওয়াতে যখন পাশের বাড়ির একটি মহিলা তাকে উদ্ধার করে এনে রাসমণির কাছে রেখে যান তখনও সে কোন খোঁজ নেওয়া দরকার মনে করে নি। অবশ্য তার পর দু-একবার দেখা হয়েছিল বৈকি! মা যেদিন মারা যান সেদিনও সে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ঠিকই, হয়তো বা কিছু সাহায্যও করতে পারত, কিন্তু যে স্বামী কোনদিন তাকে—ভালবাসা দূরে থাক্—স্পর্শ পর্যন্ত করলে না, যে স্বামী স্পষ্টতই এক বার-নারীর প্রেমে আকণ্ঠ মগ্ন—তার কাছ থেকে তার অবহেলিত দেহটাকে রক্ষা করার জন্য পয়সা ভিক্ষা করার চেয়ে দেহটাকে শেষ করে ফেলাও যে ঢের সহজ! না, উমা সে ভিক্ষা চায় নি।

অথচ সেদিন আর কোন আশ্রয়ই ওর ছিল না। রাসমণি তিনটি মেয়েরই বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন সত্য—কিন্তু কারুরই নিশ্চিন্ত বা নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। উমার বড় বোন কমলা অবস্থাপন্ন চরিত্রবান লোকের হাতেই পড়েছিল কিন্তু অত্যন্ত অকালে বিধবা হওয়ার ফলে সে ও আজ নিরাশ্রয়। সামান্য গহনা-বেচা কটি টাকার সুদে কায়ক্লেশে তার সংসার চলে। উমার যমজ বোন শ্যামা—তার স্বামী নরেন তো আরও অমানুষ। সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে স্ত্রী-পুত্রকন্যাকে ভিখারীর পর্যায়ে দাঁড় করিয়েও সে থামে নি। একেবারেই পথে বসত ওরা, কোনমতে পদ্মগ্রামের সরকার বাড়ির নিত্য সেবার কাজটা যোগাড় হয়েছিল তাই মাথা গোঁজবার মত একটু আশ্রয় এবং দৈনিক আধ সের আতপ চালের এই ব্যবস্থাটুকু হয়েছে। তাও সে কাজটুকুও তার দ্বারা হয়ে ওঠে না, ঠাকুরের ভার একরকম ঠাকুরের নিজের ওপরই। সমস্ত সংসারের ভার তরুণী স্ত্রীর ওপর তুলে দিয়ে অনায়াসে সে দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাস করত

এবং মধ্যে মধ্যে অকস্মাৎ এসে তাদের ভিক্ষান্নে ভাগ বসিয়ে, এমন কি কিছু চুরি করেও আবার গা-ঢাকা দিত।

সুতরাং কার কাছে যায় উমা? শুধু দেহধারণের প্রশ্নই নয়। নবীন বয়স এবং অসামান্য রূপ, এই দুটি পরম শত্রুর কাছ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য একটু নিরাপদ আশ্রয়ও চাই।

অগত্যা কমলার কাছে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল তাকে। সিমলের কোন সংকীর্ণ গলির এক প্রাচীন বাড়ির একতলায় দুটি অন্ধকার ঘর ভাড়া করে দুই বোন তাদের জিনিসপত্র নিয়ে এসে কোনমতে মাথা গুঁজে ছিল। উমা দু টাকা এক টাকা মাইনের কয়েকটি টিউশনি করত, আর কমলার ছিল মাসিক ষোলটি টাকা বাঁধা আয়। তাইতেই কোনমতে চলত ওদের। এরই মধ্যে গোবিন্দর লেখাপড়া শেখার খরচাও ছিল। সুতরাং অবসর বস্তুটি ওদের জীবনে একেবারেই ছিল না—না চিন্তার, না বিলাসের।—তবু সেই অন্ধকার ঘরেও একদা খবরটা এসে পেঁছিয় 'রাজা আসছেন'।

উমা যেখানে যেখানে মেয়ে পড়ায়, সব জায়গাতেই দেখে আয়োজন। গোবিন্দ ইস্কুল থেকে এসে খবর দেয়—তারা দু দিন বাড়তি ছুটি পাবে আর তাদের লেবু-সন্দেশ খাওয়ানো হবে। 'কিন্তু রাজা দেখার কী হবে মা?' মার দিকে উৎসুক মুখ তুলে গোবিন্দ প্রশ্ন করে।

কমলা উত্তর দিতে পারে না। ওদের বাড়িওয়ালা কাকে ধরে একখানা গাড়ির ব্যবস্থা করেছে। তা ষেটের কোলে ওদেরই তো চৌদ্দ জন—মেয়েছেলে আর ছোট ছেলে মিলিয়ে। কী করে ধরবে কে জানে! বুড়ো গিন্নী বলেছেন, 'সে আমরা যেমন করে পারি ধরাব। তবে ওর বেশী আর হবে না'—কতকটা কমলাদের শুনিয়েই শেষের কথাগুলো বলা।

অবশ্য ধরেও ওদের ঐ ছেলে বুড়ো চোদ্দ জন একখানা গাড়িতে—তা কমলা নিজের চোখেই দেখেছে। কর্তার ভায়রা-ভাই এক প্রেসের ম্যানেজার। বুঝি কোন থিয়েটারের প্লাকার্ড ছাপে, মধ্যে মধ্যে মেয়েদের এক গাড়ি পাস দেয়। তখন ঐ একখানা গাড়ির মধ্যে আশ্চর্য কৌশলে ওঁরা ধরান ঐ চোদ্দ জনকে। প্রতিদিনই কমলার ভয় হয় বুঝি সর্দিগর্মি হয়ে দু-একটা ছোট ছেলেমেয়ে মরে—কিন্তু প্রতিদিনই সে আশঙ্কাকে উপহাস করে ফেরবার সময় দুখানা গাড়ি চড়ে ফেরে ওরা। যাবার সময় অবশ্য চার আনা ভাড়ার ওপর আরও দু আনা বখশিশ দিতে হয়—কিন্তু তাতে লোকসান নেই। গাড়ির ছাদের ওপর খাবারের ঝুড়ি, জলের কুঁজো, পাখা, কাঁথা, বালিশের পুঁটুলি নিয়ে ওঁরা সন্ধ্যার আগেই হৈ-হৈ করতে করতে চলে যান—ফেরেন একেবারে ভোরবেলা। আজকাল রেওয়াজ হয়েছে দুখানা আড়াইখানা করে নাটক হয় সারারাত ধরে—এক-এক দিন বেশ বেলাও হয়ে যায়। তাছাড়া আগে আরম্ভ হ'ত রাত নটায়, এখন সাতটা না বাজতে বাজতে শুরু হয়—ছেলেমেয়েদের দুধ, বার্লি, কাঁথা সবই গুছিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

কিন্তু সে যাক্—কমলার ওদিকে কোন আশা নেই। উমা যাদের বাড়ি পড়ায় তাদের মধ্যে এক ডাক্তারের একখানা গাড়ি আছে—সেই গাড়িটির ভরসাতে নাকি একরাশ কুটুম্ব এসে জড়ো হয়েছে। তবু তাঁরা উমাকে বলেছিলেন যে এক দিন অন্ততঃ আলো দেখাতে নিয়ে যাবেন তাকে কিন্তু উমা রাজী হয় নি। দিদিকে ফেলে, বিশেষ করে গোবিন্দকে ফেলে যাওয়া সম্ভব নয়।

এক উপায় আছে গাড়ি ভাড়া করে আলো দেখতে যাওয়া কিন্তু তাতেও দুটি বড় বাধা, প্রথমত একটু শক্তগোছের পুরুষমানুষ না হলে শুধু গোবিন্দর ভরসাতে অচেনা গাড়োয়ানের সঙ্গে যাওয়া যায় না—দ্বিতীয়ত সব চেয়ে বড় বাধা হ'ল টাকা। গাড়িওলারা নাকি হাতে মাথা কাটছে। আলো দেখাতে ভাড়া চাইছে দু টাকা তিন টাকা পর্যন্ত—রাজা আসবার দিন নাকি পাঁচ টাকা ছ টাকা পড়বে—এ ওদের সাধ্যাতীত।

সুতরাং কমলা শুষ্ক মুখে ঘাড় নাড়ে, 'কী বলব বাবা, আমাদের কী সে ক্ষমতা আছে?'

গোবিন্দ ম্লান চোখ দুটি মাটিতে নামিয়ে চুপ করে বসে থাকে। সে আর নিতান্ত ছোট্ট ছেলেটি নেই। গত কয়েক বছরেই সে এটুকু বুঝে নিয়েছে, অন্য অন্য ছেলেদের মত আব্দার করা তার সাজে না।

এরই মধ্যে এক দিন সকালে অতি-পরিচিত একটি কণ্ঠের ডাক কানে এসে পেঁছিয়, 'কৈগো দিদি কোথায় গেলে? উমি! উমি বাড়ি আছিস নাকি?'

প্রথমটায়—পরিচিত হলেও ঠিক মনে করতে পারে নি উমা। তার পর হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এ গলার আওয়াজ ভগ্নীপতি নরেনের।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল সে। আর যাই হোক নরেন তাদের এ ঠিকানা খুঁজে বার করবে এ আশঙ্কা সে কখনও করে নি। পাঁচ জনের সঙ্গে বাস, বাড়িওয়ালা, বিশেষত বুড়ো গিন্নী বড় বেশী কৌতূহলী, তাঁর মুখও বড় প্রখর। হয়তো এই নিয়ে অন্ততঃ বিশ দিন খোঁটা দেবেন। নরেনের তো কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, হয়তো এমন বেশভূষায় এসে দাঁড়াবে যে পরিচয় দিতেই লজ্জা করবে। আর তেমনি তার কথাবার্তাও—

উমা বেরিয়ে এসে দেখলে তার অনুমান সবটা ঠিক না। বেশভূষাটা আজ অন্ততঃ চলনসই। একটা ধোয়া থান পরনে এবং গায়ে একটা ফরসা উড়ুনি। হয়তো সদ্য কোন ক্রিয়া-কর্মে পাওয়া। যদিও কাপড়টা হাঁটুর ওপর তুলে পরা এবং অবিরত রোদে জলে চলার ফলে পা দুটির অবস্থা বঙ্কিমের বিদ্যাদিগ্‌গজের পায়ের মতই, তবু এক জোড়া নতুন চটি থাকায় খানিকটা ভদ্রতা বজায় আছে। হাতে অতি পুরাতন এবং ছেঁড়া একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ, তার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি থেলো হুঁকো ও কলকে। বেশ প্রশান্ত এবং সহাস্য মুখে ওধারে সারি সারি দাঁড়ানো বাড়িওলাদের দিকে তাকিয়ে আছে। উমা যত তাড়াতাড়িই বেরিয়ে আসুক—বুড়ী গিন্নী তারও আগে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং নিঃশব্দ-কৌতুকে নিরীক্ষণ করছেন আগন্তুকটিকে।

উমা বেরিয়ে আসতেই তিনি মুখ টিপে প্রশ্ন করলেন, 'কে হয় গা তোমাদের, মা উমা ?'

উমা উত্তর দেবার আগে নরেন নিজেই উত্তর দিলে, 'আজ্ঞে আমি ওদের ভগ্নীপতি হই গো মা-ঠাকরুন। এ বাড়ির আমি মেজ-জামাই !'

'বেশ জামাই !' আবারও মুখ টিপে বলেন তিনি !

প্রীত এবং গদ্‌গদ কণ্ঠে নরেন উত্তর দেয়, 'সে যা বলেন নিজগুণে, হেঁ হেঁ। তা ভাল, ভাল—খোঁজখবর যে রাখেন এই ভাল। আপনাদের ভরসাতেই তো এখানে ফেলে রাখা। সত্যিই ধরুন দুটো সোমত্থ মেয়ে থাকে—হুট্ করে অমনি পুরুষ আসা তো ঠিক নয়।'

'তুমি বাছা বুঝি এদের গার্জেন ? তা কৈ এতকাল তো দেখি নি কোন দিন ?'

'দেখবেন. কী করে মা, নিজের শুয়োরের পাল দেখব না এদের দেখব ! মাগী তো বিইয়েই খালাস—কী জ্বালা তা আমিই জানি। দেখেশুনে ইচ্ছে হয় এক-এক দিন দিই গোরবেটার জাতকে কেটে কুচি কুচি করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে। কেউ মানুষ হবে ভেবেছেন ? কেউ না, কেউ না।'

উমা তার বিরক্তি চেপে রাখতে পারে না। বাড়িওলাদের সবাই হাসছে। পাগল বা সং দেখলে যেমন হাসে। সে প্রাণপণে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে নিজেকে সামলায়। বলে, 'ভেতরে আসবেন, না সারাদিন উঠোনে দাঁড়িয়ে বকবেন।'

'না—না—এই যে যাই।'

ভেতরে এসেই বলে, 'ও চামডাইনী বুড়ী কে রে ? বাড়িউলী বুঝি ? মাগীর চিপ্‌টেন কেটে কেটে কথা দ্যাখ না একবার।'

ততক্ষণে কমলা এসে দাঁড়িয়েছে।

'এই যে দিদি, দাও দিকি একটু চা তৈরী করে। এ আবার পোড়ার এক অব্যেস করে ফেলেছি। ভয় নেই, চা-চিনি সব নিয়ে এসেছি যোগাড় করে। তারপর উমি, সব ভাল তো ?'

উমা সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলে, 'এখানকার ঠিকানা কে দিলে আপনাকে ? ছোটদি ?'

'বজ্জাত মাগী দিতে কি চায় ? কত করে বললুম হারামজাদীকে—কিছুতেই দিলে না। আমিও তেমনি—বিছানার নীচে থেকে তোদের পুরোনো একখানা চিঠি টেনে বার করলুম। তাতেই তোদের ঠিকানা লেখা ছিল এ বাড়ির। তা সে-ও হয়ে গেল অনেকদিন। ছ মাস আগের কথা—ঘুরতে ঘুরতে এদিকে আসাই হয় না—নিহাত এই রাজা আসছে শুনলুম তাই ! কলকাতায় আসতে হবে, মনে পড়ল, ব্যাগের মধ্যে থেকে টেনে বার করলুম চিঠিখানা। বলি আস্তানা যখন একটা আছেই তখন আর ভাবনা কি ? এই নাও যোগাড় সব—'

চা-চিনির মোড়ক দুটো বার করে দিয়ে নিজে তামাক সাজতে বসে নরেন।

কমলা তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করে, 'তা ওরা সব আছে কেমন ?'

'আছে, আছে—ভালই আছে।' মুরুব্বীয়ানার ভঙ্গীতে উত্তর দেয় নরেন।
উমা বিরক্তি আর গোপন করে না। বলে, 'তুমিও যেমন দিদি, ও তাদের কি খবর রাখবে? ছ মাস আগে একবার গিয়েছিল তা তো শুনলেই।'
হা-হা করে প্রায় অট্টহাস্যে হেসে ওঠে নরেন।
'বেড়ে বলিছিস ভাই। জিতা রহ। যাই বল দিদি, উমিটা কেলেভার আছে। আর নইলে কি ম্যাস্টারি করতে পারে! কথাটা বলেছে মন্দ নয়। কতকটা তাই বটে। তবে কি জানিস উমি, ওরা ভালই থাকবে তা আমি জানি। ও মাগীর কি মরণ আছে? মলে ওরও হাড় জুড়োয়—আমারও হাড় জুড়োয়। যমের অরুচি। ওদের মরণ নেই—বুঝলি, ওদের মরণ নেই। আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে বসে আছে—'
আরও এক দফা হেসে নিয়ে কলকেতে ফুঁ দিতে থাকে নরেন। অসহ্য ক্রোধ দমন করতে না পেরে উমা সরে পড়ে।
কমলা চা এনে ধরে দিয়ে বললে, 'তারপর? মতলবটা কি?'
'মতলব! ঐ যে বললুম রাজা আসছে, বাজি পুড়বে, আলো জ্বলবে, তাই দেখতে এলুম। তা আস্তানা তো চাই। তোমরা থাকতে আর কোথায় যাব বল!'
'এখানে থাকবে কোথায়?' আমরা এক ঘরে থাকি কোনমতে। ও ঘরটা তো মালে ঠাসা। এর ভেতরে পুরুষমানুষ তুমি থাকবে কোথায়?'
'ও, সেজন্যে কিছু ভেবো না দিদি। সে আমি ঠিক করে নেব। ঐ যে বাড়ি ঢুকতে চলনটায় বেঞ্চি গাঁথা রয়েছে একটা? ঐখানেই তোফা শুয়ে থাকব এখন। আমরা পুরুষমানুষ, সব অব্যেস আছে। বলে কত রাত গাছতলায় কেটে যায়, তো পাকাবাড়ির ব্যবস্থা! সেজন্যে কিছু ভেবো না। তুমি এখন রান্না চড়াও দিকি, বেশ হিং-আদা-মৌরি দিয়ে যেমন রাঁধো বিউলির ডাল, অনেক দিন খাই নি। আর কড়াইশুঁটির ডালনা। সেবার খেয়ে গিয়েছিলুম যেন অমর্ত, আজও মুখে লেগে আছে। খাওয়ার আমার কোন গোল নেই। বেগুন-পোড়ার সঙ্গে দুকুচি আদা পিঁয়াজ দিও—তাতেই দিব্যি খাওয়া হয়ে যাবে। আর একটা আলুভাতে। ব্যস্!'
চা শেষ করে নরেন হুঁকোটয় টান দেয়।

॥ ২ ॥

বিকেলবেলা টানা একটা ঘুম দিয়ে উঠে নরেন বলে, 'দিদি যাবে নাকি আলো দেখতে? যাবে তো চলো। গোবিন্দ কী বলিস?'
গোবিন্দর চোখ আগ্রহে ঔৎসুক্যে জ্বলতে থাকে। সে মার মুখের দিকে চায়।
কমলা তখনই কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারে না। বিব্রত মুখে উমার দিকে

চায়।

নরেন আবারও বলে, 'চল না দিদি, সেই তো গাড়ি করতেই হবে একটা—তোমাদেরও দেখা হয়ে যাবে।'

'তুমি কি গাড়ি করবে নাকি?'

'ওমা তা করব না! তোমাদের কি নিয়ে যাব হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে? আমি একা হলে আলাদা কথা—'

বেশ তো তুমিই যাও না ভাই!'

'সে কী কথা। তা কখনও হয়। এলুম যখন, তোমাদেরও কেউ নেই—আমার তো এটা কত্তব্যের মধ্যে পড়ল গো!'

কমলা উমার মুখের দিকে চায়।

উমা ঘাড় নাড়ে, 'না দিদি, আমি কোথাও যাব না।'

কমলা বলে, 'তা হলে আমিই বা যাব কেমন করে। তুমি একাই যাও ভাই—'

'তাই তো, যাবে না? গোবিন্দটা—? গোবিন্দ না হয় চলুক।'

উমা দৃঢ় স্বরে বলে, 'না, গোবিন্দ একা আপনার সঙ্গে যাবে না।'

'যাবে না? তবে থাক্।'

গোবিন্দ মিনতি করে, 'তুমি চল না ছোট মাসী। তুমি গেলেই অমাদের সকলের যাওয়া হয়। তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি ছোট্ মাসী—চল—'।

সেদিকে চেয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উমা।

কমলা সমস্ত বুঝে বলে, 'তাই চ উমা। কোথাও তো যাস না!'

নরেন মহা উৎসাহে গিয়ে গাড়ি ডেকে আনে।

এ পাড়া থেকে বেরিয়ে বৌবাজার ধর্মতলা হয়ে সাহেব-পাড়া পড়বার মুখে গাড়ি আটকে গেল। বিষম ভিড়, অসংখ্য গাড়ি, ল্যাণ্ডো, ব্রুহাম, ভিক্টোরিয়া, ফিটন, টমটম—ভাড়াটে পাল্কি গাড়ি—কিছুরই অভাব নেই। সদ্য আমদানি দু-একখানা মোটর গাড়িও আছে। এদিক ওদিকের গাড়ি এমন 'জ্যাম' হয়ে আছে যে কোন দিকেই কোন গাড়ি নড়ছে না—শুধু চারিদিক থেকে চেঁচামেচি হচ্ছে।

এরই মধ্যে একটা ডাক আসে কোথা থেকে, 'বড় মাসীমা ছোট মাসীমা—শুনছ!'

মহাশ্বেতার গলা। উমা ত্রস্তেব্যস্তে চারিদিকে চায়।

'এই যে এদিকে।' আবারও শোনা যায়।

'আঃ! চুপ কর না বৌমা। চারদিকে পুরুষমানুষ সব—কী মনে করবে।' কার চাপা-গলার শাসনও কানে যায়।

অর্থাৎ খুবই কাছে। কিন্তু দেখা যায় না।

অবশেষে নরেনই দেখতে পায়। ঠিক ওদের গাড়ির সমান্তরালে বিপরীতমুখী গাড়ি একটা। মাঝে আর একখানা বিপুল বগিগাড়ি দাঁড়িয়ে থাকায় এরা দেখতে পায় নি। কোচবক্সের নীচে একটা খাঁজ দিয়ে মহাশ্বেতা দেখেছে।

নরেনই নেমে গেল। কোনমতে ঘোড়ার মুখ বাঁচিয়ে গলে চলে গেল ওদের গাড়ির ফাঁকে।

'তুই এখানে কোথা থেকে রে? ও এই যে বেয়ান, প্রাতঃপেন্নাম। এই যে বাবাজী—'

'আঃ! কী যে কর বাবা। আমার মেজ দ্যাওর।'

'অ। বেশ বেশ। তা তোরা কোত্থেকে? কার গাড়ি এ?'

মহাশ্বেতা উত্তর দেবার আগেই অম্বিকা তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়, 'আমার মামার এক বন্ধুর গাড়ি—'

'এসেছ কোথায় বাবাজী?'

'আমার মামার বাড়ি।'

'তা বেশ বেশ। ঠিকানাটা দাও—কাল সকালে দেখা করব'খন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ দেব বৈকি। বরং আপনাদেরটাই দিন না—কাল সকালে এদের নিয়ে যাব'খন।'

'অম্বিকাপদ চট করে ওদিক থেকে নেমে পড়ে।

'আমি যাব তোমার সঙ্গে ঠাকুরপো?' ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করে মহাশ্বেতা।

'পাগল! এই গাড়ি-ঘোড়ার মধ্যে দিয়ে?

কিন্তু এর ভেতরেই গাড়ির ভিড় পাতলা হয়ে আসে। এদের গাড়োয়ানও ঘোড়ার পিঠে চাবুক দেয়। অম্বিকাপদ আবার গাড়িতে চড়তে যায়।

'বাবাজী, একটা কথা—'

ওর জামার হাত ধরে টানে নরেন; চুপি চুপি বলে, 'একটা টাকা হবে বাবা? আমি বাড়ি ফিরেই পাঠিয়ে দেব। কুটুমের ঋণ রাখব না · দ্যাখ না, এরা ধরলে এত করে—না বলতে তো পারি না। তা পয়সা কিছু কম পড়ে গেল —'

অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে অম্বিকাপদ একটা টাকা বার করে দিয়ে গাড়িতে চড়ে বসল। গাড়ি তার আগেই চলতে শুরু করেছে।

নরেনের গাড়িও ছেড়ে দিয়েছে। পুলিস এসে সরিয়ে দিচ্ছে গাড়ি। নরেন ছুটতে ছুটতে এসে নিজেদের গাড়িতে চড়ে বসল।···

সাহেব-পাড়ায় আলো দেখে নরেন বেলভেডিয়ার যাবার প্রস্তাব করেছিল কিন্তু উমা বেঁকে দাঁড়াল। সে এখনই ফিরবে। তার ভাল লাগছে না একটুও। তাছাড়া নরেনকে সে চিনে নিয়েছে এই ক বছরে বেশ ভাল রকমই। ওর এই আত্মীয়তাতে সে স্বস্তি পাচ্ছিল না। কোথা দিয়ে কী করে বসবে—হয়তো সে ভয়ও একটু ছিল।

অগত্যা ফিরতে হয়—গোবিন্দ এবং নরেনের ঘোরতর অনিচ্ছাতেও। বাড়ি ফিরে এল ওরা রাত এগারোটারও পর। ভিড়েই দেরি বেশী হয়েছে। ঘণ্টা হিসাবে গাড়িভাড়া—পাঁচ টাকা ভাড়া পাওনা হয়ে গেছে গাড়োয়ানের।

কমলারা নেমে ভেতরে চলেই যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে দুজনেই ফিরে দাঁড়াল।

পাগলের মত ঘুরপাক খাচ্ছে নরেন, আর অনবরত মুখে একটা চাপা 'হায় হায়' 'হায় হায়' ধ্বনি করছে।

'কী সর্বনাশ! এ কী বিপদে পড়লুম গো!……এখন কী করব গো!'

'কী হয়েছে কী'? কমলা এগিয়ে আসে তাড়াতাড়ি—

ট্যাকে—ট্যাকে টাকা কটা রেখেছিলুম দিদি—সে টাকা ফরসা। বললে বিশ্বাস না কর—এই দ্যাখো—।'

সে উড়ুনিটা তুলে ট্যাকটা দেখবার ভঙ্গী করে একটা।

'এখন উপায়?'

প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে নরেন বলে, 'নিশ্চয় ঐ ওদের সঙ্গে যখন দেখা করতে গেছি—তখনই কোন্ ব্যাটা আমার এই সব্বনাশটি করে বসে আছে!…দোহাই দিদি, এই নাককান মলছি আর কখনও যদি করি এমন—এ যাত্রা মান বাঁচাও। যেমন করে পারি আমি সাত দিনের মধ্যে—।'

কমলা উমা দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর যাই হোক—এতটার জন্যে তারা কেউ প্রস্তুত ছিল না। মাসিক ত্রিশ টাকারও কম আয়ে তাদের তিনটি প্রাণীকে ঘড়ভাড়া দিয়ে সংসার চালাতে হয়—তার ভেতর থেকে পাঁচ টাকা অপব্যয় করার কথাটা ধারণা করতেও দেরি হয় বৈকি!

কাছে এসে নরেন বলে, 'টাকা যদি না থাকে তো দু-এক কুচো সোনাফোনা রেখে না-হয় বাড়িউলী মাগীর কাছ থেকেই ধার নিয়ে চালিয়ে দাও দিদি—আমি কাল সেটা পোদ্দারের কাছে রেখে ওদের টাকা মিটিয়ে দেব।…আমি এই কথা দিচ্ছি দিদি, যেমন করে হোক—। সাত দিনও যাবে না! দেখে নিও—'

স্তম্ভিত স্থাণুবৎ কমলার হাতে একটা টান দিয়ে উমা বলে, 'চলে এসো দিদি। যাওয়াটাই ভুল হয়েছে। এখন আর ভেবে লাভ কি। যা হোক করে বাক্স ঝেড়ে দিয়ে দাও। এত রাত্তিরে আর কেলেঙ্কারি বাড়িও না। এরা এখনো ফেরে নি তাই রক্ষে, নইলে এতক্ষণে সার দিয়ে এসে দাঁড়াত।'

সত্যিই তখন আর দেরি করার সময় নেই। গাড়োয়ান অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। কণ্ঠস্বর তার বেশ চড়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই—

অগত্যা কোনমতে পা ধুয়ে ভেতরে গিয়েই বাক্স খুঁজতে বসতে হয়। এ কৌটো ও কৌটো করে শেষ অবধি পাঁচ টাকা পুরো হয় বটে—তবে পরের দিনের জন্যে পাঁচটা পয়সাও পড়ে থাকে না ওদের। মাসের শেষ—রাজা আসার হ্যাঙ্গামে সকলেই ব্যস্ত—কমলার সুদ এবং উমার মাইনে—কবে পাওয়া যাবে তারও ঠিক নেই—সবটাই অনিশ্চিত। উমার যেন কান্না পেয়ে যায়।

কমলা নরেনের হাতে দিতে যাচ্ছিল টাকাটা—উমা বললে, 'না দিদি, গোবিন্দ দিয়ে আসুক। আবার যদি কিছু হারায় ও থেকে তো আর কোন উপায় থাকবে না!'

নরেন অগ্নিদৃষ্টিতে তাকায় উমার দিকে কিন্তু কথা বলতে পারে না।

গাড়োয়ান ততক্ষণে রীতিমত চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে।

মুখহাত ধুয়ে তাড়াতাড়ি দুপুরের তৈরী রুটি তরকারি নরেন আর গোবিন্দকে খেতে দেয় কমলা। নরেনের দুঃখ আর অনুতাপ ততক্ষণে কমে গেছে, সে মহা উৎসাহে গোবিন্দকে বোঝাতে লাগল, আলিপুরের দিকে গেলে এর চেয়ে ঢের বেশী আরও ভালো ভালো আলো দেখতে পাওয়া যেত।

কমলার অসহ্য বোধ হচ্ছিল সত্যি কথা, তবু সে নিজে বোধ হয় কিছুই বলতে পারত না—কড়া কথা তার মুখ দিয়ে বেরোয় না—উমা বাইরে থেকে ডেকে বললে, 'ওঁকে বলে দাও দিদি, কাল সকালেই যেন অন্য কোথাও ব্যবস্থা করেন। এখানে আর সুবিধে হবে না। আর এক পয়সাও ঘরে নেই যে ওঁকে খাওয়াব—'

একেবারে যেন আগুনের মত জ্বলে ওঠে নরেন, 'দিদি, তোমরা কি ভাবছ আমি মিছে কথা বলছি, আমার চুরি যায় নি! কোন্ বেজন্মা মিছে কথা বলে, কোন্ শুয়োরের বাচ্ছা মিছে কথা বলে! আমি তাহলে এ দায় ঘাড়ে করব কেন। নিজে তো পায়ে হেঁটে দেখতে পারতুম—'

হঠাৎ গোবিন্দ বলে ওঠে, 'মেসোমশাই, তখন ঐ যে ও-গাড়ির সেই ভদ্দরলোকের কাছ থেকে টাকা না কি চেয়ে নিয়ে চট্ করে পেটকাপড়ে বেঁধে ফেললেন—সেটাও কি চুরি গেছে?'

ক্ষোভে এবং অভিমানেই বোধ করি নরেনের বাক্‌রোধ হয়ে যায়। খানিক পরে—খাওয়া শেষ করে উঠে বলে,' 'বেশ—বললেই হত সোজাসুজি যে জায়গা হবে না—ছেলেবুড়ো সবাই মিলে এমন অপমান করবার কি দরকার ছিল?… আমারই ভুল হয়েছিল এখানে আসা। হাজার হোক্ এ-ও সেই বেউড় বাঁশের ঝাড় তো! ঝকমারি হয়েছিল—'

গজ গজ করতে করতে ব্যাগ এবং হুঁকো কলকে গুছিয়ে নিয়ে নরেন সেই রাত্রেই বেরিয়ে পড়ল।

কমলা-পুজো আহ্নিক শেষ করে বাইরে এসে উমার কাছে দাঁড়াল।

উমা এসে পর্যন্তই উঠোনের দিকের অন্ধকার রকে বসেছিল, আর ওঠে নি। কমলা কোমল কণ্ঠে বললে, 'উমা চ, খাওয়া-দাওয়া সেরে নিবি—'

'তুমি খাও দিদি, আমি—আমার শরীরটা ভাল লাগছে না।'

উঠান অন্ধকার কিন্তু ওপরের সিঁড়ির মুখে কেরোসিনের একটা দেওয়াল-আলো জ্বালা ছিল, তার ম্লান আভাতেও ওর গালে জলের চিহ্ন কমলার চোখ এড়াল না। সে আর কথা কইলে না, অনুরোধও করলে না। সেও নিঃশব্দে পিছনটায় বসে পড়ল। শুধু উমা নয়, সে-ও দেখেছে—আর একটি মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে শরৎ আলো দেখে বেড়াচ্ছে। উমার স্বামী শরৎ।

দুজনেই সেই অন্ধকারে বসে থাকে বহুক্ষণ। কেউই কথা কয় না, কওয়ার প্রয়োজনও নেই। পেছন থেকেই কমলা বুঝতে পারে, ঠিক কাঁদার মত ফুঁপিয়ে না কাঁদলেও উমার কপোল বেয়ে জল ঝরছেই, আর উমাও বোঝে যে তার অবস্থা দিদির অজানা নেই।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়।

দূর রাজপথে তখনও উৎসব-যাত্রীদের গাড়ির আওয়াজ উঠতে থাকে মধ্যে মধ্যে। আরও দূরে কোথায় থিয়েটার হচ্ছে, মাঝে মাঝে তার সঙ্গীতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। একঘেয়ে ভাবে পাশের বাড়ির কলে জল পড়ে যাচ্ছে। বোধ হয় বাড়িতে কেউ নেই, যাবার সময় কারুর কল বন্ধ করার কথা মনে হয় নি।… ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে অবিশ্রান্ত।

কমলারও কত কথা মনে পড়ে যায়। শ্যামার বিয়ের কথা। কি না ছিল ওদের, জাজ্বল্যমান সংসার। ভালভাবে চললে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেতে পারত। সব উড়িয়ে দিলে দুটি ভাই—দেবেন আর নরেন। তবু দেবেন আরা না কোথায় ডাক্তারি করে সংসার চালাচ্ছে। নরেন একেবারে নির্বিকার। কোন দিন কোন দায়িত্ব বহন করল না আজ পর্যন্ত। তার তুলনায় কমলার নিজের বরাতও এমন কি ঢের ভাল। ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ে তার স্বামীর কথা। বিবাহিত জীবনের অতি সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে কাটা স্বল্প ক'টি বৎসর। তারপর বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থা। গোবিন্দ কি মানুষ হবে?…সে আরও কত দিন পরে?

উমাটা—। সত্যিই ওর কি আছে? কি নিয়ে থাকবে?

শরৎকে বুঝতে পারে না কমলা। আসত তো ওদিকে মধ্যে মধ্যে। বেশ কথাবার্তা, যেন উমার ওপর মায়াও আছে মনে হয়। তবে এমন কি করে হয়? অমন তো কত পুরুষেরই 'বার-টান' আছে, ঘরের বৌকে ছোঁবে না তাই বলে? ওদের অদৃষ্টে সবই যেন উলটো হয়।…

নিজেকেই দায়ী মনে হয় কতকটা। মা অনেক ইতস্তত করেছিলেন। কমলাই জেদ করে সেদিন। কার্তিকের মত রূপ ছিল শরৎ-জামাইয়ের। আচার-আচরণেও অতি ভদ্র। কেমন করে যে ও এত নিষ্ঠুর হল!…

হৈ-হৈ করতে করতে গাড়ি বোঝাই করে বাড়িওলারা এসে পড়ে। তখন রাত দুটো বেজে গেছে। এদের দু'জনেরই একসঙ্গে যেন চমক ভাঙে। এখনই যত বাজে গল্প আর কে কতটা দেখতে পেলে তার হিসেব-নিকেশ শুরু হবে। চট্ করে ঘরে ঢুকে আলোটা নিভিয়ে দেয় উমা। কমলাও ঘরে ঢুকে হাতড়ে হাতড়ে ঘরদোর সেরে শুয়ে পড়ে। সেরাত্রে দু'জনের কারুরই খাওয়া হয় না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

গোবিন্দ সেদিন স্কুল থেকে ফিরলই জ্বর নিয়ে। সামান্য জ্বর—রাত নটা নাগাদ ছেড়ে গেল। এমন একটু-আধটু হয়ই। তা নিয়ে কেউই মাথা ঘামাল না। পরের দিন সুজির রুটি আর মাছের ঝোল খেয়ে ইস্কুলে গেল। সেদিন কিন্তু ছুটির আগেই ফিরে এল। শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে দেখে মাস্টার মশাইরা গায়ে হাত দিয়ে দেখে ছেড়ে দিয়েছেন। পরের দিন আর স্কুলে গেল না। কিন্তু সেদিনও

ঠিক দুটো নাগাদ জ্বর এল। খুব বেশী নয় হয়তো—তবু জ্বরই।

কমলা চিন্তিত হয়ে পড়ল। বাড়িওলাদের গিন্নী ব্যবস্থা দিলেন বেলপাতা আর শিউলিপাতার রস। একজন বললেন জোলাপ দিতে। এইভাবে টোটকা-টুটকি চলল তিন-চার দিন। কিন্তু জ্বর বন্ধ হ'ল না। রোজই দুটো নাগাদ আসে, রাত নটা-দশটা নাগাদ ছেড়ে যায়। উমা কমলা দু'জনেরই মুখ শুকিয়ে উঠল। বাড়িওলা-গিন্নী শুনিয়ে গেলেন, 'উঠতি বয়স, খুব সাবধান বাছা। এই বয়সটাতেই বড্ড থাইসিস হয় শুনেছি। ডাক্তার দেখাও!'

গলির মোড়ে চারু ডাক্তার কী নতুন এক রকম চিকিৎসা করেন—হোমিওপাথির মতই। বাড়িওলার মেয়ে মালতীর পরামর্শে তাঁকেই ডাকা হ'ল। মালতী বলল, 'খরচাও বেশী নয়, আট আনা ভিজিট আর দু' পয়সা করে ওষুধের পুরিয়া—কিন্তু ওষুধ ওঁর শুনেছি ডাকলে কথা কয়।'

সাত দিনের দিন তাঁকে ডাকা হ'ল। তিনি এসে দশ আনা পয়সা নিয়ে চার দাগ ওষুধ দিয়ে গেলেন। নাড়ী দেখে জিভ দেখে আঠারো রকম প্রশ্ন করে বলে গেলেন, 'ভয় নেই, এই চার পুরিয়াতেই সারবে—বড় জোর আর চার পুরিয়া।'

'কী জ্বর' প্রশ্ন করাতে উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন, 'কেন, জানলে কি নিজেরাই চিকিৎসা করবেন?'

তিন-চারে বারো পুরিয়া ওষুধ খাওয়ানো হয়ে গেল—আরও একটা ভিজিটও নিলেন তিনি, কিন্তু জ্বর বন্ধ হ'ল না। সে ঠিক নিজের নিয়মে আসে, নিজের নিয়মে যায়। মাঝখান থেকে ছেলে নেতিয়ে পড়ছে। আর উঠে কলঘরেও যেতে পারে না—এত দুর্বল হয়ে পড়ল।

বুড়ী গিন্নী বললেন, 'করছিস কি মাগী, ছেলেটাকে কি মেরে ফেলবি? এই-বায়সে ভাতার খেয়েও আক্কেল হ'ল না! আবার ছেলেটাকেও খেতে চাস? ভাল ডাক্তার দ্যাখা!'

কমলা আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল, উমাই ধমকে দিল বুড়ীকে, 'কি বলছেন যা তা। আমাদের ছেলে, টানটা আমাদেরই বেশী। ভাবনার কথা—সে কি আমরা বুঝি না? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে তো।'

'দরকার হলে ঘটিবাটি বেচতে হবে মা। ওর পাঁচটা নয় দশটা নয় ঐ একটা। ওর কষ্ট দেখতে পারি না বলেই বলা। তুমি কি বুঝবে মা? পেটে একটা ধরতে তো বুঝতে!'

তিনি খর খর করে চলে যেতে যেতে সবাইকে শুনিয়ে গেলেন, 'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! এদিকে তো এক কড়ার মুরোদ নেই—বাক্যি দ্যাখ না!

বাড়িওলা লোকটি মন্দ নন। তিনি সব শুনে মালতীকে দিয়ে বলে পাঠালেন, 'এ পাড়ায় ডাক্তার বটব্যালের খুব নামডাক। দু' টাকা করে ফী,—বলে কয়ে এক টাকা করে দিতে পারি। ডাকতে চান কি?'

কমলা উমার মুখের দিকে চাইল। অগত্যা। উমা বললে. 'তাই ডেকে দিতে

বল ভাই, দরকার হলে ঘটিবাটিই বেচতে হবে—কী করব !'

ডাক্তার বটব্যাল এক টাকা করে ভিজিট নিতে রাজী হলেন বটে কিন্তু ওষুধ-পত্তরে রোজ আর একটি করে টাকা বেরিয়ে যেতে লাগল। নিজেদের বাজার বন্ধ করে দিলে—শুধু আলু-ভাতে ভাত খাওয়া, জীবনধারণের মত—কমলার মুখ দিয়ে ভাতই গলতে চাইত না, নেহাত উমার ধমকে কিছু মুখে তুলত সে। উমা বলত, 'ছেলের মুখ চেয়েই মুখে দিতে হবে। ওর সেবা করা চাই তো। তুমি যদি বিছানায পড় তো দেখবে কে ?'

তবু খরচা কমানো যায় না কিছুতেই। বাক্স ঝেড়ে দু-এক কুচি সোনা যা ছিল সব বার করে দিলে কমলা মালতীর বাবাকে। কিন্তু দেখা গেল সোনা কিনতে যা দাম বেচবার সময় তার তিন ভাগের দু' ভাগও পাওয়া যায না।

তা হোক—গোবিন্দ ভাল হয়ে উঠুক—তা হলেই হ'ল। কমলা মা কালীকে সোনার বেলপাতায় বুকের রক্ত মানসিক করল। উমা আগেই জোড়া-সত্যনারায়ণ মেনেছিল। কিন্তু না দেবতাদের কৃপা আর না বটব্যালের ওষুধ—কিছুতেই কিছু হ'ল না। ঠিক দুটো থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ঘুষঘুষে জ্বর চলতে লাগল প্রত্যহ।

এর পর ডাকতে গেলে আর. এল দত্তকে ডাকতে হয়। কিন্তু সে একগাদা টাকার দরকার। অংকটা শুনে দু'জনেরই মুখ শুকিয়ে উঠল। তাও এক বার এলেই হবে কিনা ঠিক কি। বার বার যদি ঐ টাকা দিযে আনতে হয়—

পাড়ার একটি বিধবা বৌয়েব সঙ্গে গঙ্গাজল পাতিয়েছিল কমলা, সে পরামর্শ দিল, 'শিবপুরে দীনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে চল গঙ্গাজল। শুনেছি ধন্বন্তরি—গেলেই সারবে।'

উমা ঘাড় নেড়ে বললে, 'না, সে সম্ভব নয়। ছেলে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেছে একেবারে, এখন গাড়িতে তুলে অত পথ নিয়ে গিয়ে দেখানো যাবে না। গাড়ির ধকল সইতে পারবে না।'

দুই বোন দুপুরবেলা বাক্স-পেঁটরা খুলে দেখতে বসল—কোথায় কি আছে। মোটামুটি হিসেব তো আছেই—তবু মনে হয় যদি আর কিছু বেরোয় !

থাকাব মধ্যে আছে উমার দু' গাছা বালা, যা সে হাতে পরে থাকে বারো মাস—আর গোবিন্দর পৈতের আংটি। আর দুটি জিনিস আছে বটে কিন্তু সেদিকে চেয়ে দু'জনেই স্তব্ধ হয়ে গেল। গোবিন্দর বাবার বিয়েব আংটি—এটি নাকি তাঁর বড় প্রিয় ছিল, বিযের পব মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কখনও খোলেন নি। আর রাসমণির সোনা-বাঁধানো নাভিশংখ একটি। এটি নাকি রাসমণিরও মায়ের চিহ্ন। দুটোর কোনটাই বেচতে মন সরে না।

অনেকক্ষণ পরে উমা বললে, 'দু গাছা লাল রুলি কিনে এনে বালা দুটোই খুলে দিই দিদি—গোবিন্দ বেঁচে থাকলে আমাব সব রইল। এ বালার দাম কি ?'

হঠাৎ কমলার মনে পড়ে গেল। সে বললে, 'না তার দরকার হবে না। মা গোবিন্দর বৌয়ের জন্যে যা দিয়ে গেছেন, সেটা আমি রেখে দিয়েছি আলাদা করে।

দুটো বালা আর একজোড়া কেয়াপাত। তাই বার করি।'

'ছি! মা'র চিহ্ন গোবিন্দর বৌ ভোগ করবে না?'

কমলা ম্লান হেসে বললে, 'বাঁচলে তবে বিয়ে, তবে বৌ। বাঁচুক আগে—'

উমা তবু জেদ করে বললে, 'আগে আমার বালাটাই যাক না দিদি—'

'না বোন। আমি মন স্থির করেছি।'

সেই দিনই যা হয় ব্যবস্থা করা দরকার। আর সময় নেই একেবারে।

কমলা গহনাগুলো নিয়ে মালতীর বাবার কাছে যাচ্ছিল, উমা তার হাত চেপে ধরলে। বললে, 'না দিদি—আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। হয়তো আমারই অন্যায়—কিন্তু তবু দেখি না একটু হাত বদল করে। সোনার দাম বাইশ টাকা, কালও পথে এক স্যাকরার দোকানে জিজ্ঞাসা করে এসেছি, অথচ মামাবাবু বেচতে গেলেই পনেরোর বেশী দাম পান না।'

'কি করবি তবে, কাকে দিবি?'

'আমি যাঁর বাড়ি চার টাকার টিউশনি করি, রসময়বাবু—বুড়ো মানুষ, বেশ ধর্মভীরু বলেই মনে হয়। তাঁকেই গিয়ে দিই না?'

'দ্যাখ যা হয় কর। কিন্তু তাঁকে কি এখন পাবি?'

'দেখি। না হয়—না হয় নিজেই যাব কোন পোদ্দারের দোকানে—'

'সে কি রে! না না, তুই যাস নি।'

'কেন যাব না দিদি। সবই করছি, বাইরে বেরিয়ে পুরুষমানুষের মত রোজগার করছি, আর এইটেই পারব না? এক দিন না এক দিন করতেই তো হবে সব। কেউ যখন নেই—তখন কতকাল আর পরমুখাপেক্ষী হয়ে এমন করে ঠকব বল!'

উমা আর দাঁড়াল না।

কিন্তু রসময়বাবু বাড়ি ছিলেন না। তিনি কি সব বিলিতী ওষুধের কারবার করেন। দুপুরবেলা খেতে আসেন ঠিকই—দুটো আড়াইটেয় আবার বেরিয়ে যান। আর কেউ তেমন পুরুষও নেই তাঁদের বাড়ি, যাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যায়।

উমা আর অপেক্ষা করল না। মালতীর বাবাকে দুপুরবেলা বলেই দেওয়া হয়েছে আর এল. দত্তকে ডাকতে। টাকা নিয়ে না গেলে দাঁড়িয়ে অপমান।

উমা সোজা নতুন বাজারের দিকে এগিয়ে গেল। লাল শালু টাঙানো সার সার পোদ্দারের দোকান। কিন্তু ফুটপাথ পেরিয়ে ওদিকে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে গেল একবার।

আজন্ম সংস্কার। কী মনে করবে লোকগুলো কে জানে! ভদ্রঘরের মেয়েছেলে পোদ্দারের দোকানে এসেছে মাল বেচতে—হয়তো বিশ্বাসই করবে না। হয়তো ভাববে সে 'ঐ সব' ঘরের মেয়ে।—ছি, ছি, কেন এ সাহস করতে গেল সে! দিলেই হ'ত মালতীর বাবাকে।—ভয়ে লজ্জায় উমার যেন কান্না পেতে লাগল।

কিন্তু উপায়ই বা কি? দেরি করা চলবে না। এখনই যা হয় করা দরকার। প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু দমন করে দৃঢ় পদক্ষেপে ওপারে গেল উমা।

ওদিকে চাইতেও পারছে না। তখনও অপরাহ্নের ভিড় দেখা দেয় নি। দোকানদাররা বেশির ভাগই অলসভাবে বসে রয়েছে। ওকেই দেখছে নিশ্চয়, ওর দিকেই চেয়ে আছে। এইটে কল্পনা করেই যেন উমা আর ওদিকে চেয়ে দেখতে পারলে না। সে ভেবেছিল ওরই মধ্যে বুড়ো-মত একটা দোকানদার দেখে তার কাছেই যাবে। কিন্তু এখন অতগুলি কৌতূহলী চোখের সামনে ওদিকে তাকিয়ে কে বুড়ো আছে খোঁজা একেবারেই অসম্ভব—ইতিমধ্যেই হয়তো ওদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে তাকে নিয়ে।...সুতরাং কোন দিকে না তাকিয়ে ঠিক সামনে যে দোকানটি পড়ল—উমা সেখানে গিয়েই উঠল।

'কি চাই গা বাছা তোমার?' কণ্ঠস্বরে যেন বেশ একটা অবজ্ঞা এবং বিদ্রূপ।

অপমানে এবং বিরক্তিতে যেন কান-মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। প্রাণপণে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিলে উমা। তারপর যথাসাধ্য নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে, 'এইটে বেচতে চাই।'

বালা জোড়াটা দোকানদারের সামনে নামিয়ে রাখলে।

'অ।' কেমন একটা নৈর্ব্যক্তিক শব্দ করলে দোকানী। তার পর একগাছা বালা তুলে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরে উলটে পালটে দেখলে।

'এ তো দেখছি সেকেলে জিনিস, এ তো এখনকার নয়। এ যে চোরাই মাল নয় কেমন করে জানব আমি?'

সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে উঠল উমার মুখ।

'চোরাই মাল! কি বলছেন আপনি! চোরাই মাল নিয়ে এসেছি আপনাকে বেচতে!'

'কি জানি বাছা!' বিরসকণ্ঠে বলে দোকানদার, 'হ্যাঙ্গাম-হুজ্জুতের মধ্যে আর যেতে ইচ্ছে করে না।—আনে, তোমাদের মত মেয়েরা হামেশাই আনে —বাবু না থাকলে যখন মধ্যে মধ্যে কষ্টে পড়ে তখন গয়না বেচেই খেতে হয় যে— কিন্তু সে সব জিনিস আমরা দেখলেই চিনতে পারি। চক্ষু বুজে নিই। নতুন জিনিস, হয়তো রসানও ওঠে নি। কিন্তু এ অন্তত পঞ্চাশ বছরের মাল হবে, সিন্দুকে তোলা ছিল!'

উমা আর থাকতে পারলে না। রাগে দুঃখে অপমানে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। সে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'আপনি মুখ সামলে কথা বলুন। কি ভেবেছেন আমাকে। আমার সিঁথিতে সিঁদুর দেখছেন না! নিতে হয় নেবেন না হয় ফিরিয়ে দেবেন, খদ্দেরকে অপমান করতে আসেন কোন্ সাহসে?—আমাকে তুমি তুমি বলেই বা কথা বলছেন কেন—আপনি বলতে পারেন না!'

সে বালা জোড়াটা কুড়িয়ে নিয়ে দোকান থেকে নেমে আবার ফুটপাতে এসে পড়ল। এর পর কি করবে কোথায় যাবে—তা সে জানে না, শুধু ক্ষোভে, লজ্জায়, একটা উপায়হীন ক্রোধে তার সেইখানেই মাথা কুটে মরে যেতে ইচ্ছে করছিল।—সে ভেবেও দেখে নি কিছু, ভাববার ক্ষমতাও ছিল না, বোধ করি সহজাত সংস্কারেই কোনমতে রাস্তা পেরিয়ে একেবারে এ পাশের ফুটপাতে এসে

থমকে দাঁড়াল।

কিন্তু এইবার ভগবান বোধ করি মুখ তুলে চাইলেন। অতি পরিচিত একটি কণ্ঠস্বর কানে এসে পোঁছল, 'এ কি, এখানে কি করছ? মুখ-চোখ এমন কেন? কি হয়েছে? কারুর কোন বিপদ-আপদ—?'

দুই চোখ তখনও অশ্রুতে ঝাপ্‌সা, তবু চিনতে দেরি হ'ল না। সেই বাষ্পাকুল চোখ দুটি তুলে শরতের দিকে তাকিয়েই সে যেন ফেটে পড়ল, 'তোমার মত পুরুষ যার স্বামী তার কি হতে বাকি থাকে, বল—সিঁথিতে সিঁদুর হাতে নোয়া থাকতেও শুনতে হ'ল যে আমি বেশ্যা!—এর চেয়ে বিধবা হওয়াও ঢের ভাল ছিল!'

বলতে বলতে ঝরঝর করে দুই চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় জল পড়তে লাগল। কোনমতে—কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারলে না সে।

তখনও পথে লোকজন বেশী চলতে শুরু করে নি বটে, তবু যে দু'একজন ওদিক দিয়ে যাতায়াত করছিল, তারা অবাক হয়ে চাইতে লাগল। বিব্রত শরৎ ব্যাকুলভাবে বললে, 'কী হয়েছে কি, ব্যাপারটা কি খুলেই বল না ছাই!—একটু এদিকে এসে, সবাই ফিরে ফিরে দেখছে—চল বরং কোম্পানির বাগানের ঐ বেঞ্চিটায় বসবে চল।'

'না, ওখানে বসতে আমি পারব না। সরকারী বাগানে বসে পরপুরুষের সঙ্গে কথা কইলেই আমার ষোল কলা পূর্ণ হয় বটে!'

পরপুরুষ!

কী একটা কৌতুক করতে গিয়েও শরতের উদ্যত রসনা লজ্জায় থেমে যায়।

'তা এখন ব্যাপারটা কি আমাকে বলবে তো! কে অপমান করলে তোমাকে?'

'ঐখানের একজন পোদ্দার। মুখের ওপরই আমাকে শুনিয়ে দিল যে সে আমাকে বেশ্যা বলে মনে করে এবং চোর বলে সন্দেহ করে!'

'তা তুমিই বা একা এমনভাবে পোদ্দারের দোকানে গিয়েছিলে কেন?'

'কী করব? আমার আর কে আছে বল! গয়না বেচতে হবে যখন, তখন পোদ্দারের দোকানে না গিয়ে উপায় কি?

'কী সর্বনাশ। তুমি কাউকে চেন না—জান না, গয়না বেচতে গিছলে? ওদের মধ্যে এক-একটা সাংঘাতিক লোক আছে!'

'উপায় কি! গোবিন্দর আজ তিন সপ্তাহ অসুখ। বড় ডাক্তার ডাকতে হবে, বাড়িতে একটা টাকা নেই। নিজের গয়না নয়, সে সবও তা ঘুচে গিয়েছে। সব সময় টিউশনিও থাকে না তেমন, বেচে বেচেই চালাতে হয়। এই বালাজোড়া গোবিন্দর বোয়ের জন্যে দিদিকে মা দিয়ে গিয়েছিলেন। এছাড়া আর কিছুই নেই বেচার মত!'

'ইস! তাই তো!'

শরৎ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ইতিমধ্যেই দূরে তিন-চারজন অলস কৌতূহলী লোক জমে গিয়েছে, এখানে এই অবস্থায় দেরি করা যায় না। সব সংকোচ দমন করে সে শেষ পর্যন্ত বলে ফেলে, 'শোন এক কাজ কর—তুমি

ফিরে যাও। বালা বেচতে হবে না। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে টাকা নিয়ে যাচ্ছি।'

অনেক—অনেকখানি ভরসা যেন। এই কথা, এই ধরনের কথা শোনা'বার জন্যেই তো তার নারি-জীবনের পূর্ণপাত্র সাজিয়ে বসে আছে সে—কতকাল, কতকাল ধরে। একটা স্বস্তির, একটা কৃতজ্ঞতার নিঃশ্বাসই বেরিয়ে আসে তার বুক থেকে—

কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে পড়ে যায় কয়েকদিন আগেকার একটি দৃশ্য। গাড়ি ঘোড়ার ভিড়ের মধ্যে একটি পুরুষ একটা স্ত্রীলোক, একেবারে গা ঘেঁষাঘেষি করে বেড়াচ্ছে আলো দেখে। পরস্পরের প্রতি একান্ত নির্ভরতা এবং প্রীতি তাদের মুখচোখে মাখানো।—

নিমেষে কঠিন হয়ে ওঠে উমার মুখ! সে বলে, 'না, পথ ছাড়। আমি বেচেই যাব এ বালা— যেমন করে পারি আমার দায় আমিই রাখব।'

দুই হাত জোড় করে শরৎ। মিনতি করে বলে, 'মান-অভিমানের সময় এ নয়। অন্তত গোবিন্দর অসুখের কথাটা ভাব। তুমি বাড়ি যাও!' আমি যাচ্ছি।

তবুও উমা কি বলতে যাচ্ছিল, শরৎ বাধা দিয়ে বলল, 'ধর, আমিই বাঁধা রাখছি বালাজোড়া। তুমি জান না, এ বেচতে গেলে তুমি আধা কড়িও পাবে না। মাঝখান থেকে বিস্তর অপমান ও বাঁকা কথা শুনতে হবে। তা ছাড়া দরকারের তো এই শেষ নয়। যদি সত্যিই কোন ভারী অসুখ হয়, গয়না বেচবার ঢের সময় পাবে। দোহাই তোমার, এখন তুমি বাড়ি যাও।'

উমা আর কিছুই বলতে পারে না! কিন্তু অকারণে আবারও তার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। সে শরতের দিকে তাকায় না, কোন কথাও বলে না—নিঃশব্দে বাড়ির পথ ধরে।

॥ ২ ॥

বড় ডাক্তার এসে তিন দিনেই জ্বর ছাড়িয়ে দিলেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে একটি ব্যবস্থা যা দিয়ে গেলেন তা এদের পক্ষে সাধ্যাতীত। বলে গেলেন, 'একে কোথাও চেঞ্জে পাঠানো দরকার। পশ্চিমের কোন জায়গায়, দেওঘর, মধুপুর বা ঐরকম কোথাও। নইলে আবার এই রকম হতে পারে—আর এবার হলে সারানো শক্ত হবে!'

শরৎ অনেক সাহায্য করেছে। তারও ছোট্ট কারবার আলাদা থাকে—সে একটা পুরো সংসার, এদিকে মা এখনও বেঁচে— বস্তুত দুটো সংসার চালাতে হয়। তাকে আর বলাও উচিত নয়। কমলাই বারণ করলে, বললে, 'কানে শুনলে হয়তো সে ধার-দেনা করেও দেবে। তাকে আর শোনাস নি।· ·যা হয় হবে।'

কিন্তু 'যা হয়টা যে কি তা কেউ বলতে পারে না। দুই বোন দুই বোনের মুখের দিকে তাকায়। অথচ ছেলেটার দিকেও চাওয়া যায় না। এই বছরেই ওর পাস দেবার কথা। আর দু' মাস পরে ওর পরীক্ষা। এই অবস্থায় পরীক্ষা দেবেই বা কী করে? পাসের পড়া নাকি দিনরাত পড়তে হয়। ভাত

যেদিন দেওয়া হল সেদিনই গোবিন্দ বইখাতা নিয়ে বসেছিল—কিন্তু আধ ঘণ্টা পড়ার পরই মাথা ধরে উঠল। কমলা এসে জোর ক'রে বই কেড়ে নিয়ে শুইয়ে দিলে।

অথচ এই 'পাসে'র দিকে চেয়েই আছে বলতে গেলে কমলা। চাকরি একটা হয়ত গত বছরেই হয়ে যেত। মালুর বাবার অফিসে, পনের টাকা মাইনের দপ্তরির চাকরি একটা খালি ছিল। মালুর বাবা নিজে থেকেই খবরটা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—'অফিসের চাকরি, কোনমতে ছুঁচ হয়ে সেঁধোনোর ওয়াস্তা তারপর ঠিকমত বড়বাবুকে তেল দিতে পারলে সে ছুঁচ ফাল হতে কতক্ষণ?'

শ্যামার বড় জামাই অভয়পদও একটা চাকরির খোঁজ দিয়েছিল। কারখানার চাকরি, লোহা-পেটানো কাজ বলে কমলার পছন্দ হয় নি। এত সাধের ছেলে তার, ওর বাবা কী দরের মানুষ ছিলেন, তার ছেলে করবে লোহা-পেটানো কাজ? থাক্ গে, এতদিনই যখন কষ্ট করে কাটল, কোমক্রমে আর একটা-দুটো বছর কাটবে না? একটা পাস করতে পারলে ভাল চাকরির অভাব কি? অনেক স্বপ্ন আছে কমলার, গোবিন্দ বড় সরকারী চাকরি পেলে কি কি করবে সে।

কিন্তু শরীরটাই যদি বিগড়োয় তো পাস করবে কে? এমনিতেই গোবিন্দর একটু বেশী বয়স হয়ে গেছে। এই পাড়াতেই ওর বয়সী অনেক ছেলে আছে তারা কেউ কেউ সামনের বছর দুটো পাস দেবে। একজন তো এ বছরই সে পরীক্ষা দিচ্ছে। গোবিন্দর স্বাস্থ্যও তেমন ভাল নয়, বুদ্ধিসুদ্ধি এখনও ছেলেমানুষের মত। নানা দুর্বিপাকের মধ্যে একটা বছর নষ্টও হয়ে গেছে।

এই সব দিনরাত তোলাপাড়া করে কমলা মনে মনে। ছেলের রক্তশূন্য মুখের দিকে চায় আর বুক শুকিয়ে ওঠে ওর।

উমার সঙ্গে রোজই রাত্রে পরামর্শ চলে তার, কোন দিন বলে, 'হ্যাঁ রে আসল দু'শ টাকা ওঠাব? কতই বা সুদের তফাত হবে? কষ্ট করে চালিয়ে নিতে পারব না?'

উমা বলে, 'সে টাকা তো যখন তখন ওঠানো যায় না শুনেছি। পারবে কি? অত হাঙ্গামা করবেই বা কে?'

'না হয় যে গয়নাগুলো বেচতে যাচ্ছিলি, সেইগুলোই বেচে দিই শেষ অবধি —কী বলিস?'

'কিন্তু দিদি টাকা হলেই তো হবে না। পাঠাবে কোথায়? কার সঙ্গে? সবাই মিলে গেলে একগাদা টাকা খরচা। মা সেবার গিয়েছিলেন রাঘব ঘোষালের সঙ্গে, কতগুলো টাকা গলে গেল, মনে নেই?'

সুতরাং কোন মীমাংসাই হয় না।

ডাক্তারের কথাগুলো বিভীষিকার মত ওদের দিনের আহার এবং রাত্রের তন্দ্রা

বিষাক্ত করে তোলে শুধু।

গোবিন্দের পড়াও হয় না। পড়তে পারে না সে কিছুতেই। ক্রমশ পরীক্ষার আশা সুদূরপরাহত হয়ে যায়।

শরৎ আসে মধ্যে মধ্যে, ফল-টল দিয়ে যায়। কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশী বসে না। তাকে দেখলে আজও চোখ জুড়িয়ে যায় কমলার। যেমন চেহারা তেমনি ভদ্র কথাবার্তা, তেমন বিবেচনা।·· সঙ্গে সঙ্গে উমার জন্য হাহাকার ওঠে মনের মধ্যে। এমন স্বামী ভোগ করতে পেলে না। কত বিচিত্র মানুষ হয়—আশ্চর্য। তাদের বরাতেই এমন শুধু আর কারুর তো এমন হতে শোনে নি!

ছেলের চিন্তার মধ্যেও কালীকে ডাকে সে, 'হে মা কালী, শরৎ জামাইয়ের সুমতি দাও মা। জোড়া পাঁঠা দেব তোমাকে। হে মা সংকটা মহাসংকট বার করব তোমার রাস্তার ধুলো খেখে।'

উমার মনের কথা মুখে ফোটে না ··শরৎ এলেই সে বাইরে চলে যায়। স্বামীর সঙ্গে কথা যে একবারে কয় না তা নয়, কিন্তু সে দৈবাৎ।

হেম আসে মাঝে মাঝে খবর নিতে।

এবার এল অনেকদিন পরে।

গোবিন্দর অসুখের সে কিছুই জানত না। এখন ওর শরীরের অবস্থা দেখে সে অবাক।

এরা কোন খবর দেয় নি। দেবার মত মানসিক অবস্থা বা অবসরও ছিল না। কিন্তু হেম যখন অনুযোগ করলে তখন কমলা মুখের ওপর সে কথাটা বলতে পারল না, এও বলতে পারলে না যে তাদের খবর দিযে কোন লাভও হ'ত না। চুপ করেই রইল।

একথা সেকথার পব চেঞ্জে যাবার কথাও উঠল।

হেম খানিকটা চুপ করে থেকে বলল 'একটা কাজ করলে হয় বড় মাসীমা। · আমার সেই জ্যাঠা এতদিন পরে এখানে এসেছে, জান?'

তাই নাকি? কবে রে?'

নরেনের দাদা দেবেন।

যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দেবার পর যখন আর কিছুই রইল না, তখন নরেন বিচলিত হয় নি কিন্তু দেবেন হয়েছিল। সে একদা বেরিয়ে গিয়েছিল নিজের ভাগ্যান্বেষণে·· বহু দূরে, পশ্চিমে কোথায় ··আর না কী এক জায়গায়। সে সব জায়গার নামও শোনে নি ওরা। খোট্টার দেশ, এই জানত। সেইখানেই কয়েকটা ওষুধ নিয়ে নাকি রাতারাতি ডাক্তার হয়ে বসেছিল। তখন এলোপ্যাথিক বলেই চালাত—এখন বুঝি হোমিওপ্যাথি বইও নিয়ে গেছে একখানা। কিছুদিন ডাক্তারি করার পর একদিন এসে স্ত্রীকে নিয়ে চলে যায়। আর একবার মাত্র এসেছিল এখানে, ওদের মা মরবার সময়—তার

পর আর কেউ কোন খবরই পায় নি। বেঁচে আছে কি মরে গেছে তাও কেউ জানত না।

'এই মাসখানেক হ'ল। অনেক খ‍ুঁজে খ‍ুঁজে আমাদের বার করেছেন। ওখানে গিছলেন এই দিন-পনেরো আগে।'

'তার পর? কী করছে রে?'

'সেই ডাক্তারিই নাকি করছেন এখনও। আমার সে দাদা মারা গেছে—জান? এখন আবার জ্যাঠাইমার খ‍ুব অস‍ুখ। তাই এখানে নিয়ে এসেছেন জ্যাঠাইমারই এক ভাই এখানে ব‍ুঝি ডাক্তার হয়েছে—মেডিকেল কলেজে চাকরি করে—তারাই ভরসায় এনে ফেলেছে। জ্যাঠাইমা নাকি বাঁচবে না।'

'তা তাঁর কথা কি বলছিলি?'

'ভাবছিল‍ুম জ্যাঠামশাই তো যাবেনই দিনকতক পরে। তাঁর সঙ্গে গোবিন্দকে পাঠালে কেমন হয়?'

'হ‍্যাঁ—তোর জ্যাঠাইমা রইল এখানে—তাকেই কে খেতে দেয় তার ঠিক নেই—তার সঙ্গে আমার রোগা ছেলে পাঠিয়ে তাকে আরও আতান্তরে ফেলি আর কি!'

কথাটা সেদিনকার মত ওখানেই চাপা পড়ে গেল।

কিন্তু একেবারে পড়ল না।

হেমের ম‍ুখে খবর পেয়ে শ্যামা এল বোনপোকে দেখতে।

বরাবর হেঁটেই আসে সে। সেদিনও ছোট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে এবং তার ওপরের বোনটাকে হাঁটিয়ে, দ‍ুটো ডাব এবং আরও কি কি ফল প‍ুঁটলি করে ঝ‍ুলিয়ে এই দীর্ঘ চার ক্রোশ হেঁটে এসে উঠল। হাঁটু অবধি ধ‍ুলো, চোখ-ম‍ুখের অবস্থা দেখলে আতঙ্ক হয়; মেয়েটা তো নেতিয়ে পড়েছে।

'কেন এ কাজ করিস শ্যামা, কোনদিন পথেই ম‍ুখ থ‍ুবড়ে মরবি। তুই নিজে যা হয় কর, ঐটুক‍ু মেয়েকে হাঁটিয়ে এনেছিস কী বলে?'

'ওদের অত কষ্ট হয় না। সারা দ‍ুপ‍ুরই তো টো টো করে ঘ‍ুরে বেড়ায় এ-বাগানে ও-বাগানে—এক দন্ড কি পায়ের বিশ্রাম আছে! সবটা জড়িয়ে ক ক্রোশ হয় তা দ্যাখ না!'

হ‍্যাঁ—সেই সঙ্গে এতটা পথ একটানা হেঁটে আসা সমান হ'ল?'

'একটানা তো আসি নি। পথে অনেকবার বসেছি। একটানা পারব কেন?···আমার সঙ্গে দ‍ু'দ‍ুটো মোট। হাত বদলালেও মাঝে মাঝে বসতে হয়। পথে খাইয়েও নিয়েছি ওকে। ক্ষ‍ুদভাজার নাড়‍ু গোটাকতক করে নিয়ে বেরিয়েছিল‍ুম, তাই ওকে দ‍ুটো দিয়েছি, নিজেও খেয়েছি।·· গোবিন্দকে খেতে দেবে কিনা জানি না তো, তবে ওর জন্যেই আরও করা। খেতে ভালবাসে—খাবে কি খাবে না, খানিক দোনোমোনা করে শেষ অব্দি নিয়েই এল‍ুম। খায় খাবে, নয়তো উমি খাবে'খন।'

পুঁটলির একপ্রান্ত থেকে নাড়ু বার করে কলাপাতায় জড়ানো।

ক্ষুদের নাড়ু— অর্থাৎ চালের ক্ষুদ ভেজে গুঁড়িয়ে গুড় দিয়ে নাড়ু বাঁধা।

সরকার বাড়িতে চালের ক্ষুদ দিয়ে আগে মাছ কেনা হ'ত—আজকাল মেছুনীরা নিতে চায় না, সেই ক্ষুদগুলো শ্যামা সংগ্রহ করে। বেশী জমলে ডাল বা ডালের ক্ষুদ মিশিয়ে এক-আধ দিন খিচুড়ি হয়, আর নইলে গুড়ের যদি যোগাড় থাকে—এই মিষ্টান্নটি তৈরী হয়। প্রথম একদিন খুব সংকোচের সঙ্গেই শ্যামা এনেছিল এ বাড়ি, কিন্তু গোবিন্দ খুব উৎসাহ প্রকাশ করায় আজকাল প্রত্যেকবারই এই পদার্থটি তৈরী করে আনে। ক্ষুদের নাড়ু কি নারকেল নাড়ু। নারকেল সংগ্রহ করা কঠিন আজকাল - সরকার বাড়ির ছেলেমেয়েরাও কান খাড়া করে থাকে কখন একটা নারকেল পড়বে—সেই শব্দের দিকে। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে যোগাড় করা কঠিন। তা ছাড়া হাতে পেলেও খরচ করতে মন চায় না। নারকেল বিক্রি হয় সহজে। তাই নারকেল ভেঙে নাড়ু করা আর বড় একটা হয়ে ওঠে না।···

মুখহাত ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে শ্যামা বললে, 'আরও ঐ জন্যেই এলুম আমি। হেম যেদিন ফিরল এখান থেকে—কী বার যেন, হ্যাঁ সোমবার, অফিস ক'রে বাড়ি ফিরল তো—সেইদিনই বটঠাকুর গেলেন আবার। হেমের মুখে সব শুনে ওকে দিয়েই কথাটা বলালেন।—ও'র খুব ইচ্ছে, বললেন, আমার তো বাড়ি পড়েই আছে। চাকরও আছে রাতদিনের। দুটো ভাত ফুটিয়ে নেওয়া, তা আমাকে গিয়ে তো করতেই হবে, আর তোদের জ্যাঠাইমা তো ছ-মাস পড়ে, সেই আমাকেই তো সব করতে হয়েছে। আমি যদি একমুঠো ফুটিয়ে নিতে পারি ওকেও তা থেকে দিতে পারব। তার জন্য আমার বাড়তি কোন খাটুনি তো নেই। চমৎকার জায়গা, জলহাওয়া খুব ভাল চটপট সেরে উঠবে। টাকায় ষোল সতের সের দুধ···তাও আদ্দেকদিন কিনতে হয় না, রুগীরাই ঘটি ঘটি দুধ দিয়ে যায়। দুধ-ঘি অজস্র, তবে হ্যাঁ, মাছ পাওয়া যায় না। তা আমি শুনে ভাবলুম গোবিন্দ তো আমাদের মাছের তত ভক্তও নয়। ডালটাই ভালবাসে বেশী। যাক না, ঘি-দুধ আছে যখন, জলও ভাল, চটপট সেরে উঠবে। লোকটা যখন অত আগ্রহ করে নিয়ে যেতে চাইছে—কী বলিস উমি?'

প্রস্তাব খুবই লোভনীয়, বিশেষ যখন কোথাও পাঠানোর কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না। বরং কতকটা দৈবপ্রেরিত বলেই মনে হয়।

তবু উমা খানিকটা চুপ করে থাকে। একটু পরে বলে, 'তোমার আত্মীয় তুমি বুঝে দ্যাখ। এর পর এ নিয়ে কোন কথা-টথা উঠবে না তো?'

'কথা আবার কি উঠবে? আর ওঠে উঠবে। আমাদের যখন দরকার তখন অত ভাবলে চলবে কেন? যেমন করে হোক আমাদের দিন কিনে নিতে পারলেই হ'ল। এর পর কথা উঠলেও কাজটা তো ফিরবে না!'

সংসারের বাস্তব-পাঠশালায় শ্যামা এই জ্ঞানই লাভ করেছে—সহস্র অভিজ্ঞতার ফল এটা।

প্রয়োজনের কাছে কিছুই বড় নয়—দুটো কথা তো তুচ্ছ !

গালাগাল গায়ে বেঁধে না, দুর্নাম তো নয়ই।

অপমানের জ্বালা ?

ক্ষুধার জ্বালা তার চেয়ে ঢের বেশী সত্য, ঢের বেশী বাস্তব।

যাদের পেট ভরা আছে, তারাই মানুষের 'কথা' নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে।

শ্যামা আবারও কণ্ঠস্বরে জোর দেয়, 'রেখে বোস্‌ দিকি। কে কী বলবে আর কে কি ভাববে সে কথা এখন ভাববার সময় নয়। যেমন ক'রে হোক ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে তো।'

তা বটে। কিন্তু তবু উমা খুঁত খুঁত করে। বলে, 'সেখানে গিয়ে যদি আবার অসুখ-বিসুখ করে ? রোগা ছেলে—ওর একটু তোয়াজও দরকার। সে ভদ্দরলোক শেষ অবধি যদি বিপদে পড়েন ? দূরের পথ, হুট্‌ করতেই গিয়ে পড়তে পারব না। তা ছাড়া সে বাড়িতে মেয়েছেলে নেই. আমাদের যাওয়াও চলবে না। ...সব কথাগুলো ভেবে দ্যাখ দিদি ভাল করে।'

কমলার মায়ের প্রাণ। ছেলের রোগপাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে তারও আশার দিকটাই দেখতে ইচ্ছে করে।·· শ্যামার মতো সে-ও প্রয়োজনটাকেই আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে।

গলায় জোর দিয়ে বলে, 'সে-ও তো একটা ডাক্তার. এতদিনে কি আর কিছুই শেখে নি !···নইলে ওখানকার লোক এখনও তাকে পয়সা দিচ্ছে কেন ? ঐ ক'রেই পেট চালাচ্ছে এটা তো ঠিক। কিছু একটা হলে সে কি আর একটু-আধটু ওষুধ দিতে পারবে না।'

'একটু-আধটু ওষুধ তো এখানকার দুজন ডাক্তার দিয়েছিল দিদি, কী হ'ল তা তো দেখলেই।'

'তা তোর বড় ডাক্তারই তো ওকে চেঞ্জে পাঠাতে বলছে। সব জায়গাতেই যে আর. এল. দত্ত নেই—সে কথা সে-ই তো সব চেয়ে বেশী জানে !'

উমা দিদির মনোভাব বুঝে চুপ করে যায়।

সত্যিই—কীই বা করবার আছে। এখানে একতলার এই স্যাঁতসেঁতে ঘরে রেখেই কি বাঁচাতে পারবে ? সেখানকার টানের হাওয়াতে আপনিই ভাল হয়ে উঠবে হয়তো।

তার নীরবতাকে সম্মতি বলে ধরে নিয়ে কমলা সাগ্রহে প্রশ্ন করে শ্যামাকে, 'তা হলে তার সঙ্গে যোগাযোগটা হবে কি ক'রে ?'

'এই তো কাছেই থাকেন বট্‌ঠাকুর। ঝামাপুকুরে মামাশ্বশুর-বাড়ি উঠেছেন যে ! এখান থেকে নাকি বেশি দূরে নয়। আমি ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি তাঁকে যাবার আগে দেখা ক'রে যাবেন। যদি তোমাদের পাঠানো মত হয় তো উনিই এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবেন যাবার আগে।

দেবেন সত্যি-সত্যিই একদিন এদের সঙ্গে দেখা করতে এল। দিন তার ঠিকই ছিল …দিন এবং গাড়ির সময়ও জানিয়ে দিয়ে গেল। বললে, 'মোটঘাট থাকবে সঙ্গে, গাড়ি করতেই হবে একটা ··অমনি ওকে তুলে নিয়ে যাব।…ওর সঙ্গে কিছুই দেবেন না, শুধু ওর জামা-কাপড় দিলেই হবে। বিছান-ফিছানা সেখানে ঢের আছে—সে সব কিছু লাগবে না।'

কমলা কথা কয় নি। মাথায় ঘোমটা টেনে দূরে বসে ছিল। উমাই আসন পেতে বসালে, জলখাবার দিলে। কথাও কইতে হ'ল তাকে। বললে, 'দিদি এখনও ভাল হলেন না—আপনি চলে যাচ্ছেন, তিনি তো আরও কাতর হয়ে পড়বেন!'

'তা কী করব বল। আমাকে তো ক'রে খেতে হবে। আর এক ব্যাটা ডাক্তার এসে বসেছে যে সেখানে। এ-ই তাই আমি দেড়মাস নেই, রুগীগুলো সব বোধ হয় তার খপ্পরে গিয়ে পড়ল।·· তোমাদের দিদি আর কি বাঁচবে—শেষ অবধি হয়তো মরবেই—মিছিমিছি আমার রুজি-রোজগারটা খোয়াই কেন?'

একটু যেন চটেই ওঠে সে।

অগত্যা উমা চুপ ক'রে যায়।

এই ধরণের মানুষের সঙ্গে ঐটুকু ছেলেকে পাঠাতে তার মোটেই ভাল লাগে না কিন্তু আর কোন উপায়ও যে নেই। 'এবার হলে সারানো শক্ত হবে' ডাক্তারের সাংঘাতিক কথাগুলো কানে বজ্রগর্জনের মতই নিত্য ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।… তা ছাড়া কমলা যেন প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে প্রস্তাবটাকে। এখন বাধা দিতে গেলে অনেকখানি ঝুঁকি নিয়েই দিতে হয়। এর পর…ঈশ্বর না করুন যদি সত্যিই গোবিন্দর কোন সংকটাপন্ন অসুখ হয়…উমা মুখ দেখাতে পারবে না দিদির কাছে।…

সুতরাং যাওয়াই সাব্যস্ত হয়।

নির্দিষ্ট দিনে দেবেন এসে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়।

গোবিন্দ এই সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষটার সঙ্গে যেতে আগে রাজী হয় নি। এতদিন পর্যন্ত মাকে ছেড়ে সে থাকে নি কোথাও এক দিনও—ইদানীং উমা ওদের সঙ্গে বাস করতে আসার সময় থেকে মাসীও তার জীবনের অপরিহার্য অঙ্গরূপে জড়িয়ে গেছে—এই দুজনের স্নেহাঞ্চল থেকে এই প্রথম তার বাইরে যাওয়া। বিদেশে যাওয়ার আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য তার কম নেই·· তাই বলে এই কাঠ-খোট্টা অপরিচিত মানুষটার সঙ্গে অত দূর দেশে যেতে তার একটুও ভাল লাগছিল না। নিতান্ত মা অনেক ক'রে বুঝিয়ে বলাতেই সে রাজী হয়েছে। তা ছাড়া এইভাবে ইস্কুল কামাই ক'রে ঘরে বসে থাকতেও তার খুব বিশ্রী লাগছিল—দুর্বল শরীর, মা-মাসীর পুতুপুতু ভাব, অর্ধেক জিনিস খাওয়া নিষিদ্ধ, এগুলোও প্রীতিকর নয়

একটুও। যদি দু-চার দিন বাইরে থেকে ঘুরে এলে সহজ স্বাচ্ছন্দ জীবন ফিরে পাওয়া যায় তো না হয় চোখ-কান বুজে কাটিয়েই দেবে। কিন্তু তবু গাড়িতে বসে মা-মাসীর মুখের দিকে চেয়ে তার দুই চোখ জ্বালা ক'রে জল ভরে এল। গলির বাঁকে বাড়ি এবং মা-মাসী অদৃশ্য হবার আগেই তার ঝাপ্‌সা চোখের সামনে থেকে তারা মুছে গেল।

এরপর দুটো দিন কমলা এবং উমার আহার-নিদ্রা রইল না। এমন কি দুজনে যেন নিঃশ্বাসটাও ধরে রেখেছিল উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায়। গোবিন্দর নিজের হাতের লেখা পোস্টকার্ডখানা এসে পৌঁছতে তবে প্রথম ওদের স্বাভাবিক নিঃশ্বাস পড়ল।

তারপর শুরু হ'ল দিন গোনা।

মুশকিল এই যে কতদিন থাকলে ডাক্তারের মতে 'চেঞ্জ' হয়, তা এরা কেউই জানে না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করাও হয় নি। তেমনি কী ক'রে এবং কার সঙ্গে গোবিন্দ ফিরবে তাও এরা জানে না। দেবেনকে সে প্রশ্ন করার কথা মনেও পড়ে নি। স্ত্রী সাংঘাতিক অসুস্থ যার সে মাঝে মাঝে আসবে নিশ্চয়ই। এবং যেমন সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে তেমনি আবার যেদিন আসবে সঙ্গে ক'রেই নিয়ে আসবে এই রকম একটা বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল আপনা-আপনিই।

ওরা দিন গুনতে থাকে প্রথম থেকেই। এক দিন এক দিন ক'রে সপ্তাহ, সপ্তাহ থেকে পক্ষ এবং পক্ষ থেকে যখন মাস গড়িয়ে গেল তখন এরা দুজনেই হাঁপিয়ে উঠল। চিঠি দেয় গোবিন্দ নিয়মিতই— তবে চিঠি ও মানুষে অনেক তফাত। শেষে কমলা উমাকে দিয়ে দেবেনের নামেই চিঠি লেখালে—অনেকদিন তো হয়ে গেল, এতদিনে নিশ্চয়ই গোবিন্দ সুস্থ হয়ে উঠেছে। যদি ও'র এখন দু' চার দিনের ভেতর আসার সম্ভাবনা না থাকে তো আর কোন চেনা লোককে দিয়ে পাঠানো যায় না? পড়াশুনোর ক্ষতি হচ্ছে তা ছাড়া উমাদেরও অসুবিধা হচ্ছে খুব। বাজার-হাট করার দ্বিতীয় কোন লোক নেই। ইত্যাদি—

পরের ডাকেই দেবেনের জবাব এল।

সে লিখছে ··

'পরম শুভাশীর্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ এই যে তুমি একান্ত বুদ্ধিমতী হইয়াও এমন অবুঝের মত পত্র লিখিয়াছ কেন বুঝিলাম না। হাওয়া বদল করিতে গেলে কোথাওকার জলহাওয়া সহ্য হইতেই পনেরো দিন লাগিয়া যায়। শ্রীমান আসিয়াছে মাত্র এক মাস, ইহারই মধ্যে কী এমন তাহার গায়ে শক্তি বাড়িবে? এতই কষ্ট যখন করিয়াছ তখন অধীর হওয়ার কোন অর্থ নাই। আরও কিছুদিন চালাইয়া লও, আগামী মাসের প্রথম দিকে আমার যাওয়ার কথা আছে, সেই সময় আমিই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। এখানে তেমন কোন আস্থা-ভাজন লোক নাই যে নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীমানকে পাঠাইব। তোমার দিদিকে আমার নমস্কার জানাইবে, তুমি আমার আশীর্বাদ লইবে।' ইত্যাদি···

আরও এক মাস!

দুজনের কারুরই ভাল লাগল না কথাটা। এতদিনে হয়তো পড়াশুনো সব ভুলেই বসে রইল। তার ওপর কেমন জায়গা, মানুষজন সব কেমন কিছুই জানা নেই—কাদের সঙ্গে মিশছে, স্বভাব বিগড়োচ্ছে কিনা তাই বা কে জানে। ···মানুষটিও তো ঐরকম, চোয়াড় কাঠখোট্টা ওর হাওয়াও বেশীদিন গায়ে লাগা ভাল নয়।

উমা অপ্রসন্ন মুখে বলে, 'কে জানে লোকটাব মতলব কি। আমার বাপু ভাল লাগছে না রকম-সকম।'

কমলা ভেতরে ভেতরে তেমন আশ্বাস বোধ না করলেও মুখে জোর দেয়, 'মতলব আবার কি! তোর যেমন কথা!'

'বলা যায় না! মেজ জামাইবাবুর দাদা তো।'

॥ ৪ ॥

চিঠিখানা পাবার বোধ হয় তিন চার দিন পরেই হঠাৎ দেবেন এসে হাজির হ'ল। সে একা—গোবিন্দ আসে নি সঙ্গে।

বিবর্ণ মুখে কোনমতে প্রশ্ন করলে কমলা, 'খোকা, আমার খোকা কোথায়?'

সে যে দেবেনের সঙ্গে কথা বলে নি এর আগে কোনদিন, তাও ভুলে গেল।

'ভয় নেই, সে ভাল আছে। আমি এধার থেকে টেলিগ্রাম পেবে হঠাৎ চলে এসেছি। তোমাদের দিদির খুব বাড়াবাড়ি—বোধ হয় এই শেষ অবস্থা।'

'তা তাকে নিয়ে এলেন না কেন?' উমা প্রশ্ন করে, 'সে একা রইল ওখানে·'

'ঠিক একা নয়। ঐ হতভাগা বাঁদরটা গিয়ে পড়ল কিনা। আমারও হঠাৎ চলে আসা—বাঁদরটা বললে, আমি এলুম সবে, অমনি চলে যাব? আমিও থাকি গোবিন্দও থাক। তুমি যদি এর ভেতব না এসো তো আমি ওকে নিয়ে দিন-সাতেক পরে রওনা হব।'

সহস্র আশঙ্কায় কণ্টকিত উমা প্রশ্ন করলে, 'কে গিয়ে পড়ল? কার কথা বলছেন?'

'কে আবার? তোমার গুণধর মেজ জামাইবাবু। বৌমা তো ঠিকানা জেনেছেন—সেখান থেকে ঠিকানা জেনে বিনা টিকিটে মূর্তিমান গিয়ে হাজির একেবারে।'

'কী সর্বনাশ!' প্রায় অসাড় কণ্ঠ থেকে শব্দটা আপনিই বেরিয়ে যায়।

দেবেন যে এবার একটু বিরক্তই হয়। বলে. 'ও আবার কী কথা! সর্বনাশ আবার এর মধ্যে কী হ'ল। সে কি বাঘ না ভালুক যে তোমাদের ছেলের কাঁচা মাথাটা কড়মড় ক'রে চিবিয়ে খাবে? · সাত দিনে এমন কি সর্বনাশ করবে শুনি? ·· এত যদি তোমাদের ভয়—এত নিধি যখন—তখন বাপু তোমাদের ছেলে চোখ-ছাড়া করা উচিত হয় নি। তা ছাড়া ছেলেও তো বললে—মেসোমশায় যখন এসেছেন, দু দিন থেকেই যাই। তাদের খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা করে রেখে

এসেছি। খুচরো টাকা পয়সা দিয়ে এসেছি গোবিন্দর হাতে -পাছে ঐ হতচ্ছাড়া ছোঁড়া উড়িয়ে দেয় সব—ভয়টা কিসের এত ?'

এরপর আর কথা বলা চলে না। কুটুম্ব মানুষ—সেধে উপকারই করতে এসেছে। কী-ই বা বলা যায় আর!

কিন্তু নেয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে স্বস্তি থাকে না এদের।

উমা বলে, 'চল দিদি, আমরা দুজনে চলে যাই, ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি! জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে চলে যাব এখন ঠিক!'

'ওমা কী বলিস!' কমলা অবাক্ হয়ে যায় উমার কথা শুনে, 'দু-দুটো সোমথ মেয়েছেলে একলা যাব এতটা পথ? কোন্ দিক দিয়ে কী ক'রে যেতে হয় তাই তো জানি নে!'

'সেটা জেনে নিলেই হবে দিদি। কত তো কাঙাল-গরীবের মেয়েছেলে একা একা ঘুরছে। আমরাই বা তার চেয়ে এমন ভাল কিসে?'

'দ্যাখ্ না -সাতটা দিনই তো! এর মধ্যে সে আর কী করবে তোর ছেলের?'

'কী যে সে না করতে পারে তা তো জানি না! হয়তো এর মধ্যেই মদ ভাঙ্ খাওয়াতে শেখাবে—তা দ্যাখ!'

উমার আশঙ্কা যে সত্য হয় তাই নয়—সত্য কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়।

সাতদিনের দিন গোবিন্দ নয়—একখানা চিঠি এসে পৌঁছল। চিঠির লেখক নরেন। উমাকে সম্বোধন ক'রে লেখা।

যদিচ চিঠির ভাষা প্রাঞ্জল, অজস্র বর্ণাশুদ্ধি থাকলেও দুর্বোধ্য নয়—তবু দুই বোনই চিঠিখানা বারতিনেক ক'রে পড়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। মনে হ'ল যেন ও-চিঠির বর্ণও তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নি।

নরেন লিখেছে—

'পরম সুভাসীর্বাদ সুভস্ত বিষেস ঃ—

কল্যাণীয়া উমা, একটি পরম সুভসংবাদ জানাইয়া এই পত্র দিতেছি। শৃমান গোবিন্দর পিত্রিদেব জিবীত নাই, কিন্তু আমরা আছি, তাহার প্রতি অভিভাবকদের যাহা কত্তব্য তাহা অবস্যই আমরা প্রাণপণে করিয়া যাইব। অবস্য যতটা সামথ্যে কুলায়। শৃমান গোবিন্দ বয়সপ্রাপ্ত হইয়াছে—দশবিধ সংস্কারের পর পর ক্রেম অনুসারে এখন তাহার বিবাহ দেওয়া আবস্যক। আমার শর্গগত জৈষ্ট ভায়রা বাঁচিয়া থাকিলে সে কত্তব্যের কথা আমাদের ভাবিতে হইত না, তিনিই ভাবিতেন। কিন্তু কী বলিব আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি অকালে গত হইলেন। যাহা হউক শৃমানের খুব সাধ সে একটি যোগ্য পাত্রি দেখিয়া বিবাহ করে, তাহার সাধ-আহ্লাদ মিটানো আমাদের কত্তব্য। এমত বিধায়, আগামী কালই এঁ মাসের শেস বিবাহের দিন থাকায় -কালই একটি সুপাত্রির সহিত তাহার বিবাহ সম্পন্য করাইয়া দিয়াছি। পাত্রিটি শৃমানদের পাল্টি ঘর—নৈকস্য কুলীন। দেখিতে দিব্য সুশৃ। পাত্রি দেখিয়া শৃমান বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছে। যাহা হউক আজ কুসুমডিঙা সারা হইল, আমি আগামী কাল ফুলসজ্জা সারিয়া আগামী পরশু ছেলে বৌ লইয়া

রওনা দিব। তোমরা সব ঠিক করিয়া রাখিও। দিদিকে প্রণাম দিও, তুমি আশীর্ব্বাদ লইও। যদি পারো তো সে মাগীকেও একটা সংবাদ দিও। ইতি— নিয়ত আশীর্ব্বাদক শ্রীনরেন্দ্র নাথ সম্মা।'

॥ ৫ ॥

চিঠিখানা যখন আসে তখন উনুনে রান্না চড়েছিল ওদের। তরকারিটা পুড়ে কয়লা হয়ে সেটাও যখন জ্বলে উঠল—তখন চৈতন্য হ'ল। উনুনটা একেবারে নামিয়ে দিয়েই এসে বসল উমা। আহারের কথা—অথবা আহার্য প্রস্তুত করার কথা এখন আর কল্পনা করারও সম্ভব নয়।

সর্বনাশ যা হবার তা হয়েই গেছে। কোথাও কিছু বাকী রাখে নি নরেন।

বিয়ে শুধু নয়—কুশণ্ডিকাও শেষ ক'রে তবে চিঠি দিয়েছে—সে চিঠি পাবার আগেই সম্ভবত বৌভাত এবং ফুলশয্যার অনুষ্ঠান সারা হয়ে গেছে। কে করলে সে সব ব্যবস্থা—কারা করলে বা কী অধিকারে করলে সে প্রশ্ন অবান্তর। সেরকম তুচ্ছ কথা নিয়ে বা সংস্কার নিয়ে মাথা ঘামাবে এমন পাত্র নরেন নয়।

অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ পরে শুষ্ক কণ্ঠ দিয়ে কমলার স্বর বেরোয়। সে কেমন এক রকম অশ্রুর মতই করুণ হাসি হেসে কতকটা অসংলগন ভাবে বলে, 'ঠাট্টা করেছে বোধ হয় নরেন জামাই—কী বলিস?'

উমা জবাব দেয় না। তার দুই চোখ দিয়ে আগুন বেরিয়ে আসে।

কেন, কেন ও লোকটা তাদের এমন সর্বনাশ করবে?

কেন, কেন—কী অধিকারে?

'এবার এলে আমি তাকে জুতো মারব দিদি! গুরুজনই হোক আর যাই হোক! তুমি দেখে নিও!'

কমলা সে কথার উত্তর দেয় না। এসব কথা তার মাথাতেই ঢোকে না।

বিশ্বাসও হয় না হয়তো।

প্রাণপণে ঝাপ্সা চোখ দুটো মুছে আবার ও চিঠিটা পড়ে।

উমা দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'এ বিয়ে আমরা মানব না দিদি, ও বউ আমরা নেব না। যার সঙ্গে ষড় ক'রে করেছে তার কাছেই রাখুক মেয়ে! তারা জানে না, নেকা! মা রইল এখানে, তাকে জানানো হ'ল না—বিয়ে দিয়ে দিলে!'

কমলা একটু ভয়ে ভয়ে তাকায় বোনের দিকে, কতকটা যেন মিনতির মতই বলে, 'কিন্তু মেয়েটার দোষ কি বল। যদি সত্যিই জাতের মেয়ে হয় তো—বাপ-মার পাপে তাকে অত বড় শাস্তি কী ক'রে দিবি? নিজের কথাটা ভেবে দ্যাখ্ উমা, মেয়েছেলের এত বড় অভিশাপ আর নেই।'

চাবুকের মতই কথাটা এসে পড়ে উমার বুকে।

সত্যিই তো, সে নিজেই তো সবার ঘৃণিত, অভিশপ্ত। বিনা অপরাধে এই গুরু দণ্ড বহন ক'রে চলেছে, সে আবার পরকে দণ্ড দেবার কথা মুখে আনে কোন্ লজ্জায়!

নির্জনে গিয়ে চোকাঠে নিজে-নিজেই মাথা খোঁড়ে।

আজ দিদির মুখেও এ খোঁটা তাকে শুনতে হ'ল!

সে দিন এবং সে রাত্রি কাটল দুই বোনের অব্যক্ত এক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে।

ছেলের মা, অকারণে নিরম্বু থাকতে নেই, তাতে ছেলের অকল্যাণ হয়—শুধু সেইজন্যেই রাত্রে একটু গুড় গালে দিয়ে দুই বোন জল খেলে এক ঘটি ক'রে—তাও উমাই কথাটা মনে করিয়ে দিলে। কমলার সে স্তম্ভিত ভাবটা সারা দিনেও কাটে নি।

ভোরবেলা দেবেন এল রাধারাণীর মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে।

পরশু শেষ রাত্রে মারা গেছে সে। কাল দুপুরে ফিরেছে ওরা শ্মশান থেকে। তার পর আর আসা হয় নি। আজ ভোরেই বেরিয়ে পড়েছে।

কমলা এবং উমা দুজনেই ছলছল চেখে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সামান্য পরিচয় ওদের, কিন্তু শ্যামার মুখে দুজনেই অনেক কথা শুনেছে—অনেক দিনের অনেক কাহিনী। সে হিসেবে ওদের খুবই পরিচিত যেন।

দেবেনের মুখের দিকে তাকানো যায় না—সে যেন দু'দিনেই অনেকখানি বুড়ো হয়ে গেছে। বাহ্যত কোন শোক প্রকাশ করলে না বটে, সহজ এবং সাধারণ ভাবেই সংবাদটা দিলে কিন্তু ঠিক অত সহজে যে সে ঘটনাটা' নিতে পারে নি তা স্পষ্টই প্রকাশ পেল ওর চেহারায় এবং উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে। রগ দুটো যেন আরও বসে গেছে, চোখের কোলে গভীর কালি, গাল দুটো ঢুকে গেছে মুখের ভেতর—এমন কি চুলগুলোও যেন বেশ পাকা দেখাচ্ছে।

দু'একটা কথার পরই দেবেন হঠাৎ প্রশ্নটা ক'রে বসল—'সে আসে নি, নরেন? করছে কি এখনও?'

এই শোকের মুখে সংবাদটা দেওয়া উচিত হবে কিনা কমলা মনে মনে এতক্ষণ এই চিন্তাই করছিল—কথাটা উঠতে সে নীরবে চিঠিখানা বার ক'রে ওর সামনে ফেলে দিলে।

দেবেন চিঠি পড়ে ক্ষেপে উঠল একেবারে।

'আমি ওকে খুন করব। ওকে গুলি করে মারব। জুতো মারতে মারতে মেরে ফেলব—হারামজাদা শুয়োরের বাচ্ছাকে। ওর গলায় পা দিয়ে জিভ টেনে বার করব! কী ভেবেছে ও? আমি মরে গেছি!···ছি ছি, এত বড় আস্পদ্দা ওর! নিশ্চয় ঘুষ খেয়েছে দিদি, মোটা টাকা খেয়েছে। নৈকুষ্য কুলীন না ছাই—এ সেই ভুবন ঘোষালের দামড়া মেয়েটা! আমি বাজি রেখে বলতে পারি। মেয়েটা যদি গোবিন্দর চেয়ে বয়সে বড় না হয় তো কী বলেছি!'

সে যেন দাপাদাপি ক'রে বেড়াতে লাগল।

চেঁচামেচিতে বাড়িওয়ালারা সচকিত হয়ে উঠলেন। উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল দু'একজন। আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বুড়ী গিন্নীরই বেশী। রসালো প্রসঙ্গের আভাস পেয়ে তাঁর দৃষ্টি লুব্ধ হয়ে উঠল।

কমলা বিপন্ন হয়ে বললে, 'আপনি শান্ত হোন। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। বিয়ে তো আর ফিরবে না—হিন্দুর বিয়ে, শালগ্রাম শিলা আগুন আর ব্রাহ্মণ সামনে রেখে ভার যদি সে নিয়েই থাকে—'

'কিসের ভার নেওয়া, কিসের বিয়ে!—বার করছি সব! বাড়ি ঢুকতে দেবেন না—একদম চৌকাঠের বাইরে থেকে মেয়েটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দেবেন —সেজন্য দায়ীক আমি।…উ'—গছিয়ে অমনি দিলেই হ'ল!'

আর এক পাক যেন নেচে এসে অপেক্ষাকৃত নরম গলায় আবার বললে, 'ওরা তিন পুরুষ ঐখানেই আছে ক্ষেত-খামার দেখে, জমি জায়গা নিয়ে নেড়ে চেড়ে খায়। একদম দেহাতী চাষা, বুঝলেন? ওদের মেয়ের বিয়ে হবে কোথায়— কে নেবে? ওখানে তেমন বাঙ্গালীই নেই, বামুন তো খুব কম।·যা আছে দূরে দূরে—কে বা সম্বন্ধ করে আর কে বা কি!—মেয়েটা এমনি দেখতে মন্দ নয় কিন্তু কালো। তার ওপর নেই বাপের পয়সার জোর।—গোবিন্দকে দেখে এস্তক্ ছোঁক ছোঁক করছে, ভরসা ক'রে আমার কাছে কথাটা পাড়তে পারে নি। পাড়তে এলে ধুধ্‌ধুড়ি নেড়ে দিতুম—তা জানে। এখন আমি নেই·ঐ হারামজাদা শুয়োরের বাচ্ছাকে ঘুষ খাইয়ে কাজ সেরে নিয়েছে। জাতটা তো বাঁচল—তার পর তুমি নাও না-নাও, না হয় ঘরেই পুষবে। এম্‌নেও পুষতে হচ্ছিল অম্‌নেও পুষবে। কম ফন্দিবাজ ধুত্ত্‌ মানুষ ঐ ঘোষালটা!'

আরও খানিকটা চেঁচামেচি ক'রে দেবেন উঠে পড়ল।

'আমি চল্লুম হাওড়া ইস্টেশনে। ঐখানে জুতো মারতে মারতে যদি গোরবেটাকে মেরে না ফেলি তো আমার নাম নেই। ঐখান থেকেই সে ছুঁড়ীকে আমি ফিরিয়ে দেব—কিচ্ছু ভাববেন না।'

কমলা এবং উমা দুজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

উমা বললে, 'কাল থেকে আপনার নিশ্চয়ই খাওয়া-দাওয়া হয় নি, আপনি ব্যস্ত হবেন না। বসুন একটু। অন্তত একটু জল খেয়ে যান। আমাদের অদৃষ্ট— আপনি আর কি করবেন?'

দেবেন প্রথমটা প্রবল আপত্তি তুলল।

'না, না। ওসব থাক। আর একদিন হবে। আমার মন-মেজাজের ঠিক নেই ছোড়দি। ওসব ভাল লাগছে না। ছি ছি, বলতে গেলে জোর ক'রেই আমি নিয়ে গেলুম ছেলেটাকে—যদি রেখে না আসতুম তো এমন কাণ্ড ঘটত না। …এর বারো আনা দায়ীক যে আমি হয়ে পড়লুম!'

আরও খানিকটা পীড়াপীড়িতে একটু বসে এক ঘটি শরবত খেয়েই রওনা দিলে সে।

যাবার সময় কমলা বলে দিলে, 'যা হবার হয়ে গেছে উমা, ওঁকে বুঝিয়ে বলে দে মিছিমিছি এর ওপর আর কেলেঙ্কার না করেন!'

দেবেন চলে যেতেই মালতীরা ভিড় করে এসে দাঁড়াল।

মালতীর ঠাকুমা বললেন, 'কী হয়েছে গা মেয়ে—বলি ব্যাওয়াটা কি ?'

তাঁর রসনা সরস হয়ে উঠেছে ভালরকম একটা কেলেঙ্কারির গন্ধ পেয়ে, ধৈর্য ধরা কঠিন।

চুপ ক'রে থাকলে চলবে না। চাপা দেবার চেষ্টাও বৃথা। একই বাড়ি, বলতে গেলে একত্র থাকা। একটু পরেই হয়তো ওরা এসে হাজির হবে। তখন সকলেই জানতে পারবে সব কথা।

কমলা নতমুখে সব কথাই খুলে বললে। উমা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

বুড়ী গিন্নী গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, 'অবাক করেছে মা !·· মিনসে এত বড় শয়তান ! ঘুষ খেয়ে পরের ছেলে বেচে দিয়ে বসে রইল ? বলি তোমাদের আত্মীয় তো সব বেশ !—তা যখন ঐ সম্পর্কেরই লোক -তখন বিশ্বাস ক'রে ছেলে ছাড়া তোমার উচিত হয় নি বাছা, স্পষ্ট কথা যা বলব।'

মালতীর মা শাশুড়ির সামনে আজও চেঁচিয়ে কথা কন না। ঘোমটার মধ্যে থেকে বললেন, 'তা কি করবে এখন ঠিক করলে খোকার মা ?

'কী করব ?' কমলা বিপন্নভাবেই বলে, 'সে বেচারীর দোষ কি বল। তাকে কোথায় ফেলব। হাজার হোক ছেলেরই বৌ, ছেলে যখন তাকে বিয়ে করেছে।'

বুড়ী গিন্নী এদের নির্বুদ্ধিতায় বিরক্ত হয়ে ওঠেন, 'ওমা, তাই বলে অমনি বৌ ঘরে তুলবে নাকি। অমন কাজও ক'রো না। অমন লোকের মেয়ে যখন, তখন সেও ধাড়ী শয়তান। গুণতুক্ সব শিখে আসছে, এই বলে দিলুম—তোমাদের হাড়ীর হাল ক'রে ছাড়বে। যাকে ঘুষ দিয়ে ঐ মেয়ে গছিয়েছে তার সঙ্গে বুঝুক, তোমরা ঝাঁটা মেরে বাড়ি থেকে বার ক'রে দাও !'

কমলা চুপ করে থাকে।

ওর মনের ভাবটা আন্দাজ ক'রে নিয়ে মালতীর মা আবারও ফিস ফিস করে বলেন, 'বলি তা যদি না পার তো এধারে উয্যুগ সঙ্গুগ কর।'

'উয্যুগ।' কমলা একটু অবাক হয়েই যায়।

'ওমা, উয্যুগ নেই ? বরণ করতে হবে না ? ন্যাটা মাছ চাই না ? দুধ ? বলি নিত-কত আছে তো সব !'

মালতীর মা কাজের মানুষ। তিনি এদের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হন।

এতক্ষণে কমলারও হুঁশ হয়। সে ওঁর হাত ধরে বলে, 'যা হয় তুমি কর বৌদি, আমি বরং গোটা দুই টাকা দিই—আমি আর কিছু পারছি না !'

মোটামুটি একটা আয়োজন করতে না করতে সদরের বাইরে একটি ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াবার শব্দ হ'ল। ছেলেমেয়েরা উন্মুখ হয়েই ছিল—তারা ছুটে

গিয়ে দেখেই হৈ-চৈ করে উঠল। মালতী একটা শাঁখ বাজাতে বাজাতে ছুটে এল—মালতীর মা এসে হাত ধরে বৌকে নামিয়ে নিলেন।

অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে নেমে দাঁড়াল গোবিন্দ। বেচারী মা-মাসীর দিকে চাইতেও পারছিল না।

একাই এসেছে ওরা।

কারণ নরেন আর যাই হোক—নির্বোধ নয়। সে গাড়ি ভাড়া করে ওদের চাপিয়ে দিয়ে হাওড়া থেকেই সরে পড়ছে। তবে গাড়ি-ভাড়াটা নাকি যাবার আগে দিয়ে গেছে গোবিন্দর হাতে।

ওর এতখানি বিবেচনায় উমা এবং কমলা দুজনেই বিস্ময় বোধ করে।

বৌ দুধে-আলতায় এসে দাঁড়াতে মালতীর মা তার মুখটা তুলে ধরে বললেন, 'মা ঠাকুরঝি, দিব্যি বৌ—খুব ঠকো নি বাপু, যাই বল।'

এতক্ষণ কমলা সেদিকে তাকাতে পারে নি সত্যিই।

বহুদিনের বহু আশা গড়ে উঠেছিল তার এই একমাত্র ছেলেকে কেন্দ্র ক'রে। বৈধব্যের পর ভবিষ্যতের সব আশা গিয়ে সংহত হয়েছিল ঐ জীবনটিতে। ছেলে বিদ্বান হবে, বড় হবে—মানুষের মত মানুষ হবে!

সেই সমস্ত আশায় ছাই দিয়ে দুর্গ্রহের মত, বোঝার মত যে এসে ঘাড়ে চাপল তার প্রতি একটা দারুন বিতৃষ্ণা যে কমলার অন্তর ছাপিয়ে উঠবে—এটা খুবই স্বাভাবিক। প্রবল একটা বিদ্বেষ, দুর্নিবার একটা রোষ অনুভব করে সে। এক সময় মনে হয় সত্যিই টুকরো টুকরো ক'রে ফেলে সে মেয়েটাকে, দু হাতে গলা টিপে শেষ করে দেয় সে ঐ সর্বনাশীকে। তাতে নিজের জীবন যায় যাক—ছেলের জীবন তো স্বচ্ছন্দ, নিরাপদ হবে!

প্রাণপণে প্রবল হৃদয়-স্পন্দন দমন করবার চেষ্টা করে সে। দুহাতে বুকটা চেপে ধরে।

উমার দিকে ফিরে বলে, 'তুই যা বোন—যা করতে হয় কর।'

উমা ঘাড় নেড়ে বলে, 'না। আমার দুর্ভাগ্যের ছোঁয়াচ এখনই আর লেগে কাজ নেই দিদি। তুমি মা। শুধু তো ছেলেরই নও, আজ থেকে ওর-ও মা!'

সামান্য একটু সময়। সকলেই একটা কি নাটক অনুভব করেছে বাতাসে। মালতীর ঠাকুরমার মুখে প্রচ্ছন্ন কৌতুকের হাসি। মালতীর মা বিপন্ন বোধ করেন নিজেকে। এমন সময় নতুন বৌ-ই এক কাণ্ড করে বসল। হয়তো বাপ-মা শিখিয়ে দিয়েছিল আসার সময়। কিংবা নরেনই—কে জানে! সে দুধে-আলতার পাত্র থেকে হেঁটে এগিয়ে এসে কমলার পায়ের কাছে বসে পড়ে ওর একটা পায়ে হাতে রেখে বললে, 'আমাকে মাপ করুন মা!'

আহা, বাছা রে!

এই শব্দটাই বুঝি বেরিয়ে আসতে চায় কমলার মুখ দিয়ে—প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসাবে।

সমস্ত নিষ্ফল ক্ষোভ, সমস্ত ব্যর্থ রোস নিমিষে এক সীমাহীন সহানুভূতিতে

রূপান্তরিত হয়।…

'যাট যাট' বলে সে দু'হাতে তুলে ধরে বৌকে।…

মালতীর মা মিছে বলে নি। কালো নয়—তবে ফরসাও নয়। শ্যামাঙ্গী বলা যেতে পারে। কিন্তু মুখখানি অপূর্ব! প্রতিমার মতো ঢেউ খেলানো চুলের ভার, গড়নও নিখুঁত। তবে গোবিন্দর পাশে হয়তো একটু বেমানানই লাগবে। অপূর্ব স্বাস্থ্যবতী মেয়েটা। সেই কারণেই অনেকখানি বড় দেখাচ্ছে ওর পাশে। নইলে মুখ এখনও কচি আছে। খুব বেশী হলেও গোবিন্দর সমবয়সী হবে।

মালতীর ঠাকুমা সকলকে শুনিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলেন, 'ভাল হয়েছে, বৌ ছোট ভায়ের হাত ধরে কোম্পানির বাগানে বেড়াতে নিয়ে যাবে'খন!'

কমলা কিন্তু বৌয়ের মুখের দিকে চেয়ে অপূর্ব একটা তৃপ্তি অনুভব করে মনে মনে। এমনি একটি বৌ-ই বুঝি তার স্বপ্ন ছিল মনের অবচেতনে। সে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলে, 'এসো মা এসো। তোমার অপরাধ কি মা। আমার ভাগ্য!…আজ, আজ তিনি থাকলে এ তো আনন্দেরই কথা হ'ত!'

দুই চোখ আর বাধা মানে না—হু-হু ক'রে কেঁদে ফেলে কমলা।

অনেকক্ষণ, অনেক বিপরীত মনোভাবের সঙ্গে লড়াই করেছে সে। সব ঝড়ের প্রশান্তি হয় বুঝি এই বর্ষণেই। শান্ত, প্রকৃতিস্থ হয় সে।

বৌটি বেশ সপ্রতিভ ধরনের মেয়ে।

পশ্চিমে মানুষ হয়েছে বলেই বোধ হয় এদেশী চালচলনে ততটা অভ্যস্ত নয়। সোজা চোখ তুলে তাকায়, স্পষ্ট স্পষ্ট কথা বলে,—হাসির কথায় শব্দ ক'রে হাসে। বধূসুলভ লজ্জা নেই—সে অভাবটা সম্বন্ধে তেমন সচেতনও নয়।

বৌয়ের নাম তারা।

সে নিজেই ব্যাখ্যা করলে, 'ঠাকুমার দেওয়া নাম কালীতারা। তা কালী আবার আমার দিদিমারও ডাকনাম—তাই মা ডাকেন শুধু তারা বলে।'

দেবেনের অনুমানই ঠিক। ভুবন ঘোষালের মেয়ে সে।

উমা প্রশ্ন করলে, 'জামাইবাবুর দাদার সঙ্গে দেখা হয়নি তোমাদের হাওড়াতে?'

'কৈ না তো!' অবাক হয়েই উত্তর দিলে তারা, 'তাঁর যাবার কথা ছিল নাকি?'

উমা কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললে, 'না, খবরটা পেয়ে তিনি খুব রেগে গিছলেন কিনা। তাই ভাবলুম যদি, সেখানে গিয়ে পড়ে একটা রাগারাগি চেঁচামেচি করেন—'

তারা আরও অবাক হয়ে বললে, 'কেন, তিনি তো জানতেন!'

'সে কি!' একই সঙ্গে কমলা ও উমার মুখ দিয়ে প্রশ্নটা বেরিয়ে আসে।

গোবিন্দ এতক্ষণ একটিও কথা বলে নি, মাথা হেঁট ক'রেই বসে ছিল। সে এবার মুখ তুললে। বললে, 'ওরা কেউ কম নয় মা। উনি আমার শ্বশুরের কাছে তিনশ' টাকা ধার করেছিলেন ক'বারে, এক পয়সাও দিতে পারেন নি, শ্বশুর শেষে ওঁকে বলে যে এই বিয়ে ঠিক ক'রে দাও, তা হলে আর তোমায় টাকা

দিতে হবে না। তখন থেকে জপাচ্ছে আমাকে। নিহাত চলে আসছে হ'ল তাই—তাও মেসোমশায়কে পাহারা রেখে এল। বাড়ি থেকে বেরোতে দিত নাকি আমাকে? চোখে চোখে রাখত দিনরাত। মেসোও দুশ'খানি টাকা খেয়েছে।...তার ওপর আজ এখানে নেমে দানের বাসনগুলোও হাতাবার তালে ছিল। নিহাত—', খানিকটা থেমে আরক্ত-কপালে কোনমতে কথাটা শেষ করে গোবিন্দ, 'নিহাত ও ঝগড়া করলে বলে তাই। গাড়িভাড়ার টাকাকড়ি সব শ্বশুর মশাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কিনা—আমি তা জানতুমও না, সব ও-ই আদায় করেছে!'

দু'দুবার স্ত্রীর কথাটা উল্লেখ করার লজ্জায় গোবিন্দর কান দুটো আবীরের মত রাঙা হয়ে উঠল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

আজকাল শ্যামার দিন কাটে অবিচ্ছিন্ন একটিমাত্র চিন্তার মধ্য দিয়েই। সেটা হল অর্থ-চিন্তা। হেম রং-কলে কাজ করে কিন্তু সে সামান্য কাজ। দশ টাকা মাইনেতে ঢুকেছিল, এখন পনেরো টাকা পায়। সকাল সাতটায় খেয়ে বেরোতে হয়—ফেরে সেই সন্ধ্যা ছটায়। কারণ আটটায় হাজিরে। দেড় ক্রোশ হেঁটে যাওয়া—পুরো একটি ঘণ্টা সময় লাগে। তা হোক—মাইনেটা যদি আর একটু বেশী হ'ত—শ্যামার অত দুঃখ করার কিছু থাকত না। এধারে যজমানি কাজটা হেম মোটামুটি আয়ত্ত করে নিয়েছে বটে, তবে তার অবসর কৈ? সাতটায় যাকে বেরোতে হবে সে আর পুজো করে কখন? সরকার-বাড়ির নিত্যসেবাটা সারতেই হয়, তাতেও অন্তত পনেরো মিনিট সময় লাগে।

হেম অবশ্য খুব ভোরে ওঠে কিন্তু অত সকালে যজমানরা পুজোর আয়োজন ক'রে রাখবে—এটা আশা করা যায় না। খন্দ লক্ষ্মীপুজোর দিনগুলোতে হেম অফিস কামাই করে—কারণ পাঁচ-সাত বাড়ির পুজো সেদিন পাওয়া যায়। তাও দুটো বৃহস্পতিবার পর পর পেটের অসুখের অজুহাতে কামাই করা যায় না—অফিসে সন্দেহ করবে। যেদিন সংখ্যায় বেশী পুজো পাওয়া যায় সেদিনই কামাই করে শুধু। পরেরটা বা আগেরটা—যার খুব গরজ সে আগে বলে রাখে, ভোরে উঠে যোগাড়ও ক'রে রাখে। কিন্তু সে আর ক'টা? মোট কথা চাকরি করতে গেলে যজমানির আয় খুব বেশী হয় না। আর শুধু যজমানির আয়ের ওপর নির্ভর ক'রে চাকরি ছাড়ার কথা বলতে পারে না শ্যামা। হেমও তাতে রাজী হয় না। ন-মাসে ছ-মাসে ষষ্ঠীপুজো, বছরে ছটা দিন লক্ষ্মীপুজো, তার ওপর ভরসা ক'রে বসে থাকতে সে রাজী নয়। তিনপো এক সের চাল, একখানা ক'রে গামছা

আট দু'আনা চার আনা দক্ষিণে। কী হয় এতে? আর মেলে কিছু কাটা ফল—তাও এখানে কেউ ফল কিনে দেবতাকে দেয় না—বা বাড়ির উঠোনে হয়—কলার পেঁয়ারা শসা—তাই দিয়ে কাজ সারে। সেসব ফল ছেলেমেয়েরা খেতেও চায় না। ফলগুলো আস্ত দিলেও না হয় বিক্রি করা যেত।

সরকাররা নিত্যসেবার মজুরি একটু কিছুও বাড়াতে রাজী হন না। নরেন যেদিন এই কাজটি ভরসা ক'রে শ্যামাকে এই তিনদিক চাপা ঘরটিতে এনে তুলেছিল সেদিনও যা মিলত আজও তাই মেলে। সকালে আধ সের আতপ চালের একটা নৈবেদ্য, রাত্রে খানকতক বাতাসা আর একপো দুধ। অবশ্য এই ঘরটায় থাকতে দেন—সেটাও একটা বড় লাভ। কিন্তু আধ সের চালে আজকাল এক বেলাও কুলোয় না। ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে, তাদের পেটও বেড়েছে। তা ছাড়া কিছুই খেতে পায় না বেচারীরা, ভাত আর ভাত—দুবেলা দুটি মুঠো ভাত শুধু। সেটা কমাতে গেলে চলে না। জলখাবারের কথা কেউ চিন্তাও করে না। কোনদিন দৈবাৎ যদি কিছু মেলে সে কথা আলাদা – সেটা রীতিমত উৎসবের দিন হয়ে ওঠে ওদের কাছে। মেয়ে দুটোর বিয়ে হয়ে গেছে বটে—কিন্তু এখনও কান্তি আছে, কানু আছে—ছোট মেয়ে তরু আছে। তবু এর মধ্যে গোটাকতক মরে গেছে। কেউ হয়ে দু'এক দিনের মধ্যেই মরেছে কেউবা মাস দুই তিন ভুগে ও ভুগিয়ে মরেছে।… সে আর এক কষ্ট এমন পয়সা নেই যে চিকিৎসা হয়। সন্তান নিজের চোখের সামনে ভোগে—বসে বসে দেখতে হয়। ভগবান তাকে যেন সব দিক দিয়েই মারতে চান। · তার কাছেই বা এতগুলো পাঠান কেন? আর পাঠানই যদি তো এমন আধমরা ক'রে পাঠাবার কী দরকার!

মঙ্গলা বলেন নেহাত মিছে নয়, 'মহাপাপ! মহাপাপ! এসব হ'ল মহাপাপের ফল –বুঝলি বামনী? আর জন্মে কত লোককে বঞ্চিত করেছিলি, তাই এই জন্মে ভগবান এমন বেঁধে মারছেন। মুয়ে আগুন বামুনের—কোন্ চুলো থেকে কতকগুলো খারাপ ব্যামো ধরিয়ে এসে এমনি ক'রে দগ্ধাচ্ছে তোকে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি মেয়ে, ওর গর্মি'র ব্যামো আছে। তাইতেই নাকি এমনি সব হয়।…দেখিস্ তোরও শরীর ঝাঁঝরা ক'রে দিয়ে যাচ্ছে—তোর কী হয় তাও দেখিস!… তাও বলি বাপু, তুই তেমনি নিঘিন্নে নিপিত্তে– আমি হলে সাত জন্মে অমন ভাতারের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতুম না।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে রাগে দুঃখে অপমানে শ্যামার চোখে জল এসে যায়। অথচ কী বা উত্তর দেবে সে!… এ সন্দেহ তার অনেক কালের। বহু দিন আগে তার বড় জাও এই কথাটি বলে গিছলেন, 'নিশ্চয়ই এরা কোন খারাপ ব্যামো ধরিয়েছে'ভাই।' সেদিন অবশ্য কথাটার মানে বুঝতে পারে নি—কিন্তু আজ পারে।

দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল শ্যামার—সতেরো বছরের রূপবান কিশোর স্বামীর সঙ্গে। সে-মূর্খ, সে গোঁয়ার—কিন্তু তবু সেদিন বালিকা-বয়সের সমস্ত মনটুকু দিয়েই ও স্বামীকে ভালবেসেছিল—তাকে অন্তরের কামনার আসনে বসিয়েছিল।…যা নিঃশেষে দিয়েছিল তা আর নিঃশেষে ফিরিয়ে নিতে পারে নি।

অনেক সয়েছে সে। পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রির টাকা নির্বোধের মতো উড়িয়ে নরেন আর তার দাদা এইসব রোগ কিনেছে। সে-সময় ওদের ফেলে রেখে গিয়েছিল গুপ্তিপাড়ার এক নির্জন বাড়িতে। দিনের পর দিন উপবাসে কেটেছে—মারধোর নির্যাতন, অনেক কিছুই পেয়েছে সে স্বামীর কাছ থেকে। নরেন ঠগ্, নরেন বাটপাড়, নরেন মিথ্যুক। সবই জানে শ্যামা। তবু যখন সে এসে দাঁড়ায়—তখন আজও বুকটা তার দুলে ওঠে বৈকি! যতই সে প্রতিজ্ঞা করুক মনে মনে যে কিছুতেই আর কোন সম্পর্ক রাখবে না স্বামীর সঙ্গে—কোন প্রতিজ্ঞাই টেঁকে না শেষ পর্যন্ত।

আজকাল নরেনও আসে কালেভদ্রে, কখনও-সখনও। পাঁচ-ছ মাস তো বটেই, এক-এক সময় আট মাস দশ মাসের ব্যবধানে আসে সে। কোথা থেকে উল্কার মতো এসে হাজির হয়। কখনও কিছু হাতে ক'রে আসে—ব্রাহ্মণ বিদায়ের বা দৈবাৎ-জোটা যজমানির দু-একটা জিনিস নিয়ে। কখনও একেবারেই শুধু হাতে এসে ওঠে। সেসব সময় বরং ঘর থেকে কাপড় কিনে দিতে হয় শ্যামাকে—এমনিই অবস্থায় এসে ওঠে। শতছিন্ন কাপড়, গায়ে জামা নেই, পরনে জুতো নেই - একহাঁটু ধুলো। মুখচোখ দেখে মনে হয় কত কাল কিছু পেটে পড়ে নি।

কিন্তু তবু - সে সব দিনে পূর্ব সংকল্প মতো তাকে দোরের কাছ থেকে বিদায় দিতে সে পারে না কিছুতেই। বরং খাইয়ে, পরিচর্যা ক'রে, সুস্থ ক'রে তুলতেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কোথায় থাকে সে এই দীর্ঘ সময়গুলো—কী করে—কী খায়—এসব প্রশ্ন অনাবশ্যকবোধে কোনদিনই করে নি শ্যামা, এখনও করে না। কী উন্মত্ত উৎসবে তার দিন কাটে, কোন্ সংসর্গে সে এমন স্ত্রী, ফুলের মতো ছেলেমেয়ে ছেড়ে পথে মাঠে ঘাটে দিন কাটায়, ভেসে ভেসে বেড়াই তা সে-ই জানে! জিজ্ঞাসা করলেও তো সত্য জবাব পাবে না—সে কথা শ্যামা ভাল ক'রেই জানে। তাই ইচ্ছা করে না ওর, অকারণে কাদা ঘাঁটবার।

তবে নরেনের লম্ফঝম্প আজকাল অনেক কমেছে। আগেকার, সে সপ্রতিভ ভাবটাও যেন আর নেই। ছেলে বলে হেমকে সে যেন একটু সমীহই করে বরং। হয়তো হেমের কথাবার্তা শুনে তার মতিগতিও অনুমান করতে পারে অনায়াসে—পিতৃভক্তির চাপ বেশী সহ্য করানো যাবে না তাকে দিয়ে। অবশ্য হেম যখন থাকে না তখন মাঝে মাঝে পুরোনো অভ্যাসবশত হাঁকডাক করে এক-এক দিন—'উঁঃ! রোজগেরে ছেলে বলে ওকে ভয় ক'রে চলতে হবে নাকি! ভারি তো রোজগার! এখনও এই শম্মা বেরোলে ওর এক মাসের রোজগার সাত দিনে কামিয়ে আনতে পারে! অত মেজাজের ধার ধারি না আমি, ছেলেকে তোমার বলে দিও। আমার বাড়ি, আমার সংসার—তেমন বুঝলে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেব বাড়ি থেকে। হুঁ! রাগলে আমি বাপেরও বেটা নই!'

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কণ্ঠে আগেকার সে উগ্র সুর আর ফোটে না। শ্যামা গ্রাহ্যও করে না আজকাল। কথায় কানই দেয় না। খুব অসহ্য হলে বলে, 'থাম দিকি। মেলা ভ্যানর্ ভ্যানর্ করতে হবে না। তোমার মুরোদ এ সংসারের

কারুও আর জানতে বাকী নেই—টিক্‌টিকি আরশোলাগুলো পর্যন্ত জেনে গেছে। চুপ কর।'

'বটে! বড্ড যে তেজ হয়েছে দেখছি। অনেকদিন পিঠে তোমার চেলাকাঠ ভাঙি নি—নয়?'

বলে—কিন্তু আশ্চর্যরকম ভাবে চুপ ক'রেও যায়।···যেমন শামুকগুলো আঘাত পেলেই নিজেকে গুটিয়ে নেয় খোলের মধ্যে, কতকটা সেই রকম।···ওর এই অধঃপতন (?) দেখে বরং শ্যামার এক-এক সময় বিচিত্র কারণে একটু দুঃখবোধই হয়।

খরচ দিন দিন বেড়েই যায়। সে অনুপাতে আয় বাড়ে না। নানারকম উঞ্ছবৃত্তি করতে হয়। সরকারদের বিস্তৃত বাগানের কলাটা আমটা নারকেলটা আনাজটা চুরি ক'রে বিক্রি করা—এইটেই বেশী ভরসা। কিন্তু ওরাও কড়া পাহারা রাখে। পিঁটকীর ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে—তারা তো সারাদিনই চোখে চোখে রাখে। তারই মধ্যে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে সরাতে হয়। ফলে কান্তি কানু তরু—এরা বেশ সুদক্ষ চোর হয়ে উঠেছে। অনেক সময় প্রথম রাতে ঘুমিয়ে নিয়ে মাঝরাতে উঠে অন্ধকারেই বেরিয়ে পড়ে ওরা—সাপখোপের ভয়ও করে না। অক্ষয়বাবু আজকাল হাঁস পুষছেন, মাঝে মাঝে তারা জলে ডিম পেড়ে যায়। তরুটা বড্ড ডিম খেতে ভালবাসে—তাই সারাদিনই বলতে গেলে পুকুর-ধারে বসে থাকে সে। একটা ডিম পেলে ওদের উল্লাসের সীমা থাকে না—শ্যামা সেইটেই ভেজে বড়া করে—তার ডালনা করে দেয় ছেলেমেয়েদের, একটা ডিমে সকলের খাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু এ কাজটি সারতে হয় খুব গোপনে। ডিমের খোলাটা কাপড়ের মধ্যে ক'রে লুকিয়ে সকলের অগোচরে গঙ্গারে ফেলে আসতে হয় কিংবা একেবারে বড় রাস্তায়, নইলে ধরতে পেলে আর রক্ষা থাকে না। সবাই মিলে গালাগাল দিয়ে ভূত ছাড়ায় একেবারে। বিশেষ পিঁটকীর যা মুখ হয়েছে—সে বামুন বলে মানে না, শাপমন্যিরও ভয় করে না। এত কাণ্ড ক'রেও সব দিন শ্যামা পেট ভরে ছেলেমেয়েদের দু'বেলা খেতে দিতে পারে না, সেইটেই বড় দুঃখ ওর। মা রাসমণি যতদিন বেঁচে ছিলেন, তবু মধ্যে মধ্যে গিয়ে হাজির হয়ে দু পাঁচ দিন ছেলেমেয়েগুলোকে খাইয়ে আনত, এখন সে পথও ঘুচেছে। কোন দিকেই আর কেউ নেই ওর।

॥ ২ ॥

এত দুঃখের মধ্যে একটি সান্ত্বনা ছিল শ্যামার—মেয়ে দুটি ভাল ঘরে পড়েছে। বড়র তো কথাই নেই। অভয়পদর মতো জামাই পাওয়া বহু ভাগ্যের কথা। হয়তো খুব সচ্ছল অবস্থা নয় কিন্তু শ্যামা এতদিনে মানুষ চিনতে শিখেছে —সচ্ছল অবস্থা আসতেও খুব দেরি হবে না ওদের। পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান হৃদয়বান ছেলে অভয়পদ—ওর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

মেজ মেয়ে ঐন্দ্রিলার শ্বশুররা বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। ধান-চাল খেত-খামার গরু-বাছুরে—জাজ্বল্যমান সংসার। শ্বশুর মেয়ে দেখে পছন্দ ক'রে বলতে গেলে বিনা পয়সায় নিয়ে গেছেন। পথ চলতে চলতে পুকুরঘাটে ঐন্দ্রিলাকে দেখে খোঁজ করে এসেছিলেন মাধব ঘোষাল। নিজেই কথা পেড়ে সেধে নিয়ে গেছেন। অবশ্য সেধে নিয়ে যাবার মতোই মেয়ে ঐন্দ্রিলা। তার গর্ভের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল। অমন রূপসী মেয়ে রাজারাজড়ার ঘরেও দুর্লভ। হরিনাথ দেখতে ভাল নয় তত, রংটা বিশেষ করে খুবই কালো। সেজন্য প্রথমটা ঐন্দ্রিলা রীতিমত বিদ্রোহই করেছিল। ছেলেবেলা থেকে কালো দেখতে পারত না সে. কালো মাছ খেত না, কালো হাঁড়ির ভাত খেতে চাইত না। কিন্তু কালো হোক, হরিনাথের স্বাস্থ্যটি ভাল - লম্বাচওড়া জোয়ান ছেলে। বলতে নেই, দুটিতে ভাবও হয়েছে খুব। খুব বেশী দূর তো নয়, দুক্রোশের মধ্যেই ঐন্দ্রিলার শ্বশুরবাড়ি। ও গাঁয়ের বহু লোক এপাড়ায় আত্মীয় বা কুটুমবাড়ি আসে. মুখে মুখে বহু কথাই ছড়ায়। অনেকে শুধু খবর শোনাবার জন্যই একেবারে অপরিচিত বাড়িতেও যেচে আলাপ করতে ঢোকেন—

'কে গো বামুন দিদি,—এই বাছা এলুম, তোমার ঘর সংসার দেখতে। আমাদের আড়গোড়ের ফলুনা ঘোষালের বেয়ান তো তুমি? বেশ, বেশ। আসব আসব করি অনেক দিন থেকেই—আবার ভাবি তোমরা কি মনে করবে! শুনেছি তুমি বাছা আবার লেখাপড়া জান, তার ওপর শহরের মেয়ে—হয়তো কথাই কইবে না। আমরা হলুম গে মুখ্খু-সুখ্খু সেকেলে মেয়েমানুষ। তা কী বল, বাছা, বসব একটু—না চলে যাব?'

'ওমা সে কী কথা! আসুন আসুন - এই যে। অ তরু, ও মা আসনটা পেতে দে মা। শিগগির। কী ভাগ্যি আমার—আপনারা দয়া করে গরীবের ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। এই যে বসুন।'

শ্যামাকে জোর করেও মুখে আপ্যায়নের হাসি ফুটিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে হয়। ভাগ্যে কাপড়খানা কালই ফুটিয়েছিল। সেলাই করা হয়েছে। সেলাইটা আবার চোখে না পড়ে যায়—হে মা সিদ্ধেশ্বরী!

যিনি এসেছেন তিনি জাঁকিয়ে বসেন।

'অ বাপু বেশ মিষ্টি ব্যাভার তোমার মানতেই হবে। শুনেছি কলকাতার মেয়েরা সব মারমুখো হয়েই থাকে। তাই তো ভরসা ক'রে এতকাল ঘেঁষি নি। তোমার বেয়াইবাড়ি সেদিন গিছনু—তোমার মেয়েই বললে. যাবেন না কাকীমা, আমার বাপের বাড়ি। ঐ তো কাছেই যান। বলি তাই আজ—। যা হয় ক'রে মরীয়া হয়েই ঢুকে পড়লুম। এই পাশেই আমার কুটুম-বাড়ি কি না। এই যে চট্-খণ্ডীরা—ওদের বৌ হ'ল আবার আমার আপন পিসীমার ননদ। সেই সুবাদেই জানাশুনো যাতায়াত। তা ছেলেমেয়ে কটি গা তোমার সবসুদ্দু?'

এইভাবে শুরু হয়, অন্তহীন আলাপ এবং পরিচয়ের এক-একটি ইতিহাস। মোটামুটি কাঠামো সবগুলোরই এক। শুধু বর্ণ-বৈচিত্র্যে বা তথ্যে হয়ত একটু-

অর্থাৎ এদিক-ওদিক।

এদেরই মুখে মেয়েদের শ্বশুরবাড়ির খবর পায় শ্যামা।

'শ্বশুর খুবই ভাল। তবে শাশুড়ী মাগী বাপু একটু দজ্জাল আছে, মুখে যে খুব গাল মন্দ দেয় তা নয়। কেমন জান—ঐ যাকে বলে শেতল-খোকাটকী। আর ছেলেমেয়েগুলো সব মার দিকে। বড় ছেলের মোটা রোজগার বলে মুখে কিছু বলতে পারে না—কিন্তু কালোর বাড়ি সোন্দর মেয়ে গিয়ে পড়েছে তো, সবাই হিংসে করে। আর যাই বল বাপু, তোমায় মেয়েটারও একটু বাড়াবাড়ি আছে। বড্ড বেহায়া—রূপের দ্যামাকও তো আছে, তার ওপর সোয়ামীর সোহাগ—ধরাকে সরা জ্ঞান করে। অতটা কিন্তু ভাল নয়। এলে বাপু সাবধান ক'রে দিও একটু।'

একই কথা বলে সবাই।

কী ক'রে এমন সাহস পেল ঐন্দ্রিলা—শ্যামা ভেবে পায় না। মনে মনে লজ্জা অনুভব করে সত্যিই।

মঙ্গলার কানেও নানা কথা আসে। আর তিনি রেখে-ঢেকে বলবার চেষ্টা করেন না। সোজাই বলেন, 'না বাপু বামনী, যতই বলিস এতটা ভাল নয়। হ'লই বা ভাতার-সোয়াগী—বলি আমাদেরও তো বয়স ছিল লো, সোয়ামী যে ঘরে নেয় নি তাও নয়, চিরকাল উঠছে বসছে আমার কথায়। তাই বলে আমারা অত ঢলাঢলি বেলেল্লাগিরি করেছি কখনও? কি ঘেন্নার কথা মা। তোর মেয়েটা পাগলী আছে—তা যা-ই বলিস।'

শ্যামার লজ্জা করে - আবার আনন্দও হয় বৈকি।

একটু যেন গর্বও অনুভব বরে—ঐন্দ্রিলার এই দুর্জয় সাহসে।

মেয়ে-জামাইয়ের খুব ভাব হয়েছে। একটু অসাধারণ রকমেরই। জামাই যতক্ষণ বাড়ি থাকে—নাকি কেবল মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে। মেয়েও নানা ছুতোনাতায় যখন তখন ঘরে গিযে তার বরের সঙ্গে গল্প ক'রে আসে। দুজনের চোখ শুধু দুজনের দিকে। এর বাইরে কোন লোক বা কোন পৃথিবীর যেন অস্তিত্বই নেই। দিনের বেলা স্বামীর ঘরে যাওয়া বা গল্প করা—এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট নিন্দের ব্যাপার। কিন্তু তাতেও থামে নি ঐন্দ্রিলা। হরিনাথ যখন অফিস যায় তখন সংসারের যতই কাজ থাকুক—ঐন্দ্রিলা গিয়ে ছাদে ওঠে। ছাদের পুব-দক্ষিণ কোণটা থেকে সেই বড় রাস্তার বাঁক পর্যন্ত নাকি দেখা যায়। সেই কোণে গিয়ে আলসেয় বুক চেপে ঝুঁকে পড়ে দেখে ঐন্দ্রিলা—যতক্ষণ হরিনাথকে বিন্দুর মতও দেখা যায় ততক্ষণ। শ্বশুর-শাশুড়ী কত গালাগালি দিয়েছেন, দেওর-ননদরা ঠাট্টা ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে গেছে—কোন কথাই গায়ে মাখে না মেয়ে।… শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বারো মাস ঐ এক অবস্থা। আবার ফেরবার সময়ও ঠিক সময় বুঝে ছাদে উঠে যায় সে। যেদিন হরিনাথের ওভারটাইম থাকে—সেদিন তো কথাই নেই। যতক্ষণ না সন্ধ্যা হয়ে অন্ধকার নেমে আসে চারিদিকে—ততক্ষণ ঐন্দ্রিলা ছাদ থেকে নামে না। নামলে ভাল ক'রে কাজকর্ম করে না--কারুর কথা

শোনে না, মুখ ভার করে থাকে। রাত্রে হরিনাথ এলে তবে তার মুখে আবার হাসি ফোটে, কাজে-কর্মে উৎসাহ আসে।

'না-না, তুইই বল বামনী এত ঢলাঢলি কি ভাল ? এ বাপু দস্তুরমত বেলেল্লা-গিরি। গেরস্ত-বাড়িতে এসব কাণ্ড ভাল নয়। শ্বশুর মিন্‌সে নাকি বড্ড ভালবাসে, তাই কিছু বলে না। তারই দাপটে বাড়ির আর সকলে মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। সে মিন্‌সে চোখ বুজলে—ত্যাখন ?'

প্রায়ই বলেন মঙ্গলা।

'ভাতার আবার ভালবাসে না কার ?···তোর মতো ভাতার ধর দৈবে-সৈবে এক আধ-জনের। কিন্তু তাই বলে জগৎ সংসার সব পর করে শুধু তার গলা জড়িয়ে বসে থাকতে হবে—আর শ্বশুরবাড়িকে শত্তুরপুরী ক'রে তুলতে হবে - এই বা কেমন কথা। ঈশ্বর না করুন—বলতে নেই, বরেরই যদি ভালমন্দ কিছু হয় ? ঐ শ্বশুর-বাড়িতে কি ওকে বাস করতে হবে ? লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে না ?·· তুই একটু বুঝিয়ে বলিস বামনী—পাড়া ঘরে যে আর কান পাতা যায় না। শাশুড়ী ননদ সহ্য করবে কেন ?'

কথাটা ভাল লাগে না শ্যামার। শিউরে উঠে নিজেই সিদ্ধেশ্বরীর উদ্দেশে কানমলা খায় গোপনে, আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে যে ঐন্দ্রিলা এলে বকে দেবে খুব। কিন্তু মেয়ে আসে না বাপের বাড়ি। নিজে থেকে তো আসেই না—কখনও-সখনও শ্যামা আনতে পাঠালে সেই সোজা বলে দেয় যে তার আসার সুবিধা হবে না অপমান বোধ করে শ্যামা—কারণটা বুঝে অপরাধ নেয় না। আসলে জামাইকে ছেড়ে আসতে রাজী নয় সে। ষষ্ঠী বা ঐরকম কোন উপলক্ষে হরি-নাথের সঙ্গে এসে তখনই চলে যায়। সে সময় কোন কথাই বলা যায় না। কেমন যেন লজ্জাও করে— এসব প্রসঙ্গ তুলতে।

একটা রাত থাকলেও না হয় পাশে শুইয়ে কথাটা পাড়ত সে। অন্ধকারে চক্ষুলজ্জা থাকে না ততটা—কিন্তু এক রাতও মেয়ে থাকতে রাজী হয় না। অনুরোধ করলে বলে, 'না বাপু, সে আমার সুবিধে হবে না। তোমার জামাইয়ের বড় অসুবিধে হয় আমি না থাকলে। একখানা ঘরে বাস তোমাদের—জামাইকে তো আর রাখতে পারবে না !'

আহত হয় শ্যামা। চোখে জল এসে যায় তার। মনে হয় শুনিয়ে দেয় ভাল ক'রেই—কিন্তু শেষ অবধি সামলে নেয় নিজেকে।· ষাট্ ষাট্ !

এরই মধ্যে এক দিন খবর এল ঐন্দ্রিলা সন্তান-সম্ভবা।

আনন্দেরই কথা—কিন্তু খরচের কথা মনে পড়ে শ্যামার মুখ শুকিয়ে যায়। মহাশ্বেতা তাকে সাধের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল, প্রথমবার সাধ হয় নি বলে তার পরের সন্তানের বেলাতেও সে ঝঞ্ঝাট ছিল না। কিন্তু ঐন্দ্রিলার এই প্রথম। অন্তত একটা কাপড় দিতেই হবে। আর খুব খেলো কাপড় দিলেও চলবে না।

ভেবে শ্যামার ঘুম হয় না রাত্রে।

ই একেবারে যে নেই তা নয়—এত দুঃখের মধ্যেও হাঁড়িকুঁড়ির মধ্যে ন্যাকড়ায় বাঁধা কটি টাকা জমেছে তার। তবে সে টাকায় হাত দিতে কিছুতেই ইচ্ছা করে না। ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত-করা অর্থ—বিশেষ উদ্দেশ্যেই সে জমাচ্ছে—এক-একটি আধলা ক'রে।

উমাকেই একটা চিঠি দেবে কাকুতি-মিনতি ক'রে—না কৌশলে মেয়েকে দিয়ে বড় জামাইয়ের কাছে কথাটা পাড়বে, এই কথাটাই রোজ ভাবে সে—কিন্তু কিছুতেই কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। উমা হয়তো সটান 'পারব না' বলে দেবে—কেমন এক রকমের মন হয়েছে তার। গোবিন্দও বোনপো—হেমও তাই। গোবিন্দর সংসারে টাকা গুঁজতে পারে অথচ তার বেলায় এক পয়সা ব্যয় করতে গেলেই কষ্ট!

না, বলতে গেলে জামাইকে বলাই সুবিধা।

কিন্তু—

এখনও একটা দুর্নিবার লজ্জা এসে যেন বাধা দেয়। এখনও ওটুকুকে জয় করতে পারে নি শ্যামা।

অবশেষে এই দুশ্চিন্তা থেকে অভয়পদই অব্যাহতি দেয় ওকে। এক দিন অফিসের ফেরত এসে অতি সহজেই একখানা নতুন তাঁতের শাড়ি দাওয়ায় নামিয়ে রেখে চলে যায়। কেন, কার জন্য—কিছুই বলে না। বলার দরকারও নেই। শ্যামা বোঝে—এবং মনে মনে অভয়পদর শতবর্ষ পরমায়ু কামনা করে মা সিদ্ধেশ্বরীর কাছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

ঐন্দ্রিলার সাধে মাধব ঘোষাল বেশ একটু ঘটাই করলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান হরিনাথ—তার সন্তান আসছে, তাঁর প্রথম পৌত্র বা পৌত্রী। বংশের আর এক পুরুষের সূচনা হচ্ছে। এ একটি বিশেষ ঘটনা বৈকি! তাছাড়া ঐন্দ্রিলাকে তিনি একটু বেশী স্নেহের চোখে দেখেন সে কথাটাও অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর কালোর বংশ—যেদিকে তাকান নিকষ কালো গায়ের রং। তার ভেতর পদ্ম-ফুলের মতো এই বধূটি যখন ঘোরাফেরা করে, তখন তার চোখ জুড়িয়ে যায়। শুধু ওই সুন্দরী নয়, সম্ভবত ওর দ্বারা তাঁর এই বংশের 'পণ' বদলাবে, এ আশাও তিনি রাখেন মনে মনে। আবার হয়তো কোন দিন এই বাড়িতেই ফুটফুটে সব ছেলে-মেয়েরা ঘুরে বেড়াবে, সেদিকে চেয়ে চেয়ে অনাগত কালে ভাবী গৃহ-স্বামীদের মন তৃপ্ত হবে—এমন ক'রে তাঁর মতো প্রতিনিয়ত দৃষ্টি আহত হবে না অবিরাম কালো রঙের দিকে চোখ পড়ে!

সে অসম্ভব ঘটনাও - অন্তত আজ তাঁর কাছে এটা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয় —যদি ঘটে তো সে তাঁর এই পুত্রবধূটির জন্যই ঘটবে, এই রকম একটা ধারণাও

কেমন ক'রে জন্মে গেছে তাঁর। তাই নিজেরই অজান্তে তিনি ঐন্দ্রিলাকে বেশী আদর এবং প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেন কখন—তা তাঁর হুঁশ থাকে না। হুঁশ হয় একেবারে গৃহিণীর গঞ্জনায়; তিনি বলেন, 'বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছে হতচ্ছাড়া মিনসের। মতিচ্ছন্ন হয়েছে। আদর দিয়ে দিয়ে ছুঁড়ীর পরকালটি খাচ্ছেন একেবারে। সোন্দর! সোন্দর বৌ যেন ভূ-ভারতে আর কারুর হয় না! আর কী এমন সোন্দর তাও তো বুঝি না—থাকার মধ্যে তো আছে এক ঐ রংটা—হাঁসা মোমবাতি! ড্যাবা ড্যাবা গোরুর মতো চোখ, নাকের তো কত বাহার, মাঝখান দিয়ে যেন রেলগাড়ি চলে গেছে। না গড়নের সোষ্টব, না মুখের কোন ছিরিছাঁদ। চলনটাও যদি একটু ভাল হ'ত তো বুঝতুম। মেয়ে যেন দিনরাত নেচেই আছেন! রাম রাম! সোন্দর দেখে একেবারে জ্ঞানগম্যি হারিয়ে বসল মিনসে—তখনই বারণ করেছিলুম যে শুধু ঐ রং দেখে অমন ডোমের চুপড়ি ধুয়ে তুলো না! আমারই ভুল হয়েছিল—তখন যদি আর একটু জোর করতুম তো এমন কাণ্ডটা ঘটত না। ভিখিরীর ঘর থেকে মেয়ে এনে আমার সব দিক গেল!' ইত্যাদি ইত্যাদি।

মাধব ঘোষাল এসব কথা কানে তোলেন না। প্রথম প্রথম ভয় হ'ত তাঁর ঐন্দ্রিলার জন্য। ঐটুকু মেয়ে—সে হয়তো কষ্ট পাবে। কিন্তু ঐন্দ্রিলাও নির্বিকার। সে যে শুধু গ্রাহ্য করে না তা নয় মনে হয় যেন শুনতেই পায় না। এক-এক সময় খুব অসহ্য হলে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি শাশুড়ীর নাকের কাছে তুলে দেখিয়ে চরম উপেক্ষা হেনে সরে যায় সেখান থেকে। মাধব ঘোষালই বরং উপ-যাচক হয়ে কোন কোন দিন সান্ত্বনা দিতে যান, 'ও মাগীর কথা গায়ে মেখো না বৌমা ওর মুখখানা চিরদিনই অমনি কদর্য্যি। আমায় সারাটা জীবন জ্বালাচ্ছে।'

'কে কান দিচ্ছে ওদিকে বাবা। আপনিও যেমন, কুচ্ছিতরা কখনও সোন্দরকে সহ্য করতে পারে? হিংসে তো হবেই একটু। ওদের আর দোষ কি, মাসীর মুখে শুনেছি কত তা-বড় তা-বড় লেখাপড়া-জানা লোকও সহ্য করতে পারে না—তার চেয়ে সোন্দর মানুষ।'

মাধব ঘোষাল নিশ্চিন্ত হয়ে হুঁকোয় টান দিতে শুরু করেন আবার।

সুতরাং এই পুত্রবধূটির প্রথম সাধে একটু বেশী ঘটা করবেন সেইটেই স্বাভাবিক। এমনিতেই বড় গুষ্টি তাঁদের, খুব নিকট-আত্মীয়দের বললেও এক-শোর ওপর দাঁড়ায়। মাধব ঘোষাল হুকুম করলেন, তা ছাড়াও পাড়াঘরের সব সধবাদেরই বলা হোক। তখনকার দিনে মহিলারা কেউ একা আসতেন না, এমন কি শুধু কোলের সন্তানটিকে নিয়েও নয়। আট-দশ বছর বয়সের মধ্যে যতগুলি সন্তান থাকত সব কটিকেই নিয়ে, আসতেন। ফলে লোক দাঁড়াল—ব্রাহ্মণ-সজ্জন কুটুম্ব-প্রতিবেশী সব জড়িয়ে চারশোর মতো। গৃহিনী দাঁতে দাঁত ঘষলেন, অন্য ছেলেরা একরকম অসহযোগই করল—কিন্তু মাধব কোন কিছুতেই দমলেন না। পুকুরে জাল ফেলে মাছ উঠল, চাষের চাল—তরি-তরকারিও কিনতে হ'ল না—মোটা খরচের মধ্যে শুধু দই মিষ্টি, তার জন্য তিনি এমন দিনে কৃপণতা করবেনই

বা কেন ? তা ছাড়া হরিনাথও কিছু টাকা দিয়েছিল তাকে গোপনে।'

দুপুরের খাওয়া—প্রথম দল বসতেই বেলা দুটো বেজে গেল। ফলে অতিথি-অভ্যাগতের পালা যখন চুকল তখন সন্ধ্যা পার হয়ে রীতিমত রাত হয়ে গেছে! সারাদিনের পর পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে স্নান পুজো সেরে মাধব ঘোষাল এসে খেতে বসবেন—হঠাৎ তাঁর একটা কাঁপুনি দেখা দিল। প্রবল কাঁপুনি। খাওয়া আর হ'ল না—কোনমতে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। প্রথমে কাঁথা চাপা দেওয়া হ'ল, তার পর লেপ—তাতেও কাঁপুনি থামে না। দু-তিন জনে চেপে ধরে রইল—তবুও তিনি কাঁপতেই থাকলেন হি-হি ক'রে।

হরিনাথ ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনল। আড়গোড়েতে ডাক্তার নেই, আঁদুল থেকে ডেকে আনতে হ'ল। তিনি এসে দেখে এবং সব শুনে বললেন, 'সারাদিনের ছুটোছুটি, ঘামের পর গিয়ে পুকুরে ডুবে চান করেছেন—তাই একটু সর্দি-গর্মি মতো হয়েছে। ভয় নেই, আরাম হয়ে যাবে।'

ডাক্তার ওষুধ ব্যবস্থা ক'রে চলে গেলেন। সে ওষুধও আসবে তাঁরই ডাক্তারখানা থেকে। প্রথম ওষুধ পড়তে পড়তেই রাত বারোটা বাজল। সেদিন বাড়ির কারুরই আর খাওয়া হ'ল না। ঐন্দ্রিলা সারারাত মাথার শিয়রে বসে রইল। কাঁপুনির মধ্যেই মাধব বার বার বলতে লাগলেন, 'তুমি গিয়ে শুয়ে পড় মা, এই অবস্থা—ঠায় বসে রয়েছ, বিষম ব্যথা হবে কোমরে।'

কিন্তু ঐন্দ্রিলা সে কথা কানেই তুলল না, 'আপনি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন বাবা, আপনাব ঘুম এলেই আমি উঠে যাব।'

শেষ রাত্রে কাঁপুনি থেমে প্রবল জ্বর এল।

পরের দিন হরিনাথকে ডেকে বললেন, 'বুকটায় এমন ব্যথা করছে কেন বল্ দিকি? নিঃশ্বেস নিতে কষ্ট হচ্ছে।'

আবারও ডাক্তার এলেন। বাবুরাম ডাক্তার। বড় নাম-করা চিকিৎসক। তিনি এসে পরীক্ষা ক'রে সংক্ষেপে বললেন, 'নিমোনিয়া। দুটো দিকেই—। আশ্চর্য। এক বাত্তিরের মধ্যেই কি ক'রে এমন হ'ল।'

পুলটিশ, সেঁক তাপ, মিক্সচার—কিছুরই ত্রুটি ঘটল না। কিন্তু আশা যে বিশেষ নেই, তা ডাক্তারের গম্ভীর মুখ দেখেই বোঝা গেল।

তিন দিনের দিন সন্ধ্যাবেলা মাধব ঘোষাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তাঁর বংশের সম্ভাব্য সুশ্রী শিশু—নবাগত সেই অত্যাশ্চর্য ও বহু-প্রতীক্ষিত আগন্তুককে দেখা আর তাঁর হয়ে উঠল না।

॥ ২ ॥

ঐন্দ্রিলা আঘাত পেলে খুবই। বাপের মতো স্নেহময় শ্বশুর তার। বাপের চেয়েও বেশী আপন বরং। পিতৃস্নেহ যে কি জিনিস তা তারা কটি ভাই-বোন তো টেরই পেলে না। ছেলেবেলা থেকেই দেখছে যে সে লোকটি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং অবাঞ্ছিত এক জীব। শ্বশুরের কাছে এসেই সে প্রথম পিতৃস্নেহের স্বাদ পেয়েছিল।

এগারো বছরের ফুটফুটে মেয়েটিকে পুকুর-পাড়ে বসে খেলতে দেখে সেই যে মাধব ঘোষালের পছন্দ হয়েছিল, তিনি আর কারও কোন কথাই শোনেন নি···সমস্ত রকম বাধা ও প্রতিরোধ অগ্রাহ্য ক'রে তার মা'-কে তিনি ঘরে এনেছিলেন। সে প্রীতি ও সে স্নেহ কোনদিনই কমে নি, বরং উত্তরোত্তর বেড়েই গেছে। আজ হঠাৎ এমন অসময়ে ওর সেই প্রিয় নিরাপদ আশ্রয়টি মাথার ওপর থেকে সরে যেতে অনেকখানিই অসহায় বোধ হ'ল।

আর বোধ করি সেই জন্য শাশুড়ী-দেবর-ননদের কথাগুলো এখন কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারলে না। তারই সাধ উপলক্ষে এই সর্বনাশটি হ'ল···এ কথা সে অস্বীকার করে কেমন ক'রে ? কথাটা যে সর্বাগ্রে তার মনেই এসেছে। কোন্ সর্বনেশে রাক্ষস তার পেটে আসছে···ভূমিষ্ঠ হবার আগেই তার প্রধান অবলম্বন এমন ক'রে ঘুচিয়ে দিলে !

শাশুড়ী আজকাল প্রকাশ্যেই বলছেন, 'ডাইনী ! অত বড় সাণ্ডোল মানুষটাকে শুষে খেয়ে ফেললে ! কী মন্তরে যে ভুলোল তা জানি না !··· ডাইনীর নিঃশ্বেসে বিষ আছে। ডাইনীর পেটে রাক্ষস এসেছে · মা'র পেট থেকেই মানুষ খেতে শুরু করলে। এ বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। দেখে নিও তোমরা !'

দেবর-ননদরা এতকাল বাপের ভয়ে কিছু বলতে পারত না, তারাও এবার প্রকাশ্যে ধিক্কার দিতে লাগল। হরিনাথ যদিও জ্যেষ্ঠ শ্সে একে শোকার্ত, তায় কেমন একটু অপ্রতিভও হয়ে পড়েছে ; বাপের এই আকস্মিক মৃত্যুর জন্য অংশত নিজেকেও যেন দায়ী বোধ করছে সে—সুতরাং সে এসব কথার কোন প্রতিবাদ করতে বা ভাইবোনদের তিরস্কার করতে পারে না। ঐন্দ্রিলার মনের অবস্থা অনুমান ক'রে তার কষ্ট হয় খুবই···তবুও পারে না ! যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলে শুধু।

ঐন্দ্রিলা উত্তর দিতে পারত। তার অভ্যস্ত মুখে জবাবটা আসতে ঠোঁটের কাছাকাছি ··'মন্তর জানা থাকলে তো তোমাদেরও বশ করতে পারতুম মা ! তাহলে আর এমন কথা শুনব কেন ?' কিন্তু কিছুই বলতে পারত না। নিরতিশয় আত্মধিক্কার এবং আত্মগ্লানি বোধ করতে করতে সে মনকে এই বলে শাসন করত যে এ গঞ্জনা এবং লাঞ্ছনা তার প্রাপ্য। তারই কোনও পাপে এই রাক্ষস পেটে এসেছে। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বৈকি।

কান্না এবং পরিতাপের সময় অবশ্য বিশেষ ছিল না। ব্রাহ্মণের অশৌচ দশরাত্রেই শেষ। শ্রাদ্ধের আয়োজন আছে। কিন্তু এধারেও, শুধু· যে মন ভেঙেছে তাই নয়, দেহটাও যেন এলিয়ে এসেছে। তবু কোনমতে যতটা সম্ভব করে ঐন্দ্রিলা, কিন্তু এমনই অদৃষ্ট—শ্রাদ্ধটাও নির্বিঘ্নে হ'ল না। শ্রাদ্ধের পরের দিন, নিয়মভঙ্গের আগেই ·তার প্রসব-বেদনা উঠল।

আবারও একটা ধিক্কার এবং গঞ্জনার ঝড় বয়ে গেল। যেন এজন্য সে দায়ী। চুপ ক'রে দাঁতে দাঁত দিয়ে প্রসব-যন্ত্রণা সহ্য করলে সে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী অসহ্য যেন এই বাক্যবাণ।

হরিনাথকে নিজে গিয়েই দাই ডেকে আনতে হ'ল। মেজ ভাই শিবুকে বলতে

সে সাফ জবাব দিল, 'আমি পারব না। এখনও অশৌচ গেল না, আমি বাইরের বাড়ি যাব? যেতে হয় তুমি যাও।'

এ সময়ে আর এই সব কথা নিয়ে হাঙ্গামা করা যায় না। উদ্গত নিঃশ্বাস চেপে দৌড়য় হরিনাথ। ঐন্দ্রিলা একা পড়ে পড়ে কাতরায়—গোয়ালঘরের পাশের সেই অপরিচ্ছন্ন আঁতুড়ঘরে। ঘরটা কেউ সাফ্ ক'রেও দেয় নি। স্তূপিকৃত জঞ্জালের মধ্যে কোনমতে নিজেই একটা মাদুর পেতে শুয়ে পড়েছিল সে। ননদরা তো নয়ই, শাশুড়ীও এসে উঁকি মারেন নি এর ভিতর।

দাই শশীর মা অনেক কালের লোক। এ বাড়ির হরিনাথ ছাড়া সবাইকে প্রসব করিয়েছে সে। এ অঞ্চলের ডাকসাইটে দাই, কাউকে পরোয়া করার লোক সে নয়। সে এসে বেশ চারটি কথা শুনিয়ে দিল হরিনাথের মাকে, 'হ্যাঁ গা, বলি ও বাছা শিবুর মা! এ তোমাদের কেমন ধারা ব্যাপার? শোক কার না হয়? শোকের জন্যে কি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছ তোমরা? তা তো আর কর নি। তবে? বাড়ির বড় বৌ, বংশের প্রথম সন্তান হচ্ছে—এই আঁস্তাকুড়ে! বলি ওরই বরের রোজগারে তো খাচ্ছ। এখন তো সে-ই বাড়ির কর্তা। কথাটা একটু হুঁশ করে ভেবে দেখ! ছিঃ! পাড়ার লোকে শুনলে বলবে কি?'

গৃহিণী একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। সামনেই যে মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ঝালটা গিয়ে পড়ল তারই ওপর,'আমার না হয় শোকে-তাপে মাথার ঠিক নেই—বলি তোরাও কি সব হুঁশপব্বের মাথা খেয়ে বসে আছিস?—জানি তো রাক্কস আসছে—সপুরী একগাড় করতে—কিন্তু তাই বলে তো আর পার পাব না। আমাদের কাজ তো আমাদের করত হবে। যা দা-দেইজী শত্তুর চারদিকে—একটা কথার ফ্যাকড়া পেলে আর রক্ষে নেই। উপকার করতে কেউ আসবে না—কিন্তু চুনকালী দিতে সবাই পা বাড়িয়ে বসে আছে। যা না—ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দে না একটু—হাঁ করে সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কি?'

হরিনাথ ওরই মধ্যে এক ফাঁকে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে আসে, 'দ্যাখো না—কোল-আলো করা খোকা আসছে তোমার, এক বাবা গিয়ে আর এক বাবা আসছে। ছেলে দেখলেই মা ভুলে যাবেন।'

ঐন্দ্রিলা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'ওগো আমি আর বাঁচব না। আর আমি বাঁচব না' কিছুতেই—'

শশীর মা খন্ খন্ করে ওঠে, 'ও মা, ওকি ছিরির কথা! বালাই ষাট্। এই তো—আর দেরি নেই বাছা একটুও—এখুনি সব ব্যথা জুড়িয়ে গেল বলে। তুমি দাদা এবার যাও দিকি এখান থেকে, আমাকে গোছ করতে দাও একটু।'

সন্ধ্যার একটু পরেই নবজাত শিশুর কান্না শোনা গেল।

শাশুড়ী ননদরা এবার সবাই ছুটে এলেন - কৌতূহলই আরও স্থির থাকতে দিল না।

- 'কী হ'ল গো, ও শশীর মা?'

দালানে দাঁড়িয়ে হরিনাথ আশা-আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে কান পেতে থাকে

উত্তরের দিকে। অর্ধ-অচেতন ঐন্দ্রিলাও।

শশীর মা বলে, 'খুকী গো বাছা—খুকী। পদ্মফুলের মত ফুটফুটে খুকী!'

'আবার খুকী! পোড়া কপালে হুজ্জুর। এক ফুটফুটে খুকী আমার গুষ্টি-সুদ্দু জ্বালিয়ে খেলে, আবার সেই! ডাইনীর বেটি, মায়ের পেট থেকে খেতে শুরু করেছে। হাড় খাবে, মাস খাবে, চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবে!'

শাঁখ বাজল না, হুলুধ্বনি উঠল না—আনন্দ প্রকাশও কেউ করলে না। ঐন্দ্রিলার প্রথম সন্তান হ'ল।

ক্লান্ত মুদিত দুই চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তার। আশা তারও ছিল মনে মনে । তারও ওপর হরিনাথের সান্ত্বনাটাতে বড়ই আশ্বাস পেয়েছিল সে।

সে-ও মনে মনে বলতে লাগল, 'রাক্কুসী, রাক্কুসী। আমার সুখের বাসায় আগুন লাগাতে এসেছে!'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

কোথায় কোন্ মুলুকে যুদ্ধ বেধেছে তার জন্যে এখানে কেন জিনিসপত্রের দর চড়বে, মহাশ্বেতা কিছুতেই তা বুঝে পায় না। যুদ্ধ বলতে কি বোঝায়, সে সম্বন্ধেও যে ওর খুব পরিষ্কার ধারনা আছে তা নয় মারামারি কাটাকাটি-একটু বড় রকমের এই মাত্র বোঝে। কিন্তু তার জন্য এখানে কাপড়ের দব চড়ে যাবে, নুনের বাজারে আগুন লাগবে—তার মানে কি ?

লড়াইয়ের খবর যে ওদের রোজ এনে দেয়—এ সম্বন্ধে সেও খুব ওয়াকিবহাল নয়। মহার ছোট দেওর দুর্গাপদ ইস্কুলের পড়া শেষ ক'রে নিশ্চিন্ত হযে ঘরে এসে বসেছে। বার দুই পরীক্ষাও দিয়েছিল কিন্তু কোন সুবিধা হয় নি। ক্ষীরোদার একান্ত সাধ—তার ছোট ছেলে একটা পাস করুক, তিনি পীড়া-পীড়ি করে ক'রে রাজী করিয়েছিলেন ওকে আরও এক বার পরীক্ষায় বসতে, কিন্তু অম্বিকাপদ এক কথায় নাকচ করে দিল। বললে, 'উঠন্তি মুলো পত্তনেই বোঝা যায়! ওর কিছু হবে না, মিছিমিছি আরও একরাশ টাকা খরচা! · তার চেয়ে দিনকতক ঘরেই বসে থাক, বাগান-টাগানগুলো দেখুক—এর ভেতর চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখি একটা।'

এর পর আর ক্ষীরোদা কিছু বলতে সাহস করেন নি। সুতরাং দুর্গাপদর অখণ্ড অবসর। মাঝে অম্বিকাপদ হেঁটে কলকাতায় গিয়ে পোস্তা থেকে আলু কিনে আনার ভার দিয়েছিল ওকে, পর পর দুবার রাস্তায় পয়সা হারিয়ে ফেলতেই কথাটা বুঝে সে চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হ'ল। এখন দুর্গাপদ ঘণ্টা দু-তিন ক'রে পাড়াটা ঘুরে আসে আর লাফাতে লাফাতে বাড়ি ঢুকে নতুন নতুন খবর দেয়।

'ইউরোপে বুঝলে বৌদি—দারুণ এক কাণ্ড হয়ে গেছে। এক রাজ্যের রাজপুত্তুর আর এক রাজ্যে গিয়েছিল, সেখানকার কে এক বেটা তাকে মেরে

ফেলেছে। তাই নিয়ে মহা হৈ চৈ হচ্ছে। হয়তো খুব বড় লড়াই একটা বেধে যেতে পারে।'

'কি বললে? কী দেশ? ইউরোপ? সে আবার কোথায়?' চোখ বড় বড় ক'রে মহাশ্বেতা প্রশ্ন করে।

'ইউরোপ গো, ইউরোপ জান না? কি মুশকিল! তোমরা ছাই জিওগ্রাফি পড় নি, মুখ্যুখু মেয়েমানুষ—তোমাদের কি বোঝাব।'

'তুমি তো এত পণ্ডিত, এক্‌জামিন দিতে বসে এসব লেখাপড়া কোথায় যায়?' মুখ টিপে হেসে প্রমীলা ফোড়ন কাটে।

দুর্গাপদ কোন দিনই মেয়েদের কথা গ্রাহ্য করে না, সে একটা 'হুঁ।' বলে কথাটা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে মহাশ্বেতাকে বোঝাতে বসে, 'সে অনেক দূর বড় বৌদি—হাজার হাজার ক্রোশ দূর। সেখানে শুধু সাহেবরা থাকে, সাদা চামড়ার লোক।'

'ও, সায়েবদের দেশ! বিলেত বল। মিছিমিছি ইউরোপ-মিউরোপ অত কথা বলছ কেন।'

'তোমরা ঐ এক বিলেতই শিখেছ। আরে বাপু সাহেব কি এক রকম আছে? ইংরেজ ফরাসী জার্মান রুশ—সবাই সাহেব। তোমরা দেখলে কি চিনতে পারবে?—তা পারবে না। যারা জানে তারা ঠিক চিনে নেয় কোন্‌টা কে। বিলেত হ'ল ইংরেজের দেশ। খুবই ছোট্ট একরত্তি দেশ। তাও ওটা ঠিক ইউরোপে নয়, দেশ ছাড়া—আলাদা মুল্লুক একটা।'

'তুমি বুঝি সব দেখলেই চিনতে পারো ছোট্ ঠাকুরপো!' প্রমীলা আবারও চিম্‌টি কাটে।

এবার আর উত্তর দেয় না দুর্গাপদ, চরম তাচ্ছিল্যভরে পিছন ফিরে দাঁড়ায়।

মহাশ্বেতার কিন্তু এসব দিকে লক্ষ্য থাকে না। ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা ভাবে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করে। সাহেবদের আবার আলাদা জাত আছে? মাগো, সব সাহেবই তো এক রকম দেখতে, ওদের আলাদা আলাদা চেনে কেমন ক'রে—কে জানে।

অনেক দিনের কথা মনে পড়ে যায়। মহার দিদিমা ছিলেন চন্দননগরের মেয়ে, তিনি ফরাসীদের কতকটা বেশী আপন মনে করতেন। পথেঘাটে সাহেব দেখলে নাক সিঁটকে বলতেন, 'যতই বলিস তোরা, আমাদের ফরাসীদের মত ইংরেজরা সুন্দর নয়। হুম্‌দো হুম্‌দো মুখ আর রূপী বাঁদরের পেছনের মতো লাল রং। না চেহারার লালিত্য আর না রঙের বাহার।'

তখন কথাটার মানে বুঝত না—এখন যেন খানিকটা খানিকটা বুঝতে পারে। 'সত্যি, দিদিমা অনেক জানত শুনত বাপু—যত যা-ই বল। এখনকার লেখাপড়া জানা পুরুষদের ঘোল খাইয়ে দিতে পারত।' মহাশ্বেতা মনে মনে তারিফ করে।

আর এক দিন তেমনি ঝড়ের মতো ছুটে এসে দুর্গাপদ খবর দিলে, 'ভয়ানক কাণ্ড মা। ইংরেজ আর জার্মানে লড়াই বেধে গেল। দ্যাখো না—কী কাণ্ড হয়!'

'সে আবার কি রে? এই সেদিন কি একটা বললি অস্টিরিয়া-মস্টিরিয়া—কত

লড়াই বাধছে রে ? কলি দেখছি এইবারেই চার-পো হয়ে উঠল।'

'না।·· তোমাদের দেখছি বোঝানোই মুশকিল। ওরে বাপু সেই একই লড়াই। আগে তো দুটো দেশই ঝগড়া বাধালে। লড়াইও শুরু হ'ল। এখন দু' পক্ষই চাচ্ছে দল ভারী করতে। এ দেশ ও দলে যাচ্ছে তো ও দেশ এ দলে আসেছে। এমনি আর কি! এখন শুনছি আসল লড়াইটা হচ্ছে ইংরেজদের সঙ্গে ওদের—মানে জার্মানীর লোকদের। জার্মানীর মতলব নাকি আগাগোড়াই এই—ইংরেজদের মুল্লুকগুলো হাতাবে। ওদের নাকি বড্ড লোভ এই বাংলা দেশের ওপর। এখানকার মাটিতে তো সোনা ফলে। আর ওদের দেশে শুনেছি কিচ্ছু পাওয়া যায় না।'

ক্ষীরোদা অবিশ্বাসের হাসি হাসেন, 'হ্যাঁ, ইংরেজদের মুল্লুক অমনি নিলেই হ'ল! মহারাণীর রাজত্বে সুয্যি অস্ত যায় না—এদের দাপট কী সোজা!'

'সেই জন্যেই তো ওদের এত আক্রোশ গো। এরা কেন এত রাজত্ব ভোগ করবে?'

তার পর একটু দম নিয়ে দুর্গাপদ ওদের জ্ঞান দিতে বসে, 'ইংরেজদের আর অত দাপট নেই। এখন নাকি জার্মানীর জোরই বেশী। সবাই তাই বলছে। বলছে যে ইংরেজরা তিন মাসের মধ্যেই হেরে ভূত হয়ে যাবে। জার্মানী নাকি অনেক দিন ধরেই এই মতলব আঁটছে। একটা মজার কথা আজ শুনে এলুম—চক্কত্তি মশাই গল্প করছিলেন– মহারাণী ভিক্টোরিয়া বেঁচে থাকতেই নাকি জার্মানীর রাজা এক তাস বার করেছিল, তাতে সায়েবের জায়গায় নিজের ছবি ছেপেছিল আর বিবির জায়গায় মহারাণীর·· এ তো আবার মহারাণীর নাতি হয় কি না –মুখে বললে দিদিমাকে নিয়ে রসিকতা করেছি। দিদি-নাতির রসিকতা তো এমন চলেই। কিন্তু সবাই বললে আসল মতলবটা ঐতেই বুঝিয়ে দিলে।'

ক্ষীরোদা গালে হাত দিয়ে বলেন, 'ওমা, তাই নাকি! পেটে পেটে এত! অবাক করেছে। তা মহারাণী কিছু বললেন না?'

'কী বলবেন? হাজার হোক নাতি তো!'

'ওমা··—তা মামাতো ভায়ের সঙ্গে লড়াই করবে?'

'হ্যাঁ, রাজরাজড়াদের আবার মামাতো পিসতুতো ভাই!·· নিজের ভাইকেই বড় রেয়াত করে!·· নবাবরা তো শুনেছি রাজা হয়েই আগে ভাইগুলোকে কেটে ফেলত।·· তার ওপর এরা তো আবার সাহেব!

॥ ২ ॥

এসব গল্প-কথা শুনতে মন্দ লাগে না। কোন্ সুদূর মুলুকে—কাদের যেন গল্প তার সঙ্গে ওদের জীবন-যাত্রার সম্পর্ক কি?

কিন্তু সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত হতে হ'ল বৈ কি।

বিলিতি কাপড়, কেরোসিন তেল, চিনি,—এমন কি নুন পর্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠল। দশ আনা বারো আনার কাপড়খানা দেড় টাকা দু' টাকায় পাওয়া দায়, আরও দূরে গাঁ অঞ্চলে নাকি ভদ্দর ঘরের মেয়েরা গামছা পরে কাটাচ্ছে। লজ্জা

নিবারণ করতে না পেরে নাকি কোথায় একটি মেয়েছেলে গলায় দড়ি দিয়েছে। এর মানে কি ?

স্বামীর কাছে প্রশ্ন ক'রে উত্তর মেলে না। খুব বিরক্ত করলে অভয়পদ বলে, 'ও তুমি বুঝবে না। মেলাই কাণ্ড।'

অম্বিকাপদর তো সময়ই নেই। দিনরাত সংসারের কাজ আর হিসেব। এই নিয়েই ব্যস্ত সে। তাকে কিছু বলতে গেলেই হাত নেড়ে বলে, 'সর সর। আমার এখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। ওসব ঘ্যানর ঘ্যানর করার সময় নেই।'

অগত্যা দুর্গাপদকেই পাকড়াও ক'রে ধরে মহাশ্বেতা।

ব্যাপারটা কি, তাকে বুঝতেই হবে।

দুর্গাপদ বিজ্ঞভাবে বোঝাতে বসে, 'আরে, এটা আর বুঝলে না ? ওসব মাল তো বিলেত থেকেই আসত। তা সে সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে আসা তো ! জাহাজে করে আসে। জার্মানীরা একখানা জাহাজও আসতে দিচ্ছে না। গোটা গোটা জাহাজ ডুবিয়ে দিচ্ছে রোজ, মাল সুদ্দু। ওরা এক রকম ডুবো জাহাজ বার করেছে, জলের তলা দিয়ে চলে। তাদের কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু তারা সবাইকে দেখে। ইংরেজদের জাহাজ দেখছে আর ডোবাচ্ছে। মাল আসছেই না, তার পাবে কি।'

ব্যাপারটা যে ঠিক বোঝে—তা নয়। তবু এক রকম সান্ত্বনা পায়। কারণ একটা আছে— সেইটেই বড় কথা।

'তা এ পোড়ার যুদ্ধ থামবে কবে। থামলে যে বাঁচি, হাড় জুড়োয়।'

'বল না কথাটা একবার দাদাকে।…দাদা হরির নুট মানছে যুদ্ধ এখন না থামে। আর তোমার কী এমন অসুবিধেই বা হচ্ছে ? তোমার কি পরনে কাপড় নেই ? না ব্যন্নে নুন জুটছে না ?'

সে-ও এক সমস্যা মহাশ্বেতার।

ইদানীং অস্বাভাবিক একটা কি কাণ্ড-কারখানা চলছে ওদের বাড়িতে, যার কোন মাথা-মুণ্ডু সে বোঝে না। দু' ভাইই অনেক রাত ক'রে বাড়ি ফেরে, কোথায় যায় কী করে—কোন হদিসই পাওয়া যায় না। বাড়ি ফিরেও দুজনে মেজকর্তার ঘরে দোর দিয়ে বসে কি সব করে, বাইরে থেকে আড়ি পেতে দু এক দিন টাকা গোনবার শব্দও পেয়েছে। মেজকর্তার হিসেব-নিকেশের কাজও বেড়েছে যেন আজকাল।

আবার এক-একদিন রাত দুপুরে দু' ভাই কোথায় বেরিয়ে যায়। সঙ্গে দুর্গাকেও নিয়ে যায় তুলে। তারপর ভারী ভারী লোহার মাল গড়াতে গড়াতে বয়ে নিয়ে আসে। মোটা মোটা তারের বাণ্ডিল, কলকব্জা যন্ত্রপাতি - এক এক দিন এক-এক রকম। এই সব মাল - চুপিচুপি রাত-দুপুরে এসে ঘরে ওঠে, আবার দু-চার দিন পরে কারা সব এসে নিয়ে যায়। মনে হয় টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যায়।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘরেরও অভাব নেই আর। এর মধ্যে দু-দুখানা ঘর ক'রে ফেলেছে অভয়পদ। যদিও মহাশ্বেতা শোয় সেই আগেকার ভাঙা-ঘরেই ! নতুন

ঘর একখানা নিয়েছে অম্বিকা—আর একখানায় বুড়ী, দুর্গা আর ওর শাশুড়ী শোয়। পুরোনো ঘর গুলোতে শুধু মাল থাকে আজকাল।

ব্যাপারটা দিন-দিনই হেঁয়ালী হয়ে উঠছে মহাশ্বেতার কাছে। মনে হয় প্রমীলা জানে কিন্তু তার কাছে ভালরকম কোন জবাব পাওয়া যায় না—শুধু সে মুখ টিপে হাসে আর বলে, 'নেকু!···কী দিয়ে ভগবান তোকে গড়েছিল দিদি তাই ভাবি!'

অনেকদিন পরে, অনেক সাধ্য-সাধনায় প্রমীলাই ওকে কথাটা বুঝিয়ে দিলে, 'ওলো, চোরাই মাল লো চোরাই মাল। বটঠাকুর যে কোম্পানির ভাঁড়ার দেখেন। এস্টোর না কি বলে সেইখানে থাকেন। গঙ্গার ওপর বড় টিনের চালা – সেইখানে বসেন উনি একা। এদিক ওদিক দেখে বড় বড় ভারী মাল গঙ্গায় গড়িয়ে ফেলে দেন। নৌকো ঠিক করাই আছে, সন্ধ্যের পর সেই নৌকো গিয়ে মাল তুলে নেয়। তারপর তারা এসে এই সরস্বতীর খালের মুখে মাল দিয়ে যায়। নৌকোয় আসে বলেই তো অত রাত হয়। রাত্তিরে গিয়ে মাল তুলে আনে। অনেক মাল ঐখানে ঐখানেই বিক্কিরি হয়ে যায়, যা হয় না সেইগুলোই বাড়ি আসে। আবার খদ্দের ঠিক হলে তারা রাত-দুপুরে বাড়ি এসে মাল তুলে নিয়ে যায়। যুদ্ধুর বাজারে লোহা লক্কড়ের দাম তো বিস্তর বেড়েছে কিনা - চারগুণো পাঁচগুণো দাম। তাই চোরাই মালও মোটা টাকায় বিক্কিরি হয়!'

অনেকক্ষণ অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে মহাশ্বেতা। তারপর বলে, 'ও মা, তা ধরা পড়ে না?'

'এঁরা তো গোড়ার দিকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে থাকেন না। এস্টোরের দারোয়ান জানে—তা সে তো ভাগ খায়! ধরা পড়ে নৌকোর মাঝিমাল্লারা জেল খাটবে। তারা মোটা টাকা মুনাফা পায়, এক-আধ মাস জেল খাটলেই বা কি? দু-একবার ধরা পড়েছেও নাকি এর মধ্যে - কিন্তু আগে থাকতেই বলা-কওয়া ছিল, এদের নাম করে নি তারা, কোথা থেকে তুলে এনেছে তাও বলে নি!'

এতক্ষণে ব্যাপারটা একটু একটু পরিষ্কার হয় মহাশ্বেতার কাছে। দুর্গাপদর সেদিনের ইঙ্গিতটাও বুঝতে পারে।

সেইজন্যে যতদিন যুদ্ধ চলে তত দিনই ভাল - এদের কাছে।

রাত্রে শোবার সময় মহাশ্বেতা আর কথাটা চেপে রাখতে পারলে না। যদিচ এখনও অভয়পদ সেই আগের মত চলনেই রাত কাটায় তবু প্রথম রাত্রে ক্ষানিকক্ষণ ঘরে শোয় সে, ছেলেমেদের আদর করে এই সময়টা। দু-একটা কি হিসেব-নিকেশও করে প্রদীপের আলোতে বসে। এই সময় একটু যা দেখাশুনো হয় তার সঙ্গে। আজ ঘরে আসতেই মহাশ্বেতা কথাটা বলে ফেলল, 'তোমরা চোরাই মালের কারবার কর! তোমরা চোর? ছি!'

এই প্রথম অভয়পদর মুখের প্রশান্তি যেন একটু নষ্ট হয়। ভ্রূ কুঁচকে সে বলে, 'কে—বললে কে তোমায়? তুমি এসব কথায় থাক কেন? কী বোঝ তুমি সংসারের?'

'যে-ই বলুক। কথাটা তো সত্যি। আর সংসার বুঝি না বুঝি চুরি করা যে দোষ সেটা বুঝি।'

'সে আমিও জানি। কিন্তু এক্ষেত্রে দোষ নেই। তিনটে সায়েবের কাজ আমি একা করি, মাইনে পাই সিকির সিকি! আরও কম বরং। একেবারে গোমুখ্খু সায়েবও একটা পায় তিন শো টাকা, আমি পাই তেত্রিশ টাকা। তাও এ্যাদ্দিনে। আমার সংসারটা চলে কিসে?'

মহাশ্বেতা খানিকটা চুপ করে থাকে। এই যুক্তিগুলোর যেন জবাব খুঁজতে থাকে সে মনের মধ্যে। শেষে কিছুই না পেয়ে বলে, 'তা হোক বাপু, কাজটা ভাল না। শেষে কোন রকমে লোক জানাজানি হয়ে গেলে সে একটা ঢিঢিক্কার!'

অভয়পদ এ কথার উত্তর দেয় না। খাতাপত্র কুলুঙ্গিতে তুলে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

এত পয়সা কার জন্যে তাও তো বোঝে না মহাশ্বেতা। নিজে তো বাবু বিছানাও ছেড়ে দিয়েছেন আজকাল। খালি একটা কাঠের বেঞ্চিতে একটা কাঠের পিঁড়ি মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকেন!

ভোগই যদি না করলে তো এমন অধর্মের পয়সা কামিয়ে লাভ কি?

নিবন্ত দীপশিখার কম্পিত মৃদু আলো ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসে, কিন্তু মহাশ্বেতার চোখে ঘুম নামে না।

কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভোগ করতে থাকে সে।

॥ ৩ ॥

যুদ্ধের খবর পুরোপুরি শ্যামাও রাখে না কিন্তু ওর প্রত্যক্ষ ফল যেটা, সেটার খবর তার কানে পেঁছয় ঠিকই। পয়সা নাকি বাতাসে উড়ছে, ধরে নিতে পারলেই হ'ল। ধরে নিচ্ছেও অনেকে, তা তো সে চোখেই দেখছে। তার মধ্যে বড় জামাইও একজন। কথাটা বুঝতে মহাশ্বেতার যত সময় লেগেছে ততটা হেমের লাগে নি—এবং হেমের মুখ থেকে শ্যামার কানে উঠতেও দেরি হয় নি। মেয়ে-জামাইয়ের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে হোক, তাতে শ্যামা আনন্দিতই—যদিচ বোকা অভয়পদ নাকি সব টাকাই মায় এই চুরির টাকাও, মেজ ভাইয়ের হাতে ধরে দেয়, মেয়ের কথাবার্তা থেকে এই কথাটা শোনা পর্যন্ত শ্যামার মনে স্বস্তি নেই, যত জেরা করেছে মেয়েকে তত সেই সন্দেহটাই দৃঢ় হয়েছে।

কিন্তু উপায়ই বা কি? মেয়েটা যা আকাট বোকা, ওর দ্বারা একটি পয়সাও আদায় হবে না, তা শ্যামা বিলক্ষণ জানে। মেয়েকে 'বোকা' মুখ্খু 'নেকী' বলে গালাগাল দিয়ে মনের ঝাল মেটাবার চেষ্টা করে শুধু। উপদেশও দেয় মাঝে মাঝে, রোজ একটা করে পয়সা চেয়ে নিলে তোর মাসে আট আনা জমে যায়, বছরে ছ টাকা! টাকায় দু' পয়সা ক'রে সুদ সব জায়গায়, দুটো টাকা খাটালে মাসে এক আনা করে হাতে আসে! বছরে বারো আনা। তুই এমন বোকা যে তাও আদায় করতে পারিস না! আর দেবে নাই বা কেন? জোরের সঙ্গে চাইবি। স্বামীর

টাকা পয়িবার চাইবে—এর মধ্যে আবার লজ্জাই বা কি ভয়ই বা কি? ওদিকে দেখ্‌ গে যা তোর জা টাকার আণ্ডিল সরাচ্ছে। সে তো তোর মতো বোকা নয়। সে তোর শ্বশুরের গুষ্টির সবকটাকে এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনে আনতে পারে! ঐ হবে আর কি, দিন থাকতে দিন কিনে নিচ্ছ না, এর পর ঐ জায়ের বাঁদীগিরি করতে হবে বলে দিলুম! · আমার পেটের মেয়ে তুই—এত বোকা!

মহা মথা নিচু ক'রে থাকে, নয়তো অন্যদিকে তাকায় আর মুচকি মুচকি হাসে অপ্রতিভের মতো। বড় জোর বলে, 'কী জানি বাপু, সে আবার যা মানুষ চাইতে ভয় হও। হয়তো এক বিপরীত কাণ্ড ক'রে বসবে। যে লোকের সঙ্গে ঘর করতে হয়—চেন না তো তাকে! আমাকে কোন কথা বলে নাকি? না আমি কিছু টের পাই? যা কিছু পরামর্শ ঐ মেজর সঙ্গে—দুটি ভাই-ই সমান, মনকলা খায় শুধু ভেতরে ভেতরে ওরা!'

'যা, যা!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দেয় শ্যামা, 'সে শুধু তোরই কাছে। তোর জার কাছে মনকলা খেয়ে পার পায় কি? সে দ্যাখ্‌ নাড়ী-নক্ষত্র জেনে বসে আছে। তোকে বলবে কি কথা—তুই কি মানুষ একটা! যা বলবে সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সারা গাঁয়ে ঢাক পিটিয়ে বেড়াবি।'

যতই বলুক আর যা-ই করুক, ও চুরির পয়সা মেয়ের বাক্সে একটিও উঠবে না—তা শ্যামা বিলক্ষণ বোঝে। বোঝে বলেই জামাইয়ের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ ও অসন্তোষ জমে ওঠে মনের মধ্যে। সে অসন্তোষ মেয়ের দোতলায় ঘর ওঠবার সংবাদেও যেমন যায় না—মেয়ের গায়ে নতুন সাত ভরির তাগা আর পাঁচ ভরির কেবল হার উঠতে দেখেও যায় না। কারণ প্রশ্ন করার আগেই মহাশ্বেতা খুশী হয়ে খবরটা দেয়, 'তা ওদের বাপু নেয্য বিচার, কোন অর্শদর্শ নেই, আমার যত ভরির জিনিস হয়েছে, 'মেজ বৌয়েরও ঠিক তত ভরির। এক চুল ইদিক উদিক নেই। এক প্যাটেন—এক সব। বরং আমার হারটার দেড় পাই বেশী ওজন আছে। ওজনে বেশী বেরোতে মেজ বললে, তবে ঐ হারাটা বৌদি নিক, হাজার হোক মান্যে বড়!'

'নে বাপু চুপ কর্‌।' শ্যামা বিরস মুখে ধমক দিয়ে ওঠে, তোর এসব ন্যাকা-পনা কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে ওঠে। অত বোকামি আমি সইতে পারি নে। অর্শদর্শ নেই! কেন অর্শদর্শ থাকবে?···বলি টাকাটা কি তোর দেওর বাড়তি রোজগার করে? সে তা থাকে কলকাতার আপিসে বসে, চুরিটা তো গঙ্গার ধারের গুদোমে। ওর মধ্যে তো মেজ কর্তার এক পয়সাও পাওনা হয় না। তার বৌ পাবে কেন? ··তুই যেমন নেকী। 'পড়ত আমার পাল্লায় তো সমান ওজনের গয়না গড়ানো বার ক'রে দিতুম।···তুই ঝগড়া করতে পারিস না?···কেন পাবে মেজ বৌ, কেন পাবে ও—তাই শুনি?'

'ওমা তাই কি বলা যায় নাকি? একত্তরে রয়েছি।' কেমন একটা অপ্রস্তুত ভাবে বলে মহাশ্বেতা। একটুখানি চুপ করে থেকে কুণ্ঠিত স্বরে আবার বলে, 'তাই তো শুনেছি মেজ দ্যাওর আমাদের এঁর চেয়ে মাইনে বেশী পায়।···তার ওপর আমার

সংসার বড়—ওর তো এখনও ছেলে-পিলেই হ'ল না। আমার তো মেটের তিনটি—এরই মধ্যে। খরচ তো আমারই বেশী।'

কুণ্ঠিত ভাবের মধ্যেই সামান্য একটু গর্বের সঙ্গে তাকায় মায়ের দিকে। খুব জ্ঞান ও বুদ্ধির কথা, হিসেবের কথা মা'র সামনে বলতে পেরেছে—গর্বটা যেন এই জন্যেই।

অসহিষ্ণু ভাবে শ্যামা জবাব দেয়, 'তুই থাম বাবা। তোর কথা শুনলে হাসব কি কাঁদব তাই ভেবে পাই না।· ক টাকা মাইনে বেশী পায় তাই শুনি? আমি হেমের কাছে সব শুনেছি। বড় জামাই পান তেত্তিরিশ, মেজকত্তা পায় চাল্লিশ।·· কী এমন তফাৎটা? ওদিকে যে বাড়িত মোটা টাকা আনছে জামাই? তার হিসাবটা দেখেছিস? জানিস কত টাকা রোজগার হয় এক এক দিনে? আমি হেমের মুখে সব শুনেছি। এক বাণ্ডিল তারের দামই ছিয়ানব্বুই টাকা!'

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে মহাশ্বেতা। জবাব দিতে পারে না।

কিন্তু শুধু মেয়ে বঞ্চিত হচ্ছে এইটেই অভিযোগ নয়। মনে মনে আরও একটা অভিযোগ শ্যামার আছে জামাই সম্বন্ধে।

হেমকে অভয়পদই চাকরি ক'রে দিয়েছে, আর এমনই চাকরি যে এক পয়সা বাড়তি আয় হবার সম্ভাবনা নেই সেখান থেকে। রং কলের চাকরি। এক টিন রং পাচার করতে পারে বড় জোর—কিন্তু তার কীই বা দাম? অথচ ঝুঁকিও কম নয়।·· হেমকে সে ইঙ্গিতও দিয়ে দেখেছে শ্যামা—কিন্তু কোন সুবিধে হয় নি। একেবারে নিরাশ ক'রে দিয়েছে হেম, 'বাব্‌বা, চারদিকে সাতশো লোক। সবাই ঐ তাল খুঁজছে! আমি কী এমন মাতব্বর চাক্‌রে বল? চুরি কি আর হচ্ছে না, দেদার চুরি হচ্ছে ঠিকই—তবে সে সব উঁচু মাইনের বাবুরা, সায়েবরা করছে। আমাদের কোন সুবিধা নেই।'

মা'র অসন্তোষ ও অসহিষ্ণুতাতে এক-এক দিন হেসে ফেলত হেম, বলত, 'মা তুমি কি মনে কর যে লোহার কারখানাতে ঢুকলেই আমার দেদার রোজগার হ'ত? ঐ বড় জামাইবাবুর অফিসেই কি সবাই অমনি রোজগার করছে? ওটা বরাত, নইলে এত লোক থাকতে ঐ তেত্রিশ টাকা মাইনের লোককেই বা সাহেবেরা অত বড় স্টোরের ভার দেবে কেন? আর ঐ নির্জন গঙ্গার ওপর জায়গায়? স্টোর তো ঢের আছে!'

এ সব কথা বোঝে না শ্যামা, বিশ্বাসও করে না। অদৃষ্টকে দোষ সে-ও দেয় অবশ্য, কিন্তু আসলে সে এর জন্য দায়ী করে ওদের দুজনকেই। কতকটা হেমের অকর্মণ্যতা, তার চেয়ে বেশী অভয়পদের আক্রোশ! সে চায় না যে হেম তার ভায়ের চেয়ে বেশী রোজগার করুক। নইলে এর চেয়ে ভাল চাকরি কি একটা যোগাড় করে দিতে পারত না?

অস্ফুট কণ্ঠে আপন মনেই গজ গজ করে এক-এক দিন, 'আড়ি আকোচ—আড়ি আকোচ! আসল কথা—করবে না কিছু। ভিখিরী ভিখিরীর মতো থাক—অত কেন? আমি কি আর বুঝি নে মনের ভাব! সবাই বলে জামাই ভাল, জামাই

ভাল। মিট্‌মিটে ডান ।· নিজেরা মড়্‌মড় টাকা রোজগার করেছেন, আমার বেলায় এমন একটা চাকরি—যে একটা পয়সা বাড়তি আমদানি নেই।· ভগবান তেমনি একচোকো। যাকে দেবে, ঢেলে দেবে একেবারে—যাকে দেবে না তাকে কিছুই দেবে না। সকলকারই দিন ফেরে, আমার দিন ফেরার নাম নেই।'

॥ ৪ ॥

হঠাৎ একটা সুযোগ কিন্তু এসে যায়।

অক্ষয়বাবু যুদ্ধ বেধে পর্যন্ত মেতে উঠেছেন লড়াই নিয়ে। আগে একখানা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ নিতেন, এখন তিনি দৈনিক কাগজ নিচ্ছেন। অফিস থেকে ফিরে এলে রোজ বৈঠক বসে তাঁর দাওয়ায়। গ্রামসুদ্ধ লোক আসে, আলোচনা চলে অনেক রাত পর্যন্ত। সে হল্লায় শ্যামা বিরক্তই হয। লড়াইয়ের খবরে তার কোন কৌতূহল নেই। এদের এই অতিরিক্ত কৌতূহলের কোন কারণ তাই সে বুঝতে পারে না। 'কোথায় লড়াই বেধেছে তার ঠিক নেই, তোদেব তা নিয়ে এত মাথা ঘামানো কেন? বলে এক গাঁযে ঢেঁকি পড়ে আর গাঁয়ে মাথাব্যাথা। কোথায কোন্ মুলুকে জার্মানীরা কী করছে, তাই নিয়ে তোরা গেলি যেন। আসল কথা যাহোক একটা কিছু নিয়ে খানিক চকড়বা করা চাই। উত্তম ওষুধ জুটেছে এখন।'

অক্ষয়বাবু বাড়ির মধ্যেও জ্ঞান দেন মধ্যে মধ্যে, তামাক খেতে খেতে বলেন, 'জান গিন্নী ইংরেজ রাজত্ব আর থাকবে না। জার্মানেরা নিয়ে নেবে সব। আমাদের বাবুরা তো ইরি মধ্যে জার্মানী পড়তে লেগে গেছেন।'

মঙ্গলা গালে হতে দিয়ে বলেন, 'ওমা সে কি কথা গো। অমন কথা বলো না—ইংরেজদের হারিয়ে দেবে অমনি এক কথায়? বলে এত বড় মোগল পাঠান যা পারলে না জার্মানেরা তাই পারবে।'

'রেখে দাও তোমার মোগল পাঠান। সে সব ঢাল-তলোয়ারের রাজত্ব আর নেই। এখান কামান-বন্দুক, জেপেলিন, মাইন, বোমা। জার্মানেরা জেপেলিন বার করেছে, এই গেরামের মতো একটা জাহাজ বাতাসে ওড়ে।·· আর হাউইজার না কি কামান—তার গোলা গিয়ে পড়ে দশ-বারো কোশ দূরে।'

অবিশ্বাসের হাসি হেসে মঙ্গলা জবাব দেন, 'কার গাঁজায় দোক্তা। কম হয়েছে? দশ ক্রোশ দূরে কামানের গোলা গিয়ে পড়ছে আর গেরাম উড়ছে বাতাসে। বেখে বসো দিকি!'

অক্ষয়বাবু চটে ওঠেন, 'তুমি কামানের কি বোঝ? কামান দেখেছ চোখে যে ফট্ ক'রে একটা কথা বলে বসলে? আর জেপেলিন আকাশে উঠছে কি না—এই ছবিতে দ্যাখো, এই, এই।'

খবরের কাগজখানা মেলে ধরেন অক্ষয়বাবু মঙ্গলার চোখের সামনে।

এবার মঙ্গলা বিশ্বাস করেন। বলেন, 'ওমা কী হবে! তা হলে তো ইংরেজরা পারবে না। বলি সত্যি সত্যিই জার্মান আসবে নাকি?· আমাদের ছেলেদের ইংরিজি ছেড়ে আবার জার্মানী শিখতে হবে? তা হ্যাঁগা, কদ্দিনে আসবে ওরা?'

তার পরই হটাৎ গলাটা খাটো ক'রে আবার প্রশ্ন করেন, 'তাই বুঝি তুমি কোম্পানির কাগজগুলো সব বেচে দিয়ে নগদ ক'রে নিলে ?'

'চুপ চুপ !' চাপা ধমক দিয়ে ওঠেন অক্ষয়বাবু, 'মাগী আমার সর্বনাশ না ক'রে ছাড়বে না দেখছি, বাড়িতে ডাকাত না পড়লে আর চলছে না !'

কিন্তু এসবে প্রায়ই কানে দেয় না শ্যামা। কান দেবার তার অবসরও নেই। দুঃখের ধান্দায় যাকে ঘুরে বেড়াতে হয় তার অত বাজে খবর নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে চলে না। ইংরেজই থাক আর জার্মানীই আসুক—তার দুঃখ ঘুচবে না !

এর মধ্যে একদিন একটা কথা কানে আসে। শ্যামা আর হেম দুজনেই চমকে ওঠে সে কথা শুনে।

অক্ষয়বাবু কাকে বোঝাচ্ছেন, 'বলি শুধু কাপড়ের কথা তুলছ কেন ? কোন্ জিনিসটা এদেশে হয় বল। ছিষ্টি তো সেই জাহাজ ভর্তি হয়ে আসত তবে আমাদের দিন চলত।...অত কথা কী বলব, শিশি-বোতলগুলোর কি দাম হয়েছে ! একটা ছোট শিশি, তাই তিন-চার আনায় বিকুচ্ছে ! পুরোনো শিশি যোগাড় ক'রে না নিয়ে গেলে ডাক্তারখানায় ওষুধ মেলে না আজকাল। যদি বা দেয়, এক শিশি মিকচারের দামের সঙ্গে শিশির দাম ধরে নেয় চার আনা।'

শ্যামা উত্তেজনায় বিবর্ণ হয়ে উঠেছে শুনতে শুনতে।

কিছু আগেই ওর ফোড়ন আর মশলা রাখবার ভাঁড় ভেঙে গিয়েছিল, শ্যামা বলেছিল খাবারের দোকান থেকে কটা ভাঁড় চেয়ে আনতে। হেম তার বদলে অফিস থেকে দু-তিনটে শিশি এনে দিয়েছিল। ওদের অফিসে নানান জিনিস আসে—ছোট বড় মাঝারি শিশি ক'রে। সে সব শিশি এক পাশে জড়ো হয়, যার যা দরকার নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ফেলে দেওয়া হয় ঝেঁটিয়ে, শিশিগুলো দেবার সময় এই ইতিহাসটুকুও বলেছিল হেম।

এমনিই যদি রোজ কটা ক'রে শিশি আনতে পারে তা হলেও তো হয়। রোজ দুটো ক'রে আনলেও অন্তত চার আনা পয়সা। মাসে মাসে সাত আট টাকা।

লোভে, আশায় শ্যামার চোখ জ্বলতে থাকে।

চাপা গলায় সে ছেলেকে তিরস্কার করে, 'তুই বেটাছেলে হাটে বাজারে ঘুরে বেড়াস—তা কি একটা খবরও কান দিয়ে শুনিস না ? অ্যাদ্দিন রোজ একটা ক'রে শিশি জমলেও কতকগুলো জমে যেত বল্ দিকি ? মেয়েমানুষেরও অধম তোরা !'

হেম বিরক্ত হয়ে বলে, 'হ্যাঁ দুটো পুজো সেরে সাড়ে ছটায় অফিস যাই, সন্ধ্যে সাতটায় ফিরি—কত সময় আমার ! আমি এখন যাই বাজারে ঘুরে কোন্ জিনিসের কী দর বাড়ল তাই খবর নিতে !'

তখনকার মতো মাকে থামিয়ে দিলেও হেম শেষ অবধি রাত্রে বাড়ি ফিরল দুই পকেটে দুটো শিশি নিয়ে। অ্যাসিডের শিশি, ছোট ছোট। তা হোক, শ্যামা সেগুলো সযত্নে সাজিয়ে রাখে তক্তপোশের নিচে। সস্নেহে তাদের গায়ে হাত বুলোয়। এখন আর ওগুলো সামান্য কাচের শিশি নয় তার কাছে—মণিমুক্তার

মতই মূল্যবান।

সেদিন থেকে প্রায়ই নিয়ে আসে হেম—একটা দুটো ক'রে। কোন কোন দিন তিন-চারটেও আনে। কিন্তু সে অবাক হয় মায়ের ভাবগতিক দেখে। জমিয়েই যাচ্ছে শিশিগুলো, কৈ বেচবার তো কোন লক্ষণ নেই!

একদিন মুখ ফুটে প্রশ্নও করে, 'কাল তো ছুটি আছে বাজারে গিয়ে দেখব নাকি কত দর ওঠে?'

'ক্ষেপেছ তুমি! এইখানে বেচতে যাও আর চার দিকে ঢিঢিক্কার পড়ে যাক। যা শত্রুপুরীতে বাস। ও এখন জমুক। এক পুঁটুলি হলে কলকাতায় গিয়ে বেচে আসব আমি নিজে। তাতে দামও বেশী পাব। তুমি যা হাঁদা ছেলে, আধাকড়িতেই হয়তো বেচে দিয়ে বসে থাকবে, ভাববে খুব লাভ করেছ।'

সত্যিই-সত্যিই শ্যামা একদিন এক পুঁটুলি শিশি নিয়ে কলকাতায় এল। নতুন বাজারের ধারে সার সার যে সব পুরনো শিশিবোতলের দোকান সেইখানে ঘুরে দরদস্তুর ক'রে বেচে পয়সা গুছিয়ে আঁচলে বাঁধলে—মোটা এক টাকা চৌদ্দ আনা!

তার পর কমলাদের ওখানে গিয়ে উঠল।

কমলা জিজ্ঞাসা করলে, 'কি রে, হঠাৎ?'

'না। এমনিই। অনেকদিন তোমাদের দেখি নি, তাই।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

একটু একটু ক'রে সাহস বাড়ে হেমের। আজকাল সে একটা ছোট ঝাড়ন নিয়ে আফিসে যায়, আসবার সময় পুটুলি বেঁধে নিয়ে আসে শিশি-বোতল। সেখান থেকে বার করা অসুবিধা নয়, এখানে আনাই অসুবিধা। কে দেখবে, কী ভাববে! তবু আসবার পথে ওল কি কচুর শাক কি কালকাসুন্দা তুলে পুঁটুলির ওপরের দিকে বেঁধে নেয়—যাতে বোতলগুলো ঢাকা পড়ে থাকে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা এ তো কথাতেই আছে, শাক দিয়ে বোতল ঢাকতে দোষ কি! আপন মনেই হাসে হেম এক এক দিন। তাও সাধ্যমত দিনের আলোয় পাড়ায় ঢোকেনা—বেশ একটু অন্ধকার হলেই আসে।

কিন্তু তাতেও মুশকিলের শেষ হয় না শ্যামার।

ঘর তো ঐ একখানা। তক্তপোশের নিচে ছাড়া কোন জিনিস রাখবার জায়গা নেই। অথচ পিঁটকীর ছেলেমেয়েরা হরদমই আসছে এ ঘরে। ওর কপালে যে হয়েছে সবই বিপরীত। বিয়ে হলে মেয়েছেলে শ্বশুরঘর করবে—এই তো সবাই জানে। কপাল পোড়ে সে আলাদা কথা—এর বর আছে, আসে-যায়, ভাব-সাবেরও কমতি নেই। অথচ বারো মাসেই পড়ে আছেন বাপের বাড়ি। কি না—তাদের অবস্থা ভাল নয়, খাওয়া-দাওয়া ভাল নয়। মুখে আগুন অমন নোলার আর অমন পিরবিত্তির। এ শুধু শ্যামার কপাল! এক আধটা হলে ঢেকে রাখা যায়,

কিন্তু একপুঁটুলি বোতল-শিশি টাকা সোজা কথা নয়। অথচ একপুঁটুলি না হ'লে কলকাতায় যাওয়ার মজুরি পোষায় না। শিশি-বোতল এখানে কিনবে কে? মৌড়ীর খটিতে নাকি দোকান হয়েছে—কিন্তু সে-ও তো বহুদূর। তার চেয়ে সোজাসুজি কলকাতাতে যাওয়াই ভাল। দর হু-হু ক'রে বাড়ছে সেখানে। একটু ভারী পুঁটুলি বয়ে নিতে যেতে পারলে তিন টাকা সাড়ে তিন টাকাও হয়। তা নইলে চলেই বা কেমন ক'রে। বারো আনা দামের রেলির বাড়ির ধুতিটা আড়াই টাকা হয়ে গেছে। তাও দুষ্প্রাপ্য।

শ্যামা নিত্য নূতন জায়গা উদ্ভাবন করে সেগুলো লুকোবার। ছোট ছোট পুঁটুলি বেঁধে রেখে দেয়। দিনের বেলা বিছাবার কাঁথাগুলো একপাশে গোটানো থাকে - তার আড়ালে রাখা চলে, কিন্তু রাত্রে সে আশ্রয় থাকে না। অথচ ওদের আসবার সময়-অসময় নেই। আর তার ছেলেমেয়েগুলোও হয়েছে তেমনি -দিন রাত ঐ পিঁটকীর ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গেই খেলা! মঙ্গলার ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, তারা বড় জোর হেমের সঙ্গে গল্প করে, বাইরে বাইরেই সেটা চলে। এরা শুধু ঘরে নন, সটান দুম্ ক'রে তক্তপোশের ওপরই উঠে পড়ে—হুড়যুদ্ধ তো লেগেই আছে। কোন দিন না ঐ বোতলগুলোর ঘাড়ে পড়ে সব ভাঙে! ভাঙুক, সেটা অত ভয়ঙ্কর ক্ষতি নয়, কিন্তু যা ঢিঢিক্কার হবে তারপর এই নিয়ে—ভাবতেই শ্যামা শিউরে ওঠে।

দাঁতে দাঁত চেপে গালাগাল দেয় ছেলেমেয়েদের, 'মুখে আগুন, নাথখোরের ঝাড়! এমন নইলে এ দুর্গতি হয়! আমার পেটেই বা আসবে কেন? লজ্জা-ঘেন্না হায়া-পিত্তি কিছু নেই! হরদম মার খাচ্ছেন, অপমান হচ্ছেন—কথায় কথায় তো ওরা দিয়ে যাচ্ছে দুমদাম বসিয়ে,—তবু কি লজ্জা আছে? ওদেরই সঙ্গে যত খেলা। আর ওরাও তেমনি—ছেলেমেয়ে তো নয়—দস্যি এক-একটি, গিলছে কুটছে আর ডাকাত তৈরী হচ্ছে।'

শুধু কি তাই।

ভয় ওর নিজের ছেলেমেয়েদেরও কম নয়! যা বোকা, ওরাই হয়তো গল্‌গল ক'রে কোন্ দিন বলে ফেলবে। মঙ্গলার স্বভাব—নিজের কোটে পেলেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করা—কী রান্না হ'ল, কী দিয়ে খেলি, কী করলি সারাদিন, মা কোথায় যায়, কি করে—এই সব নানা প্রশ্ন।

সে অবশ্য নিত্য একবার ক'রে আড়ালে ধমক দেয় কান্তি-তরু-কানুকে; রোজ সতর্ক ক'রে দেয়, তবু দুশ্চিন্তা থেকেই যায় একটা।

অবশ্য সমস্যা যতই হোক্—শ্যামা অসাধ্য সাধনই করে। একটি একটি ক'রে দশ মাস কেটে যায়—ওর রহস্য প্রকাশ পায় না তখনও। কেবল ওর নিজেরই বুদ্ধির দোষে কথাটা উমাদের কাছে জানিয়ে ফেলেছিল। লাভ হয় নি কিছুই—শুধু শুধু জানাজানি হয়ে ওদের কাছে একটু খাকতাই হতে হ'ল।

কার কাছে যেন শুনেছিল শ্যামা, দোকানে নিজেরা নিয়ে গেলে বড় ঠকায়, তার চেয়ে ঘরে রেখে ফিরিওয়ালাদের কাছে কাছে দরদস্তুর ক'রে বেচতে পারলে

অনেক বেশী দাম পাওয়া যায়। তাই একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে কথাটা দিদির কাছে পাড়তে গিয়েছিল। এই উপকারটুকু ওরা করতে পারবে না? কোথাও যেতে হবে না—হাটে নয় বাজারে নয়, বাড়ির দোরে শিশিবোতলওলা ডেকে দর ক'রে বেচা—এ আর এমন কঠিন কাজ কি?

কমলা হয়তো এক কথাতেই রাজী হয়ে যেত, কিন্তু উমা একেবারে বেঁকে দাঁড়াল, ছি! ও তো চোরাই কারবার ছোড়দি। কথাটা তুমি মুখে আনলে কি ক'রে! ছোটখাটো ফল-পাকুড় চুরি করতে করতে তোমার গা-সওয়া হয়ে গেছে, তাই আর এর অপমানটা দেখতে পাও না, কিন্তু আমরা ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েছেলে হয়ে চোরাই মাল বেচব—এ কথা তুমি মুখে আনলে কি ক'রে? গোবিন্দ কী শিক্ষা পাবে বল তো? বৌমাই বা কি ভাববেন? তাছাড়া আমরাও একজনদের বাড়ির মধ্যে বাস করি—তারা কি বলবে! তোমার না হয় লাভ হবে, তোমার সবই সইবে—আমাদের লাভের মধ্যে তো চোর বদনাম! ও আমরা পারব না!'

মাথা হেঁট ক'রে চলে আসতে হয়েছিল শ্যামাকে। নিজের বোনকে জেনে-শুনেও কেন যে কথাটা পাড়তে গিয়েছিল। নিজের নিবুদ্ধিতায় নিজেরই গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছা করে।

হঠাৎ পর পর দু-তিনটে দিন হেম এল শুধু-হাতে।

শ্যামা প্রশ্ন করলে, 'কি রে, কি ব্যাপার।'

হেম উত্তর দিলে না প্রথম দিন। দ্বিতীয় দিন সংক্ষেপে শুধু বললে, 'একটু অসুবিধে হচ্ছে।'

তৃতীয় দিনেও ঐভাবে আসতে দেখে শ্যামা চেপে-চুপে ধরল, 'আজও আনতে পারলি না কিছু? কি ব্যাপার? নাকি পথে নিজেই বেচে দিয়ে আসছিস?'

কুটিল সংশয়ের সুর তাব কণ্ঠে। কাঁচা টাকার ব্যাপার—কাউকেই বিশ্বাস নেই তার।

হেম এ খোঁচা গায়ে মাখল না, কিন্তু একটু বিরক্তভাবেই বললে, 'সকলেরই তো চোখ আছে, পয়সারও দরকার আছে। শুধু আমিই লুটেপুটে খাব—অন্য লোক তা সইবে কেন?'

শ্যামা একটা চুপ ক'রে থেকে বলে, 'এত কাল সইছিল, এখন আর হঠাৎ সইছে না?'

'জানি নে। চুপ কর দিকি একটু—বকো না।'

ছেলের মুখের ভাব কেমন থমথমে। গলার আওয়াজটাও ভাল নয়, শ্যামা আর পীড়াপীড়ি করে না—তখনকার মত চুপ ক'রে যায়। কিন্তু ভাবগতিক তার আদৌ ভাল লাগে না।

সারারাত ঘুম হ'ল না তার। এটা বাড়তি, হিসেবের মধ্যে নয, তবু এতদিন ধরে নিয়মিত পেয়ে আসার ফলে, টাকাটা যেন প্রাপ্যর মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে। ন্যায্য পাওনার মতোই ওটার ওপর ভরসা জন্মেছে—তেমনি ভয়ও হচ্ছে বৈকি বন্ধ হওয়ার

আভাসে-ইঙ্গিতে।

সমস্ত রাত অজ্ঞাত আশঙ্কায় কণ্টক-শয্যাতে-ছট্‌ফট করার পর ভোরের দিকে একটুখানি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ অতি-পরিচিত একটি কণ্ঠের চিৎকারে চম্‌কে ধড়মড়িয়ে উঠল শ্যামা।

নরেন এসেছে।

উঠোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেন তুড়িলাফ খাচ্ছে। বিজয়গর্বে তার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত, কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত উল্লাস।

'হবে না! এ যে হতেই হবে! ঈশ্বর তো আছেন একজন মাথার ওপর! দর্পহারী মধুসূদন কারুর দর্প সন না। তেজ হয়েছিল—তেজ! বলি এখন সে তেজ রইল কোথায়? দু'পয়সা রোজগার ক'রে ধরাকে সরা দেখেছিল একেবারে। যেমন দেমাক ঐ গোরবেটার, তেমন দেমাকে মাগীর। নে, এখন মায়ে-পোয়ে বসে বসে দেমাকের গোড়ায় জল ঢাল!'

শ্যামা আজকাল আর ভয় করে না স্বামীকে। বেরিয়ে এসে ধমক দিল, বলি ও হচ্ছে কি, ষাঁড়ের মতো গাঁক্ গাঁক্ ক'রে চেঁচাচ্ছ কেন!...পাঁচ'টা মানুষ ঘুমোচ্ছে, তারা কি মনে করবে! ভোরবেলাই নেশা-ভাঙ করেছ বুঝি?,

'নেশা! নেশা হয়েছিল তোর—তোদের। · পয়সার নেশা। সে নেশা ছুটে যাবে!'

শেষের দিকের কথাগুলো বলবার সময় অদ্ভুত একটা সুর বেরোল নরেনের কণ্ঠে। সে যেন একপাক্ নেচেই নিল।

এতক্ষণে শ্যামার তন্দ্রা ভেঙেছে রীতিমতোই। সে একটু শঙ্কিত হয়ে উঠল। এতখানি উল্লাস—প্রতিহিংসার মতো আনন্দ—একেবারে অকারণ হতে পারে না।

সে উঠোনে নেমে এসে এবার একটু চাপা গলাতেই বললে, 'বলি এবার একটু থামবে কি? কী হয়েছে কি? অত ফুর্তি কিসের?'

'তোদের তেজ ভেঙেছে যে। ফুর্তি করব না? ছেলের চাকরির অংকারে ধরাকে সরা দেখছিলি একেবারে! চাকরি তো গেল! আমাকে চোর বলে অপ-গেরাজ্যি করা হ'ত। এবার ছেলেকেও তো চোর বলে দেগে ছেড়ে দিলে একে-বারে। তার কি করবি? বেটাছেলের চোর-বদনামের চেয়ে আর কোন বদনাম আছে? এই বয়সে চোর বদনামে চাকরি গেল। তোরা নাকি নেহাত নিঘিন্নে নিপিত্তে, তাই লোকের কাছে মুখ দেখাচ্ছিস! অন্যলোক হলে গলায় দড়ি দিত!

সে চিৎকারে বাড়িসুদ্ধ কেন, পাড়াসুদ্ধ লোকেরই ঘুম ভাঙবার কথা। মঙ্গলা-রাও ভিড়ে ক'রে এসে পড়েছিলেন। এইবার বাসিমুখে গোটা দুই পান আর খানিকটা দোক্তা পুরে এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলি কার চাকরি গেল গো ঠাকুর? ভোরবেলা শুভ সংবাদটি নিয়ে এলে কার?'

'কার আবার—ঐ গোরবেটার!—এই যে—এই হারামজাদী মাগী—বুঝলেন না, বেউড় বাঁশের ঝাড়ে বেউড় বাঁশই হয়—বুঝলেন না।—ঐ মাগী চোর, দেখছেন

না, আপনাদের বাগানকে বাগান চুরি ক'রে ভূষিন্যাশ করলে। তার ছেলে আর কত ভাল হবে! আবার ঐটি যে পেয়ারের ছেলে।'

'বলি তোমার ছেলের—আমাদের হেমের চাকরি গেল? কী বলছ গো ঠাকুর? হ্যাঁলা, ও বামনী, কি বলছে পাগলা ঠাকুর?'

'কি বলছি ঐ গোরটার জাতকেই জিজ্ঞেস করুন না। চাকরি গেল, তাই কি এমনি? চোর দুর্নামে। আমার ছেলে তুই—সামান্য শিশিবোতল চুরি ক'রে চাকরিটা খোয়ালি! মারি তো হাতি, লুটি ভাণ্ডার! তা নয়—কিনা শিশি-বোতল। তা আবার হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলি! বেটা বেজম্মা আকাট কোথাকার!'

শ্যামার মনেহ'ল সমস্ত মাটিটা টলছে। এই বাড়ি, উঠোন শুধু নয়—সমস্ত পৃথিবীটাই।—কিন্তু পৃথিবীটা টলে নি, টলছে ওর নিজেরই মাথা। এই মুহূর্তে সত্যি সত্যিই একটা বড় ভূমিকম্প হলে যেন বাঁচত সে—সীতার মতো মাটিতে সেঁধিয়ে যেতে পারত।

কিন্তু তা হ'ল না। মঙ্গলা আর সবাইকে ঠেলে ঘরে এসে ঢুকলেন এবার, সঙ্গে সঙ্গে পিঁটকীও—যেখানে হেম মাথা হেঁট ক'রে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। তার পর অবিশ্রান্ত জেরায় সবই বেরিয়ে এল—একটি কথাও গোপন করা গেল না।

শিশিবোতলগুলোর যখন কোন দাম ছিল না—তখন কারুরই নজরে পড়ে নি। শেষে টনক নড়ল সবাইকারই। বিশেষ ক'রে দারোয়ানেদের। ওটা ওদেরই প্রাপ্য বলে তারা মনে করলে—মাঝখান থেকে এই বাবুটা ভাগ বসায় কেন? দু-তিন দিন হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছিল তারা। শেষে একটা বন্দোবস্ত হয়েছিল—চার ভাগের এক ভাগ নেবে হেম। কিন্তু হেম বেছে বেছে ভালগুলোই নিত, তার ফলে দারোয়ানরা চটে একেবারেই কণ্টক দূর করলে। ছোট সাহেকে জানিয়ে হাতে-নাতে ধরিয়ে দিয়েছে সেদিন।

ঐ কটা শিশিবোতল কোম্পানীর লাভের ঘরে জমা হ'ত না এবং হবেও না কোন দিন। সাহেবও ভাগ বসাতে আসবেন না। কিন্তু চুরি চুরিই—সাহেব সেটা বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নন। নেহাতই ছেলেমানুষ, কাজটা ক'রে ফেলছে—বাবুরাও সকলে ওর হয়ে অনুরোধ উপরোধ করায়—সাহেব পুলিসে দেন নি বটে, কিন্তু ওকে চাকরিতে বহাল রাখতে আর কিছুতেই রাজী হন নি। কালও হেম গিয়েছিল—এই তিন দিনই যাচ্ছে—অনেকেই ওর হয়ে বলেছেন, কিন্তু সাহেব কোন অনুরোধ শুনতে রাজী হন নি। কাল একেবারে জবাব হয়ে গেছে।

মঙ্গলা মুখে কিছুই বললেন না, বরং ক্ষেত্র-মাফিক দু'একটা সহানুভূতি ও সান্ত্বনার কথাই বললেন, কিন্তু তাঁর মেয়ের ওষ্ঠপ্রান্তে যে সানন্দ কৌতুক ও ব্যঙ্গের হাসি উঁকি মারছিল তা নিতান্ত বালকদের চোখেও চাপা রইল না। পিঁটকী বেরিয়ে গিয়ে, এ উঠানে পেরিয়ে নিজেদের উঠোনে পড়বার মুখে বেশ সকলের শ্রুতিগোচর ভাবেই বললে শুধু, 'ঠিকই বলেছে ঠাকুর, ভগবান আছেন! পাঁচ দিন চোরের এক দিন সেধের—এ তো জানা কথা।'

॥ ২ ॥

বিপদ একা আসে না—এতকাল শুনেই এসেছিল শ্যামা—কথাটার মর্ম এবার হাড়ে হাড় অনুভব করলে।

হেমের চাকরি যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঐন্দ্রিলার খবর।

এর মধ্যে অবশ্য প্রথম সংবাদটাই সবচেয়ে মর্মান্তিক—

ওদের মতো হতদরিদ্রের সংসারে একমাত্র উপার্জনকারী লোকের আয়ের পথে বন্ধ হওয়ার মতো দুর্ঘটনা আর নেই। এমন কি তা বোধ হয় সাধারণ আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথার চেয়েও দুঃসহ। অন্তত শ্যামার তাই মনে হ'ল। এর আগে তার দু-তিনটি সন্তান মরে গেছে—একটি তো বেশ বড় হয়েছে—তাতেও বোধ হয় দুঃখটা এত দুর্বল বলে মনে হয় নি। প্রতিটি দিন-রাত্রি যেন চিন্তাটা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে থাকে মনে। ঘুম হয় না কিন্তু জাগরণের মুহূর্তগুলিও কাটে যেন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে।

টাকা আছে। এই ক মাসের শিশিবোতল বেচা টাকার একটি পয়সাও সে সংসারে খরচ করে নি। জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে তার জন্য কৃচ্ছ্রসাধনই বাড়িয়েছে, বাড়তি টাকায় হাত দেয় নি। কাপড়ের দামটাই সব চেয়ে বেশী - তার জন্য ছেলেমেয়েগুলোরই দুর্দশা। বাড়িতে তারা ছেঁড়া 'কানি'পরে থাকে বললেই হয়। শ্যামাও তাই—তবে তাকে মাঝে মাঝে বাইরে বেরোতে হয় বলে আস্ত শাড়ি একখানা অন্তত বাঁচিয়ে রাখে। আর গোটা কাপড় লাগে হেমের। তবে যত অভাবই হোক - ব্রত-পার্বণের কল্যাণে লালপাড় শাড়ি এবং ধুতি এক-আধখানা মেলেই।

কিন্তু সে অন্য কথা।

টাকা জমছে। আছেও তা খুব সঙ্গোপনে। নরেনের কেন—ছেলেমেয়েদেরও ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।

কিন্তু সে টাকাতে শ্যামা প্রাণ ধরে হাত দিতে পারবে না। সে টাকার একটি ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশও খরচ করতে রাজী নয় সে।

ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে মনের সাঙ্গোপনে একটি অতিশয় উচ্চাভিলাষ মাথা তুলেছে ওর মধ্যে। ওর পক্ষে তা অসম্ভব, একান্ত দুরাশা—সে উচ্চাশা সফল হবার সুদূরতম সম্ভাবনা এমন কি নিজের মনের কাছেও স্বীকার করতে পারে না সে—তবু তা কী এক অমোঘ এবং দুর্নিবার শক্তিতে ওকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। বিলাস তো নয়ই জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি থেকেও নিজেকে বঞ্চিত ক'রে সে সেই আশা-তরু-মূলে জল সিঞ্চন করছে। বরং বুকের রক্ত সিঞ্চন করছে বলাই উচিত।

নিজের বাড়ি।

কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করতেও হাসি পায় ওর নিজেরই। তার মতো পরাশ্রয়ীর নিজের বাড়ি, একে উচ্চাশা বললেও যথেষ্ট বর্ণনা হয় না।

একেই বুঝি বলে বামনের-চাঁদ ধরবার শখ। ব্যাঙের সাগর পার হবার সাধনা।

তবু—তাই-ই তো করছে সে।

একটি একটি ক'রে প্রায় ছ'শোটি টাকা জমেছে ওর!

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য।

গুনতে বসলে নিজের হাত এবং চোখকেও বিশ্বাস হয় না যেন। কিন্তু বার বার গুনে দেখেছে সে। আর মাত্র কয়েকটি টাকা হলেও ঐ কল্পনাতীত সংখ্যা পূর্ণ হবে।

ওর মতো ভিখারীর পক্ষে কুবেরের ঐশ্বর্য।

এর থেকে সামান্য কিছু টাকা খরচ করলেও এখন অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য পেতে পারে—তা শ্যামা জানে। একটি পয়সারও ক্রয়ক্ষমতা কতখানি তা তার বেশ জানা আছে! যত আক্রাই হোক—এখনও এক পয়সার নুনে সাত দিন চলে। এক পয়সার পাঁচফোড়নে মাস চালায় সে। অবশ্য ফোড়ন ব্যবহার করার খুব পক্ষপাতীও নয় শ্যামা। সামান্য তেলে তাকে রাঁধতে হয়—ফোড়ন দিলে সেটুকু তেলে ফোড়নেই শুষে নেয়। ব্যঞ্জনের সঙ্গে মিশে তার স্বাদ বাড়াবার কোন কাজে লাগে না।

ছেলেমেয়েগুলো সদা-সর্বদাই ক্ষুধার্ত হয়ে থাকে। তাদের কোটরগত চক্ষুর উদগ্র লোলুপ দৃষ্টির দিকে তাকালে মায়ের প্রাণে আঘাত লাগে বৈ কি। শতচ্ছিন্ন মলিন বেশ—ভিখারীরও অধম। তবু ঐ টাকা থেকে একটি পয়সাও ভাঙতে পারে না শ্যামা।

না। ভাঙবেও না। বহু অপমান সয়েছে সে। বহু লাঞ্ছনা। প্রতিটি অপমানের স্মৃতি তার মনে জমা আছে। স্মৃতির গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মিশে আছে সে ইতিহাস। একা পথ চলতে চলতে কিংবা নির্জন নিস্তব্ধ দুপুরে পাতা কুড়োতে কুড়োতে সেই রশিতে টান পড়লেই নতুন ক'রে জ্বলতে থাকে প্রত্যেকটি ঘা। লোকে বলে মার খেয়ে খেয়ে কড়া পড়ে যায়—তখন আর লাগে না। ভুল কথা, কড়ার ওপর লাগলে আরও বেশী যন্ত্রণা হয়। অবিশ্রান্ত পথ চলে চলে তার পায়ের নীচে অগুন্তি কড়া পড়ছে। সে কড়ার কোনটি দৈবাৎ যদি কোন কাঁকর কি খোয়ার ওপর পড়ে—বেদনায় চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে।··

যদি উপবাস ক'রে ক'রে সত্যিই কোনদিন ছেলেমেয়েরা মরতে বসে—তখন যা হয় করবে। তার আগে নয়।

হেম ঘোরে টো টো ক'রে। লজ্জাই বেশী তার। বাড়ির লোক, বিশেষত সরকারদের সামনে মুখ দেখাতে তার লজ্জা করে। মনে হয় প্রতিটি লোকের সকৌতুক দৃষ্টি চোর বলে তাকে বিদ্রূপ করছে। চুরি তারা বহুদিন থেকেই করছে সত্যি কথা—কিন্তু সে চুরি আলাদা। চুরি ক'রে চাকরি যাওয়ার মতো অপমানকর নয় তো।

চাকরি অবশ্য বসে নেই তার জন্যে। তার ওপর অফিস থেকে কোন সার্টিফিকেট পায় নি। তবু ঘোরে—এখানে ওখানে, পাগলের মতো। অফিসে অফিসে ঘোরে

আর ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

শ্যামা নিজে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে ছেলের হয়ে যজমানির কাজ চায়। কিন্তু সকলকারই পুরনো লোক আছে। বাড়তি কাজ মেলা শক্ত। লক্ষ্মীপুজো মনসা পুজো বাড়তি কাজ পাওয়া যায় না।

তা ছাড়া—শ্যামা বেরিয়ে আসতে আসতে তাকে শুনিয়েই কেউ কেউ মন্তব্য করে 'বাব্‌বা, ও চোরকে কে বাড়িতে ঢোকাবে। তার পর পুজোর বাসনকোসন নিয়ে পালাক একদিন!'

এই অনিষ্টটি ক'রে গেল নরেন। নইলে কাকে-বকেও টের পেত না। বাপ হয়ে চিরদিন ছেলেমেয়েদের অনিষ্টই ক'রে যাচ্ছে সে। স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের পথে বসিয়ে, অপরের বাড়ির দাসত্ব করিয়েও শান্তি নেই তার।

রাগে দাঁত কিড়মিড় করে শ্যামা। অনুপস্থিত স্বামীকে গালাগালি দেয় অনুচ্চকণ্ঠে।

আর এদেরও চেনে সে। ভাল ক'রেই চেনে। সবাই সাধুপুরুষ। অফিসে যারা চাকরি করে—অফিস উজোড় ক'রে নিয়ে আসে। কাগজ, পেন্সিল, নিব কলম—এগুলো কি চুরি নয়! নিজেরাই বলে 'উপরি' আছে। 'উপরি'টা কি? চুরি, না হয় ঘুষ—কিন্তু সেও তো জুচ্চুরি।

গালাগাল দিয়ে তখনকার মতো গায়ের জ্বালা মেটে বটে কিন্তু আয়ের কোন উপায় হয় না। উত্তেজনার শেষে আসে অবসাদ আর একটা হিম-হতাশা। একটু একটু ক'রে মনটা ভেঙে আসে কোথায় যেন!

এরই মধ্যে এল দ্বিতীয় দুঃসংবাদ।

ঠিক আগের দিনই শ্যামা ভাত বেড়ে দিতে দিতে হেমকে উপদেশ দিয়েছে, একবার হরিনাথের কাছে যা না। ওর তো রেল অফিস—যখন তখন লোক নেয়। যদি একটা কাজকর্ম করে দিত!'

'গিছলুম তো। তুমিও তো বলেছ! আবার গিয়ে লাভ কি!' হেম সংক্ষেপে জবাব দেয়। এ জ্বালাতন তার ভাল লাগে না। মায়ের নিত্য অভিযোগ এবং নিত্য নূতন উপদেশ। মায়ের অতিরিক্ত আগ্রহই তাকে চুরিতে প্ররোচিত করেছিল সেটা আজ মায়ের মনে নেই। মা তো এখন স্পষ্টই বরং বলে, 'চাকরি বাঁচিয়ে চুরি করতে পারতিস তো চুরির মানে হ'ত! এমন কাঁচা চুরি করতে যাস কেন? তার চেয়ে যা পেতিস—দুঃখের ভাত সুখ ক'রে খেতুম।'

শ্যামা আজও ছেলের কথার উত্তরে জিদ করে, 'একবার গেলে কি একবার বললে যদি চাকরি হ'ত তা হলে আর ভাবনা ছিল না! এসব ব্যাপারে বার বার যেতে হয়, অনেক সময় মানুষ বিরক্ত হয়ে ক'রে দেয়! দায় কার? তার না তোর?'

হেম নিঃশব্দে খেয়ে উঠে যায়।

নাজ্‌নে ডাঁটা সস্‌সড়ি আর ভাত। চুরি ক'রে নাজ্‌নে ডাঁটা পাওয়া যায়—ডাঁটা আর আমড়া। ডাঁটা সস্‌সড়ির সঙ্গে আমড়া-গোলা কাঁচা অম্বল। এই চলছে

কদিন ধরে। তাতে তত কষ্ট ছিল না—মায়ের বাক্যিতে যত কষ্ট। প্রতিদিনই ভাত খেতে বসলে শুরু হয় এই নাকে-কান্না এবং অভিযোগ! অন্য সময় পালিয়ে বেড়ায়, খেতে বসলেই জব্দ! এই সময়টা চোখকান বুজে শুনতেই হয়। ফলে ভাতটাই বিষ মনে হয় আজকাল।

অবশেষে ক্লান্ত হয়ে হেমকে প্রতিজ্ঞা করতেই হয় যে কাল সকালে সে আড়-গোড়ে যাবে।

কিন্তু সেই কাল সকালের আগেই ভোরবেলা দোরে ধাক্কা পড়ে ওদের।

প্রথমটা মনে হয় নরেন—শ্যামার চোখমুখ কঠিন হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গেই, কিন্তু তার পরেই মনে হয়, শুধু দোরে ধাক্কা দিয়ে চুপ ক'রে থাকার লোক তো নয় সে, এতক্ষণ তার চিৎকারে পাড়া জেগে উঠত।

বিস্মিত এবং কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে দোর খুলতেই চোখে পড়ল—ঐন্দ্রিলা, মেয়ে কোলে দাঁড়িয়ে অঝোরঝরে কাঁদছে। তার চুল উসকোখুস্‌কো, বেশবাস অবিন্যস্ত, চোখেমুখে কালি, যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে।

ভয়ে উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে গেল শ্যামা।

'এ কী রে? এমন ভাবে কোথা থেকে? কার সঙ্গে এলি? ব্যাপার কি? ওদের বলে এসেছিস তো? এত ভোরে এলিই বা কেন? জামাই ভাল আছেন তো?'

একসঙ্গে এক সহস্র প্রশ্ন করে শ্যামা।

ঐন্দ্রিলা প্রায় টল্‌তে টল্‌তেই ঘরের মধ্যে এসে মেঝেতে বসে পড়ে।

'একটু জল দাও মা—জল!'

ততক্ষণে ছেলেমেয়েরাও উঠে পড়েছে। হেমই ছুটে গিয়ে জল গড়িয়ে নিয়ে এল। তরু কোল থেকে মেয়েটাকে নিয়ে নিলে তাড়াতাড়ি।

শ্যামা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তবু তখনও সর্বনাশের পরিমাণ আন্দাজ করতে পারেনি সে। সে ভাবছে জেদী মেয়ে তার—শ্বশুরবাড়িতে, হয়তো বা জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রেই, এমন ভাবে পালিয়ে এসেছে। এই নিয়ে কত অশান্তি হতে পারে সেই ভেবেই সে আকুল!

সে প্রশ্ন ক'রেই যাচ্ছে উপর্যুপরি।

জল খেয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থেকে সেই চরম দুঃসংবাদটি দিলে ঐন্দ্রিলা। না, কারুর সঙ্গে আসে নি সে। কাউকে বলেও আসে নি। সে সময়ও ছিল না।

হরিনাথের অসুখ করেছে। সাংঘাতিক অসুখ।

পরশু জ্বর নিয়েই ফিরল অফিস থেকে। সামান্য জ্বর। কাল আফিস যেতে বারণ করেছিল ঐন্দ্রিলা, শোনে নি। বিকেলে অফিস থেকে ওকে ধরে নিয়ে এল অন্য বাবুরা—ধরাধরি ক'রে। অজ্ঞান, অচৈতন্য। সেখানে গিয়ে নাকি কাশতে গিয়ে রক্তবমি করেছে। একবার নয়—অনেক বার। আফিসের ডাক্তার দেখে বলেছে—যক্ষ্মাকাশ, রাজযক্ষ্মা। এখন থেকেই খুব ভাল চিকিৎসা হলে একআনা আশা আছে বাঁচবার। নইলে—

কথা শেষ করতে পারলে না ঐন্দ্রিলা। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল আবারও।

পাথর হয়ে গেছে শ্যামা। কিছুই তার মাথায় যাচ্ছে না যেন। তার অমন স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ জামাই, কষ্টিপাথরের মতো রং এবং তেমনি কঠিন শরীর।

তার ঐ রোগ হ'ল? যক্ষ্মা! যে রোগের নাম শুনলেই লোকে শিউরে ওঠে!

'না না খেঁদি, তোর ভুল হচ্ছে!' শ্যামা বলে ওঠে।

সেইজন্যেই তো এসেছে ঐন্দ্রিলা।

কালই হাতে যা ছিল তাই দিয়ে বাবুরাম ডাক্তারকে এনেছিল সে। কাল রাত্রেই। তিনি বলে গেছেন সাহেব-ডাক্তাব ডাকতে হবে। তিনিও রাজযক্ষ্মাই মনে করেন, কিন্তু এ রোগের এখানে চিকিৎসা করা অসাধ্য। বাইরে পাঠাতে হবে। কিন্তু তাব আগে এখনই আর এল. দত্ত অথবা কোন ভাল সাহেব-ডাক্তার আনা উচিত।

অর্থাৎ এখনই একশোটি টাকা বার করতে হবে। বত্রিশ টাকা ফি, পাড়াগাঁয়ে এলে ডবল। তা ছাড়া গাড়িভাড়া আছে।

টাকা ঐন্দ্রিলার কাছে ওর অর্ধেকও নেই।

একে তো মাইনের সব টাকা আজও মায়ের হাতেই ধরে দেয় হরিনাথ, তার ওপর দু-এক টাকা ক'রে যা ঐন্দ্রিলা জমিয়েছিল, মাত্র মাসখানেক আগেই ধার নিয়ে বসে আছে—হরিনাথ নিজেই। অফিসের কোন বন্ধুর বোনের বিয়ে হচ্ছিল না—তাকে দিয়েছে। সে নাকি মাসে মাসে শোধ দেবে কিছু কিছু করে। কিন্তু এখন?

শ্যামা তাকে অন্তত পঞ্চাশ টাকা ধার দিক, সে গয়না বেচে পরে শোধ ক'রে যাবে। কিন্তু গয়না বেচা বা বাঁধা দেওয়া কোনটাই তো এখনই হতে পারে না, অথচ এখনই ডাক্তার ডাকা দরকার। মাত্র পঞ্চাশটি টাকা—দেবে না, দিতে পারবে না শ্যামা?

পাথরের মধ্যেও কি এমন অনুভূতি থাকে?

একটা হিম-শৈত্য মেরুদণ্ড বেয়ে নামছে কেন ওর এমন ভাবে!

পঞ্চাশ টাকা!

'দোহাই মা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। এখনও ডাক্তার ডাকলে হয়তো বাঁচতে পারে, বাঁচার পথ থাকে একটা।'

হ্যাঁ থাকে। কিন্তু সে সম্ভাবনা এক আনা মাত্র। মেয়ে নিজেই বলেছে একটু আগে। মেয়ে আর জামাই। না দিলে তাগাদা করা যাবে না, আদায় করা যাবে না।

'আমি, আমি কোথায় পাব মা টাকা? আজ ছ মাস তোর দাদার চাকরি নেই।' শ্যামারই মনে হয়—আর কে যেন দূর থেকে কথা কইছে। সে নয়।

ঐন্দ্রিলা চিরদিনই মুখফোঁড়।

বলে, 'টাকা তুমি জমিয়েছ মা, তা আমি খুব জানি। যে শিশিবোতল চুরি ক'রে দাদার চাকরি গেল, সেগুলো বেচার সব টাকাই তো তোমার হাতে আছে!'

'ছিল বৈ কি মা—ছিল। কিন্তু এই ছ মাস কি খাওয়ালুম এই রাবণের

গুষ্টিকে ? কী হাল হয়ে আসছে দেখছ না ? হাতে পয়সা থাকলে কি এমন দশা ক'রে রাখি ছেলেমেয়েদের ?'

ঐন্দ্রিলা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মায়ের দিকে।

'পঞ্চাশটা টাকাও দিতে পারলে না মা !'

'কেন, তা তোর শাশুড়ি দিতে পারলে না ? চেয়েছিলি তার কাছে ? মাগীর হাতে তো যথাসর্বস্ব। এ-ই বড় ছেলে !'

'তোমরা সবাই সমান মা। কাল রাত্রে তাঁকেই তো বলতে গিয়েছিলুম। তিনি বল্লেন—এ রোগে কেউই বাঁচে না' কাউকে বাঁচতে তিনি দেখেন নি, কানেও শোনেন নি কারুর বাঁচবার কথা। ছেলে মারা গেলে সংসার তো ঠিকই থাকবে, তাঁকেই চালাতে হবে। মিছিমিছি যে বাঁচবে না তিনি জানেন, তার পেছনে যথা-সর্বস্ব খরচ ক'রে তিনি সর্বস্বান্ত হতে পারবেন না।' কঠিন ব্যঙ্গের সুরে কথা বলে ঐন্দ্রিলা, তার চোখে আর জল নেই।

শ্যামা মাটির দিকে চেয়ে ছিল। সেই ভাবেই বললে, 'তুমি মিছিমিছিই ঠেস দিয়ে কথা বলছ মা ! তোমার শাশুড়ীতে আমাতে ঢের তফাত। তার আছে সে দিচ্ছে না, আমার সত্যিই নেই।—ভিখিরী আমি—কী ভাবে আমার দিন চলে তা কি আর তুমি জান না ?'

ঐন্দ্রিলা তরুর কোল থেকে একটানে মেয়েটাকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'সবই জানি মা, তোমাকেও জানি। তবু মন মানে নি তাই ছুটে এসেছিলুম !'

ঘরের বাইরে এসে থমকে দাঁড়াল আবার।

'একটা উপকার করবে ? এই চারগাছা চুড়ি রেখে কায়েত দিদির কাছ থেকে এনে দিতে পারবে একশোটা টাকা ! দেড় ভরি ক'রে আছে এক-এক গাছা।'

'দেখি না হয় বলে। তুই একটু বোস্ না। একটু কিছু মুখে দিয়ে যা না হয় !'

'থাক। আমার এখন মুখে না দিলেও চলবে মা। মুখে দেওয়ার পব্বটাই তো শেষ হতে বসেছে। এখন এই উপকার করতে পার কিনা দেখ দিকি !'

সে মেয়েটাকে সেইখানেই মেঝেতে নামিয়ে রেখে চুড়িগুলো খুলতে শুরু করে।

তা হোক। তবু শ্যামা পারবে না তার সেই পাঁচশ ছিয়াশি টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা ভাঙতে !

ছেলেদের উপবাস করতে দেখেও প্রাণ ধরে ভাঙতে পারে নি সে। জামাইয়ের জন্যে আজ ভাঙতে পারবে না। হরিনাথের মা ছেলেরই উপার্জন করা টাকার গাদায় বসে যদি ছেলের চিকিৎসার জন্যে সেই টাকা বার করতে না পেরে থাকে তো ওর দোষ কি !

বহু কষ্টের টাকা তার—বহু সাধনের টাকা।...

চুড়িগুলো নিয়ে মঙ্গলার কাছে গিয়ে সংবাদটা দিতে দিতে শ্যামা কেঁদে ফেলল।

সে কান্নাও তার সত্য। কিন্তু যে দুঃখ ঐ টাকা কটা সম্বন্ধে তাকে এমন কঠিন করেছে সে দুঃখ আরও সত্য। তাই কিছুতেই পারল না সে মেয়েকে চুড়ি-ক-গাছা ফেরত দিতে।

আর মেয়ে তো চুড়ি বাঁধা দিতে দেরি হবে বলেই তার কাছে চাইছিল শেষ পর্যন্ত সেই বাঁধা দিয়েই তার টাকা শোধ দেবে বলেছিল। সেই কাজটাই যখন অবিলম্বে হয়ে গেল তখন আর কী এমন অপরাধই বা তার হয়েছে!

বার বার নিজের মনের কাছেই কৈফিয়ত দেয় শ্যামা।

মঙ্গলা একশো টাকার একখানা নোট ওর হাতে আলতো ফেলে দিয়ে বললেন, 'উনি বললেন যে, ছ' ভরিতে একশ টাকা দেওয়া যায় না; তা ছাড়া হাতের চুড়ি ক্ষয়েও গেছে হয়তো—তা হোক, খেঁদির এত বড় বিপদে ওসব কথা আর ভেবো না—দিয়েই দাও।'

চুড়ি ক-গাছা তখনও অবশ্য ওরই পেটকাপড়ে বাঁধা—গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে সিন্দুকে পুরতে হবে।

নবম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

ঐন্দ্রিলা এদের কোন খবর দেয় নি। দেওয়ার ইচ্ছা বা অবসর কোনটাই ছিল না। মাসীদের অবস্থা সে জানে—মিছিমিছি ব্যস্ত ক'রে লাভ কি? তাছাড়া খবর দিতে গেলে চিঠি লিখতে হয়—চিঠি লেখার সময় কৈ তার?

কথাটা শ্যামার মুখেই শুনলে এবং একেবারে হতবাক্ হয়ে গেল এরা—উমা ও কমলা। বিশ্বাস হয় না কথাটা, যেমন হয় নি শ্যামারও। বিশ্বাস হবার কথাও নয়। হরিনাথ? ঐ লোহার মতো সুস্থ সবল শরীর যার!

এদের খবর দিয়ে যে বিশেষ ফল হবে না—তা শ্যামাও জানত। কিন্তু সে কথা হিসেব ক'রে সে আসে নি। চুপ করে বসে থাকতে পারে নি বলেই এসেছে। কথাটা কাউকে বলা দরকার। অন্তত কারুর সঙ্গে দুঃখটা ভাগ ক'রে নিতে না পারলে সে যে পাগল হয়ে যাবে।...তাই হঠাৎ আজ ভোরেই বেরিয়ে পড়েছে, উদ্‌ভ্রান্তের মতো। ছেলেমেয়ে কাউকে নেয় নি সে, তাদের কথা ভাবেও নি। হেম আছে—যা হয় করবে। এই সমস্ত পথটা একটানা কোথাও না বসে একরকম ছুটে চলে এসেছে সে।

তার শুষ্ক শীর্ণ চেহারা, রুক্ষ কেশ, অপরিসীম ক্লান্ত এবং অবসন্ন দৃষ্টি—সবটা মিলিয়ে মূর্তিমান হতাশা যেন। কোনমতে এদের এখানে পৌঁছে বাইরের রকটার ওপরই এলিয়ে পড়ল একেবারে।

কমলা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ওর হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এল।

'কি রে? এমন ক'রে—এই অসময়ে, একা? কী হয়েছে? ছেলেমেয়ে ভাল আছে তো?'

আশঙ্কায় রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে কমলা।

উত্তর দিতে গিয়ে চোখের জলই বেরিয়ে আসে প্রথম।

তার পর একটু একটু ক'রে এই সংবাদ!

অবিশ্বাস্য শ্বাসরোধকারী সংবাদ। বলে এবং কপাল চাপড়ায় শ্যামা।

'কী পাপ ক'রে এসেছিল্‌ম দিদি, এততেও কি তার শেষ হ'ল না!' বার বার বলে সে।

অনেকক্ষণ পরে অনেক কষ্টে কমলা শ্‌ধ্‌ বললে, 'কী বলছিস শ্যামা! তুই—ভুল শ্‌নিস নি?'

শ্যামা সজোরে একটা চাপড় মারলে কপালে।

'আমার কপাল যে দিদি। এ সবই আমার কপালের ফল। এ কপাল না হলে ভুল হ'ত হয়তো। খারাপ খবর আমার কপালে কখনও ভুল হবে না!'

এ কী শোনালে, হে ভগবান! এ কী শোনালে!

মনে মনে দ্‌জনেই শ্‌ধ্‌ এই প্রশ্ন করে অবিরাম; যদিও ম্‌খে কার্‌রই আর স্বর ফোটে না।

অনেকক্ষণ পরে উমাই প্রথম সংবিৎ ফিরে পায়।

এগিয়ে এসে শ্যামার ডান হাতখানা ধরে ফেলে বলে, 'অমন ক'রে কপাল চাপড়াতে নেই ছোড়দি। ওতে মেয়ে-জামাইয়েরই অকল্যাণ হবে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। নাও, ওঠো—ম্‌খে মাথায় একটু জল দাও দিকি—'

উমার কথাতে কমলারও যেন চৈতন্য হয়। সক্রিয় হয়ে ওঠে তার হাতপাগ্‌লো আর মাথাও।

সেও উঠে পড়ে বলে, 'ঠিক কথাই তো—সেই কোন্‌ ভোরে বেরিয়েছে হয়তো' এখনও ম্‌খে একটু জল পড়ে নি। আমার যেমন পোড়া ব্‌দ্ধি আগেই গেল্‌ম ঐসব কথা পাড়তে।...তুই ওকে কলতলায় নিয়ে যা উমি, আমি ততক্ষণ একটু শববত করি।'

হাত-পা ধ্‌য়ে, ঘাড়ে মাথায় খানিক জল থাব্‌ড়ে দিয়ে একট্‌ স্‌স্থ হ'ল শ্যামা। শরবত খেয়ে প্রশ্ন করলে, 'বৌমা কোথায়? গোবিন্দ?'

'বৌমা আরায় গেছেন। বিয়ের পর এতকাল পাঠানো হয় নি তো! এবার ওঁরা এসে নিয়ে গেলেন। আর গোবিন্দ আপিস গেছে।'

'আপিস!' প্রশ্নটা আচম্বিতে বেরিয়ে আসে—তাই সতর্ক হবার অবসর পায় না শ্যামা। তীক্ষ্ণ, আর্ত শোনায় কণ্ঠস্বর।

সঙ্গে সঙ্গে—সমস্ত দ্‌খের মধ্যেও মনে পড়ে হেমের চাকরি নেই।

এরা কাকে ধরে কেমন ক'রে চাকরি পেলে? আমার হেমের হয় না?

কমলা অতটা লক্ষ্য করে না, মাথা হেঁট ক'রে বলে, 'আর কি করব বোন! ওর লেখাপড়া আর হবে না। এত বয়স হয়ে গেল—বার বার বাধা পড়ছে—আর কবে পাস করত বল! বসিয়ে খাওয়াবারও সঙ্গতি নেই; এক্ষেত্রে চাকরি-বাকরির চেষ্টা করা ছাড়া উপায় কি?'

'কোথায় বেরোচ্ছে? পাচ্ছে-টাচ্ছে কিছ্‌? কাকে ধরে ব্যবস্থা করলে দিদি? আমার হেমের একটা উপায় হয় না?'

'পোড়া কপাল। তুমিও যেমন ছোড়দি!' উমা বলে ওঠে, 'দিদি কাকে ধরবে—কাকে চেনে? গোবিন্দরই এক ইস্কুলের বন্ধ্‌—তার বাবার ব্‌ঝি ম্যাপ

ছাপার কারখানা আছে—সেইখানে ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে বাবাকে বলে। এখন কিছুই পায় না, কাজ শিখছে। ছমাস গেলে দশ টাকা জলপানি দেবে, আরও ছ' মাস পরে মাইনে। এখন কোথায় কি!'

তবু ভাল! নিজের অজ্ঞাতেই কথাটা নিঃশব্দে মনের মধ্যে উচ্চারিত হয়। সে নিঃশ্বাস ফেলে একটা। স্বস্তির নিঃশ্বাসের মতোই আরাম অনুভব করে যেন।

গোবিন্দ চাকরি করছে এবং মাইনে পাচ্ছে—দুটো খবর একসঙ্গে সহ্য করা কঠিন হ'ত বৈকি!

গোবিন্দর উপার্জন শুরু হ'লে, কমলার হাতে টাকা এলে শ্যামার লাভ ছাড়া লোকসান নেই—তবুও, সংবাদটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বুকের মধ্যে নিঃশ্বাসটাকে চেপে ধরেছিল; এখন সেইটেই সহজে বেরিয়ে এল।

খেতে বসে প্রসঙ্গটা আবারও হরিনাথের অসুখে ফিরে এল। শ্যামা যায় নি কিন্তু হেম রোজই যায়। হরিনাথের নিজের ভাইরা কেউ সেদিক মাড়ায় না। এমন কি মা-ও না। তিনি শুধু বাইরে থেকে ঐন্দ্রিলার ভাত জল আর রুগীর পথ্যি দিয়ে যান। কী ভাগ্যি মেয়েটাকে রেখেছেন তবু। কিন্তু সেদিকে যাই হোক—চিকিৎসার জন্যে একটি পয়সাও খরচ করতে রাজী নন তিনি। ছেলে গেছেই—ঘটনাটা দুঃখের হলেও পরিতাপের হলেও, অস্বীকার করার উপায় নেই যখন—তখন সেই মতোই চলতে হবে। এত বড় সংসার তাঁর, রোজগারের কেউ রইল না—আবার তিনি ঘরের যথাসর্বস্ব বার ক'রে দিয়ে কি পথে দাঁড়াবেন? যে যাবেই তার জন্যে, যারা থাকবে তাদের সর্বনাশ করবেন কেন?

'এ ধারে বড় ডাক্তার আসছে', শ্যামা বলতে থাকে, 'মড়-মড় টাকা খরচ হচ্ছে; এবেলার ওষুধ ওবেলা পাল্‌টে দিচ্ছে—অ্যাকো অ্যাকো ওষুধের দামই চার টাকা পাঁচ টাকা। ডাক্তার বলছে এই অবস্থাতেই পাহাড়ের ওপর কি সমুদ্দুরের ধারে নিয়ে যেতে—কিন্তু সে ব্যবস্থা করবে কে? তাতেও তো একগাদা টাকা চাই! অর্থবল লোকবল ছাড়া কি হাওয়া-বদল হয়? তা ছাড়া ঐ সাংঘাতিক রুগী, সেকেন্‌ ক্লাস ছাড়া নিয়ে যাওয়া যাবে না—সেও শুনছি রিজাব করতে হবে। এ সব তো চাট্টিখানি টাকার খেলা নয়!...খেঁদির গয়না সব গেছে—সোনা-রুপো বলতে আর কোথাও কিছু নেই—এখন নাকি ওর অফিসের টাকায় হাত পড়েছে। মেয়েটার আর ইহকাল পরকাল কিছুই রইল না।'

শ্যামা বলছে—এরা শুনছে। তিনজনেরই খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে কখন। হাতের ভাত কড়কড়িয়ে উঠেছে, থালায় ভাত-তরকারি অখাদ্যে-পরিণত হচ্ছে—কারুরই খেয়াল নেই।

মেয়েদের এত বড় বিপদ এবং দুর্ভাগ্য আর নেই—এরা সকলেই মেয়েছেলে, সেইটে অনুভব করছে মর্মে মর্মে। তিন জনেরই দৃষ্টি সজল হয়ে উঠেছে, বুক কাঁপছে থর্ থর্ করে। আহারে রুচি নেই কারুরই।

উমা প্রশ্ন করল, 'তুমি গিয়েছিলে?'

'না। আমি যাই নি।'

'কেন ?' আশ্চর্য হয়ে যায় উমা, 'মেয়ের এত বড় বিপদ !—'

'আমি গিয়েই বা কি করব বল্‌। যদি কোন কাজে লাগতুম তো সে কথা আলাদা। মেয়ের এত বড় বিপদে—এক পয়সা সাহায্য করার ক্ষমতা তো নেই—শুধু শুধু জামাই-বাড়ি যাওয়া, সে ভারি লজ্জার কথা। তা ছাড়া কখনও যাই নি !'

'ক্ষমতা নেই' কথাটা বলার সময় শ্যামার গলাটা অকারণেই কেমন যেন কেঁপে যায়।…কদিন আগে ঐন্দ্রিলার কথাগুলো কি মনে পড়ে ? কে জানে !

'তা বলে মেয়ের এতবড় বিপদে—! অর্থে না পার, সামর্থেও তো কিছু করতে পার !'

'তাই বা পারি কি ক'রে বল্‌ ! আস্তে আস্তে মাথা নিচু করে বলে শ্যামা। 'দু দিন চার দিন গিয়ে থাকলে হয়তো ওর একটু আসান হ'ত, কিন্তু এদিকে আমার সংসার যে অচল হয়ে যায়—হেমের চাকরি নেই, জানিসই তো—আমার উঞ্ছবৃত্তি ক'রে-খাওয়া। তা ছাড়া ওর শাশুড়ী মাগীর যা মুখ, নিজে দিচ্ছে না এক পয়সাও কিন্তু শুধু-হাতে গিয়ে দাঁড়ালে একঝুড়ি কথা শোনাবে। সে ভারি অপমান !'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে সকলেই।

শেষে যেন কমলাই জোর ক'রে নিজেকে সচেতন ক'রে, 'নে—ভাত ব্যান্নন জল হয়ে এল, যা পারিস দুটো মুখে দিয়ে নে !'

কিন্তু সে ভাত আর মুখে তোলা সম্ভব নয়—কমলাও তা জানে। উমা আর চেষ্টাই করলে না। শ্যামা পাতে ভাত নষ্ট করার কথা কল্পনা করতে পারে না—তবু সেও দু-চার গ্রাস মুখে তোলবার পর চেষ্টা ছেড়ে দিলে।

একটু ইতস্তত ক'রে বললে, 'একটা হাঁড়ি-টাড়ি বরং দাও দিদি—ভাতগুলো কুড়িয়ে তুলে রাখি। যাবার সময় নিয়ে যাব।'

শিউরে ওঠে কমলা, 'এই ডাল-মাখা—এঁটো ভাত—নিয়ে যাবি কি রে !'

'তা হোক। আমাদেরই তো এঁটো। ছেলেমেয়েগুলো খেয়ে বাঁচবে। এত ভাত নষ্ট করতে পারব না।'

॥ ২ ॥

শ্যামা বিকেলেই আবার ফিরে গেল। সব ফেলে রেখে হঠাৎ চলে এসেছে, এ অবস্থায় থাকা সম্ভব নয় তার—তাই কমলাও থাকতে অনুরোধ করলে না।

উমা যথারীতি পড়াতে বেরিয়েছিল। কিন্তু দু-এক বাড়ি ঘোরার পরই সে ফিরে এল। ভাল লাগছে না তার—অপরিসীম ক্লান্তি লাগছে যেন। তারই বেশী লেগেছে খবরটায়। ঐন্দ্রিলা তার কাছে অনেকদিন ছিল ছেলেবেলায়। বলতে গেলে তার কাছেই মানুষ। ফুটফুটে বুদ্ধিমতী মেয়ে। একটু প্রখরা হয়তো, তবে সে প্রাখর্যকে অনায়াসে দীপ্তিও বলা চলে।

মায়া বসাতে দেবে না কিছুতেই—ঐন্দ্রিলাকে যখন কাছে রাখতে রাজী হয়,

বার বার এই প্রতিজ্ঞাই করেছিল উমা—তবু সে মনের মুখে পুরো লাগাম লাগাতে পেরেছিল কি ?

পারে নি। মনের অনেকখানিই সেদিন দখল ক'রে নিয়েছিল ঐন্দ্রিলা।

নিঃসন্তান রমণীর সমস্ত বুভুক্ষা সেদিন তার প্রাণরস সংগ্রহ করেছিল ঐ মেয়েটির মধ্যে। সকল তৃষ্ণা মেটে নি এটা সত্য কথা—কিন্তু আংশিক শান্তি হয়েছিল বৈকি !

ঐন্দ্রিলার বিবাহে তার সমস্ত অন্তরে বেদনার টান পড়েছিল।

হয়তো নিজের মেয়ে হলে আরও আঘাত লাগে কিন্তু তাতে একটা সান্ত্বনা থাকে, তৃপ্তি থাকে। ভবিষ্যতের আশাও থাকে। উমার কাছ থেকে এই যাওয়া যে একেবারে যাওয়া। তার লেগেছিল বেশী। অন্তরে অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল সে।

দীর্ঘদিনের অদর্শনে সে ব্যাথায় একটা প্রলেপ পড়েছিল—আজ আবার নতুন ক'রে দগ্‌দগিয়ে উঠল ঘা-টা।···

কিছুতেই প্রাত্যহিক কাজে মন বসাতে পারল না। ছাত্রীদের নির্বুদ্ধিতা অন্যদিন ক্লান্তিকর মনে হয়, আজ বিরক্তিকর হয়ে উঠল।

ঐন্দ্রিলার এই বিপদ ! এই সাংঘাতিক বিপদ !

এর চেয়ে সর্বনাশ মেয়েদের যে আর কিছুই হতে পারে না। যথাসর্বস্ব হারাতে বসেছে সে—আক্ষরিক অর্থেও যথাসর্বস্ব। চরম সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। অথচ কীই বা বয়স তার ! বলতে গেলে কৈশোরও কাটে নি, এই ঠিক প্রথম বয়স !

শুনেছে এ জগতে সৎ যে তারই ভাল হয় ; সতীত্বের বহু গৌরব, বহু বিজয়-গাথা শুনেছে ছেলেবেলা থেকে। কিন্তু না তার জীবনে না তার আত্মীয়স্বজন কারুর জীবনে—কখনই সে তার কোন প্রমাণ পেলে না।

শ্যামার যত দোষই থাক্—মনে-প্রাণে-দেহে সে সতী।

আর ঐন্দ্রিলা ! স্বামীকে এমন উগ্র, আবেগময়, সকল সংস্কারের অতীত ভালবাসার কথা—দেখা তো দূরে থাক্ শোনে নি পর্যন্ত। ঐন্দ্রিলা যদি সতী না হয় তো সতীত্বের কী অর্থ তা বোঝে না উমা। তাহলে স্বয়ং সতীকুলরাণীরও সতীত্বে সংশয় জাগা সম্ভব।

এই তো কিছু আগেই শ্যামা বলছিল, কী অতন্দ্র, অস্খলিত সেবা দিয়েই না ঐন্দ্রিলা ঘিরে রেখেছে স্বামীকে। গত কদিনে এক রাত্রিও সে বিশ্রাম পায় নি, ঘুম তো কল্পনাতীত। দিনরাত্রের একটি মুহূর্তও স্বামীকে ছেড়ে ওঠবার তার উপায় নেই—হয়তো তার ইচ্ছাও নেই। হেম নাকি দু-এক বার প্রস্তাব করেছিল, সে বসছে, ঐন্দ্রিলা একটু গড়িয়ে নিক—কিন্তু ঐন্দ্রিলা রাজী হয় নি। হরিনাথের কখন কি অসুবিধা হয়, কখন কি প্রয়োজন হয়—তা সে ছাড়া নাকি আর কেউ বুঝবে না !

এই তো কালই নাকি—হেম যখন গিয়েছিল, তার কিছু আগেই রক্তবমি করেছে

হরিনাথ—সেই বমি দু'হাতে ধরতে গিয়ে সমস্ত কাপড় ভেসে গিয়েছে ঐন্দ্রিলার। সে বেরিয়ে এসেছে একেবারে যোগিনী হয়ে, মনে হয়েছে রক্তবস্ত্রই পরেছে সে!

হে ঈশ্বর, এ কী করলে! এ কী করলে! কী পাপ করেছিল ঐটুকু মেয়ে তোমার কাছে! কেন ওর সুখের বাসা এমন ক'রে ভেঙে দিচ্ছ!

বার বার পাগলের মতো অস্ফুট কণ্ঠে আপনমনেই বলে উমা।

নিষ্ঠুর, নীরন্ধ্র কোন পাষাণপ্রাচীরে যেন সে প্রশ্ন বারবারই প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। নির্মম কোন অন্ধ এবং বধির দেবতা তাঁর দৃষ্টিহীন চোখ মেলে এই সংসারের দিকে চেয়ে আছেন, কিছুই তাঁর চোখে পড়ে না, কোন হাহাকার কানে পৌঁছায় না।

উমা বাড়ি ফিরেও স্থির হয়ে বসতে পারে না।

কমলাকে প্রশ্ন করে, 'দিদি কিছুই কি আমরা করতে পারব না? কোন কিছুই করবার নেই আমাদের?'…

কমলা নিঃশব্দে চোখের জল মোছে।

অথচ সময়ও যে আর নেই তা দুজনেই বোঝে। ঐন্দ্রিলার চরম সর্বনাশের মুহূর্তটি এগিয়ে আসছে, অমোঘ অপ্রতিহত গতিতে। শ্যামার মুখে শোনা রোগের বিবরণেই তা বোঝা যায়। আর বড় জোড় পনেরো দিন কি কুড়ি দিন—কি এক মাস।

ডাক্তার বলে গেছেন, একেই বাংলায় বলে রাজযক্ষ্মা—ইংরাজীতে গ্যালপিং থাইসিস। এ রোগ প্রকাশ পাবার পর রোগী দু মাসের বেশী নাকি বাঁচে না সাধারণত। এক মাস তো কেটেই গেছে কবে।…

অবশেষে উমা একসময় বলে ওঠে, 'দিদি আমি একবার দেখতে যাব?'

'সে কি রে! তুই যাবি কি? কার সঙ্গে যাবি? তার মা-ই গেল না—। কে কী বলবে—'

'কী বলবে? আর বললেই বা কি? আমার আর মান অপমান কি দিদি! তা ছাড়া আমি—আমি তো হরিনাথের নিজের শাশুড়ী নই—আমার কোন অপমানই গায়ে লাগবে না।…কিন্তু একবার না গিয়ে যে আমি থাকতে পারছি না—ভেবে দ্যাখো তো মেয়েটার অবস্থা, এই বিপদে একলা কী করছে সে, ঐটুকু একফোঁটা মেয়ে!… ঐ রুগী কোলে ক'রে একা বসে থাকা · একজন আপনার লোক কেউ কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও তবু খানিকটা জোর পায়। নইলে পাগল হয়ে যাবে যে!'

'কিন্তু সে জায়গা তো তুই চিনিসও না—কি ক'রে কোথা দিয়ে যেতে হয়!'

'ইস্টিশান থেকে জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে চলে যাব এখন—সে আমি ঠিক খুঁজে নেব।'

'তা হলে না হয় যা একবার খোকাকে সঙ্গে ক'রে'—কমলা অনেক ইতস্ততঃ ক'রে শেষ পর্যন্ত মত দেয়।

'না না, দিদি। একে গোবিন্দর শরীর ভাল নয়, তার ওপর ঐ সব্বনেশে

রোগ। ওকে নিয়ে যাব না। পদ্মগ্রামের পথও চিনি না যে—নইলে ওখানে গিয়ে হেমকে নিতুম সঙ্গে। গোবিন্দ আমাকে হাওড়ায় তুলে দিয়ে আসুক বরং—আমি ঠিক চলে যাব।'

কমল প্রবলবেগে ঘাড় নাড়লে, 'না উমি, তা হয় না। একলা যাওয়া তোমার কিছুতেই হয় না। বিপদ আপদের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম—পাড়াগাঁ জায়গা, নানা কথা উঠবে, সে সব শুনতে হবে তাকেই। মাঝখান থেকে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হবে মেয়েটার!'

বিমূঢ় নিরুপায় হয়ে বসে থাকে উমা।

গোবিন্দর কথা দিদি বলেছে উপায় নেই বলেই—তা উমা জানে। ঐ রোগের মধ্যে গোবিন্দকে নিয়ে যাওয়া যায় না। দিদিরও একমাত্র সন্তান।

অথচ আর তেমন লোকই বা কৈ?

অনেকক্ষণ ধরে ভাবল উমা বসে বসে।

ক্রমশ অপরাহ্ণ ম্লান হয়ে এল। কলকাতার গলিতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে বহুক্ষণই। বুকচাপা ধূমমলিন দুঃসহ সন্ধ্যা। তারই মধ্যে ঝুপ্সি অন্ধকারে পাথরের মতো বসে রইল উমা।

একটা কথা অনেকক্ষণ ধরে—সেই প্রথম থেকেই আব্ছা আব্ছা মাথা তুলতে চাইছে বার বার, বারবারই প্রবল বেগে সরিয়ে দিচ্ছে সে চিন্তাটাকে।

না, না, তা হয় না। তা সে করবে না। পারবেও না। সে বড় অসম্মান। বড় লজ্জার কথা। ছিঃ!

অথচ ঘুরে-ফিরেই আসছে কথাটা। অস্পষ্ট তার রূপ—তবু মনের অগোচর পাপ নেই। সে আব্ছা ভাবনাটাকে উমা অস্বীকার ক'রে উড়িয়েও দিতে পারে না।

॥ ৩ ॥

অবশেষে তেতলা বাড়িগুলোর কার্নিস থেকেও আকাশের শেষ রক্তরাগ মিলিয়ে এল। নিচে রাস্তায় নতুন আমদানি গ্যাসের আলো জ্বলে উঠেছে বহুক্ষণ। তারই একটা ফালি আলো তের্ছা ভাবে এসে পড়েছে ওদের ঘরের নোনধারা দেওয়ালে—

গোবিন্দ ফিরল অফিস থেকে।

'কী হয়েছে ছোট মাসী? এমন ভাবে বসে যে! পড়াতে যাও নি তুমি?'

'না রে।...বাবা, শোন একটা কথা।...তুই, ওর—মানে, এই তোর মেসোমশাইয়ের ছাপাখানা চিনিস?'

'কার?' যেন বিস্ময়ে দু'পা পিছিয়ে যায় গোবিন্দ। নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারে না।

'তোর ছোট মেসোমশাইয়ের কথা বলছিলুম।'

প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে কথাগুলো। সমস্ত রক্ত কানে এবং মাথায় চড়ছে বলতে বলতে। কান আগুন হয়ে উঠেছে। মাথার মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করছে।

'ছোট মেসোমশাই ?···হ্যাঁ চিনি। এই তো গরানহাটার মোড়টা ঘুরলেই।'
'আমাকে একবার নিয়ে যাবি বাবা? এখনই?'
'তু-তুমি? তুমি যাবে সেখানে? কী বলছ?' তোতলা হয়ে যায় গোবিন্দ, 'তুমি সেখানে যাবে কি?'
'হ্যাঁ বাবা, বিষম দরকার আমাকে নিয়ে চ।'
তবু গোবিন্দর বিশ্বাস হয় না কথাটা।
'তুমি যাবে কেন-বরং গিয়ে ডেকে আনি না।'
'না রে, সে সময় আর নেই।'
'চল তবে।' জুতোটা আবার পায়ে গলাতে গলাতে প্রশ্ন করে গোবিন্দ, "কিন্তু ব্যাপারটা কি, কিছুই তো বুঝছি না!'
'হরিনাথের বড্ড অসুখ, রাজযক্ষ্মা। একা মেয়েটা সেই মরণাপন্ন রুগী নিয়ে বসে আছে, দেখবার কেউ নেই। আমি একবার যাব। তাই—
কমলা ওদিকে রান্নায় ব্যস্ত ছিল, গোবিন্দর গলার আওয়াজ পেয়ে এখন ছুটে এল। উমার প্রস্তাব শুনে সে-ও অবাক।
'তোর মাথা খারাপ হল উমি? খোকা গিয়ে শরৎ জামাইকে ডেকে আনুক না!'
'আর সময় নেই। আজই রাত্তিরে আমি যেতে চাই। আয় খোকা—'
উমা কথা বলতে বলতেই বেরিয়ে এসেছে সদরের কাছে। অগত্যা গোবিন্দকেও নেমে আসতে হয়।
'তাই বলে এমন ক'রে এক বস্ত্রে—' টাকা-পয়সা – কমলা ব্যাকুল হয়ে বলতে যায়, কিন্তু তার আগেই উমা হাঁটতে শুরু করেছে, কথাগুলো সম্ভবত তার কানেও গেল না।

শরৎ হেঁট হয়ে নিজের ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে বোধ করি কী একটা হিসেব দেখছিল, বাইরে রাস্তায় জুতোর আওয়াজ পেযে মুখ তুলে চেযে অবাক হয়ে গেল।
গোবিন্দর আসাটাই যথেষ্ট অপ্রত্যাশিত—কিন্তু তার পেছনে ও কে!
চকিতে একবার কর্মচারীদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বিস্মিত এবং বিমূঢ় মুখে উঠে বেরিয়ে এল সে।
'এ কী কাণ্ড? এমন ভাবে হঠাৎ? এসো এসো, এদিকে এসো। ট্রিভিলিয়্যানটা আবার হাঁ ক'রে এই দিকে চেয়ে আছে—'
একটু এদিকে সরে এসে উমা বিনা ভূমিকাতেই কথাটা পাড়লে—'হরিনাথের মরণাপন্ন অসুখ। খেঁদি একা, ওর বাড়ির লোকেরা পর্যন্ত কেউ ঘরে ঢোকে না। ছোড়দিও যাচ্ছে না ··মেয়েটা পাগল হয়ে উঠেছে একেবারে।···আমি একবার যাব এখনই।·· তুমি, তুমি আমায় নিয়ে যাবে?···অসুখটা খারাপ—গোবিন্দকে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।'
প্রস্তাবটা এমন অভাবনীয় আর আকস্মিক যে, কথাটা বুঝতেই শরতের

বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। উমা অসহিষ্ণু ভাবে কয়েক মুহূর্ত প্রতীক্ষা ক'রেই চাপা অথচ প্রায় আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'তুমি, তুমি এটুকুও পারবে না ?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। পারব না কে বলেছে তোমাকে ? কিন্তু এখনই কি ক'রে হয়। এই রাত্রিবেলা, অচেনা জায়গা, তুমিও যাও নি কখনো। কাল ভোরে গেলে কি হয় ?'

'হরিনাথের অবস্থা যা শুনলুম, এখন-তখন। এই অন্ধকার রাত—একা মেয়েটা—যদি সত্যিই সেই অবস্থা হয়—'

কথাটা শেষ করতে পারে না উমা, কান্নায় গলা আটকে যায়।

একটু পরে আবার বলে, 'আমি একাই যেতুম। রাত বলেই তোমার কাছে এসেছি। এত রাত্রে, বিপদ আপদের কথা ছেড়েই দাও, ওরা কী বলবে না বলেব—। একমাত্র—একমাত্র তোমার সঙ্গেই এত রাত্রে কুটুমবাড়ি যাওয়া যায়।'

কথাটা বলে সেই অশ্রুবিকৃত মুখেও একটু হাসল উমা। অদ্ভুত, অর্থপূর্ণ, অথচ হতাশাময় এক রকমের হাসি।

সে হাসিতে মুহূর্তে লাল হয়ে উঠল শরৎ। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি বললে, 'কিন্তু অন্তত আধ ঘণ্টা তো তোমাদের দাঁড়াতেই হবে। ছাপাখানা না হয় ওরা কেউ বন্ধ করবে—চুরির ভয় আছে, কী আর করব—কিন্তু খুব জরুরী কাজগুলো বুঝিয়ে দিতে হবে, খদ্দেরের বাড়ি প্রুফ পাঠাতে হবে—বাড়িতেও একটা খবর—'

বলতে বলতেই সচেতন হয়ে থেমে যায় শরৎ।

উমা বলে, 'হ্যাঁ বাড়িতে একটা খবর পাঠাতে হবে বৈকি।···বেশ, আমরা এখানেই দাঁড়াচ্ছি। তুমি সেরে নাও।'

আবার ম্লান হাসে সে।

'তুমি—তুমি বাড়িতেই থাক না। আমি এখনই গিয়ে পড়ছি।'

শরৎ একটু বিব্রত ভাবে বলে।

'না, বাড়ি আর ফিরব না ! এইখানেই দাঁড়াচ্ছি।'

শরৎ আর একটু ইতস্তত ক'রে মেরজাইয়ের পকেট থেকে চারটে টাকা বার ক'রে গোবিন্দর হাতে দেয়। বলে, 'জামাইয়ের অসুখ দেখতে যাচ্ছি—ফল-টল তো কিছু নিয়ে যাওয়া উচিত। তোমরা বরং কয়েকটা বেদানা, আঙুর—আর যা ভাল বোঝ কিছু কিছু কিনে নিয়ে এসো—ততক্ষণে আমার সারা হয়ে যাবে।'

'জামাই' শব্দটা নিজেরই কানে বোধ করে আঘাত করে। আবারও রক্তাভ হয়ে ওঠে তার সুগৌর শুভ্র ললাট।

॥ ৪ ॥

গোবিন্দ ওদের হাওড়া স্টেশনে তুলে দিয়ে গেল। তার মুখে ওদের দেখা হওয়া থেকে যাওয়া পর্যন্ত সব বিবরণ শুনে কমলা দুই হাত জোড় ক'রে বার বার কপালে ঠেকাল।

'হে মা আনন্দময়ী, শরৎ জামাইকে সুমতি দাও মা। এই থেকেই যেন ওর সব পাল্‌টে যায়—আর যেন ছাড়াছাড়ি না হয়। বুক চিরে রক্ত দেব মা তোমাকে, সোনার বিল্বিপত্তর দিয়ে।'

উমার জীবনে এ এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। স্বামীর সঙ্গে সে যে কোন দিন সত্যি-সত্যিই কোথাও যাবে বা যেতে পারবে—এ চিন্তা আজ সকাল পর্যন্ত ছিল ওর সুদূরতম কল্পনারও বাইরে। কিন্তু তাই তো শেষ পর্যন্ত হল!

শরতের মনে আর যা-ই হোক, যে ঝড়ই উঠুক,—বাইরের প্রশান্তিটা বোধ করি প্রাণপণ চেষ্টাতেই সে আবার ফিরিয়ে এনেছিল। তার শান্ত নিরুদ্বিগ্ন মুখ দেখে বাইরের কোন লোকের কিছু অনুমান করার উপায় ছিল না। সাধারণ ভাবেই এক স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে কোথায় যাচ্ছে—এইটুকুই মনে হবার কথা।

উমার অবশ্য এদিকে এত সচেতনতা ছিল না—থাকবার কথাও নয়—ঐন্দ্রিলার চিন্তাই তার মনের বেশির ভাগ জুড়ে তখন—তবুও এই ঘটনায় অভিনবত্ব একই সঙ্গে তার মনে একটা বেদনা ও সকরুণ কৌতুকের দোলা দিচ্ছিল বৈকি!

তবু ট্রেনের পথটা একরকমে কাটল। গাড়িতে ভিড় ছিল না বেশী, এক বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসলেও যতদূর সম্ভব ব্যবধান বজায় রেখেই বসতে পেরেছিল ওরা। দুজনে দুদিকে চেয়ে বসে থাকারও কোন অসুবিধা ছিল না। উমা প্রায় সমস্তক্ষণই স্তব্ধ দৃষ্টিতে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে রইল—আর শরৎ রইল বেশির ভাগ সময়ই চোখ বুজে আত্মচিন্তায় ডুবে।

কিন্তু বিপদ বাধল স্টেশনে নেমে।

রাত বেশী হয় নি—কিন্তু তখনই সমস্ত স্টেশনটা থমথম করছে—মধ্য রাত্রির মতই নির্জন ও নিস্তব্ধ। বাইরে যত দূর দৃষ্টি যায় কোন লোকালয়ের চিহ্ন পর্যন্ত নজরে পড়ে না—বড় বড় গাছ ও বাঁশঝাড়ে এক নিবিড় নীরন্ধ্র অন্ধকার রচনা ক'রে রেখেছে।

এই অবস্থায় অজানা পথে যাওয়া যায় না। পথ জিজ্ঞাসা করতে গেলেও লোক চাই।

শরৎ বিপন্ন মুখে উমার দিকে চাইল। উমা বিমূঢ়।

শেষে শরৎ এগিয়ে গিয়ে স্টেশন মাস্টারের শরণাপন্ন হ'ল।

'বলতে পারেন—আড়গোড়ের পথটা কোন্ দিকে পড়বে; আর কী ভাবে যাওয়া যায়?'

স্টেশন মাস্টারটি প্রবীণ। তিনি খানিকক্ষণ সন্দিগ্ধ ভাবে ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা ক'রে বললেন, 'দেখুন, আমি স্থানীয় লোক নই। আড়গোড়ে একটা জায়গা আছে শুনেছি কিন্তু ঠিক কোথা দিয়ে যাওয়া যায় তা জানি না। আর সে আপনারা বলে দিলেও যেতে পারবেন না। তার চেয়ে এক কাজ করুন—একটা পাল্কি নিন,—পাল্কিবেহারারা এখানকার বেশির ভাগ লোককেই চেনে,—ওরা ঠিক পৌঁছে দেবে।'

'পালকি!' শরৎ যেন আরও বিব্রত বোধ করে, 'দুটো পালকি পাওয়া যাবে তো?'

'বোধ হয় না। দিনের গাড়িগুলোর সময় দু-তিনটে থাকে তবু—রাত্রিবেলা একটাই পড়ে থাকে সাধারণত। দেখছি—'

তিনি লণ্ঠন হাতে ক'রে বেরিয়ে এলে তারই ক্ষীণ আলোতে দেখা গেল—পালকি একটা পড়ে আছে কাঁটাগাছের বেড়ার ধারে—একটা বিরাট কাঠচাঁপা গাছের তলায়—কিন্তু একদম বেওয়ারিশ, অর্থাৎ তার বেহারাদের পাত্তা নেই। অনেক ডাকা-ডাকিতেও যখন সাড়া পাওয়া গেল না—তখন মাস্টারমশাই একজন চাকর পাঠালেন খোঁজ করতে।

বললেন, 'এই কাছাকাছিই থাকে। তবে বাসায় থাকে তো ভাল, আর যদি নেশাভাঙ্ ক'রে কোথাও পড়ে থাকে তা হলে ঐ পর্যন্ত।

স্টেশন মাস্টারের ছোট ঘরে চেয়ার নেই, টুলের সংখ্যাও প্রয়োজনাতিরিক্ত নয়। তবু তিনি একটু সংকোচের সঙ্গে বললেন, 'মেয়েদের একটা ওয়েটিং রুম তৈরীর কথা হচ্ছে—তা কবে হবে জানি না। ও'কে বরং এই টুলটা বাইরেই বার ক'রে দিই—একটু বসতে বলুন—।'

শরৎ প্রবল ভাবে ঘাড় নেড়ে জানালে, 'না না—দরকার নেই। আমরা বাইরে ততক্ষণ একটু পায়চারি করি।

উমা সব কথাই শুনেছিল—স্টেশন মাস্টারের সামনে কিছু বলতে পারে নি, এখন শরৎ বাইরে আসতেই নিচু গলায় কেমন এক রকম সংকোচের সুরে বললে, 'একটা পালকিতে কী ক'রে—মানে পালকিতে না চড়ে ওদের কিছু পয়সা দিলে আলো ধরে পৌঁছে দেয় না?'

শরৎ কুণ্ঠিত ভাবে বললে, 'কিন্তু সেটা বড় খারাপ দেখাবে। স্বামী-স্ত্রী এক পালকিতেই চড়ে থাকে সাধারণত। মাস্টারবাবু আবার কী ভাববেন হয়তো! তা ছাড়া দেরিও হয়ে যাবে অনেক। রাস্তা ভাল নয়, খালি পা তোমার, হোঁচট খাবে—কী করবে! লতা-টতার ভয়ও তো আছে।'

অর্থাৎ সাপখোপ। রাত্রে নাম করতে নেই।

উমা আর কথা কইলে না।

অনেকক্ষণ পরে স্টেশনের চাকরটি ফিরে এল। বেহারাদের পাওয়া গেছে। মূল্যবান কোন নেশা করে নি—একটু ভাঙ্ খেয়েছে বোধ হয়—তা তাতে কাজ আটকাবে না।

সংবাদটা ফিসফিস ক'রে জানাল পোর্টার নগেন, আরও জানাল যে এত রাত বলে ওরা ডবল ভাড়া চাইছে, তবে সে অনেক বলে-কয়ে বারো আনাতে রাজী

অগত্যা। শরৎ বললে, 'পালকি এই ফাঁকায় আনতে বল—আর দেশলাই জেবলে দ্যাখো—তাঁরা কেউ আছেন কিনা।'

উমা চুপি চুপি বললে, 'ভাঙ্ খেয়েছে বলছে—খানা-ডোবা কি পগারে ফেলে দেবে না তো?'

শরৎ একটু হেসে উত্তর দিলে, 'আমাদের বরাত। তবে নেশা করা ওদের অভ্যাস আছে, মনে তো হয় কিছু হবে না!'

সংকীর্ণ-পরিসর পাল্কির মধ্যে দুজনকে মুখোমুখি বসতে হ'ল। হাঁটুর সঙ্গে হাঁটু ঠেকাই শুধু নয়—একজনের হাঁটুর ওপর আর একজনের হাঁটু এসে পড়ল।

এই প্রথম দীর্ঘক্ষণ ধরে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে স্বামীকে ছুঁয়ে থাকার সুযোগ ঘটল উমার। মন যথেষ্ট ভারাক্রান্ত এবং উদ্বিগ্ন থাকলেও ঘটনাটায় অভিনবত্ব কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বল ক'রে তুলল বৈকি!

দু'দিকের দরজা যতটা সম্ভব খোলা। তারই মধ্য দিয়ে প্রাণপণে মুখ বার ক'রে রইল উমা। শরৎ ঠিক অতটা না হলেও, আর এক দিকে মুখ ফিরিয়ে বাইরেই চেয়ে রইল।

স্বামী-স্ত্রী। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নিস্তব্ধ রাত্রে নির্জন পাল্কির সংকীর্ণ পরিবেশে ঘনিষ্ঠ হয়েই বসে ওরা। দুজনের নিঃশ্বাসের শব্দ দুজনে শুনছে, হাঁট দুটোর যেখানটা ছুঁয়ে আছে পরস্পরের—সেখানকার শিরাগুলো দুজনেরই দপ্‌দপ্‌ করছে। অপরের সম্পূর্ণ অনুভূতিগোচর সেটা। হয়তো কান পেতে থাকলে স্ত্রীর বুকে শোণিত-তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে ওঠার শব্দও স্বামীর কানে যেত। তবু দুজনেই নির্বাক এবং যত দূর সম্ভব বাহ্যত নিস্পন্দ।

অন্ধকার রাত। সরু, পায়ে-চলা-পথের মতো অপরিসর রাস্তা—তার দু'ধারে নিবিড় বাঁশবন ও বড় বড় বিভিন্ন গাছে জড়াজড়ি। নিরেট নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আকাশ দেখা যায় না—জন-বসতির চিহ্ন চোখে পড়ে না—শুধু সেই একাকার অন্ধকারে অসংখ্য জোনাকি ঘুরে বেড়াতে থাকে—ওপরে নিচে, চার পাশে। যেন চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান নক্ষত্ররাশির মধ্যে অন্ধকার মহাশূন্যে চলেছে ওরা। বাইরে পাল্‌কি-বেহারাদের নিশ্বাসের শব্দ না থাকলে—সবটা অপার্থিব ও অবান্তর বোধ হবার কথা।

একবার মাত্র ফিসফিস ক'রে প্রশ্ন করল শরৎ, 'ভয় করছে?'

উমা কোনমতে উত্তর দিল, 'না।'

নিজেদের কাছেই ওদের গলা অপরিচিত মনে হ'ল। কেমন যেন বিকৃত রুদ্ধ স্বর। অতিকষ্টে স্বর ফুটল দুজনেরই।…

উমা যেন একটু বিস্মিত হয় নিজের অবস্থায়। কৈশোর কেটে গেছে কবে—যৌবনও। সন্তান হয় নি বলেই হয়তো—এখনও দেহের বাঁধন আছে, মধ্যবয়সী দেখায় না। প্রথম বয়সের মাদকতাও নেই, চাপল্যও নেই। সে সব কোন্‌ অতীতের কথা। অনুভূতি আবেগ—এগুলোও তো আজ কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, তবে বুকের রক্তে অকারণে এ কিসের তরঙ্গ জেগেছে, সমস্ত স্নায়ুতে এ কিসের কাঁপন? কেন স্বর বেরোয় না কণ্ঠে, কেন রাজ্যের সংকোচ গলা চেপে ধরে?

সে কি পাগল হয়ে গেল?

না, না, না। এ তাদের প্রণয়-অভিমান নয়।

এসব কিছুই নয়। নিতান্তই দায়ে-পড়ে প্রয়োজনের গরজে সে স্বামীর কয়েক

ঘণ্টার সাহচর্য প্রার্থনা করেছিল এবং স্বামীও, একান্তই ইচ্ছার বিরুদ্ধে, নিতান্ত এড়াতে না পেরে, সেটুকু দিতে রাজী হয়েছেন। এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। সে যেন ভুল না বোঝে।

বার বার মনকে চোখ রাঙায় উমা। বুড়ো বয়সের আদিখ্যেতা বলে নিজেকেই ব্যঙ্গ করে। জামাই মৃত্যুশয্যা পেতেছে, একা মেয়ে বসে আছে সেখানে—শুধু সেই কথাটাই প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করে।

অবশেষে একসময়, সে যে সহজ হয়েছে, এইটে প্রমাণ করবার জন্যই, নিজে থেকে কথা বলে, 'ওরা বোধ হয় সব শুয়ে পড়েছে এতক্ষণে, না? এ তো নিষুতি রাত দেখছি এখানে!'

প্রাণপণ চেষ্টায় কথাগুলো বেরোল বটে কিন্তু তবু এখনও সে কণ্ঠস্বর এমনই বিকৃত শোনাল যে—নিজের এই শোচনীয় পরাজয়ের লজ্জায় সত্যি-সত্যিই চোখে জল এসে গেল উমার—শরৎ কী জবাব দিলে, তা তার কানেও গেল না।

॥ ৫ ॥

বেহারারাই ডাকাডাকি ক'রে জাগালে সবাইকে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হরিনাথের মা বেরিয়ে এলেন, হ্যারিকেনটা তুলে ধরে আগন্তুকদের চেনবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'কে গা এত রাত্তিরে—কৈ চিনতে তো পারছি না!'

উমা এগিয়ে এসে মাথার কাপড়টা একটু তুলে উত্তর দিলে, 'আমি আপনার বেয়ান হই দিদি।'

'বেয়ান? সে আবার কি?'

'আমি আপনার হরিনাথের ছোট মাসশাশুড়ী। এতদিন তো খবর পাই নি, আজই খবর পেয়ে ছুটে আসছি।'

হরিনাথের মা ঈষৎ কান্নার ভঙ্গী ক'রে বললেন, 'আর কী দেখতে এলে বেয়ান, এতদিন পরে? আমার অমন সাজোয়ান সাড্ডোল ছেলের কিছুই যে নেই আর!··· সে যে যেতে বসেছে। তার রক্ত যে শুষে নিয়েছে সব।'

তার পরই যেন কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন। অপেক্ষাকৃত সহজ কণ্ঠে বললেন, 'তা সঙ্গে ইনি?'

কোথায় যেন একটু খোঁচা থাকে সে প্রশ্নে।

উমা ওপরের রকে উঠে এসে জবাব দিলে, 'উনি যে আপনার বেয়াই! এত রাত্রে মেয়েছেলে কার সঙ্গে আর আসতে পারে বলুন?'

'অ। তবে যে শুনেছিলুম—! তা বেশ বেশ। মিটে-টিটে গেছে ভাই, ঘরকন্না করছ, এইটেই আনন্দের কথা।···যার যা হক, তা পাবেই—দু দিন আগে হোক আর দু দিন পিছে হোক।'···

উমার কান-মাথা অপমানে ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। সমস্ত শরীর দুলে উঠল যেন। সে পড়েই যেত—কোন মতে ঘরের দেওয়ালটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিল।

হয়তো হরিনাথের মা আরও কিছু বলতেন—মুখরোচক প্রসঙ্গের তৃপ্তি তাঁর মুখে চোখে ফুটে উঠেছিল—কিন্তু অকস্মাৎ বাধা পড়ল। ঐন্দ্রিলা ইতিমধ্যে অতি-পরিচিত গলার স্বর শুনে বিস্মিত হয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল, হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোতেও উমাকে চিনতে পেরে সে প্রায় আর্তকণ্ঠে চিৎকার ক'রে উঠল।

'মাসীমা! ছোট মাসীমা!'

তার পর একেবারে ওর পায়ের কাছে এসে আছড়ে পড়ল, 'ওগো মাসীমা! কী দেখতে এলে মাসীমা? আমার সর্ব্বনাশের যে আর দেরি নেই! ওগো আমি যে আর পারছি না। আমি যে পাগল হয়ে যাব।'

পাগলের মতোই ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে মাথা খুঁড়তে লাগল সে উমার পায়ের কাছে। তার পাশে বসে পড়ে উমা কোনমতে জোর ক'রে ঐন্দ্রিলার মাথাটা নিজের কোলে টেনে নিলে, কিন্তু সান্ত্বনার একটি কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলে না। মর্মান্তিক দুঃখের এই বুকফাটা অভিব্যক্তির সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে তারও এতক্ষণকার সমস্ত হৃদয়াবেগ, সমস্ত ক্ষোভ দুঃখ অপমান বুকের মধ্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছে—চোখের জল কিছুতেই, কোনমতেই অভিমান ও মর্যাদাবোধের পাষাণপ্রাচীরে আবদ্ধ থাকছে না।

ঐন্দ্রিলার মাথাটা বুকে চেপে ধরে হু হু ক'রে কেঁদে উঠতে পেরে অবশেষে সে যেন বাঁচল।

আতিথেয়তার কোন ত্রুটি হ'ল না অবশ্য। শরতের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেই রাত্রেই নতুন ক'রে রান্নার আয়োজন করা হ'ল। এবং ঠিক চর্ব্য-চোষ্য গোছের ব্যবস্থা না হলেও নিতান্ত নগণ্য হ'ল না। উমার গলা দিয়ে কোন আহার্য তখন নামা সম্ভব নয়—এ কথা করজোড়ে বার বার জানিয়েও কোন ফল হ'ল না। অশোভন পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হয়েই শেষ পর্যন্ত উঠে এসে থালার সামনে বসল এবং দু-এক গ্রাস নাড়াচাড়া ক'রে উঠে পড়ল।

তার পর শোয়ার পালা।

বেয়ান একটু যেন বিশেষ অর্থপূর্ণ মুচকি হেসে জানালেন যে, ওপাশের ঘরে খাটে তাদের শয্যা প্রস্তুত, উমারা এইবার শুয়ে পড়ুক। আর রাত করবার দরকার নেই।

উমা একবার অপাঙ্গে শরতের মুখের পানে তাকাল। তার প্রশান্ত ভাবলেশহীন মুখে কোন উত্তেজনা কি উদ্বেগই নেই; সে যেমন বাইরের রকে পায়চারি করছিল তেমনই করছে—শুধু তার মুখের চুরুটটা প্রতিবারই দীর্ঘটানে অনেকখানি করে পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে।

মাথা নামিয়ে উমাও সহজ কণ্ঠে বলল, 'তুমি শুয়ে পড় গে যাও। আমি এ ঘরে এসেছি, এ কাপড়ে খাটে শোব না। আমি খেঁদির কাছেই থাকব রাত্রে।'

হরিনাথের মা বিষম ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'না না, বেয়ান। এই এত কাণ্ড ক'রে আসা—আবার রাত জাগা উচিত হবে না। তুমি শুয়ে পড়। আমরা তো

আছিই, বৌমা একটু ঘুমিয়ে নিতে পারবেন স্বচ্ছন্দে।'

বিরক্তিটা এবার আর উমার কণ্ঠে চাপা রইল না। সে বললে, 'না বেয়ান—ঘুমোতে আমি আসি নি। তাছাড়া বেশীদিন তো থাকতে পারব না, কাল সকালেই আমাকে চলে যেতে হবে। যে ক'ঘণ্টা আছি একটু মেয়ের পাশেই বসে থাকি। কিছুই করতে পারব না তা জানি,—তবু দুঃখটা একদিন ভাগ ক'রে নিতে পারব অন্তত। আপনি বরং শুয়ে পড়ুন গে।...আপনারা তো রোজই রাত জাগছেন—একদিন একটু বিশ্রাম নিন।'

তার কণ্ঠস্বরে কী ছিল কে জানে, হরিনাথের মা যেন একটু থতমত খেয়ে গেলেন। হয়তো বেশী ঘাঁটাতেও সাহস হ'ল না। আস্তে আস্তে বললেন, 'তবে যা ভাল হয় করো। বেয়াই মশাই আপনি শুয়ে পড়ুন বরং—আর অনর্থক রাত করবেন না।'

শরৎ হাতের চুরুটটা ফেলে দিয়ে এবার উমার মুখের দিকে তাকাল। বেশ সহজ কণ্ঠেই বলল, 'আমিও না হয় থাকি না তোমাদের সঙ্গেই। একটা রাত না-ই ঘুমুলুম!'

এইটুকু সহানুভূতিতেই কি উমার গলা এত অবাধ্য হয়ে ওঠে? শরৎকে এই মুহূর্তে ঈর্ষাই করে সে। কেমন অনায়াসে সহজ ও স্বাভাবিক হয় ও—উমা পারে না কেন?...প্রাণপণে গলার কাঁপন চেপে সে বলে, 'না না। অনর্থক তোমাকে আর রাত জাগতে হবে না। দরকারও তো নেই।...আবার কাল সকালেই তো তোমাকে কাজে বেরোতে হবে।...তা ছাড়া ঐ রোগের মধ্যে যাওয়া!...পুরুষ মানুষ তোমরা—তেমোদের ওপর বহুলোকের ভাত-ভিক্ষে নির্ভর করছে!'

দশম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

হরিনাথের মৃত্যুর পর ঐন্দ্রিলাকে মা'র কাছেই এসে উঠতে হ'ল! একেবারে শ্বশুরবাড়ির পাট চুকিয়েই চলে এল সে বলতে গেলে।

তার কারণ ওখানে আর থাকবার মতো অবলম্বন কিছু ছিল না ওর, আশ্রয়ও না।

হরিনাথকে অনেকদিন বাঁচিয়ে রেখেছিল ঐন্দ্রিলা। ডাক্তারের মতে যে কদিনের মেয়াদ, তার চেয়ে ঢের বেশী দিন। উমার দেখে আসার পরও প্রায় দেড় মাস বেঁচে ছিল।

কিন্তু সেজন্য মূল্যও বড় কম দিতে হয় নি।

উমার কথামতো সাহেব-ডাক্তারই ডেকেছিল ঐন্দ্রিলা। উমার কথামতো—অর্থাৎ উমার পরামর্শে। কিন্তু পরামর্শ কথাটা নিতান্তই শোভনতার খাতিরে ব্যবহার করা চলতে পারে। ঐন্দ্রিলা আগেই মন স্থির করেছিল। উমার যখন মত চাইলে তখন উমা আর 'না' বলতে পারে নি। জানে অনর্থক, জানে যে শুধু তাতে ওর ইহকালের সম্বলটুকু নিঃশেষ হয়ে যাবে—ফল কিছু হবে না। তবুও

পারে নি। সে হরিনাথের মা-ও নয়, শাশুড়ীও নয়। টাকার ব্যবহারিক মূল্য তার অত জানা নেই। তার কাছে মেয়ের অন্তরের কথাটাই বড়। জামাই যদি দুটো দিনও বেশী বাঁচে, মেয়ের কাছে সেইটেই লাভ। সেই জন্যই তাকে প্রত্যাসন্ন সর্বনাশটার দিকে চোখ বুজে দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বলতে হয়েছিল, 'হয় তো এখনই ডাক, দেরি ক'রে লাভ নেই!'

কিন্তু সে একরাশ টাকার দরকার।

অত টাকা ঐন্দ্রিলারও কল্পনারও বাইরে। তার গহনা প্রায় সবই চলে গেছে। অফিস থেকে যতটা পাওয়া সম্ভব, তা পেয়েছিল—সে-ও সব শেষ।

'টাকা? টাকা কোথা থেকে আসবে?'

ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল হরিনাথ।

'সব তো শেষ করলে। কেন এ কাজ করছ!' আবারও বলেছিল সে।

'তুমি চুপ কর।...আমার ভাবনা আমিই ভাবব। তোমার অত সব তাইতে কথা কেন বল তো!'

এই বলে সে জোর ক'রে ওর চোখের পাতা বুজিয়ে রেখে চলে এসেছিল।

এসেছিল সটান শাশুড়ীর কাছে।

কলকাতায় মাসী আর দিদিমার কাছ থেকে অনেক কথাই শুনেছে সে, অনেক কথা শিখেছে। মোটামুটি ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা ভাবে বিষয় সম্পত্তির মোটা কথাগুলো জানে।

শাশুড়ীর কাছে এসে বলেছিল, 'মা, এ বিষয়ে ওঁরও তো ভাগ আছে। সেই ভাগটা বিক্রি করব। আপনি ব্যবস্থা ক'রে দিন।'

'ইস! ভারি তো বিষয়! এখানে পাড়াগাঁয়ে এসব সম্পত্তির দাম কি!'

'যত কম দামই হোক, কিছুও তো হবে। এখন তাই লাভ। সাহেব-ডাক্তার ডাকতে হবে, একশ টাকা এখুনি চাই।'

'এখনই চাই বললেই তো হবে না। আমরা তো তোমার খাস তালুকের প্রজা নই বাছা যে হুকুমতো চলব! বিষয় এখনও ভাগ হয় নি। এখনও আমার নাবালক ছেলে আছে। বিষয় আমি ভাগ করতে দেব না। বেচবি কাকে? রাক্কুসী! আমার সব্বস্ব খেয়েও রাক্কুসীর পেট ভরে নি—নাবালক ছেলেগুলোর মুখের দুটো ভাতও খেয়ে নেবার মতলব!'

ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল ওর শাশুড়ীর মুখ।

কিন্তু তাতেও ঐন্দ্রিলা ভয় পায় নি। ভয় পাবার উপায় ছিল না ওর হরিনাথের জন্যে সাহেব-ডাক্তার চাই। আনতেই হবে ওকে।

সে উঠে দাঁড়িয়ে জবাব, দিয়েছিল, 'শুনেছি ভাগ না করা বিষয়ও কেনবার লোক আছে। সস্তায় কেনে তারা, মামলা-মকদ্দমা ক'রে নেয়। আমি তাহলে তাদেরই সন্ধান করি। কায়েত দাদুর কাছে গেলেই খোঁজ পাব।'

বোমার মত ফেটে পড়েছিলেন শাশুড়ী। অকথ্য কদর্য ভাষায় গালিগালাজও করেছিলেন। কিন্তু ঐন্দ্রিলা অপেক্ষা করে নি, তর্‌ তর্‌ করে নেমে এসেছিল

দালান পেরিয়ে রক থেকে উঠোনে। কিন্তু তাকে কোথাও যেতে হয় নি শেষ পর্যন্ত। মেজ দেওর শিবু এসে পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছিল।

'আহা-হা, একটু থামো না। ছেলেমানুষি কর কেন! কত টাকার দরকার এখন তোমার? আমি মা'র কাছ থেকে আদায় ক'রে দিচ্ছি।...দাদাকে দিয়ে একটা রসিদ সই করাতে পারবে তো! এখনও নাবালকের সম্পত্তি—দস্তুরমতো সইসাবুদ সব রাখতে হবে। এরপর যদি ফটকে-মানুকে বড় হয়ে নালিশ দেয়।'

ফটিক আর মানিক—হরিনাথের দুই ছোট ভাই।

কিন্তু ঐন্দ্রিলার সে সব কোনদিকে কান ছিল না। কী রসিদ—রসিদ না দলিল তাও দেখে নি সে। হরিনাথেরও দেখার মতো অবস্থা ছিল না। ঐন্দ্রিলা সই করাচ্ছে—তাই যথেষ্ট। এর ভেতর অফিসের টাকা আনাতে কয়েকবারই এমন সই করতে হয়েছে তাকে। এবারেও তাই মনে করেছিল সে। ঐন্দ্রিলাও সই করেছিল—সাক্ষী হিসেবে। কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে তখন কোনমতে টাকাটা নিয়ে সে চলে যেতে পারলে বাঁচে।

সাহেব-ডাক্তার তিন দিন এসেছিলেন। ডবল ফি আর গাড়ি-ভাড়া। এ ছাড়া দামী ওষুধ আছে। সাহেবের দোকান থেকেই ওষুধ আনবার ফরমাশ হয়েছিল। তাতেও কম খরচ হবার কথা নয়। তবু হেম প্রত্যহ হেঁটে গিয়ে ওষুধ কিনে আনত, ডাক্তারের কাছে খবর দিত।

এমনি তিন-চারখানা দলিলে সই করতে হয়েছিল ঐন্দ্রিলাকে।

হেমও জানত না। জানলেও তা রদ করার উপায় ছিল না।

হরিনাথ ডাক্তারের হিসেব এবং অনুমান অতিক্রম করলেও সত্যি সত্যিই এমন কিছু বেশী দিন বাঁচেনি। বাঁচলে হয়তো তার জীবদ্দশাতেই সাংঘাতিক খবরটা পেতে হ'ত তাকে। ঐ চরম আঘাত থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন ভগবান তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে।

প্রথম শোকের দুঃসহ আঘাতে, এবং হয়তো এতদিনের অমানুষিক ক্লান্তিহীন পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাবার প্রথম স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ায় ঐন্দ্রিলা মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। সে মূর্ছা তিন দিন ভাঙে নি। কারা নিয়ে গেছে হরিনাথকে, কখন নিয়ে গেছে, কে তার মুখাগ্নি করেছে—কিছুই টের পায় নি।

ওর শাশুড়ীরও শোক লাগে নি তা নয়—তবু তার মধ্যেই তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'ঢং! আদিখ্যেতা! বলে মা'র চেয়ে বেথিনী তারে বলি ডান।...গেল আমারই পেটের ছেলে গেল! আমার চেয়ে তো আর ওর বেশী নয়? কদিনের দেখাশুনো তোদের! আমি যদি এখনও খাড়া থাকি—ওরই এত শোক যে একেবারে মুচ্ছো গেল! শহরে ছিল, নবেল-পড়া মাসীর কাছ থেকে কল্লা সব রকম শিখে এসেছে।'

সুখের বিষয় এ কথাগুলো ঐন্দ্রিলার কানে যায় নি।

কিন্তু প্রথম জ্ঞান হবার পরই কানে যা গেল, তাও কম নয়।

শুনেলে যে এ বাড়িতে, শ্বশুরের সম্পত্তির কোন কণামাত্রেও তার কোন অধিকার নেই। হরিনাথের যা ভাগ তা সে বেঁচে থাকতে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ভায়েদের কাছে বিক্রি ক'রে গেছে। সাক্ষী আছে তার বৌ। সুতরাং এখানে আর কোন আশ্রয়ের আশা যেন ঐন্দ্রিলা না করে। এই অশৌচের কটা দিন অবশ্য তাঁরা আর কিছু বলবেন না। কিন্তু তার পর যেন মানে মানে সে পথ দেখে। বাপের বাড়ি কি মাসীর কাছে—যেথানে খুশি!

'ঢের সয়েছি, ঢের সহ্যি করেছি। আর নয়। রাক্কুসী ডাইনী মড়মড় ক'রে আমার স্বামীপুত্তুর চিবিয়ে খেয়েছে—আরও কিছুদিন থাকলে এ বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখবে না। সবাইকে খাবে।…শিবেটা তো এক নম্বরের আহাম্মুক, বলে—হাজার হোক দাদার বউ, দাদার মেয়ে—থাক না!… আমাদের সংসারে তো কত রবাহূত অনাহূত খেয়ে যাচ্ছে পেত্যহ! সে আমিও জানি। না হয় বুঝতুম ঝি রেখেছি। ঝিয়ের মতো থাকত, খাটত, খেত। বলি কত ফেলা-ছাড়াও তো যায়! কিন্তু একে রাখব কি ক'রে? নিঃশেষে রক্ত চুষে খাবে। শিবেকে তাই বললুম, খবরদার অমন ভুল করিস নি। কত্তা ওই চাঁদপানা মুখ দেখে ভুলে নিজের সব্বনাশ আমার সব্বনাশ ক'রে গেলেন। তুই আর ভুলিস নি! ওদিকে চাইবি না পজ্জন্ত—যদি বাঁচতে চাস। ওকে রাখব? আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ওকে বিদেয় ক'রে তবে আর কাজ। কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করব।'

এ কথাগুলো শুধু ঐন্দ্রিলা শোনে নি, হেমই শুনেছিল। অপমান, দুঃসহ ক্রোধে তার মুখ আগুনের মতো লাল হয়ে উঠেছিল, কপালের শিরাগুলো উঠেছিল ফুলে। মাথার মধ্যে রক্ত-সঞ্চরণের এমন ঝাঁ ঝাঁ শব্দ হচ্ছিল যে নিজের কথাগুলোই শোনা কষ্টকর।

তবু সে প্রাণপণেই নিজেকে সংবরণ করেছিল। ওদের জবাব দেয় নি, ওদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বোনকে বলেছিল, 'তুই এখনই চ খেঁদি। যদি আমাদেরও একবেলা জোটে তো তোরও জুটবে!'

ঐন্দ্রিলার জ্ঞান হয়েছিল ঠিকই—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রচণ্ড আঘাতে ওর দেহ-মন সমস্ত যেন এক হিম অনুভূতিতে নিথর হয়ে গিয়েছিল। তার নড়বার শক্তি তো ছিলই না—কথা কইবারও না।

সে অনেকক্ষণ বিহ্বল হয়ে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে একসময় স্খলিত শিথিল কণ্ঠে বলেছিল, 'তার কাজটা শেষ ক'রে যাব না? তার শেষ কাজটা?… তাতে যদি মেয়েটার আবার কোন অকল্যেণ হয়? কী বল তুমি? যা হয় কর। আমি আর কিছু ভাবতেও পারছি না যে।'

হেম আর কথা বলতে পারে নি।

কীই বা বয়স ওর। এই বয়সেই সব চলে গেল। এখন শুধু ঐ গুঁড়োটুকুই ওর অবলম্বন। সত্যিই যদি কিছু ক্ষতি হয় তার তো চিরদিন মনে হবে হয়তো এই জন্যেই—। থাক।

শুধু অনেকক্ষণ পরে চুপি চুপি বলেছিল, 'পারবি থাকতে ? এই কটা দিনও কি কাটাতে পারবি ? ও মাগী সব পারে, হয়তো খুন ক'রেই ফেলবে !'

'আমি সবই পারব দাদা। আমার দ্বারা হয়তো সবই সম্ভব। হয়তো সত্যিই আমি ডাইনী রাক্ষুসী। আমার অসাধ্য কিছুই নেই। আমার হয়তো মরে যাওয়াই উচিত, এখানে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলুম, যদি সেখানেও দিই ! আমার নিঃশ্বাসে বিষ আছে।'

কথাগুলো বলতে বলতে এই প্রথম ওর চোখের জল বেরিয়ে এল। স্বামীর মৃত্যুর পর এই প্রথম কান্না ওর।

॥ ২ ॥

শ্রাদ্ধের পরের দিনই হেম নিয়ে এল ওকে। নিয়মভঙ্গের জন্যে অপেক্ষা করলে না। বললে, 'ওর আবার নিয়ম ভঙ্গ কি ? ও কি আর মাছ মাংস খাবে ? তেল— আমাদের ওখানেই দিতে পারবে।'

শাশুড়ী শেষ মুহূর্তে পৌত্রীর দিকে চেয়ে একবার চোখে আঁচল চাপা দিয়েছিলেন—অস্ফুটকণ্ঠে বলেছিলেন, 'কেমন থাকে মেয়েটা মধ্যে মধ্যে খবর দিও। ডাইনীর মেয়ে ডাইনীই হবে···তবু হরের মেয়েটা—'

'আপনারাই খবর নেবেন মধ্যে মধ্যে—'

শুধু এইটুকু উত্তর দিয়েছিল হেম। সম্পর্ক যখন চিরকালের জন্যই উঠছে তখন মিছিমিছি শেষ মুহূর্তে কতকগুলো কটু কথা বলে আর শুনে লাভ কি !···

নিয়ে আসতেই হ'ল ঐন্দ্রিলাকে। শ্যামাকেও ঘরে তুলতে হ'ল। উপায় নেই। চিরকালই বইতে হবে, তার মেয়ে, সে আর কোথায় ফেলবে ?

কিন্তু এখন এই বোঝার ওপর বোঝা দুঃসহ হয়ে উঠল।

হেম চাকরি পায় নি এখনও। লড়াই শেষ হয়ে এসেছে—তার সুতীক্ষ্ণ কামড় দরিদ্র সংসারের কণ্ঠনালী কামড়ে ধরেছে বরং বেশী ক'রে—শ্বাসরোধ হয়ে আসছে নিম্নমধ্যবিত্তদের, কিন্তু এখানে তার দরুন কাজ এমন কিছু বাড়ে নি যাতে চাকরি সহজপ্রাপ্য হয়। অভয়পদদের অফিসে ঢোকানো চলত হয়তো কিন্তু হেমের প্রাক্তন অফিসেরই এক সাহেব এ অফিসে চলে এসেছেন। তিনি ওকে বিলক্ষণ চেনেন। অভয়পদর সাহস হয় না ঢোকাতে। সার্টিফিকেট নেই কাজের—বরং কলঙ্ক বা দুর্নাম আছে। কাজ পাওয়া শক্ত বৈকি।

দু'বেলা দু'মুঠো ভাত, তাও যেন অসাধ্য হয়ে আসছে। শ্যামার রাত্রে ঘুম হয় না। ঐন্দ্রিলা আসার পর বহু রাত্রে উঠে এসে সে একা বসে থাকে বাইরের রকে। আরও ঘুম হয় না—মেয়েটাও ঘুমোয় না বলে। প্রায়ই সে রাত্রে শুয়ে শুয়ে নিঃশব্দে কাঁদে, আর কেউ না টের পাক মা পায়।

নরেন আসে নি বহুকাল। মেয়ের এমন হ'ল সে খবরটা পর্যন্ত পেলে না সে। এলেও হয়তো বিশেষ কিছু উপকারের লাগত না, বরং অপকারের সম্ভাবনাই বেশী। তবু মনে হয়—এক-একবার অকারণেই মনে হয়—হয়তো মেয়ের

এত বড় সর্বনাশ দেখলে একটু প্রকৃতিস্থ হবে সে, হয়তো টান ফিরে আসবে ছেলেমেয়েদের দিকে। কিছুও যদি আনতে পারে সে—চালটা ময়দাটাও—তা হলেও অন্ততঃ উপবাসটা বাঁচে।

ঐন্দ্রিলা আসবার পর তবু একটা উপকার হয়েছে, ওর মেয়ের দুধের জন্যে উমা তিনি টাকা ক'রে দিতে রাজী হয়েছে, এক মাসের টাকা পাঠিয়েও দিয়েছে। কমলাও পাঁচটা টাকা পাঠিয়েছে থোক্-কিন্তু এ সবে কীই বা হয়। সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ।

হেম ঘোরে টো টো ক'রে, ঘোরার কামাই নেই তার।

কাজ মেলে না। মিছিমিছি শরীরটাই নষ্ট হয়। ওর যথার্থ সোনার মত রং—যেন কে কালি মেড়ে দিয়েছে, এত রোগা হয়ে গিয়েছে যে খালি গায়ে দেখলে ভয় করে।

এই যখন অবস্থা—তখন হঠাৎ অভয়পদ একটা প্রস্তাব নিয়ে এল। কথাপ্রসঙ্গে বললে, 'কান্তিটার কথাটা একটু ভাবুন না। আট'ন বছর বয়স হয়ে গেল—না ইস্কুল না পাঠশালা। এমনি ক'রেই কি চলবে? বেটাছেলে মানুষ, লেখাপড়া না করলে খাবে কি ক'রে? যা হয় দুটো পাতাও তো পড়তে হবে!'

শ্যামা এখনও ঘোমটার মধ্য দিয়ে কথা বলে জামাইয়ের সঙ্গে—অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। আজও সেই ভাবেই বললে, 'সবই তো বুঝি বাবা—এক বামুনের ঘরের গরু নিয়ে চিরকাল জ্বলেপুড়ে মলুম। আবার ছেলেকেও তাই করবার কি আর সাধ! কিন্তু আসল কথা যে অন্যত্তর বাবা। দু'বেলা খাওয়া তো ওরা ভুলেই গেছে বলতে গেলে—একবেলা তাই সব দিন জোটে না। ফল-পাকুড় ডুমুর-সেদ্ধ খেয়ে দিন কাটে। স্কুল-পাঠশালে পড়াচ্ছি কোথা থেকে? নিজেরা একটু নিয়ে বসা—তাই হয়ে ওঠে না!'

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে অভয়পদ বললে, 'ওকে কাছছাড়া করতে রাজী আছেন?'

'তার মানে? কাছছাড়া মানে—?' মুখ তুলে বিস্মিত উৎসুক নেত্রে তাকায় এবার, ঘোমটার মধ্য দিয়েই।

আবারও কিছুক্ষণ মৌন থেকে অভয় বলে, 'মানে এই জানাশুনোর মধ্যেই অবশ্য—ধরুন যদি কেউ নিজের বাড়িতে রেখে লেখাপড়া শেখাতে রাজী থাকে, খরচ-পত্তর সবই তার—খাওয়া-পরা কিছুর জন্যই ভাবতে হ'বে না!

'সে তো ওর মহা ভাগ্য বাবা।' তবু কেমন একটু ধীরে ধীরেই বলে শ্যামা। কোথায় যেন একট দ্বিধা ওর কণ্ঠে। কোথায় একটু সংকোচ।

'না। আপনি যা ভাবছেন তা নয়।' অভয়পদ প্রশ্নটা অনুমান ক'রে নিয়ে একটু হেসে 'জবাব দেয়, 'ভয় নেই, পুষ্যিপুত্তুর নিতে চাইবে না সে। এমনি আমি আপনাদের অবস্থার কথা বলেই তাকে রাজী করিয়েছি, তার এমন কোন আগ্রহ নেই।'

'তা হলে সে তো অতি উত্তম প্রস্তাব বাবা! সত্যি-সত্যিই ভাগ্যের কথা!…

অবশ্য অবস্থা যা, পুষ্যি নিতে চাইলেই বা আপত্তি করবার জোর কৈ ? ছেলেটা ভাল খেয়ে পরে বাঁচবে, মানুষ হবে—সেইটেই তো মহা লাভ !···তা এ কার বাড়ি রাখবে বলছ ? এখানে না কলকাতায় ?'

'কলকাতায় ।'

সংক্ষেপে শুধু এই কথাটা বলে আবারও চুপ ক'রে যায় অভয়পদ। শ্যামা এবার বোঝে যে কোথাও একটা কোন কাঁটা আছে প্রস্তাবটার মধ্যে। খুব সরল সহজ নয় ব্যাপারটা। সেও চুপ ক'রেই থাকে। শঙ্কিতও হয় না—কারণ হঠাৎ-সৌভাগ্যে সে আস্থা হারিয়েছে অনেক কালই ; আজকাল আশা আর সে করে না কোন কারণেই—কারুর কোন আশ্বাসে বা কিছুতেই। এই দীর্ঘকালের অভাবে এবং দারিদ্র্যে এটা সে বেশ বুঝেছে যে সহজে কোন মানুষ কারুর উপকার করতে চায় না। যখনই কেউ কারুর উপকার করতে আসে তখন বুঝতে হবে যে তারও স্বার্থ আছে এই ব্যাপারে। বিশেষতঃ শ্যামার যা অদৃষ্ট তার কিছু মাত্র উপকারের প্রস্তাবও আসলে অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া কিছু নয়। তাই মনে মনে সে হাসেই বরং—আত্মবিদ্রূপের হাসি।

অবশেষে অভয়পদই কথাটার জের টেনে বলে, 'আপনা-আপনির মধ্যেই। সজাত, আমাদের আত্মীয় ; খুবই আত্মীয়। যত্ন-আত্তির অভাব হবে না। কথাটা কি জানেন, ঠিক আমাদের—মানে গেরস্ত ধরনের নয়।···হয়তো, হয়তো আপনি ওর কাছে শুনে থাকবেন কিছু কিছু, আমার মামাতো বোনের কথা বলছি। তার কাছে সেদিন পেড়েছিলুম কথাটা। সে রাজী আছে। আপনার যদি আপত্তি থাকে অবশ্য – '

সব সংকোচ ঝেড়ে ফেলে যেন কোন মতে কথাগুলো বলে ফেলে অভয়পদ।

আশাভঙ্গের কথা নয়—তবু যেন আঘাত লাগে একটা শ্যামার।

এতটা নীচে তাদের বংশে কেউ কখনও নামে নি বোধ হয়।

ভ্রষ্টা নারীর অন্নদাস। এর চেয়ে ব্রাহ্মণের ছেলের অধোগতি আর কি হতে পারে ! প্রস্তাবটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন একটা উষ্মাও বোধ করে—অভয়পদর এই ধৃষ্টতায়।···কিন্তু প্রায় তখনই সে উষ্মা তাকে দমন করতে হয়। ভিখিরীর আবার সম্মানবোধ ! বিশেষত নরেনের ছেলেমেয়ে—ব্রাহ্মণ-সন্তানের মর্যাদা সত্যিই কি ওরা দাবি করতে পারে ?

অনেকক্ষণ কাঠ হয়ে বসে থেকে আস্তে আস্তে সে উত্তর দেয়, 'মহা বলে নি অবশ্য, তবে আমি কানাঘুষো কিছু শুনেছি বৈকি। আমি আর কি বলব বাবা, আমার কি আর বলবার কোন উপায় আছে ? নাচারের আর বাছবিচার কি ?'

শ্যামা একটু মিথ্যাই বলে। মহাশ্বেতা তাকে সবই বলে গেছে। তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা না বলে থাকতে পারে নি। কিন্তু সেটা মেনে নেওয়া ঠিক নয়। মেয়ে সব কথা এসে বাপের বাড়িতে গল্প করে—এটা জানালে, সে-মেয়ের সম্বন্ধে শ্বশুরবাড়ীর ধারণাটা খারাপ হতে বাধ্য। তীক্ষ্ণবুদ্ধি অভয় অনুমান করেছে ঠিকই—তবু অনুমানটাকে নিশ্চিত ক'রে লাভ কি ?

অভয়পদ কম কথার মানুষ। সে একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'তাহলে কি ঠিক করছেন?'

শ্যামা কথাটার ঠিক স্পষ্ট জবাব তখনই দিতে পারে না। যেন নিজেকেই বোঝায় সে, 'আজকাল আর কোন্ সংসারে কোন্ বংশে এসব দোষ নেই বল'। …ছেলে থাকবে—নিরুপায় হয়ে, তাতে এমন দোষ কি? সে রকম বুঝলে এর পর একটা প্রাচিত্তির করিয়ে নিলেই চলবে। কিংবা পৈতের পর না হয় আর পাঠাব না। তদ্দিনে হেমের কি আর একটা উপায় হবে না?…সেই কটা দিন চলুক না। তাছাড়া কে-ই বা টের পাচ্ছে?…বললেই হবে কলকাতায় মাসীর বাড়ি থেকে পড়ছে! না কী বল বাবা?'

একটু অসহায় ভাবেই শেষের প্রশ্নটা করে শ্যামা।

অভয়পদ ছাতাটা বগলে ক'রে উঠে দাঁড়ায় একেবারে। 'তা হলে একটা দিন-টিন দেখে নিই। ওর জামা-কাপড় কি আছে ক্ষার ফুটিয়ে রাখবেন—আমিই—সঙ্গে ক'রে রেখে আসব।'

সে বেরিয়ে যায় সহজ স্বভাবিক গতিতে। কিন্তু শ্যামা বসে থাকে অনেকক্ষণ কাঠ হয়ে।

॥ ৩ ॥

কান্তিকে নিয়ে যেদিন অভয়পদ চলে গেল, সেদিন আর শ্যামার মুখে অন্ন গেল না। শুধু ছেলের অকল্যাণ হবে বলেই একটু গুড় গালে দিয়ে জল খেয়ে নিয়েছিল ছেলে যাবার সময়। তার বড় আদরের ছেলে কান্তি, বড় সাধ করে নাম রেখেছিল কান্তিচন্দ্র। বাপের নিখুঁত দৈহিক গঠনের সঙ্গে মায়ের গোলাপ ফুলের মত রং নিয়ে জন্মেছে সে।

কিন্তু মাকাল ফলের মতো রূপসর্বস্ব নয় তাই বলে। গুণেরও অন্ত নেই ঐটুকু ছেলের। এই বয়সেই শান্ত, ভদ্র, বিনত ও বিবেচক। সে যে কবে থেকে আবদার করা ছেড়ে দিয়েছে তা শ্যামার মনেও পড়ে না। এত ছেলেমেয়ের মধ্যে এইটিই যেন তার যথার্থ দুঃখের অংশভাগী। প্রাণপণে সাহায্য করে সব কাজে, অথচ কোন দিন মুখ ফুটে কিছু চায় না, কোন অনুযোগ করে না। লেখাপড়ায় ঝোঁক খুব—তবু সে সম্বন্ধে ও একটা কথা বলে নি কখনও। শুধু দিন-রাতের কোন এক সময়—দুর্লভ অবসরের সুযোগে সামান্য মলিন ছেঁড়া-খোঁড়া বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে—আর মাঝে মাঝে করুণ চোখে সুদূর দিগন্তের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে থাকে।

সেই ছেলে চলে গেল ওর—অজ্ঞাত অপরিচিত মানুষ ও আবেষ্টনীর মধ্যে। হয়তো কেউ তাকে ডেকে খেতে দেবে না। সে যা ছেলে—না খেয়ে মরে গেলেও কোন দিন চেয়ে খাবে না। মুখ ফুটে কোন দিনই কোন কথা কাউকে বলতে পারবে না। একেবারে সমস্ত আত্মীয়দের কাছ থেকে বিচ্যুত হয়ে মন গুমরে-গুমরেই হয়তো একটা অসুখ বাধিয়ে বসবে।

না—ভাল করে নি শ্যামা ওকে পাঠিয়ে। পুরুষ মানুষ, লেখাপড়া না-ই শিখুক—মুটেগিরি ক'রেও তো খেতে পারবে!

অভয়পদকে বলবে সে, কালই ডাকিয়ে পাঠাবে তাকে—বলবে, 'বড্ড ভুল হয়ে গেছে বাবা, তোমার সে বোন যেন কিছু মনে না করেন, তুমি গিয়ে কান্তিকে ফিরিয়ে নিয়ে এস।'

কিন্তু অভয়পদ যখন আসে তখন কিছুই বলা হয় না। কারণ সে আসে সম্পূর্ণ এক নূতন প্রস্তাব নিয়ে। শ্যামার দিক্-দিশাহীন অন্ধকার জীবনে আলোকের সন্ধান নিয়ে আসে সে। যা সুদূরতম কল্পনারও অতীত—তাই যেন হঠাৎ একেবারের সামনে, হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যায়।

কান্তিকে কলকাতায় রতনের বাড়ি পেঁছে দিয়ে সেই দিনই ফিরে এখানে এল অভয়পদ। বগল থেকে ছাতাটি নামিয়ে দাওয়ায় পেতে তার ওপরই বসে হাঁক দিলে সে, 'কৈ গা ছোড়দি, জল খাওয়াও এক ঘটি!'

ছোড়দি অর্থাৎ ছোটশালী, তরুবালা। এই মেয়েটিকে স্নেহ করে অভয়পদ। আদর ক'রেই ছোড়দি বলে ডাকে!

যাকে ডেকে পাঠাবার কথাই সারাদিন ধরে চিন্তা করেছে শ্যামা, অপ্রত্যাশিত ভাবে তাকেই হঠাৎ আসতে দেখে আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে সে, 'তুমি—তুমি আবার এখানে এলে যে আজই? কান্তি, কান্তি কোথায়?'

'কান্তি তো কলকাতাতে!' আশ্চর্য হয়ে বলে অভয়পদ, 'সেখানে পেঁছে রতনের জিম্মা ক'রে দিয়ে তবে এসেছি। তার ঘর তাকে দেখিয়ে দিয়েছি, ঠাকুর ভাত দিচ্ছিল, খেয়ে গেছে বলে সে খেলে না—তবু মোক্ষদা ঝি জোর ক'রে জলখাবার খাইয়ে দিয়েছে। সে বেশ আছে, তার জন্যে ভাববেন না। কালই তাকে ওরা ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দেবে। এই যে একটা চিঠিও দিয়েছে—'

এক টুকরো কাগজ বার ক'রে শ্যামার সামনে ফেলে দেয় অভয়পদ। শ্যামা সাগ্রহে তুলে নিয়ে পড়ে, কান্তিরই গোটা গোটা গোল গোল হরফ, প্রেণাম শতকোটি নিবেদনমিদং (শ্যামাই এসব শিখিয়েছে ছেলেমেয়েদের) মা, আমি নিরাপদে পেঁছিয়াছি। ভাল আছি। আপনি ভাবিবেন না। সকলকে আমার প্রণাম জানাইবেন, আপনিও জানিবেন। ইতি—সেবক কান্তি।'

কিন্তু চিঠিটা ভাল ক'রে শ্যামাকে পড়বারও অবকাশ দেয় না অভয়পদ। অকস্মাৎ প্রশ্ন ক'রে বসে, 'আমি এসেছি অন্য একটা কথা জিজ্ঞেস করতে। বাড়ি কিনবেন?'

চমকে কেঁপে ওঠে শ্যামা। হাত থেকে চিঠিটা খসে পড়ে যায়। কান্তি কি লিখেছে তা সবটা পড়াও হয় না বোধ হয়।

সে কি ভুল শুনছে?

না কি অভয়পদ ঠাট্টা করছে অকে?

এত ধৃষ্টতা হবে তার! সে তো সেরকম ছেলে নয়! অথচ আর কীই বা হতে পারে—মর্মান্তিক পরিহাস ছাড়া?

অতি কষ্টে, অনেকক্ষণ পরে সে উচ্চারণ করে, 'কী বললে ? কী কিনব ?'

'বাড়ি। আমি বাড়ির কথা বলছি। এই কাছেই—আঁদুলে একখানা পাকা বাড়ি খুব সুবিধেয় বিক্রি হচ্ছে। লোকটা দায়ে ঠেকেছে তাই অত সস্তায় বেচতে চাইছে। প্রায় তিন বিঘে জমি, তার মধ্যে বারো কাঠা আন্দাজ জলকর—পুকুরটাও বেশীদিনের কাটানো নয়—পাকা বাড়ি। একটা ঘর দালান আগাগোড়াই পাকা, আর একটা ঘরের ভিতর পর্যন্ত আছে। বৈঠকখানা ঘরটা সব পাকা নয়—পাকা দেওয়াল খড়ের চাল। মেটে রান্নাঘরও একখানা আছে এ ছাড়া।...যাই হোক, আপনাদের ভাল রকমই সম্পুষ্যি হবে।'

'কত দাম ?' অসম্ভব জেনেও প্রশ্নটা বেরিয়ে যায় শ্যামার মুখ দিয়ে।

'দেড় হাজার টাকা চাইছে—যে রকম গরজ, বোধ হয় বারো-তেরো শোতেও রাজী হয়ে যাবে !'

'কিন্তু তা হলে আমাকে আর ওকথা বলতে এসেছ কেন বাবা ? এ কি ঠাট্টা করছ ? আমার অবস্থা জান না ?' তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে শ্যামার কণ্ঠস্বর। জামাইকে সমীহ ক'রে কথা বলা উচিত—এটাও তার মনে পড়ে না।

কিন্তু এ ভর্ৎসনাতে অভয়পদর মুখের একটি রেখাও পরিবর্তিত হ'ল না। তেমনি শান্ত ভাবে কিছুক্ষণ মৌন থেকে সে ধীরে ধীরে বললে, 'আমি জানি সামান্য কিছু টাকা আপনার হাতে জমেছে। ঠিক কত জমেছে বলুন তো !'

শ্যামা এতখানি নিশ্চিত অনুমানের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সে অস্বীকার করবার চেষ্টা করলে না। এটুকু সে বুঝেছে যে আজ সারা পৃথিবীতে এই জামাইটির মতো হিতাকাঙ্ক্ষী তার কেউ নেই। সেও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, 'ছ'শো কুড়ি টাকা। তোমার কাছে মিছে বলব না—হেমের শিশিবোতল বেচা টাকা—এই জন্যেই জমিয়েছিলুম—হাজার দুঃখেও হাত দিই নি। কিন্তু সে তো অর্ধেকেরও কম বাবা !'

অভয়পদ একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে ছাতাটি তুলতে তুলতে বললে, 'তা হলে সামনের রবিবার বাড়িখানা দেখে আসবেন চলুন। যদি পছন্দ হয় তো বাকী টাকার জন্য আটকাবে না। ও টাকাটা অম্বিকের কাছ থেকে চেয়ে আমিই ধার দিতে পারব।'

শ্যামা কি জেগে আছে, না স্বপ্ন দেখছে ? কানে শুনেও যে বিশ্বাস হয় না। দু'কানের মধ্যে যেন কত কী কোলাহল ! এ কি ওর রক্তস্রোতেরই গুঞ্জন ?

তবু ক্ষীণ কণ্ঠে একবার বলে, 'তার পর ? এখানকার নিত্যসেবা ছাড়লে খাব কি ? ইট কামড়ে তো পেট ভরবে না ! আর দু-এক ঘর যজমান এখানে আছে—'

'বাড়ি কেনামাত্র যে এখনই সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে যেতে হচ্ছে তার মানে কি ? তা ছাড়া ও সম্পত্তিটারও আয় আছে। উনিশটা নারকোল গাছ, গোটা কুড়ি সুপারি গাছ আছে। পুকুরে মাছের ডিম ফোটালেও মন্দ আয় হবে না। সে তখন পরে দেখা যাবে।'

অভয়পদ ছাতিটি বগলে চেপে চলে গেল। বোধ করি এই-ই প্রথম—ওকে

কিছু জলখাবার দেবার কথা শ্যামার মনে পড়ল না।

উনিশটা নারকেল গাছ!

এখানে একটা নারকেল পড়লে সরকারদের সঙ্গে কী নিদারুণ টানাটানি, প্রতিযোগিতা! কত কৌশলে সেটি চুরি ক'রে আনতে হয়। তিনটি কিংবা দুটি পয়সা মিলবে বিক্রি ক'রে, তারই জন্যে যেন প্রাণপণ!...

অত কষ্টের অর্জিত পয়সা থেকে যেন মরীয়া হয়েই একটা বার ক'রে দেয় শ্যামা—এক পয়সার বাতাসা আনায়।

খাড়া খাড়া হরির লুট দেবে সে।

খবরটা—প্রস্তাবটা আসার জন্যই। জামাই অতগুলো টাকা ধার দিতে চেয়েছে যখন—এখানে না হোক, অন্য কোথাও হবেই।

এতখানি সৌভাগ্য—তার কি হবে সত্যি-সত্যিই? মনে করতেও ভয় করে। তার যা কপাল!

আশা ও আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে সারারাত জেগে বসে কাটিয়ে দেয় শ্যামা।

একাদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

রবিবার যখন সত্যি-সত্যিই জামাইয়ের সঙ্গে বাড়ি দেখতে গেল শ্যামা, তখন তার নিজেরই অবাক লাগছিল। এই আশাতীত কল্পনাতীত ঘটনা যে তার জীবনে সত্যিই ঘটবে—এ কে ভেবেছিল! একটা আশা যে কোথাও ছিল না তা নয়—কিন্তু সে সুদূর, সে আশাকে নিজের মনেও স্বীকার করতে ভয় করত, লজ্জাবোধ হ'ত। এদিন যে তার এত তাড়াতাড়ি আসবে তা সে কখনও স্বপ্ন পর্যন্ত দেখে নি বোধ হয়! যখন রওনা দিচ্ছে তখনও পর্যন্ত ব্যাপারটাকে তাই আবস্তব দিবাস্বপ্ন বলে বোধ হচ্ছে, এমন কি এমনও এক-আধবার মনে হচ্ছে যে জামাই তাকে নিয়ে একটা তামাশা করছে না তো?

তারপর একসময় আঁদুল রাজবাড়ির পাশ দিয়ে বাজার পেরিয়ে মা সিদ্ধেশ্বরীকে ডাইনে রেখে যখন সে সত্যিই সহদেব দাসের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, তখন তার দুই চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। বাড়িটার দিকে ভাল ক'রে তাকাতে শুধু যে সাহস হচ্ছে না তাই নয়—শক্তিও যেন লোপ পেয়েছে।

কত দিনের কত লাঞ্ছনা, কত হতাশ্বাস, কত দুর্ভাগ্য মনে ও মাথায় ভিড় ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘকালব্যাপী পর পর আশাভঙ্গের ইতিহাস ও বেদনা। বিশেষ ক'রে গত এই দুটো বছরের শ্বাসরোধকারী দুর্ভাগ্যের মিছিল। চারিদিক থেকে চেপে ধরেছে তাকে—একটার পর একটা।

এর মধ্যে বাড়ি! তার নিজস্ব বাড়ি! পরের অনুগ্রহ ও আশ্রয়ের মুখ চেয়ে থাকতে হবে না আর!

কিন্তু বাড়ি তো তাদের ছিল। পাকা বাড়ি। বাগান জমি, পুকুর সব

দেখেই তো তার মা তাকে দিয়েছিলেন। ভোজবাজির মতো চকিতে সব উড়ে চলে গেল কোথায়, নিঃশ্বাস ফেলতেও তর্ সইল না যেন। আবারও যদি তেমনি যায়!

বাড়িটা ভাল ক'রে দেখবার আগেই প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'আবার যদি সব বেচে খায় ঐ হতভাগাটা?—'

'হতভাগা—?' ঈষৎ বিমূঢ় ভাবেই তাকায় অভয়পদ, তার পরই তার ভাবলেশহীন প্রশান্ত মুখে প্রচ্ছন্ন একটু কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে, 'ও আপনি ওঁর কথা—মানে বাবার কথা বলছেন? না তা পারবে কেন? বাড়ি তো আপনার নামে কেনা হবে!'

শ্যামাকে অনায়াসে 'মা' বলে ডাকলেও নরেনকে 'বাবা' বলতে আজও সংকোচ বোধ হয় অভয়পদর—তা শ্যামা এই বিহ্বলতার মধ্যেও লক্ষ্য করে।

শ্যামা বলে, 'আমার নামে? বাড়ি আমার নামে কেনা হবে? মেয়েছেলের নামে বাড়ি কেনা যায়?…নয় তো না হয় হেমের নামেও কিনলে হয়, ও তো এখন সাবালক!'

'না না', দৃঢ় কণ্ঠে আপত্তি জানায় অভয়, 'বাড়ি আপনার নামেই কিনুন। ছেলের নামে কেনার অনেক ঝুঁকি। বিয়ের পর ছেলে কেমন দাঁড়াবে কে বলতে পারে?…মন না মতি!…তখন যদি অন্য ভাইদের ফাঁকি দেয়? যদি ধরুন আপনাকেই তাড়িয়ে দেয়? আপনার নামে বাড়ি থাকলে ছেলেরা চিরদিন আপনার দাপে থাকবে।'

'তা হলে আমার নামেই কেনা হবে বলছ? অবশ্য যদি কেনা হয় শেষ অবধি!' কেমন একটা ছেলেমানুষের মতোই উৎসুকভাবে প্রশ্ন ক'রে শ্যামা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখন আপনি বাড়িটা দেখুন ভাল ক'রে।'

অভয় যেন মৃদু ধমক দেয় একটা।

শ্যামা আঁচল দিয়ে চোখ রগড়ে দৃষ্টিটাকে পরিষ্কার ক'রে নেয়।

তা বাড়িটা অবশ্য ভালই। অভয়পদ যা বর্ণনা দিয়েছিল, তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়, বরং আরও বেশী ভাল। ঘরটা বেশ বড়, সরকারদের যে ঘরে তারা কোনমতে মাথা গুঁজে থাকে—তার চেয়েও বড়। তার সঙ্গে ঘেরা দরদালান, সেও তো আর একখানা ঘরই। ওপাশে এই ঘর আর দালানের মাপেই ''আদ্‌রা' করা রয়েছে, ঘর তুলতে বেশী সময় লাগবে না। বৈঠকখানা ঘরটায় গোলপাতার ছাউনি বটে—কিন্তু শোবার ঘরের 'চেয়েও বড়। তার সামনে আবার বাঁধানো রোয়াক। শুধু এই ঘরখানা পেলেও সে বর্তে যেত।

বাড়ি, বাগান, পুকুর সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে শ্যামা। নারকেল সুপারি গাছ একটি একটি করে গুনে নেয়। তিন ঝাড় কলা আছে। সহদেবের বৌ বললে, সব ভাল কালী-বৌ কলার জাত। সজনে গাছ, ডুমুর গাছ তো অগুনতি। চালতা গাছেরও একটি চারা উঠেছে। তিনটে আম, একটা কাঁঠাল। আম সবই দেশী—কিন্তু একটায় নাকি খুব মিষ্টি ফল হয়। এ ছাড়া পুকুরপাড়ে একটা আমড়া গাছ আছে—সহদেবের বৌ বলল, 'আম ফেলে আমড়া খেতে হবে মাঠাকরুন, যেমন

সোয়াদ, তেমনি সোগন্ধ ।···কী বলব, সব শখ ক'রে গাছপালা আর্জানো মা, নিজে এক কোশ পথ হেঁটে বোনের বাড়ি থেকে ঐ আমড়ার চারা এনেছিলুম। এ কী বেচবার জিনিস ? কী বলব, মিনসের পোড়া কপাল তাই—আর আমারও।'

ডাব পাড়ানোই ছিল, সহদেবের স্ত্রী দুজনকে দুটো কেটে দিলে। অন্তত আড়াই ঘটি করে জল এক একটার। দুর্বার লোভে শ্যামার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল, আগ্রহে আশঙ্কায় অধীরতায় মাথা ঝিমঝিম ক'রে উঠল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাড়ার দু-চারজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রে মা সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে বুক চিরে রক্ত দেবার মানসিক ক'রে যখন আবার পদ্মগ্রামের পথ ধরলে শ্যামা, তখন তার আর, 'কেনা হবে কি-না শেষ পর্যন্ত, টাকাপয়সার ব্যবস্থা হবে কিনা',—এ প্রশ্ন করবার সাহস নেই। হবে না—সে তো জানা কথাই, সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মনের গোপন কোণে এই আশাটুকু থাকে থাক না। মিছিমিছি এই সংশয়ের সুখটুকু নষ্ট ক'রেই বা লাভ কি ?

অবশেষে কতক্ষণ রুদ্ধ-নিশ্বাস প্রতীক্ষার পর অভয়পদই প্রশ্ন করলে, 'বাড়ি আপনার পছন্দ হ'ল তা হলে ?'

'এ কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করছ বাবা ! ঘুঁটেকুড়ুনীর রাজপ্রসাদ ভাল লাগবে না—এ কি হতে পারে ? যে অবস্থায় আছি, তার হক্কে এ তো ইন্দ্রভুবন !'

'আশপাশে সব কী বললে ?'

'ঐ যে যাকে বললে অর্জুনের বৌ—ঠিক পাশেই যে, সে বলছিল যে জমির কী সব নাকি গোলমাল আছে। পুকুরে নাকি ওদের অংশ আছে একটা। এ নিয়ে নাকি মামলা-মকদ্দমাও হতে পারে।'

'হুঁ। ওরা তো ভাংচি দেবেই। ওরা আটশো টাকা দাম দিয়ে বসে আছে যে! আর কে কি বললে ?'

'নিবারণ দাস বলছিল যে বাড়ির ভিত তেমন ভাল নয়—তা ছাড়া ও ভিটের নাকি কী সব দোষ আছে, কারুরই সয় না।'

'নিবারণ দাসের কাছেই বাড়িটা বন্ধক আছে যে। চারশো টাকা ধার দিয়েছে —সুদে আসলে মোটা হলে একদিন ঐ টাকাতেই বাড়িটা নিতে পারবে, এই ওর মতলব !'

'কী জানি বাবা। ওসব তুমি আমার চেয়ে ভাল বুঝবে। ও নিয়ে আমি মাথা ঘামিয়ে কী করব ! ··আসল কথা এখন—'

এই পর্যন্ত বলে থেমে যায় শ্যামা। আসল কথাটা যেন মুখে উচ্চারণ করতেও বেধে গেল। সশঙ্কিত আগ্রহে উৎসুক হয়ে জামাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু।

কিন্তু অভয়পদর নির্বিকার মুখে কোন উত্তরই ফোটে না। সে যেমন উদাসীন নিস্পৃহতার সঙ্গে হাঁটছিল, তেমনিই হাঁটতে থাকে।

শ্যামাকেও অগত্যা নিঃশব্দে পথ চলতে হয়। কিন্তু আশা ও আশঙ্কার এই

স্পন্দন যেন আর সয় না। পথ চলার পরিশ্রম তার কাছে নতুন নয়—কিন্তু এখন যেন পা দুটো ক্রমশ পাথর হয়ে আসে, বার বার শাড়ির আঁচলে কপাল মোছে কিন্তু পরক্ষণেই অজস্রধারে ঘাম গড়িয়ে দুই চোখ ঝাপসা ক'রে দেয়।

অবশেষে পথের ধারের একটা গাছতলায় গিয়ে সে বসেই পড়ে।

'আমি—আমি একটু বসি বাবা। বড্ড কষ্ট হচ্ছে। আমি আর চলতে পারছি না'

বিনা বাক্যে অভয়পদও একটু দূরে আর একটি গাছতলায় নিজের বিবর্ণ ছাতাটি পেতে বসে। না জানায় শাশুড়ীর এই অবস্থার জন্য কোন উদ্বেগ, না করে কোন প্রশ্ন। এমন কি অযথা দেরি হওয়ার জন্য এতটুকু অসহিষ্ণুতাও প্রকাশ করে না। শুধু চাদরের খুঁটে নিজের মুখটা মুছে নেয় একবার।

অবশেষে আর থাকতে না পেরে, এক রকম মরীয়া হয়েই প্রশ্ন করে শ্যামা, 'তা হলে কি হবে বাবা এখন ?'

'কিসের কী হবে ?' অভয়পদ নিরুৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় শ্যামার, জামাইয়ের এই নিরাসক্তিতে। কোনমতে মনের ভাব দমন ক'রে বলে, 'ঐ—মানে বাড়িটার ? গাছে তুলে দিয়ে এখন মই কেড়ে নেবে না তো ?'

অভয়ের মুখে এবার কোন প্রায়-অদৃশ্য হাস্যরেখাও ফোটে না। সে তেমনি অনাসক্ত কণ্ঠে বললে, 'এখনও তো ঠিক বলা যাচ্ছে না, বায়না ক'রে একটা সার্চ করাতে হবে। উকিলকে দেখাতে হবে কাগজগুলো, যদি কোন গোলমাল সত্যিই থাকে তো নেওয়া চলবে না।'

'কিন্তু যদি গোলমাল না থাকে—'

অদ্ভুত একটা আর্তনাদ কি ফোটে শ্যামার কণ্ঠে ?

হে মা সিদ্ধেশ্বরী, স্থানে থেকে কানে শুনো মা।

'তাহলে আর কি।'

'টাকা ?' দাঁতে ঠোঁট চেপে অসহ একটা উষ্মা দমন করে শ্যামা।

'সে হয়ে যাবে। পরশু ভাল দিন আছে, আপনি একষট্টিটা টাকা ঠিক ক'রে রাখবেন। একান্ন টাকা বায়না—আর উকিলকে আপাতত দশটা টাকা দিয়ে রাখতে হবে। আরও লাগবে অবিশ্যি—যদি বাড়ি কেনাই সাব্যস্ত হয়।'

আরও কী বলতে থাকে অভয় কিন্তু শ্যামার কানে এক বর্ণও যায় না তার। যেন সহস্র মন্দিরা তার কানের কাছে ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে ওঠে, সমস্ত তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অযুত খঞ্জনীর ঝঙ্কার ওঠে—কিছু কানে পৌঁছয় না চোখ আসে ঝাপসা হয়ে।

হে ঠাকুর, হে মা সিদ্ধেশ্বরী, অবশেষে কি মুখ তুলে চাইলে মা ?

সে গাছের গুঁড়িটায় ঠেস দিয়ে অবসন্নভাবে চোখ বোজে।

তারপর অনেকক্ষণ পরে যেন বহুদূরে থেকে একটা পরিচিত কণ্ঠ ক্ষীণ অস্পষ্ট ভাবে কানে এসে পৌঁছয়, 'এবার তা হলে উঠুন মা, অনেক দূর যেতে হবে।'

চোখ খুলে একেবারে উঠে দাঁড়ায় শ্যামা।

'হ্যাঁ বাবা, চল যাচ্ছি।'

পা দুটোয় আর কিছু মাত্র ভারবোধ হচ্ছে না—আশ্চর্যরকম ভাবে হালকা হয়ে গেছে।

॥ ২ ॥

উঠোনে পা দেবার অনেক আগে থেকেই দাপাদাপি ও চেঁচামেচির শব্দ কানে আসে। কে করছে তা আর বলে দিতে হয় না কাউকেই—আর কি জন্য, সে প্রশ্ন তো নিরর্থক।

নরেন এসেছে।

বাড়িতে ঢুকে দেখা গেল সারা উঠোনটায় যেন নেচে বেড়াচ্ছে সে।

ঐন্দ্রিলা এখানে নেই—দিনকতকের জন্য মাসীর বাড়ি গেছে। তরু একা। সে ছোট ভাইটাকে নিয়ে ভয়ে ঘরের দোর দিয়ে বসে আছে, পিঁটকীর ছেলেমেয়েগুলো আর মঙ্গলা ঠাকরুনের নিজের ছোট ছেলেমেয়েরা ওপাশের দরজায় ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। কারুর চোখে কিছু ভয়, কারুর চোখে শুধুই কৌতুক।

'শেষ ক'রে দেব, বুঝলি? গোরবেটার জাতকে এক কোপে শেষ ক'রে দেব আজ। ঝাড়ে-বংশে শেষ। কাউকে রাখব না। ছেরাদ্দ মাখতেও একটাকে আস্ত রাখব না।'

এ সবই অতি পুরাতন, তবু যেন জামাইয়ের সামনে অপমানে মাথা কাটা যায়। তারই মধ্যে মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দেয় সে, তরুর বুদ্ধির জন্য। কে জানে, ঘরে ঢুকে নিরিবিলি থাকতে পারলে শেষ পর্যন্ত সেই জমানো টাকাটার সন্ধান পেত কি না!

আর তা হলে—বাপ রে!—ভাবলেও সমস্ত শরীর হিম হয়ে যায়। অতি কষ্টে যখন সে আশা করতে শুরু করেছে সবে—দুরাশা হলেও—সেই সুবৃহৎ দুরাশার মূলে এমনভাবে ঘা পড়লে হয় সে পাগল হয়ে যেত, নয়তো তাকে আত্মহত্যা করতে হ'ত!

'কী হয়েছে কি? ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছ কেন?' দ্রুত বাড়ির মধ্যে ঢুকে তীক্ষ্ম কণ্ঠেই প্রশ্ন করে সে।

'এই যে মহারানী সয়ার ক'রে এলেন!…বল্ মাগী, আমার ছেলেকে কেন সেই বেশ্যে মাগীটার কাছে পাঠিয়েছিস! কেন, কেন পাঠিয়েছিস বল্ আগে?…কত বড় বংশের ছেলে সে তা তুই কি জানবি? ওর ঠাকুরদা শুদ্দুরের বাড়ি পা ধুতো না—আর তাকে তুই পাঠিয়েছিস খানকীবাড়ির ভাত খেতে!'

'তার ঠাকুরদা তো শুদ্দুর বাড়ি পা ধুতো না—কিন্তু তার সেই ঠাকুরদার ছেলে কি! বংশের পরিচয় দিতে লজ্জা করে না!'

'চোপরাও মাগী! আমি কি সে আমি বুঝব। তুই এখন বার কর ছেলেকে

যেখান থেকে পাস্‌। নেকালো—আভি নেকালো হাম্মারা লেড়কাকো!'

আরও এক পাক যেন নেচে নেয় সে।

'চুপ কর বলছি। ছেলে! ছেলের কথা মুখে আনতে লজ্জা করে না?··· ছেলেকে খাওয়াবার বেলা আমি, লেখাপড়া শেখাবার বেলা আমি—আর কর্ত্তাত্তি করার বেলায় উনি!'

'ফের মাগী মুখ নাড়ছিস!···মুখ ভেঙে দেব তা জান না! ডাণ্ডা মারব মাথায়—তবে তুমি জব্দ হবে। বল্‌ তুই কেন আমার ছেলেকে পাঠিয়েছিস সেখানে, কী এক্তিয়ারে পাঠিয়েছিস তুই? জানিস আমি তার গার্জেন, পুলিস কেস করতে পারি তা জানিস? তোকেসুদ্দ পুলিপোলাও খাওয়াতে পারি?'

'জানি। খুব জানি। আর মুখ নাড়তে হবে না। তোমার মুরোদ আমার আর জানতে বাকি নেই। পুলিসের ত্রিসীমানায় যাবার সাহস আছে তোমার? যাও না দেখি—কত মুরোদ!'

'বটে! আচ্ছা! মরবার পালক গজিয়েছে—বুঝেছি। পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে!···অনেকদিন গোবড়েন খাও নি বটে।···সপুরী এক গাড় করব আজ—সব কটাকে কেটে দুখানা ক'রে ফেলব-তবে আমি ফলনা বাঁড়ুয্যের ছেলে। গোরবেটার জাতকে এক কোপে কেটে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে তবে আমার আর কাজ।'

এতক্ষণ বোধ করি সে অভয়পদকে দেখতে পায় নি। সব ঝালটাই তাই পড়ছিল শ্যামার ওপর।

হঠাৎ এইবার জামাইয়ের কাছে এসে হাত পা নেড়ে বলে ওঠে, 'এই যে কম্মকত্তা খোদও আছেন সঙ্গে! বলি নিজেদের বংশের কেলেঙ্কার নিয়ে সব বংশ না জজালে বুঝি চলছিল না বাবাজী? তোমাদের ও আদিখ্যেতা তোমাদেরই থাক—এখন আমার ছেলেকে এনে দাও। ওকে প্রাচিত্তির করিয়ে ঘরে তুলতে হবে।···তোমাদের চামে-কাটা বংশের ওতে লজ্জা-ঘেন্না হয় না—কিন্তু আমাদের বংশে কেউ কখনও ও কাজ করে নি—বুঝলে? ভিক্ষের ভাত খেয়েছি—তাই বলে বেশ্যের ভাত! চোদ্দপুরুষ নরকস্থ হয় ওতে—'

অভয়পদ নির্বিকার। কিন্তু শ্যামা এইবার ক্ষেপে উঠল একেবারে। সামনে এসে দাঁতে দাঁত চেপে বীভৎস একটা ভঙ্গী ক'রে বললে, 'বলি থামবে—না জ্যান্ত মুখে নুড়ো জেবলে দেব! এর চেয়ে বিধবা হলেও আমার ঢের ভাল ছিল যে। ফের যদি একটা কথা কও তুমি তো ঐ আঁশবটি দিয়ে কেটে তোমাকে দুখানা ক'রে ফেলব বলে দিচ্ছি। তাতে আমার ফাঁসি হয় সেও ভাল। তবু ধরার ভার হরণ ক'রে তো যেতে পারব।'

এই ধমকেই যেন কাজ হয় খানিকটা। নরেনের দাপাদাপি অনেকটা কমে আসে। সে যেন একটু ভয়ে-ভয়েই দু'পা পেছিয়ে গিয়ে বলে, 'হুঁ—খুব যে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা হয়েছে! বিধবা হলে খুব চার হাতে খাবে—নয়? খাওয়াচ্ছি তোমায়! বেশ আমি চললুম সেইখানেই—দেখি কে ঠেকায়। নিজেই

নিজের ছেলেকে নিয়ে আসব—তার জন্যে থানাপুলিস করতে হয় সেও ভাল।'

হঠাৎ যেন দুষ্ট সরস্বতী ভর করে শ্যামার রসনায়। কী বলছে তা বোঝবার আগেই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'বেশ তো, যাও না। তার কাছ থেকে ঠকিয়ে টাকা এনেছ মনে নেই? সেও দারোয়ানদের বলে রেখেছে—দেখলে সে-ই তোমাকে পুলিসে দেবে!'

অকস্মাৎ জোঁকের মুখে নুন পড়ল। নরেন সত্যিসত্যিই কী একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। আম্‌তা আম্‌তা ক'রে কেমন একরকম আলগা ভাবে বললে, 'কে, কে বলেছে এ কথা, সেই মাগী বলেছে? তার চোদ্দ পুরুষের পুণ্যি যে বামুনে তার টাকা ছুঁয়েছে! ভারি তো কটা টাকা—তার-জন্যে—হুঁঃ!'

তার পরই, সম্ভবত এতক্ষণের দাপাদাপির ফলস্বরূপই, অবসন্ন ভাবে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে পড়ে বলে, 'দে, একটু তামাক দে দিকি।'

কথাটা যখন বলে ফেলেছিল শ্যামা, তখন সে সুদূর কল্পনাতেও এ কথা ভাবে নি যে নরেন কোনদিন সত্যিসত্যিই মেয়ের ননদের বাড়ি গিয়ে—বিশেষত সমাজের বাইরের, অপাংক্তেয় সেই মেয়েটার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসতে পারে। ঠিকানাই তো জানার কথা নয় তার। কিন্তু আন্দাজী ঢিল এইভাবে অব্যর্থ লক্ষ্যে পৌঁছতে অপমানে ও ক্ষোভে যেন দিশাহারা হয়ে গেল সে⋯এমন কি অভয়ের সেই পাথরের মতো মুখেও একটু বিস্ময় ও উদ্বেগের ছায়া ফুটে উঠল।

শ্যামা দ্রুত একেবারে নরেনের মুখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, 'বেরোও', বেরোও বলছি, এই দণ্ডে বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। নইলে সত্যি-সত্যিই একটা রক্তারক্তি কাণ্ড করব বলে দিলুম।⋯আমার মুখখানা আর কোথাও পোড়াতে বাকি রাখলে না, সেখানে পর্যন্ত!⋯তাই তোমার বংশের আর বামুনাইয়ের এত ভড়ং, তাই এত চেঁচামেচি দাপাদাপি! ওকে তামাক দেবে—! ঐ তামাকের আগুন মুখে গুঁজে দেব।⋯কৈ, উঠলে? বেরোও বলছি, এই দণ্ডে এখান থেকে চলে না গেলে আমি অনথ করব।'

নরেন একবার ভয়ে ভয়ে শ্যামার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। কী দেখলে সেখানে কে জানে—কিন্তু তার পর একটা কথাও কইতে সাহস করলে না—এতটুকু স্পর্ধার সুর আর তার কণ্ঠে ফুটল না। কেমন যেন হতচকিত বিহ্বল ভাবেই আস্তে আস্তে উঠে পা পা ক'রে বেরিয়ে গেল সে। গামছায় পুঁটুলি বেঁধে কোথা থেকে কী এনে দাওয়ারই এক কোণে রেখেছিল—যাবার সময় সেটার কথাও তার মনে রইল না।

উঠোন পেরিয়ে বাগানে পড়ে—সেই প্রায়ান্ধকার অপরাহ্ণের আলোতে এক সময় দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল সে।

এই প্রথম নরেনের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটল তার বহুদিনের উৎপীড়িত অত্যাচারিত স্ত্রীর কাছে।⋯

মঙ্গলা ঠাকরুন ছেলেমেয়েগুলোকে সরিয়ে এবার সামনে এলেন, 'সত্যিসত্যিই

এই অবেলায় ভাতারটাকে তাড়িয়ে দিলি বামনী! হাজার হোক বামুনের ছেলে, সোয়ামী!'

কথাটা বোধ হয় শ্যামারও মনের কোণে ইতিমধ্যেই কোথায় খচ্ খচ্ করতে শুরু করেছিল, সে নিজের কপালে জোরে জোরে দুটো ঘা মেরে কান্নায় ভেঙে পড়ল একেবারে, 'আর যে আমার সহ্য হয় না মা, আর কত সহ্য করি! আমার যে মরণও হয় না। যমে নিলেও যে রেহাই পেতুম। আমাকে বিষ এনে দাও মা এক ডেলা, তাই খেয়ে ছুটি নিই।'

মঙ্গলা তাকে আর কোন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা না ক'রে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এসে তরুকে ডেকে বললেন, 'ওলো তরী দোর খোল্ না, জামাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেই থেকে—দেখতে পাচ্ছিস না?...এসো বাবা এসো—এ কেলেঙ্কার তো নিত্য এদের। তুমি ঘরে এসে বসো, ঠাণ্ডা হও। একটু জলটল খাও।'

॥ ৩ ॥

নরেনকে তাড়িয়ে দিলেও তার কথাগুলোকে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না শ্যামা। কানের মধ্যে কেবলই যেন ঘুরে ফিরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। ক্রমশ তিরস্কারের মতোই শোনায় সে প্রতিধ্বনিগুলো। এর মধ্যে মঙ্গলারাও রসান দেন। ব্যাপারটা থিতিয়ে গেলে অর্থাৎ অভয়পদ জলযোগের পর বিদায় নিলে আবার এসে জাঁকিয়ে বসেন মা ও মেয়ে। দুটো একটা একথা সেকথার পর পানের পিক ফেলে আর একটু চুন এবং দোক্তা সেই অন্ধকার মুখবিবরে ফেলে দিয়ে বলেন, 'তা যাই বলিস বাছা বামনী, লোকটা পাগলই হোক আর ছাগলই হোক—কথাগুলো যে খুব অন্যেয্য বলেছে, তা বলে নি। হাজার হোক পুরুত-বামুনের ছেলে, গুরুবংশ—তাকে কি উচিত ঐসব জায়গায় পাঠানো? যা শুনলুম, বাপ্ রে—গা শিউরে ওঠে। তোর কিন্তু খুব সাহস বাপু—যাই বলিস। না খেতে পেয়ে মরে গেলেও আর কেউ পারত না'—

পিটকী হি হি ক'রে খানিকটা হেসে নিয়ে বলে, 'আর কী চাপা বামুনদি, বলে কিনা আমার মেয়ের ননদের বাড়ি পাঠিয়েছি! হি হি, খুব বুদ্ধি বাপু—বলতেই হবে।'

লজ্জায় মাথা কাটা যায় শ্যামার। একটু আশঙ্কাও হয়। কে জানে এ কিসের ভূমিকা? মা-মেয়েতে দল বেঁধে এল কেন? কী বলতে চায়?

আর একবার পিচ্ ফেলে বলেন মঙ্গলা, 'না—সে না হয় হ'ল। ননদের কথাটা সত্যিও হতে পারে। বামুন-কায়েতের ঘরের মেয়েরা কি আর বেরিয়ে যায় না, এমন তো আকছার।...তবে সম্পক্ক যাই হোক্—একবার যে নষ্ট হয়েছে—তার সঙ্গে আর সম্পক্কই বা কি, আর তার জাতই বা কি।...না বাপু, কাজটা ভাল করিস নি বামনী! যা হয় দু'মুঠো তো তোদের জুটছিল। মিছিমিছি নষ্ট মেয়েমানুষের অন্নদাস ক'রে দেওয়া—কথায় বলে অন্নপাপ মহাপাপ!'

'না না, মা—সে তো বামুনের রান্না ভাতই খায়। বামুনে রাঁধে যে!'

'ওলো তা জানি। পরকে যে বসিয়ে খাওয়াতে পারে—এত পয়সা—সে কি আর নিজে রান্না করবে? তা নয়। তাকে অন্নপাপ বলে না। পাপের অন্ন তো খাচ্ছে!…আগেকার দিন হলে তোদের একঘরে করত, কেউ কি আর তোদের দিয়ে পুজো-আচ্চা করাত? এখন সে সব আর নেই—সমাজও নেই, শাসনও নেই—তাই!'

কথাটা সেখানেই চাপা পড়ে যায়।

কিন্তু কথাটা কোন্‌দিকে যাচ্ছে বুঝে শ্যামার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। ঠিক এই আশঙ্কাই করেছিল সে। একে তো হেমের চাকরি নেই—তার ওপর যদি এই নিত্যসেবার বাঁধা বরাদ্দটুকু ঘুচে যায়, তা হলে তো শুকিয়ে মরতে হবে। এই যে এখন—মনে মনে সেই কথাটাই খচ্‌খচ্‌ করছে সেই থেকে—বাড়ি কেনা হলেও সেখানে গিয়ে হয়তো বাস করতে পারবে না, সে তো এই নিত্য সেবাটুকুর জন্যেই। এ ছাড়াও এখানে যা দু-চার ঘর যজমান আছে, সরকাররা ছাড়িয়ে দিয়েছে শুনলে তারাও হেমকে দিয়ে পুজো করাবে কি না সন্দেহ। এক কথায় দাঁড়িয়ে সর্বনাশ! নতুন বাড়িতে উঠে যাওয়া মানে নতুন গাঁ—নতুন পাড়া। যজমানি জুটবে কি না—জুটলেও কতদিনে জুটবে তার ঠিক কি? সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের ভরসায় নিশ্চিতকে ছাড়া—না, সে সম্ভব নয়। হেমের যদি একটা দশ-বারো টাকার চাকরিও জুটত তা হলেও সে একবার দেখত ভরসা ক'রে বেয়েছেয়ে। নতুন বাড়ির উনিশটা নারকেল গাছ আর কুড়িটা সুপুরি গাছ থেকে বাকিটা চলত।

সারারাত ঘুমোতে পারে না শ্যামা। এক দিনে জীবনের সুদুর্লভ আশা-পূরণের সম্ভাবনা মাত্র দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই অপর দিকে এ কী দুর্দৈব! একেবারে ভাত-ভিক্ষের টান।…বাড়ির আয়-পয়ও তো খুব দেখা যাচ্ছে! কেনবার প্রস্তাবেই এই, কিনলে না জানি কী হবে!…

পরের দিন ভোরবেলাই হেমকে দিয়ে খবর পাঠালো শ্যামা, জামাই যেন ছুটির পর যত রাতই হোক একবার আসেন। হেম পেঁছিতে পেঁছিতে অবশ্য অভয় বেরিয়ে গিয়েছিল, মহাশ্বেতার কাছে বলে এল সে।

মহাশ্বেতা চোখ দুটোকে যত দূর সম্ভব বিস্ফারিত করে, চুপিচুপি বলবার প্রাণপণ চেষ্টায় প্রায় সবাইকে শুনিয়েই ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে ভাইকে প্রশ্ন করলে, 'ব্যাওরাটা কি বল্‌ দিকি? তোদের জামাই ঘন ঘন শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, আবার রবিবার নাকি মাকে সঙ্গে নে কোথায় গেছল, অচলি ঠাকুরঝির দেওর রঘু পথে দেখতে পেয়েছে। কী হচ্ছে রে?'

ছেলেমানুষের মতো উৎসুক নেত্রে চেয়ে থাকে সে।

'ব্যাওরাটা তাকেই তো জিজ্ঞেস করলে পারিস।' একটু চুপ ক'রে থেকে সাবধানে জবাব দিলে হেম।

'তবেই-হয়েছে!' ঠোঁট উল্‌টে বলে মহা, 'সে যা মানুষ! মানুষ কি পাথর

সন্দ হয় মধ্যে মধ্যে। সাতবার হয়তো একটা কথা জিজ্ঞেস করলে তবে জবাব মেলে—তাও হাঁ হুঁ—একটা কথার জায়গায় দুটো কথা নয়।…জিজ্ঞেস তো করেছিলুম, বলে কি—জেনে কি হবে? তুমি তো কিছু কাজে আসবে না! যখন জানবার আপনিই জানতে পারবে।'

'ঠিকই বলেছে।' বলে হেম চলে এল।

মহাশ্বেতা খানিকটা গুম্ খেয়ে থেকে আপন মনেই বলে উঠল, 'মুয়ে আগুন! মুখপোড়ারা সব্বাই সমান!'

অভয়পদ কিন্তু রাত্রে এসে কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিলে।

শ্যামা সারাদিন ভাল ক'রে খেতে পর্যন্ত পারে নি উদ্বেগে।

জামাই এলে তাকে ঘরে বসিয়ে, তরুকে বাইরে পাহারায় রেখে খুবই চুপিচুপি বলেছিল কথাটা—আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে। কিন্তু অভয়পদ গায়েই মাখলে না যেন। বললে, 'এই কথা! এখনও তো কিছু বলে নি, এরই মধ্যে এত ভাবছেন কেন?'

'যদি বলে?'

'বলে তো ছেলেকে আনিয়ে নেবেন—প্রাচিত্তির করিয়ে নিলেই হবে। এখনও পৈতে হয় নি। অত ভয় কিসের! আর আমার মনে হয় কিছু বলতে সাহস করবে না।'

'সাহস! এতে আবার সাহসের কি আছে বাছা?'

প্রিয় কথাই যে বলতে চায় না—অপ্রিয় কথা বলতে তার দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক। তাই কিছুক্ষণ মৌন হয়ে থেকে অভয়পদ উত্তর দিলে—'সকলেরই কিছু না কিছু ঢাকবার থাকে মা! মিছিমিছি আপনার কাছে আর সেসব কেচ্ছা বলতে চাই না। তবে আমারও কিছু জানতে বাকি নেই। সরকাররা ওদিকে ঢিল মারতে এলে পাটকেল খেয়ে যাবে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

সে প্রশান্ত মুখেই উঠে দাঁড়ায় একেবারে।

'আপনার টাকাটা তা হলে দিয়ে দিন, কালই বায়নাটা করে ফেলি। এদিকে এসে আবার আঁদুল যাবার সুবিধে হবে না।'

'এই যে বাবা দিই।' শ্যামা জামাইয়ের অবিচলিত মুখের দিকে চেয়ে যেন ভরসা পায় খানিকটা।

টাকাগুলো গুনে দেখে নিয়ে পেটকাপড়ে বেঁধে বাড়ির দিকে রওনা হয় অভয়পদ। অফিস থেকে প্রায় ক্রোশখানেক হেঁটে বাড়ি ফিরেই মহার মুখে খবর পেয়ে এই ছাঁকা দু' ক্রোশ রাস্তা হেঁটে এখানে এসেছে। আবার সেই দু' ক্রোশ রাস্তা ভেঙে বাড়ি ফিরবে এখন। বাড়ি ফিরে জলখাবার খাওয়ার অভ্যাস ওর কোনকালে নেই—সকাল ক'রে একেবারে ভাত খেয়ে নেয়। আজ সে অবসর হয়নি। সব জেনেও ওকে একটু জল খেয়ে যাবার কথা বলতে মনে রইল না শ্যামার। রাত্রে শুতে গিয়ে হঠাৎ কথাটা মনে পড়ায় সেই অন্ধকারেই এতখানি জিভ কাটল সে।

তা বাড়ির পয় ভালই বলতে হবে। বাড়ি কেনার সঙ্গে সঙ্গেই আরও এক দিকে সুরাহা হয়ে যায়।…

বায়না থেকে শুরু ক'রে রেজেস্ট্রি পর্যন্ত নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে সব চুকে গেল। বায়নার পরই বাড়ি খালি ক'রে দিয়েছিল সহদেবরা—বিক্রির দিন আদালতে চাবি দিয়ে কাগজ-কলমে দখল দিয়ে দিলে। এরা কোর্টের ফেরত গিয়ে 'বাঁশগাড়ি' করে এল সকলে মিলে, অর্থাৎ সে তালা খুলে নিজেরা ঘরে-দরজায় তালা লাগিয়ে এল।

এত দিন পর্যন্ত কথাটা সকলের কাছেই চেপে রাখা হয়েছিল কিন্তু আর রাখা গেল না। কারণ 'দাঁড়া' হরির লুট মানা ছিল। সেই হরির লুটের বাতাসা দিতে গিয়েই কথাটা জানাতে হ'ল। ছেলের চাকরি হয় নি, সদ্য-বিধবা মেয়ে বুকের ওপর বসে—হরির লুট কিসের?

শ্যামা মঙ্গলার হাত দুটো ধরে বললে, 'মা', তোমার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই—যা হ'ল বলতে গেলে তোমার দয়াতেই হ'ল।‥একটা মাথাগোঁজার জায়গা ক'রে ফেললুম মা!'

'মাথা কি—কী বললি? ও—বাড়ি?' মঙ্গলার হাঁ-করা মুখ বুজতে বেশ একটু দেরিই হয়, 'বাড়ি কিনলি?…ও, তাই এত ঘন ঘন জামাইয়ের আসা-যাওয়া, গুজগুজ ফুসফুস? আমি ভাবি না জানি কী। তা ভালই তো। কিন্তু এর এত লুকোছাপার কী আছে?'

'না মা। লুকোছাপা নয়।' ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবেই বলে শ্যামা, 'এ তো আমার আশার অতীত, হবার কথাও নয়। তাই না আঁচালে বিশ্বাস করি কী ক'রে বল। নিহাত জামাই দয়া করলেন বলেই তাই, মোটা টাকাটা অভয়পদই ধার দিলেন তো!'

'বুঝেছি বুঝেছি।' অপ্রসন্ন মুখে উত্তর দেন মঙ্গলা, 'আমার কাছে অত শাক দিয়ে মাছ না ঢাকলেও চলবে। জামাই তোমার ভারি তালেবর রহমান কিনা। মোটা টাকা ধার দিলেন!…এ বাড়ির আনাজ ফল যে কোথায় যায় তা আমরা কি আর জানি না! কাজেই টাকা কোথা থেকে এল তা আমাকে বিস্তার ক'রে না বললেও চলবে।'

পিঁটকী কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলে, 'ধন্যি চাপা মেয়েমানুষ বটে তুমি বামুনদি! বাব্ বা, তোমার পেটে পেটে এত!…কেন, আগে বললে কি আমরা টাকাটা কেড়ে নিতুম—না ভাংচি দিতুম?'

এক রকম মাথা হেঁট ক'রেই নিজের ঘরে ফিরে আসে শ্যামা। অভয় এ ঘর থেকে সবই শুনেছিল, সুতরাং সে সব কথার পুনরুক্তি না ক'রে ম্লান একটু হেসে বললে, 'শুনলে তো বাবা।'

'ও তো একটু হবেই মা। এত কাল যে পায়ের নিচে ছিল সে মাথা তুলতে গেলে একটু প্রাণে লাগবে বৈ কি!…ও সবে কান দেবেন না!'

নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠেই উত্তর দেয় অভয়।
'তার মানে এই শত্রুপুরীতে বাস তো!'
'দেখা যাক!' বলে উঠে দাঁড়ায় অভয়।
'তা হলে কবে গৃহপ্রবেশ করবেন? সামনে চান-পূর্ণিমের দিনটা ভালশুনছি'।
'তাই যা হয় কর বাবা। সে তো আবার একগাদা টাকা খরচা। একটু সিন্নিও দিতে হবে, সিদ্ধেশ্বরীর পুজো মানত আছে—'
'সে এক রকম ক'রে যোগাড় হয়েই যাবে।' অভয় ছাতা বগলে ক'রে উঠে দাঁড়াল।
'কিন্তু বাবা একটা কথা—', কুণ্ঠিত ভাবে বলে শ্যামা।
না ফিরেই শুধু দাঁড়িয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে অভয়, 'কী বলুন!'
'বলছি যদি গৃহপ্রবেশ হয় তো—কান্তিকে তো আনাতে হবে, অন্তত দুটো দিনের জন্যে—আনন্দের দিনে বাছা আমার থাকবে না?'
'কেন থাকবে না—দু' দিন আগেই বরং আনিয়ে নেবেন। তবে আমার শেষ পর্যন্ত সময় হবে কিনা—বরং হেমকেই পাঠিয়ে দেবেন। গৃহপ্রবেশের কথাটা আর বলে দরকার নেই—পুজো-আচ্চার নাম ক'রে আনিয়ে নেবেন।'
দু পা এগিয়ে গিয়ে এবার অভয়পদ নিজে থেকেই থামে আবার।
'বরং—বরং হেম যদি যায় তো রতনকেও বলতে পারে একবার চাকরির কথাটা। ওর তো অনেক জানাশুনো—'
কথাটা ভাল ক'রে শেষ না করেই সে বেরিয়ে গেল।

হেম রতনদের বাড়ি খুঁজে খুঁজে গিয়ে যখন পৌঁছল তখন তার চোখ থেকে যেন বিস্ময় যেতে চায় না। ঐশ্বর্য যে সে দেখে নি তা নয়—এত কাল শহরে আনাগোনা করছে, ঐশ্বর্যের বাহ্য চেহারাটা ভাল ক'রেই দেখা আছে—কিন্তু এত কাছে থেকে আগে কখনও দেখে নি। এত প্রাচুর্য যে সত্যিই থাকতে পারে—এসব যে নিতান্ত গল্প-কথা নয়, তা চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস হওয়া শক্ত।
রতন বেশ সস্নেহেই গ্রহণ করলে ওকে। মোক্ষদাকে ডেকে জলখাবার দিতে বললে, রাত্রে খেয়ে যাবার অনুরোধ জানালে।
তার পর বললে, 'আপনিই তা হলে কান্তির দাদা? বড় ভাল ছেলে আপনার ভাইটি, সত্যিই বড় ভাল ছেলে। ও খুব উন্নতি করবে দেখবেন!···তা নিয়ে যান, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফেরত দিয়ে যাবেন, ওর ওপর যেন বড্ড মায়া পড়ে গেছে।'
একথা সেকথার পর প্রাণপণে সংকোচ কাটিয়ে চাকরির কথাটা পেড়ে ফেলে হেম। বহুদিন ধরে বেকার বসে আছে সে, কোথাও কিছু হচ্ছে না। পনেরো-কুড়ি টাকারও একটা চাকরি পেলে বেঁচে যায়। শেষে অভয়পদর কথাও বলে, 'তিনিই আরও বলে দিলেন—'
'আমাকে বলতে বলেছে অভয়দা, বাঃ বেশ তো! আমি কি বেটাছেলে, যে আমার হাতে চাকরির খোঁজ থাকবে?'
বলে বটে কিন্তু একটুখানি চুপ ক'রে ভুরু কুঁচকে বইয়ের আলমারিটার দিকে

[illegible] নিজেই বলে ওঠে, 'আচ্ছা থিয়েটারের চাকরী করবেন ? গেট-কীপারি ? দেখুন তা হলে—ওঁর বন্ধু রমণীমোহনবাবুর থিয়েটার আছে, বোধ হয় তাঁকে লিখে দিলে কাজ হবে।'

করবেন ! এ প্রশ্নও করে মানুষ ?

হেম সাগ্রহে বলে, 'আমি এখন যা পাব তাই করব। শুধু দয়া ক'রে একটু বলে দেন যদি—'

'বাড়িতে আপত্তি করবে না ? মা আছেন তো ! তিনি দেবেন এ চাকরি করতে ? বড্ড খারাপ জায়গা ওটা।

'কিছু বলবেন না মা। আমার ওপর সেটুকু ভরসা তাঁর আছে। আপনি দয়া ক'রে ব্যবস্থা ক'রে দিন একটা—'

'তা হলে বরং আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, এখনই একবার দেখা ক'রে আসুন। এই কাছেই তো—গোয়াবাগানে থাকেন তিনি। দারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে যান—বাড়ি চিনিয়ে দেবে।'

সে চিঠি লিখে খামে এঁটে ওর হাতে দিলে। খামেই ঠিকানা লেখা ছিল—তবু দারোয়ানকেও ডেকে সঙ্গে যেতে বলে দিলে রতন।

সৌভাগ্যক্রমে তখনও বাড়িতে ছিলেন রমণীমোহনবাবু, রতনের দারোয়ানকে দেখে বেশ প্রফুল্লমুখেই বললেন, 'কী ব্যাপার গো শিউনন্দন—কী হুকুম ওঁর ?'

'এই যে—বাবুর হাতে চিঠি আছে।'

চিঠিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ মালিকজনোচিত মুখ ক'রে ফেললেন বাবু। এমনিতেই প্রকাণ্ড রাশভারী চেহারা ভদ্রলোকের, তার ওপর মুখ গম্ভীর ক'রে থাকলে রীতিমত ভয়ই হয়। হেমের বুকটা দুর-দুর করে উঠল। ভয়ে ও আশাভঙ্গের আশঙ্কায়।

কিন্তু রমণীবাবু বার-দুই আপাদমস্তক ওকে দেখে নিয়ে বললেন, 'তুমি তো নিতান্তই ছেলেমানুষ দেখছি, আর নিরীহ। পারবে থিয়েটারে কাজ করতে ? ভারি বদ জায়গা !'

হেম আর কী উত্তর দেবে, মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে ঘামে শুধু।

রমণীবাবুই আবার বলেন, 'আর যে যায় লঙ্কায় সে-ই হয় রাবণ ! যত জানাশুনো লোকই রাখি, দু দিন পরে সব শালা চোর হয়ে দাঁড়ায়।···দ্যাখো বাপু, এক কথায় চাকরি দিচ্ছি, নিমকটা রেখো। নইলে এক কথায় তাড়াতেও আমার দেরি লাগবে না। কলকাতায় থাকবার জায়গা আছে তো ?'

'আছে—মাসীর বাড়ি।'

'বেশ,' তা হলে পয়লা তারিখ থেকে কাজে লেগে যাও। কুড়ি টাকা ক'রে মাইনে পাবে—আর হোল-নাইট শো হলে খাবার।···রাজী থাক তো মাসকাবারের দিন দেখা ক'রে জেনে যেও কটায় আসতে হবে !'

হেম মনের আনন্দে হেঁট হয়ে রমণীবাবুকে একটা প্রণামই ক'রে ফেললে। রমণীবাবুরা বিশুদ্ধ কনৌজী ব্রাহ্মণ, তা সে আগেই শুনেছিল রতনের মুখে।

একে থিয়েটার—কল্পলোকের সুখস্বর্গ, শুধুমাত্র ধনীলোকের প্রমোদ-বিলাসের অধিকার সেখানে—এই জানত, তার চাকরি। আনন্দে যেন বাতাসে ভাসতে ভাসতে চলে এল হেম। রতনকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে স্রেফ মনের আনন্দেই বিশেষ কিছু বলতে পারল না। মাকে সংবাদটা না দিতে পারা পর্যন্ত স্থির হতে পারছে না সে।

কিন্তু শ্যামা খবরটা শুনে খুব খুশী হতে পারল না। থিয়েটারের অনেক কাহিনী শুনেছে সে বাপের বাড়ি থেকে—বহু কেচ্ছা। জোয়ান ছেলেকে সেই সাতশো রাক্ষসীর খপ্পরে পাঠাতে মন চায় না তার, কিন্তু সব দিকে বিবেচনা ক'রে 'না' ও বলতে পারলে না। শুধু মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল।

হেমের এ খুঁতখুঁতুনি ভাল লাগে না। তার মন আনন্দে কল্পনাকাশে পাখা মেলেছে তখন! সে গলায় জোর দিয়ে বলে, 'বেশ তো, এখন কিছু দিন করি না—এধারেও তো পাঁচজনকে বলে রেখেছি, একটা কিছু পেলে এ কাজ ছাড়তে কতক্ষণ?'

অগত্যা। শ্যামা একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

মা সিদ্ধেশ্বরী যদি এইভাবে মুখ তুলে চান, হেমের ভাল একটা চাকরি হতেই বা কতক্ষণ?

আবারও বুক চিরে রক্ত দিয়ে পুজো দেবে না হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

শ্বশুরবাড়ির মধ্যে একদা প্রমীলাকেই সব চেয়ে পছন্দ ছিল মহাশ্বেতার। তেমনি এখন যেন আর সে দুটি চক্ষু পেড়ে' দেখতে পারে না ওর এই পাকা-গিন্নী 'জা'-টিকে। একদিন সহজেই তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং অভিভাবকত্ব মেনে নিয়েছিল—সেই মেনে নেওয়াটাই যেন ওর কাল হয়েছে। যে আসনে সে স্বেচ্ছায় নিজেই তাকে বসিয়েছে, এখন সেখান থেকে টেনে নামানো ওর সাধ্যাতীত। কেমন ক'রে কোথা দিয়ে যে সবাইকে ডিঙিয়ে প্রমীলাই সংসারের গৃহিণী হয়ে বসেছে—তা মহাশ্বেতা এতটুকু বুঝতে পারে নি। এখন সে দেখছে—প্রথম দিনটিতেও সে যেমন এ সংসারে পরমুখাপেক্ষী ছিল, আজ এত দিন পরেও—এতগুলি সন্তানের জননী হয়েও তেমনিই আছে। কোথাও ওর মর্যাদা কিছুমাত্র বাড়ে নি।

এর জন্য আত্মগ্লানির শেষ থাকে না আজকাল ওর। মনে মনে কেবলই আপসোস হয়—ও যদি গোড়া থেকে একটু শক্ত হ'ত! এতটা 'নাই' যদি না দিত ছোট জাকে!

বেচারী মহাশ্বেতা! ও জানে না যে এক-একজন এ পৃথিবীতে আসে সোজাসুজি বিধাতার কাছ থেকেই কর্তৃত্ব করবার পরোয়ানা নিয়ে। প্রমীলাও সেই বিধিদত্ত সহজাত পরোয়ানা নিয়ে এ সংসারে এসেছে, কর্তৃত্ব করবার সহজ অধিকার

তাই। মহাশ্বেতার কোন দিনই সাধ্য ছিল না প্রমীলার ওপর অভিভাবকত্ব করবার বা জ্যেষ্ঠত্ব ফলাবার।

এই সত্যটা জানে না বলেই তার এই আত্মগ্লানি। মনে হয় প্রমীলাকে সে-ই বুঝি এতটা অগ্রাধিকার দিয়েছে।

অবশ্য আত্মগ্লানি বা অনুশোচনা থাকলেই যে—যাকে কেন্দ্র ক'রে এই গ্লানি—তার ওপর বিদ্বেষ থাকবে না, এর কোন মানে নেই। বিদ্বেষ যথেষ্ট আছে মহাশ্বেতার—ওর এই জায়ের ওপর। আড়ালে সে ফাঁক পেলেই গালাগাল দেয়। বলে, 'শতেকখোয়ারী আমার সব্বনাশ করবে বলে এ ভিটেয় এসে সেঁধিয়েছে। আমার সাতজন্মের শত্তুর।···হারামজাদা মেয়েমানুষ! চোদ্দ পুরুষ বদ, ওদের ঝাড়েবংশ বজ্জাত!' ইত্যাদি—

আবার শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'মহারানী! উনি মহারানী, আমি চাকরানী। মহারাজ আর মহারানী! যে যা বরাত ক'রে এসেছে। ওরা এসেছে রাজত্ব করতে—ক'রে যাচ্ছে। আমি যা করতে এসেছি তাই করছি। ঘুঁটেকুড়ুনীর বেটী ঘুঁটেই কুড়িয়ে যাব জীবন-ভোর, আমার কি আর কোনদিন সুখ হবে!'

প্রমীলা শোনে আর হাসে। জানে মহাশ্বেতা ঢোঁড়া সাপ—একটু ফোঁস করবারও শক্তি নেই। ওর সঙ্গে ঝগড়া করাও শুধু শুধু নিঃশ্বাসের অপচয়।

আর ওর এই নিশ্চিন্ত উপেক্ষাই যেন আরও বেশী ক'রে জ্বালাতে থাকে মহাশ্বেতাকে।

কথাটা বড় মিথ্যাও বলে না ও। মহারাজ আর মহারানী।

অভয়পদও যদি একটু মানুষের মতো হ'ত (মহাশ্বেতার সেই বড় অনুযোগ)! সর্বস্ব রোজগার ক'রে এনে মেজভাইয়ের হাতে তুলে দেবার দরকারটা কি? তোমার ছেলেমেয়ে হয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎ আছে। ভাই যে চিরকাল দেখবে তার কি কিছু লেখাপড়া আছে? সবাই কিনা ওঁর মতো সত্যযুগের মানুষ!

'দেখব দেখব। রোজগার যদি কোন দিন তোমার বন্ধ হয় সেইদিন দেখে নেব। অত সহজে আমি মরছি না। ঐ ভাই যদি তখন মুখে নাতি না মারে তো আমি কী বলেছি। উনি কলির রামচন্দ্র-গিরি ফলাচ্ছেন! আগে দ্যাখ্—যার ওপর ফলাচ্ছিস সে লক্ষ্মণ কিনা!'

দাঁত কিড়মিড় ক'রে চাপা গলায় বলে মহাশ্বেতা, অভয়পদের সামনে বসেই বলে আজকাল। এটুকু সাহস তার হয়েছে।

কিন্তু বলেই বা লাভ কি? এর চেয়ে ঐ ইটের দেওয়ালটাকে বলাও ঢের ভাল। নিজের নিষ্ফল রোষ এবং অর্থহীন সেই রোষের অভিব্যক্তি ফিরে এসে শুধু নিজেকেই আঘাত করে। আরও ক্ষতবিক্ষত হয় সে অন্তরে অন্তরে।

এই যুদ্ধের বাজারে টাকা যে এরা কম রোজগার করে নি, তা মহাশ্বেতা এত দিনে বেশ বুঝেছে। প্রথমটা অত ধরতে পারে নি ঠিকই—কিন্তু প্রমীলা চোখ-কান খুলে দেবার পর বুঝতে আর কিছু বাকী নেই ওর। কিন্তু সে টাকা পর্যন্ত সব এনে ঐ ভাইয়ের পেটে পুরছে বোকা লোকটা! মোট-মোট টাকা! রাত জেগে

আড়ি পেতে মহাশ্বেতা দেখেছে অনেক কিছুই। নগদ কাঁচা টাকা ইটের মতো ক'রে সাজিয়ে মোটা রাংতা-কাগজে বেঁধে কাপড় দিয়ে সেলাই করেছে অম্বিকাপদ বসে বসে—তার পর ওর ঘরের দেওয়াল থেকে ইট খসিয়ে নিয়ে চুন-সুরকি দিয়ে সেই টাকার ইট গেঁথে রাতারাতি বালির কাজ ক'রে মায় চুনকাম পর্যন্ত ক'রে দিয়েছে নিজের হাতে। সে-ও সারারাত জেগেছে—মহাশ্বেতাও তাই। প্রমীলা অত ধার ধারত না, সে পড়ে পড়ে ঘুমোত। 'ঘুমোবে না কেন, ওর যে বুক-পোঁতা আছে! জানে ওর ঘরের দেওয়ালেই তো গাঁথা রইল।' আপন মনে গজ্ গজ্ করত মহাশ্বেতা।

শুধু কি টাকা! সোনার বাট কাকে বলে জানত না সে। এবার চোখে দেখলে। সে বাট তো তৈরী করিয়ে নিয়ে এল এই আহাম্মুকটাই। এনে ধরে দিলেন লক্ষ্মণ ভাইকে! উঃ! এর চেয়ে যদি সে একটা মুখ্খু মুটে-মজুরের ঘরে পড়ত—সেও ঢের ভাল ছিল। এ জগতে সবাই নিজের স্বার্থ বোঝে, কেবল বিধাতা কি বেছে বেছে তার জন্যেই নির্জনে বসে এই মানুষটি গড়েছেন!

অবশ্য হ্যাঁ—এর মধ্যে গয়না ওদের কিছু হয়েছে বটে। দু বৌয়ের সমান ওজনের এক প্যাটার্নের গয়না হয়েছে—যা হয়েছে সবই দু সেট ক'রে। কিন্তু এরচেয়ে ঢের কম সোনাও যদি অভয় নিজে হাতে ক'রে এনে দিত তো ঢের বেশী খুশী হ'ত মহাশ্বেতা। 'মুখপোড়া মিন্‌সের কি একটা এক কড়ার জিনিসও কোন দিন আনতে ইচ্ছে করে না!'...এই সোনার গয়না শুধু দেওরের হাত দিয়ে আসে বলেই বিষ মনে হয় ওর। পরলে যেন জ্বালা করতে থাকে সর্বাঙ্গ। মাঝে মাঝে পরে, আবার একটু পরেই হয়তো ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আপন মনেই বকে, 'কেন, কিসের জন্যে আমি পরের হাত-তোলায় থাকব? আমার বরই তো বেশী রোজগার করছে, টাকা তো আমার।...ও কলকাতার অফিসে বসে থাকে, এক পয়সা উপরি আছে ওখানে? তবে?...উনি হাত-তুলে দেন—যেন দয়া ক'রে দিচ্ছেন, ভিক্ষে দিচ্ছেন। কেন, কিসের জন্যে? আমার সমান গয়নাই বা ওর বৌ পরবে কেন? এটা হুঁশ থাকে না যে কার ভাতারের টাকা!'

পরাজয় এক দিক দিয়েই নয়—বহু দিক দিয়ে।

মাঝে মাঝে এ বাড়ি এসে মনের সব বিষ উজাড় করে সে মায়ের কাছে কিংবা মা'র অনুপস্থিতিতে পিঁটকীর কাছে। বলে, 'মেজ-বৌটা আসলে গুণ জানে, বুঝলে! ওর মা-মাগী তো ভীষণ জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ, আমি তাকে দেখেছি। নিশ্চয়ই গুণতুক করে মেয়ের হয়ে। নইলে সবাই ওর হাতের মুঠোয় যায়? যেমন আমি বোকা—তেমনি আমার মা। কিছুই করতে শিখলুম না কখনও। সেই জন্যেই আরও আমাকে কেউ গেরাহ্যি করে না। সবাই যেন ওর ভেড়ুয়া। আমার শাশুড়ী মাগী আমাকে কি কম জ্বালিয়েছে—কিন্তু কৈ এখন বলুক দিকি মেজ বৌকে কিছু! একখানা বললে দশখানা শুনিয়ে দেবে সে। চুপ ক'রে জুজু হয়ে বসে থাকে।'

আবার হয়তো খানিক থেমে কপালে করাঘাত ক'রে বলে, 'কী বলব, আমার ভাতারও যে তেমনি। ওর সুখের কপাল, ভাতার ওর কথায় ওঠে-বসে। আমার

একটা কথা কি এ মিনসে শোনে ! তা হলে আর ভাবনা ছিল কি ?'

তার পর আরও গলাটা নামিয়ে বলে, 'শিবপুরের দিকে শুনেছি কে এক জন গুণিন আছে, একটু খোঁজ করো না মা। খরচা যা লাগে আমি দেব। যদি একটু ওষুধ-বিষুধ দিতে পারে—'

শিউরে উঠে শ্যামা উত্তর দেয়, 'না মা, খবরদার ওসব করতে যেও না। ঐ চট্‌খণ্ডীদের একটা বৌ নিবড়ের ত্রিগুণা বুড়ীর কাছ থেকে কী ওষুধ এনে বরকে খাইয়েছিল—তার বর তাকে নিত না, কে এক দূর সম্পর্কের মাসীকে নিয়ে পড়ে থাকত, লোক দেখিয়ে ছোঁড়া তাকে বলত মাসীমা অথচ—। যাক তা সে ওষুধ তো খাওয়ালে, ফলও হ'ল—সে মাগীকে ছেড়ে দিলে একদম। কিন্তু তার পরই কি হ'ল, গুম খেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন পাগল হয়ে গেল, একেবারে উন্মাদ পাগল।'

শিউরে ওঠে মহাশ্বেতাও—কথাটা শুনে। শ্যামা সেটা লক্ষ্য ক'রে সমর্থন-সূচক ঘাড় নেড়ে বলে, 'তাই তো বলছি, ওসবে যাস্ নি। কী থেকে কি হয় তা কি বলা যায় ! তোর কপালে থাকে—হক্কের ধন হয়—একদিন পাবিই !'

'ছাই পাব !' মুখটা ভার ক'রে উত্তর দেয় মহাশ্বেতা—'পাব একেবারে কাঠে-খড়ে উঠলে, তার আগে নয়।'

কিন্তু গুণতুকের দিকে যেতে আর সাহসে কুলোয় না ঠিকই।

আরও অসহ্য হয়েছে ওর দুর্গাপদর ব্যাপারটা। ওরও ঐ শ্রীচরণে আত্মসমর্পণটা। ইদানীং সেও, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে, যেন প্রমীলার একান্ত অনুগত হয়ে উঠেছে ক্রমশ। এইতে আরও অবাক লাগে ওর।

'মুয়ে আগুন। সব শেয়ালের এক রা ! সব কটা ভাই ঐ এক ক্ষুরে মাথা মুড়িয়ে বসে আছে গা ! জোয়ান হয়েছিস, ডবকা হয়েছিস—তাই বে-থা কর ! নয় তো এদিক ওদিক চন্‌মন্ ক'রে বেড়া, তা নয় বয়সে-বড় দিদির-বয়সী বৌদির আঁচলে আঁচলে ঘুরছেন। এ আবার কি ! আমার হয়েছে জ্বালার ওপরে জ্বালা। এ যেন গোদের ওপর বেজি !...আচ্ছা, কী দ্যাখে ওর মধ্যে এরা বলতে পারিস ? কী আছে ওর ? গায়ের রং আমার চেয়ে অন্তত তিনপুরু ময়লা। মুখচোখ-গড়ন-পেটনও এমন কিছু ভাল নয়। ঐ তো মন্দাটে মন্দাটে চওড়া চওড়া গড়ন, আর মন্দাটে ভাব, এই গাছে উঠছে, এই জলে ঝাঁপাই ঝুড়ছে—আর যখন তখন হি-হি হাসি। তাইতেই সবাই যেন মজে আছে।...যেমন ভাতার, তেমনি ছোট দেওর।... আমার এক এক সময় সন্দ হয় কী জানিস খেঁদি, তোর দাদাবাবুও ঐতেই মজেছে। ওকেও নিশ্চয় গুণতুক করেছে ছুঁড়ি। নিহাত ভাসুর-ভাদ্দরবৌ সম্পর্ক, তাই হাতে হাতে যথাসব্বস্ব ওকে তুলে দিতে পারে না, ওর ভাতারের হাতে দেয়। ও আমাদের সকলের সব্বনাশ করবে বুঝলি, সংপুরী একগাড় করবে একেবারে। ও আস্ত রাক্কুসী, হাড়মাস চিবিয়ে খেতে এসেছে সকলকার !'

ঐন্দ্রিলা হয়তো হেসে জবাব দেয়, 'তোমার তো খুব বুদ্ধি দিদি, দেওর-ভাজে

যদি না সম্পর্কে আটকায়, ভাসুর-ভাদ্দরবৌতে কি সেই জন্যেই আটকে আছে? বলি ভাসুর-ভাদ্দরবৌতে কেলেঙ্কার কি কখনও শোন নি কোথাও?'

কিছু-পূর্বের কথাও ভুলে গিয়ে অমনি সগর্বে জবাব দেয় মহাশ্বেতা, 'তেমন বান্দা তোর দাদাবাবু নয়, বুঝলি। কখনও কোন মেয়েছেলের দিকে চেয়ে দেখে না। ওদিকে ওর খেয়ালই নেই। বলে, যে কখনও এক দিনের তরে ভাল খেলে না, ভাল পরলে না, বিছানায় শুল না—সে করবে মেয়েছেলে নিয়ে কেলেঙ্কার! তা করলে তো বুঝতুম। যেন আমার কপালেই কোথায় এই গেরস্ত সন্নিসী তৈরী হয়ে বসে ছিল। সন্নিসীরও মন টলে—এর তাও টলবে না, বুঝলি! শিবের ও কলঙ্ক হতে পারে—এর হবে না কোন দিন!'

'তবে আর মজেছে বলছিস কেন?' হাসে ঐন্দ্রিলা।

'কে জানে!' মুখটা বিকৃত ক'রে কাঁধটা হেলিয়ে উলটো জবাব দেয় মহাশ্বেতা, 'তবে আর গুণতুকের কথা বলেছে কেন! ওষুধ-বিষুধ মন্তর-তন্তরে কী না হয়—বল্!'

সত্যিই দুর্গাপদর আচরণটা দিন দিন দৃষ্টিকটু হয়ে উঠছে। দিনরাতই দেওর-ভাজে গুজগুজ, ফষ্টিনষ্টি। চাপা হাসি, চোখে চোখে কৌতুক। অন্ধকার বাইরের বাগানে বাঁশবনে ঘোরাফেরা। দুর্গাপদর ইদানীং চাকরি হয়েছে, অভয়পদই বলে-কয়ে রেল অফিসে একটা কাজ যোগাড় করে দিয়েছে—সেই জন্যেই দিনরাত থাকতে পারে মা বাড়িতে—কিন্তু চাকরির সময়টুকু ছাড়া আর এক দণ্ডও দুর্গাপদ বাড়ির বাইরে কাটায় না। ওর বন্ধুবান্ধব আড্ডা সব গেছে, এখন দিনরাতই বাড়িতে থাকে, মায় ছুটির দিনও। ছোট ননদের বিয়ের পর ওরা বাড়ির পাট পালা ক'রে নিয়েছে। একজন ছড়া-ঝাঁট দেয়, গোয়াল কাড়ে—আর একজন বাসন মাজে, রান্নার যোগাড় করে। প্রমীলার যেদিন ছড়া-ঝাঁটের পালা পড়ে, সেদিন ভোর থেকে দুর্গাপদ ওর পেছনে পেছনে ঘোরে, গোবরছড়ার হাঁড়ি এগিয়ে দেয়, নয়তো ঝাঁটাটা খুঁজে আনে, গোয়ালে গিয়ে গরু বাছুর বার ক'রে বেঁধে দেয়। আবার যেদিন ওর বাসন মাজার পালা, সেদিন একটা দাঁতন মুখে দিয়ে গিয়ে পুকুরের পাড়ে বসে, অথবা তালগুঁড়ির পইটেতে এক ধাপ উঁচুতে বসে প্রমীলার আঁচলটা নিয়ে খেলা করে—ওর অজ্ঞাতে আঁচলে ঢিল বেঁধে দেয়, অথবা চুলে কাঁটাফল আটকে দেয়। অজ্ঞাত কিন্তু থাকে না কোন দিনই, গোড়া থেকেই অবহিত থাকে প্রমীলা, কাজেই ঠিক ঘটনাটির মুখেই হাতে-নাতে ধরে কৃত্রিম তর্জন করে, দুজনেই হেসে খুন হয়।

এ সবই দেখে মহাশ্বেতা, আর জ্বলে জ্বলে মরে।

'বুড়ীও কি দেখতে পায় না এসব!' শাশুড়ীর উদ্দেশে বলে সে, 'না কি ছোট ছেলের দোষ দেখতে গেলেই দুটি চোখ কানা হয়ে যায় কানীর!…এমন ঢলাঢলিও চোখে পড়ে না, আশ্চর্য!'

পাড়াতে কানা-ঘুষো হয় বৈকি।

আশপাশেই জ্ঞাতিদের বাড়ি, সেখানেও গুঞ্জন ওঠে। কিন্তু এরা নির্বিকার।

যেমন মা তেমনি ছেলেরা।

সব চেয়ে বিস্মিত হয় মহাশ্বেতা অম্বিকাপদর আচরণে।

ওর দাদা না হয় চিরদিনই নির্বিকার, উদাসীন, পাথরের ঠাকুর। তা ছাড়া তার প্রত্যক্ষ ক্ষতির কোন ব্যাপার নয়, অন্তত তার নিজের গায়ে তত জ্বালা ধরাবার মতো ঘটনা নয়—কিন্তু ও চুপ ক'রে থাকে কী ক'রে? তবে কি ওরা ভাইয়ে ভাইয়ে সবাই পাথর?

মায়ের কাছেই মনের কথাটা বলতে পারে খুলে, 'তুমি যে বল মা! ঘেন্নায় ঘেন্নায় আমি পাথর হয়ে গেলুম, কিন্তু ওদের ঘেন্নাপিত্তি হায়া কি কিছু নেই? গণ্ডারের চামড়া, এ কি কোন পুরুষে সহ্য করতে পারে? অন্য বাড়ি হলে এত দিনে খুনোখুনি হয়ে যেত!'

শ্যামা বলে, 'ওলো খুনোখুনি ওদেরও হ'ত, যদি না দুগ্‌গো মাস মাস মাইনের সমস্ত টাকাটি এনে ধরে দিত ঐ মেজ ভায়ের হাতে। ও কি অমনি সহ্য করে? টাকাতে সব সয়ে যায় মা—সব সয়! কত লোকে টাকার জন্যে ঘরের মাগ পরের বাড়ি পেঁছে দিয়ে আসে, তা জানিস না!'

মহাশ্বেতার কথাটা তত পছন্দ হয় না। টাকার এতটা মূল্য নিজের জীবন দিয়ে সে অনুভব করতে পারে নি এখনও। তাই খানিক চুপ ক'রে থেকে ঘাড় নেড়ে বলে, 'উঁহু, তুমি যাই বল বাপু, ওর মা-মাগী অনেক কিছু জানে, আসলে গুণ করেছে সবাইকে। ঐ যে কী সুপুরি খাওয়ায় না কি, তাই খাইয়েছে নিশ্চয়! শাশুড়ী, ভাসুর, মায় ভাতার সুদ্ধ এত বড় অসৈরন চোখ বুজে সহ্য করে—এ অমনি হয় না মা! আমি তোমাকে বলে দিলুম, একদিন এ কথাটা বাজারে বের হবেই, দেখে নিও। ঐ মা-মাগীর কাজ এসব। সব গুণতুক্!…কী বলব তুমি ভয় দেখিয়ে দিলে, নইলে আমিও একটা গুণিনেব কাছে যেতুম। একটা ভাল গণ-ক্কারের সন্ধান পেলে আমি চার পাঁচ টাকাও খরচ করতে রাজী আছি।'

শ্যামার 'টাকা' সম্বন্ধে সদা-জাগ্রত কান খাড়া হয়ে ওঠে, 'জামাই তো তোকে কিছুই দেয় না বলিস, তবে টাকা পাস কোথা থেকে?'

'আমি যে আজকাল সরাই ওর পকেট থেকে। এসে হাত-মুখ ধুয়ে গিয়ে তবে তো বসে দু ভাই। সে যা বাহার! ওধারে ওরা হয়তো রান্নাঘরে, নয় তো পালা না থাকলে, বাইরের দাওয়ায় মুখোমুখি—এধারে এ'রা মেজকর্তার ঘরে দোর দিয়ে মুখোমুখি। দু দলই গুজগুজ ফুসফুস!… তা সেই মুখ-হাত ধোবার ফাঁকেই আমি যা পাই হাতিয়ে নিই। দ্যায়ও মধ্যে মধ্যে দু-একটা টাকা, আজকাল আমি মুখ ধরেছি তো, চেঁচামেচি করি, তাই হাত-খরচ বলে দু-এক টাকা ঠেকায়। বাকী হাত-সাফাই! তবে টের পায় ও, ওর গোনাগোনতি হিসেবের টাকা, এক পয়সা ইদিক-উদিক হবার উপায় নেই বাবা—বলে, ঢোলা ঢোলা লাউয়ের পাতা, তোমার ভেয়ের, গোনা গাঁথা। টের পায়, তবে কী ভাগ্যি কিছু বলে না। আগে আগে বোধ হয় ওঘরে গিয়ে অপ্রস্তুত হ'ত—এদান্তে তাই পকেট থেকে বার ক'রে আগে গুনে নিয়ে যায়। পেথম পেথম বুক ঢিব্ ঢিব্ করত, সরে যেতুম সামনে থেকে।

এখন সোজা দাঁড়িয়ে থাকি। বলি অত ভয় কিসের? এ তো আমারই হকের টাকা। তা কম দেখলে একবার চেয়ে দ্যাখে শুধু, একটু মুচকি হাসে, কিছু বলে না। ·তবে কি আর বেশী নিতে ভরসা হয়—সিকিটা আধুলিটা দু'আনিটা! টাকা—সে দেবে সেবে।'

শ্যামা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সাগ্রহে প্রশ্ন করে, 'তা কত জমালি?'

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যায় যেন মহাশ্বেতা, উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে বলে, 'কত আর! ছাই জমিয়েছি। ব্যাঙের আধুলি!'

শ্যামা অপ্রসন্ন মুখে বলে, 'থাক। বলতে হবে না। তবু যে বুদ্ধি হয়েছে, নিজেরটা বুঝতে শিখেছিস—এইতেই আমার সুখ। আমি কি আর তোর টাকা নিতে যাচ্ছি—না চাইছি!'

অপ্রস্তুত হয়ে চুপ ক'রে যায় মহাশ্বেতা, তবু যে সংবাদটা শোনবার জন্য শ্যামা সাগ্রহে ভেতরে ভেতরে ছট্‌ফট করে—সে সংবাদটা কিছুতেই সে দেয় না। সংসারের শিক্ষাই এমন যে কিছুদিন সেখানে পাঠ নেবার পর অতি বড় নির্বোধও খানিকটা সতর্ক হয়ে যায়, স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। ঘা খেয়ে খেয়ে আত্মরক্ষার প্রাথমিক পদ্ধতিগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

॥ ২ ॥

কথাটা অবশেষে একদিন মহাশ্বেতাই পাড়ে শাশুড়ীর কাছে। ঠাকুরঘরের বন্ধ দরজার সামনে অন্ধকার দালানে পা ছড়িয়ে বসে নিঃশব্দে মাতগুড় আর নারকোলকোরা দিয়ে মাখা চালভাজার গুঁড়ো খাচ্ছিলেন ক্ষীরোদা—মহাশ্বেতা এসে কাছে বসল। সংসারের কাজ সারা হয়ে গেছে, মায় কাল ভোরের জন্যে উনুনে কলা-বাসনা, সুপুরির বেলদো পর্যন্ত সাজানো, চাল ধোয়া—সব তৈরী ক'রে রেখে রান্নাঘরে চাবি দিয়ে এসেছে। রাত এগারোটা বেজেও গেছে কখন কুণ্ডুদের ঘড়িতে। রোজই এমনি হয় ওর। যেদিন মেজবৌর পালা থাকে সেদিন দুর্গাপদ অর্ধেক কাজ ক'রে দেয়—ওর তো আর সে সহায় নেই। তবু ভাগ্যি মেয়েটা এখনও পর্যন্ত ওঠে নি। সন্ধ্যে হতে না হতে ঘুমোবে মুখপোড়া মেয়ে আর রাত ঠিক যেই এগারোটা বাজবে অমনি উঠে চিল-চেঁচাতে শুরু করবে। ···তার পর তাকে খাইয়ে ঘুম পাড়াতে যার নাম একটি ঘণ্টা। আজ এই একটা মহা সুযোগ মিলেছে। আজ কর্তারাও সব ঘুমিয়ে পড়েছে, মেজবৌ আর দুর্গাপদ উঠেছে ছাদে—আজকাল সিঁড়ি হয়ে এ একটা সুখ বেড়েছে ওদের—এখন আর সহজে নামছে না।

'কী মা?' প্রশ্ন করেন ক্ষীরোদা। একটু বিস্মিতই হন। বড় বৌ ছেলেপুলের মা গিন্নী হবার পর থেকে এ সৌভাগ্য তাঁর বড় একটা হয় না।

'না, এমনিই। খুকীটা আজ ওঠে নি এখনও, তাই বলি যে মা খাচ্ছেন—একটু কাছে গিয়ে বসি। একলা বসে খান—তা একটু আলোয় বসলেও তো হয়!

'কী আর হবে আলো মা—কাঁটা-খোঁচা তো নেই। বুড়োমাগী রাত্দুপুরে

খাচ্ছি, এ আর এমন দেখাবার মতো কী ঘটনা বল ? খাবে নাকি মা একটু ?'

'না মা, আপনি খান। দুপুরের ছিষ্টি পান্তা পড়েছিল—এক পেট খেয়ে এসেছি—এখন ঐ গুড়মাখা জিনিস খেলেই অম্বলে বুক জ্বলে উঠবে।'

এও এক অপ্রসন্নতার কারণ শাশুড়ীর সম্বন্ধে। প্রতিদিনই জোর ক'রে চাল বেশী নেওয়াবেন। বলবেন, 'গেরস্তবাড়ি থেকে খাবার সময় অতিথ-ভিখিরী ফিরে গেলে বড় অকল্যেণ মা, বড় লজ্জারও কথা। ভগবানের ইচ্ছেয় শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তোমাদের তো তেমন অভাবও নেই আর—থাক না দুটো ভাত বেশী। ফেলা তো যাবে না। জল দিয়ে রাখলেই চলবে।'

'হ্যাঁ তা তো চলবেই।' মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করে মহাশ্বেতা। সে ভাত খেতে হবে ওকেই। অতিথ-ভিখিরী আসে কদাচিৎ কোন দিন—তাও ওদের খাওয়া হয়ে গেলে আর দেওয়া চলবে না, সে নাকি দিতে নেই। ফলে রোজই সেই পান্তা তুলতে হয় ওকে। মেজবৌ সাফ বলে দিয়েছে, 'ও আমার পোষাবে না। আর তুমিই বা খেয়ে মরতে যাও কি জন্যে ? পুকুরে ঢেলে দাও গে না চুপিচুপি! যেমন-কে-তেমনি !'

সেইটেই পারে না মহাশ্বেতা—জন্মাবধি দীর্ঘকাল অভাবের সংসারে কাটিয়েছে সে, একমুঠো ভাতের মূল্য সে হাড়ে হাড়ে বোঝে। জানে যদিও যে, এক পয়সা বাঁচালে তার ঘরে উঠবে না কানাকড়াও, তবু পারে না।

শাশুড়ী এ খোঁচাটা নীরবে হজম করলেন, অথবা খোঁচাটাই টের পেলেন না। শুধু বললেন, 'অ। তা শুনেছি মা মুড়ি কি চালভাজার সঙ্গে গুড় খেলে নাকি অম্বল হয় না।'

'না মা। আমার হয়। ও আপনি খান। তা ছাড়া পেটে আমার জায়গাও নেই।'

তার পর মুহূর্তখানেক চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ বলে বসে, 'হ্যাঁ মা, তা ছোট ঠাকুরপোর বিয়ে দেবেন না ?'

ক্ষীরোদা কেমন যেন থতমত খেয়ে যান, 'তা কী জানি, কৈ অম্বিকাপদ তো কিছু বলছে না !'

'দেবেন আপনি ছেলের বে, তা মেজকর্তা কি বলবে শুনি ? ছেলে আপনার না মেজকর্তার ?'

'না—তা নয়।' আরও যেন থতমত খান ক্ষীরোদা, কেমন একটু অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলেন, 'তা দিতে হবে বৈকি।...দেখি না হয় একবার মেজবৌকে বলে।'

'হাড় জ্বালা করে মা আপনার কথা শুনলে !' অনেক দিনের নিরুদ্ধ রাগ আর চাপতে পারে না মহাশ্বেতা, দাঁতে দাঁত চেপে অনুচ্চকণ্ঠে বলে, 'বলি গিন্নী কে এ বাড়ির, আপনি না মেজবৌ ? আপনি বেঁচে থাকতে ও কিসের গিন্নী শুনি ? সব তাইতে মেজকর্তাকে আর মেজবৌকে টানেন কেন ? বেশ তো, আপনি না পারেন আমাকে বলবেন—আমি তো হাজার হোক এ বাড়ির বড় বৌ !'

'বেশতো, তা দাও না বাপু। আমার কি আর অসাধ ছোট ছেলের বৌ

দেখা! তা ওরাই সব করে তো—তাই বলি। তা দাও না তুমিই। না হয় ওদেরই বল না একবার, ওরা আবার না কিছু ভাবে!'

সভয়ে সসংকোচে যেন কথাগুলো বলেন ক্ষীরোদা।

'বলবই তো! জোরের সহিত বলব। অত ভয় কিসের?'

এই বলে দুম্ দুম্ ক'রে পা ফেলে উঠে যায় মহাশ্বেতা।

শাশুড়ী এখনও একা বসেই খাচ্ছেন এবং খুকীও ওঠে নি—এ কথাটাও যেমন মনে থাকে না তার, তেমনি মেজবৌ ও মেজকর্তাকেই শেষ পর্যন্ত বলতে যে ও রাজী হয়ে গেল সেটাও মাথাতে যায় না।

পরের দিন খেতে বসে বলতে গেলে দুম্ ক'রেই কথাটা পাড়লে মহাশ্বেতা, 'একটা ভাল মেয়ে-টেয়ে খোঁজ কর্ মেজবৌ, ছোট্ ঠাকুরপোর বিয়ে দেব।'

প্রমীলা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তার পর বলে, 'ছোট কর্তার (মহাশ্বেতার থেকে 'কর্তা' কথাটাই এ বাড়িতে চালু হয়ে গেছে) বিয়ে দেবে? তুমি?'

ওর সেই দৃষ্টিতে বিস্ময়ের সঙ্গে ঈষৎ প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল কিনা, তা মহাশ্বেতার নজরে পড়ে না—শুধু অকারণ জোর দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ—তা তোরা যখন কিছু উয্যুগ-সঞ্জুগ করছিস না—তখন আমাকেই দিতে হবে বৈকি!···আর ভাল দেখাচ্ছে না।···তাছাড়া সোমত্থ হয়েছে, যা হোক দু পয়সা রোজগারপাতিও করছে, দেব না-ই বা কেন বল্!'

'তা তো বটেই। দেওয়াই উচিত।' এই বলে মুখ টিপে হেসে বাটিচচ্চড়ির লঙকাটা অকারণেই থালার ওপর টিপতে থাকে প্রমীলা। কেন যে আর ভাল দেখাচ্ছে না···সে কথাটাই শুধু জিজ্ঞাসা করতে পারে না কিছুতে।

সেদিন প্রমীলার রান্নার পালা। দুর্গাপদ অফিস থেকে এসে জামা-কাপড় ছেড়ে সবে রান্নাঘরে ঢুকেছে, প্রমীলা বড় জায়ের মতই দুম্ ক'রে বলে উঠল 'শুনছ, বড়গিন্নী তোমার বিয়ে দিচ্ছেন যে!'

আসলে কথাটা আর চাপতে পারছিল না প্রমীলা।

দুর্গাপদ কিছুমাত্র ব্যস্ত হ'ল না। এদিক ওদিক চেয়ে সন্তর্পণে ট্র্যাক থেকে একটা ছোট্ট পুরিয়া বার ক'রে বললে, 'শুনব' খন—এখন চুপিচুপি একটু চা তৈরী কর দিকি!···সেদিনের চিনি একটু আছে না? নইলে বড়গিন্নীর মেয়ের মিছরি থেকে একটু হাতসাফাই কর।'

এখনও এ অঞ্চলে চায়ের তত রেওয়াজ হয় নি। কলকাতায় চলছে বটে খুব—কিন্তু বড় মেজ দুই কর্তাই হাড়ে-চটা ও অভ্যাসের ওপর, তা দুর্গাপদ জানে। মেজকর্তার রাগটাই বেশি, সে প্রায়ই বলে, 'যাদের লক্ষ্মীছাড়ার দশা, তাদেরই ঐসব বদ্-অভ্যেস দ্যাখ'গে যাও! কলকাতার বাবুদের সব ফোতো নবাবি। এধারে অবস্থা তো জানতে বাকি নেই আমার! দেনার দায়ে মাথার চুল বিকিয়ে আছে—নবাবিটুকু চাই ষোল আনার ওপরে আঠারো আনা! সায়েবরা খায়! আরে তোরা আর সায়েবরা সমান হলি? তাদের রোজগার আর তোদের

রোজগার ? তারা পায় তিন হাজার টাকা মাইনে, তোরা পাস তিরিশ টাকা। তাদের যা সাজে তা কি তোদের মানায় ?'

হয়তো ছোট ভাইয়ের 'ফোতো নবাবি'র দিকে এক-আধটু টানের আভাস পেয়েই কথাগুলো বলে অম্বিকাপদ, কে জানে !

তাই লুকিয়ে-চুরিয়েই চালাতে হয়। যেদিন প্রমীলার পালা না থাকে, সেদিন সুবিধা হয় না। মেজ বৌকেও ধরিয়েছে সে জোর ক'রে। মেজ-বৌ অবশ্য রোজই আপত্তি করে। বলে, 'নেশা কি এক দিন অন্তর করলে চলে ! তার চেয়ে আমার পানদোক্তাই ভাল। কেউ বলবার নেই !'

দুর্গাপদও ছাড়ে না। বলে, 'না বাপু, চা আবার একা একা খেয়ে সুখ হয় না।···একটু খাও, নইলে মৌতাত জমবে না !···রোস না—একটু সইয়ে নিই ব্যাপারটা, তার পর ডোন্‌টো কেয়ার—সামনেই খাব !'

আজ কিন্তু প্রমীলার কাছে এ সব ব্যাপার তুচ্ছ হয়ে গেছে। সে জল চড়াবার কিছুমাত্র আয়োজন না ক'রে, ছোটকর্তার মুখের দিকে বঙ্কিম কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে বলে, 'ঠাট্টা নয়—সত্যি বলছি। বড়গিন্নী বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছে !'

'ব্যস্ত হওয়াচ্ছি !···বড়গিন্নীর কি, আমি বিয়ে করি না-করি ? বলে এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে ভিন্‌ গাঁয়ে মাথাব্যথা !···আমার জন্যে এত দরদ উথলে উঠল কেন হঠাৎ !'

'এর আর দরদ উথলে ওঠা-উঠির কি আছে !' একটা ছোট বাটি ক'রে কাঠের উনুনের আঙরার ওপর জল চড়াতে চড়াতে বলে প্রমীলা, 'সত্যিই তো, বিয়ের কি আর বয়স হয় নি তোমার ? সে বড়, তার একটা কর্তব্য আছে তো ? আর তার কথাই বা বলি কেন—আমারও তো কর্তব্য ! এখন কি রকম মেয়ে পছন্দ তাই বল ?'

'নাও নাও—সারাদিন পরে বাড়ি এলুম, এখন ওসব বেয়াড়া ঠাট্টা ভাল লাগছে না।···দুটো অন্য কথা বল।'

'ঠাট্টা কিসের ?' প্রমীলা যেন অকস্মাৎ জ্বলে উঠল, 'ঠাট্টাটা কিসের দেখলে ? আমরা তোমার গার্জেন নই ? বিয়ের কথায় আবার ঠাট্টা এল কোথায় ? আমরা বলছি, বিয়ে করবে।'

'ওসব হবে-টবে না। বিয়ে আমি করতে পারব না। এই সাফ বলে দিলুম। বেশী ঘাঁটিয়ো না আমাকে। শেষ অবধি একটা কেলেঙ্কার করব !'

'কেন ? কেন করতে পারবে না শুনি ?'

'পারব না, ব্যস্‌। তার আবার অত কৈফিয়েত কি ?'

তার পর কতকটা যেন অর্ধ-স্বগতোক্তি করে—'ন্যাকা !'

'দ্যাখো—এই আমিও সাফ্‌ বলে দিলুম···ওসব ঢ্যাটাগিরি ছাড়। বিয়ে তোমকে করতেই হবে। আর ভাল দেখাচ্ছে না। বয়স হয়েছে—রোজগারপাতি করছ, এখনও বিয়ে না দিলে পাঁচজনে পাঁচকথা কইবে।'

'তা বলুক। পাঁচজনের কি ধার ধারি আমি !'

জল ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলে না। এখনই হয়তো কে এসে পড়বে।
তাই সামান্য বুজকুড়ি কাটতেই কাগজের মোড়ক থেকে চা পাতাটুকু ঢেলে দিয়ে একটা রেকাব চাপা দেয় প্রমীলা, তার পর বলে, 'তুমি না ধারো, আমরা তো ধারি! আমরা মুখ দেখাব কি ক'রে? ··বেশ, বিয়ে না করতে চাও করো না—তবে এও বলে দিচ্ছি, আমাদের সঙ্গে আর তা হলে কোন সম্পর্ক থাকবে না, আমি অন্তত আর কথা কইব না তোমার সঙ্গে। এইখানেই ইতি!'

দুর্গাপদ এবার রীতিমত হকচকিয়ে যায় যেন। অবাক হয়ে কিছুক্ষণ প্রমীলার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'ঐ নাও! যার জন্যে চুরি করি সে-ই বলে চোর।'

মেজবৌ কাঁসার গেলাসে দুধ চিনি ঢালতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘুরে বসল এদিকে। দুই চোখে তার আগুন। বললে, 'তার মানে? তার মানে তুমি আমার জন্যে বিয়ে করতে চাইছ না?···তার মানে কি? লোকে এ কথা শুনলে কি বলবে?··· কী বলতে চাইছ স্পষ্ট ক'রে খুলে বল দিকি!'

আর কিছুক্ষণ সেই প্রজ্বলন্ত মুখের দিকে নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকবার পর দুই হাত জোড় ক'রে দর্গাপদ বললে, 'আমার ঘাট হয়েছে। তোমরা যা খুশি তাই কর। আমি আর কিছু বলব না।'

'ঘাটই তো। একশো বার ঘাট হয়েছে।'

প্রমীলা চা ছেঁকে প্রায় ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গীতে গেলাসটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে জোরে জোরে উনুনে ফুঁ পাড়তে থাকে। শুকনো কলার বাস্‌না ঠেলে দেয় তারই ফাঁকে—দেখতে দেখতে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে ওঠে উনুনটা।

দুর্গাপদ আর সাহস করে কিছু বলতে পারে না। শুধু একবার উঁকি মেরে দেখে নেয় যে বাটির তলায় একটু চা অবশিষ্ট আছে। প্রমীলা নিজেই রেখেছে।

আশ্বস্ত হয় কতকটা। ভাগ্যিস্‌ নিজেই রেখেছে তাই, নইলে অন্যদিনের মতো পীড়াপীড়ি করতে সাহসে কুলোত না ওর।

॥ ৩ ॥

বিয়ের কথাটা আগেই তুলুক, আর ওর নিজের ভাষায় 'জোরের সহিত'ই তুলুক—শুধু ওঠার অপেক্ষা, তার পরই মহাশ্বেতা তার যথাস্থানে অর্থাৎ পিছনে পড়ে গেল। প্রমীলাই সহজে এবং অনায়াসে কর্ত্রী হয়ে বসল এ ব্যাপারেও।

সে-ই হাঁক-ডাক ক'রে পাড়ায় সবাইকে বলে এল মেয়ে খুঁজতে, আত্মীয়-স্বজনদের চিঠি লিখতে বসল। এক কথায় তোলপাড় তুলল চারিদিকে।

ওর এ ব্যবহার মহাশ্বেতার বুদ্ধির অগম্য। তবে কি তার সন্দেহটাই ভুল? —আসলে মেজবৌর মনের ভেতরটা পরিষ্কার? 'কে জানে বাপু—বুঝি না!' ·· আপনমনে হতাশ ভাবে শুধু বলে বার বার।

ওর এতদুর কর্মক্ষমতাও নেই। বিয়ের কথা সে তুলেছিল বটে, তাই বলে

তার জন্যে যে এত করতে হয় তা সে জানত না।

যথাসময়ে চারিদিক থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগল হু-হু ক'রে। ওদের এখন অবস্থা ভাল, ছেলে সুপুরুষ, রেল অফিসে চাকরি করে—এ পাত্র দুর্লভ।

ক্ষীরোদা একবার ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিলেন, 'তা পাড়ার নীরো ঘট্‌কীকে একবার খবর দিলে না কেন মেজবৌমা?'

প্রমীলা তাতে উত্তর দিয়েছিল, 'না মা। ঘট্‌কীর সম্বন্ধে ভাল মেয়ে পাওয়া যায় না। খোঁজখবর কিছু জানি না, যাকে তাকে এনে কি বাড়িতে ঢোকানো ভাল?··· জানাশোনা ঘরের মেয়ে চাই, যাদের বাড়ীর নাড়ী-নক্ষত্র সব জানা যাবে—তবে না!'

তার পর একটু থেমে মুচকি হেসে বলেছিল, 'চাই কি তা হলে আমরাও দেখে পছন্দ ক'রে আসতে পারি।'

ক্ষীরোদা চমকে উঠে বলেছিলেন, 'ওমা সে কি, মেয়েরা আবার পরের বাড়ি হুট্ ক'রে মেয়ে দেখতে যাবে কি?'

'সেই জন্যেই তো একেবারে নিম্পরের বাড়ির মেয়ে আনতে চাইছি না মা। আত্ম-কুটুম্বের বাড়ি যাব, তার আর কথা কি, সে তো এমনিও যেতে পারি।'

'তাই বুঝি যাচ্ছে আজকাল সব? কে জানে বাপু। আমরা তো জানতুম মেয়েদের এসব কথায় থাকতে নেই!'

'কলকাতায় তো হামেশা যাচ্ছে। একেবারে অজানা-অচেনা লোকের বাড়িতেও যাচ্ছে। শাশুড়ী-ননদের মেয়ের বাড়ি গিয়ে কনে দেখা খুব চল হয়ে গেছে মা, আপনি ওসব খবরও রাখেন না!'

'তা হবে।' মিট্‌মিট ক'রে তাকান শুধু ক্ষীরোদা, তার পর বলেন, 'তবে যে শুনেছি ঘট্‌কী এলে মেয়েরা ঘিরে ধরে তাকে, হা-পিত্যেশ ক'রে বসে থাকে, কনে কেমন যদি একটু শুনতে পায় এই লোভে!'

'ও কবেকার কথা বলছেন মা! ওসব ছিল আপনাদের আমলে। সে সব দিন আর নেই।'

অগত্যা ক্ষীরোদা চুপ ক'রে যান। কথাটা তাঁর বিশ্বাস হয় না—কিন্তু ভরসা ক'রে প্রতিবাদও করতে পারেন না।

•

কুটুম্বদের ঘর থেকেই সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেল শেষ অবধি।

ক্ষীরোদারই বড় মেয়ের মামাতো ভাসুরের শালার মেয়ে।

অত দূর-কুটুম্বদের বাড়ি যাওয়া চলল না বটে, কিন্তু প্রমীলা বুদ্ধি ক'রে মেয়েকে ননদের বাড়ি আনাবার ব্যবস্থা করলে। মহাশ্বেতা আর ও গিয়ে দেখে এল অম্বিকাপদকে সঙ্গে ক'রে। দেখে আর কারুর মত না নিয়েই একেবারে পাকা কথা দিয়ে এল। মহাশ্বেতার সামনেই দিলে, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিবাদ করা বা সবাইয়ের সামনে নিজের জাকে তিরস্কার করা উচিত কিনা ভাবতে ভাবতে আর মহাশ্বেতার কিছুই করা হয়ে উঠল না। একথা সেকথার মধ্যে একসময় বিদায়ের সময় হয়ে এল।

ফেরবার পথে মহাশ্বেতা কথাটা তুলল অবশ্য, 'তুই যে হুট্ ক'রে কথা দিয়ে এলি, শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করলি না, কারুর মত নিলি না, কাজটা কি ঠিক হ'ল ? বাড়িতে ফিরে একটু সব দিক ভেবে দেখা উচিত ছিল না ?'

'তুমি থাম দিকি দিদি ! মেয়ে দেখলুম আমরা, শাশুড়ী কি বলবেন তাই শুনি ? তা ছাড়া আমরা দুই বড় জা মত করলুম, এর ওপর আর কথা কি ? আমরাই তো ঘর করব—না বেটাছেলেরা ঘর করতে আসবে ?'

দুই জা যে একমত হয় নি, অন্তত মহাশ্বেতা যে মত দেয় নি, সংকোচে এটুকু কিছুতেই বলতে পারল না মহাশ্বেতা। কথাটা ঘুরিয়ে বলল, 'তা এত মেয়ে দেখে এই কষ্টিপাথরের মতো কালো মেয়ে তুই পছন্দ করলি কেন ?'

'শুধু বুঝি রংই দেখলে ? কালো তো আমরাও উনিশ আর বিশ ! গড়ন-পেটন ভাল, কেমন একটা লক্ষ্মীছিরি, এসব দেখলে না ? রং নিয়ে কি ধুয়ে খাবে ? মেয়েটার কথাবার্তা চালচলনও বেশ ভাল, কেমন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। শুধু রূপ দেখে উগ্রচণ্ডা মেয়ে এনে বাড়িতে ঢুকিয়ে পোড়াশান্তি হোক আর কি !'

'তা হোক বাপু, এ যেন বড্ড কালো। ছোটকত্তার অমন সাহেবদের মতো রং, তার পাশে এই কয়লার বস্তা, লোকে কি বলবে বল দিকি !'

'সেই তো ভাল। বলি কালো মেয়েগুলোও তো পার হওয়া চাই। তারা যাবে কোথায় বল দিকি ? তা ছাড়া ছেলেমেয়ে হলে বাপের অত রংয়ের কিছুও তো পাবে—অত কালো থাকবে না। কালো সঙ্গে কালোর বিয়ে হলে ছেলেমেয়ে-গুলোও যে আবলুস কাঠ হ'ত একেবারে !'

'সে যাদের ঘরে হ'ত তাদের ঘরে হ'ত, আমাদের কি ?' মহাশ্বেতা অপ্রসন্ন কণ্ঠে বলে।

'দেখব দেখব, বলি তোমারও তো মেয়ে হয়েছে, বাপের ধাতে তো যায় নি ! এমন কি মায়ের রং-ও পাবে না, তখন পার কর কি ক'রে বুঝব !'

কথাটা এই প্রসঙ্গে এসেই শেষ হয়ে যায়। মহাশ্বেতার যে এ মেয়েতে অমত, সেটা কিছুতেই স্পষ্ট করে জানাতে পারে না।

বাড়িতে ফিরে শাশুড়ীকে বুঝিয়ে দেয় প্রমীলা, 'রংটা একটু চাপাই হ'ল মা, কিন্তু সব দিক তো দেখতে হবে। শুধু কটা-চামড়া নিয়ে কি করব ? বংশটা খুব ভাল। ঠাকুরঝি বললে, ওদের সবাই অমনি ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা,. খুব মিষ্টি স্বভাব। আমাদের ঘরে ও-ই ভাল। নইলে বাপু ঘর করতে পারতুম না।···বৌ আসতে না আসতে তিন ভাই তিন ঠাঁই হওয়া কি ভাল ? তা ছাড়া বেশ গোলালো গোলালো গড়ন, মুখচ্ছিরিও মন্দ নয়। সব দিকে ভেবে ও আমি মত দিয়ে এলুম। এখন দেনাপাওনা আপনারা বুঝুন।'

'তা দ্যাখো তোমাদের যা মত হয়।···তোমরাই ভেবে দ্যাখো, যা ভাল বোঝ সবাই। আমি আর কি বলব ! অম্বিকাপদ যদি মত করে—'

তিনি ঐখানেই থেমে গেলেন। প্রমীলা শেষের কথাটার উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন মনে করলে না।

অগত্যা রাত্রে স্বামীর কাছেই কথাটা পাড়লে মহাশ্বেতা, 'কালো কুচকুচে, কয়লার মতো রং। তোমাদের মেজগিন্নী গিন্নীমো ক'রে একেবারে কথা দিয়ে এল। আমাকে একবার জিজ্ঞেস নেই, বাদ নেই, দুটি ঠোঁট ফাঁক করতে দিলে না।... এর পর যেন দুষো না আমাকে!'

অভয়পদ একটা পুরনো হ্যারিকেন লণ্ঠন সারাচ্ছিল বসে বসে প্রদীপের আলোতে; বাড়িতে কেরোসিনের আলো ঢুকেছে বহুদিন, কিন্তু এ ঘরে তা জ্বালতে দেয় না অভয়পদ। বলে, 'অত চড়া আলোয় চোখ খারাপ হয়।' সে কাজ থেকে মুখ না তুলেই বললে, 'দুজনে দেখতে গিয়েছিলে, মত দিয়ে এসেছ। আমরা এ-ই জানি। তোমার যদি এতই অমত ছিল, সেখানে বল নি কেন? মা'র কাছেও তো বলতে পারতে! আমাকে বলে কি হবে?...তা ছাড়া, কালো রং এইটেই বড় আপত্তির কারণ বলে আমিও মনে করি না।' তার পর একটু থেমে, অনেকদিন পরে একটু মুচকি হেসে (কাজ থেকে মুখ না তুলেই অবশ্য) বললে, 'তোমার রং যতই হোক, আমার চেয়ে তো ঢের নিরেস, কৈ তাতে তো তোমাকে পছন্দ করতে আটকায় নি আমার! মা'র মেজবৌমা ও কথাটা ঠিকই বলেছেন, বৌ আনতে হয় বংশ দেখে, ঘর দেখে—শুধু রূপটাই বিচার করতে নেই।'

সম্ভবত বার বার নিজের রং সম্বন্ধে ইঙ্গিত হতেই মহাশ্বেতা ক্ষেপে গেল একেবারে। বাল্যকাল থেকেই এটা তার বড় দুঃখ, মা-ভাই-বোনদের মধ্যে তার রংটাই সব চেয়ে নিরেস, এখানে এসেও স্বামীর কাছে নিজেকে বড়ই ময়লা লাগে। (এত অযত্নেও 'মিন্সে'র গায়ের রং যেন অন্ধকারে জ্বলে!) সে প্রায় খিঁচিয়ে উঠল, 'বেশ বেশ, মেজবৌমা যখন বলেছেন তখন তো বেদবাক্যি হবেই—ঐ মেয়েই নিয়ে এস এবে-বেবে। আমারই ভুল হয়েছিল মহারানীর কথার ওপর কথা কইতে যাওয়া। এই নাক-কান মলছি, আর যদি কখনও এমন অন্যায় করি। তোমরা তিনটি ভাই যে এক ক্ষুরে মাথা মুড়িয়ে বসে আছ তা তো জানিই, বোকা বলে তাই আবার গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাই।'

বলতে বলতে সে ঘুমন্ত মেয়েটাকেই সজোরে ঘুম পাড়াবার ভঙ্গিতে চাপড় মারতে থাকে, ফলে সেটা জেগে উঠে তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করে। এইবার সব রাগটা গিয়ে পড়ে তার ওপর, সজোরে তার গালটা মুচড়ে দিয়ে বলে, 'মুয়ে আগুন! হাড়মাস জ্বালিয়ে খেলে একেবারে। মর্ মর্, শত্তুরের দল যত সব!'

অভয়পদর কিন্তু এসব কিছুতেই শান্তিভঙ্গ হয় না, সে আপনমনেই ভাঙা লণ্ঠনটা মেরামত করে যায়। মেয়েটা যে অকস্মাৎ কেন অমন ক'রে একেবারে ককিয়ে কেঁদে উঠল, সে কারণটাও জিজ্ঞাসা করে না।

ওর মুখ থেকে সব শুনে পিঁটকী মন্তব্য করেছিল, 'ওলো, ইচ্ছে ক'রে কালো মেয়ে আনছে, বুঝলি? পাছে সোন্দর মেয়ে এলে ওর ওপর থেকে সোহাগ কমে যায়—এই ভয়ে!'

কিন্তু প্রমীলার অন্য আচরণে সে মনোভাবটা খুঁজে না পেয়ে কেমন যেন একটা

অস্বস্তি অনুভব করে মহাশ্বেতা।

পাত্রী-পক্ষের কাছে এঁরা চেয়েছিলেন নগদ টাকাই বেশী। অর্থাৎ বিয়ের খরচটা যাতে ঘর থেকে বার করতে না হয়। অনেক দর-কষাকষির পর আটশো এক টাকা নগদ ও পঁচিশ ভরি সোনা ঠিক হয়েছিল। কিন্তু প্রমীলা বেঁকে বসল, 'তা হবে না। আমাদের দুই জায়ের যা গহনা আছে, ওরও তাই সমান হওয়া দরকার। তা নইলে খারাপ দেখাবে।'

ফলে আরও প্রায় দশ ভরি সোনা ঘর থেকে বার করতে হ'ল। তার ওপর আবার মেজবৌ ধরে বসল, 'আর তো সবাই পার হয়ে গেছে, মা'র এই শেষ কাজ, ছোটকত্তার বিয়েতে রসুন-চৌকি বসাতে হবে।'

'পাগল নাকি. সে যে অনেক খরচ!'

'কী আর খরচ? আমি খোঁজ নিয়েছি, দশটা টাকা হলেই হয়ে যাবে।'

অম্বিকাপদ অবশ্য আর বিশেষ আপত্তি করে নি, শুধু খোঁচা দিয়ে বলেছিল, 'এটা তো তোমাদের দুই জায়ের কারুর বেলাই হয় নি, তবে এটা করতে চাইছ কেন?'

তার জবাবে মেজবৌ বুঝিয়েছিল, 'তখনকার অবস্থা আর এখনকার অবস্থা সমান হ'ল? গয়না তো বরং আরও বেশী দেওয়া উচিত ছিল, সে সব চেয়ে ছোট, আমাদের আদরের জিনিস।...বুঝতে পারছ না, একসঙ্গে ওঠা-বসা, একসঙ্গে ঘর নেমন্তন্ন যাওয়া, সেই সময়টাই বড় দৃষ্টি কটু লাগে। আমরা বড়, আমরা পরে যাব, আর ও পরবে না—খারাপ লাগবে না? সবাই জানে যে এ বাড়িতে যে যার সে তার গয়না গড়ায় না—যা হয় সংসার থেকেই হয়। তখন তো সবাই বলবে যে ছোট ভাইটাকে ছেলেমানুষ বলে ঠকাচ্ছে এরা!'

এর পর অম্বিকাপদ কথা বলে নি। কিন্তু শানাইয়ের প্রস্তাবটা অভয়পদ এক কথায় নাকচ করে দিলে। মেজভাইকে ডেকে সংক্ষেপে শুধু বললে, 'কী শুনছি, মেজবৌমা নবৎ বসাতে চাইছেন? ওসব করতে যেও না। পাড়াঘরে সবাই ভাববে, এদের খুব পয়সা হয়েছে। এমনিতেই কানাঘুষো হয়। শেষ অবধি ডাকাত পড়বে।'

ভাসুরের কথার ওপর কথা খাটবে না, প্রমীলা তা ভাল ক'রেই জানে। অগত্যা চুপ ক'রে যেতে হয়।

কিন্তু শানাই ছাড়া ঘটা করবার আর যা যা ব্যবস্থা আছে, কোনটারই ত্রুটি ঘটল না। প্রতিবারেই 'ভেতো-যজ্ঞি' হয়, অর্থাৎ বৌভাতের হাঙ্গামাটা দুপুরে সেরে নেওয়া হয়, এবারে মেজবৌ লুচির ব্যবস্থা করলে, লোকও নিমন্ত্রিত হ'ল অনেক বেশী। তা ছাড়া আয়োজনটা হ'ল এবার রাত্রে। প্রমীলা বললে, 'পাতা পেড়ে বসে খেয়ে যাওয়াই ভাল। সেই জনাজাত ছাঁদা তো দিতেই হয়, মিছিমিছি দুপুরে বলে লাভ কি? আপিসের সময়, সবাই আসতে পারে না, কিছু না!'

অভয়পদ একবারই আপত্তি করেছিল, আর কোন ব্যবস্থাতে প্রতিবাদ জানায় নি, তবু মহাশ্বেতা তাতেই খুশি। মেজবৌর 'দম্ভ' যে চূর্ণ হ'ল, এই আনন্দে

সে পরবর্তী এত সমারোহের সব জবালা ভুলে গেল। অবশ্য খুবে বেশী একটা ঈর্ষা ছিলও না।···তার বেলা যেমন হয় নি, তেমনি মেজবৌর বেলাও তো হয় নি, সেটাই কি কম সান্ত্বনা! ও ছোট, ওর বেলা হয় হোক।···শুধু মেজবৌর মনের ভাবটাই বুঝতে পারছিল না বলে মনে মনে ছট্‌ফট করছিল।

বিয়ের সব ব্যাপারেই প্রমীলা শাশুড়ীকে সম্পূর্ণ পিছনে ফেলে গিন্নী হয়ে বসল। এমন কি বরণের সময় সে যে বড় জাকে ডাকল, এটাও যেন মহাশ্বেতা আশা করে নি। কতকটা কৃতার্থ ভাবেই ছুটে এগিয়ে গেল সে। এতটা দাপট যে মহাশ্বেতা আর এক জন্ম ঘুরে এলেও দেখাতে পারত না, সেটা মনে মনে সে-ও স্বীকার করে।

'ওরই সাজে, সত্যি! কেমন পারে ও!' আপন মনেই বলে।

মহাশ্বেতা কেন, ক্ষীরোদা মরে গেলেও যা পারতেন না, প্রমীলা সেটাও পারে অনায়াসে। বৌ আসবার সময় হতে উপস্থিত কুটুম্বিনীদের বেশ হেঁকেই শুনিয়ে দেয়, 'বৌ আসছে বাপু কালো ; তা আগে থেকেই শুনিয়ে দিচ্ছি। কেউ যেন না তখন তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে চিপ্‌টিনি কেটে কোন কথা বলে। আগে থাকতে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। আমি তা হলে কিন্তু কাউকে ছেড়ে কথা বলব না!'

ওর এই দুঃসাহসে সকলে স্তব্ধ হয়ে যায়। এমন কি সেটা নিয়ে আলোচনা করবারও যেন শক্তি থাকে না কারুর। মৃদু গুঞ্জন একটা ওঠে বটে, তবে সে অনেক পরে।

॥ ৪ ॥

বৌভাত নির্বিবাদে চুকলেও ফুলশয্যাতে এমন একটা ঘটনা ঘটল, যা এ পাড়াঘরে কেন, কলকাতাতেও কেউ কখনও কল্পনা করেছে কিনা সন্দেহ।

ক্ষীর-মুড়কি এবং হাতের সুতো খোলার পালা শেষ হবার পর, হঠাৎ দেখা গেল মেজবৌ নেই।

সামান্য একটু খোঁজাখুঁজির পরই সবাই চলে গেল ঘর থেকে। সকলের মুখেই একটু চাপা হাসি। অর্থাৎ মেজবৌয়ের অন্তর্ধানের ব্যাপারে কারুর তেমন কোন দুশ্চিন্তা নেই। কারণটা সকলেই অনুমান ক'রে নিতে পারে।

দেখা গেল সকলের সঙ্গে ছোটকর্তারও ব্যাপারটা অনুমান ক'রে নিতে অসুবিধা হয় নি। সবাই চলে গেলে দুর্গাপদ তড়াক ক'রে উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে, তার পর হেঁট হয়ে তক্তপোশের তলা থেকে টেনে বার করলে কালো-কাপড় মুড়ি দেওয়া প্রমীলাকে। এই গরমে পুঁটুলির মতো বসে থেকে আধসেদ্ধ হয়ে গেছে সে।

খুব একচোট হাসাহাসি হ'ল বৈকি!

এমন কি কনে-বৌও ওপাশে মুখ ঘুরিয়ে ফিক্ ক'রে হেসে ফেললে।

টেনে বাইরে এনেও আসামীকে শক্ত ক'রে ধরে ছিল দুর্গাপদ ; বেঁকেচুরে এক

ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে দরজার কাছে পেঁছিল প্রমীলা, 'বেশ ভাই বেশ, আপদবালাই চললুম মনের সুখে পীরিত কর—হ'ল তো ?'

কিন্তু দুর্গাপদ তারও আগে গিয়ে বন্ধ কপাটে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াল।

'উঁহু, তা হবে না। ছিলে যখন, এখানেই থাকতে হবে।'

'ছাড় ছাড়, কী ইয়ার্কি হচ্ছে!'

'ইয়ার্কি আবার কি ? থাকই না।'

'হ্যাঁ, তোমার ফুলশয্যেয় আমি কাঁটা হয়ে থাকি আর কি ? ছোটবৌ শাপমান্যি দিক শেষে!'

'ফুলে তো কাঁটা থাকেই, এ আর এমন নতুন কথা কি ? না হয় কাঁটাই হয়ে থাকলে।'

'এই ছাড়, সত্যি! লোকে কি বলবে? ছোটবৌই বা কি মনে করবে! ফুলশয্যের রাত বলে কথা, এ তো আর জীবনে দুবার আসবে না!'

'লোকে আবার কি ভাববে! আর একজন মানুষ তো আছে। এসো সবাই মিলে গল্প ক'রে কাটিয়ে দিই। কতটুকুই বা রাত বাকী আছে। এসো, এসো!'

এক রকম জোর ক'রেই হাত ধরে বিছানার কাছে টেনে আনে দুর্গাপদ। হয়তো প্রমীলাও শেষ পর্যন্ত খুব জোর দেখায় না। ছোটবৌকে মাঝখানে ঠেলে দিয়ে এক পাশে শুয়ে পড়ে সত্যি-সত্যিই।

তার পর ওরা দুজনে বেশ গল্প জমিয়ে তোলে। এটা-ওটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথা। বিয়ে-বাড়িতে সমাগত আত্মীয়-কুটুম্বিনীদের বিচিত্র আচরণ নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই বেশী। মনে হতে লাগল, ওদের মাঝখানে আড়ষ্ট কাঠ-হয়ে-শুয়ে-থাকা আর একটি মেয়ের অস্তিত্ব ওরা ভুলেই গেছে।

বাইরে যারা আড়ি পাতবার আশায় ছিল, আড়ষ্ট হয়ে গেছে তারাও। এমন অভাবনীয় কাণ্ড আর এমন প্রচণ্ড দুঃসাহস স্মরণকালের মধ্যে কেউ কখনও শুনেছে বলে কারও মনে পড়ে না। আড়ি পাতবার মজাটা না হওয়ায় তাদের আক্রোশ আরও বেশী। কিন্তু সে শুধুই ব্যর্থ আক্রোশ, মেজবৌকে যে তাদের কোন আঘাত কখনও লাগবে না, তা তারা জানে।

ছোটবৌ তরলার ঠিক কি অনুভূতি হচ্ছিল, তা বলা শক্ত। দুঃখ বা বেদনার চেয়েও বেশী যেটা, সেটা বিস্ময়। এক রকমের নাম-না-জানা আতঙ্ক-মিশ্রিত বিস্ময় শুধু। পনেরো বছর বয়স হ'ল তার, এর মধ্যে বহু মেয়ের ফুলশয্যার বহু বিবরণ সে শুনেছে, কৈ কোনটার সঙ্গেই তো মেলে না এ অভিজ্ঞতাটা! এ তার কী হ'ল ?

অবশ্য মেজবৌ সকাল পর্যন্ত রইল না ওদের ঘরে। হাসিগল্পের মধ্যেই দূরের চটকলে চারটের ভোঁ বাজা শুনতে পেয়েছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ এক লাফে উঠে, দুর্গাপদ ব্যাপারটা কি বোঝবার বা বাধা দেবার আগেই, বাইরে বেরিয়ে গিয়ে কপাটটায় শেকল তুলে দিলে।

তার পর এক মুহূর্ত সেইখানে দাঁড়িয়েই ইতস্তত করল। মেজকর্তা নিশ্চয় দোর

দিয়েই ঘুমোচ্ছে, ডাকাডাকি করতে গেলে বাড়িসুদ্ধ জেগে উঠবে। এত হাঙ্গামা ক'রে লাভ নেই, ওপাশের দালানে বিছানা ক'রে ওর বড় ননদ ঘুমোচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত সেইখানেই গিয়ে এক পাশে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

রতনের বাড়ি কান্তি সুখেই আছে বলতে হবে, কিন্তু শান্তিতে নেই। অথচ কেন যে শান্তিতে নেই, কেন যে সে সর্বদা একটা অস্বস্তি বোধ করে—তা সে নিজেও তেমন ভাল ক'রে বুঝতে পারে না।

রতনদি তাকে খুবই যত্ন করে অবশ্য। পাছে আশ্রিত মনে ক'রে ঠাকুরচাকররা অবহেলা করে বা তাদেরই সমপর্যায়ভুক্ত ভাবে—এই জন্যে সে ছুটির দিনে দুপুর-বেলায় কান্তিকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসে। কারণে অকারণে মোক্ষদাকে উপলক্ষ ক'রে সবাইকে শুনিয়ে বলে, 'দেখিস—কুটুম মানুষ, যত্ন করিস। নিন্দে না হয়।'

রতনদি মানুষ ভাল, খুবই ভাল। এমন মিষ্টি কথাবার্তা, এমন সস্নেহ মধুর ব্যবহার কান্তির কাছে অবিশ্বাস্য! রতনকে দেখে বড়লোক সম্বন্ধে ধারণাটাই তার পালটে যাচ্ছে। বড়লোক বলতে কান্তিরা এতকাল সরকারদেরই জানত, এখানে এসে কান্তি বুঝেছে যে এরা সরকারদের চেয়ে ঢের বড়লোক। কিন্তু তবু তাদের মতো একটুও নয় তো! সরকার-বাড়ির ছেলেমেয়েদের দেখে ওর মনের মধ্যে বড়লোকত্বের সঙ্গে রূঢ় কর্কশ কথা এবং উদ্ধত অবহেলা অঙ্গাঙ্গী হয়ে গিয়েছিল। তাই, এখানে এসে প্রথম প্রথম এদের, বিশেষত রতনদির কথাবার্তা শুনে, তাঁর সঙ্গে সংসারের চারিদিকে ছড়ানো প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের চিহ্নগুলোকে খাপ খাওয়াতে পারত না। সবটাই যেন মাথার মধ্যে গুলিয়ে যেত।

তবু রতনদি যেন কেমন!

ওর মধ্যে যেন দুটো মানুষ আছে।

একটা দিনের বেলা—মানে বেলা আটটার পর থেকে সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত তার সঙ্গে সদয় মধুর ব্যবহার করে, মিষ্টি কথা বলে, লেখাপড়ার খোঁজ নেয়, কত কি গল্প বলে, ভাল ভাল বই থেকে গল্প পড়ে শোনায়—ওর সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখে; কিন্তু রাত আটটা বাজলেই অন্য একটা মানুষ যেন ওর মধ্যে ভর করে।

সে যেন একেবারে আলাদা। তাকে দেখে ভয় হয় এবং বলতে নেই—ভাবতে গেলে মনের মধ্যে একটু লজ্জাই অনুভব করে কান্তি—ঘৃণাও হয়।

রতনদিও তা জানে বোধ হয়। সে তেতলার একটা ছোট্ট ঘরে কান্তির থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। এবং প্রথম দিনই বলে দিয়েছে—'সন্ধ্যের পরই তোমার ঘরে উঠে যেও, লক্ষ্মী ভাইটি। বিশেষ দরকার না পড়লে নিচে নেমো না। রাত্রের খাবার যাতে আটটার মধ্যেই হয়ে যায় বামুন ঠাকুরকে বলে দিয়েছি—খেয়েদেয়ে ওপরে চলে যেও—পড়াশুনো ক'রে ঘুমিও। ভয় পেও না, মোক্ষদাকেও এখন থেকে রাত্তিরে ওপরে শুতে বলেছি। তোমার পাশের ঘরেই সে থাকবে—

ভয়-টয় পেলে তাকে ডেকো।'

তার পর একটু থেমে ঢোক গিলে বলেছে যে—'তোমার ভগ্নীপতি বড় রাগী মানুষ, তা ছাড়া কারণে-অকারণে বড় হৈ-হল্লা করে—তাই হয়তো চেঁচামেচি শুনবে, কিন্তু তাতে ভয় পেও না। নিচে নামবারও দরকার নেই। কী জানি কি মেজাজে থাকবে, কোন দিন কি বলবে টলবে—সে তোমারও অপমান আমারও অপমান। দরকার কি!'

কান্তি সে নির্দেশ সাধ্যমতই পালন করত অবশ্য। ইস্কুল থেকে ফিরে দোতলায় রতনদির ঘরে বসে একটু-আধটু গল্প করত—তার পর সন্ধ্যে হলেই ওপরে গিয়ে পড়তে বসত। সাড়ে সাতটা নাগাদ মোক্ষদা আসত ডাকতে—'খাবে চল গো দাদা, তোমার খাবার হয়ে গিয়েছে।' একবার গিয়ে খেয়ে আসত নিচ থেকে। তার পরই যে ওপরে এসে ঢুকত—আর বড় একটা নামত না। কেবল প্রাকৃতিক প্রয়োজনে এক আধ দিন নামতেই হ'ত—সে দৈবাৎ, কিন্তু তাতেই সে নিচের একটা বীভৎস জীবনের আভাস পেত। শুধু হৈ-হল্লা চেঁচামেচি নয়—আরও সব কত কি! কী একটা উগ্র গন্ধও পেত, প্রথম দিন সে গন্ধে বমি এসে গিয়েছিল ওর। অনেকদিন পরে মনে পড়েছিল—এই গন্ধ একদিন ও শিবপুর থেকে মা'র সঙ্গে হেঁটে ফিরতে ফিরতে পেয়েছিল। ওদের পাড়ারই পেঁকো মল্লিক পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল কেমন একরকম টলতে টলতে—তার গা থেকেও এমনি গন্ধ পেয়েছিল। মা বলেছিল, 'উঃ, পেঁকো মল্লিক মদ খেয়েছে!' এটাও তাহলে মদের গন্ধ।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল, 'রতনদির বর মদ খায়! ছিঃ!'

একটু দুঃখও হয়েছিল তখন, 'ঐ জন্যেই রতনদি নিচে নামতে বারণ করে। লজ্জা পায় বলে। আহা বেচারী!'

কিন্তু যেদিন আবিষ্কার করল যে শুধু রতনদির বর নয়—রতনদিও নেশা করে, ওর সেদিনের দুঃখ ভোলবার নয়।

রাত তখন দশটা বেজে গেছে, কান্তির দুচোখে ঘুম এসেছে জড়িয়ে। মোক্ষদা অবশ্য শেজ-এর আলোটা জেবলে দিয়ে গেছে অনেকক্ষণ—এটা সারারাত জ্বলে, কান্তি আসার পর রতনই এ ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে, বলে, 'ছেলেমানুষ একা শোবে, আলো না থাকলে ভয় করবে'—সুতরাং হাত বাড়িয়ে ওর পড়বার আলোটা নিবিয়ে দিয়ে চোখ বোজার অপেক্ষা, আর কিছুই করবার নেই। তা-ই করতে যাবে, হঠাৎ নিচে বিরাট একটা হৈ-চৈ গণ্ডগোল উঠল। এসব অবশ্য আজকাল ওর কতকটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, এমন কি রাশি রাশি কাচের বাসন বা বোতল ভেঙে পড়বার শব্দেও বড় একটা ওর শান্তিভঙ্গ হয় না—তবে আজকের এ হৈ-হল্লাটা যেন বিশেষ রকম। অভ্যস্ত শব্দগুলো আজ একটু বেশী হচ্ছে—তাতেও হয়তো কান্তি এত বিচলিত হ'ত না, কিন্তু—কে কাঁদছে না? আর একটু কান পেতে শুনতেই মনে হ'ল—রতনদিই কাঁদছে।

আর চুপ ক'রে থাকতে পারল না কান্তি, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে

নেমে এল। নিচে আসতেই নজরে পড়ল, ওরই ঘরের সামনে বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে রতনদি—কপালটা কাটা, তা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে বুকের কাছে কাপড়টা পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠেছে। চারিদিকে ভাঙা ডিশ ও বোতল ছড়ানো। ভেতর থেকে কে একজন জড়ানো জড়ানো গলায় তখনও চেঁচামেচি করছে। ঠাকুর-চাকররা ছুটে এসে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছে, আর মোক্ষদা এসে হাত ধরে টানছে রতনদিকে। শুধু—ওরই মধ্যে এক ফাঁকে দেখে নিলে কান্তি, নিচে কত্তাঠাকুরের ঘরে তখনও আলো জ্বলছে, কিন্তু তিনি বেরিয়ে আসেন নি।

রতনকে ঐ অবস্থায় দেখে কান্তি আর থাকতে পারলে না, কাচ বাঁচিয়ে খানিকটা এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলে, 'কী হয়েছে রতনদি, কেটে গেল কী ক'রে!'

রতন কান্না থামিয়ে উগ্র কণ্ঠে ওকে তেড়ে উঠল, 'তুই কেন রে ছোঁড়া এখানে? একশো বার বলেছি না নিচে নামবি না!...এঁচোড়ে-পাকা হয়ে উঠেছ এরই মধ্যে? বালামচালের ভাত* পেটে পড়তে না পড়তেই পিপুল পেকে গেছে?...যা বেরো—ওপরে যা! ফের যদি ডেঁপোমি করতে আসবি তো দূর ক'রে দেব—যেখানে ছিলি সেখানে!'

ভয়ে, অপমানে, লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে পা পা ক'রে পিছিয়ে গেল কান্তি। কিন্তু তবু তারই মধ্যে একটি জিনিস লক্ষ্য ক'রে গেল—রতনদির মুখেও সেই বিশ্রী গন্ধটা। তারও পা টলছে!

তা হলে রতনদিও!

চোখের ঘুম কোথায় চলে গেল ওর। বহু রাত্রি পর্যন্ত ছাদে জেগে বসে রইল কান্তি। প্রথমে অপমানটাই খুব লেগেছিল ওর, ওরও কান্না পেয়ে গিয়েছিল—দাসী-চাকরের সামনে এ কী অপমান! সে যে আশ্রিত, সে যে অন্নদাস, নিরুপায়—যে কথাটা রতনদি নিজেই এতদিন ঢাকবার চেষ্টা করত, সেইটেই প্রচার ক'রে দিলে নিজেই! এর পর ওরা কী চোখে ওকে দেখবে—কি করুণা ও বিদ্রুপের চোখে—সেইটে কল্পনা ক'রেই ওর কান মাথা গরম হয়ে উঠল, চোখ ফেটে জল এল। অপমান ও লাঞ্ছনা ওদের নতুন নয়—কিন্তু এখানে এসে এত আদরযত্ন এত সম্মান পাবার পর এ আঘাতটা যেন বড় বেশী বাজল!

নিচের গোলমাল শান্ত হয়ে এসেছে। মোক্ষদা ঝাঁট দিয়ে ভাঙা কাচগুলো সরাচ্ছে আস্তে আস্তে—নিচে রান্নাঘরে সামান্য খুটখাট আওয়াজ, ঠাকুর দ্রুত কাজ সেরে নিচ্ছে তার। একটু পরেই ওদেরও খাওয়া-দাওয়া চুকে যাবে—বাড়ি শান্ত ও নিস্তব্ধ হয়ে আসবে।

তবু ঘুম এল না কান্তির। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবার পর নিজের অপমানের

* সেকালে বাখরগঞ্জ বা বরিশালের বালামচাল কলকাতায় খুব বেশী চালু ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এর চলন কমতে থাকে। কিন্তু নামটা ছিল অনেক দিন।

জ্বালাটা গেছে, কিন্তু রতনদির কথাটা ভুলতে পারছে না। কান্নার ফলে রগের পাশ দুটো দপ্‌দপ্‌ করছে, মাথাটা ধরে উঠেছে—তবু ঘুম নেই।

আর একটু পরেই মোক্ষদা শুতে এল। হাতে অভ্যস্ত কেরোসিন তেলের পাত্র। শোবার আগে হাজায় দিতে হয় ওর। কিন্তু কান্তিকে দেখে আর ঘরে গেল না, সেইখানেই পা ছড়িয়ে বসল পায়ে তেল দিতে।

'ওমা, এখনও ঘুমোও নি বুঝি দাদাবাবু? আহা, দিদির ব্যাপারটা বড্ড নেগেছে, না? তা তুমি ওসব গায়ে মেখো নি, বুঝলে? ও কি আর ও বলেছে, নেশায় বইলেছে। নইলে মানুষ তো দ্যাখো—ঐ সব কথা বলবার কি মানুষ?··· এই বাপু তোমাকে বলা রইল, নিচে যাই হোক না কেন, অক্তগঙ্গা কি পেলয় কুলুখেত্তর ঘটে যাক—তুমি নিচে নেমো নি।'

কান্তি আর থাকতে পারলে না, আস্তে আস্তে মোক্ষদার পাশে এসে বসে প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা রতনদি ঐ সব ছাইভস্ম নেশা করে কেন মোক্ষদাদি? ওতে যে শুনেছি শরীর খারাপ হয়ে যায়। মানুষ আর মানুষ থাকে না!'

'করে কেন! আ আমার কপাল!' ফিস ফিস ক'রে বলে মোক্ষদা, 'ও কি আর সাধ ক'রে করে? ওকে যে জোর ক'রে করায়! কী করবে বল! আগের যে বাবু ছেল সে ছেল দেবতা। আসত যেত কাকে-পক্ষীতে টের পেত নি! আত নটার পর আসত, ওদিকে আত থাকতে থাকতেই চলে যেত। কপাল খারাপ তাই সে বাবু গেল।···তা কি দুটো দিন নিস্তার আছে, কি একটু খোঁজখবর ক'রে বেছেবুছে নেবার জো আছে? ঐ যে দাঁতাদানা আছে ঐ নিচের ঘরে শুয়ে—মুয়ে আগুন, মার্কণ্ডির পেরমাই নিয়ে এসেছে যেন, মরণও নি! না ওর না ঐ মাগীর—বসে বসে মেয়েবেচা পয়সায় খাচ্ছে, তবু মরবার নাম নি।···ঐ মিন্‌সে গো—ঐ কত্তাবাবু কি চোখে-কানে দেখতে দিলে, আত না পোয়াতে পোয়াতে নিজে কক্করে দুটি হাজার টাকা গুনে নিয়ে এই মিন্‌সেকে জুটিয়ে দিলে। এ কি মানুষ, আক্কস! নিজে পিপে পিপে মদ গিলছে, মেয়েটাকে সুদ্দু মাতাল ক'রে ছাড়ছে! নইলেই মেজাজ, ভাঙবে চুরবে মারধোর করবে—যাচ্ছেতাই কাণ্ড, বেলেল্লাগিরির একশেষ। তবে হ্যাঁ—দুটো গুণ আছে, পয়সা ঢালে অজচ্ছল, একটা ভাঙলে তিনটে পাঠিয়ে দেবে পরের দিন আর ভোরটি হবে, দুটি কাপ চা গিলবে পর পর—তার পরই পালাবে। মেয়েটার ছুটি, পরের দিন আত আটটার আগে আর টিকি দেখাবে নি। ছুটির দিনেও দোপরে আসে না। সেখানে নাকি এক খাণ্ডারনী আছে, তাকে ও ভয় করে খুব শুনেছি।'

মোক্ষদা বোধ করি নিঃশ্বাস নেবার জন্যেই থামল একটু।

কান্তির তখন মাথা ঘুরছে যেন। এসব কথা ওর কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য, জটিল!

'বুড়োকত্তা' অর্থাৎ রতনদির বাবা একজন আছেন বটে—শুনেছে, ঠাকুরের আর মোক্ষদার কাছেই শুনেছে, বড্ড বদ্‌মেজাজী রাগী—সেই জন্য তাঁর ত্রি-সীমানায়ও যায় না কান্তি। আর বুড়ো-মতো মেয়েছেলেও একজন আছেন—তিনিই নাকি

রতনদির মা—রোগা কয়া-ঘষা একরত্তি। তাঁকে একদিন মাত্র দেখেছিল, তিনি নাকি ঠাকুরঘরের বাইরে বেরোন না। তিন চার দিন অন্তর সামান্য হবিষ্যি খান। মোক্ষদা বলে, 'বেরোয় না তাই বেঁচে গিয়িচ। যা ছুঁচিবাই, মাগো, তাইতেই আমার এই হাতেপায় ঘা ধরে গেছে। নিত্যি বেরোলে তো পাগল হয়ে যেতুম!'

কান্তির কানে গেল মোক্ষদা কেরোসিন তেল পায়ে ঘষতে ঘষতে তখনও বলে চলেছে, 'তেমনি জব্দ হয়েছে মিন্‌সে। আগে ও'রও অমনি ছিল, কথায় কথায় আগ, কথায় কথায় দম্ভিষ্যি, থালাবাসন ছোঁড়াছুঁড়ি—এ বাবু আসবার পর একেবারে কেঁচোটি। এক দিন কি করেছিল চেঁচামেচি, অমনি তেড়ে নিচে গিয়ে বলে দিলে, "দ্যাখো, চুপচাপ থাক তো থাক, নইলে দারোয়ান দিয়ে বার ক'রে দেব। মেয়ের পয়সায় খাচ্ছ, অত আবার মেজাজ কিসের? লজ্জা ক'রে না?"—সেই দিন থেকে একেবারে ঠাণ্ডা। থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে দিয়েছে তো!·· বেশ হয়েছে। মুয়ে আগুন। অমন বাপের মুখে নুড়ো জেবলে দিতে হয়!'

কান্তির কিন্তু এসব কথায় তত কান ছিল না। তার মনের মধ্যে যে সমস্যাটা প্রবল হয়ে উঠেছিল সেইটেই আর চেপে রাখতে পারলে না। আস্তে আস্তে বললে, 'আচ্ছা মোক্ষদাদি, আগের বাবু এ বাবু কি আলাদা?·· মানে রতনদির কি দুটো বিয়ে?'

'বে!' মোক্ষদা যেন থতমত খেয়ে যায়, 'হ্যাঁ তা বে-ই বলতে পার।···আমার হয়েছে যেন মরণদশা, কি বলতে যে কী বলে ফেলি। মুয়ে আগুন, বুড়ো হয়ে মরতে চন্‌নু, এখনও হৃষ্যিদীগ্যি জ্ঞান হ'ল না! মুখে লাগাম এল না।·· হেই দাদাবাবু এসব কথা যেন ঘুর্ণাক্ষরে বলো নি কাউকে—তা হলে আমার চাকরি থাকবে না। মরে যাব একেবারে। সাত দোহাই তোমার!'

মোক্ষদা কেরোসিনের হাতেই কান্তির হাত দুটো চেপে ধরে।

তাড়াতাড়ি হাতটা টেনে নিয়ে সে বলে, 'ছি! কী ভাব আমাকে তুমি মোক্ষদাদি! আমি এসব কথা কাকে বলতে যাব? তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি কাউকে বলব না।'

'দেখো বাপু!' তার পর নিজের গালে নিজেই দুই চড় মারে মোক্ষদা, 'এই, এই! ··এই নাককান মলা খাচ্ছি।···তবু যদি চৈতন্যি হয়!'

তার পর নীরবে আর কিছুক্ষণ পায়ে তেল ঘষে মোক্ষদা প্রচণ্ড একটা হাই তুলে বলে, 'যাই, আবার তো সেই ভোরে উঠে চোদ্দ বাটি চা দেওয়া। বলি দাসী-চাকর তো পঞ্চাশ গণ্ডা! অথচ যা কিছু সবই তো এই মুকী ছাড়া চলে না! দেখছ তো নিজের চোখে?'

॥ ২ ॥

কিন্তু শুধু রাত্রেই নয়, সকালেও স্নানের আগে পর্যন্ত রতনদির মেজাজ-যেন কেমন থাকে। কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারে না কান্তি। সাতটায় ওঠে, বিছানা থেকেই চা খেয়ে আটটা নাগাদ কলঘরে ঢোকে, বেরোয় পুরো দেড় ঘণ্টা পরে।

তখন একেবারে নতুন মানুষ। কিন্তু বিছানা থেকে ওঠবার পর আর কলঘরে ঢোকার আগে অবধি মেজাজ যেন চড়েই থাকে। যাকে সামনে পায় খিঁচোয়, ঝি-চাকরদের সঙ্গে বকাবকি করে, তুচ্ছ কারণেও রেগে আগুন হয়। এক দিন সেই সময়টা নিতান্ত প্রাকৃতিক কারণেই কান্তিকে নিচে নামতে হয়েছিল, ওর সামনে পড়তেই যেন তেড়ে মারতে এল, 'এই ছোঁড়া, দিন নেই রাত নেই তুই যখন-তখন নিচে ঘুরঘুর করিস কেন বল্ তো? পড়াশুনো নেই তোর? মা এই করতে পাঠিয়েছে এখানে?'

কান্তি তো আড়ষ্ট। প্রথমটা ভয়ে কথাই বেরোয় না, অতিকষ্টে বললে, 'না —আমি তো মানে এই আজই—'

'আজই!' ভেঙিয়ে বলে রতন, 'আজই! যেদিন দেখি সেইদিনই আজ! না? যা পড়তে বস গে যা!'

প্রাকৃতিক কাজটা মাথায় তুলে ফিরে আসতে হয়েছিল কান্তিকে।

কিন্তু একটু পরেই রতন কলঘরে ঢুকল। মোক্ষদাকেও রোজ প্রথমটা ঢুকতে হয় ওর সঙ্গে, তারই মধ্যে এক ফাঁকে সে ওপরে উঠে বলে গেল, 'যাও গো দাদা, এবার নিচোয় চলে যাও। আর কিছু বলবে নি, চান ক'রে যখন বেরোবে—তখন দেখো নতুন মানুষ!'

সত্যিই তাই। স্নান ক'রে ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রণাম সেরেই রতন ওর ঘরে এসে দাঁড়ায়, 'কান্তি কিছু মনে করিস নি ভাই।' বলে হঠাৎ পাশে বসে পড়ে দুটো আঙুলে ক'রে ওর দাড়িটা তুলে ধরতেই কান্তি আর সামলাতে পারে না নিজেকে, ওর চোখে জল এসে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুল হয়ে রতন নিজের মূল্যবান খোপদস্ত ফরাসডাঙ্গার শাড়ির আঁচল দিয়েই ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলে, 'এই দ্যাখো··· পাগল! একেবারে চোখে জল এসে গেল!·· ওরে তখন বড্ড মাথা ধরেছিল, কী বলছি কী করছি—সে কি জ্ঞান ছিল কিছু?···রাগ করিস নি লক্ষ্মীটি!'

আরও অনেক মিষ্টি কথা বলে চলে গিয়েছিল রতন।

কান্তির কাছে এ আচরণ বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু বুঝিয়ে দেয় মোক্ষদাই— —সন্ধ্যেবেলা এক ফাঁকে এসে হঠাৎ পা ছড়িয়ে বসে বলে, 'সকালে বুঝি গিন্নী এসে আবার তোমার কাছে ঘাট মেনে গেল? দেখলে? আমি বলি নি তোমাকে যে চান ক'রে বেরোবে নতুন মনিষ্যি!'

'আচ্ছা অমন কেন হয় মোক্ষদাদি?' প্রশ্ন না ক'রে পারে না কান্তি।

'ওরে বাবা, সকালে যে মাথা ধরে থাকে। পেচণ্ড মাথাধরা, ও আমি জানি যে! দিনকতক আমার মানুষও ঐসব ছাইভস্ম ধরিয়েছিল কিনা···ঐ দ্যাখো আবার কি বলতে কী বলে ফেলি। মরণদশা আমার!'

'রোজ মাথা ধরে থাকে?'

'ওজ! পেত্যহ!···আসল কথা খোঁয়াড়ি ভাঙে না তো! আবার যদি সকালে একটু ঢুকুঢুকু চালাত তো চাঙ্গা। তা তো চালায় না। ঐ চান করে দেড় ঘণ্টা ধরে, কলের নিচে মাথা পেতে বসে থাকে—অন্তত দশ-পনেরো মিনিট

—ডুবে ছাড়ে। তখন আবার মনিষ্যিজন্ম ফিরে আসে।'

একটু চুপ ক'রে থেকে কান্তি বলে, 'আচ্ছা অতক্ষণ ধরে জলে থাকেন, অসুখ করে না ?'

'অব্যেস! তবে আর অব্যেস বলেছে কেন ? অব্যেসে সব হয় রে ভাই!'

'ও'র সঙ্গে তুমিও থাক কেন ?'

'ওমা তেল মাখাতে হয় যে! চান করার কত পব্ব তা তো জান না। ঐ যে দেখছ মাছি-পিছলে-পড়ছে ভেলভেট সাটিংয়ের মতো মোলাম চামড়া, ও কি অমনি হয় নাকি ? কতক ছেলাবত ওর, অমন ছেলাবতে থাকলে আমাদের চামড়াও অমনি হ'ত! শোন, পেথম তো আমি সন্দ কলঘরে ঢুকে তেল মাখাতে বসব—অমন একটি ঘণ্টা ধরে চুপচুপে ক'রে তেল মাখবে, ঐ যে কলঘরে বড় সাদা পাথরের জলচৌকি আছে, দেখেছ তো ? ওটা শুধু তেল মাখবার জন্যেই। তার পর বেসম দিয়ে সেই তেল আবার তুলতে হবে। তার পর তো আমি বেরিয়ে আসব, উনি তখন বেশ ক'রে সাবান মাখবেন। তার পর চান-টান সারা হলে গা মাথা মুছে গন্ধ-তেল মাখা হবে। গায়েও সেই তেল পড়বে, তবে আলতো। তার পর আবার দু-চার ঘটি জল গায়ে ঢেলে গা মুছে তবে বেরোবে। দ্যাখ না—যখন বেরিয়ে আসে কেমন ভুরভুর করে খোসবো—গা থেকেও অমনি খোসবো বেরোয়।'

তার পর উঠে যেতে যেতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কতকটা স্বগতোক্তিই করে মোক্ষদা, 'যে ব্যবসার যা! নইলে পয়সা আসবে কেন ?'

সত্যিই—রতনদির গায়ের চামড়া একটা দেখবার মতো—ভাবে কান্তি, তার মাও তো কত ফরসা, মেজদির তো কথাই নেই, কিন্তু অমন চামড়া কারুর নয়। ...ঐ জন্যেই অত বড় কলঘর লাগে রতনদির—ঐ কলঘরে রতনদি আর জামাইবাবু ছাড়া কারুর যাবার হুকুম নেই। এক দিন শুধু ঢুকে দেখেছিল কান্তি। কী বড়—একেবারে একটা শোবার ঘরে মতো। এক দিকে চৌবাচ্চা,ঝাঁঝরি কল, তার মধ্যেই এক কোণে একটা চেয়ারের মতো—ঐটে নাকি পাইখানা। জলচৌকিই আছে দুটো। একটা কলের নীচেই—আর একটা শ্বেতপাথরের চৌকি, কিছু দূরে। এক ধারে তাকে সাজানো সার সার তেল সাবান—আরও কত কি, শিশিতে শিশিতে কৌটোয় কৌটোয়! একটা মানুষের এত কি লাগে চান করতে ভেবে পায় না কান্তি। তার মা-দিদিরা তো মাথার মাঝখানে একটু তেল থাবড়ে দিতে দিতে ছোটে পুকুরঘাটে। তাই মেজদির কি মেঘের মতো একঢাল চুল!...

মোক্ষদার শেষ কথাটা ভাল বুঝতে পারে না কান্তি—ওটা কি বলে গেল ? মোক্ষদাদিটা আস্ত পাগল!

॥ ৩ ॥

কিন্তু ক্রমশ একটু একটু আঁচ পায় বৈকি !

আশপাশের বাড়িগুলোও যেন কেমন কেমন। দিনের বেলা সব নিথর—চুপচাপ। রাত হলেই জেগে ওঠে। ঘরে ঘরে আলো, হাসি-তামাশা, মধ্যে মধ্যে কোন কোন বাড়ি থেকে গানবাজনাও শব্দ আসে। কিন্তু আবার সকাল হলেই ভোঁ ভোঁ, নিবান্দাপুরী। সেই রূপকথার ঘুমন্ত দেশের মতো। তা ছাড়া কোনো বাড়িতেই যেন পুরুষ নেই—থাকলে দু'একজন। পুরুষ বলতে চাকর—তাও ঝিই বেশী। তারাই বাজার করে, তারাই দোকানে যায়, সব। এক-একটা বাড়িতে বোধ হয় অনেক ঘর ভাড়াটে থাকে, এক ঝিই কিন্তু সব ভাড়াটের বাজার করে। সে এক মজার কাণ্ড, কত দিন ইস্কুল যেতে যেতে দেখেছে কান্তি, ওধারের বড় রাস্তায় কারুর রকে বসে হিসেব মিলোচ্ছে। একটা ঝি তো পেয়ে বসেছে তাকে, দেখতে পেলেই ডাকবে, 'ও খোকা শুনে যাও, নক্ষীদাদা আমার—হিসেবটা একটু বুঝ্ ক'রে দিয়ে যাওনা!' আসলে সুবার বাজার থেকেই চুরি করে—কান্তি হিসেব 'বুঝ্ করতে' গিয়েই বুঝে নিয়েছে। পাছে ওখানে গিয়ে হিসেব গোলমাল হয়ে যায় তাই রাস্তা থেকে হিসেব বুঝে চুরির পয়সা আলাদা পেট-কাপড়ে বেঁধে নেয়। যা ফেরত পয়সা হবে—তাও আলাদা নেয়, তার পর বাড়ি ফিরে সেই নতুন হিসেব বুঝিয়ে দেয়। এক-এক দিন কান্তির মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলে বলে, পয়সা এই থেকে না সরালে খাব কি বল দাদা ? পেটটা চলা চাই তো! মাইনে যা দেয় তা তো বুঝতেই পার। তা থেকে আর কত পয়সা জমে! বলি গতর যতদিন আছে ততদিনই, তার পর কি আর কেউ পুছবে, না বসিয়ে খাওয়াবে ? তখন খাব কি ? · তাই কী আর এমন হয়, এখন সব স্যায়না হয়ে গেছে। আর বাজারও তো ভারি, চার গণ্ডা পাঁচ গণ্ডা পয়সার বাজার জনাযাতের—তা থেকে দুটো পয়সা রাখতেই কষ্ট হয়!'

তবু পাড়াটায় যে কোন বিশেষ 'চিহ্ন' আছে তা কান্তি বুঝতে পারে নি অনেক দিন। একদিন হঠাৎ কী কথায় কথায় ওর ক্লাসের একটা ছেলে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'তুই কোথায় থাকিস রে কান্তি ?' কান্তি সরল ভাবেই পথটার নাম বললে। অকস্মাৎ আশেপাশে যারা ছিল—পাঁচ-ছ জন ছেলে বেশ জোরে হেসে উঠল। তার পর কেমন একটা যেন নতুন কৌতূহলে চেয়ে রইল ওর দিকে, তখনও তাদের ঠোঁটের কোণে ঈষৎ কৌতুকের হাসি!

সেইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন ওদের এক মাস্টারমশাই—ধীরেনবাবু, বিরাট গোঁফ, প্রথমটা দেখলেই ভয় করে—কিন্তু ভারি ভালমানুষ—তিনি যেন বাতাসে কি একটা অঘটন টের পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে একটা ছেলেকে প্রশ্ন করলেন, 'কী হয়েছে রে জগু ?'

জগু মুচকি হেসে বললে, 'কিছু না স্যার! এই কে কোথায় থাকে, তাই জানা

হাচ্ছল। কান্তি স্যার রামবাগানে থাকে!'

'আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে, এঁচোড়ে-পাকা ডেঁপো ছেলে সব। ফের যদি এইসব প্রাইভেট কথা নিয়ে আলোচনা শুনি তো পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নেব এক-একটার বেতের চোটে!'

তখনকার মতো সবাই চুপ ক'রে গেল—কিন্তু কান্তির পিছনে যে তাই নিয়ে আরও অনেকক্ষণ হাসাহাসি এবং গুজগুজ চলল তা কান্তি বেশ টের পেলে।

টিফিনের সময় ধীরেনবাবু ওকে এক ফাঁকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে দিলেন, 'তোমাকে যদি কেউ বাড়ির ঠিকানা-টিকানা জিজ্ঞেস করে তুমি আসল ঠিকানা বলো না।'

'কেন' সে কথাটা আর জিজ্ঞাসা করার সাহস হ'ল না কান্তির। সে কেমন ক'রে যেন বুঝল যে এর মধ্যে একটা গণ্ডগোল আছে। শুধু বলল, 'তা হলে কী বলব?'

'যা হোক ব'লো—বিডন স্ট্রীট, কি মানিকতলা স্ট্রীট, যা হয় বলো! ঠিক পথটার নাম বলো না।'

বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ ভাবল কান্তি, কথাটা রতনদিকে বলা উচিত হবে কিনা। আপনা-আপনিই মনে হ'ল ওর, হয়তো এর মধ্যে লজ্জার কোন কারণ আছে, রতনদি হয়তো দুঃখিত হবে। কিন্তু চেপেও রাখতে পারল না শেষ পর্যন্ত। সন্ধ্যাবেলা রতনদি ছাদে এসে ওকে কাছে ডেকে যখন আকাশের তারা চিনিয়ে দিচ্ছেন—তখন ভয়ে ভয়ে—সংকোচের সঙ্গে হলেও, কথাটা বলেই ফেললে।

সব শুনে রতনদির মুখটা যে ম্লান হয়ে গেল তা সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারেই টের পেলে কান্তি। মনে মনে অনুতাপের শেষ রইল না ওর। কিন্তু তখন আর উপায় কি? রতন খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে, 'মাস্টারমশাই ঠিকই বলেছেন ভাই, কেউ জিজ্ঞেস করলে তুমি বলো ঐ হেঁদোর কাছে থাকি, নিতান্ত কেউ ঠিকানা জানতে চাইলে মানিকতলা স্ট্রীটই বলো। এ পাড়াটার একটা দুর্নাম আছে ভাই। সেই জন্যেই তো তোমাকে অত দূরের ইস্কুলে ভর্তি করেছি। কাছাকাছি না থাকাই ভাল।'

কান্তি চুপ ক'রে যায়। কিসের দুর্নাম সেটা প্রশ্ন করার ইচ্ছা থাকলেও করতে পারে না। মনে মনে বোঝে যে রতনদি তাতে আরও অপ্রস্তুত হবেন।

আরও নানা কারণে কান্তির এখানটা খারাপ লাগে।

এক দিন ইস্কুল থেকে ফিরছে, দারোয়ান ডেকে বললে, 'ও খোকাবাবু, শোন—তোমার বাবা এসেছিল!'

বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল ওর। বাবা এখানে!

কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারল না—অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল ওর, শুধু বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল।

দারোয়ান যা বললে তার সরল অর্থ হচ্ছে—ওর কাছ থেকে নরেন চার আনা

পয়সা ধার নিয়ে গেছে। বলে গেছে যে, 'দিদিবাবুকে বলবার দরকার নেই, এই বাড়িতে আমার ছেলে থাকে, কান্তি—তার কাছে চাইলেই দিয়ে দেবে। বলো যে তার বাবার বিশেষ দরকার পড়েছিল, নিয়ে গেছে। মানে আত্মীয়ের মধ্যেই তো—মিছিমিছি এই সামান্য কটা পয়সার জন্যে তোমাদের কর্তাবাবু কি দিদিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই না।'

শুনে পাথর হয়ে গেল কান্তি। মুহূর্তে ঘেমে উঠল সে। বয়স যতই কম হোক—এর মধ্যে যে অপমানটা আছে তা বোঝবার শক্তি ওর হয়েছে। খানিকটা আমতা আমতা ক'রে বললে, 'কিন্তু আমি তো—আমার কাছে তো কিছুই পয়সা নেই দারোয়ানজী, আমার কাছে তো থাকে না!'

প্রায় কেঁদে ফেলবার মতো অবস্থা তার।

দারোয়ান নিমেষে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললে, 'আচ্ছা আচ্ছা, তার জন্যে কিছু নয়। এ আমি দিদিবাবুকে বলতেও যাচ্ছি না। কটা বা পয়সা, দিলাম না হয় বাহ্মনকে! তুমি ভেবো না, যাও। যখন তুমি লিখাপাঢ় করবে, দফ্‌তরে নোক্‌রি করবে, তখন আমাকে গোটা এক টাকা দিয়ে দিও, কেমন?'

সে পিঠ চাপড়ে ভেতরের দিকে ঠেলে দিলে কান্তিকে।

অতিকষ্টে চোখের জল সামলে কান্তি শুধু বললে, 'কিন্তু আর কোন দিন এমনি দিও না দারোয়ানজী!'

'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে!'

নিজের বাবার সম্বন্ধে এমন কথা বলা আরও লজ্জার, তবু না বলাও অনুচিত, এটা মনে মনে বোঝে কান্তি।··প্রকৃতিই কতকগুলো শিক্ষা দিয়ে দেয় মানুষকে।···তার জন্যে বেশী জ্ঞান-বুদ্ধির দরকার হয় না।

কিন্তু নরেন অত সহজে ছাড়ে না। আর এক দিন ইস্কুলে যাবার মুখে বড় রাস্তার মোড়টাতে দেখা।

এই যে—ভাল হয়েছে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে—দে দিকি গণ্ডা-চারেক পয়সা।'

আজও যেন চোখে জল এসে যায় কান্তির, রাগে, দুঃখে, অপমানে—মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে ওর। তবু অতি কষ্টে নিজেকে সংযত ক'রে বলে, 'আমার কাছে তো পয়সা থাকে না! পয়সা আমি পাব কোথায়?'

'সে কি রে? অত বড়লোকের বাড়ি থাকিস, হাতে পয়সা নেই? জলখাবারের পয়সা দেয় না?'

'না। সঙ্গে জলখাবার দিত—অত ছেলের সামনে খেতে লজ্জা করে বলে নিয়ে যাই না। তার পর পয়সা দিতে এসেছিল, আমি নিই নি। ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে দুপুরের ভাত থাকে—খাই। আমার জলখাবার দরকারই হয় না—অতবার খাওয়া তো আমার অব্যেস নেই!'

'হুঁ। তা এদিক-ওদিক হাতাতে পারিস না কিছু? তবে আর ওখানে পড়ে থাকবার মানে কি?···ওখানে তো পয়সা গড়াগড়ি যায় শুনেছি!'

'যাক গে! আমি' কি চোর নাকি?'

দুঃসহ রাগে সাহস বাড়ে কান্তির, আবারও বলে, 'আপনি খবরদার ওখানে আর যাবেন না—অমন ক'রে চাকর-বাকরের কাছে পয়সা ভিক্ষে করেন কেন ? আমি বারণ ক'রে দিয়েছি, এবার আর চাইলেও পাবেন না !'

'আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে ! কস্‌বী-বাড়ির ভাত খেয়ে খুব ট্যাকটেঁকে কথা শিখেছেন—লেখাপড়া কত হোক না হোক ! চড়িয়ে গাল লাল ক'রে দেব একেবারে, আমাকে তো চেনো না !'

কিন্তু কান্তি আর ভয় পায় না। আশেপাশে লোক জমে যাচ্ছিল তাইতেই যা লজ্জা।

সে প্রায় মরীয়া হয়ে বলে ফেলে, 'ফের যদি আপনি কোনদিন ওখানে যান—আমি মা আর দাদাকে বলে দেব। দাদা কলকাতাতেই থাকে।'

নরেনের রুষ্ট ভাব নিমেষে বদলে যায়, 'ও কলকাতাতেই থাকে বুঝি ?···

'চাকরি হয়েছে তা হলে ? কোথায় থাকে রে ? আপিসটা কোথায় ?'

'জানি না।' বলে কান্তি হন হন ক'রে এগিয়ে যায়।

যেতে যেতেই শোনে, পিছনে দাঁড়িয়ে তার বাবা দাঁত কিড়মিড় ক'রে বলছে, 'উঃ, কলের জল আর বালামচাল পেটে পড়ে বড্ড তেল হয়েছে ! তেল বার করছি ! গোরবেটার জাতকে যেদিন ধরব, সেদিন একেবারে শেষ ক'রে দোব·· আমাকে তো চেনো না !'

দাদাকে বলে দেবার ভয় দেখালেও শেষ পর্যন্ত কে জানে কেন, বলতে পারে না। এর পরে যেদিন হেম ওর সঙ্গে দেখা করতে এল, মাঝে মাঝে আসে আজকাল, শুধু বললে, 'আমার কি অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা হয় না দাদা ? এখানে—এখানে আমার ভাল লাগে না থাকতে। এরা অবিশ্যি যত্ন করে খুবই, কিন্তু তবু—কেমন যেন—'

হেম কি বুঝলে কে জানে, হয়তো কোন অপ্রিয় কথা শোনাবার ভয়েই কিছু প্রশ্ন করলে না, খুব যত্ন করা সত্ত্বেও কেন ভাল লাগছে না সেটা জানতে চাইলে না। শুধু বললে, 'কী আর উপায়, দেখছি না তো। আমার যা মাইনে—তাতে তো কিছুই হয় না। মাসীর ওখানেও আর থাকার উপায় নেই। আর কিছু দিন কাদায় গুণ ফেলে থাক—একটা পাকা চাকরি-বাকরি না হলে কোথায় নিয়ে যাব বল্ !'

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

হেম মুখে যাই বলুক, এ চাকরি ওর খুব ভাল লাগছে—মাইনে অবশ্য খুবই কম। আলাদা মেসে থাকতে হলে মাকে আর কিছু পাঠাতে পারত না। নিহাত বড় মাসীর কাছে আছে তাই। মাসে পাঁচ-ছ টাকা দিলেই চলে যায়। মাসী কিছু নিতে চান না—শ্যামারও ইচ্ছে নয় যে ওখানে কিছু খোরাকি দেয় হেম—উমা

রোজগার করছে, বলতে নেই গোবিন্দও যা হয় আনছে—আবার ওখানে দ্ব্যে দেবার দরকার কি? কিন্তু হেমের লজ্জা করে বড্ড; এদের অবস্থা তো নিজেই দেখছে। গোবিন্দর বিয়ে হবার পর আর একটা ঘর ওদের নিতে হয়েছে। সেও খুপরির মতো, তবু দুটো ঘর মিলিয়ে আট টাকা ভাড়া। তাও ওঁরা সুবিধেই ক'রে দিয়েছেন বলতে হবে। বাড়িওয়ালা খুব একটা লোক খারাপ নয়। হেমকে ওঁরা রাত্রে ওঁদের বৈঠকখানা ঘরে শোবার অনুমতি দিয়েছেন। তার জন্য কিছু নেন না। অবশ্য ওঁদের জামাই-টামাই এলে ছেড়ে দিতে হয়। তখন ভেতরের রকে শোয়। যাই হোক—কিছু না দিয়ে খাওয়া সম্ভব নয়। আয় এবং ব্যয় দুটোই চোখের ওপর দেখছে। মাছ আসে কদাচিৎ কখনো। ডাল, বড়াবড়ি আর পোস্ত-চচ্চড়ি এই তো ভরসা। দেওয়া-নেওয়া দুই-ই লজ্জার ব্যাপার বলে হেম নগদ টাকা হাতে ক'রে দেয় না, পয়সা-কড়ি এলে একদিন বড়বাজার গিয়ে পাইকিরী দরে কিছু কিছু ডাল-মশলা-পোস্ত এনে দেয়। কুলোলে কোন মাসে এক-আধ সের ভাদুয়া ঘিও নিয়ে আসে। কমলা আপত্তি করে মুখে, কিন্তু খুশীই হয়।

পয়সা-কড়ি এলে কথাটার অর্থ আছে বৈকি!

মাইনে তো ঐ সামান্য—তাও সবটা একসঙ্গে পাওয়া যায় না। কেশিয়ার-ম্যানেজারবাবুর কাছে (দুই-ই এক ব্যক্তি) গিয়ে মাথা চুলকে দাঁড়াতে হয়, 'কিছু খরচা দেবেন?' হেম গোড়াতে অবাক হয়ে গিয়েছিল, হকের পাওনা—তার আবার 'খরচা' কি? কিন্তু এখানের নাকি এ-ই চাল। কোন দিন ম্যানেজারবাবু সে খরচা দেন, কোন দিন দেন না। দিলেও চার-পাঁচ টাকার বেশি একসঙ্গে পাওয়ার উপায় নেই। ফলে সে টাকাতে আয় দেয় না। তবু ওরই মধ্যে যা পারে—সাত-আট টাকার বেশী হয়ে ওঠে না প্রায় কোন মাসেই—একদিন গিয়ে মাকে দিয়ে আসে। মা ফি-বারই গজগজ করে—কিন্তু সে গজগজানি গায়ে মাখতে গেলে হেমের চলে না।

শ্যামা শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে নিজের বাড়িতেই চলে এসেছে। আধ সের চাল বাঁচাতে গিয়ে এ বাগানের ফসল যাবে—হয়তো দরজা-জানলাই কে খুলে নিয়ে যাবে। তা ছাড়া ওখানে বাস করার লাঞ্ছনাও যেন আর সহ্য হচ্ছিল না। ফলে কিন্তু কষ্টের সীমা নেই। নিত্য-সেবার চাল দুধ বন্ধ, এদিকেও হেম যজমানি ক'রে যা দু-চার পয়সা আনত, তাও আসে না। আয় বলতে তো হেমের ঐ ক-টা টাকাই। আনাজপাতি অবশ্য কিছুই কিনতে হয় না। অভাব এক আলুর—তা হেম কলকাতা থেকে নিয়ে এলে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রাখে—এক আধটা ক'রে খরচ করে। নারকেল-সুপুরি থেকে কিছু আয় হয়—এ ছাড়া পেঁপে আছে কলা আছে। হেম এখন মধ্যে মধ্যে যাওয়া-আসা করায় কিছু সুবিধা হয়েছে। বড় বড় নারকেল আর পেঁপে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয় শ্যামা। এখানে নারকেল বাইশ টাকা হাজার। কলকাতার বাজারে অনেক বেশী দাম মেলে। তাও এখন আর হেমকে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতে হয় না। উমা ওদের অবস্থা বুঝে সে ভার নিজের হাতে নিয়েছে। প্রথম কথায় কথায় ছাত্রীদের বাড়ি কথাটা

পেড়েছিল—তাঁরা সাগ্রহে নিতে চান অনেকেই। ফলে এখন সব বোঝাটাই তার ঘাড়ে চেপেছে অবশ্য, কিন্তু সত্যিই দামে অনেক তফাত হয়। বড় বড় নারকেল শ্যামার বাগানের—এক-একটা পাঁচ-ছ পয়সা দরে বিক্রী করে উমা। এমন কি খুব বড়গুলো দু আনা পর্যন্ত দাম ওঠে। পেঁপের তো কথাই নেই, দু আনা দশ পয়সায় এক-একটা বিক্রী হয়। হয়তো বাজারের থেকে দাম কিছু বেশীই পড়ে, তবু তাঁরা পছন্দমত জিনিস দেখে তাতে আপত্তি করেন না। সাত-আট দিন অন্তর হেম যেদিন বাড়ি যায়—এক-একবার দু টাকা আড়াই টাকা পর্যন্ত জমে যায়। তবে ফেরার সময় তেমনি বোঝা বইতে হয়। ইদানীং শ্যামা লোভ পেয়ে কলার কাঁদিও চালান করতে শুরু করেছে। বড় বড় কালী-বৌ ওদের, যে খাবে সে ভুলতে পারবে না, এ জোর তার মনে আছে। যেমন বড়, তেমনি মোলায়েম আর তেমনি মিষ্টি।

তবু অভাবও তো কম নয়। এখন ঐন্দ্রিলা আর তার মেয়ে এসে ঢুকেছে, তরু আছে, একটা রুগ্ন বাচ্চা ছেলে আছে। বাজার না করুক, চাল তেল নুন তো কিনতেই হয়। হপ্তায় পাঁচ ছটাকের বেশী তেল কেনে না শ্যামা ঠিকই—কিন্তু মাথায় দেবার এক ছটাক নারকেল তেল কিনতে হয়। এ ছাড়া একটু-আধটু গুড় আছে, লঙ্কা ফোড়ন আছে—কাপড়-গামছা তো আছেই। বাড়ির চৌকিদারি, সেস্ এগুলোও না দিলে নয়। প্রাণপণ কার্পণ্য ক'রেও শ্যামা পারত না—যদি না অভয়পদ কিছু কিছু সাহায্য করত। কেরোসিন তেল তো তার ওপর দিয়েই চলে, এটা নাকি সে অফিস থেকে পায়। এ ছাড়া মাসকাবারী ডাল-মশলাও কিছু কিছু দিয়ে যায়। ওদের নিজেদের জিনিস যখন কেনে—তখনই এদের জন্যে খানিক খানিক সরিয়ে রাখে। আগে এদের বাড়িতে সে পুঁটুলিটা ফেলে দিয়ে নিজের বাড়িতে যায়।

এ দেওয়ার কথা অভয়পদ কাউকেই বলে না অবশ্য। সে নিজে ছাড়া এ ইতিহাস কেউ জানতে পারে না—এমন কি মহাশ্বেতাও নয়। তেমন দেখলে কোন কোন দিন একখানা বা এক জোড়া কাপড় কি গামছাও দিয়ে যায়। কিছুই বলে না, হাতে ক'রে এসে বসে, অন্য কথা বলে, যাবার সময় ফেলে রেখে চলে যায়। শ্যামাও প্রশ্ন করে না। জামাইয়ের কাছ থেকে হাত পেতে নেবার লজ্জা এখনও তার আছে—সেটা জামাইও জানে, তাই কোন কথা না বলেই শুধু রেখে যায়। যেদিন ডাল মশলা কি কেরোসিন তেল নিয়ে আসে সেদিনও এসে তরুর খোঁজ করে—'কৈ গো ছোড়দি কোথায় গেলে, এগুলো তুলে রাখো।' কিংবা বলে, 'এগুলো আজড়ে নাও গো ছোড়দি, ঝাড়নে আমার কাজ আছে।' কোন দিন এ কথা শাশুড়ীকে বলে না।

তবু—এও এক রকম ভিক্ষা বৈকি!

জামাইয়ের কাছে সাহায্য নেওয়া—পরের কাছ থেকে নেওয়ার চেয়ে ঢের বেশি লজ্জার। জামাই পারতপক্ষে কাউকে জানতে দেয় না সত্যি—কিন্তু লজ্জা তো তার কাছেই।

হেম তা বোঝে। তার যে উঠে-পড়ে লেগে একটা ভাল চাকরি, অন্তত বাঁধা মাইনের কাজ একটা যোগাড় করে নেওয়া দরকার—তা বাড়ি গেলে প্রত্যেকবারই অনুভব করে। মনে মনে সেজন্য লজ্জা ও আত্মগ্লানিরও শেষ থাকে না। কিন্তু এখানে এলেই সে সব যেন চাপা পড়ে যায়, আর যেন কোন উদ্যম থাকে না।

এ কি শুধুই আলস্য, শুধুই উদ্যমহীনতা ?

নিজেকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পেত হেম যে এর মূলেআছে এই নতুন—তার কাছে একেবারে অপরিচিত—এই জগৎ, এই থিয়েটারটা।

অনাবিষ্কৃত জগতে প্রথম পদক্ষেপের মতোই সে দিশাহারা, রোমাঞ্চিত, বিস্ময়-বিহ্বল!

সত্যিই এ একটা আলাদা জগৎ।

মনে আছে ওদের হেড্ গেট-কীপার এবং সাট ও পাট লেখকও* বটেন—(হাতের লেখা ভাল বলে) দক্ষিণাবাবু প্রথম দিনই বলেছিলেন, 'দূর থেকে যা ভাব ছোকরা—তা নয়। দুটো দিন ভেতরে থেকে দ্যাখো, রস ছুটে যাবে, ঘেন্না হয়ে যাবে একেবারে।'

তার পরই নিভে-আসা বিড়িতে একটা শেষ টান দিয়ে বলেছিলেন, 'তবে ছাড়াও পাবে না বাবা—এ চিটে গুড়ের আটা, পাখা জড়িয়ে যাবে, নট্ নড়ন নট্ চড়ন নট্ কিচ্ছু!'

কথাটা মিথ্যে নয়। রস ছুটে, স্বপ্ন ভেঙে ঘেন্না হয়ে যাবারই কথা—তবু যেন কোথায় একটা টান থাকে, একটা মোহ থেকেই যায় শেষ পর্যন্ত!

সে তো নতুন, বয়সেও কাঁচা, তার মোহ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু দক্ষিণাবাবুর বহুদিন কাটল এখানে, বয়সেও ওর চেয়ে ঢের বড়—তবু তিনি মুক্তি পান কৈ ? সত্যিই যেন তাঁর পাখা আটকে গেছে এখানের চিটেগুড়ে।

বিচিত্র লোক দক্ষিণাবাবু।

বাড়ীতে স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়েও আছে চার-পাঁচটি। তাদের খরচ চালাতে পারেন না। নিহাত একান্নবর্তী সংসার বলেই তারা বেঁচে আছে, এবং ছেলে-মেয়েগুলোও কোনমতে লেখাপড়া করছে কিছু কিছু। তাদের কথা যে চিন্তা করেন না দক্ষিণাবাবু তাও নয়। কিন্তু তবু অন্য কোন চাকরি খোঁজা বা অপর কোন উপার্জনের পথ ধরার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না।

অথচ এখানে পা দিলে পুরুষের যেটা সর্বাগ্রে হবার কথা সে দোষ অর্থাৎ চরিত্র-দোষ তাঁর নেই। মেয়েরা—থিয়েটারে যারা সখী সাজে, যাদের 'সখীরা' বা 'ছুঁড়ীরা' বলে উল্লেখ করা হয় সাধারণত—তারা সবাই ওঁকে দাদা বলে—আর বড়

* মুদ্রিত নাটক ও অভিনীত নাটকে অনেক রকম তফাত থাকে। নাট্য-অধিকর্তার মর্জি ও প্রয়োজন-মাফিক ছাঁটকাট অদল-বদল হয় প্রায়ই। শেষ পর্যন্ত যেমনটি দাঁড়ায়—প্রম্পট্ করার সুবিধার জন্য খাতায় লিখে নেওয়া হয় বড় বড় হরফে—তাকেই বলে সাট।

অভিনেত্রীদের উনি দিদি বলেন—পদবী এবং বয়স নির্বিশেষে। সখীদের 'তুই-তোকারি' করেন, ধমক দেন যখন-তখন, মধ্যে মধ্যে আদি-রস-ঘেঁষা রসিকতা করতেও ছাড়েন না—আবার সাধ্যমত উপকারও করেন, যার যা প্রয়োজন হয়, ওঁর নিজের শ্বারা যতটুকু সম্ভব, ক'রে দেন। আর বড় অভিনেত্রীদের ফাই-ফরমাশ যেন দক্ষিণাবাবুর জন্যেই তোলা থাকে, যার যত কিছু বেগার দেওয়া দরকার, সবই তিনি। তার ফলে তাঁরাও স্নেহের চোখে দেখেন।

কিন্তু এ স্নেহ বা প্রীতিতে পেট ভরে না! মাইনে তো বাড়েই না—নিয়মিতও পাওয়া যায় না। যখন কিছু আদায় হয় তখন বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসেন। নেশায়-টেশায় বিশেষ অপব্যয় নেই, সেটা যতটুকু পরের ঘাড়ে চলে ততটুকুই। যখন এমন হয় যে দশ-বারো দিনের মধ্যেও কিছু আদায় হ'ল না, তখন লজ্জায় গা ঢাকা দেন ভদ্রলোক—অর্থাৎ বাড়িতে যান না। থিয়েটারেই কাটান—কিংবা কোন মেয়ের বাড়ি কোন বাড়তি জায়গা থাকলে—অথবা কারুর কোন দিন 'বাবু' না আসার কথা থাকলে—তার বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকেন। খাওয়াও ঐভাবে চলে। মেয়েরা এমনিই এটা-ওটা বাড়ি থেকে নিয়ে আসে, সারারাত অভিনয় থাকলে এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা তো থাকেই।

মেয়েদের বাড়ি, এমন কি—দক্ষিণাবাবু দিব্যি গেলে বলেছেন—তাদের সঙ্গে এক ঘরেও শুয়েছেন, কিন্তু চরিত্রদোষ যাকে বলে তা তাঁর ঘটে নি।

'মাইরি বলছি তোকে, তুই বামুনের ছেলে, তোর গা ছুঁয়ে বলছি, পৈতে ছুঁয়েও বলতে পারি—পিরবিত্তি হয় না। দাদা বলে ডাকে, ভক্তিছেদ্দা করে, বিশ্বাস করে—ওদের মায়েরাও ভরসা ক'রে এক ঘরে ছেড়ে দেয়—সেখানে সে বিশ্বাসটা নষ্ট করা কি ঠিক! না ভাই, ও কাজ কোনদিন করিনি, হলপ ক'রে বলছি!'

এক-একবার এই গা-ঢাকা দেওয়ার সময়টা যখন লম্বা হয়ে পড়ে তখন ওঁর স্ত্রী ধৈর্য হারান। ছেলেকে সঙ্গে ক'রে থিয়েটারে হানা দেন। ভেতরে আসেন না অবশ্য—ওধারের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছেলেকে দিয়ে ডাকতে পাঠান, তারপর শুরু হয় জবাবদিহির পালা। দক্ষিণাবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে গিয়ে দাঁড়ান—বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে আসেন অনেক কষ্টে। সে লজ্জাও বড় কম নয়, স্ত্রী-পুরুষের চেঁচামেচিতে এক-একদিন রাস্তায় লোক জড়ো হয়ে যায়। থিয়েটার সুদ্ধ লোক এ ইতিহাস জানে, অনেকেই বুঝিয়ে বলে, কেউ কেউ টিটকিরিও দেয় তবু দক্ষিণা-বাবু এ চাকরি ছাড়তে পারেন না। ওঁর এই দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে কর্তারা ভূতের মতো খাটিয়ে নেন, যখন বাড়ি যান না, তখন সারা দুপুর ধরে একা বসে বসে সাট লেখেন—এটা তাঁর করার কথা নয়, অন্তত ঐ মাইনেয়, তা দক্ষিণাবাবু জানেন, অবিচারটা অনুভব করেন—তবুও ছাড়তে পারেন না। জায়গাটা ভূতের মতোই পেয়ে বসেছে ওঁকে। মাঝে মাঝে বলেন, 'জানিস —উপরি উপরি দু'দিন এখানের এই ভ্যাপ্‌সা গন্ধটা নাকে না গেলে হাঁপিয়ে উঠি। ভূতেই পেয়েছে বোধ হয়। নইলে এমন হয়!'

হেমেরও এক এক সময় ভয় হয়—তাকেও কি এই থিয়েটারের 'ভূতে পাচ্ছে নাকি? তখনই প্রতিজ্ঞা করে যে এবার উঠে পড়ে লাগবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর উদ্যম থাকে না। মনকে প্রবোধ দেয়, 'অনেক দিন তো টো টো ক'রে ঘুরলুম। ঘুরলেই কি কাজ হয়!···ভেতরে লোক থাকা চাই। দেখি—!'

সে দেখাটা যে কোথায় এবং কী ভাবে হবে তাও জানে না।

॥ ২ ॥

দক্ষিণাবাবুর ভেতরে যতই দহরম মহরম থাক—হেমের ভেতরে যাওয়ার বিশেষ সুযোগ ছিল না। মাঝে মাঝে এক-আধটা ছোটখাটো ফাইফরমাশের কাজে ভেতরে গেছে, দু-একটা কথা যে দু'একজনের সঙ্গে না হয়েছে তাও নয়—কিন্তু তাকে পরিচয় বলে না।

এক দিন হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গেল।

সেটা থিয়েটারের দিন নয়। অর্থাৎ সেদিন কোন অভিনয় ছিল না।

হেম এমনিই এসেছিল, মাইনের তাগাদায়। ম্যানেজার বাবুর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে- মেজাজ বুঝে ভেতরে ঢুকবে বলে—হঠাৎ স্বয়ং মনিব বেরিয়ে এলেন তাঁর ঘর থেকে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সম্ভবত যাদের খুঁজছিলেন তাদের কাউকে দেখতে না পেয়ে ফিরেই যাচ্ছিলেন, হঠাৎ নজর পড়ল হেমের দিকে।

'এই ছোকরা শোন—এদিকে এস একবার! বলে ইঙ্গিতে ডাকলেন রমণীবাবু।

হেমের বুক দুর দুর ক'রে উঠল। মনিবকে এখানে সকলেই ভয় করে, অকারণেই করে—সেই সঙ্গে হেমও। রাশভারী চেহারা ও গম্ভীর গলা। যদিও শুনেছে সে যে রমণীবাবু লোক খুব খারাপ নন, বরং কর্মচারীরা বিপদে আপদে পড়লে যথাসাধ্য সাহায্যই করেন—তবু বাইরেটা এমন রুক্ষ ও কর্কশ যে ওঁর মুখের দিকে চাইলে কিংবা গম্ভীর গলার আওয়াজ কানে গেলেই বুক শুকিয়ে ওঠে।

আজও তার ব্যতিক্রম হ'ল না—তবে ওরই মধ্যে আড়ে একবার তাকিয়ে দেখে নিলে যে যদিও ভ্রূকুঞ্চিত, মুখভাব রুষ্ট নয়।

ঘরে গিয়ে নিজের চৌকিতে বসে বললেন, 'শোন, কী যেন নাম তোমার, হেম না? একটা কাজ করতে পারবে?'

পারবে! মনিবের মুখে এ কী কথা! হেম একটু অবাকই হয়ে গেল।

ওঁর নাম হুকুম—তাদের নাম তামিল - কতকটা তো এই অবস্থা। তবে?

প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে সে।

'এমন কিছু নয়, দারোয়ান দিয়েই হয় কিন্তু ব্যাটারা যে কোথায় সব তা জানি না—'

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন আবার। কেমন যেন সংকোচ।

তার পর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'এক জায়গায় একটা চিঠি পেঁছে দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু খুব সাবধান, কাউকে বলবে না কি গল্প করবে না। যদি আমার কানে যায় কখনও যে কাউকে বলেছ—সেই দিনই তোমার চাকরিতে

জবাব হয়ে যাবে—মনে থাকে যেন।'

এবার চোখ ফিরিয়ে ওর দিকে কতকটা কটকট ক'রেই চেয়ে রইলেন খানিকটা। তার পর আবার বললেন, 'কম্বুলেটোলা জান? শ্যামবাজারের কাছে? ঐখানে একটা বাড়িতে চিঠি পোঁছে দিয়ে আসতে হবে। নাম ঠিকানা সব লেখা আছে। রাস্তার ওপরই বাড়ি, খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না। দিয়েই চলে এস। যাও··· দাঁড়াও—এই নাও, দু গণ্ডা পয়সা, বরং ট্রামেই যেও না হয়। এখানে কাজ ছিল কিছু?'

তিনি পাশের হাতবাক্স খুলে খুচরো পয়সা বার করতে করতে প্রশ্ন করলেন।

'না, এমন কিছু নয়।'

হাত বাড়িয়ে চিঠি আর পয়সা নিয়ে সে বলতে গেলে ছুটেই বাইরে বেরিয়ে এল। ট্রামে সে চড়বে না এ তো জানা কথাই—সুতরাং একটু জোরে হাঁটতে হবে বৈকি!

বাইরে এসে খামটার নাম-ঠিকানায় নজর পড়ল। নলিনীবালা দাসী।

নলিনীবালা! ওদেরই তো অভিনেত্রী একজন। খুব একটা উঁচুদরের নয়—তবে বয়স কম, দেখতে-শুনতেও ভাল।

হেমের একটা কথা মনে পড়ে যায়। হঠাৎ কিছু দিন আগেই কথাটা উঠেছিল—এই নলিনীরই অভিনয় দেখতে দেখতে একদিন ও হঠাৎ সত্য বলে আর এক গেটকীপারকে বলে ফেলেছিল, 'আচ্ছা', এত বড় পার্টটা হরিভূষণবাবু একে দিয়েছেন কেন বল্ তো, এটা নয়নতারাকে দেওয়াই উচিত ছিল!' তার জবাবে সত্য ওর হাতে একটা চিমটি কেটে বলেছিল, 'চুপ কর—শুনতে পেলে চাকরি থাকবে না তোর!'

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিল হেম, 'কেন বল্ তো—ব্যাপার কি?'

'তুই যেমন উজবুগ! বাবুর গিন্নী বদল হয়েছে জানিস না? নইলে ঐ পার্ট ও পায়! ওটা আসলে নয়নতারারই পার্ট!'

'তার মানে?' কিছুই বুঝতে পারে নি হেম তখনও। কিন্তু কথাটা সেইখানেই বন্ধ করতে হয়েছিল। পাশেই ছিলেন দক্ষিণাবাবু, প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠেছিলেন সত্যকে।

আজ কথাটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

আরও আগেই হওয়া উচিত ছিল—এখন হেমের মনে হয়। কারণ আর একটা কথাও মনে পড়ে যায় ওর।

সব মেয়ে যে গাড়িতে যাতায়াত করে—নলিনী তাতে করে না। নলিনীর জন্যে খোদ বাবুর গাড়ি পাঠানো হয়।···এটা তো কত দিনই লক্ষ্য করেছে ও—অর্থটা বোঝা উচিত ছিল।

যত অল্প দিনই এ জগতে আসুক সে—এর অর্থ না বোঝার কথা নয়। অভিনেত্রীদের প্রায় সকলেরই 'বাবু' আছেন এক-একজন। নলিনীর বাবু তা হলে স্বয়ং কর্তাই!

॥ ৬ ॥

বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হেম একটু ইতস্তত করল। ওর কপালটা একটু ঘেমেও উঠল সামান্য। এর আগে সে এ ধরনের বাড়িতে কখনও আসে নি— অবশ্য এ ধরনটা যে ঠিক কি সে সম্বন্ধেও ওর স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না—তবু নম্বরটা মিলিয়ে পাবার পর বুকটা একটু ছাঁৎ ক'রেই উঠল।

তবে পাড়াটা খারাপ নয়, রতনের বাড়ি যাতায়াতের সময় সে অঞ্চল দিয়ে যেতে হয়, সে রকমও নয়। বেশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রপাড়া বলেই মনে হ'ল ওর। আর বাড়িটাও আশপাশের বাড়ির মতোই—এমন একটা অসাধারণ কিছু নয়। শান্ত নিস্তব্ধ। বরং রাস্তার দিকের দোর-জানালা বেশির ভাগই বন্ধ।

খানিকটা এদিক ওদিক তাকিয়ে হেম বোধ করি একটু বলসঞ্চয় ক'রেই নিলে মনে মনে। তার পর পকেট থেকে ময়লা রুমালটা বার ক'রে কপাল ও গলার ঘাম মুছে নিয়ে—এক রকম মরীয়া হয়েই কড়া নাড়ল দরজার।

দরজা খুলল হিন্দুস্থানী বেহারা গোছের একজন লোক।

ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'কী চাই আপনার?'

'এ বাড়িতে—এ বাড়িতে নলিনীবালা দাসী বলে কেউ থাকেন?'

যেটুকু ভরসা সে এনেছিল মনে মনে, ওর প্রশ্ন করার ধরনে সেটুকু লোপ পেতে বসেছে তখন।

'হ্যাঁ—থাকেন। কী দরকার তাঁকে?'

'এই—মানে তাঁর নামে একটা চিঠি আছে!'

'কে রে গিরিধারী?' এইবার ওপর থেকে নারীকণ্ঠে প্রশ্ন হয়।

'কে একজন আপনার নামে চিঠি এনেছে দিদিবাবু।'

'আমার নামে চিঠি? কে দিয়েছে?' সেই ভাবেই প্রশ্ন হ'ল।

গিরিধারী জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইল হেমের দিকে।

'বল যে আমাদের বাবু, বড়বাবু দিয়েছেন। রমণীবাবু।'

কিন্তু গিরিধারীকে কিছু বলতে হ'ল না। ওপর থেকেই বোধ করি কথাটা শোনা গিয়েছিল—এবার সে মেয়েটি তরতর ক'রে নেমে এল।

'কে রে গিরিধারী—থিয়েটার থেকে কেউ এসেছে বুঝি? ওমা আপনি! আপনি চিঠি এনেছেন? কি হবে!…কেন শিউরতন কোথা গেল? আমাদের দারোয়ান?'

হেম আরও ঘেমে উঠেছে ততক্ষণে। মাটির দিকে চোখ রেখে জবাব দিল, 'ওরা কেউ ছিল না—তাই বাবু বললেন—আমাকেই দিয়ে যেতে।'

'তা বেশ ভালই হয়েছে। তবু তো আপনার পায়ের ধুলো পড়ল। আসুন আসুন, ওপরে আসুন।'

'আর ওপরে—মানে এই চিঠিটাই দেওয়ার দরকার ছিল তো…আমি বরং এখন

যাই। এই যে চিঠিটা—'

'ওমা, সে কখনও হয়! কখনও তো আসেন না—কোন দিন। আজ প্রথম দিনটা এলেন—এমনি এমনি চলে যাবেন! আসুন আসুন—একটুখানি অন্তত বসে যান!'

হেমের গলা শুকিয়ে উঠেছে। পা দুটো ওর কাঁপছে বুঝি।

'না—মানে বাবু হয়তো ভাবছেন। ফিরে গিয়ে খবরটা দিতে হবে কিনা।'

'আচ্ছা আচ্ছা সে হবে। আপনি আসুন তো। একটুখানি বসে গেলে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আপনি অত সংকোচ করছেন কেন—আমরা এক জায়গায় কাজ করি—বন্ধু হলুম তো সম্পর্কে, আপনিও তো ওখানে কাজ করেন—আমি আপনাকে দেখেই চিনেছি। এই গিরিধারী—একটা মিষ্টি জল নিয়ে আয় তো ঠাকুরের দোকান থেকে।'

অগত্যা হেমকে ভেতরে ঢুকতে হ'ল, নলিনীর পিছনে পিছনে ওপরেও যেতে হ'ল!

বাইরে থেকে যতটা নির্জন মনে হয়েছিল বাড়িটা—দেখা গেল ঠিক ততটা জনহীন নয়। নিচের সব ঘরেই লোক আছে। আর তার অধিকাংশই মেয়ে। মেয়েরা কেউ কেউ ওদের কথাবার্তার শব্দে বেরিয়ে এসেছিল, তারা নীরব কৌতূহলে তাকিয়ে দেখতে লাগল হেমকে—সেটা মাথা না তুলেই বেশ বুঝতে পারল সে। ফলে আরও যেন রাজ্যের লজ্জা তাকে পেয়ে বসল। সিঁড়ি দিয়ে যখন সে ওপরে উঠছে তখন পা দুটো তার যেন আর স্ববশে নেই, প্রতিমুহূর্তেই মনে হচ্ছে পড়ে যাবে সে হুমড়ি খেয়ে।

ওপরের যে ঘরে হেমকে নিয়ে গিয়ে বসাল নলিনী—সে ঘরটা বেশ প্রশস্ত। রাস্তার দিকে সবটা জুড়ে টানা ঘর একটা। একপাশে প্রকাণ্ড বড় পালঙ্কে পুরু-গদির বিছানা। এছাড়া মেঝেতেও একটা বিছানা পাতা আছে—ওপরের বিছানার চেয়েও এটা বড়। অত পুরু না হলেও, এর তলাতেও গদি আছে। এ বিছানায় মাথার বালিশ বা পাশবালিশ নেই···শুধুই চারদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আটটা তাকিয়া সাজানো।

নলিনী ওকে সেই বিছানাটার কাছেই নিয়ে এল, বলল, 'বসুন ভাল হয়ে। আমি আসছি।'

কিন্তু সে বিছানার দিকে তাকিয়ে হেমের সংকোচের অবধি রইল না। ফরসা ধপ্ ধপ্ করছে বিছানা—বকের পালকের মতো। সে ওখানে বসবে কি? ক্ষারে কাচা লাল্চে কাপড়-জামা তার, জুতোটা ফুটো হওয়ার ফলে পথের ধুলো জমেছে আঙুলের খাঁজে খাঁজে। বিছানাটাই হয়তো শেষ পর্যন্ত ময়লা হয়ে যাবে। তখন মুখে কিছু না বললেও মনে মনে নিশ্চয় রাগ করবে—হয়তো কটূক্তিও করবে। হয়তো—

আরও অনেক সম্ভাবনাই মনে হ'ল। এর আগে নিজের বেশভূষার দীনতার জন্য এত লজ্জা আর কখনও অনুভব করে নি। ওর মনে হতে লাগল, দরিদ্রী

দ্বিধা হয়তো সে সীতাদেবীর মতো তাতে প্রবেশ ক'রে বেঁচে যায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে—একটা কাচের প্লাসে লেমোনেড নিয়ে আবার ঘরে ঢুকল নলিনী।

'ওমা কি হবে, আপনি এখনও ঠায় দাঁড়িয়েই আছেন? বসুন, বসুন! বেটাছেলের এত লজ্জা কি? না, না—মাটিতে নয়। ছিঃ, মেজেয় কি বসতে আছে? বিছানাতেই বসুন ভাল হয়ে—'

অগত্যা হেমকে বসতে হয়—তবু সে ভরসা ক'রে পুরোপুরি বিছানায় বসতে পারে না। দেহের বেশির ভাগই মেঝেতে রেখে কোনমতে বিছানাটা ছুঁয়ে বসে শুধু।

প্রথমটা মনে হ'ল—বসবার সময়—নলিনী বুঝি ওর হাতটা ধরে জোর ক'রেই বিছানাতে বসিয়ে দেবে, নলিনী এগিয়েও এসেছিল যেন সেইভাবেই, কিন্তু কী ভেবে নিজেকে দমন ক'রে নিলে।

'নিন জলটা ধরুন। আপনার আবার যা লজ্জা!'

'এ—এ জল—শুধু জল দিন না!'

'কেন—আপনি বোতলের জল খান না বুঝি?'

'না, মানে কখনও খাই নি। আমাদের পাড়াগাঁয়ে বলে ওসব মুসলমানে তৈরী করে, বামুনদের খেতে নেই।'

'আপনি ব্রাহ্মণ বুঝি? ভাগ্যি ভাল আমার! ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো পড়ল।…তবে থাক—এ জল খেয়ে কাজ নেই। আপনি বরং এমনি একটু জল খেয়ে যান। গিরিধারীকেই না হয় আনতে বলি—ও ভাল জাতের লোক। দেখুন বাধা নেই তো?'

আরও ঘেমে ওঠে হেম।

'না, না। সে সব কিছু না। দিন না হয় ঐটেই খাই। নষ্ট হবে!'

'না থাক। আমার এখানে একদিন এসেছেন, আপনার জাতটা মেরে দেব কেন? আর কেউ খেয়ে নেবে। আমার হাতে জলটা চলবে তো? না কি গিরিধারীকেই আনতে বলব?'

'না, না। খুব চলবে। আপনার চেয়ে কি ঐ খোট্টা বেয়ারা ভাল?'

একটু যেন বেঁশী ঝোঁক দিয়েই বলে ওঠে হেম—আর বলার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় আগুন-বর্ণ হয়ে ওঠে।

নলিনী ওর সেই সুগৌর কপোলের রক্তোচ্ছ্বাস যেন একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে দেখে কিছুকাল। বেশভূষা মলিন, গেট-কীপারের চাকরি করে—এত দিন তাই ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখার কথাও তার মনে হয় নি। আজ সামনা-সামনি কাছ থেকে বিস্ময়ের সঙ্গেই লক্ষ্য করলে যে হেম রূপবান—বেশ একটু অসাধারণ রকমেরই রূপবান।

অবশ্য তাকিয়ে রইল সে মুহূর্ত দুই-এর বেশী নয়—তার পরই আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেশ ভাল ভাল আসবাব ঘরে। অবস্থা ভালই। অবশ্য থিয়েটারের মাইনেতে এসব হয় না। নিশ্চয় রমণীবাবু দিয়েছেন। আয়না-বসানো আলমারি, বুককেস, পাথর দেওয়া টেবিল তার ওপর কাচের ঢাকায় শৌখিন ঘড়ি, দেওয়ালে সোনালী ফ্রেমে আঁটা আয়না, বড় বড় ছবি, আরও কত কি!—

ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে তখনও, নলিনী একটা আসন আর পাখা নিয়ে ঘরে ঢুকল আবার। পিছনে গিরিধারীর হাতে একটা রেকাবিতে গোটাকতক রসগোল্লা, সাদা পাথরের গ্লাসে জল।

'নিন, আসুন দেখি। একটু জল খেয়ে নিন।'

'এসব আবার—। না না, থাক, শুধু জল দিন একটু। আমার মানে—একটুও ক্ষিদে নেই। সত্যি বলছি।'

'এসব খাবার ক্ষিদে না থাকলেও খাওয়া যায়। এমন কিছু হাতিঘোড়া নয়। শুধু জল খেতে নেই—তাই। আসুন আসুন। কত ভাগ্যিতে পায়ের ধুলো পড়ল, আবার কবে আসবেন—আসবেন কি-না তারও ঠিক নেই। আমি বুঝি অমনি অমনি ছেড়ে দেব? ব্রাহ্মণ-ভোজনের একটা পুণ্যিও তো আছে।... আসুন, উঠুন। হাত ধোবেন? বাইরেই জল আছে। গিরিধারী, জল ঢেলে দে তো একটু।'

অগত্যা উঠে এসে আসনে বসতে হয়।

এমনিই খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে হেমের লজ্জা একটু বেশী—তার ওপর অপরিচিত মেয়েছেলেদের সামনে বসে একরাশ রসগোল্লা খাওয়া। প্রতি গ্রাসেই গলায় বেধে বেধে যেতে থাকে ওর।

তার ওপর নলিনী সামনে বসে হাওয়া করে!

'থাক থাক।' অতি কষ্টে একবার বললে ও—কিন্তু সে প্রতিবাদ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না নলিনী।

'ওমা, একটু হাওয়া করলে কি আমার হাত ক্ষয়ে যাবে? যা গরম আজ! আপনি তো গলগল ক'রে ঘামছেন। অবশ্য গরমের চেয়েও লজ্জাই বেশী—কিন্তু তবু গরমও পড়েছে বাপু।...টানাপাখার ব্যায়রাটা আসে রাত্তির বেলা। বাবু থাকেন তো, হাওয়া না হলে ওঁর একদণ্ড চলে না। দুবেলা আর কিছু টানাপাখা চালানো যায় না। কী বলেন?'

গলায় আটকে গেলেও হেম কোনমতে জল দিয়ে দিয়ে সেই আটটা রসগোল্লাই গলাধঃকরণ করে। ভাল জিনিস ফেলবার অভ্যাস নেই—তায় এঁটো পড়ে থাকলে ফেলাই যাবে হয়তো, সেই সম্ভাবনার কথাটা মনে ক'রেই আরও জোর ক'রে খায় সে—কষ্ট ক'রেও।

খাওয়া শেষ হলে নলিনী অন্য কথা পাড়ে।

'দেখুন, আমার একটা উপকার করবেন? বাবু লিখে পাঠিয়েছেন বাবুর জন তিন-চার বন্ধু আসবে রাত্তিরে, এখানেই খাবে। আমার গিরিধারী মোটে মাংস মাছ চিনতে পারে না। বাজার করে ঠিকে ঝি—সে আসবে সেই সন্ধ্যের পর।

তা ছাড়া সে বিকেলে বাজার করতেও চায় না। আপনি গিরিধারীকে সঙ্গে নিয়ে যাবার সময় মাংসটা আর মাছটা একটু কিনে দিয়ে যাবেন?'

'তা—না, আর কিছু নয়। দেরি হলে বাবু রাগ করবেন না তো? তিনি হয়তো ভাবছেন—চিঠিটা পেঁছিল কি না!'

'আমার বাজার ক'রে দিয়ে গেছেন শুনলে কিছু বলবেন না!'

বলে মুখ টিপে হাসে একটু নলিনী।

'তা হলে দিন।'

'বাঁচা গেল! পাঁচপো মাংস আর এক সের ভাল বাগদা চিংড়ি মাছ। দেড়-পোয়াখানেক কাটা-পোনাও। বুঝলেন? বাকী যা দই প্যাঁজ—সে আমি গিরিধারীকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

গিরিধারী বাজারের ঝুড়ি টাকা প্রভৃতি বুঝে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এলে হেমের পিছু পিছু নলিনীও নিচে নেমে আসে। দোরের কাছে এসে চাপা গলায় বেশ একটু আন্তরিক ভাবেই বলে, 'আলাপ-পরিচয় তো হয়ে গেল, এবার আসবেন কিন্তু মধ্যে মধ্যে।···এখানে এলেই কিন্তু লোক খারাপ হয়ে যায় না। আমরা বাঘ-ভালুকও নই।·· তা ছাড়া সবাই এক জায়গায় কাজ করি, বন্ধুর মতোই। না কী বলেন? আসবেন কিন্তু। না এলে আমি ভারি দুঃখ করব।'

ওর মতো হতদরিদ্র দীনহীন ব্যক্তির জন্য এই আকিঞ্চনে খুশী হবার কথা। হেমও খুশী হ'ল। এই আদর-যত্ন, এই আন্তরিকতা, কণ্ঠে এই মিনতির সুর অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা মধুর রেশ জাগিয়ে রাখল ওর মনে। সব চেয়ে এই সাধারণ সহজ ব্যবহারটাই ওকে মুগ্ধ করেছে বেশী। এই সব মেয়েদের এবং তাদের বাড়ি সম্বন্ধে একটা যে অজ্ঞাত আতঙ্কের ভাব ছিল, সেটাও কেটে গেছে—এখন বরং সে আতঙ্কের জন্য একটু লজ্জাই বোধ করছে মনে মনে।

সত্যিই তো, মানুষ মানুষই—বাঘ-ভালুক তো নয়! এত ভয়ই বা কেন হ'ত ওর?

আর—এক পয়সার মুরোদ নেই যখন তার, তখন পয়সার লোভে তাকে যত্ন করেছে বা ভোলাচ্ছে, এমন মনে করবারও কোন কারণ নেই।

আসলে মানুষটা ভালই। বেশ সরল। বেশ মিষ্টি কথাবার্তা।

আরও খানিকটা পরে ওর মনে হ'ল—নলিনী কেমন দেখতে তাও ভাল ক'রে বলতে পারবো না কাউকে। এতক্ষণের মধ্যে একবারও ভরসা ক'রে চাইতে পারে নি তার মুখের দিকে।

মনে মনে ঠিক করলে থিয়েটারের দিন এবার ভাল ক'রে দেখবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

গোবিন্দর বৌ কালীতারা বরাবরই খুব সপ্রতিভ—বেশ একটু ভারিক্কী চালের গিন্নী-বান্নী গোছের মেয়ে। সে সংসার করতে চায়—আর করতে জানেও। বিয়ের পর প্রথমবার বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে এসেই রান্না করা, জল তোলা, বাসন মাজা—এক কথায় সংসারের যাবতীয় কাজ নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। যেমন তেমন ক'রে যে করত তাও না—বরং শাশুড়ীর চেয়েও এসব কাজে তার পারিপাট্য ও শৃঙ্খলা বেশী ছিল। সংসার ভালবাসে যে সব মেয়ে—কালীতারা সেই দলেরই একজন।

বিনা সম্মতিতে ছেলের বিয়ে হলে প্রত্যেক ছেলের মায়েরই বিদ্বেষটা আগে গিয়ে পড়ে বধূর ওপর। কমলার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি—তবে সহজাত ভদ্রতা ও সুশিক্ষায় সে বিদ্বেষটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি হয়তো। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে মূল আপত্তি এবং সেই চাপা বিদ্বেষটা কাটতেও যে খুব বেশী দেরি হয় নি তার কারণ বোধ হয় বধূর কর্মদক্ষতা। বৌকে নিয়ে সে বেশ সুখীই হয়েছিল। কমলা নিজে অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে অবস্থাপন্ন স্বামীর ঘরে গিয়ে পড়েছিল—কাজকর্ম গুছিয়ে করার শিক্ষা বা অভ্যাস কোনটাই উমার মতো পাকা হয় নি। সে বেশ অসুবিধাই বোধ করত প্রথম প্রথম নিজে-হাতে কাজ করতে গিয়ে। এখন বৌয়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে—অথবা ছেড়ে দিতে পেরে সে নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। বধূ সম্বন্ধে তাই স্নেহ ও প্রশ্রয়ের অভাব ছিল না তার মনে।

কিন্তু কে জানে কেন গোবিন্দ খুশী হতে পারে নি। অন্তত উমার তাই মনে হ'ত।

তার যে খুব নালিশ করবার মতো কিছু ছিল তাও নয়। বরং প্রতিটি প্রয়োজনের জিনিস মুখে মুখে যুগিয়ে কালীতারা তাকে বেশ খানিকটা অকর্মণ্য আর বাবু ক'রেই তুলেছিল। তবু স্ত্রীর সামনে এলেই গোবিন্দ যেন কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করত। কালীতারা বোধ হয় তার সমবয়সী—উমা সন্দেহ করত সামান্য একটু বড়ই হবে হয়তো—তার ওপর ওর ঐ ভারিক্কী চালচলনে ওকে দেখলেই একটা সম্ভ্রমের ভাব আসত গোবিন্দর মনে—প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও স্বামীর সহজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারত না। অথবা বলা চলে স্ত্রীকে সমীহ না ক'রে পারত না। তার ওপর দৈহিক গঠনেও কালীতারা—পূর্ণযুবতী মেয়ের যেমন হওয়া উচিত, তেমনিই ছিল ; বরং তার যৌবন যেন একটু বেশী প্রস্ফুট বলে মনে হ'ত বাড়ির অন্য মেয়েদের কাছে। ঠিক মোটা না হলেও, স্বাস্থ্যটা ছিল একটু বেশী রকমের ভাল—তার জন্যও বোধ হয় আচমকা দেখলে নবযৌবনা তরুণী বধূ নয়, পূর্ণযৌবনা নারী বলে মনে হ'ত। আর এই সব কারণেই সম্ভবত গোবিন্দর নিজের অজ্ঞাতসারেই মাঝে মাঝে কালীতারাকে মনে হ'ত ওর দিদি। ওর নিজের

দিদি নেই কেউ—দিদি সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণাও যে ছিল তাও নয়—তবু ঐ ধরনেরই যে একটা অনুভূতি হ'ত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কালীতারাও স্বামী সম্বন্ধে শ্রদ্ধা, ভক্তি বা স-কাম প্রেমের অনুভূতি থাকলেও প্রচ্ছন্ন ছিল খুবই। যেটা সব চেয়ে স্পষ্ট এবং প্রকট ছিল—সেটা হচ্ছে একটা সস্নেহ প্রশ্রয়ের ভাব। বয়স্কা বিবাহিতা দিদিদের অনুজ সম্বন্ধে যেমন হয় তেমনিই। উৎকণ্ঠা উদ্বেগের অভাব ছিল না—বরং হয়তো একটু বেশীই ছিল। কোনদিন গোবিন্দর বাড়ি ফিরতে দেরি হলে প্রকাশ্যেই বিচলিত হয়ে পড়ত সে, তবু তার মধ্যেও—উমার যেন কেমন মনে হ'ত—বাৎসল্যভাবই বেশী।

তখনও দিনের বেলায় কিংবা গুরুজনের সামনে স্বামীর সঙ্গে কথা বলার খুব চলন হয় নি। কড়াকড়িটা কমেছে—আগের মতো বিধিনিষেধের বেড়াটা অত উঁচু নেই—তবু একেবারে সমভূমিও হয় নি সেটা। তখনও পাড়াঘরের আশপাশে কিছুটা সংকোচ কিছুটা কুণ্ঠা ছিল, কিন্তু কালীতারা যেন সেটুকুরও ধার ধারত না। প্রয়োজন হলেই অভ্যস্ত ঘোমটাটা শুধু আর আধ ইঞ্চি মাত্র সামনের দিকে টেনে শাশুড়ীদের সামনেই নিঃসংকোচে কথা কইত সে। শুধু কথাই নয়, ওঁদের সামনে ধমক-ধামকও করত অনায়াসে। আর সে ধমক গোবিন্দ মা-মাসীর তিরস্কারের মতোই নিঃশব্দে হজম করত। কখনও বা নিতান্ত কুণ্ঠার সঙ্গে মাথা চুলকোতে চুলকোতে অথবা ক্ষমাপ্রার্থনা ভঙ্গীতে কৈফিয়ত পেশ করত।

এসব কোন কিছুই কমলা কোনদিন লক্ষ করে নি। অতশত তার মাথাতেও যেত না। সে সবটাই সহজ ভাবে নিয়েছিল। কিন্তু উমা সব লক্ষ্য করত। ওদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কোন অসঙ্গতিই তার চোখ এড়াত না। যেখানেই এতটুকু বেসুরে বাজত, ঘটত এতটুকু ছন্দপতন, সেখানেই সচেতন হয়ে উঠত সে। নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখত ওদের দিকে আর কেমন একটা নাম-না-জানা আশংকা অনুভব করত ওদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। গার্হস্থ্য সুখের অভাব নেই—সহস্রবিধ আরামে আর সেবায় অভিভূত ক'রে রেখেছে কালীতারা তার স্বামীকে—কিন্তু দাম্পত্যসুখ যাকে বলে তা ওরা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছে কি? ওরা কি পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রীর মতো ভালবাসতে পেরেছে? এমনি নানান্ প্রশ্ন মধ্যে মধ্যে দেখা দিত উমার মনে—কিন্তু তার কোন সদুত্তর কোথাও খুঁজে পেত না সে। শুধু সেই নিরুত্তর সমস্যা তার নিজের দুর্ভাগ্যের চিন্তার মধ্যে আর একটা বোঝার মতো চেপে বসে থাকত।

অবশেষে একদিন সে দিদির কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব ক'রে বসল, 'দিদি, বৌমা তো প্রায় দু বছর বাপের বাড়ি যান নি—এবার ওঁকে একবার পাঠানো দরকার।'

'কেন বল্ দিকি?' কমলা সবিস্ময়ে, কিছুটা সশঙ্ক চিত্তেও তাকায় ওর মুখের দিকে, 'বৌমা বলেছেন কিছু?'

'না, বৌমা বলেন নি—আর হয়তো কোন দিন বলবেনও না। কিন্তু আমাদের একটা বিবেচনা আছে তো। ছেলেমানুষ একটানা এতদিন এই দেড়খানা ঘরে

আটকে আছে আর কল্বরে বলদের মতো একঘেয়ে সংসারের ঘানি ঘোরাচ্ছে।'

কমলা কথাটা শ্বনে খ্বে খ্বশী হ'ল না। হবার কথাও নয়। বৌমার আরা যাওয়া মানে সংসারের সহস্রবিধ কাজ নিজেদের ঘাড়ে পড়া। অপ্রসন্ন ম্বখে বললে, 'ও, আমাদের বিবেচনা! তা সেখানেও তো শ্বনেছি বেয়াইয়ের অবস্থা ভাল নয় —তার ওপর আবার ঘাড়ে গিয়ে পড়া—'

'অবস্থা এমনও খারাপ নয় যে নিজের মেয়েকে খেতে দিতে পারবে না। সেই বাড়িরই তো মেয়ে!'

'তা বটে।' একটু থেমে বলে আবার কমলা, 'আমাদের যে এদিকে আতান্তর।'

'এটা বড্ড স্বার্থপরের মতো হ'ল না দিদি! ছেলেমান্বষ মেয়েটা কি আমাদের সংসারে কেনা বাঁদীর মতো খাটতেই এসেছে শ্বধ্ব? এতকাল তো চলছিল আমাদের—তেমনিই না হয় চলবে। আমিই চালিয়ে নেব—'

কমলা আর কথা কইল না। কথাটা সেখানেই চাপা পড়ে গেল।

উমা কিন্তু বেশী দিন চাপা পড়তে দিলে না। আবারও তুললে।

আসলে একটা নতুন চিন্তা তার মাথায় এসেছে। এদের নিয়ে একটা নতুন খেলা খেলতে চায়। বিচ্ছেদের বিরহে এদের মনে—অন্তত গোবিন্দর মনে সকাম তৃষ্ণা বা আবেগ জাগে কিনা তাই দেখতে চায়। যাকে সহজে, না চাইতে হাতের কাছে পাওয়া যায়—তার সম্বন্ধে আমাদের থাকে সহজাত অবহেলা। দ্বরে গেলে দাম বাড়ে। গোবিন্দর কাছে কালীতারা একটা প্বরনো অভ্যাস মাত্র দাঁড়িয়ে গেছে—তাই হয়তো তার সেবাটাও চোখে পড়ে না। সরে গেলে সেই সেবার অভাবটাই হয়তো প্রেম বা তৃষ্ণা জাগাতে সহায়তা করবে।

নিজের দ্বর্ভাগ্যে উমা এই বিষয়টায় অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে পড়েছে, কিন্তু সেই কারণেই কথাটা খ্বলে বলতেও পারে না সে কাউকে। শ্বধ্ব কালীতারার বিশ্রামের প্রযোজনীযতার ওপব জোর দেয়।

কালীতারাব কানে কথাটা যেতে সে-ই প্রতিবাদ করে সব চেয়ে বেশী। আকাশ থেকে পড়ে বলে, 'ওমা আমি গেলে এখানে চলবে কি ক'রে? মা'র শরীর খারাপ—আপনার তো এই টো-টো ঘোরা চাকরি—ঠাকুরপো স্বদ্ধ এখানে এসে রয়েছেন—সে কখনও হয়?'

'খ্বব হয় মা। তুমি যখন ছিলে না তখন কি আর আমাদের সংসার চলত না? আমি তো আছি—চালিয়ে নেব এক রকম ক'রে। তুমি মাসখানেক কাটিয়ে এসো গে অন্তত!'

তব্ব না কালীতারা আর না কমলা—কথাটা কেউই গায়ে মাখে না। শেষ পর্যন্ত হয়তো উমাকে শ্রান্ত হয়েই চুপ ক'রে যেতে হ'ত—কারণ আর বেশী পীড়াপীড়ি করলে ব্যাপারটি দ্বষ্টিকটু হয়ে উঠত—কৈফিয়তের হেতু তো হ'তই। কিন্তু হঠাৎ কালীতারার এক জ্যেঠামশাই কী এক মোকদ্দমার ব্যাপারে কলকাতায় এসে পড়লেন এবং দেখা করতে এসে—পশ্চিমে-বাঙালীর অভ্যস্ত কাঠখোট্টা চালে বলে ফেললেন, 'কী রে তারা, যাবি নাকি আমার সঙ্গে আরায়? দ্যাখ, যাস তো

চল্। কী বলেন বেয়ান—ছাড়বেন, না কোন অসুবিধা আছে—কাজকর্মের ?'

সত্য কথাটা বেশী স্পষ্ট ক'রে বললে অনেক সময় রূঢ় শোনায়, এমন কি কমলার কানেও তা শোনাল। সে একটু চাপা রাগের সঙ্গেই বললে, 'আপনাদের মেয়ে কি আমাদের ঝি যে কাজকর্মের জন্যে তাকে আটকে রাখব? ওকে ঘরের লক্ষ্মী ক'রেই ঘরে তুলেছি বেয়াই—ঝি হিসেবে নয়।...কাজকর্ম ও আসবার আগেও কিছু আটকে থাকত না—এখনও থাকবে না। আমরাই বরং ওকে কত দিন বলছি, অনেক দিন যাও নি—একবার ঘুরে এস দিনকতক। আপনাদের মেয়েই যেতে চায় না।'

বেয়াই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। বলেন, 'তা তো বটেই—তা তো বটেই। না, আমি সেভাবে কিছু বলি নি। নিজের ঘরে নিজের কাজ করবে—সে আর এমন বড় কথাই বা কি! কী রে যাবি নাকি তারা ?'

সপ্রতিভ তারা বাজে কথার মধ্যে না গিয়ে দরকারী প্রশ্নটিই করে শুধু, 'তার পর? ফিরব কবে? কার সঙ্গে?'

'কেন জামাই যেতে পারবেন না? বাবাজীও তো যান নি ওখানে অনেক দিন।'

'না, উনি যেতে চান না। যা ব্যাভার তোমরা করেছ ও'র সঙ্গে!'

মুহূর্ত কয়েক চুপ ক'রে থেকে কালীতারার জ্যেঠামশাই বলেন, 'আচ্ছা, সে যা হয় হবে এখন। না হয় আমারাই কেউ এসে পেঁছে দিয়ে যাব।'

আর কোনও পথ খোলা থাকে না কোথাও।

কালীতারা মুখটা গোঁজ ক'রে বলে, 'আমি কিন্তু বেশী দিন থাকব না। তা বলে দিচ্ছি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। দেখেছেন বেয়ান—মেয়েদের যদি বিয়ে হ'ল তো আর শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে দুটো দিনও বাপের বাড়ি থাকতে চায় না। বিয়ে হ'ল কি পর—না কী বলেন! হা হা হা!'

তিনি নিজেই জোরে হেসে উঠে আবহাওয়াটাকে হাল্‌কা ক'রে দেন।

॥ ২ ॥

কালীতারা আরা যাবার দিন পনেরো পরেই ঘটনাটা ঘটল।

রাত তখন বোধ হয় তিনটে হবে, উমা আর কমলা একসঙ্গেই ঘুম ভেঙে চমকে উঠে বসল বিছানায়।

'কী দিদি? কি হ'ল?' প্রশ্ন করল উমাই।

'বড় একটা বাজে স্বপ্ন দেখলুম রে। দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দ! দুর্গা দুর্গা!'

'কি স্বপ্ন দিদি?' উমা ও বিছানা থেকে এ বিছানায় উঠে আসে। কণ্ঠস্বরটাও তার অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ শোনায়।

'দেখলুম বৌমা যেন এসে আমার মশারির মধ্যে ঢুকে পা ঠেলে ডাকছেন, বলছেন...মা, ঘরে তো আর ঠাঁই দিলেন না—তবে পায়ের ধুলো দিন—আমি যাই।'

'দুর্গা দুর্গা', শিউরে উঠে উমাও বলে অস্ফুট কণ্ঠে।

'কেন বল্ দিকি? তোরই বা ঘুম ভাঙল কেন?'

'দিদি, আমারও যেন মনে হ'ল বৌমা এসে পা ঠেলে ডাকছেন মশারির মধ্যে। যেন বলেছেন—একবার উঠুন না মাসীমা, একটু পেন্নাম ক'রে যাই!'

'সে আবার কি!…তুইও—একসঙ্গে এক সময়ে! এর মানে কি? কৈ এমন তো কখনও শুনি নি।'

'কে জানে বাছার কী হ'ল! ভালই ভালয় ফিরলে বাঁচি!'

এর পর আর ঘুম অসম্ভব। দুই বোনই বাইরের রোয়াকে বেরিয়ে আসে। আর বাইরে আসতেই প্রথম নজরে পড়ে রকের ওপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে গোবিন্দ।

'এমন ক'রে বসে আছিস কেন রে খোকা?'

আর্তনাদের মতো শোনায় কমলার কন্ঠস্বর।

গোবিন্দ শুষ্ক মুখে যা বলে তার মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, সে এইমাত্র তার স্ত্রীকে স্বপ্ন দেখেছে—কালীতারা যেন এসে ওকে ঠেলে বলছে, 'ওগো তোমার আপদ-বালাই জন্মের মতো বিদেয় হয়ে যাচ্ছি—এখন যাও দিকি, তাড়াতাড়ি নতুন কস্তাপেড়ে শাড়ি একখানা আর একথান সিঁদুর কিনে আনো দিকি। এক পাতা আলতাও এনো অমনি। সেজেগুজে যাব বাপু বেশ ক'রে—তা বলে রাখছি!'

এবার কমলার অশ্রু আর বাধা মানে না। ডুকরে কেঁদে ওঠে। উমার দুই চোখেও জল ভরে আসে। কালীতারাকে সেও ভালবাসত।…তার ওপর তার একটা অপরাধীর কুণ্ঠা আছে মনের মধ্যে—বলতে গেলে সে-ই জোর ক'রে পাঠিয়েছে।

কান্নার শব্দে বাড়িওয়ালা উঠলেন। হেম অনেক রাত্রে এসে শুয়েছে, তবু তারও ঘুম ভাঙল। তখনই মন্ত্রণাসভা গোছের বসল। বহু আলোচনার পর স্থির হ'ল যে সকালেই স্টেশনে গিয়ে গোবিন্দ আরার গাড়ির খবর নেবে এবং প্রথম ট্রেনেই চলে যাবে। জানাশোনা অফিস, ছুটির জন্য চিন্তা নেই—হেম গিয়ে একটা খবর দিয়ে এলেই হবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথাও যাবার প্রয়োজন হয় না।

আলোচনা করতে করতেই ভোর হয়ে যায়। আর সামনের বিশ্বাসদের বাড়ির তেতলার কার্নিসে উষার প্রথম আভাস লাগার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দরজায় ঘা পড়ে।

কালীতারার জেঠ্যামশাই।

দোর খুলতেই আছড়ে পড়লেন তিনি।

অতি কষ্টে সেই বুকফাটা কান্নার মধ্য থেকে যেটুকু সংবাদ আহরণ করা গেল তা এই:

আজ তিন দিন থেকে কালীতারা এখানে আসার জন্যে কান্নাকাটি করছিল। কাল কতকটা জোর ক'রেই সে জ্যেঠার সঙ্গে রওনা হয়। পথে আসানসোল পেরোবার পরই ভেদবমির লক্ষণ দেখা দিল। দুবার দাস্ত এবং একবার বমি—তার

পরই শেষ। রেলের ডাক্তার দেখে বলেছেন এসিয়াটিক কলেরা। মৃতদেহ হাওড়াতেই পড়ে আছে। এরা না গেলে ছাড়বে না বোধ হয়।

মরবার আগে শেষ অনুরোধ জানিয়ে গেছে কালীতারা—ওর জ্যেঠামশাই বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন,—লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি আর আলতা-সিঁদুরে যেন সাজানো হয় তাকে শ্মশানযাত্রার আগে, আর গোবিন্দ যেন নিজে হাতে সাজায়!

মৃত্যুপথযাত্রিণীর শেষ অনুরোধ কোনটারই অন্যথা হ'ল না। ভাল লালপাড় ফরাসডাঙার শাড়ি এল—সিঁদুর আলতা ফুলের মালা—হেমই চোখ মুছতে মুছতে গিয়ে নিয়ে এল। উমা ও কমলার কারোরই তখন কিছু দেখবার অবস্থা নয়, উমা মূর্ছাহত, স্তম্ভিত; কমলা আছাড় খেয়ে খেয়ে কাঁদছে—বাড়িওয়ালা গিন্নীই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিলেন, গোবিন্দ অপটু হাতে সাজিয়ে দিল। মায় আলতা পর্যন্ত পরিয়ে দিল সে-ই।

কালীতারার শেষ অনুরোধ।

স্বপ্নে দেখা দিয়ে জানিয়ে গেছে সে।

গোবিন্দ যথাসাধ্য যত্নের সঙ্গেই সে অনুরোধ রাখবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু যা করছে সে—যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো। আসলে গোবিন্দ যেন কেমন বিমূঢ় স্তম্ভিত হয়ে গেছে। ঘটনাটা তার কাছে এখনও কেমন অবাস্তব, স্বপ্নের মতো ঠেকছে।

এই বয়সে বিয়েই হয় না কারুর কারুর—সে বিপত্নীক হ'ল।

তা ছাড়া, ক' বছরে কালীতারা কেমন যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে থাকবে না—কোন দিন সে কোথাও চলে যাবে একেবারে—এমন যেতে পারে—এইটেই তো অবিশ্বাস্য। আর এই আকস্মিক মৃত্যু—এমন সহসা চিরবিচ্ছেদ—এখনও তার স্পষ্ট বিশ্বাস বা ধারণা হচ্ছে না।

হাওড়া গিয়ে নিয়ে আসা থেকে শুরু ক'রে, সাজানো, হরিধ্বনি দিয়ে কাঁধে তোলা, মায় মুখাগ্নি পর্যন্ত সবই তাই কতকটা সে তেমনি স্তম্ভিত ভাবেই করলে। তার পর সেই ভাবেই একটু দূরে এসে বসল সে উদাসীন নিস্পৃহবৎ।

তার এই বিমূঢ় ভাব অনেকেই ভুল বুঝল।

আসবার সময় হাহাকার কান্নার মধ্যেই কমলা হেমকে বলে দিয়েছিল, 'ওকে একটু কাঁদতে বল হেম, কোনমতে ওকে কাঁদিয়ে দে, নইলে বুক ফেটে মরে যাবে যে!'

এখন কালীতারার জ্যেঠামশাইও আবার ভুল করলেন।

আস্তে আস্তে কাছে এসে বসে বললেন, 'বাবাজী—কান্না পাচ্ছে না? একটু কাঁদবার চেষ্টা কর না। এতকাল ঘর করেছ, সতীসাধ্বী স্ত্রী জন্মের মতো চলে যাচ্ছে—এর পর আর মাথা খুঁড়লেও দেখতে পাবে না। কথাগুলো ভাববার চেষ্টা কর—কান্না পাবে নিশ্চয়ই। না কাঁদতে পারলে বড্ড কষ্ট পাবে যে বাবা!'

ওঁর কথায় বিস্মিত হ'ল গোবিন্দ। সম্ভবত এই প্রশ্ন তার মাথায় জাগল যে ওর এই স্তম্ভিত ভাবটাকে ওঁরা দুঃসহ আঘাতের জড়তা বলে ভুল করছেন।

এইবার ওর সেই বিস্ময়-বিমূঢ় ভাবটা—সেই অবিশ্বাসের—স্বপ্নের ভাবটা কেটেও গেল খানিকটা। একটা বিস্ময়ের আঘাতে আর একটা বিস্ময়ের ঘোর বুঝি কাটল। সে এবার নিজের মনের দিকটা তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল।

কিন্তু সেখানেও নবতর বিস্ময় অপেক্ষা করছে তার জন্য। বিস্ময় আর তার সঙ্গে সামান্য একটু লজ্জাও।

কৈ, খুব একটা শোকাভিভূত তো সে হয় নি।

খুব একটা কষ্ট তো হচ্ছে না। হাহাকার ক'রে তো তার কাঁদতে ইচ্ছা যাচ্ছে না। বুক ফেটে যাবে এই আঘাতে—এমন তো মনে হচ্ছে না তার!

বরং—লজ্জার সঙ্গে হলেও—বার বার এ বিশ্বাসটা মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করলেও—এক সময় মানতে বাধ্য হ'ল সে—কেমন যেন একটা স্বস্তির ভাব, একটা অব্যাহতির ভাবই মনে জাগছে। তার যেন বোঝা নেমে গেল মাথা থেকে, যেন একটা—খুব কষ্টকর না হলেও—বন্ধন থেকে মুক্তি পেলে সে!

তবে কি কালীতারাব কোন স্থান ছিল না তার মনে?

ছিল বৈ কি! সে যে নিত্যকার সহস্র অভ্যাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। সেই অভাববোধ, শূন্যতা তো আছেই। সেই সঙ্গে একটা বিপন্ন ভাবও।

কালীতারা না থাকলে খুব অসুবিধা হবে তার—যেমন এই কদিন হয়েছে। দৈনিক জীবনযাত্রা বিড়ম্বিত হবে।

একা-একা থাকাও বড় অসুবিধা।

সারাদিনের পর ঘরে এসে একটু সেবা, একটু স্বাচ্ছন্দ্য—রাত্রে পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে সুখদুঃখের গল্প করা, তার নানা কথা শুনতে শুনতে আরাম ও তৃপ্তির স্বাদের মধ্যে তন্দ্রায় চোখটি বুজে আসা—এটা যেন শুধু অভ্যাস নয়, প্রয়োজনও হয়ে পড়েছে তার।

কিন্তু কৈ, খুব একটা কান্না তো পাচ্ছে না।

অথচ কান্নাটাই যে শোভন এবং সঙ্গত সেটা সে বুঝতে পারছে।...

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্ত্রীর চিতার কাছে এসে দাঁড়ায় গোবিন্দ।

পুড়ে-যাচ্ছে—এই দৃশ্যটা সামনাসামনি দেখে যদি কান্না পায়!

আরও দু-তিনটি চিতা জ্বলছিল। কালীতারার চিতার আশেপাশে।

তাদেরই শবযাত্রীদের মধ্য থেকে একজন পাশে এসে দাঁড়ালেন। মধ্যবয়সী একহারা গড়নের একটি ভদ্রলোক। ব্রাহ্মণ—উত্তরীয়ের মধ্যে থেকে মোটা পৈতার গোছা বেরিয়ে আছে।

'বাবাজীরই বুঝি অর্ধাঙ্গিনী গেলেন?'

একটু অবাক হয়েই তাকাল গোবিন্দ। কিন্তু অস্বস্তিকর চিন্তা থেকে রেহাই পেয়ে কিছুটা কৃতজ্ঞতাও বোধ করল লোকটি সম্বন্ধে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' সংক্ষেপে বললে সে।

'আহা-হা। কীই বা বয়স, তেইশ-চব্বিশ হ'ল বোধ হয়—না হয় সামান্য একটু বেশীই হবে। এই বয়সে—বড়ই অসুবিধে, সত্যি!'

এ কথার উত্তর নেই, অগত্যা চুপ করেই থাকে গোবিন্দ।

'আমার দেখুন না—সংসারে নানা ঝক্কিতে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে দুটো দিন শ্বশুরবাড়ি জুড়োতে আসা—তা এসে পড়ে এই বিভ্রাট। শালার ছেলেটি—বললে বিশ্বাস করবেন না বাবা, সাতদিনের জ্বরে! কে আর জানে বলুন, খবর তো পাই নি, হঠাৎ এসে পড়েছি—বলি শহর-বাজার জায়গা, তাও শহরের মতো শহর—কলকেতা। কদিন একটু আরাম ক'রে আসি গে। তা এসে দেখি এই কাণ্ড। কাল এসেছি, আজই এই—।'

এই পর্যন্ত বলে চুপ ক'রে যান ভদ্রলোক। গোবিন্দও চুপ ক'রে থাকে। এমনিতেই সে খুব আলাপী নয়—তা ছাড়া এই মানসিক অবস্থায় সম্পূর্ণ অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কী কথা কইবে তাও ভেবে পায় না। শোকের সংবাদ—সান্ত্বনা দেওয়াই উচিত। কিন্তু তাকেই কে সান্ত্বনা দেয় তার ঠিক নেই—সে অপরকে কী দেবে?

অনেকক্ষণ পরে বোধ করি কোন কথা খুঁজে না পেয়েই প্রশ্ন ক'রে 'আপনি থাকেন কোথায়?'

'দেশে থাকি বাবা। নিকটেই দেশ।' উৎসাহিত হয়ে ওঠেন ভদ্রলোক, 'খুব একটা দূরে কোথাও নয়। বি. এন. আর লাইন দিয়ে যেতে হয়, নতুন ইস্টিশান হয়েছে আবাদা—তার কাছেই মানিকপুর।...আমরা ব্রাহ্মণ, শ্রীগোপীনাথ চক্রবর্তী আমার নাম, ঠাকুর ছিলেন ঈশ্বর জানকী চক্রবর্তী। মানিকপুরের চক্কোত্তি-বাড়ি ডাকসাইটে—এককালে দোল-দুর্গোচ্ছব দুই-ই হ'ত। এখন আর কি, আসলই নেই—বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া সাপ হয়ে বসে আছি, কিছুই আর হয় না, পাল-পাব্বন বলতে আর কিছু নেই। কোনমতে দিন গুজরান করা। তবু গুপী চক্কোত্তী বললে ও অঞ্চলের সবাই চিনবে। ইস্টিশানে নেমে জিজ্ঞেস করলে কানাও দেখিয়ে দেবে আমার বাড়ি।'

তার পর যেন দম ফেলবার জন্যেই কতকটা থেমে বললেন, 'আপনারাও তো ব্রাহ্মণ দেখছি, সবাইকার কাঁধেই সুতোটা ঝুলছে—তা আপনাদের পরিচয়?'

গোবিন্দ সংক্ষেপে নিজের নাম বলে।

'থাকা হয় কোথায়? সিমলে? কলকাতার সিমলে? ও তো ধরুন আমার শ্বশুরবাড়িরই পাড়া। আমার শ্বশুরবাড়ি হ'ল ভালুকবাগান। নিজের বাড়ি? ভাড়া—? তা কলকাতায় আর কটা লোকেরই বা বাড়ি আছে! সবই তো ভাড়া। কত তা-বড় তা-বড় লোক ভাড়া বাড়িতেই কাটিয়ে দিলে সারা জীবনটা! করা হয় কি? চাকরি? তবে আর কি? মাসে গেলে যার বাঁধা আয় আছে তার আর বাড়িভাড়াতে ভয় কি?'

ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে অঙ্গারবর্ণ দেহটা।

ভরা যুবতী কালীতারার পুরন্ত দেহ বহুরূপী রাক্ষসটা যেন লেলিহান জিহ্বা মেলে লেহন করছে—তাতে ক্ষয়ে যাচ্ছে সেটা একটু একটু ক'রে।

সেদিকে চেয়ে চেয়ে যেন অবাক লাগে, ভয়-ভয়ও করে।

হেম গিয়ে হাত ধরে অল্প টান দেয়—

'এদিকে সরে এসে বসো না বড়দা।'

'হ্যাঁ বাবাজী, তাই চল। এসব দৃশ্য না দেখাই ভাল, বুঝলে না? কাঁচা বয়স—এখন কি আর এসব দেখার কথা—না দেখা উচিত? এসো এসো।'

তার পরই সামান্য একটু জিভ কেটে বলেন গুপী চক্কোত্তী, 'ঐ যা! তুমিই বলে ফেললুম। অবিশ্যি তাতে দোষই বা কি, তোমার ডবলের ওপর বয়স আমার—তবে নাকি আজকালকার ইয়ং বেঙ্গলরা আবার রাগ করে শুনেছি।'

উত্তর না দিলেও গোবিন্দ তাঁকে এড়াতে পারে না—কারণ সে তাঁর পাশে গিয়ে না বসলেও গোপীবাবুই এসে বসেন।

'তা কতকাল ঘর করলে বাবাজী মায়ের সঙ্গে?'

গোবিন্দ উত্তর দেয় না। এবারও যেন কেমন ক্লান্তি বোধ করছে—সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটা বিতৃষ্ণাও। কিন্তু তাতে গুপী চক্কোত্তীর উৎসাহ কমে না। তিনি বলেন, 'তা বছর পাঁচ ছয় হ'ল নিশ্চয় কী বল? ইস্—তা হলে তো বড্ড কষ্ট লাগবে। ফাঁকা লাগবে—তা লাগুক, কিন্তু অসুবিধে হবে, কষ্ট হবে, সেইটেই বড় কথা। তেল, তামাক, বৌ—এসব অভ্যেস হয়ে গেলে ছাড়া শক্ত। তোমার তো দেখছি বাবাজী অবিলম্বে আবার সংসার করতে হবে।'

গোবিন্দ এবারও চুপ ক'রে থাকে—কিন্তু কথাটা শুনে যতটা বিরক্ত বোধ করার বা চমকে ওঠবার কথা—ততটা কিছু লাগে না ওর। বরং নিজের মনের অবচেতনে যে অনুভূতিটা সুপ্ত আছে, প্রকাশের পথ খুঁজছে—গুপী চক্কোত্তীর কণ্ঠে সেইটেই প্রতিধ্বনি শুনে কেমন একটা বল পায় মনে মনে, অনুভূতিটা স্বীকার করতে যে সংকোচ বোধ করার কথা—সে সংকোচের কারণও দূর হয়ে গিয়ে স্বস্তি অনুভব করে।

গুপী চক্কোত্তী একটু থেমে মেরজাইয়ের পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করেন। 'বাবাজী কিছু মনে করো না—এখানে বসেই স্বার্থের কথা তুলছি—কিন্তু আর তো সময়ও পাব না, এখানেই যখন ভগবান দেখা করিয়ে দিলেন তখন এটাকে বিধাতারই যোগাযোগ মনে করতে হবে। আমার একটি ভাগ্নী আছে বাবা, বিধবা বোনের মেয়ে, সে মেয়ে ইস্তক সমস্ত আমার ঘাড়ে—তা ঘাড়ও তো আমার এই—পল্‌কা, কখন মট্‌কে ভেঙে পড়ে তার ঠিক নেই—কিন্তু যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তো আমাকেই দেখতে হবে। বয়স ঠিক যেমনটি মানানসই হয়—বারো পূর্ণ হয়েছে—ভা-রি ফুটফুটে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, আর তেমনি বুদ্ধি; ব্যাটাছেলে হলে জজ-মেজেস্টার হতে পারত। কী বলব বাবা, এ মেয়ে রাজ রাজড়ার ঘরেই মানায়। তা আমার তো বুঝতেই পারছ, না অর্থবল না লোকবল। সম্বন্ধ করছেই বা কে, আর রেস্তর জোরই বা কোথায়! তা একবার দেখবেন না কি বাবা? মেয়েটাকে? মাইরি বলছি—দেখলেই পছন্দ হবে!'

হেম পাশেই বসে ছিল। সবাই শুনেছে। মানুষ যে এত হৃদয়হীন হতে পারে তা তার ধারণার অতীত। সর্বাঙ্গ রাগে রি-রি করতে লাগল তার।

কিন্তু গোবিন্দর কাছ থেকে এ প্রস্তাবের যে প্রতিক্রিয়া আশা করেছিল সে—তার কিছুই দেখতে পেল না। যে কড়া উত্তর গোবিন্দর দেওয়া উচিত ছিল—যা হেমের গলার কাছে ঠেলাঠেলি করছিল প্রকাশের জন্য, তা অনুক্তই রয়ে গেল। গুপীর কথায় যতটা অবাক সে হয়েছিল তার চেয়ে ঢের বেশী অবাক হ'ল, যখন শুনল যে গোবিন্দ ধীরে ধীরে উত্তর দিচ্ছে, 'এ সব কথা আমাকে বলে কী লাভ বলুন, বরং যদি কথা পাড়তে চান তো মা'র সঙ্গে দেখা করবেন। মা আছেন, মাসী আছেন—তাঁরাই আমার গার্জেন!'

কানে শুনেও বিশ্বাস হতে চায় না হেমের, সে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে যে কথাগুলো ঠিক গোবিন্দর মুখ থেকেই বেরোচ্ছে না আর কারুর—কিন্তু গুপী চক্কোত্তীর উৎসাহের অবধি থাকে না। তিনি প্রায় গোবিন্দর মুখের কথা কেড়ে নেন, 'বটেই তো, বটেই তো! আমারই ভুল ওটা। তা ভুল তো সব মানুষেরই হয় বাবা—ইংরেজরা নাকি বলে। তাঁদের কথাই খোঁজ করা আমার আগে উচিত ছিল। তা তাঁদের ঠিকানাটা বাবাজী—? মানে তোমারই ঠিকানা ধর। মাসীমা ওখানেই থাকেন! তোমাদের সঙ্গে? বিধবা নাকি?'

অসহ্য ক্রোধ সামলাতে না পেরে হেম বলে বসে, 'অত কথায় আপনার দরকার কি? এখনই হাঁড়ির খবর না নিলে চলছে না? আগে দেখুন তারা এখন ছেলের বিয়ে দেবেন কিনা—এখন থেকেই অত আত্মীয়তা করছেন কেন?'

গুপী চক্কোত্তী কয়েক মুহূর্ত তাঁর শান্ত কোটরগত চোখ দুটি মেলে মিট্‌মিট্‌ ক'রে তাকিয়ে রইলেন হেমের মুখের দিকে—যেন ওর সমস্ত পরিচয় ও মনোভাব একসঙ্গে সেই এক নজরেই জেনে নিলেন, তার পর বললেন, 'ঠিক বলেছ বাবা, আমারই অন্যায়। আসল কথা কি জান—বুড়ো হলে সব জ্ঞানগম্যি লোপ পেতে থাকে।... তা ঠিকই হয়েছে—তোমার কথাটা বলা কিছু অন্যায় হয় নি। শিক্ষার বয়সও নেই। বয়স হলে সন্তানদের কাছ থেকেই শিক্ষা নিতে হয়। ধর না কেন—শাস্তরেই তো বলেছে যে স্বয়ং বেহ্মাও তাঁর সন্তানদের কাছে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। সনৎকুমার না কে যেন ধমক দিয়ে শিখেয়ে গিয়েছিল তাঁকে।... তা সে কিছু নয়। এখন তোমার ঠিকানাটা শুধু দরকার। কাগজ প্যান্সিল কারুর কাছে কিছু আছে? নেই? কাগজ এক টুকরো বোধ হয় হবে—কিন্তু উট্‌-প্যান্সিল একটা, চাই যে! দাঁড়াও খুঁজে নে আসছি—কারুর কাছ থেকে চেয়ে!'

এই বলে—আর উত্তরের অপেক্ষামাত্র না ক'রে প্রায় লাফিয়ে উঠে চলে গেলেন এবং বোধ হয় কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কোথা থেকে একটা পেন্সিল সংগ্রহ ক'রে ছুটতে ছুটতে ফিরে এলেন।

তার পর পকেট থেকে কাগজ বার ক'রে পেন্সিলসুদ্ধ গোবিন্দর শিথিল হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'বেশ গোটা গোটা ক'রে লিখে দাও দিকি বাবাজী ঠিকানাটা—আমার আবার চশমা নেই কিনা!'

॥ ৪ ॥

দিন তিনেক পরেই গুপী চক্কোত্তী এসে হাজির হলেন।

বিকেলের দিক—পুরুষরা কেউ বাড়ি নেই, উমাও পড়াতে গেছে। খবরটা নিয়ে এসেছিল নীলা—বাড়িওলার ছোট মেয়ে। তার দিকে 'অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে কমলা বললে, 'আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে? বুড়োমতো বেটাছেলে? দূর পাগলী—খোকাকে খুঁজছে নিশ্চয়। বল্ গে যা গোবিন্দবাবু বাড়ি নেই, রাত আটটার পর দেখা হবে।'

'উঁহু—সে আমি বলেছিলুম। লোকটা বলছে, আমি গোবিন্দবাবুর মা'র সঙ্গেই দেখা করতে চাই। বিশেষ দরকার আছে।'

কমলার এখনও অপরিচিত পুরুষের সামনে বার হতে বিষম সংকোচ বোধ হয়—এখনও পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে অভ্যস্ত হয় নি সে। ছেলের বন্ধুরা কেউ বাড়ি এলে একগলা ঘোমটা টেনে বসে থাকে।

সে বিপন্ন কণ্ঠে বললে, 'আমার সঙ্গে কী দরকার—না না বল্ গে যা, কথাবার্তা যা আছে যেন গোবিন্দবাবুকেই বলেন।'

গুপী চক্কোত্তীর কান খুব সাফ্। বাইরের দালান থেকেই কমলার অনুচ্চ কণ্ঠ তাঁর কানে গেছে। তিনি সেখান থেকেই হেঁকে বললেন, 'ওঁকে বল খুকী যে তাঁর সঙ্গে কতাবার্তা আমার হয়ে গেছে—এখন দরকার ওঁয়াকেই। বল যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বহু দূর থেকে এসেছি, বিশেষ প্রয়োজনেই। তোমার সঙ্গেই উনি একটিবার বাইরে এসে পায়ের ধুলো দিন, তোমার মারফৎই কথাবার্তা চলতে পারবে।... কিংবা এ বাড়িতে যদি আর কোন ছেলে পুলে থাকে—তাকেই সঙ্গে ক'রে আসুন না হয়!'

অগত্যা কমলাকে বাইরের দালানে আসতে হয়।

তার আগে জানলার ফাঁক দিয়ে মানুষটাকে দেখে নেয়—নিতান্তই সাধারণ চেহারার মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। খাটো মেরজাইয়ের মধ্য থেকে পৈতের গোছা ঝুলছে, পাত্‌লা উড়ুনির ভেতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেটা।

না, লোকটাকে খুব ভয়ংকর বলে মনে হচ্ছে না। গুণ্ডা বদমাইশের মতো চেহারা নয়।

নীলাকে দিয়ে একটা আসন পাতিয়ে দিয়ে—নিজে একটু দূরে মেঝেতেই বসল কমলা। নীলাকে টেনে কোলের কাছে বসিয়ে তার একটা হাত ধরে রইল। সাত বছরের মেয়ে হলেও সে-ই এখন যেন ওর প্রধান ভরসা ও অবলম্বন।

কিন্তু অতঃপর গুপী চক্কোত্তী মশাই যথোচিত ভূমিকা ক'রে যে প্রস্তাবটি পাড়লেন—আর যাই হোক সে কথার জন্য প্রস্তুত ছিল না 'কমলা। হেম কিছুই বলে নি—হয়তো বলবার মতো কথা নয় বলেই বলে নি—অথবা এত তাড়াতাড়ি গুপীবাবু এসে হাজির হবেন তা সে কল্পনা করে নি। সুতরাং কমলার বিস্ময়ের সীমা রইল না।' আর সেই অবিশ্বাস্য রকমের বিস্ময়ের প্রবল আঘাতে স্থানকাল-

পাত্রের হিসেব ভুলে গেল সে—নীলাকে মধ্যস্থ ক'রে কথা বলবার সংকল্পটাও মনে রইল না। সে তার বিস্ফারিত চোখ সোজা গুপীবাবুর দিকেই মেলে প্রশ্ন করল, 'গোবিন্দ রাজী হয়েছে! সে নিজে ঠিকানা দিয়েছে!···না না, এ কী বলছেন আপনি ?'

'আজ্ঞে মিছে কথা কি আর বলছি? আর এসব ক্ষেত্রে মিছে কথা কতক্ষণ বজায়ই বা থাকবে বলুন? ছেলে বাড়ি ফিরলেই তো সব জানতে পারবেন! তা ছাড়া বাবাজী না বললে আমি আপনার ঠিকানাটাই বা জানব কি ক'রে! দেখুন না কেন তার নিজের হাতে লেখা ঠিকানা। তার হাতের লেখাটা আমি পাব কি ক'রে?···তার হাতের লেখা তো চেনেন!'

মেরজাইয়ের পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বার ক'রে সগর্বে মেলে ধরেন গুপী চক্কোত্তী। সামান্য একটু বিজয়ের হাসিও বুঝি ফুটে ওঠে ও'র মুখে।

হাতের লেখাটা সত্যিই গোবিন্দর। সেদিকে একবার মাত্র চেয়েই বুঝতে পারে কমলা। অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই।

অনেকক্ষণ স্তম্ভিত শূন্য দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে কমলা ধীরে ধীরে উত্তর দেয়, 'তা তার সঙ্গে যখন সব কথাই হয়ে গেছে, তখন আর মিছে আমার কাছে এসেছেন কেন? বাকী যা কথা তার সঙ্গেই শেষ করবেন!'

দুঃখের চেয়ে অভিমানই যেন বেশী ফুটে ওঠে তার কণ্ঠে।

সঙ্গে সঙ্গে এতখানি জিভ কেটে দু কানে হাত দেন গোপীনাথ চক্রবর্তী। 'বাপ্ রে! তাই কখনও হয়? সে ছেলে আপনার নয়—বলেই দিয়েছে যে মাথার ওপর মা আছেন, মাসী আছেন, তাঁরাই গার্জেন। আপনাদের ছাড়া কিছুই হবার জো নেই। তবে তার অমত নেই—এই হ'ল কথা।···কী জানেন বেয়ান ঠাকরুন—বেয়ানই বলি, মেয়েটার অদেষ্টে থাকে এমন শাশুড়ী পাবে—না পায় তবু সম্বন্ধটা পাতিয়ে রাখতে ক্ষেতি কি—অনুগ্রহ ক'রে যখন কথাই কইলেন আত্মীয় ভেবে—কী জানেন—বিধবা বোনের মেয়ে, নিজের মেয়ের চেয়ে বেশী দায়িত্ব, তা ছাড়া আমার সাধ্যি তো এই—কাজেই দিনক্ষণ সময়-অসময় বিচার করতে গেলে আর চলে না। শ্মশানেই কথাটা পাড়া যে আমার উচিত হয় নি তা কি আর জানি না—না কি এই অশৌচের মধ্যেই এখানে আসা যে কত অন্যায় তাও বুঝি নি। কী বলব, নিরুপায়। কাল ভোরের টেরেনে দেশে ফিরব, এখন আর হয়তো আসার যোগাযোগই হবে না কত কাল! তবে যদি আপনার দয়া পাই তো—এই জন্যেই আসব। খরচাপত্তর ক'রে শুধু শুধু আসবার মতো আমার অবস্থা নয় বেয়ান!'

কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতায় ও বলবার সেই একান্ত দীন ভঙ্গীতে নরম হয়ে আসে কমলা। মাটির দিকে তাকিয়ে বলে, 'তা আমিও তো এখন কিছু পাকা বলতে পারব না চক্কোত্তী মশাই—বোন আছে, এক বোনপো আছে। তারা আসুক, ছেলেও আসুক—তার সঙ্গে কথা কই, পরামর্শ করি, তবে তো! এখন কোন কথা দিতে পারব না আপনাকে।'

'ব্যস্! ব্যস্! এই ঢের! এইটুকু যে দয়া করেছেন এতেই আমি কৃতার্থ।

নারাজ হন নি একেবারে, এইটেই বড় কথা! তবে আজ আমি উঠি—এখানেও আপনাদের অশৌচটা চলে যাক—দিন দশেক পরে একেবারে এসে মেয়ে দেখাবার ব্যবস্থা করব। আপনারা তো আর সে ধাধ্দাড়া গোবিন্দপুরে যেতে পারবেন না—এখানেই আমার শ্বশুরবাড়িতে এনে দেখাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। চাই কি বলেন তো এখানে এনেও দেখাতে পারি, একেবারে আপনার শ্রীচরণের কাছে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত।···তবে আসি, প্রণাম হই!'

অনেকগুলো বিপরীত মনোভাবের সংঘাতের মধ্যে সাধারণ ভদ্রতা ও লৌকিকতারই জয় হয়। কমলা ইতস্তত ক'রে বলে—'অশৌচ চলছে, এখানে তো—মানে আপনাকে কিছু খেতে-টেতে বলতে পারলুম না—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গুপীবাবু বলেন. 'না না, সে কি কথা! খাওয়াদাওয়ার ঢের সময় মিলবে। কুটুম্বিতে যদি হয়—তখন আপনার কাছে চেয়ে প্রসাদ পেয়ে যাব।···মেয়েটার কি এমন ভাগ্যি হবে—আপনার মতো দেবীকে শাশুড়ী পাবে!···তবে কি জানেন, ভগবান এক কূল ভাঙেন এক কূল গড়েন। বোনটাকে অনেক দুঃখ দিয়েছেন, মেয়েটার একটা ভাল হিল্লে ক'রেও দিতে পারেন!'

স্মিত প্রসন্ন মুখে বিদায় নেন গুপীবাবু।

থিয়েটারের দিন নয়—শুধু একটু আড্ডা দিতে আর অভ্যাসমতো বাকী মাইনের তাগাদা করতে যাওয়া—হেম সকাল ক'রেই ফিরল, প্রায় গোবিন্দরই সঙ্গে।

কমলা গোবিন্দকে সোজাসুজি প্রশ্ন না ক'রে হেমকেই নিয়ে পড়ল, 'হ্যাঁরে হেম, গুপী চক্কোত্তী মশাই লোকটা কে—কৈ তুই তো কিছু বলিস নি!'

হেম নিমেষে জ্বলে উঠল, 'এসেছিল নাকি সেই বদমাইশ বাস্তুঘুঘুটা? লোকটার সাহস তো কম নয়! পাজীর পাঝাড়া বেটা! কী বললে? ইস্—আমি থাকলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতুম!'

'ছিঃ বাবা, ভদ্রলোককে অমন ক'রে বলতে নেই। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ, তায় গরীব—ওদের কি আর অত ভাবতে গেলে চলে! বিপদে পড়ে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান হারিয়েছে। ওর দোষ কি?···তা ছাড়া খোকার মত না থাকলে—সে ঠিকানাই বা দিলে কেন?'

শেষের কথাগুলো বলবার সময় আড়ে একবার ছেলের মুখের দিকে তাকায় কমলা।

গোবিন্দ রাঙা হয়ে ওঠে—সেটা হ্যারিকেনের আলোতেও টের পাওয়া যায়। সে জড়িয়ে জড়িয়ে আমতা ক'রে বলে, 'বা রে—তা আমি কি করব—জোর ক'রে বললে ভদ্দরলোক—আর সত্যিই তো—গার্জেন আছে মাথার ওপর তাই বলেছি। এমন তো কিছু—'

হেমও গোবিন্দর কথা সমর্থন করে।

সত্যিই তো—দাদার কি দোষ। যা ছিনে-জোঁক লোকটা! তা ছাড়া সেখানে দাঁড়িয়ে তখন কী আর কথা-কাটাকাটি করতে ইচ্ছে করে?···তা তুমি তাকে

একেবারে হাঁকিয়ে দিয়েছ তো?'

'বেশ বাবা তোমরা। ছিনে-জোঁককে তোমরা বেটাছেলে হয়ে ছাড়াতে পারলে না—আমি ছাড়াব! কিছুই বলি নি, এখন এসব কথা আলোচনা করা যাবে না—শুধু এইটুকুই বলেছি। সেও পরে আসবে বলে চলে গেছে।'

'আসছি! উঃ—কী স্বার্থপর লোকটা! এই শোকের সময়—এখনও বোধ হয় সে মানুষটার চিতে জুড়োয় নি!'

কমলা তখনকার মতো কথাটা বন্ধ ক'রে দিলে অন্য প্রসঙ্গ পেড়ে। এই আলোচনার সময় কিন্তু গোবিন্দর কণ্ঠে বা মুখের রেখায় যে কোন প্রতিবাদ বা বিতৃষ্ণা ফোটে নি একবারও—এটুকু অর চোখ এড়াল না।

সারাদিনের পর ক্লান্ত উত্ত্যক্ত হয়ে ফেরে উমা—সাত-আট ঘণ্টা বকে বকে তার তার মাথা ঠিক থাকে না—এটা সবাই জানত। তাই উমার সামনে প্রসঙ্গটা কেউই তুললে না। কমলা ওকে খবরটা দিলে একবারে রাত্রে—বিছানায় শুয়ে।

কিন্তু সে যতটা আশা করেছিল উমা ততটা উত্তেজনা প্রকাশ করলে না। বরং শান্ত ভাবেই প্রশ্ন করলে, 'তা তুমি এখন কি করবে ভাবছ? যা শুনছি, সে লোক তো শ্রাদ্ধের দিন গুনছে।…কটা দিন গেলে মেয়ে নিয়েই এসে হাজির হবে।'

একটুখানি চুপ ক'রে থাকে কমলা। বোধ হয় একটু সংকোচই অনুভব করে। তার পর বলে, 'দেখিই না মেয়েটা যদি সত্যিই ভাল হয়—। বিয়ে তো দিতেই হবে। এই বয়স থেকে তো সন্ন্যাসী হয়ে থাকতে পাবে না ছেলে।'

'তা থাকতে পারে না ঠিকই—', কণ্ঠে তিক্ততা আর চাপা থাকে না উমার, 'তবু দিদি, মনুষ্যত্ব বলে একটা কথা আছে। সে মেয়েটা তোমার সংসারে ক'বছর কেনা বাঁদীর মতো খেটেই গেল শুধু—না পেলে এদিকের কোন সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর না পেলে স্বামীর তেমন ভালবাসা। তোমার সংসারের ভাবনাতেই সে বাপের বাড়িতেও যেতে চাইত না—চায়ও নি শেষ পর্যন্ত—সেই মেয়েটা অমন বেঘোরে মারা গেল, তার জন্যে ছটা মাসও তোমরা অপেক্ষা করতে পারছ না! অশৌচটা কাটতেও তর সইল না! লোকে কি বলবে? মানুষের চামড়া আছে—তাই যে কেউ বিশ্বাস করবে না!'

কমলা অপ্রতিভ হয়, একটু বিরক্তও হয়। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলে, 'বলছে বলেই যে এখনই হচ্ছে তাও তো নয়। মেয়ে দেখে পছন্দ হলেও তো আমরা দু মাস চার মাস সময় নিতে পারি। তা ছাড়া সত্যিই তো, সংসারেরও তো লোক চাই। আর খোকারও হাতে হাতে পান-জল কাপড়জামা কে যোগায়। হরেক রকম তোয়াজ ওর—আমার তো বয়স বাড়ছে দিন দিন—না কি কমছে?'

'সবই ঠিক দিদি—তবু মানুষ পারে না এটা। ভাব দিকি—যদি তোমার মেয়ে হ'ত?'

কমলা চুপ ক'রে যায়। খানিকটা পরে অসংলগ্ন খাপছাড়া ভাবে হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'স্বামীর ভালবাসা পেলে না—এ কথা বললি কেন? গোবিন্দ তো বৌমাকে

কোনদিন অযত্ন করে নি।'

'অযত্ন না করলেই ভালবাসা হয় না দিদি। আমাদের তো চোখ আছে— গোবিন্দ একদিনের জন্যেও মনেপ্রাণে বৌ বলে নিতে পারে নি তাকে·· তুমিও কি আর তা লক্ষ্য কর নি।'

কমলা এ কথার কোন জবাব দেয় না।

গলির প্রান্ত থেকে তেরছা ভাবে একফালি গ্যাসের আলো এসে পড়েছে ওদের ঘরে—সামনের বুককেসটার ওপর। কাচের মধ্য দিয়ে দেখা যায় ওপর ওপর সাজানো—বিবর্ণ-হয়ে-যাওয়া লাল কাপড়ে বাঁধা ওর স্বামীর অস্ত্রের পুঁথিগুলো। এগুলো তাঁর বুকের হাড় ছিল বলে কমলা প্রাণ ধরে ফেলতে পারে নি। ছেলেকে বলে রেখেছে, 'আমি মলে এগুলো গঙ্গায় দিস। তোর তো কোন কাজেই লাগবে না—আর ও কাজে লেগে দরকারও নেই।' এখন চুপ ক'রে সেই দিকে চেয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে অনেকক্ষণ পরে আপনিই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন। এসব কথা নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতেই বা হবে কেন!

॥ ৫ ॥

গুপী চক্রবর্তী বোধ হয় সত্যিই দিন গুনছিলেন। কালীতারার শ্রাদ্ধ মিটে যাবার ঠিক পরের রবিবারটিতেই তিনি একেবারে পাত্রী নিয়ে এসে হাজির হলেন।

পাত্রী আর তার সঙ্গে তার বিধবা মাও। আটঘাট বেঁধেই কাজ করতে অভ্যস্ত গুপীবাবু।

তখন বেলা তিনটে। সকলেই বাড়িতে আছে। সম্ভবত গুপীবাবু সেটাও হিসেব ক'রেই এসেছিলেন। গোবিন্দ তখনও ঘুমোচ্ছে—হেম উঠে বসে গল্প করছে মাসীদের সঙ্গে, আর একটু পরে সে থিয়েটারে যাবে। উমা ও কমলা অনন্ত চতুর্দশীর সলতের সুতো কাটছে টেকোতে।

বাইরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াবার শব্দ হয়েছিল—কিন্তু সেদিকে কেউ কান দেয় নি। কারণ ছুটির দিন এ গলিতে গাড়ি আসা কোন বিচিত্র ঘটনা নয়। সামনের বাড়ি, পাশের বাড়ি—এ বাড়িতেও বাড়িওয়ালার আত্মীয় কুটুম আসতে পারে। কিন্তু গাড়ির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই যখন গুপী চক্কোত্তীর ঈষৎ মেয়েলি ধরনের গলাটি নিখাদে বেজে উঠল—'কৈ গো বেয়ান ঠাকরুনরা, দরজাটা খুলবেন দয়া ক'রে?'—তখন আর সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না।

কমলা বিপন্ন উদ্বিগ্ন মুখে প্রথমেই একবার উমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিল— দেখল ব্যাপারটা অনুমান করতে তার এক মুহূর্তও দেরি হয় নি এবং সমস্ত চেহারাটা সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিবর্ণ ধারণ করেছে। আর সে রক্তিমার কারণ যে আর যাই হোক লজ্জা নয়—তাও বুঝতে বাকী রইল না কমলার।

কিন্তু তখন আর সেদিকে তাকাবার অবকাশ নেই।

অর্ধাবগুণ্ঠিতা বিধবা এবং তার পেছনে একটি কিশোরী মেয়ে উঠান পেরিয়ে

রোয়াকে এসে উঠেছে। অগত্যা অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে যেতেই হয়। উমাকে কিছু বলবার সাহস নেই—কমলাই উঠে তাড়াতাড়ি মাদুর এনে বিছিয়ে দেয়।

গুপী চক্রবর্তী সময়ের মূল্য বোঝেন। গাড়োয়ানের সঙ্গে তকরার করলে আরও দু আনা বাঁচত, কিন্তু সে দু আনার চেয়ে বর্তমানকালের একটি মিনিটের দাম অনেক বেশী। তিনি নির্বিবাদে হাওড়া থেকে আসার ভাড়া আট আনার জায়গায় পুরো দশ আনাই দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ঢুকলেন এবং অপেক্ষাকৃত চাপা অথচ তেমনি তীব্র নিখাদে নির্দেশ দিলেন, 'করছিস কি নিস্তার, পায়ে পড়, পায়ে পড়—এমন পা আর পাবি না। সাক্ষাৎ মা দয়াময়ী—ওঁর দয়া হলে তোর রাণীর আর কোন ভাবনা থাকবে না। রাণী তোর সত্যিই রাজরাণী হবে—।'

নিস্তার অর্থাৎ নিস্তারিণীও প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। তিনিও আর কালবিলম্ব করলেন না, সত্যিসত্যিই কমলার পায়ের কাছে বসে পড়ে আর্দ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'বড় জ্বালায় জ্বলে শীতল হতে এসেছি দিদি, আপনি তো আমার মতোই দুঃখী, দুঃখীর ব্যথা বুঝবেন! মেয়েটাকে পায়ে ঠাঁই দিয়ে আমায় বাঁচান। ইহজীবনে আর কোন সাধ-আহ্লাদ নেই—ওর সদ্‌গতি হলেই আবার সব হ'ল।···এখন আমার এই ধ্যানজ্ঞান, এই চিন্তা। আমাকে রক্ষা করুন দিদি—করতেই হবে। নইলে এ পা আর ছাড়ব না!'

কিন্তু এ নাটকের সত্যিই কোন প্রয়োজন ছিল না। ততক্ষণে নিস্তারিণীর পশ্চাদ্‌বর্তিনী সেই কিশোরী মেয়েটির দিকে চেয়ে এরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেছে।

রাণী যেন সাক্ষাৎ রাধারাণী।

বুঝি বা এই কিশোরীকে দেখেই সাধক মহাজনরা পদাবলী রচনা করেছিলেন—ভগবানের কিশোরীভজন লীলা কল্পনা করেছিলেন।

শ্বেতপদ্মের মতো ঈষৎ হরিদ্রাভ শুভ্র বর্ণ, পদ্মের পাপড়ির মতোই বিশাল বিস্ফারিত চোখ, তার সঙ্গে মানানসই টিকলো নাক, সুকুমার চিবুক। বারো তেরো বছরের মেয়ে—যৌবনের সুঠামতা এখনও লাভ করে নি তার তনু-দেহ—কিন্তু ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কী হবে, তা কী হয়েছে দেখেই বোঝা যায়। ছিপছিপে অথচ গোলালো গড়ন, ছোট ছোট রক্তাভ হাতে চম্পক-কোরকের মতো আঙুল, কৃষ্ণনগরের মূর্তির ধাঁচে ঈষৎ বেঁকে আছে। শুধু রূপ নয় মনটিও যে নির্মল, এখনও কাঁচা—গুপী চক্রবর্তীর আওতায় থেকেও অকালে পাক ধরে নি তাতে—বোঝা গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। মা'র কীর্তি দেখে—সম্ভবত পথে আসতে আসতে মামার রিহার্স্যাল কল্পনা ক'রেই—মেয়েটি খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। আর তাতে দেখা গেল দাঁতগুলিও তার মুক্তার মতই সাজানো—এমন কি শিল্পী বিধাতা সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখে টোলটি দিতেও ভুল করেন নি।

নিস্তারিণী মেয়ের নির্বুদ্ধিতায় জ্বলে উঠলেও সে উষ্মা বাইরে প্রকাশ করলেন না—শুধু এক হ্যাঁচকায় মেয়ের হাত ধরে টেনে এনে চাপা তর্জন ক'রে উঠলেন, 'পেন্নাম কর হতভাগী—স্বগ্‌গের দেবতা এঁরা—এঁদের পায়ে হাত দিবি—এ তোর জন্মান্তরের পুণ্যি।'

তজক্ষণে মেয়েটিও নিজেকে সামলে নিয়েছে। ছেলেমানুষ হ'লেও এই রকম ক্ষেত্রে তার পক্ষে হাসাটা যে উচিত নয়—সেটুকু বোঝবার মতো জ্ঞান বুদ্ধি তার হয়েছে। সে এবার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে কমলাকে প্রণাম করতে গেল।

কিন্তু কমলা তাকে পুরোটা হেঁট হতেই দিল না—তার আগেই তাকে নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে তার চিবুক স্পর্শ ক'রে সুগভীর স্নেহে বলে উঠল, 'তোমার আর পায়ে হাত দিতে হবে না মা, তুমি যে আমার মা-জননী!'

তার পর উমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'এঁকেও প্রণাম কর মা—আমার বোন।'

উমাকে প্রণাম ক'রে মেয়েটি অবশিষ্ট উপস্থিত ব্যক্তি হিসেবে হেমকেও প্রণাম করতে যাচ্ছিল, কমলা তাকে ধরে ফেলে বললে, 'উঁহু—উঁহু, ওকে প্রণাম করতে হবে না, ও যে সম্পর্কে তোমার দেওর হবে মা!'

ভাবের উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে এরা সকলেই ভাসছে তখন—কে কি বলছে, কী আচরণ করছে কারুরই তখন সে সম্বন্ধে কোন সচেতনতা নেই। কমলারই যদি এই রকম মুগ্ধ অবস্থা হয়—হেমের যে কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। মুখের কাছে যে কড়া কড়া কথাগুলো তৈরী হয়েছিল গুপীবাবুর উদ্দেশে—সেগুলো যে কখন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেছে তা হেম বুঝতেই পারে নি। এই ত্রয়োদশী কিশোরীর রূপের মোহ জাদু বিস্তার করেছে তার মনে মস্তিষ্কে চৈতন্যে—সে বিহ্বল হয়ে গেছে। কী করা উচিত, কী বলা উচিত কিছুই বুঝতে না পেরে ঘেমে লজ্জায় রাঙা হয়ে বিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। রাণী তাকে স্পর্শ করে নি—কিন্তু তাকে প্রণাম করতে, স্পর্শ করতে আসছিল—এইটে অনুভব ক'রেই অকারণে কণ্টকিত হয়ে উঠল।

কিন্তু গুপীবাবুর বুদ্ধি, দৃষ্টি কিংবা শ্রুতিশক্তি কিছুমাত্র আচ্ছন্ন বা মুগ্ধ হবার কারণ ঘটে নি। তিনি এই সুযোগ মুহূর্তকালের জন্য নষ্ট হতে দিলেন না, কমলার মুখের কথার শেষটুকু শেষ হবার আগেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'জয় মা ব্রহ্মময়ী, জয় গৌর আনন্দময়। ব্যস্—জবান পেয়ে গেছি, আর কিছু ভাবি না বেয়ান, দরিদ্র ব্রাহ্মণকে যে ভিক্ষাটি দিলেন আর এই অনাথা বেওয়া বিধবাকে—এর জন্যে মা আনন্দময়ী আপনার প্রাণ পুরে মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। নিস্তার কার মুখ দেখে উঠেছিলি আজ, তোর মেয়ের হিল্লের মতো হিল্লে হয়ে গেল!'

বিচার শুরু হবার আগেই যদি আসামী অপরাধ কবুল ক'রে বসে থাকে, তা হলে পরে আর সওয়াল জবাব জমে না। মামলা চলারও আর কারণ থাকে না।

এক্ষেত্রে কমলারও হ'ল তাই।

কোন্ এক দুর্বল মুহূর্তে এমন কথাই বেরিয়ে গেল যে পরে আর কোন ওজর আপত্তি ওঠাবার অবসর রইল না। গুপীবাবু এবং তার উপযুক্ত বোন নিস্তারিণী দুজনে পালা ক'রে এমনই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ শুরু করলেন যে এ পক্ষে আর কেউ কোন কথা কইবার বিশেষ ফাঁকও পেলে না। তাঁরা বিবাহের প্রতিশ্রুতি তো নিয়ে গেলেনই—এক দিন ঠিক করা ছাড়া বলতে গেলে আর কোন কথাবার্তাও বাকী রইল না। কমলা বা হেমের পক্ষ থেকে সামান্য একটু দ্বিধার ভাব দেখাবার

ক্ষীণতম চেষ্টাও কোথায় উড়ে চলে গেল এঁদের আন্তরিকতার প্রবল বাতাসে।
দেনাপাওনার কথাও তোলা গেল না,—এঁরা বিশেষ কিছুই চাইবেন না এক রকম এই কথা আদায় ক'রেই নিয়ে গেলেন গুপীবাবু। বাকী রইল শুধু দিনটা ঠিক করা—সেটা গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা ক'রে ঠিক হবে—এই স্থির রইল, অর্থাৎ শোভনতার জন্য কতটা অপেক্ষা করা যায় সেইটে ভেবে দেখতে হবে। তা ছাড়া —কমলা মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল—হয়তো আর্থিক প্রশ্নও উঠবে, গোবিন্দকে ওর বন্ধু-মনিবের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত কিছু টাকা ধার করতেও হবে।

সে কথাটাও এখন সারতে পারলে গুপীবাবু খুশী হতেন কিন্তু মানুষের কোন সার্থকতাই পরিপূর্ণ ভাবে দেওয়া বুঝি বিধাতার ইচ্ছা নয়—তাই সেটা আর হয়ে উঠল না। এঁরা আসাতেই গোবিন্দর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল—সে ওধারের দরজা দিয়ে প্রায় তখনই সরে পড়েছে।...

উপযুক্ত জলযোগের পর গুপীবাবুরা বিদায় নিতে কমলা উমার মুখের দিকে তাকাবার অবকাশ পেল। বড় রকমের একটা ঝড়ই সে আশঙ্কা করেছিল সেদিক থেকে, কিন্তু প্রাথমিক রোষরক্তিমা মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখে যে একটা ভাবলেশহীনতা ফুটে উঠেছিল—তার আর কোন পরিবর্তন হ'ল না। অভদ্রতা করার মানুষ সে নয়, নিস্তারিণীর দু-চারটে প্রশ্নের উত্তর ভদ্র ভাবেই দিয়েছে—তবে সেটা কমলার কাছে খুব বড় আশ্বাস নয়। সে সারা সন্ধ্যাটা বার বার ভয়ে ভয়েই তাকাতে লাগল উমার মুখের দিকে, কিন্তু সেখানে কোন বৈলক্ষণ্য টের পাওয়া গেল না। তার শান্ত উদাসীন মুখভাবে বা সহজ আচরণে কোথাও এতটুকু রূপান্তর ঘটল না।

তবু কমলার ভয় সবটা যায় নি—রাত্রে শুতে গিয়ে একান্তে হয়তো কথাটা উঠবে এ আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু রাত্রেও সহজ ও স্বাভাবিক দু-চারটে কথাবার্তার মধ্যেই উমা এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। নিজে থেকে বিকেলের কথাটা তুলবে এত সাহস কমলার হ'ল না—তবু এইবার সে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হ'ল।

মনকে সে আশ্বাস দিলে, আর যাই হোক—কোন বড় রকমের তুফান আর উঠবে না।

এর পর মাস দুই কাটল নিরাপদেই। এর মধ্যে গুপীবাবা বারকতক এসেছেন, দিনও ঠিক হয়ে গেছে, বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন শুরু হয়েছে। সামনের অঘ্রানেই বিয়ে। কমলার মনে যেটুকু আশঙ্কা ছিল সেটুকুও আর নেই। বিবাহের আয়োজনে উমা কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নি বটে কিন্তু তার তরফ থেকে কোন অসহযোগেরও আভাস পাওয়া যায় নি।

বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতোই একেবারে প্রথম সে আভাস পাওয়া গেল পাকা-দেখার হাঙ্গামাও মিটে যাওয়ার পরের দিন—বিবাহের যখন আর মাত্র সাতটি দিন বাকী আছে।

উমা সহজ ভাবেই সন্ধ্যার পর পড়িয়ে ফিরে- আহ্নিক করতে যাবার আগে

দিদির কাছে কথাটা পাড়লে, 'দিদি, আমার এক ছাত্রী থাকে এই কাছেই, ক্রিশ্চানদের হোস্টেলটার পেছনে—তারাও ব্রাহ্মণ, দু-তিনটি বিধবা আছেন বাড়িতে। তাঁরা একটা ছোট ঘর ভাড়া দেবেন—বাড়ির মধ্যে, ভাড়াও খুব কম—মনে করছি এই মাসের পয়লা থেকে আমি সেখানে গিয়েই থাকব।'

খুব স্বাভাবিক ভাবে, একান্ত শান্তকণ্ঠে কথাগুলি বললে উমা,—কিন্তু তাতেই আরও দুর্বোধ্য ঠেকল কমলার কাছে। সাধারণ শব্দেরও যেন অর্থ গ্রহণ করতে পারলে না সে—হাঁ ক'রে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

অবশেষে যখন ওর কণ্ঠে কথা ফুটল, তখন শুধু বিহ্বল ভাবে এই প্রশ্নটুকুই করতে পারল, 'তুই—তুই একলা থাকবি? আলাদা ঘরভাড়া ক'রে? কী বলছিস?'

'দোষ কি? আর অন্তত আমার স্বভাব-চরিত্রের দোষ কেউ দেবে না। দশ বাড়ি মেয়ে পড়িয়ে খাই, সে দোষ দিলে এত কাল ঢের দিতে পারত। তা ছাড়া সে বয়সও আর নেই!'

'কিন্তু তার দরকারটা কি পড়ল···সেইটেই তো বুঝছি না!'

'সব কথা সবাই বুঝতে পারে না দিদি!···সে মেয়েটাকে আমিই একরকম জোর ক'রে পাঠালুম, আমি না পাঠালে সে হয়তো যেত না—মরতও না। সেজন্যে তার কাছে চিরদিন আমি অপরাধী হয়ে থাকব।···তার বড় সাধের সংসার—সংসার করবারও তার বড় শখ। তার জায়গায় এই ঘরে এই সংসারে তার সতীন এসে ঢুকবে—তিন মাস না যেতে যেতে—এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না। মনে হবে আমিই তাকে খুন করেছি—এই মতলবে। তার আত্মা আমাকে অভিসম্পাত করতে থাকবে স্বর্গ থেকে। না দিদি, মাপ কর আমাকে—এখানে আর আমি থাকতে পারব না। এ ঘরে আর একটা মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ দেখলে এখানে আমার মুখে অন্ন রুচবে না।' বলতে বলতে, নিজেকে সংযত করবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও উমার কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এসেছিল, সম্ভবত সেই আসন্ন চোখের জল গোপন করতেই সে আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়ে নিজের পুজোর আসনে গিয়ে বসে চোখ বুজল।

ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদনের অশ্রুর মধ্যে অনুশোচনা ও আত্মগ্লানির অশ্রু আত্মগোপন করতে পারবে—সুলভ ভাবাবেগ প্রকাশ হয়ে পড়ার লজ্জায় পড়তে হবে না!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

কথাটা কেমন ক'রে রাষ্ট্র হয়ে গেল তা হেম বুঝতে পারলে না। সম্ভবত কম্বুলে-টোলা থেকে ফিরে এসে রুষ্ট এবং উৎকণ্ঠিত রমণীবাবুকে যখন দেরি হওয়ার কৈফিয়ত দিচ্ছিল, সেই সময়ই কেউ শুনে থাকবে।

বাবু বেশ একটু তেতে ছিলেন, আর তাতাই স্বাভাবিক—সেটা হেমও মনে মনে স্বীকার করে। বাড়িটা সে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলে কি না—চিঠিটা ঠিকমত

পৌঁছল কিনা—সে সময় তাঁর উৎকণ্ঠা বোধ করারই কথা ; কারণ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত বন্ধু যাবেন তাঁর সঙ্গে, তাঁদের আতিথেয়তার দায়িত্ব আছে। কিছু জরুরী কাজও ছিল—খবরটার জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে সময় পার হয়ে গেল, কাজটা নষ্ট হ'ল। সুতরাং ঝাঁজটা অনেকক্ষণ থেকেই মনের ভেতর জমা হয়েছে, তার ফলে চাপা গলায় কথা কইবার অর্ধ-আন্তরিক ক্ষীণ চেষ্টাটা প্রথম দুটো-চারটে শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই কোথায় ভেসে চলে গেল—বেশ চড়া গলাতেই কথা শুরু করলেন। নিজের কাজ পণ্ড হওয়ার তিক্ততা, ওর নিবুদ্ধিতার জন্য বিরক্তি এবং সবটা জড়িয়ে অতিরিক্ত একটা উষ্মা—গলার আওয়াজে একসঙ্গে উপ্‌চে বেরিয়ে এল যেন।

বাবু প্রচণ্ড রাশভারী মানুষ। তাঁর এই উষ্ণ কণ্ঠস্বরের সামনে বহুদিনের পুরনো কর্মচারীদেরই মাথার ঠিক থাকে না—হেম তো সেদিনের লোক। তাঁর চোখমুখের চেহারা দেখেই এক নিমেষে ঘেমে উঠেছিল - এখন ধমক খেয়ে গলাতে যেন আওয়াজটাই জড়িয়ে গেল, প্রাণপণ চেষ্টাতেও বিলম্ব হওয়ার কারণটা গুছিয়ে বলতে পারলে না। ফলে যে কৈফিয়তটা এক মুহূর্তে দেওয়া যেত সেইটে বলতেই তার বহু সময় লাগল এবং ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা চড়া চড়া ধমক খেতে হ'ল।

যাই হোক—বিলম্বের কারণ শেষ পর্যন্ত অতি কষ্টে তার সেই জড়ানো-গলার আওয়াজ এবং উল্‌টো-পাল্‌টা কথার মধ্যে থেকে উদ্ধার ক'রে বাবু খুশীই হলেন। আরও খুশী হলেন হেমের এই অহেতুক ভয় দেখে। কর্মচারীদের কাছ থেকে প্রীতি বা শ্রদ্ধার চেয়ে ভয়টাই তাঁর বেশী পছন্দ। তাঁর দাপট আছে, তাঁকে ওরা যমের মতো ভয় করে—এইটে জানলে তিনি খুশী ও নিশ্চিন্ত হন।

আজও তাঁর মুখ প্রসন্ন হতে দেরি হ'ল না। তবু প্রচ্ছন্ন একটা আশ্বাসমিশ্রিত মৃদু ধমকের সুরেই বললেন, 'এই তো—এই কথাটা এতক্ষণ বলে ফেললেই তো হয়ে যেত। বাজারটা ক'রে দিয়ে এসেছ—কাজটা তো কিছু অন্যায় কর নি। তার জন্যে এত ভণিতা কেন ? তা মাছ-টাছ বেশ ভাল দেখে কিনে দিয়ে এসেছ তো ?··· পচা-পাচ্‌কো হলে খুব মুশকিল হবে কিন্তু—বড় বড় লোক সব যাবে, দুজন ব্যারিস্টার, একজন হাকিম। সাবধান ! দেখো বাপু, আমাকে ডুবিও না যেন।'

এ কণ্ঠস্বরে খানিকটা আশ্বস্ত হ'ল হেম। মাথা হেঁট করেই জবাব দিলে, 'আজ্ঞে না—টাটকা দেখেই কিনেছি। জিনিস কোনটা খারাপ হবে না।'

'বেশ বেশ—তা হলেই হ'ল।' তার পর জামাটা উল্‌টে ট্যাঁক থেকে একটা আধুলি বার ক'রে ওর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন' 'এটা রাখো—বাড়ির জন্যে মিষ্টি কিনে নিয়ে যেও।'

পকেটে মনিব্যাগ থাকে, তাতে টাকারও অভাব নেই—তবু সর্বদা ট্যাঁকে কিছু রেজগি রাখা রমণীবাবুর অভ্যাস। বলেন 'একশো বার ব্যাগ বার ক'রে পয়সা দেওয়া বড় হ্যাঙ্গাম ! তা ছাড়া কেউ তুলে নিলে তো সব গেল—একটা পয়সার আজীর !'

দুখানা গাড়ি থাকা সত্ত্বেও রমণীবাবু হামেশাই ট্রামে যাতায়াত করেন—সুতরাং পকেটমারের ভয় থাকাটা স্বাভাবিক।

সেই চেঁচামেচির ফলে দু-চারজন বাবুর ঘরের বাইরে এসে জমাটা আশ্চর্য নয়—আর দুজনের কথাবার্তা থেকে ঘটনাটা অনুমান করতেও কারুর অসুবিধা হবার কথা নয়।

তার ফলে হেমেরই প্রাণান্ত। একটা ঘাড়ে কারও দুটো মাথা নেই যে বাবুর সামনে রসিকতা করবে। আড়ি-পাতার ইতিহাসটাও তাঁর জানার সম্ভাবনা ছিল না—কারণ তাঁর বাইরে আসার আভাস মাত্র পেয়েই সবাই পালিয়েছিল। হেমও প্রথমটা তাই বুঝতে পারে নি। বুঝতে পারলে একেবারে যখন চারিদিক থেকে বাক্যবাণ বর্ষিত হতে শুরু হ'ল—তখনই।

প্রথমেই শুরু করল নন্দ—ওরই এক সহকর্মী গেট-কীপার।

চোখ মট্‌কে মুচকি হেসে বললে, 'আর কি হেমচন্দর—তোমার কপাল তো খুলে গেল—দেখো বাবা, সুসময়ে গরীবদের কথা একটু মনে রেখো—একেবারে পায়ে ঠেলো না!'

ওরা যে কেউ অপরাহ্ণের ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানে—এ অনুমান হেমের স্বপ্নের অগোচর। সে বিহ্বল হয়ে খানিকটা নন্দর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে, 'তার মানে?'

'না—তাই বলছি!' আবারও মুচকি হাসে নন্দ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কানাই এসে পড়ে।

'বাবা ডুবে ডুবে জল খাও—ভাবো শিবের বাবা টের পাচ্ছে না। হুঁ-হুঁ—সবাই বলে পাড়াগেঁয়ে মেড়া, ভূত, বোকা। আমি চিরদিন বলে এসেছি পাড়া-গাঁয়ের লোকেরা আমাদের এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনে আনতে পারে। তা ভাল ভাল—নিজের আখের দেখবে বৈ কি। তবে একটু সাবধানে চ'লো ধন—একদিকে মেয়েমানুষ আর একদিকে বড়লোক। দুই-ই সমান। লোকে কথায় বলে—বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষ্যাণে হাতে দড়ি ক্ষ্যাণেকে চাঁদ!···আর মেয়েমানুষ? আরও সাংঘাতিক—ও হ'ল শাঁখের করাত, যেতেও কাটে আসতেও কাটে।'

হেম আরও বিহ্বল হয়ে পড়ে। একটা অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা-মতো সন্দেহ যে মনের কোণে উঁকি না মারে তা নয়—তবু সে অবাকই হয় সত্যি-সত্যি। বলে, 'কী যে তোরা বলছিস বুঝতেই পারছি না!'

'ইল্‌-লো!' কানাই ওর দাড়িটা ধরে নেড়ে দিয়ে বলে, 'কচি খুকী একেবারে! কিছু জান না!···অত বড় ঘুঘু কন্‌ট্রাক্‌টারকে ঘায়েল ক'রে তার মেয়েমানুষের দিকে হাত বাড়িয়েছ—তুমি কিছু জান না! ন্যাকা!'

'এই কেলো—কী করিস। চুপ কর্‌।' সতর্ক ক'রে দেয় নন্দ।···

একটু পরে দক্ষিণাবাবুর সঙ্গে দেখা হতে তিনিও মুখ টিপে হাসেন। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, 'দেখো হে ছোকরা, সাবধান!···বেশী বাড়াবাড়ি করতে যেও না যেন। ও হ'ল নৈবিদ্যির মোণ্ডা—কুকুরের ওতে মুখ দিতে নেই!'

লাল হয়ে ওঠে হেম—লজ্জাতেও বটে, অপমানেও বটে। কিন্তু এতকাল এখানে থেকে এইটুকু বুঝেছে যে, এ ধরনের কথা নিয়ে বাদানুবাদ বা তর্কের ক্ষেত্র এটা

নয়। পাঁকে নাড়া দিলে, পাঁকই ঘ্লোয়—পরিষ্কার জল মেলে না তাতে।

সে শুধু আস্তে আস্তে বলে, 'কী বলছেন দক্ষিণাদা তা বুঝছি না—মনিব হুকুম করেছিলেন—তামিল না ক'রে উপায় ছিল না। এতে এত টিটকিরির কী আছে তাও বুঝি না!'

দক্ষিণাবাবু আর কথা বাড়ান না, ওর পিঠে গোটা দুই মৃদু চাপড় মেরে বলেন, 'রাগ হযে গেল অমনি! ঠাট্টা করছিলুম রে।·· তবে ভাই সাবধানে থাকিস একটু। এখানে অনেক বছর কাটল তো—অনেক দেখলুম।'

কিন্তু এধারে যতই যা রাষ্ট্র হোক—হেম নিজের ভাগ্যের কোন পরিবর্তনই দেখতে পায় না। বরং উলটোটাই দেখে।

কৃতজ্ঞতা সে আশা করে নি—কী-ই বা সে করেছে কৃতজ্ঞতা পাবার মতো? তা কিছু নয়—তবে পরিচয়ের স্বীকৃতিটা অন্তত আশা করেছিল। কিন্তু দিন-তিনেক পরেই কী একটা কাজে ভিতরে যাবার দরকার হতে এবং (হয়তো নিজের সচেতন মনের অগোচরে সেরকম একটা চেষ্টাও ছিল) নলিনীবালার সামনে পড়ে যেতেও, সে অবাক হয়ে দেখলে, সামান্য মাত্র ব্যক্তিগত পবিচয়েব দাপ্তিও ফুটল না তার চোখে। যেমন সাধারণ ভাবে অন্য দিন নির্লিপ্ত স্মিতমুখে চেয়ে বসে থাকে—তেমনিই রইল নলিনী।

শুধু অবাক হ'ল না হেম—আহতও হ'ল।

এতটা সে আশঙ্কা করে নি। হলেই বা বাবুর প্রেয়সী—তা বলে চিনতে পারবে না, এত অহঙ্কার কিসের!

অপমান-বোধ, ক্ষোভ অথবা উষ্মা—কারণ যা-ই হোক, হেমের কান দুটো আগুনের মতো গরম হয়ে উঠল। বিশেষ ক'বে তার মনে হল, চারিদিক থেকে অসংখ্য কৌতূহলী দৃষ্টি বিদ্রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

সে স্থান কাল পাত্র সব ভুলে সম্পূর্ণ অকারণেই, নলিনীর সামনে দাঁড়িযে দাঁত বার ক'রে বোকার মতো হেসে বললে, 'এই যে, ভাল আছেন?'

নলিনী একটু যেন বিস্মিত হয়েই ভ্রূ কুঁচকে তাকালে, তার পর তেমনি থতমত ভাবেই বললে, 'ভাল—হ্যাঁ—তা—। অ, আমাদের হেমবাবু! পোড়া কপাল আমার। সেদিন বুঝি বাবুর চিঠি নিয়ে গিছলেন! ঠিক বটে। হ্যাঁ ভাই, বেশ ভাল আছি। আপনার খবর ভাল সব? আহা, আপনি সেদিন কষ্ট না করলে বড় বিপদে পড়তে হ'ত।'

এই বলে চারিদিকে একবার বিচিত্র অমায়িক ভঙ্গীতে তাকিয়ে নিয়ে পাশের আর এক অভিনেত্রীর দিকে হাত বাড়াল, 'দেখি লা নেড়ী তোর ডিবেটা—আমার চাকরটা আজ আবার এমন ঝাল পান এনেছে, মোটে মুখে দিতে পারছি না!'

হেম তখন পালাতে পারলে বাঁচে—শুধু এখান থেকে নয়—এই থিয়েটার থেকেও। মনে হচ্ছে আরও উপহাস এবং টিটকিরি নির্বোধের মতো সেধে নিজের ওপর টেনে আনল সে।

অন্ধের মতো হোঁচট খেতে খেতে এবং প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে একটা উইংস-এর

পাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছছে—কানের পাশ থেকে হিস্‌ হিস্‌ ক'রে উঠল দক্ষিণাদার কণ্ঠস্বর, 'ইস্টুপিড্‌। সেধে অপমান হতে না গেলে বুঝি চলছিল না? ঐটুকু কথা কয়ে কী স্বর্গ-লাভ হ'ল তাই শুনি!···নিজেও মরবি ঐ ছুঁড়ীটাকেও মারবি যে—এটাও বুঝিস না?'

আরও বিস্মিত হ'ল হেম—কিন্তু তবু ও'র এই মন্তব্যের অর্থটা জিজ্ঞাসা করতে পারল না দক্ষিণাদাকে। অপমানে লজ্জায়, কেমন এক ধরনের অবর্ণনীয় গ্লানিতে কান-মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করছিল—গলা দিয়ে একটু স্বরও বেরোল না।

॥ ২ ॥

দক্ষিণাবাবুর কথাগুলোর অর্থ বুঝল হেম—আর কদিন পরে।

সেদিন বহুরাত্রি পর্যন্ত জেগে এপাশ ওপাশ করতে করতে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে—আর নয়! চাকরি করতে গেছে, চাকরিই করবে। বাইরে তার কাজ—বাইরে থাকাই ভাল—কোন দিন কোন ছুতোয় সে ভেতরে যাবে না, কোন মেয়েছেলের সঙ্গে কথাও কইবে না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রইল না—দিন পনেরো পরেই আবার এক অপরাহ্ণে বাবু ওকে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে।

ভয়ে ভয়েই গেল হেম—যদিচ অনেক ভেবেও এমন কোন অপরাধের কথা তার মনে পড়ল না যাতে ভয় পাবার কারণ থাকে—কিন্তু বাবু ডাকলেই বুকটা ধড়াস ক'রে উঠে। এইরকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে সকলের।

যাই হোক—ঘরে ঢুকে দেখলে বাবুর মুখ অনেকটা প্রসন্ন। নিজের ডেস্কের সামনে বসে একটা কাগজ মেলে আগের দিনের হিসেব দেখছিলেন। কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললেন, 'এসেছ? দাঁড়াও।' তার পর হিসেবটা দেখা শেষ হতে ওর দিকে খানিকটা নিঃশব্দে চেয়ে থেকে বললেন, 'ও, হ্যাঁ—তোমাকে ডেকেছিলুম বটে। কী যেন তোমার নাম—হেম না?···তা শোন, একটা কাজ করতে পারবে? সেদিন যে বাড়িটায় গিছলে, মনে আছে তোমার?···আজও একবার সেখানে যেতে হবে।···মানে—আজও কজন লোক খাবে, একটু বাজার দরকার। সেদিন নাকি তুমি বেশ ভাল বাজার করেছিলে—অনেক সস্তায়ও। সাজার-ঝিকে দিয়ে বাজার করানো—সে বেটি দু' হাতে চুরি করে; তা পারবে বাজারটা ক'রে দিতে?'

প্রতিজ্ঞার কথাটা মনে পড়ে বৈকি!

তবুও মনিবের মুখের ওপর 'না' বলতে পারে না। মাথা হেঁট ক'রে বলে, 'পারব।'

বেশ, বেশ। এই তো চাই, কোন কাজেই না বলতে নেই। আমি—আমাকে আজ এই দেখছ। একদিন গামছা কাঁধে ক'রে ফিরি করেছি এই কলকেতার রাস্তাতেই, মেড়োদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। আজও—লাখ লাখ টাকার ঠিকেদারি করি বটে—কিন্তু নিজে ছাতি মাথায় দিয়ে রোদেজলে দাঁড়িয়ে মিস্তিরি খাটাই।···তোমার উন্নতি হবে।···এই নাও ফর্দ। দু-রকম মাছ, একটু মাংস—আর আদা পিঁয়াজ টকদই, আলু হিসেব-মতো। সবই লেখা আছে, এই দশটা টাকাও ধর—

কেন ভাল দেখে জিনিস কিনো—বিশিষ্ট ভদ্দর-লোকেরা খাবেন।'

তার পর কী ভেবে ট্যাঁক থেকে আরও দুটো টাকা বের ক'রে দিয়ে বলেন, 'এটাও রাখো—যাচ্ছো যখন তখন অমনি তিনকড়ি ময়রার দোকান থেকে দই-সন্দেশও কিনে নিয়ে যেও—দশে বোধ হয় কুলোবে না, আরও লাগবে।'

হেম ফর্দটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, 'কিন্তু এত বাজার নিয়ে যাব কী করে? ঝাড়ন কি গামছা একটা—। ও বাড়িতে কি আগে যেতে হবে? গিরিধারীকে সঙ্গে নেব?'

'তোমার তো খুব মনে থাকে হে ছোকরা! গিরিধারীর নামটাও মনে ক'রে রেখেছ?' তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে একবার তাকান রমণীবাবু ওর মুখের দিকে, 'না তার দরকার নেই। একেবারে এই নতুন বাজার থেকে বাজার ক'রে একটা ঝাঁকামুটের মাথায় চাপিয়ে নিয়ে যেও।·· কতই বা নেবে—চারটে পয়সা বড় জোর! তার জন্যে আর দোকর আসা-যাওয়া ক'রে লাভ কি? নতুন বাজারে মাল কিনলে কিছু ওয়ারাও পাওয়া যাবে—তাতে মুটের পয়সাটা উসুল হবে!'

মুটের পয়সা ওর ট্রামভাড়াতেও উসুল হবে, মনে মনে গজগজ করতে লাগল হেম, মুটের মাথায় মাল চাপিয়ে কিছু ট্রামে যেতে পারবে না। মাঝখান থেকে ওর পয়সাটা মাটি!

কিন্তু সেটা মুখে বলা সম্ভব নয়। 'যে আজ্ঞে' বলে কোঁচার খুঁটে টাকা কটা বাঁধতে বাঁধতে বেরিয়ে পড়তে হ'ল তখনই।

করতেই হবে—তাই করা। কিন্তু মনটা অপ্রসন্ন হয়ে রইল সারাক্ষণ। আবাব নলিনীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—এই ভেবেই আরও বিশ্রী লাগছিল।

মুটের মাথায় মোট চাপিয়ে, নিজের দু হাতে দইয়ের খুলি আর সন্দেশেব হাঁড়ি নিয়ে ভাদ্রের খর-রৌদ্রে হেঁটে যেতে বার বার নিজের মনকে শাসাল, 'খবরদার, আর কোনও রকম ঘনিষ্ঠতা করা নয়। দোরের কাছ থেকে গিরিধাবীকে ডেকে বুঝিয়ে দিয়েই চলে আসতে হবে। বসতে বললেও বসব না!'

কিন্তু বাড়িতে পেঁাছে কড়া নাড়তে দোর খুলে দিলে গিরিধারী নয়—নলিনী স্বয়ং।

'আসুন, আসুন। আপনার জন্যই সেই থেকে নিচে বসে আছি হা-পিত্যেশ ক'রে। আসুন, আসুন—ভেতরে আসুন। যা রোদ আজ বিকেল অব্দি!'·

হেম এ আত্মীয়তায় ভিজবে না—সে শুষ্ক স্বরেই বলবার চেষ্টা করলে, 'থাক, আমি আর এখন ভেতরে যাব না। জরুরী কাজ আছে একটা—আপনি গিরিধারীকে ডাকুন—মালগুলো নামিয়ে নিক্। এই ফর্দ বাবু দিয়েছিলেন, মিলিয়ে নেবেন—'

'আচ্ছা আচ্ছা! হয়েছে। অত রাগ করতে হবে না। দয়া ক'রে ভেতরে আসুন দিকি। ঘাট হয়েছিল আমার, গলবস্ত্র হয়ে মাপ চাইছি।·· নিন্—কী অবস্থা হয়েছে বলুন তো—এই ভাদ্দরের রোদটা মাথার ওপর দিয়ে গেল—তা একটা ছাতাও কি নিতে নেই? অবিশ্যি ছাতা থাকলেই বা কি হ'ত—দু হাত

বোঁঝাই।...বাবুর যেমন কাণ্ড! এখানে এসে গিরিধারীকে ডেকে নিয়ে গেলেও হ'ত। আসুন।'

অগত্যা ভেতরে আসতে হয়।

দইয়ের থুলি আর সন্দেশের হাঁড়ি নলিনীই নামিয়ে নেয় হাত থেকে।

'কৈ রে কোথায় গেল—অ গিরিধারী। এই নে, এগুলো ধর—ভাল ক'রে চাপা দিয়ে রাখ গে যা মা'র ঘরে।...দেখিস বেড়ালে না খায়। মুটেটাকেও অমনি নিয়ে যা; রান্নাঘরে মালগুলো নামিয়ে রাখ সাবধানে।...ওকে চারটে পয়সা দিয়ে দিস—'

'না, না, ওর পয়সা আমার কাছে আছে।'

'থাক গে যাক!' গলা নামিয়ে বলে নলিনী, 'এই ঠেকো রোদ্দুরে এতটা পথ হেঁটে এসেছেন—ট্রামভাড়া বলেও তো বাবু কিছু দেয় নি। ওটা আপনিই রাখুন।

তার পর গলাটা আরও নামিয়ে বলে, 'হ্যাঁ রে গিরিধারী, মা ঘুমোচ্ছে তো—না?'

'না তো দিদিবাবু—মা তো মাসীমার ওখানে বেড়াতে গেছে!'

'যাক নিশ্চিন্ত—তা হলে সন্ধ্যের আগে আর এ-মুখো হচ্ছে না। আসুন আসুন, ওপরে আসুন।'

আপত্তি এবং প্রতিজ্ঞা যেন কোন্ বহুদূর অতীতের কথা, এরই মধ্যে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে। মানুষটার সহৃদয়তা শুধু নয়—অন্তরঙ্গতা এবং আত্মীয়তাই—মুগ্ধ করল হেমকে। সে ওর পিছু পিছু অভিভূতের মতোই উঠে গেল।

সে-ই পূর্ব-পরিচিত ঘর। মেঝেতে একটা মাদুর বিছানো রয়েছে—তার সঙ্গে একটা ছোট বালিশও কার শোবার চিহ্ন বহন করছে—সম্ভবত গরমের জন্যে নলিনীই এখানে শুয়েছিল। হেম সেই মাদুরেই বসতে যাচ্ছিল, নলিনী খপ ক'রে একটা হাত ধরে ফেললে।

'না-না, ওখানে নয়। ভাল হয়ে বসুন—বিছানায়।'

এক রকম জোর ক'রেই টেনে নিয়ে গিয়ে ঢালা বড় বিছানাটায় বসাল সে।

হেম আরও অভিভূত। সুগৌর মুখ তার অঙ্গার-বর্ণ ধারণ করেছে, ঘামে সমস্ত দেহটার অবস্থা হয়েছে ভিজে গামছার মতো—কিন্তু সে কতটা ভাদ্রের রোদ্রে আর কতটা এখন লজ্জায় সংকোচে—তা বলা শক্ত। বার বার নিজের ছোট ময়লা রুমালটা দিয়ে মুখ মোছবার চেষ্টা করছে কিন্তু সেটা ইতিমধ্যেই ভিজে সপ্‌সপে হয়ে উঠেছে বলে তাতে আর কোন কাজ হচ্ছে না।

নলিনী এতক্ষণ ওর মুখের দিকেই চেয়েছিল—কেমন এক রকমের মুগ্ধ দৃষ্টিতে—এখন রুমালের বদলে কোঁচার খুঁটে ঘাম মোছবার চেষ্টা করতেই তার সংবিৎ ফিরে এল—সে তাড়াতাড়ি আলনা থেকে একটা ফরসা তোয়ালে টেনে নিয়ে ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, 'এইটে নিন। একেবারে ধোপদস্ত—কাচা। আমাদের কারুর ব্যাভার করা নয়।...ইস্ কী হয়েছে মনে হচ্ছে যেন বালতি ক'রে কে জল

ফেলে দিয়েছে। লোকটা মানুষ নয়, চামার—চামার !···কেন, আর একটু রোদ পড়লে পাঠানো যেত না !'

সে একটা পাখা এনে জোরে জোরে হাওয়া করতে লাগল। তাতে হেম আরও বিব্রত বোধ করল—হাত বাড়িয়ে পাখাটা টেনেও নিতে গেল একবার, কিন্তু আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ডান হাতটা সরিয়ে নিয়ে বাঁ হাতে ওর হাতটা চেপে ধরল নলিনী, 'অত কিন্তু হচ্ছেন কেন বলুন তো ! ব্রাহ্মণ মানুষ, একটু সেবা করলুমই বা—কত পাপ করেছিলুম গেল জন্মে, তাই এই সব ঘরে জন্মেছি, আবার এজন্মে ব্রাহ্মণকে দিয়ে ব্যাগার খাটিয়ে পাপে ডুবব ! একটু সেবাও করি—যদি সেই পুণ্যে পাপটা খণ্ডায় !'

ইতিমধ্যে সাদা পাথরের প্লাসে কী একটা পানীয় নিয়ে প্রবেশ করে গিরিধারী। সম্ভবত প্রস্তুতই ছিল।

'দাঁড়া, ওখানে রেখে যা। ঘামটা আর একটু মরুক। বেশী ক'রে বরফ দিয়েছিস তো ?'

গিরিধারী কিছু দূরে প্লাসটা রেখে চলে যেতে নলিনী বললে, 'এ মোচলমানেব জল নয় ঠাকুর। আমি নিজে মিছরি ভিজিয়ে শরবত ক'রে রেখেছিলাম। বলা ছিল আপনি এলেই বরফ আনিয়ে দিয়ে যাবে।··নিন্—এবার বরং খেয়ে ফেলুন। রোদ্দুরের তাতটা কমেছে বোধ হয় একটু। তাতের ওপর ঠাণ্ডা খেলে সর্দিগর্মি হয় শুনেছি।'

শুধু শরবত নয়—একটু পরে একথালা ফল এবং সন্দেশ-রসগোল্লাও বসে খেতে হ'ল ওকে। কিছুতেই ছাড়লে না নলিনী। এমন সহজ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে জোর-জবরদস্তি করতে লাগল যে চেষ্টা ক'রেও এড়াতে পারল না হেম।

সমস্তটাই স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে ওর। এই ঘর, এই শয্যা, শ্বেত পাথরেব রেকাবে এমন দেবভোগ্য জলযোগের আয়োজন, এমন একটি মেয়ে বসে বাতাস করছে, সবটাই অবিশ্বাস্য, অবাস্তব, স্বপ্নের মতো। তবু—হয়তো অসম্ভব অবিশ্বাস্য বলেই, ক্ষণেক পরে রূঢ় বাস্তবে নেমে আসতে হবে বলেই—এই ক্ষণিক সুখস্বপ্নটুকুর মায়া কাটাতে পারে না হেম। তার অদৃষ্টে কোনদিনই তো এসব জুটবে না—যদি স্বপ্নেও এটুকু ভোগ ক'রে নিতে পারে তো মন্দ কি !··

অবশ্য বেশীক্ষণ বসে থাকতে সাহসে কুলোয় না। স্বভাবিক সংকোচ তো আছেই, বাবু হয়তো ওর প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করছেন সেদিনের মতো। বাজাবে যতটা দেরি হতে পারে—তার সমস্ত কাল্পনিক সীমা ছাড়িয়ে এসেছে বহুক্ষণ। এমনিতেই এখন ট্রামে ফিরতে হবে—নইলে অশোভন হয়ে পড়বে।

'চললেন ? আচ্ছা আসুন আজকের মতো। আবার আসবেন কিন্তু—এ তো আমি অছিলে ক'রে ডেকে আনলুম। বাজারের সুখ্যেত ক'রে, দাম কমের কথা বলে—কত কাণ্ড ক'রে। নইলে তো আসতেন না ! দুপুরে দুটোর পরে—মানে মা খেয়ে ঘুমোলে (গলার স্বরটা নামিয়ে আনে নলিনী, হয়তো অকারণেই) যে কোন দিন চলে আসবেন। তার পর এই পাঁচটা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। বেলা

দুপুরে থেকে থিয়েটারেই বা গিয়ে পড়ে থাকেন কেন ? বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখানে আসবেন। এখান থেকে বরং থিয়েটারে যাবেন।'

তার পর জোর ক'রে একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে—কণ্ঠস্বরটা আরও নামিয়ে বলে, 'সেদিন খুব রেগে গিয়েছিলেন—না হেমবাবু ?···আপনি বে বড্ড ছেলেমানুষ !···নইলে এসব কথা কি আর বুঝিয়ে বলতে হয়।···ওখানে—ওখানে আলাপ-পরিচয় মাখামাখি না করাই ভাল, বুঝলেন না ? সাতশো রাক্ষসীর ঘর করি বলতে গেলে। নৈবিদ্যির কলা—সবাই টেঁকে বসে থাকে একবার একটা ছুতো পেলেই হ'ল। লাগিয়ে ভাঙিয়ে মন ভারী করতে কতক্ষণ···? বেশী কথা কি বলব, আমার মা-টিই অষ্টপ্রহর গোয়েন্দাগিরি করছে। তার ভয় আমি যদি এমন বাবুটা ক্ষুইয়ে বসি !···এসব লজ্জার কথা—বলতেও ঘেন্না হয়—তবে আপনি জানেন না বলেই···একটু সাবধান ক'রে দিলুম।···মোদ্দা আসবেন আবার।··· আমায় কথা দিচ্ছেন তো ? বলুন আসবেন ?'

হেমের কানের ডগা এমন কি পেছনের ঘাড়টা পর্যন্ত যেন লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। কোনমতে মাথা নামিয়ে ছোট্ট একটা 'হ্যাঁ' বলে একরকম ছুটেই বেরিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যার আর বেশী দেরি নেই। বাবু কী ভাবছেন কে জানে ! আজ আবার কী মূর্তিতে থাকবেন।

॥ ৩ ॥

একেবারে রাত্রে বিছানায় শুতে গিয়ে দিনের ঘটনাগুলোকে মনের মধ্যে রোমন্থন করবার অবসর মিলল। সন্ধ্যাবেলাটা খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল, কিছু ভাববার সময় বা সুযোগ পায় নি—তবু মনটা যে খুব খুশী-খুশী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এখন বিকেলের কথাটা ভাবতে ভাবতে ওর মনে হ'ল—আসলে অনেকদিন পরে একটা মানুষের কাছ থেকে ভদ্র ব্যবহার পেয়েছে বলেই মনটা এত খুশী আছে। এইটেই তো তার জীবনে একটা অসাধারণ অননুভূত অভিজ্ঞতা। না—মেয়েটা যে ভদ্র খুব তাতে কোন ভুল নেই। খুবই ভাল। হেম এ কদিন তাকে ভুলই বুঝেছিল।

ক্রমে ক্রমে সেই ঘর, মেয়েটির সেবা, সমস্ত পরিবেশ—স্মৃতির পটে পরিষ্কার ফুটে উঠল। যতই সবটা পর্যালোচনা করে দেখল মনে মনে, ততই যে শুধু ঐ প্রত্যয়টা দৃঢ় হ'ল তাই নয়—কেমন একটা অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুর্যেও মনটা আবিষ্ট হয়ে উঠল।

এক এক সময় গোপনবাসী কোন এক সত্তা তাকে সতর্ক ক'রে দেবার চেষ্টাও করল বৈ কি ! মনে হল শেষ পর্যন্ত এটা গরীবের ঘোড়া-রোগেরই সূচনা নয় তো ! কিন্তু সে অন্তরের সুদূরতম প্রান্তের কথা—তা ভাল ক'রে শোনাও গেল না—তার আগেই সে হেসে উড়িয়ে দিল সম্ভাবনাটাকে। একটা মানুষ একটু ভদ্র ব্যবহার করেছে—তার ভাল লেগেছে ! এর ভেতর আর এত মাথা ঘামাবার মত আছেই বা কি !

এবং শেষ পর্যন্ত এক সময়—নিজের অজ্ঞাতসারেই—আবার কবে ভদ্রভাবে, নিজের তরফ থেকে কোন অশোভন ঔৎসুক্য প্রকাশ না ক'রে ওর বাড়ি যাওয়া যায়, এই চিন্তাতেই তন্ময় হয়ে উঠল। আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে বার বার নিজেকে এই কথাটাই বোঝাতে লাগল যে অত ক'রে অনুরোধ করেছে যখন—তখন এক-আধবার যাওয়া যেতে পারে। তাতে এমন কিছু অশোভনতা প্রকাশ পাবে না।…

পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখনও মনটা বেশ প্রসন্ন আছে। অকারণেই খুব খানিকটা হৈ-চৈ করল, যেচে বাজারে গিয়ে নিজেরই পয়সাতে (গত বিকেলে সামান্য যা লাভ হয়েছিল তাইতে) বড় মাসীর জন্য কলা এবং গোবিন্দর জন্য মৌরলা মাছ কিনল। সেটা ওর কামাবার দিন নয়—সাধারণতঃ দু'দিন অন্তর কামায় আর আগের দিনই কামিয়েছে—তবু পরিপাটী করে দাড়ি কামাতে বসল, এবং সেদিন দুপুরবেলা রিহার্স্যাল হবে মনে পড়ে যাওয়াতে খাওয়ার পরই থিয়েটারে ছুটল।

কমলা জিজ্ঞাসা করল, 'এমন সময়ে বেরোচ্ছিস যে!'

'কাজ আছে একটু—এই এই—এক জায়গায় একটা কাজের সন্ধান আছে, তাই যাচ্ছি!'

এমন সময় থিয়েটারে যাবার কোনও কৈফিয়তই দিতে পারবে না বুঝে মিথ্যার আশ্রয় নিল। রিহার্স্যাল আছে বলা চলবে না—'রিহার্স্যাল তো তোমার কি?'—এখনই এই প্রশ্ন উঠবে।

রিহার্স্যালের সময় যেমন ওদের যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না—তেমনি নিষেধও ছিল না। অনেকেই আসত এমন,—যারা থিয়েটারে কাজ করে থিয়েটারের বাইরে তাদের জীবনটা কোথাও যেন খাপ খেতে চায় না—তাই তারা সকালে দুপুরে যখন তখন এখানে আসে। ওকে দেখে সেজন্য কেউ বিস্মিতও হ'ল না, কোন কারণও জিজ্ঞাসা করল না—অকারণে এমন সময়ে আসবার!

হেম প্রথমটা একটু ভয়ে-ভয়েই ছিল—পাছে সহকর্মীদের জেরায় পড়তে হয়। কিন্তু কেউই যখন বিশেষ প্রশ্ন করল না তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ভেতরে এসে দাঁড়াল এবং পেছন দিকের একটা কোণ থেকে রিহার্স্যাল দেখতে লাগল।

রিহার্স্যাল নলিনীরও ছিল। থাকার কথাই—কারণ আজকাল ও বড় বড় পার্ট পায়।

অবশ্য হেমের রিহার্স্যালে তত মন ছিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও নলিনীকেই ভাল ক'রে দেখল। আর দেখতে দেখতে এক সময় মনে হ'ল—সাজলে-গুজলে নলিনীকে ভালই দেখায়।

তন্ময় হয়েই দেখছিল—হঠাৎ কানের কাছে দক্ষিণাদা যেন হিস হিস ক'রে উঠলেন, 'এরই মধ্যে লট্‌কেছে! ইস্—এরা একেবারে কাঁচা-খেগো।… ওরে ছোঁড়া তোর কি প্রাণের ভয় নেই?…গরীবের ছেলে—মরবি যে!'

ভারি বিরক্ত হয়ে উঠল হেম। দক্ষিণাদার কথাগুলো আদৌ ভাল লাগল

না। বড্ড ছোট মন ভদ্রলোকের। সব তাতেই খারাপটা আগে দেখেন—

সে কোন উত্তর দিল না, তেমনি আর দাঁড়ালও না। বাইরে বেরিয়ে নন্দরা যেখানে বসে জটলা করছিল সেইখানে এসে দাঁড়াল।

এবং সাধারণত যেটা কোন দিন ওর নজরে পড়ে না—আজ সেইটেই পড়ল—নন্দ বেশ চুনোট-করা কোঁচানো দেশী দামী ধুতি পরে এসেছে। সে আর থাকতে না পেরে—কী বলছে তা বোঝবার আগেই—বলে উঠল, 'মাইরি—থিয়েটারে গেটকীপারি ক'রে এত পয়সা পাস কোথা থেকে নন্দ!'

'কেন—পয়সার কি দেখলে বাবা! খাচ্ছি তো এক পয়সায় দশটা বিড়ি!'

'না তা বলি নি। দামী দামী ধুতি পরছিস আজকাল - তাই বলছি।'

হো হো ক'রে হেসে উঠল নন্দ। বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাসল। তার পর বললে, 'এই কাপড় দামী! ওর মুখ্ খু—এ যে হেটো ধুতি! হাওড়ার হাটের ধুতি—এক টাকা দু আনায় একখানা!'

'যাঃ!' অবিশ্বাসের হাসি হাসে হেম, 'আঠারো আনায় দিশী ধুতি—কী যে বলিস! বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছিস নাকি?'

'তাই তো দাঁড়াচ্ছে। তুই যে এত আনাড়ী তা জানতুম না। এ কী তোর ফরাসডাঙার ধুতি? দেখে বুঝতে পাচ্ছিস না?'

কানাই এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল, সে বলে উঠল, 'অত কথায় কাজ কি বাবা, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। আজই তো মঙ্গলবার, হাটবার—চ তোকে হাটটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসি! কাপড় কিনেই নে একখানা, তা হলে তো সন্দেহ ঘুচবে!'

আঠার আনায় এমন কুচ্‌কুচে কালাপাড় ধুতি!

তবু আঠারো আনাও কম নয় তার কাছে—চৌদ্দ আনার ধুতিতেই বেশ, চলে যায়!

মুখ ফুটে বললেও কথাটা, 'কী দরকার ভাই আমার অত নবাবীতে—এই সাত সিকে জোড়ার কাপড়েই তো আমার দিব্যি চলে যাচ্ছে।'

'তা যাচ্ছে বটে। তবে কী জানিস, তোর ও মিলের কাপড়ের চেয়ে এ ঢের বেশী দিন যাবে।'

হেম ঠোঁটটা চেপে ভ্রূ কুঁচকে ভাবে অনেকক্ষণ।

দু পয়সা এক পয়সা ক'রে জমিয়ে তোরঙ্গের তলায় টাকা-দুই সে সরিয়ে রেখেছে। কেন রেখেছে তা অবশ্য অত ভাবে নি—নিজের কোন একটা বিশেষ প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারে—এই ভেবেই জমিয়ে রেখেছে হয়তো। কিন্তু—

ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ মন স্থির ক'রেই ফেলল হেম—বললে, 'তোদের কারুর কাছে একটা টাকা হবে? তা হলে না হয় যাই! বাড়িতে আছে, কাল দিতে পারব।'

খুব মক্কেল ধরেছ বাবা। আমাদের বলে ট্যাঁক গড়ের মাঠ—সদাসর্বদাই…। তবে দাঁড়া—একবার হোটেলটা দেখে আসি, যদি রঘুদা থাকে তো দেবে—তুই

কাল দিবি তো ঠিক ?'

কানাই দোতলায় উঠে গিয়ে হোটেলওয়ালার কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে নিয়ে এল। তিন-চার আনা পয়সা হেমের পকেটে আছে। সুতরাং এবার নিশ্চিন্ত হযে দুজনে হাওড়ার পথ ধরল।···

বাড়ি ফিরে আবারও মিথ্যে কথা বলতে হ'ল কমলাকে।

কাপড়খানা দেখে সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'কি রে, কী ব্যাপার! হঠাৎ একেবারে দিশী কাপড় কিনে হাজির করলি যে! আল্‌টপ্‌কা টাকা এল নাকি কোথাও থেকে?···নাকি তোর মা তোর বের সম্বন্ধ করেছে কোথাও? পাকা দেখায় বসবার কাপড় নিয়ে এলি!'

মুখ টিপে একটু হাসলও সে।

হেম লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে জবাব দিল, 'কী যে বল মাসী—তোমাব যেন আজকাল কি হয়েছে!···এটা হয়েছে কি—দ্যাখো না, ঐ আমাদেব থিযেটাবের কানাই—ওর কে জানাশোনা তাঁতী ওকে জোর ক'রে এক জোড়া কাপড় গছিয়েছে। তা ওরও তো আমারই মতো অবস্থা—একেবারে দুখানার দাম কোথায় পাবে—তাই ও আবার আমাকে গছালে একখানা।'

'তা তুই-ই বা কোথায় পাবি?'

'না—' আরও অপ্রতিভ, আরও বিব্রত হয়ে পড়ে যেন হেম, 'না—মানে সাত-আট আনা আছে আমাব কাছে, তুমি যদি আর আট আনা ধার দাও তা হলে ওব দামটা চুকিয়ে দিতে পারি। দামটা কমই—কী বল? সেইজন্যেই আরও—। যোগে-যাগে যদি একখানা ভাল কাপড় হয়ে যায় এমনি করে—এই আর কি।'

এর আগে এদের বহু প্রয়োজনে কাঠ হয়ে থেকেছে সে, তোরঙ্গেব কাগজের নিচে জমানো পয়সার কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয নি কাউকে। তাই আজও সে কথা বলা চলল না। একটা মিথ্যা ঢাকতে বহু মিথ্যার অবতারণা করতে হ'ল।

প্রয়োজন-মতো কেমন একটার পব একটা মিথ্যা মুখে এসে গেল ভেবে হেমের নিজেরই খুব অবাক লাগল।

॥ ৪ ॥

এর পর চার-পাঁচটা দিন হেম যেন কতকটা ছট্‌ফট ক'রে বেড়াল। খেযে বসে কিছুতেই যেন তার স্বস্তি নেই, কারুর সঙ্গে কথা কইতেও ইচ্ছা হয় না। বিশেষ ক'রে থিয়েটারে সহকর্মীদের সঙ্গ যেন আরও অসহ্য। ওদের সেই সব অর্থহীন রসিকতা এবং নিরুদ্যম একঘেয়ে আড্ডা যেন বিষ মনে হতে লাগল। অথচ ওখান ছেড়েও কোথাও থাকতে পারে না সে। বরং ঐ নন্দ-কানাইদের মতোই সেও যখন-তখন থিয়েটারে যেতে শুরু করল।

তার এই অস্থিরতা আর ভাবান্তর ক্রমে এতই প্রকট হয়ে উঠল যে কমলার

মতো শিথিল স্বভাবের মানুষও তা লক্ষ্য না ক'রে পারল না। সে একদিন সোজা-সুজিই প্রশ্ন ক'রে বসল, 'তোর কীহয়েছে বল্ তো হেম? অমন ক'রে মুখ শুকিয়ে দিনরাত কি ভাবিস?'

'কৈ, কী আবার ভাবব!' বলে উড়িয়ে দেয় বটে, কিন্তু কেন কে জানে—তার কানের ডগাগুলো সুদ্ধ যেন লাল আর আগুন হয়ে ওঠে।

ধরা পড়ে দক্ষিণাদার কাছেও। তিনি শুধু ওকে দেখে মুখ টিপে হাসেন আর হাতের বিচিত্র একটা ভঙ্গী করেন। কখনও হয়তো একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেন—'নিয়তি!' কিন্তু ঐ হাসিটাই অসহ্য বোধ হয় হেমের। সে আজকাল প্রাণপণে ও'র সংসর্গ এড়াবার চেষ্টা করে।...

বিকেলের দিকে কদিন সে কারণে-অকারণে বার বার মনিবের ঘরের সামনে ঘুরে বেড়াল। কিন্তু এর মধ্যে এক দিনও তাঁর আর ওকে স্মরণ করার দরকার হ'ল না। এমন কি একদিন ঘর থেকে বেরোবার মুখে ওর সঙ্গে চোখোচোখিও হ'ল, কিন্তু রমণীবাবু ওকে চিনতে পারলেন বলেও মনে হ'ল না! এমন কি যেন ওর দিকে চেয়েই চোখটা সরিয়ে নিলেন।

অবশেষে রবিবার দিন সে এক কাণ্ড ক'রে বসল। কেন করলে তা সে নিজেও জানে না, আর কেউ জানতে চাইলেও বলতে পারত কিনা সন্দেহ। সে অভিনয়ের মধ্যেই এক সময় স্টেজের ভেতর ঢুকে পড়ল।

কাজটা যে খুব ভাল করে নি তা হেমও জানে। কর্তাব্যক্তি কারুর সামনে পড়লে ধমক খেতে হবে। ম্যানেজারবাবু জানতে পারলে তো কথাই নেই—লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। হয়তো খোদ বড়কর্তার কানেও উঠবে কথাটা। অথচ দেবার মতো একটা জুতসই কৈফিয়তও ওর ছিল না, আগে থাকতে কিছু ভেবে নিতেও পারে নি। হঠাৎ একটা ঝোঁকের মাথাতেই ঢুকে পড়েছিল।

যাই হোক—ভাগ্যটা সেদিক দিয়ে সেদিন ভালই ছিল। তেমন কারুর সামনেই পড়ে নি। উইংসের আশেপাশে, পর্দার পেছনে দু-চারজন ক'রে জটলা যে না করছিল তা নয়, কিন্তু তারা কেউ ও'কে লক্ষ্যও করল না। এক পাশে কতকগুলো অল্পবয়সী মেয়ে বসে গুলতানি ও নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিল, তারা কেউ কেউ একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল—এক-আধজন বোধ হয় কিছু মন্তব্যও করলে। কিন্তু হেম জানে যে ওরা ধর্তব্যের মধ্যে কেউ নয়। ওরা নিতান্তই—দক্ষিণাদার ভাষায় 'ছুঁড়ীরা' এবং কেশিয়ার বাবুর ভাষায় 'সখীরা'। সে ওদের গ্রাহ্য না ক'রেই এগিয়ে গেল।

কিন্তু কোথায় যাবে তাই যে ও জানে না। কেন ঢুকেছে সেটাও তো স্পষ্ট নয় ওর কাছে।

তা ছাড়া দিনের বেলায় স্টেজ এক রকম। সবটা খোলা থাকে। রাতে, বিশেষত অভিনয়ের সময়, ও বিশেষ কখনও ঢোকে নি এর ভেতর। এ যেন গোলকধাঁধা বলে মনে হয়। একটু পরেই হাঁফিয়ে উঠল, ভয়-ভয়ও করতে লাগল। এবং সেই—কতকটা দিশাহারা অবস্থাতেই সে ওদিক দিয়ে বেরোবার চেষ্টা করতে গিয়ে

খোদ দানীবাবুর ঘরের দরজার সামনে এসে পড়ল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর সামনের আর একটা ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল নলিনী।

মুহূর্তে ধড়াস ক'রে উঠল ওর বুকের মধ্যেটা। আগেই এর মধ্যে ঢোকবার জন্যে ঘামতে শুরু করেছিল—এখন যেন একেবারে নেয়ে উঠল এক নিমেষের মধ্যে।

কিন্তু আজ আর নলিনী অপরিচয়ের ভান করল না। সম্ভবত এদিকটা কেউ ছিল না বলেই। মধুর হেসে বরং একটু এগিয়েই এল ওর দিকে ; বললে, 'এই যে হেমবাবু, কৈ গেলেন না তো আমাদের ওদিকে আর এক দিনও।···আমি বলে রোজ দুপুরবেলা আপনার আশায় হা-পিত্যেশ ক'রে জেগে বসে থাকি !'

অভিমানে-আবদারে-সোহাগে-মেশা সে নারীকণ্ঠ সেই মুহূর্তে হেমের কাছে একান্ত মোহিনীর এবং দুর্নিরোধ্য বলে মনে হ'ল। সে কোন উত্তরই দিতে পারল না। বিহ্বল দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল শুধু।

কিন্তু নলিনীর তখন আর অপেক্ষা করলে চলবে না। সে আর একটু কাছে এসে এক হাতে ওর একটা বাহুমূল ধরে ফিস ফিস ক'রে বলল, 'কবে আসবেন বলুন ঠিক ক'রে। কথা দিন। এবার কিন্তু একটা দিন বলতে হবে—আমি আর কোন কথা শুনব না।'

হেম কোনমতে ঢোঁক গিলে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'দেখি—কাল কি পরশু—এর ভেতর এক দিন--'

'না না। ওসব দেখি-টেখি আমি শুনব না। কালই আসুন তা হলে। আসবেন তো ? লক্ষ্মীটি—'

এই বলে ওর হাতের যেখানটা ধরা ছিল সেখানটায় একটু চাপ দিয়ে ব্যস্তভাবে স্টেজের দিকে চলে গেল সে।

এর পর আর ইতস্তত করবার কোন কারণ রইল না। যে দ্বিধা সংকোচ এবং শোভনতা-বোধ পথ রোধ ক'রে ছিল এ ক'দিন, সে সবই কালকের সেই অপূর্ব কণ্ঠস্বরের মিনতিতে সরে গেছে। এতটা আন্তরিকতা যেখানে, সেখানে আর না যাবার কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। এখন আর অন্তত তাকে লোভী বা 'হ্যাংলা' মনে করার কোন কারণ নেই।

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গেই আগের সেই অস্থিরতা ও অন্যমনস্কতা অনেকটাই কমে গেল। বাড়ল একটু অধীরতা। সে রাত্রিটা ভাল ক'রে ঘুম হ'ল না-- ওধারেও ভোর না হতে ঘুম ভেঙে গেল। সে সেই সাত-সকালেই উঠে আগে গোবিন্দর চটিটায় কালি মাখিয়ে চকচকে করলে। ওর নিজের জুতোটার প্রায় শতচ্ছিন্ন অবস্থা, কয়েকটা তালি তো পড়েইছে, আরও গোটাকতক পড়া দরকার। তার চেয়ে গোবিন্দর নতুন চটিটাই ভাল। একটু বড় হয় ওর পায়ে—কিন্তু সেটা তত চট ক'রে ধরা পড়বে না। ছুটির দিন না হলে গোবিন্দর চটির দরকার হয় না। ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে স্নান করতে করতেই তার সাড়ে আটটা বেজে যায় —নটায় বেরোতে হয়। চটি পায়ে দিয়ে আর কোথায় যাবে।

শার্টটা ফরসাই ছিল, মাত্র শনিবারই সাবান দিয়েছে—তবু সেটায় আর একবার সাবান বুলিয়ে নিলে। কমলা ওর ধরন-ধারণ দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল, বার বার প্রশ্ন করতে লাগল, 'ব্যাপার কি বল্ তো? কোথায় যাবি আজ যে সকাল থেকে এত সাজগোজের ঘটা?'

উত্তর প্রস্তুতই ছিল, এক কথায় জবাব দিয়ে দিলে, 'আজ এক জায়গায় যেতে হবে—একটা আপিসে চাকরির খোঁজ আছে!'

কমলার পক্ষে এই উত্তরই যথেষ্ট। কিন্তু গোবিন্দ একটু বিপদে ফেললে, ঘরের থেকেই হেঁকে হেঁকে প্রশ্ন করতে লাগল, 'কী আপিস রে? কাদের ফার্ম? কী চাকরি?'

অতিকষ্টে—তাড়াতাড়ি অন্য কী একটা প্রসঙ্গ এনে কথাটা চাপা দিলে হেম।···

সব চেয়ে কষ্টকর হচ্ছে খাওয়ার পর দুটো অবধি অপেক্ষা করাটা। এগারোটার মধ্যেই ওদের বাড়ির ও-পাট চুকে যায়। তার পর এতখানি সময় কী করে? ঘুমোতে সাহস হ'ল না—যদি বেশী ঘুমিয়ে পড়ে? অ ছাড়া দুপুরে ঘুমিয়ে ওঠার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুখচোখ ফুলে থাকে, বিশ্রী দেখায়।·

কোনমতে বেলা একটা পর্যন্ত ছট্‌ফট ক'রে—একটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ল সে। নতুন কেনা ধোয়া দেশী ধুতিটা বার করল আজ। ,তার সঙ্গে অবশ্য সাবানকাচা শার্টটা ঠিক মানাল না—মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল একটু—কিন্তু সে আর উপায় কি? তবু অন্য দিন বিছানার নিচে চাপা দিয়ে রেখে ইস্ত্রির কাজ সারে আজ নিজে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে গিয়ে সেই হালসীবাগানে ওদের ধোপানীর কাছ থেকে ইস্ত্রি করিয়ে এনেছে।

সবে একটা; এখনই কিছু যাওয়া যায় না। হাঁটতে হাঁটতে এসে হেদোতে বসল খানিকটা। কিন্তু সেখানেও বসে থাকতে পারল না বেশীক্ষণ। ওখান থেকে উঠে, থিয়েটারের সামনেটা এড়াতে রামবাগানের ভেতর দিয়ে, ঘুরতে ঘুরতে এসে আবার কোম্পানির বাগান। তাও—একটা দোকানের ঘড়িতে দেখল দেড়টার বেশি হয় নি তখনও। কোনমতে আরও দশটা মিনিট সেখানেই কাটিয়ে এবার সোজা কম্বুলেটোলার পথ ধরল। আস্তে আস্তে গেলে ঠিক দুটোতেই পৌঁছতে পারত। কিন্তু এই চড়া রোদে হেঁটে গেলে ঘামে ভিজে জামাকাপড়ের যে অবস্থা হবে তা অনুমান ক'রে আজ ট্রামেই চড়ে বসল। তিনটে পয়সা খরচ হবে—তা হোক বড্ডই রোদ আজ।

॥ ৫ ॥

কড়া নাড়বার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আজও নলিনী নিজেই এসে দোর খুলে দিলে। সম্ভবত ওর জন্যে চলনটাতেই বসে অপেক্ষা করছিল সে।

'আসুন আসুন। কী ভাগ্যি আমার!··আপনি যে সত্যিসত্যিই কথাটা মনে ক'রে আসবেন শেষ পর্যন্ত—এ ভরসা আমার ছিল না। আমি ভেবেছিলুম নিশ্চয়ই ভুলে বসে থাকবেন।'

'না না। তা কেন? এরই মধ্যে—বা।' এমনি ধরনের কতকগুলো কী এলোমেলো কথা বললে হেম—তা তার নিজের মাথাতেও গেল না। নলিনীও অবশ্য তার উত্তরের জন্য বিশেষ অপেক্ষা করল না, ওর একটা হাতে একটু টান দিয়ে বলল, 'ও কি, তা বলে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? চলুন চলুন, ওপরে চলুন।'

হেম অভিভূতের মতোই ওর পিছু পিছু চলল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওপরের বারান্দায় পড়তে গলাটা একটু নামিয়ে নলিনী বলল, 'একটু আস্তে আসুন ভাই, মা আবার বেছে বেছে ঠিক আজকের দিনটিই পাড়া বেড়াতে বেরোল না, ঘরে শুয়ে আছে।'

আজ আর ঘরে মাদুর পাতা ছিল না। গৃহকর্ত্রীর শোবার প্রয়োজনই হয় নি সম্ভবত। হেম সামান্য একটু ইতস্তত ক'রে প্রথম দিনকার মতো বিছানার ধার ঘেঁষে মেঝেতে বসতে যাচ্ছিল, নলিনী 'ও আবার কি হচ্ছে, ভাল হয়ে বসুন', বলে হাত ধরে জোর ক'রেই নিচের ঢালা বিছানাতে বসিয়ে দিলে। তার পর একটা হাতপাখা নিয়ে নিজে ওর গা ঘেঁষে মেঝেতে বসে হাওয়া করতে লাগল।

ইস, কী ঘেমেছেন আপনি! বড্ড কষ্ট হয়েছে না? সত্যি, এই ঠেকো রোদ্দুরে মানুষকে ঠিক-দুপুরবেলা আসতে বলাই অন্যায়।'

হয়তো এই মৃদু অনুশোচনার সুরের জবাবে প্রবল প্রতিবাদ করাই উচিত ছিল, কিন্তু হেম কিছুই করতে পারল না। তার কণ্ঠ এমন কি তালু সুদ্ধ যেন শুকিয়ে উঠেছিল—নির্বাক হয়ে বসে বসে ঘামতে লাগল। যে ঘাম এড়াতে সে নগদ তিনটে পয়সা খরচা ক'রে ট্রামে এল—সে ঘাম কিছুতেই এড়ানো গেল না। এ বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কে বালতি বালতি জল গায়ে ঢেলে দিতে আরম্ভ করেছে। জামা-কাপড় সব যেন গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে। সে অসহায় ভাবে রুমাল দিয়ে বার বার কপালটা মোছাবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু ফল কিছুই হ'ল না।

নলিনী হাওয়া করতে করতেই সেটা লক্ষ্য করেছিল। বললে, 'জামাটা খুলে ফেলুন না। এ পাখার হাওয়া তো আর ঐ মোটা জামা ভেদ ক'বে গায়ে পেঁছচ্ছে না। তাতেই অত ঘাম হচ্ছে। জামাটা খুলুন—বেশ আবাম করে বসুন।'

জামা খুলবে! সর্বনাশ! হেমের ঘাম আরও বেড়ে গেল। ভেতরের গেঞ্জিটার যা অবস্থা! ভদ্রসমাজে সেটা প্রকাশ করা যায় না কোনমতেই।

কিন্তু নলিনী ততক্ষণে নিজেই ওর জামার বোতাম খুলতে শুরু করেছে। নিন নিন, অত লজ্জা করার মতো কিছুই নেই। জামাটা খুলে দিন, আলনায় মেলে রাখছি। ও কি, জামা চেপে ধরছেন কেন? ও, গেঞ্জিটা ময়লা বুঝি? তাতে আর কি হয়েছে? ও আমরা জানি।'

এর পর আর বাধা দেওয়া যায় না। হাতটা ছেড়ে দিতে হয়। নলিনী জামাটা বলতে গেলে নিজেই খুলে নিয়ে গিয়ে আলনার মেলে দিয়ে আসে। তার পর হঠাৎ নিজের আঁচল দিয়েই ওর মুখটা মুছিয়ে দিয়ে জোরে জোরে হাওয়া করতে থাকে।

এর ভেতরে বহু কথা হতে পারত। কিন্তু হেমের কণ্ঠ ভেদ ক'রে যেন আজ একটা কথাও বেরোতে চাইছে না। তার বুকের ভেতর যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে, হাত-পায়ে বল নেই। এমন অবস্থা তার কখনও হয় নি এর আগে। এক সময় তার মনে হ'ল যে তার শরীরটাই নিশ্চয় খারাপ হয়ে পড়েছে, এখানে থাকলে হয়তো আরও খারাপ হয়ে পড়বে। আর হয়তো সে যেতেই পারবে না।

সে সহসা—যেন মরীয়া ভাবেই সোজা হয়ে বসল। প্রাণপণ চেষ্টাতে কথাও ফুটল; বললে, 'আমি যাই আজ—'

'ও মা! সে কি! এই পাঁচ মিনিটের জন্যে বুঝি এত কাণ্ড ক'রে আনালুম!

'না—শরীরটা—শরীরটা যেন কেমন করছে।'

'বুঝেছি। ও অমন হয়।' মুখ টিপে একটু হাসে নলিনী। সে হাসি যেন কেমনধারা—হেমের ভাল লাগে না। আর সেটা বুঝতে পেরেই সঙ্গে সঙ্গে সামলে নেয় নলিনী। বলে, 'এই রোদে এতটা এসেছেন তো!···দাঁড়ান, ডাব আমি আনিয়েই রেখেছি। এবার দিতে বলি। তা হলেই অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠবেন। বসুন—ততক্ষণে নিজে নিজেই হাওয়া খান।'

সে ত্বরিত লঘুপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং আজ গিরিধারী মারফৎ নয়, মিনিট কয়েক পরে নিজেই পাথরের গ্লাসে বরফ দেওয়া ডাবের জল নিয়ে ঢুকল। তার পর দরজাটা একেবারে ভেজিয়ে দিয়ে কাছে এসে—বলতে গেলে ওর গায়ের ওপর বসে মুখের সামনে সেটা বাড়িয়ে ধরে বললে, 'নিন, এবার এটা খেয়ে নিন তো। জলখাবার কিন্তু এখন আনলুম না। এখন খেতেও পারবেন না—যাবার সময় বরং খেয়ে যাবেন, কেমন?'

হেম প্রবলবেগে ঘাড় নেড়ে বলতে গেল, 'না না। রোজ রোজ খাওয়া কি? আর আমি এই তো খেয়ে এলাম। ওসব—'

নলিনী আবারও মুখ টিপে হেসে বললে, এখন এটা তো খেয়ে নিন। ওসব নৌকতা পরে হবে'খন। ডাবের জলে বাতাস লাগতে নেই।'

ঠাণ্ডা ডাবটা খেয়ে সত্যিই কিছু প্রকৃতিস্থ হ'ল হেম। কিন্তু অস্বস্তিটা গেল না। তা ছাড়া সহজ ভাবে কথা বলতে না পারাতেই যেন আরও অস্বস্তি। কি যে হয়েছে আজ, কথা কইতে গেলেই ভেতরে ভেতরে যেন গলা কেঁপে যাচ্ছে, ঠিকমতো কথা যোগাচ্ছেও না।

নলিনী কিন্তু অনর্গল বকে যেতে লাগল। ওর বাড়ির কথা, মায়ের কথা, ভাড়াটেদের কথা, থিয়েটারের কথা। এই বাড়িতে এককালে ও-ও ভাড়াটে ছিল, এই মোটে গত সন বাড়িটা কিনে নিয়েছে। বাবুই টাকা দিয়েছেন। বাবু বলেছেন আরও একটা বাড়ি কিনে দেবেন। ওর ইচ্ছে এবার কাশীতে একটা বাড়ি কেনে, তা হলে মাকে সেখানে রাখতে পারবে; ইত্যাদি—এমনি কত কি!

হেম কিন্তু কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হতে পারল না। তার বুকের মধ্যে আজ যেন কী করছে! শরীরটা বড়ই দুর্বল ঠেকছে। নিজের নাড়ীর চাঞ্চল্য যেন সে নিজেই টের পাচ্ছে।

অবশেষে এক সময় সে আবারও উঠতে যায়। কোনমতে প্রাণপণে বলে, 'আজ তা হলে আমি উঠি।'

'না না, এরই মধ্যে উঠবেন কি? বা রে, এই তো এলেন! এখনও এক ঘণ্টাও হয় নি।'

'না, মানে একটু কাজ আছে কিনা—এই সাড়ে তিনটেতেই—'

কথাগুলো মুখের মধ্যেই যেন কেমন এড়িয়ে যাচ্ছে। তবুও বলে—থেমে থেমে, ঢোঁক গিলে গিলে।

'থাক গে কাজ। কাজই বুঝি এত বড়! কাজ নিয়ে এলেন কেন?…তা তো নয়, আমার সঙ্গে বসে কথা কইতেই ভাল লাগছে না আসলে, এই তো? সেইটেই পষ্ট ক'রে বলুন না!'

'না না। এ কী বলছেন! আপনি এমন বলেন যা-তা!'

হেম ওঠবার চেষ্টা ত্যাগ ক'রে বসে পড়ে।

নলিনী পাখাটা নামিয়ে রাখে। তার পর কণ্ঠে আশ্চর্য রকমের অভিমান ঢেলে দিয়ে বলে, 'তবে কেন আপনি এসে এস্তক উঠি-উঠি করছেন? দু দণ্ড বসলে কি হয়?'

এবং হেম সেই অননুভূত অভিজ্ঞতার বিস্ময় কাটিয়ে ওঠবার আগেই সহসা সে নিবিড় ভাবে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে বুকের ওপর এলিয়ে পড়ে ওর চোখের দিকে কেমন একরকম দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'তোমাকে আমি এখন ছেড়ে দেব না। কিছুতেই না। কৈ যাও দিকি কেমন ক'রে যাবে!'

তার সেই দৃষ্টিতে আর সেই কণ্ঠস্বরে কেমন যেন মাথার মধ্যে গোলমাল হয়ে যায় হেমের। সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন সম্মোহিত হয়ে পড়ে। তার পর কখন যে এক সময় এই মোহিনী নারীর জাদু তাকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করে—তা সে বুঝতেও পারে না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

তরুর বিয়ে যে আর না দিলেই নয়, সেটা শ্যামাও বোঝে, কিন্তু কী ক'রে যে কি করবে সেইটেই বুঝতে পারে না। পাড়াপড়শী আত্মীয় স্বজন অবশ্য তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে এতটুকুও অনবহিত নন—তাঁরা প্রথম প্রথম শুধু কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কিংবা মৃদু অনুযোগ ক'রে ক্ষান্ত থাকতেন, এখন গঞ্জনা ও ধিক্কার দেন। তার বেশি তাঁদের কাছ থেকে কীই বা আশা করা যায়? শ্যামা তা করেও না—শুধু যখন নিজের বিপুল দুশ্চিন্তার মধ্যে কেউ এসে পড়ে চিপ্‌টেন কেটে কেটে কথা বলেন—তখন আর চুপ করে থাকতে পারে না, সেও বেশ চাট্টি কথা শুনিয়ে দেয়। বলে, 'বলি পাত্তর কি আমার বাড়িতে জাওয়ানো আছে তবু আমি মেয়ের বে

দিচ্ছি না ! নাকি তোমরা পাঁচ-সাতটা পাত্তর এনে কথা কইছ—আমি কানে তুলো দিয়ে বসে আছি ! না ন'শো পঞ্চাশ টাকাই কেউ দিয়ে রেখেছে ! আমি মেয়েছেলে একা—বলতে গেলে অবীরে—পাত্তরটাই বা খংজে দেয় কে আমার হয়ে—আর কোমর বেঁধে দাঁড়ায়ই বা কে ? টাকাও তো চাই এতটি—শুধু হাত তো আর মুখে উঠবে না ? তোমাদের আর কি বল না—বলেই খালাস। যাকে এ বাজারে মেয়ের বে দিতে হয় সে-ই জানে। বলে কত তালেবর তালেবর লোকেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে—তবু তো তারা পুরুষ, তাদের কোমরের জোর আছে। ···আর আমি কি ? সোয়ামী থেকেও নেই—ছেলে সেও এক রকম বলতে গেলে খরচের খাতায় লিখে রাখা। রোজগার করে কি করে না ভগবান জানেন—আমি তো তার কিছু চোখে দেখতে পাই না ! দৈবে-সৈবে পাঁচ-সাতটা টাকা ভিক্ষের মতো ফেলে দেয় এই পর্যন্ত। বলে আছে গরু না বয় হাল—তার দুঃখ সর্বকাল। তোমরা তো বলেই খালাস—আমি কি করব কেউ বলে দিতে পার ?'

তবু—বাইরে যতই মুখসাপোট করুক, এত কাল যে বিশেষ কিছু চেষ্টা করতে পারে নি বা করে নি—তা শ্যামাও জানে। করে নি তার প্রধান কারণ অর্থাভাব। অনেকগুলি টাকা লাগবে। সংসার চালিয়ে বাড়ির দেনা শোধ করতেই তার প্রাণান্ত হয়ে যাচ্ছে। হেম যা দেয় তাতে তার চালটাও পুরো কেনা হয় না। ভরসার মধ্যে তো ঐ কটা গাছের নারকোল আর সুপুরি। পেঁপেও দু-চারটে পাওয়া যায় বটে—তবে সব সময় তা বেচা যায় না—কারণ লোকাভাব। হেম বাড়ি আসে বহুদিন অন্তর। নারকোল সুপুরি জমিয়ে রাখা যায় কিন্তু কলার কাঁদি বা পেঁপে পাকলে রাখা যায় না। তারা শ্যামার সময় হিসেব ক'রেও পাকে না। এখানে বাজার আছে, কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েছেলে বাজারে গিয়ে বসে কলা পেঁপে বেচতে পারে না। কান্তিও নেই যে তাকে পাঠাবে। অনেক সময় ঘরেই খেতে হয়—কিন্তু এগুলো বেচে কত পয়সা আসতে পারত সেকথা ভেবে পাকা কালী-বৌ কলার বা বড় পেঁপের অমৃত-স্বাদও বিষ লাগে তখন।

দেনা অবশ্য বাইরের কিছু আর নেই—যা আছে জামাইয়ের কাছে, তাতে সুদ লাগছে না এটাও ঠিক—তবু তা দেনাই। তা ছাড়া সেটা শোধ না হলে আর চাওয়াও যাবে না তার কাছে, এটাও বড় কথা। সুতরাং পাত্র দেখেই বা লাভ কি।

ঐন্দ্রিলাটা যদি ঘাড়ে না চাপত তো এত ভাবনা ছিল না। খরচ বেড়েছে—কিন্তু আয় বাড়ে নি। কুটি ভেঙে দুটি করবে না মেয়ে। কত মেয়ে আজকাল ঠোঙা গড়ে বেশ দু পয়সা রোজগার করছে—সে কথা ওর কাছে তোলবারই জো নেই ! এমন কি, নারকেল পাতাগুলো গাদা হয়ে পড়ে আছে—পচে মাটি হয়ে যাচ্ছে বলে একবার বলতে গিয়েছিল—'পাতা-কটা চেঁচে রাখবি মা ?' তাতে সাফ জবাব দিয়েছিল—'ওসব উঞ্ছ কাজ আমার দ্বারা হবে না !' আবার তেজ কত—বলে, 'গতর খাটিয়েই যদি খাব তো তোমার কাছে বিনি মাইনেয় খাটব কেন মা, অপর জায়গায় কাজ করলে পেট-ভাতা ছাড়াও মাইনে মিলবে।' একবার

শ্যামার মনে হয়েছিল বলে—ঠোঁটের কাছে জবাবটা এসেও ছিল—'তাই যা না, কোথায় ঐ বাঞ্ছা মেয়ে সুদ্ধ তোকে কাজ দেয় আর দুটো পেট ভরিয়ে আবার বাড়তি মাইনে দেয় দেখি!' কিন্তু সাহস হয় না বলতে; যা তেজ মেয়ের, হয়তো সত্যিই চলে যাবে। যাবে আর কোথায়—দিনকতক পরেই ফিরে আসতে হবে তা জানে শ্যামা—তবে রূপের খাপ্‌রা মেয়ে কোথায় গিয়ে পড়ে কী কেলেঙ্কারি ক'রে আসবে—তখন ভুগতে তো হবে শ্যামাকেই। ও মেয়ে এক দিনও চোখের আড়াল ক'রে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না যে!

আয়ের দিক তো দেখেই না—ব্যয় সম্বন্ধেও সচেতন নয়। শ্বশুরবাড়ি থেকে বড়মানুষী মেজাজ নিয়ে এসেছে। রান্নার দিকটা অনায়াসে দেখতে পারে—আর তাতে খুব আপত্তিও নেই হয়তো—কিন্তু হলে কি হবে—গরীবের সংসারের হিসেব একেবারেই মাথাতে ঢোকে না। একদিন রাঁধতে বললে এক সপ্তাহের তেল কাবার ক'রে বসে থাকে। কাজেই—পাতা কুড়িয়ে, বাগানের কাজ ক'রে এগারোটা-বারোটায় এসে আবার রাঁধতে বসতে হয় শ্যামাকে। অত বড় মেয়ে শুধু নিজের মেয়েকে আদর ক'রে সাজিয়ে নাচিয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর কাজ না থাকলেই যা হয়—খুনসুটি ক'রে বেড়ায় সবাইয়ের সঙ্গে। মুখ তো নয়—ক্ষুরের ধার একেবারে। সব চেয়ে আক্রোশ যেন তরুটার ওপরই। ওকে হাতে পেলে দুখানা ক'রে কাটে যেন। দিনরাত ঝগড়া আর ঝগড়া—কাক-চিল বসতে পারে না। অথচ এই মেয়েটাই—রূপে না হোক গুণে গর্ভের সেরা মেয়ে শ্যামার। মুখ বুজে গাধার খাটুনি খাটে—বাসনমাজা, জলতোলা, ঘরের পাট, ক্ষারকাচা সবই এখন তরুর ঘাড়ে। শুধু রাঁধতে দেয় না শ্যামা ইচ্ছে ক'রেই আইবুড়ো মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, কাঠের বা পাতার জ্বালে রান্না, হাতের লোম পুড়ে যায়, আঁচ লেগে লেগে কর্কশ হয়ে ওঠে হাতের চামড়া। একেই তো রংটা ওর হয়েছে মহাশ্বেতার মতোই মাজামাজা—মা বা ঐন্দ্রিলা মত তো নয়ই—এমন কি হেম বা কান্তির রঙও পায় নি। গড়নপেটনও খুব যে একটা সাকারা তাও নয়। সুতরাং যেটুকু বাঁচানো যায় বাঁচিয়ে চলে শ্যামা। তবু রান্নার সময় এটা ওটা যোগাড় তো তরুই দেয়। ঐন্দ্রিলাকে ডাকতে সাহস হয় না শ্যামার—কাজ যা করবে বাক্যি শুনতে হবে তার ষোল গুণ। তার চেয়ে দূরে থাকে সেই ভাল।

তবু এক সময় সক্রিয় হয়ে উঠতেই হয়। এক ভরসা অভয়পদ—তাকেও বলে মধ্যে মধ্যে। পাড়া-ঘরেও দু-চারজনকে বলতে হয়। চট্‌খণ্ডীরা মল্লিকরা চৌধুরীরা অনেক ঘরই ব্রাহ্মণ আছে, তাদের ঘরে যে ছেলে নেই তাও নয়, কিন্তু তারা কথাটা শুনেও কান দেয় না! কারণ জানে এখানে একেবারে শুধু-হাত মুখে তুলতে হবে, মেয়েও এমন কিছু আহা-মরি নয়। শ্যামা কলকাতাতে চিঠি লেখে গোবিন্দর কাছে। হেমকে বলে যে কিছু হবে—এমন মনে নেয় না, ও আজকাল সর্বদাই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, নেশাখোরের মতো ভাবভঙ্গী হয়েছে ওর—যে-কোন কথাই শ্যামা বলুক না কেন, মনে হয় যেন ডান কান দিয়ে

ঢুকে বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। তাই ওর ওপর ভরসা না ক'রে এক পয়সা খরচ ক'রে একটা পোস্ট কার্ডই ফেলেছে শ্যামা। কিন্তু গোবিন্দ তার উত্তরও দেয় নি—সেখানে যে কিছু সুবিধে হবে এমন ভরসা পায় না।

এই যখন অবস্থা—হঠাৎ একদিন মনে পড়ে গেল মঙ্গলার কথাটা। বলতে গেলে দুটো মেয়ের বিয়েই মঙ্গলা দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাছেই যাওয়াটা উচিত ছিল। এখানে চলে আসার পর,—প্রথম প্রথম মঙ্গলা আসতেন মধ্যে মধ্যে, কিন্তু এখন আর আসতে পারেন না। অক্ষয়বাবু শরীর খারাপ বলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন—ভরসার মধ্যে বড় ছেলের রোজগার—সে এমন কিছু নয়। পিঁটকীর ছেলেরা কেউ কিছু করে না—তাই নিয়ে নিত্য অশান্তি। ভাইয়ের গঞ্জনা সইতে না পেরে মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ি চলে যায় পিঁটকী কিন্তু সেখানেও টিকতে পারে না। এতকাল তাদের অগ্রাহ্য শুধু নয়, অবজ্ঞা ক'রে এসেছে—এখন তারা শোধ তুলতে ছাড়বে কেন? কাঁদতে কাঁদতে যায়, আবার কাঁদতে কাঁদতে আসে। ভায়েরা আরও পেয়ে বসে, বলে, 'সধবা মেয়েকে চিরকাল বিধবা মেয়ের মতো পুষে এসেছেন বাবা—সে তাঁর পয়সা তিনি যা খুশি করেছেন—এখন আর কেন? ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে—এত পুষতে আমরা পারব না। যেখানকার জিনিস সেখানে চলে যাক।'

মঙ্গলা হয়তো ক্ষীণকণ্ঠে বলতে যান, 'তোরা কি পুষছিস? এখনও তো সে-ই পুষছে। কত রোজগার করিস তোরা দু'শ পাঁচশ টাকা শুনি—'

তারা আরও জোরে জবাব দেয়, 'সেই জন্যেই তো আরও তাড়ানো দরকার। বাবার তো রোজগার নেই, কলসীর জল ক্রমাগত গড়াতে গড়াতে কত দিন থাকবে? আমাদের চলবে কিসে? আমাদের হকের ধনে ওদের ভাগ বসাতে দেব কেন?'

এ ঝগড়ার শেষ হয় না। মেয়ের জন্যেই মঙ্গলাকে আরও বেশী ক'রে খাটতে হয়—গতরে খেটে যতটা খরচা কমাতে পারেন। তার ওপর বিষম শুচিবায়ু বেড়েছে তাঁর। এক কাজ দশবার করেন। পঞ্চাশবার পুকুর-ঘর করতে হয়। তাতেই আরও সময় পান না।

সুতরাং তাঁর ওপর ভরসা ক'রে থাকলে চলবে না। শ্যামা নিজেই এক দিন কোলের ছেলেটার হাত ধরে হাঁটা দেয়। বুড়ো বয়সে এই এক পাপ—তিন বছরের ছেলে কোলে। ফুল-টানেই শুধু বাড়ি আসে যেন। নইলে আর খবরটা পর্যন্ত থাকে না। তার ছেলেমেয়ে—অথচ যত বোঝা বইতে হয় ওকেই।...যেতে যেতে স্বামীর কথাই ভাবে শ্যামা। মনে মনে হিসেব ক'রে দেখে এবার অনেক দিন বাড়ি আসে নি। কে জানে কী হ'ল। এত দিন তো কখনও দেরি করে না। কে জানে কোথাও রোগে পড়ে আছে কিনা। কিংবা হয়তো বা—ভাবতেই শিউরে ওঠে শ্যামা। নিজের লোহা আর শাঁখার দিকে চায়। না, না, অমন বেঘোরে মরবে না কখনও। এত পাপ শ্যামা কিছু করে নি—। ভাবতে ভাবতেই হাঁটে সে। কেমন যেন একটু মন-কেমনই করে নরেনের জন্য।

॥ ২ ॥

মঙ্গলাদের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই বুঝতে পারল সেখানে একটা ধুন্ধুমার ব্যাপার চলেছে। চেঁচামেচির অন্ত নেই। একসঙ্গে সবাই যেন চিৎকার করছে। কী একটা ব্যাপার নিয়ে সবাই কটু-কাটব্য করছে কোন-একজনকে। কিন্তু যে কোন উপলক্ষেই হোক না কেন—সব চেঁচামেচিতেই যার গলা সর্বাগ্রে শোনা যায় আজ তার গলা শোনা যাচ্ছে না কেন ? তবে কি মঙ্গলা বাড়ি নেই ? একটু উদ্বিগ্ন হয়েই বাড়িতে ঢুকল শ্যামা। কিন্তু উঠোনে পা দিতেই কারণটা বোঝা গেল—এক্ষেত্রে আসামী খোদ মঙ্গলাই। তাঁকেই উপলক্ষ ক'রে চারিদিক থেকে এত তিরস্কার এবং লাঞ্ছনা বর্ষিত হচ্ছে।

কারণটাও জানতে বেশী দেরি হ'ল না। শ্যামাকে দেখেই আর এক দফা সকলে চেঁচিয়ে উঠল। ওকেই মধ্যস্থ মানলে সবাই—'বামুনদিই বলুক, এ মানুষকে নিয়ে কি সংসার করা চলে ! একে খাঁচায় পুরে রাখা ছাড়া আর কী উপায় !'

চিৎকারটা একটু থিতিয়ে আসতে ব্যাপারটা বোঝা গেল। আগের দিন অক্ষয়বাবু কলকাতা থেকে সালু কিনে এনে নতুন লেপ তৈরী করিয়েছেন আসন্ন শীতের জন্য। যেহেতু মুসলমান ধুনুরী লেপ সেলাই করেছে এবং বাইরের বাগানে ফেলে তৈরী হয়েছে—সেখানে কুকুর-বেড়ালের বিষ্ঠা থেকে শুরু ক'রে মাছের কাঁটা এবং পাঁঠার হাড় কী নেই—সেই হেতু গতকাল বা আজ সকালে কাউকে কিছু না বলে দুপুরবেলা চুপিচুপি সকলে শুয়ে পড়লে সেটাকে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ফেলেছেন, পরিতৃপ্তি ক'রে কেচেওছেন—কিন্তু তারপর আর টেনে তুলতে পারেন নি। বেগতিক দেখে এসে পিঁটকীর শরণাপন্ন হয়েছেন কিন্তু সেও মায়ের এ কাজটা সমর্থন করতে পারে নি। তার ফলে এই জানাজানি ও চেঁচামেচি।

শ্যামারও কষ্ট কম হ'ল না খবরটা শুনে। পয়সার অভাবে কত কাল তারা একটা বাঁদিপোতার লেপও গায়ে দিতে পারে নি। ছেঁড়া কাপড়ের কাঁথা গায়ে দিয়ে শীত কাটাচ্ছে। সে কাঁথাও স্থানাভাবে গরমের দিন বিছানায় পেতে রাখতে হয়—তার ফলে শুধু যে কতকগুলো ছারপোকার বাসা হয় তাই নয়—আট মাসের চাপে আরও ভারী হয়ে ওঠে এবং চিপ্‌টান খেয়ে যায়। অমন সালুর লেপখানা ছুঁচিবাইতে নষ্ট ক'রে দিলে ! কত খরচ পড়েছিল কে জানে !

যাই হোক শ্যামা গিয়ে পড়ার জন্যই সে-যাত্রা মঙ্গলা অল্পে অব্যাহতি পেয়ে গেলেন। সম্ভবত নিজে বাড়ি ক'রে চলে যাওয়ার জন্যই—এখন এ বাড়িতে শ্যামার কিছু আদর হয়েছে, পিটকী মেয়েকে এক ঘটি পা ধোবার জল আনতে বলে তাড়াতাড়ি ওকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে দাওয়ায় বসালে, একটা পাখাও এনে দিলে।

মঙ্গলাও এতক্ষণে কিছুটা সহজ হয়েছেন—অবশিষ্ট অল্প কয়েকটি পান-দোক্তা-খাওয়া দাঁত মেলে হেসে বললেন, 'তার পর বাম্‌নি, কী মনে ক'রে ?'

'কী মনে ক'রে আবার ! কেন শুধু অমনি দেখতে আসতে নেই ? মা না হয়

খোঁজ নেয় না—তাই বলে মেয়ে কি ভুলে থাকতে পারে ?' শ্যামা একটু হাসবারও চেষ্টা করে।

'ওমা—এখনও তোর এমনধারা মিষ্টি মিষ্টি বাক্যি আসে! তাই তো বলি পিঁটকীকে যে মেয়েগুলোকে লেখাপড়া শেখাতিস তো তবু কাজ হ'ত। আজকাল ইস্কুলে-পড়া মেয়েদেরই কদর। দেখিস না, বামুন-মেয়ে কাঁই বা দু পাতা লেখাপড়া শিখেছে—তারই জোরে কেমন গুছিয়ে গুছিয়ে কথা বলে! আমরা যে ষাঁড়ের নাদ হয়ে রইলুম। থাকত পেটে একটু কালির আঁচড়, তা হলে দেখতুম কে মুখের সামনে দাঁড়ায়। তা হলে কি আর ভাতারেরই কথা সহ্য করতুম, না ছেলেদেরই হাতে এমন খোয়ার হতে পারত? কী বলব অদেষ্ট মন্দ—তাই অত বড় ঘরে জন্মে এই নাথি-ঝাঁ্যাটা খাচ্ছি।'

বলতে বলতে চোখে জল এসে যায় মঙ্গলার।

শ্যামা বেগতিক দেখে পিঁটকীকে ধরেই কুশল প্রশ্ন করে। পিঁটকীও আল্‌তো আল্‌তো জবাব দেয়। বেশ একটু বাঁকা বাঁকা তার বলবার ভঙ্গিমা! একটু পরে তার কথাও অস্বস্তিকর পথ ধরবে বুঝে শ্যামা সোজাসুজি নিজের কথাই পাড়ে। ওদের পারিবারিক অশান্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা ওর আদৌ নেই। তা ছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, পিঁট্‌কী আর তার ছেলেমেয়েদের দুর্গতিতে সে মনে মনে খুশীই।

সে মঙ্গলার দিকে ফিরে বললে, 'মা, যা হোক ক'রে তো দুটো মেয়েকে পার করলেন—এবার এটার একটা গতি করুন - নইলে জাতধর্ম্ম থাকে না আর।'

'গতি—! ও তরুর বে'র কথা বলছিস? ওমা, এখনও কিছু করিস নি বুঝি? মেয়ে যে ধাড়ী হয়ে গেল। সময়ে বে হলে তিনটে-চারটে নেণ্ডি-গেণ্ডি হয়ে যেত। আমি ভাবি এই বুঝি নেমন্তন্ন আসবে, এই বুঝি নেমন্তন্ন আসবে, তা মুলেই হাবাত!'

'আমি কি করব মা! জানেনই তো। ওর তো ঐ গতি। ভরসা এক ছেলে—তা তারও চাকরি-বাকরির কিছু হ'ল না—থিয়েটারে পড়ে আছে, কী পায় আর কী পায় না তা তো বুঝি না—আমি তো কোন মাসে পাই সাতটি কোন মাসে পাই আটটি টাকা। যে মাসে খুব পেলুম—সে মাসে দশটি টাকা। তার চেয়ে এখানে থেকে যদি চালকলা বাঁধত তো বেশী রোজগার হ'ত। টাকা কোথায় যে বে'র কথা ভাবব? ঐ তো কটা গাছের ফলফুলুরি ভরসা। তা থেকে সংসার চালাব, না ধার শোধ করব?'

'তা তবু তা থেকেই কিছু জমিয়েছিস বল—তাই য়্যাদ্দিন পরে পাত্তরের সন্ধান করতে বেরিয়েছিস! ধন্য মেয়েমানুষ তুই বামনী। তোর ক্ষুর-ধোয়া জল পেলেও আমার মেয়েটা বর্তে যেত।'

কেমন এক রকম ধূর্ত ভাবে শ্যামার মুখের দিকে চেয়ে হা-হা ক'রে হেসে ওঠেন মঙ্গলা। তাঁর সেই পানদোক্তা খাওয়া কালো বিরাট মুখগহ্বর আর পাকা উচ্ছেবীচির মতো কয়েকটা অবশিষ্ট দাঁতের হাসিটা কেমন বীভৎস মনে হয়।

শ্যামা তাড়াতাড়ি বলে, 'টাকা জমাব! কী বলছেন মা—এখনও জামাইয়ের দেনাই শোধ করতে পারি নি। তবু আর তো রাখা যায় না—তাই। আবারও ধারই করতে হবে—নইলে ভিক্ষে! তাই বলছিলুম আপনার সন্ধানে যদি কিছু থাকে—'

মঙ্গলা ভ্রূটা কুঁচকে আকাশের দিকে চেয়ে কী ভাবেন খানিকটা, তারপর বলেন, 'আড়গোড়ের ঘোষালদের সঙ্গে সম্বন্ধ করবি? মানে ওদের নয়—ওদেরই ভাগনাগুষ্টি। একটা ভাল ছেলে আছে। রেলে কাজ করে, এখনই প্রায় চল্লিশ টাকার মতন মাইনে পায়—'

শ্যামা ওঁর কথা শেষ করতে দেয় না—হাত জোড় ক'রে বলে, 'রক্ষে করুন মা—ওদের সংস্পর্শে আর আমি যাব না। তার চেয়ে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেব সেও ভাল।'

'দিবি নি? তাই তো? আর কোথাও তো কিছু মনে পড়ছে না। হ্যাঁ—একটা সম্বন্ধ আছে বটে—কে যেন বলছিল সেদিন—নিবড়েতে একটা খুব ভালো পাত্তর আছে। চাকরিতে ঢুকেছে সবে—মা-বাপ কেউ কোথাও নেই, বুড়ী ঠাকুমা আছে, অগাধ বিষয়। অন্তত পাঁচ বিঘের ওপর ভদ্রাসনটাই। তবে একটা কথা—সতীন আছে।'

'সতীন'!

'না—না, সতীনকে নিয়ে ঘর করতে হবে না। তাকে ত্যাগ করেছে—দু'বিঘে জমি তাকে লেখাপড়া ক'রে দিয়ে ঠাকুমা মাগী তার বাবাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে যে আর কোন দিন সে ফিরে আসবে না, আসতে চাইবে না। বিষয়-সম্পত্তিতেও তার কোন কেলেম্ থাকবে না!'

'কিন্তু তাকে ত্যাগ করেছে কেন?'

'সে অনেক পব্ব। কী সব মনান্তর হয়েছিল তত্ত্বতাবাস নিয়ে—বুড়ী বলেছিল বৌ পাঠাব না। পাঠায়ও নি পুরো দুটি বছর। তার পর তার বড় ভেয়ের বে আসতে মেয়ের বাবা এসে হাতে-পায়ে ধরলে, পাঠালে না। এধারে মা আছড়ে পড়ল—তাদের ঐ একটা মেয়ে, সে না এলে ছেলের বিয়ে হবে না। তখন বেগতিক দেখে—আর বাপেরও প্রাণ তো—থানা থেকে পুলিস এনে মেয়েকে নিয়ে গেল সে। তাইতে বুড়ীর বড় অপমান হয়েছে, সে আর ও বৌ ঘরে তুলবে না! তা ছাড়া সে মেয়েটাও নাকি ভাল ছিল না। তবে—নিজে যখন দেখি নি, জানি না, তখন বদ্‌নাম একটা দেওয়া ঠিক নয়।···এই ব্যাপার, দ্যাখ্ দিবি তো দে!'

'অমন দজ্জাল দিদিশাশুড়ী—দেওয়া কি ঠিক হবে? যদি আমার সঙ্গেও অমনি করে—না পাঠায়?'

'দ্যাখ্ অত বাছতে গেলে কি তোর চলবে! এমন পাত্তর একবরে হলে শুধু-হাত মুখে উঠত না! এ তোর বেশী পয়সা খরচা হবে না। তা ছাড়া বার বার এমন করতে সাহস করবে না। দুর্নাম হয়ে যাবে যে।···আর বুড়ীই বা কতদিন

—পেরায় চারকুড়ি হতে চলল বয়েস।···মা পাঠায় না-ই পাঠাল—তুই-বা কত এরে-ওরে মেয়েজামাই আনতে পারবি? এইখান থেকে এইখানে, ছেলেরা গিয়ে দেখে আসবে এখন। আমার তো মনে হয়—একবার এই কাণ্ড হয়ে গেছে, এখন সাবধানে চলবে।···দ্যাখ্ দিস তো কথা তুলি—ওরা একটু ডাগর-ডোগর মেয়েই চাইছিল, হয়তো নগদ কিছু দিতে হবে না। দানসামিগ্‌গিরও চাপ দিয়ে কমিয়ে নেওয়া চলবে!'

চুপ ক'রে থাকে শ্যামা। উত্তর দিতে পারে না। 'না' বলতেও ভয় করে—'হ্যাঁ' বলতেও বাধে।

মঙ্গলা একটু অপেক্ষা ক'রে থেকে বলেন, 'বেশ তো—একটু ভেবেই দ্যাখ্ না। কোমারর জোর থাকে অন্য পাত্তর দেখ্—নইলে এটা মন্দ নয়।·· না হয় হেমের সঙ্গেও একটু পরামর্শ কর্ না!'

'হেম!' অকস্মাৎ হি-হি ক'রে হেসে ওঠে পিঁটকী। সে উঠে গিয়েছিল শ্যামাদের জন্যে জলখাবার আনতে। একটা পেতলের সরায় করে মুড়ি, বাতাসা, নারকোল নাড়ু এনে শ্যামার সামনে নামিয়ে রেখে ছেলেটার হাতে একটা নারকোল নাড়ু ধরিয়ে দিতে দিতে হেসে গড়িয়ে পড়ল পিঁটকী।

'হেম! তাকে খরচের খাতায় লিখে রাখ বামুনদি। বলে আগ-ন্যাঙলা যেমনে যায়, পেছ ন্যাঙলাও তেমনে যায়। বাপের বেটা তো! গত মাসে শ্বশুরবাড়ি গিছলুম, শুনে এলুম—তোমার হেম আজকাল কম্বুলেটোলার কোন মেয়েমানুষের কাছে যাচ্ছে—নিত্যি দুপুরবেলা যায় সেখানে। আমার দেওর দেখেছে, দেওরেরও সেই বাড়িতেই বাঁধা রাঁড় আছে শুনেছিল তার মুখেই এক দিন হঠাৎ দুপুরে গিয়ে পড়ে নিজের চোখে দেখেছে!'

কাঠ হয়ে যায় শ্যামা। কতক্ষণ জবাবই দিতে পারে না।

'না না, এ হতে পারে না পিঁটকী। মেয়েমানুষ রাখতে গেলে টাকার জোর চাই। সে বড়লোকেরা রাখতে পারে। তোমার দ্যাওর তো কোন হৌসের মুচ্ছুদ্দী না কি বলেছিলে! সে যা পারে আমার হেম তাই পারবে? কাকে দেখতে কাকে দেখেছে—'

'না গো—এ পয়সা দিয়ে রাখা নয়। বেশির ভাগ বাজারের মেয়েমানুষেরাই—যারা বাঁধা থাকে কোন বাবুর কাছে—একটা-দুটো ক'রে শখের পতি থাকে। বলি তাদেরও তো সাধ-আহ্লাদ আছে—মনের মানুষ দরকার! হেমও তেমনি হয়েছে তার—বুঝলে না? নইলে দুপুরে যাবে কেন—লুকিয়ে-চুরিয়ে?'

এর পর আর মুড়ি বাতাসা গলা দিয়ে নামে না শ্যামার। চুপ ক'রে জন্তুর মতো বসে থাকে। যেন কিছু ভাবতেও পারে না।

'নে নে—মেয়ের কাণ্ড দ্যাখ্—দিলি বামনীকে ভাবনা ধরিয়ে! তুই ভাবিস নি বামনী—বড় জামাইকে ডেকে বল্—তার পায়ে মাথা খোঁড়—ঠিক একটা সায়েববাড়ির চাকরি জুটিয়ে দেবে। তার পর ছেলেকে ও পেঁশের চাকরি ছাড়িয়ে নিয়ে আয়। নইলে আগেই নিয়ে আয়। কী হচ্ছে তোর ঐ সাত-আট টাকায়?

ঘরে বসে বাগান দেখলে ওর চেয়ে বেশী রোজগার করবে। ঘণ্টা না হয় নাই নাড়লে—যদিও ওতে খুব রোজগার। বাপের দেখে বোধ হয় ও কাজে ঘেন্না হয়ে গেছে।...তা ছাড়া—সত্যিই কাকে দেখতে কাকে দেখেছে ওর দেওর তাই বা ঠিক কি! দু-একদিন এখানে কাজকম্মের বাড়িতে দেখেছে হয়তো—অমনি তাইতেই কি আর এত চিনে রেখেছে? তুই মিছে এখন থেকে অত ভাবিস নি বামনী, ওঠ্—মুখে জল দে। আবার এতটা পথ যাবি!'

মঙ্গলা বেশ গলায় জোর দিয়ে কথাগুলো বলাতে শ্যামা সত্যি-সত্যিই যেন খানিকটা বল পায় মনে মনে।

তবু খেতে ইচ্ছে করে না কিছুই। কোনমতে দুটো নাড়ু মুখে পুরে এক ঘটি জল খেয়ে আবার বাড়ির পথ ধরে।

কোলে ছেলেটা আছে—কিন্তু এমন ভার বওয়া আর হাঁটা ওর নতুন নয়। এর চেয়ে ঢের বেশী হেঁটেছে ও। তবু কে জানে কেন—আজ যেন পা দুটো বড় ভারী বোধ হয়।

॥ ৩ ॥

ফেরবার পথে সিদ্ধেশ্বরীতলাতে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে আর মাথা কুটে ফিরেছিল শ্যামা। একটা মানতও ক'রে ফেলেছিল বড় গোছের। হেম ভালয় ভালয় বাড়ি ফিরে এসে বসলে—তার সুবুদ্ধি হলে—আর তার কোথাও একটা ভাল পাকা চাকরি হলে—প্রথম মাসের মাইনে থেকেই সোনার বিল্বপত্র গড়িয়ে বুক চিরে রক্ত দিয়ে পুজো দেবে। প্রার্থনাও অনেকখানি অবশ্য—কিন্তু মানসিকও তার পক্ষে সাধ্যের অতীত প্রায়। কল্পনাতীত রকমেরই অনেকখানি।

হয়তো বা ওর মানসিকের জোরেই—হেম ফিরে এল।

অথবা ওকে ফিরতে হ'ল। কিন্তু সেও ঐ মানসিকেরই জোরে হয়তো।

কারণ—হেমের ফেরার মূল কারণটা যেমন তুচ্ছ, তেমনি হাস্যকর।

নলিনীর ভাড়াটেদের মধ্যে ক্ষীরি বলে একটি মেয়ে ছিল। তার ভাল নাম একটা আরও ছিল—আশালতা, কিন্তু নলিনীর মা তাকে ছোটবেলা থেকে ক্ষীরে বলেই জানত—তাই ঐ নামটাই এখানে চালু। ক্ষীরির বাবু পূর্ববঙ্গের লোক, ব্রাহ্মণ। নিমতলার দিকে কাঠের গোলা আছে—অবস্থা মাঝারি। কিন্তু ক্ষীরিরও রং কালো—গোলগাল, অতি সাধারণ চেহারা—এর চেয়ে ভাল বাবু তার পাওয়া মুশকিল। সুতরাং সে ঐতেই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু বিপদ হয়েছে এই যে—সেই ভট্চায বাবুটিও ইদানীং প্রায় আসছে না, ডুব মারছে। সম্ভবত তার প্রাণের পাখা অন্য কোন আকাশে উড়তে চাইছে, এ দাঁড়ে আর থাকতে চাইছে না। হয়তো কিছু দিন পরে একেবারেই শিকল কাটবে। ক্ষীরির এজন্যে দুঃখ আর দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না।

কিন্তু দুঃখ-দুশ্চিন্তা ছাড়াও বেদনার অন্য কারণ ছিল।

এ বাড়ির সব মেয়েই ক্ষীরির বাঙাল বাবু উপলক্ষ ক'রে ওকে খেপাত।

বরাবরই খেপিয়ে এসেছে। তাতে ওর এত দিন রাগের কারণ থাকলেও আঘাতের কারণ ছিল না। ইদানীং ওর মনে আঘাত লাগতেও শুরু করেছে। ওর কেমন মনে হয়—সত্যিসত্যিই তারা ওকে একটু কৃপার চোখে দেখে—ওর বাবু বাঙাল এবং সাধারণ ব্যবসায়ী বলে। এখন আরও একটু কৃপার চোখে দেখছে। হয়তো ওর এই দুর্গতিতে তারা মনে মনে উল্লসিত—হয়তো নিজেদের মধ্যে আলোচনা ক'রে বেশ একটু কৌতুকই উপভোগ করছে।

এই রকম মনোভাব থাকলে সাধারণ সহানুভূতিকেও লোক বিদ্রূপ বলে মনে করে। ক্ষীরিও তাই মনে করত।

কার ঘরে বাবু এল কিংবা এল না—সে খবরটা রাত্রে জানা না গেলেও সকালবেলা টের পাওয়া যায়।

সুতরাং—'হ্যালা ক্ষীরি, ভট্‌চায বুঝি কালও আসে নি?' এ প্রশ্নটা আজকাল প্রায়ই শুনতে হয় ক্ষীরিকে—এবং এটাকে সে রীতিমত উদ্দেশ্য-প্রণোদিত (অপমানের বা ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য) বলে মনে করে। ফলে অতি সাধারণ প্রশ্নও তার কাছে অসাধারণ হয়ে ওঠে। কথাগুলো শোনামাত্র তার সর্বাঙ্গে বিষের জ্বালা ধরে।

তবু মানুষ এক রকম। তার সঙ্গে যদি ইতর প্রাণীও যোগ দেয়,—সহ্যের সীমা অতিক্রম করে বৈকি!

সেদিন ভোরবেলা সবে বেচারী দোর খুলে ঘরের বাইরে এসেছে—(টাকাকড়ির টানাটানিতে ঠিকে ঝিয়ের বিলাসও ত্যাগ করতে হয়েছে ওকে, আর সেই কারণেই ভোরবেলা উঠে অন্য ভাড়াটেদের ঝি আসবার আগে কাজ সেরে নেয়। নইলে তাদের কাছেও অপমান—ভাড়াটেদের কাছে তো বটেই)—দোতলার বারান্দায় ঝোলানো খাঁচা থেকে নলিনীর পোষা ময়নাটা পরিষ্কার প্রশ্ন ক'রে বসল, 'হ্যালা ক্ষীরি, ভট্‌চায বুঝি কালও আসে নি?'

একেই সেদিন নিয়ে পর পর চার দিন অনুপস্থিত ভট্‌চায—নিয়মিত টাকা দেওয়া তো প্রায় পাঁচ-ছ' মাসই বন্ধ করেছে, এলে জোর-জবরদস্তি ক'রে যা দু-এক টাকা আদায় হয়—তাও চার দিন হয় নি, সকালে হাঁড়ি চড়বে কি ক'রে এই দুশ্চিন্তায় সারারাত ঘুমোতে পারে নি বেচারী, তার ওপর সকালবেলা ঘর থেকে বেরোতেই এই অপমান—মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা'র মতোই বাজল।

দুঃসহ রাগে ক্ষীরির আর দিগ্বিদিক জ্ঞান রইল না। সেদিন ওরই সিঁড়ি এবং উঠোন' ধোয়ার পালা বলে—ঘর থেকে বেরিয়েই উঠোন-ধোয়া খ্যাংরাটায় হাত দিয়েছিল সে—সেইটে হাতে ক'রেই ওপরে উঠে গেল এবং দুদ্দাড় মারতে শুরু করলে।

'তবে রে হারামজাদা পাখি! তোমার এত বড় সাহস! এত আস্পদ্দা! এই! এই! এই!'

বকতে বকতে এবং হাঁপাতে হাঁপাতে পাগলের মত 'খাঁচাটার গায়েই খ্যাংরা চালাতে লাগল সে।

খাঁচার ওপরেই খ্যাংরাটা পড়ছিল অবশ্য, পাখির গায়ে লাগে নি। তবু তাতে খাঁচাটা দুলছিল বিশ্রী রকম। সেই দুলুনিতে আর ঝাঁটার আস্ফালনে পাখিটা ভয় পেয়ে ক্যাঁ ক্যাঁ করতে লাগল।

ক্ষীরির চীৎকারে ও পাখিটার আর্তনাদে বাড়িসুদ্ধ সকলেরই ঘুম ভেঙে গেল —সেই সঙ্গে নলিনীর মা কিরণেরও। দৈবক্রমে সেদিন নলিনী ছিল না, আগের দিন রমণীবাবুর কোন্ এক ব্যারিস্টার বন্ধুর বাগানে বাবুর সঙ্গে মাইফেল্ করতে গিয়েছিল—কথা ছিল সেদিন সকালে ফিরবে। কিন্তু তাতে ক্ষীরি অব্যাহতি পেল না। কিরণ বলতে গেলে সম্প্রতি বাড়িউলীর মা হয়েছে—সামান্য এক একতলা ঘরের ভাড়াটে—বিশেষ ক'রে যে ভাড়াটের কাছে প্রায় তিন মাসের ভাড়া বাকী পড়েছে—তার এত ধৃষ্টতা কিরণের সহ্য হ'ল না। সে একেবারে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে নেমে এল তেতলা থেকে।

'বলি তোমার আস্পদ্দা তো কম নয় বাছা! আজ শনিবার, সাতসকাল বেলা আমার নলুর শখের ময়নাকে তুমি খ্যাংরা মারতে এসেছ? এত সাহস কিসের তোমার? দোতলাতেই বা তেড়ে উঠেছ কিসের জন্যে? ভেবেছ কি? নলু বাড়িতে নেই বলে কি সাপের পাঁচ-পা দেখেছ নাকি?'

চারিদিকের দোর খুলে যাওয়ায়—এবং অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে তাদের বাবুরাও বেরিয়ে আসায়—ঝাঁটার আস্ফালনটা অনেকক্ষণই বন্ধ হয়েছে ক্ষীরির কিন্তু তার আক্রোশটা তখনও যায় নি।

সে হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিল, 'কেন, কেন ও পাখি অমন ক'রে বলবে আমাকে? কেন বলবে তাই শুনি? পাখির এত বড় আস্পদ্দা, ও সুদ্ধ আমাকে অপমান করবে! আমার ঘরে আমার বাবু আসে নি তা বাড়িসুদ্ধ ভালখাগীদের কি? আমার পেছনে না লাগলে কি চলে না তাদের? আবার পাখিকে সুদ্ধ শিখিয়ে দেওয়া!'

কিরণের কর্কশ কণ্ঠে ক্ষীরির গলা ডুবে যায়।

'আ মর ছুঁড়ী! বলে কিনা পাখিকে সুদ্ধ শিখিয়ে দিয়েছে! লোকের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—ওকে অপমান করবার জন্যে সবাই যুক্তি করেছে!...একটা অবোলা পাখি—তার ওপর এত আক্রোশ? বলি অত যদি তোর মান মর্যোদাজ্ঞান তো তুই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যা না। অত বড় মহামানী রাজা দুর্যোধন, আমাদের এ গরিবের বাড়ি থাকবার দরকার কি!'

'যাবই তো। চলেই যাব। যাব না তো কি থাকব? অত কিসের! কেন, ঘর কি আর নেই?'

'তাই যাও না বাছা। আজই চলে যাও। আমি তোমাকে এই এখনই নোটিশ দিয়ে দিলুম।...কে তোমার আছে চোদ্দপুরুষের নাউখোলা—যে বিনা ভাড়ায় থাকতে দেবে—তার কাছে যাও। তবু যদি না তিন-চার মাসের ভাড়া বাকী পড়ত! কিছু বলি নে বলে তাই। বলি, মানুষটার দুঃসময় পড়েছে—থাক না, রয়ে-বসেই নেব না হয়। এ নাইনের হাল জানি তো—অমন মাঝে মাঝে

ক্ষ্যামাঘেন্না করতে হয়। ভগবানের ইচ্ছের নন্দুর আমার যখন কোন অভাব নেই।·· তা দয়া কি করার জো আছে। বলে দয়া ক'রে দেয় নন্দ, আত মারে সাত গুণে।···আর কিছু পেলে না তো আমার নন্দুর পাখিটাকে খুন করতে এসেছে !···তুমি তো সাংঘাতিক মেয়েমানুষ দেখছি, পেলে কোন্‌ দিন বা আমাদের গলাতেই ছুরি বসাবে। এমন সব্বনেশে ভাড়াটেতে আমার দরকার নেই। আজই তুমি আমার বাকী ভাড়া বুঝিয়ে দিয়ে তোমার এস্টেট-পত্তর নিয়ে উঠে যাবে বাছা—এই সাফ্‌ বলে দিলুম।'

'বেশ বেশ। তাই যাব। তাই তো বললেই হ'ত—তার জন্যে সাতগুষ্টি মিলে আমার এত লাঞ্ছনা করবার কী দরকার ছিল ?' এতক্ষণে চোখে জল এসে গেছে ক্ষীরির—গলাটা গেছে ধরে—'তবে তাও বলে দিচ্ছি—যেমন বিনাদোষে আমার পেছনে আদাজল খেয়ে লেগেছ—তোমাদেরও ভাল হবে না। তিন দিন বাড়িউলী হয়ে বসে বড্ড তেজ হয়েছে তোমাদের মা-বেটির ! ও তেজ থাকবে না, তেজের মাথা খাবে শিগ্‌গিরি—এই বলে দিলুম !'

'দ্যাখ বাছা, সাত সকালে অমন শাপমন্যি দিও না বলে দিলুম, ভাল হবে না। দুগ্‌গতির শেষ ক'রে ছাড়ব। ঘটি-বাটি নিলেমে তুলব তবে আমার নাম। আমাকে এখনও চেন নি। ভাল চাও তো মুখটি বুজে সহমানে বিদেয় হও।'

কিরণ রুদ্রমূর্তি ধারণ ক'রে সামনের দিকে এগিয়ে আসে দু পা। মনে হয় বুঝিবা মেরেই বসবে !

কিন্তু ক্ষীরি তাতে ভয় পায় না, সমান তেজের সঙ্গে উত্তর দেয়, 'তুমিও ভাল চাও তো চোখ রাঙিও না বেথা—এই বলে দিলুম। তুমিও আমাকে চেন নি কিরণ মাসী। ভাল আছি তো আছি—কেনা গোলাম, রাগলে আমি কারুর নই। উঠে যদি যেতে হয় তো তোমার মেয়ের সব্বনাশ ক'রে তবে যাব। সোজা গিয়ে উঠব তোমার জামায়ের কাছে—তোমার মেয়ের কীত্তি-কেলেঙ্কারী সব ফাঁস ক'রে তবে ছাড়ব !'

কিরণ এবার যেন ধেই ধেই ক'রে নেচে নেয় এক পাক।

'বলি অত কি ভয় দেখাচ্ছিস লা ! মেয়ের আমার কি কীত্তি-কেলেঙ্কারি ফাঁস করবি তাই শুনি ! সে কি আর একটা নাগর করছে ?'

'করছেই তো ! আর সে কথা এ বাড়ির না জানে কে ?' গলায় জোর দিয়ে জবাব দেয় ক্ষীরি, 'জিগ্যেস কর না, ঐ তো সব ভালোমানুষটি সেজে মুখ বাড়াচ্ছে দোরে দোরে—কী বলে ওরা ! জানতে কারুরই আর বাকী নেই।··· বাবুর মাইনে খাচ্ছেন আর দুপুরবেলা বাবুরই চাকরের সঙ্গে সোহাগ করছেন ঘরে দোর দিয়ে। · বাড়ি ছেড়ে যদি যেতে হয় তো এ হাঁড়ি হাটে না ভেঙে যাব না !'

'কী—কী বললি ? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ? জিবের লাগাম রেখে কথা বলিস না হারামজাদী ? যার আচ্ছয়ে আছিস তার নামেই মিছে বদ্‌নাম দেওয়া ?'

কিরণের মুখের চেহারা ভয়াবহ হয়ে ওঠে, কিন্তু বোধ করি অসহ্য ক্রোধেই

এর চেয়ে বেশী কিছু বলতে পারে না। অথবা ইতিমধ্যেই একটা কুটিল সংশয় দেখা দেয় ওর মনে—তাইতেই নির্বাক হয়ে যায়।

ক্ষীরি কিন্তু একটুও দমে না, অথবা অত বড় গালাগালিটাও লক্ষ্য করে না। বলে, 'মিথ্যে বদনাম, তা তো বটেই! নিজে যদি দুপুরবেলায় পাড়ায় পাড়ায় জুয়ো খেলে না বেড়াতে তা হলে নিজেই দেখতে পেতে চোখে—সত্যি বলছি কি মিথ্যে বলছি। জিজ্ঞেস কর না তোমার পেয়ারের ঐ সব ভাড়াটেদের, ওরা কি বলে! সবাই তো আর চোখের মাথা খেয়ে বসে নেই তোমার মতো!'

কিরণ স্তম্ভিত হয়ে গেল অকস্মাৎ। ঠিক জোঁকের মুখেই নুন পড়ল যেন। ভাড়াটেদের জিজ্ঞাসা করার উপায় ছিল না বটে—কারণ পাছে সাক্ষী দিতে হয় বলে ইতিমধ্যেই—ক্ষীরির কথা শেষ হবার আগেই—যে কটি মাথা বেরিয়েছিল বিভিন্ন ঘর থেকে—সে কটি মাথা আবার ঘরে ঢুকে গেছে। কিন্তু বোধ করি আর সাক্ষীসাবুদের প্রয়োজনও ছিল না। বহুদিনের লোক কিরণ, ক্ষীরির মুখের চেহারায় আর গলার আওয়াজে সে যে সত্য কথা বলছে সে সম্বন্ধে ওর মনে আর সংশয় মাত্র রইল না।

মিনিট কয়েক তেমনি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আশ্চর্য কোমল কণ্ঠে ও বলে, 'কিছু মনে করিস নি মা ক্ষীরি, বুড়ো হয়েছি—হঠাৎ মাথা গরম হয়ে ওঠে। তুই নিজের ঘরে যা—যা হবার হয়ে গেছে—মনে কিছু রাখিস নি। তোরও বোঝার ভুল, ঠাট্টা তোকে কেউ করে না। কে করবে বল্—এ তো আছেই, আজ তোর কাল আমার যে নাইনের যা।...যা, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে বাসি পাট সেরে নিগে যা · আর দ্যাখ্—আমাকে যা বললি—নলু এলে কিছু বলিস নি, লক্ষ্মী মা আমার।'

॥ ৪ ॥

হেম এসব ঘটনার কিছু জানতে পারে নি।

তার পক্ষে তখন কোন কিছুই জানতে পারার কথা নয়। চোখের সামনে কোন ইঙ্গিতপূর্ণ ঘটলেও সে ইঙ্গিত সে নিতে পারত না তা থেকে। কানের কাছে মুখ এনে কেউ হুঁশিয়ার করলেও বুঝতে পারত না। চোখ এবং কান দুই-ই তার তখন বন্ধ। সে তখন মধুর মরণে মরছে—পতঙ্গের মতো তেজদীপ্ত মৃত্যুর দিকে উড়ে চলেছে দুই পাখা মেলে।

এক কথায় তাকে নেশায় পেয়ে বসেছে। মধুর, সাংঘাতিক, আশ্চর্য নেশা। সেই নেশায় বুঁদ হয়ে আছে সে। আর নেশা লাগবারই তো কথা। ভিখারীর সামনে হঠাৎ রাজপ্রাসাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে, দরিদ্রের সামনে অবারিত হয়ে গেছে কুবের ভাণ্ডার। যা সে কোন দিন কল্পনা করে নি, স্বপ্ন দেখে নি—এমন কি যা এই পৃথিবীতে আছে এমন কোন ধারণাও ছিল না—তাই তার জীবনে ঘটছে। অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা, অনাস্বাদিতপূর্ব সুখ।

সে সারা সকাল ছট্‌ফট করে, সারা সন্ধ্যা থেকে অন্যমনস্ক।

সকাল থেকে মুহুমুর্হুঃ ঘড়ি দেখে—কখন দুপুর হবে, বেলা একটা বাজবে, প্রতীক্ষিত লগ্ন আসবে। আর বিকাল সন্ধ্যা এবং রাত্রি—দ্বিপ্রহরের সেই অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতার স্বপ্ন-রোমন্থনে তন্ময় থাকে। প্রতিটি ঘটনা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথাবার্তা, সামান্যতম রসিকতার বিনিময়গুলিও মনে ক'রে ক'রে আবার সেই রসটা উপভোগ করতে চায়।

সবটাই তার কাছে আশ্চর্য। ঐ বাড়ি ঐ শয্যা, ঐ সুশ্রী যুবতী নারী—সবই। ঐ নারী যে তাকে ভালবাসবে, কামনা করবে, যত্ন করবে সেবা করবে—তা কে জানত! চোখে দেখে, উপলব্ধি ক'রেও বিশ্বাস হতে চায় না তার। বার বার মনকে প্রশ্ন করে—একি সত্যি, এ কি সত্যিসত্যিই ঘটছে তার জীবনে—না স্বপ্ন দেখছে!

এ যেন রূপকথার মতো। হঠাৎ এক রাজকন্যা আর রাজত্ব পাওয়া।

নলিনী শুধু তাকে ভাল খাওয়ায় না—পয়সাও দেয় মধ্যে মধ্যে।

ভাল দেশী ধুতি দিয়েছে, জামা দিয়েছে—বিলিতী শাল পর্যন্ত কেনবার টাকা দিয়েছে। সে আরও এক যন্ত্রণা হয়েছে, অজস্র মিথ্যা কথা বলতে হয়—গোবিন্দ আর কমলার কাছে। কোনটা ব্রতের পাওনা, কোনটা বন্ধুর উপহার—এই বলে ঢাকতে হয়। কিন্তু বেশী দিন যে ঢাকতে পারবে বলে মনেও হয় না। ক্রমশই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছে ওরা—বিশেষ ক'রে গোবিন্দর নতুন বৌয়ের নজর বড় সাফ, তার সুডোল ওষ্ঠাধরের হাসিটাও বড় বাঁকা। ওর মিথ্যা কথা যখন সবাই বিশ্বাস করে তখন সে-ই শুধু একটু মুখ টিপে হেসে টোল-খাওয়া গাল ও টেপা চিবুকের একটা বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে চলে যায়। তবু তো এ কাপড়জামা পরে কস্মিন্‌কালেও বাড়ি যায় না হেম—কারণ সে জানে মা কোন কথাই শুনবে না—এমন কাপুড়ে বাবুগিরি তার কাছে অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। হয়তো বা এগুলো বেচে টাকা করতে উপদেশ দেবে।

থিয়েটারেও পরে যায় না সে। এমনিই তো জানে দক্ষিণাদার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে কিছু এড়ায় না। যা সত্য তিনি তা অনেক দিনই অনুমান করতে পেরেছেন। তবু এও জানে যে দক্ষিণাদা তার অনিষ্ট যাতে হয় তা করবেন না। কিন্তু বাকী যারা আছে, তারা কোনমতে ঘুণাক্ষরে আন্দাজ করলেও ছেড়ে দেবে না—জীবন দুর্বহ ক'রে তুলবে। এবং—সব চেয়ে যেটা ভয়—মনিবের কানে উঠবে কথাটা।

তাই যতটা সম্ভব সেখানে সে পূর্বের দীন ভাবটা বজায় রেখেছিল।

কিন্তু সে আরও বিপদ। দুপুরবেলা দু-তিন ঘন্টা কোথায় কাটিয়ে আসে সাজাগাজ ক'রে—রাত্রে বেরোবার সময় আবার সাজ পাল্‌টায়—এসবের কোন ভাল জবাবদিহি ইদানীং আর খুঁজে পাচ্ছিল না। চাকরির খোঁজে যেতে গেলে একটু ভাল সাজগোজ ক'রে যাওয়া দরকার—এ কৈফিয়তটা ইদানীং বড়ই মামুলী ও অর্থহীন হয়ে পড়েছিল।

এই যখন অবস্থা—দুদিক নয় তিন—দিক সামলাতে গিয়ে যখন প্রাণান্তকর হয়ে উঠেছে ব্যাপারটা—তখনই এই ঘটনাটা ঘটল।

হেম কিছুই জানে না। সেদিনও বেলা বারোটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা কোম্পানির বাগানের বেঞ্চিতে কাটিয়ে, এদিক ওদিক ঘুরে দেড়টা নাগাদ কম্বুলেটোলায় পেঁছেছে। এটা ওর যাকে বলে নিতান্তই অকারণ কষ্ট পাওয়া—স্বচ্ছন্দে একটু ঘুম দিয়ে বেলা একটাতেই বেরোতে পারে—কিন্তু বেলা এগারোটা-বারোটা নাগাদ এমনই অধীর হয়ে ওঠে সে, যে বাড়ি থেকে না বেরিয়ে পড়তে পারলে যেন যন্ত্রণা বোধ হয়।

আজও সে আসন্ন মিলন-স্বপ্নে বিভোর হয়েই—প্রতিটি পদক্ষেপে উপভোগ করতে করতে এবং পথের দুধারের ঘড়ি দেখতে দেখতে এসেছিল। কী হবে, কী ঘটবে—তা সে জানে। যে কোন দিনের ঘটনা অল্পবিস্তর অন্য দিনের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। ছোট্ট ক'রে কড়াটি নাড়লেই গিরিধারী এসে দোর খুলে দেবে। নলিনীর শেখানো আছে তাকে, তার জন্যে মোটা বখশিশ পায় সে—এই সময়টা সে কোথাও যায় না, দরজার চলনে বসে অপেক্ষা করে।···বাড়িতে ঢুকে ওপরে উঠতে উঠতে নলিনীর সঙ্গে দেখা হবে। সে হেসে বলবে, 'আজ আর একটু সকাল ক'রে এলেও ক্ষেতি ছিল না, মা আজ বারোটা বাজতে না বাজতেই বেরিয়ে গেছে!' তার পর—

তার পর তো স্বর্গ—বাস্তব ও কল্পনায় মেশা সুখস্বর্গ। এক দীর্ঘ সুখ-স্বপ্ন।

আজও সে যথাসময়ে এসে স্বর্গের দরজায় পৌছল। আজও গিরিধারী এসে দোর খুলে দিলে, আজও সিঁড়ির মাঝে দেখা মিলল নলিনীর।

নলিনী ওঁর কাঁধের ওপর থেকে নতুন কেনা জার্মানির শালটা তুলে নিয়ে বললে, 'ইস্, এই রোদ্দুরে এখানা কাঁধে ক'রে এসেছ কী বলে! দ্যাখ দিকি—অঘ্রান মাস বলেই কি আলোয়ান গায়ে দিতে হবে—শীত না পড়লেও? দরদর ক'রে ঘামছ যে!'

হেম সে কথার জবাব না দিয়ে ওর একটা হাত ধরেই ঘরে গিয়ে পেঁছিল। জুতোটা নিজেই খুলে ঢুকল বটে, কিন্তু তার পর আর কিছু করতে হ'ল না। জামাটা নলিনীই খুলে নিলে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলে। হেম সুখে ও আলস্যে ঢালা বিছানাটার ধারে একটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে এলিয়ে পড়ল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই রণরঙ্গিণী মূর্তিতে ঘরে ঢুকল কিরণ!

কিরণ পাড়া বেড়াতে বেরোলে বেলা চারটের আগে ফেরে না—নলিনী তাই নিশ্চিন্ত থাকে। আজকের সকালের ঝগড়াটা তাকে কেউ বলে নি—কিরণের কড়া শাসন ছিল। সুতরাং সতর্ক হবার সময় পায় নি।

'বলি হ্যাঁ লা ও শতেকক্ষোয়ারী, হায়া পিত্তি বলতে কি তোর কিছু নেই রাজ্যেশ্বর জামাই আমার···তার জায়গায় তারই খেজমতের চাকরটাকে বসিয়েছিস ছি ছি! কি পিরবিত্তি তোর!' যদি একথা তার কানে যায়? বলে, পাঁচ দিন চোরের মত এক দিন সেধের—বাতাসে কথা ভাসে। কখন কানে গিয়ে পেঁছিবে তার ঠিক আছে? শত্তুর তো চারদিকে। যেখানে রাণীগিরি কচ্ছিস, সেইখানেই তো বাঁদীগিরি করতে হবে। আর থ্যাটারের চাকরিই কি থাকবে? পাট তো যা

রিস অপর জায়গা হলে পঁচিশ টাকার বেশী মাইনে দেবে না কেউ। অমন তারা দু'পায়ে জড়ো করতে পারে গণ্ডা গণ্ডা ক্যা-ক্যা ক'রে বেড়াচ্ছে। না কি বাবুই আবার অমনি পাবি? লোকটার চোখে লেগেছে তাই। ও বাবু গেলে আর অমন জুটবে না মনে রাখিস। ঐ ক্ষীরির মত গোলাদার বাবু খুঁজতে হবে!'

প্রথমটা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল নলিনীর মন। বহুবার ঠোঁটের ডগায় এসেছিল কথাটা—'তোমার কি? আমি যা-খুশি তাই করব। আমার বাড়ি, আমি রোজগার করি!' কিন্তু সাহসে কুলোল না। মাকে সে চেনে। কেউ না লাগায় মা-ই গিয়ে লাগাবে। লেজে-পা-পড়া সাপের মতো হিংস্র হয়ে উঠবে মা—এত বড় রোজগারটা বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনাতে ক্ষেপে উঠেছে, তার ওপর অপমান করলে সইবে না। আর বাবুর কানে উঠলে—! মা যা বলছে তা যে কতদূর মর্মান্তিক সত্য তা ওর চেয়ে কেউ জানে না।

পাংশু বিবর্ণ নত মুখে বসে বসে ঘামতে লাগল নলিনী, প্রতিবাদের একটি কথাও বলতে পারল না।

অবশ্য তার কাছ থেকে কোন প্রতিবাদ আশঙ্কাও করে নি কিরণ, সে তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রেই হেমকে নিয়ে পড়ল এবার।

'আর বলি বাছা! তুমিই বা কি রকম বেইমান নেমোখারাম হারামজাদা লোক! যার খাচ্ছ পরছ—তারই সব্বনাশ করছ! এ-ও যা, মনিবের ঘরে সিঁদকাটাও তো তাই। এ তো ঘুমন্ত বাপের বুকে ছুরি মারা! আর সাহসই বা কী তোমার? কুকুর হয়ে—ঠাকুরের নৈবিদ্যিতে মুখ দিতে চাও! বামন হয়ে চাঁদে হাত! পথের ভিখিরীর রাজরাণীতে সাধ! কী বলব তুমি শুনলুম বামুনের ছেলে তাই—নইলে ঐ স্যেংখানার ঝাঁটা এনে গুনে গুনে সাতবার মারতুম তোমার মুখে!'

এই পর্যন্ত বলে—ঝাঁটা মারবার মতো ক'রেই হাতের ভঙ্গী ক'রে বোধ করি বা একটু দম নেবার জন্যই থামল কিরণ।

হেম অভিভূত, বিহ্বল। ভয়ে তার কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে—হাতে পায়ে কোন জোর নেই—ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে। কিছু বলা তো দূরে থাক, ব্যাপারটাই যেন ভাল ক'রে অধিগম্য হ'ল না তার—সে শুধু কিরণের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল।

তার সেই বিহ্বল দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে যেন আরও ক্ষেপে উঠল কিরণ, 'নাও নাও ওঠো—আর অমন ন্যাকাবোকা সেজে চেয়ে থাকতে হবে না। ঢের হয়েছে। বামুন বলেই পার পেলে—কিন্তু বেশী যদি নেই-আঁকড়েপনা কর তো রেয়াত করব না এই বলে দিলুম। গায়ে হাত দেবার আগে সরে পড়—যদি ভাল চাও তো। আর কখনও এ-মুখো হবার চেষ্টা করো না। কাল থেকে আমি দুপুরবেলা দোরে তালা দিয়ে রাখব। আর ভেবো না বাইরে কিছু ক'রেও পার পাবে। থ্যাটারেও আমার চোখ থাকবে—মনে করো না যে সেখানে কেউ পাহারা দেবার নেই? যদি শুনি যে আবার এদিকে হাত বাড়িয়েছ তো তোমারই একদিন কি আমারই

একদিন। কৈ, এখনও উঠলে না, বসে আছ কি জন্যে? দারোয়ান ডাকতে হবে না গলাধাক্কা দেবার জন্যে—তোমাকে আমিই তাড়াতে পারব, এটি মনে রেখো।'

হেম ইচ্ছে ক'রে বসে থাকে নি—বিহ্বল হয়েই বসে ছিল। এবার সে বিহ্বলতা কাটিয়ে ওকে উঠতেই হ'ল। হাত কাঁপছে, পায়ে জোর নেই। তা হোক; আরও বেশী অপমান হওয়ার আগেই যেতে হবে—এটুকু এরই মধ্যে ওর মাথাতে গিয়েছিল। কোনমতে জামাটা হাতে ক'রে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আলোয়ানটার কথা মনে রইল না। সেটা একটানে আলনা থেকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ওর গায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে কিরণ।

নলিনী কিছুই বলতে পারল না, ভয়ে অপমানে বেদনায় সেও পাথর হয়ে গিয়েছিল।

প্রতি ঘরে কৌতূহলী, কৌতুকোৎসুক জোড়া জোড়া চোখ তাকে লক্ষ্য করছে তা হেম জানে। এই কটা সিঁড়ি এবং সামান্য রকটুকু—তাও যেন ফুরোতে চায় না। এর চেয়ে এই মুহূর্তে যদি মরে যেত সে তো এর চেয়ে ভাল হ'ত। কত লোকের তো এরকম আঘাতে হার্ট ফেল ক'রে মৃত্যু হয় শুনেছে সে—তার হচ্ছে না কেন?

না, কিছুই হ'ল না। কোনমতে স্খলিতপদে টলতে টলতে বাড়ির বাইরে আসতে হ'ল তাকে। পিছনের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। সম্ভবত চিরকালের জন্যই। তার উদ্‌ভ্রান্ত বেশভূষা ও কালিপড়া মুখ দেখে মধ্যাহ্নের সেই জনবিরল গলির স্বল্প দু-চারজন পথিকও বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিলে হেম। জামাটাও গায়ে গলিয়ে আলোয়ানখানা কাঁধে ফেলে অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতেই গলিটা পেরিয়ে এল। কিন্তু শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত পোঁছে আর চলতে পারল না, অবসন্ন ভাবে একটা বাড়ির রকে বসে পড়ল সে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

অনেকক্ষণ বিহ্বল অবস্থায় বসে থেকে—এখানেও সে ক্রমশঃ বিস্ময় ও কৌতূহলের পাত্র হয়ে উঠছে বুঝতে পেরে—হেম একসময় উঠে পড়ল। বাড়ি ফিরতে হবে, পোশাক বদলাতে হবে। থিয়েটারে যাবার সময় হয়ে এল—আজ সন্ধ্যায় অভিনয় শুরু হবে। আগে 'ক্যান্ড্‌ল্ লাইট' বলে বিজ্ঞাপন করা হ'ত—তখন সুবিধা ছিল, আধ ঘণ্টা দেরি হলেও অত কথা উঠত না। এখন আবার সময় দিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু থিয়েটারে আর যাওয়া কি উচিত হবে ওর?

অবশ্য কথাটা কিছু এখনই বাবুর কানে পোঁছবে না। নলিনীর মায়ের সে সাহস হবে না নিশ্চয়—কারণ তাতে মেয়েরই বেশী অনিষ্টের সম্ভাবনা।

কিন্তু—, যদি অন্য কোন ভাবে লাগায়?

যদি—যদি চোর বলে?

এতদিনের থিয়েটার মহলের অভিজ্ঞতা থেকে, অনেক কিছুই তার জানা আছে, অনেক কথাই কানে এসেছে। এই শ্রেণীর মেয়েমানুষের অসাধ্য কিছুই নেই—এটুকু সে বুঝেছে বেশ।

নলিনী! নলিনীও হয়তো ঐ 'গোড়েই গোড়' দেবে!

এই তো সে চুপ ক'রে মাথা হেঁট ক'রে বসে রইল। কেন—তার বাড়ি তার ঘর একটা কথাও কি সে বলতে পারত না? হ'লই বা মা—মা'র মুখের ওপর কি কোন কথা বলে না সে?

দারুণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে হেম। চলতে চলতেই থমকে দাঁড়িয়ে যায়!

নলিনী। নলিনীও তো ঐ দলেরই মেয়েছেলে! তার আর কত ভাল হবে?

উত্তেজনাটা কিন্তু স্থায়ী হয় না। নলিনীর কথাটা মনে পড়তেই তার চেহারাটাও মনে পড়ে যায়—আর তার ফলে জীবনে প্রথম নারীসঙ্গের বিচিত্র অভিজ্ঞতাও মনে পড়ে গিয়ে মনটা কোমল হয়ে আসে। ওর দোষ দিলে চলবে কেন? আসলে ভয়ের কারণ তো যথেষ্টই আছে। ভাতভিক্ষা শুধু নয়—প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, শক্তি সবই হারাতে হবে—জানাজানি হয়ে গেলে।

না। নলিনীর পক্ষে প্রতিবাদ করা সম্ভব ছিল না।

ভবিষ্যতেও করতে পারবে না।

রমণীবাবুর কোপবহ্নি থেকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাও সম্ভব হবে না তার দ্বারা। সে চেষ্টা করতে গেলে হিতে বিপরীতই হবে।

তা হলে এখন কী করবে সে? যাবে—না যাবে না?

মূল প্রশ্নটা রয়েই যাচ্ছে যে!

টাকাও পাওনা রয়েছে অনেকগুলো। একেবারে না বলে ডুব মারলে আর কোনদিনই সে টাকা আদায় হবে না।

ভাবতে ভাবতে কোম্পানির বাগান পর্যন্ত এসে গিয়েছিল হেম। ভেতরে ঢুকে আবারও অবসন্ন ভাবে বসে পড়ল একটা বেঞ্চিতে।

আরও খানিকটা ভাবলে বসে বসে।

শুধু পয়সার আকর্ষণও নয়—আরও কিছু আছে। মনের মধ্যে অপ্রতিহত আশা আবার মাথা তোলে একটু একটু ক'রে।

বেশ তো, চোখে তো দেখতেও পাবে অন্তত নলিনীকে একবার!

তার পর? তার পর আবার কোথাও কোন রকম সুযোগ-সুবিধা হতে কতক্ষণ? সত্যিই কিছু কিরণবালার গোবরের চোখ নেই!

না—যাওয়াই যাক। দেখা যাক না। চাকরি ছাড়িয়ে দিলে মাইনে দিয়ে ছাড়াতে হবে। বদনাম আর কী দেবে! ওদের যা বাজার-হাট করে মাঝে মাঝে—তাই থেকে চুরি করেছে—এই বলবে বড় জোর। কিংবা বলবে যে 'অমুক জিনিসটা কিনতে টাকা দিয়েছিলুম ফেরত দেয় নি!' বলুক গে। তার জন্যে বড় জোর ওখানে আর পাঠাবে না। সে তো এমনিই আর যাবে না। তার আর ক্ষতি কি? আসল কর্মস্থলের বাইরে বেগার দিতে গিয়ে কিছু সরিয়েছে—এ

অভিযোগ এখানে তার চাকরি মারতে পারবে না কেউ!

মনকে এমনি প্রবোধ দিয়ে নিজেকে খানিকটা চাঙ্গা ক'রে তুলল হেম।

তার পর দ্রুত বাড়ির পথ ধরল।

অগ্রহায়ণের বেলা ম্লান হয়ে এসেছে, থিয়েটারে পেঁছিতে হবে এখনই।

বাড়িতে ঢুকতেই প্রথম দেখা হ'ল গোবিন্দর বৌয়ের সঙ্গে। সে তখন সন্ধ্যা দিতে চলেছে। ভেতরের রকের যে ঘেরা জায়গাটায় ওদের রান্না হয়—তারই এক কোণে, নিচে নামবার পইঠেটার পাশে একটা ভাঙা টবে ওদের তুলসী গাছ থাকে। সেইখানেই প্রত্যহ সন্ধ্যে দেওয়া হয়। সে উদ্দেশ্যেই ছোট্ট একটি পেতলের পিদিমে ঘিয়ের সন্ধ্যা-দীপ জ্বেলে নিয়ে দেওয়ালে টাঙানো মা-কালীর পটের সামনে প্রণাম করছিল সে। সামনে হেমকে দেখে অভ্যাসমত মুখ-টিপে হেসে প্রশ্ন করলে, 'কী ঠাকুরপো—এত দেরি? আজ ওখানে যেতে হবে না?'

'হবে বৈ কি। দেরি হয়ে গেল একটু—এমনি—', থেমে থেমে উত্তর দিলে হেম। কারণ কথা বলতে বলতেই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল সে। তার মনে হ'ল বড় বৌদিকে আজ নতুন দেখলে সে। রাণী সুশ্রী, খুবই সুশ্রী—কিন্তু তাব যে এত দীপ্তি তা যেন এর আগে কখনও এমন ভাবে চোখে পড়ে নি। সুন্দর ক'রে পাতা কাটা, শিল্পীর-হাতে-আঁকা দুই ভুরুর মধ্যে ছোট্ট একটি টিপ, উজ্জ্বল দুটি চোখের ভক্তিতন্মগত দৃষ্টি—সবটা জড়িয়ে সেই গলায় আঁচল দেওয়া মুখখানিকে কম্পমান দীপশিখার আলোকে ফ্রেমে-আঁটা-ছবির মতোই মনে হ'ল। আর সে ছবি যেন টাটকা ফোটা কোন দেবভোগ্য ফুলের।

অন্যমনস্ক, তন্ময় হয়ে গিয়েছিল বোধ হয় কয়েকটি মুহূর্তের জন্য।

হঠাৎ চমক ভাঙল রাণীরই কথায়, 'তোমার কি হয়েছে বল তো ঠাকুরপো?'

চমকে উঠল হেম, 'কেন, কী আবার হবে?'

'মুখে যেন কে কালি মেড়ে দিয়েছে, চোখ লাল—কোথাও মার-টার খেয়ে এলে নাকি?'

'না—না। তোমার এক কথা।'

কোনমতে জড়িয়ে জড়িয়ে অথচ কণ্ঠস্বরে অকারণ জোর দিয়ে উত্তরটা দিতে দিতে সেখান থেকে সরে পড়ল সে। সময়ও আর নেই মোটে। ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যাবার তো যথেষ্টই কারণ রয়েছে।

মেয়েটা বড়ই জ্বালালে। ওর ঐ উজ্জ্বল চোখে যে কিসের কৌতুক, কতটা দেখতে পায় ও—আজ পর্যন্ত ঠিক বুঝে উঠতে পারল না হেম। আর সেই জন্যেই বড় অস্বস্তি বোধ হয়।

আরও একজনের অস্বস্তিকর দৃষ্টি এড়ানো যায় না। দক্ষিণাদার তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞ চোখও বাইরের সব আবরণ ভেদ ক'রে একেবারে যেন মর্মস্থলে পেঁছিয়।

প্রথমটা অবশ্য অবসর মেলে নি কথা কইবার। হেম গিয়ে পড়েছিল একেবারে

সময়ে সময়ে। দু-চারজন লোক এর মধ্যেই এসে গেছে, সে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ভিড় শুরু হয়ে গেল। নিঃশ্বাস নেবার সময় নেই তখন। তবুও তার ভেতরেই অনুভব করলে হেম যে দাক্ষিণাদার চোখটা তার মুখের ওপর পড়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে রইল।

সেইটুকুতেই হেম ঘেমে উঠেছিল।

কিন্তু ভয়টা যে মিছে নয় সেটা বোঝা গেল ক'মিনিট পরেই—ঐ ভিড়েরই মধ্যে একফাঁকে কানের কাছে চুপি চুপি বলে গেল দক্ষিণাদা, 'প্লে আরম্ভ হলে মিনিট কতক পরে বাইরে আসিস্ একবার, কথা আছে।'

তবু দাঁড়িয়ে ছিল হেম স্থাণুর মতোই। প্রথম দৃশ্য শেষ হয়ে গিয়ে দ্বিতীয় দৃশ্য শুরু হয়ে গেল। দর্শকরা যা আসবার মোটামুটি এসেই গেছে, এর পর এলেও এক-আধজন হয়তো আসতে পারে—তার জন্যে হেমের না দাঁড়ালেও চলবে, পাশের গেটের কেউ কাজ চালিয়ে নেবে—এ সবই জানে সে। তবু যেতে পারে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকা গেল না, দক্ষিণাদা এসে জামার আস্তিনটা ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। একেবারে সোজা বেরিয়ে খাবার জলের বড় চৌকো ট্যাঙ্কটার পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কী হয়েছে কি? ধরা পড়ে গেছিস বুঝি?···কে ধরলে, খোদ বাবু না বুড়ী?'

এর পর আর গোপন করতে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

হেমও সে চেষ্টা করলে না। মাথা হেঁট ক'রে প্রায় সব ইতিহাসই খুলে বললে,—অবশ্য সংক্ষেপে।

'ইস! কত ক'রে বললুম তোকে ইস্টুপিড যে গরীব বামুনের ছেলে এ সবে জড়াস নি, তা তো শুনলি না! তা এখন কি করবি?'

ভয়ে ভয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে হেম, 'ও—ও কি বলবে বাবুকে কিছু? বলতে সাহস করবে?'

'মেয়ের দোষ তো দেবে না। দেবে তোরই দোষ—মেয়েও সতীসাধ্বী সেজে ঠিক পার পেয়ে যাবে। মরতে তুই-ই মরবি। এমন একটা কাণ্ড হবে—অপমানের চূড়ান্ত ক'রে ছাড়বে। এসব বাবুরা ঘরের মাগের সতীত্ব ছেড়ে দিয়ে আসে চাকর বেয়ারার জিম্মেয়, বাইরের মেয়ে-মানুষের সতীত্বের ওপর ওদের কড়া নজর। বুঝলি, কানে গেলে ক্ষেপে উঠবে একেবারে। তার যতই হোক্—ওরা ধনী, ওরা মনিব—ওদের হাতে শতেক ব্যবস্থা। না ভাই, তোর আমি দাদার মতো, আর দাদাই তো বলিস—আমি বলছি তুই চাকরি ছেড়ে চলে যা। আর কীই বা হচ্ছে, এ যা রোজগার কচ্ছিস, দেশে গিয়ে শাঁকে ফুঁ দিলে এর চেয়ে ঢের বেশী হবে!'

হেম মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে। তার অন্তরের আশঙ্কারই প্রতিধ্বনি তোলেন দক্ষিণাদা, সুতরাং উত্তর দেবার মতো কোন কথা খুঁজে পায় না।

কিন্তু তাই বলে সায়ও দিতে পারে না ঠিক।

সব আশার আজই সত্যি পরিসমাপ্তি ক'রে দিয়ে, এই অত্যন্ত অসময়ে তার প্রথম প্রণয়ের দাবি [illegible] গ [illegible] যেতে হবে? সত্যি-সত্যিই পূর্ণচ্ছেদ টানতে হবে তাদের সম্পর্কে?

এ মানতে চায় না তার মন। কল্পনাতেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

কাছাকাছি থাকলে, সামনাসামনি থাকলে কত সুযোগ ঘটতে পারে। এই তো থিয়েটারের মধ্যেও কত মেয়ে কত কি করে—তা ছাড়া ওর মাও কোথাও যেতে পারে তীর্থ করতে—বাবু কাজে যান অনেক সময়, বাইরে বাইরে ঘোরেন—কখনও কি ওরা দুজনে একসময়ে বাইরে যাবে না কোথাও! সে সব সুযোগের তো সদ্ব্যবহার করতে পারবে তারা। তরুণ মন হেমের—নিমেষে বহু স্বপ্ন রচনা ক'রে এগিয়ে যায়। বয়স হয়েছে, মরতেও তো পারে নলিনীর মা! বাবুরও তো এ রক্ষিতায় অরুচি ধরতে পারে। তিনি অন্য কাউকে ধরতে পারেন তো! দূরে চলে যাওয়া মানে একেবারেই যাওয়া!

অভিভূতের মতো হেম আবার ভেতরে এসে দাঁড়ায়।

এখনই প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্য শুরু হবে। এই দৃশ্যে নলিনী বেরোবে প্রথম।

একবার চোখে দেখার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে হেম। অনেক আশার দেখা তাদের অসমাপ্ত থেকে গেছে অপরাহ্নে। মনে হচ্ছে যেন কতকাল দেখে নি সে নলিনীকে। এখান থেকে দেখতে তো দোষ নেই—এই দূর থেকে। এমন তো আরও চার-পাঁচ শ জোড়া চোখ দেখছে তাকে। সেও না হয় দেখল তার সঙ্গে।

ব্যগ্র ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করল সে।

নলিনী আসে। অভিনয় করে সে অন্য দিনের মতোই। সহজ স্বাভাবিক আচরণ। তার ভাব-ভঙ্গীতে মনে হয় না যে তার চিত্তে আলোড়ন জাগবার কোন কারণ ঘটেছে। শুধু—প্রতিদিনই অভিনয় করতে করতে মাঝে মাঝে এদিকে তাকায়—এই গেট্‌টার দিকে। সে জানে হেম এই দুটো গেটের একটাতেই থাকে; তাকায় তাকে দেখবার জন্যই—সেইখানেই যেন তার চেষ্টাকৃত ঔদাসীন্য ধরা পড়ল।

আজ চাইল না। কিন্তু তাতে দুঃখ নেই হেমের। বরং এই না চাওয়াতেই একটা সান্ত্বনা বোধ করল সে। এদিকে—তার দিকে চাইলে কষ্ট হবে বলেই চাইছে না। এই তো তার প্রেমের, প্রীতির লক্ষণ।

এইটে ভাবতে ভাবতেই তার অন্তর একটা অবর্ণনীয় আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে। বরং বলা যেতে পারে অপরাহ্নেরই অসমাপ্ত আবেগ। সে যেন আর স্থির থাকতে পারে না। তার পা দুটো ভেতরে ভেতরে কাঁপে একটু, সে কাঁপন ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশ সারা দেহেই। একবার ভাল ক'রে ওকে দেখবার জন্য, সামনাসামনি কাছ থেকে দেখবার জন্য, একবার ওকে স্পর্শ করবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে সে।

কোনমতে সে প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যেকার বিরতিটা কাটায়। অন্যমনস্ক ভাবে—আচ্ছন্ন অভিভূতের মতো। ভুল হয় বার বার। ধমক খায় কানাইয়ের

জমেই থেকে। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হয়ে যেতে—আর স্থির থাকতে পারে না কোনমতেই। কে যেন অপ্রতিহত বলে ওকে ভেতর দিকে টানে। এই সময়েই সুবিধা তা হেম জানে—এর পরের দৃশ্যটা বেশ বড়, সে দৃশ্যে অনেক চরিত্রই স্টেজে আসে—ভেতরে ভিড় থাকে খুব কম। অথচ নলিনীর প্রথমে যা দু-চার লাইন পার্ট, তার পরেই সে ভেতরে চলে যাবে। সম্ভবত একাই থাকবে। শুধু চোখের দেখা নয়—মুখের কথারও সুবিধা মিলতে পারে।

হেম বাইরে বেরিয়ে এসে আগেই পানের দোকানটার দিকে এগিয়ে যায়। এক খিলি পান তাদের প্রাপ্য প্রতিদিন, যুধিষ্ঠির পানওলা হাসিমুখেই এটা দেয়। এখানে এলে কেউ সন্দেহ করবে না। পান নিতে নিতে একবার চারদিক তাকিয়ে নেয় হেম, সকলেই এ সময়টা ভেতরে, শুধু সত্য বাইরে আছে—তা সে-ও যেন কী একটা পড়ছে গেটের মাথায় ক্ষীণ আলোতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সকলের অলক্ষ্যে যাবার এই পরম সুযোগ।

কোনমতে সত্যের কাছটা সন্তর্পণে পার হয়ে হেম ত্বরিত লঘুপদে স্টেজের দোর পেরিয়ে ভেতরে চলে যায়।

সেই দৃশ্যটা আরম্ভ হয়ে গেছে। নলিনীই পার্ট বলছে এখন। এখনই ভেতরে আসবে। দুরু দুরু কম্পিত বুকে হেম স্টেজ থেকে বেরিয়ে নলিনীর নিজস্ব ঘরে যাবার সরু পথটায় দাঁড়িয়ে থাকে।

নলিনী আসছিলও এদিকে। মাথা হেঁট ক'রে কী একটা ভাবতে ভাবতে আসছিল সে—হঠাৎ সামনে একটা ছায়া দেখেই বোধ করি মাথা তুলে চেয়ে দেখল। আধা আলো আধা অন্ধকার—তবু হেমকে চিনতে ভুল হবার কোন কারণ নেই, সে অস্ফুট এবং অব্যক্ত কী একটা শব্দ ক'রে দু পা পিছিয়ে গেল এবং নিমেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে যে সীনটা সাজানো রয়েছে এখন, তার পিছন দিয়ে সোজা চলে গেল ওধারে—যেখানে বসে 'সখী'র দল গুলতানি করছিল।

হেমের মুখের ওপর কে যেন এক ঘা চাবুক মারল সজোরে। ঠিক তেমনিই লাগল তার, তেমনিই জ্বালা করতে লাগল মুখটা। বাবুর 'ঘরণী' হবার পর থেকে নলিনীর এখানে একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠা হয়েছে—নলিনীর নিজের ভাষাতে 'পোজিশেন'—সে-ঐ ছুঁড়ীদের সঙ্গে কথা বলে কদাচিৎ। তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ানোটা তো সম্পূর্ণ অভাবনীয়, কল্পনাতীত। এপার থেকে ওধারের ক্ষীণ আলোতেও পরিষ্কার দেখা গেল—ওদের দল সম্ভ্রস্ত হয়ে উঠেছে, কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়েছেও।

হেম আর দাঁড়াল না। দাঁড়াতে পারল না। প্রায়-অবশ পা দুটোকে টেনে টেনে কোনমতে বাইরে এসে দাঁড়াল।

আর যা-ই হোক—নলিনীর কাছ থেকে এ ব্যবহার সে আশা করে নি। ভয়ের কারণ তার যথেষ্ট আছে তা হেমও জানে—কিন্তু সত্যি-সত্যিই কিছু গোবরের চোখ নেই এখানে কিরণের, অন্ধকারে নির্জনে নিভৃতে দাঁড়িয়ে একটা কথা বললে সেটা তখনই কিছু তার কানে উঠত না।

একটা কম্পাভিক্কা করারও কি ছিল না তার ? একটা সান্ত্বনার কথা বলাও কি উচিত ছিল না ? হেম নিজে সেধে যায় নি—নলিনীর আগ্রহেই গেছে—না-হক যে অপমানটা হ'ল আজ, সে অপমানের পুরো না হোক বেশির ভাগ দায়িত্বই নলিনীর। সে কথাটাও কি একবার ভেবে দেখল না ?

একটা অবোধ মূঢ় অভিমানে হেমের চোখে জল এসে গেল।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই সে মন স্থির ক'রে ফেললে।

এখানে থেকে দিনের পর দিন এই মার সে খেতে পারবে না—এ জ্বালা তার সহ্য হবে না। একদিনের এই আঘাতেই মনে হচ্ছে বুকের ভেতরটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রতিদিন এই যন্ত্রণা—চোখের সামনে থাকবে, বার বার দেখা হবে, মনের সমস্ত আবেগ ও বাসনা উত্তাল হয়ে উঠে ওর কাছে ছুটে যেতে চাইবে—চাইবে ওর সঙ্গে দুটো কথা কইতে, ওকে একটু স্পর্শ করতে, অথচ পারবে না—এ যন্ত্রণা অসহ্য।

না, দাক্ষিণাদাই তার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী। সে-ই ঠিক বলেছে !

হেম আর দাঁড়াল না। কারুর সঙ্গে দেখাও করলে না। সকলের অলক্ষ্যে একেবারে থিয়েটার থেকেই বেরিয়ে এল।

ঠিক এখনই বাড়ি যাওয়া সম্ভব নয়। অসময়ে ফেরার জন্য অজস্র জবাবদিহি করতে হবে, এখনও সকলে জেগে—রাণীর তীক্ষ্ণ চোখের সকৌতুক চাহনিকে আরও বেশী ভয়। সে খানিকটা ইতস্তত ক'রে কোম্পানির বাগানেই গিয়ে বসল।

কিন্তু এখানে ভাল লাগল না। এখানেও বসার সঙ্গে সহস্র স্মৃতি জড়ানো ! নলিনীর বাড়ি যাওয়ার পথে সানন্দ প্রতীক্ষার স্মৃতি। সে যেন অস্থির হয়ে উঠে পড়ল আবার। পথে পথেই ঘুরল খানিকটা। তার পর, ওদের শুয়ে পড়ার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে আন্দাজ ক'রে বাড়িই ফিরে এল এক সময়।

তার পরের দিন খবরটা ভাঙলে বড় মাসীর কাছে, বললে, 'চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলুম মাসীমা ! আর ওখানে যাব না।'

'সে কী রে, কেন ? কী ব্যাপার ?'

'এমনিই তো মাইনে দিতে চায় না ব্যাটারা, খামচা খামচা ক'রে দেয়—সব জুড়লে আমার অমন ছ মাসের মাইনে পাওনা বেরোবে। তার ওপর আবার মেজাজ। কাল একটু যেতে দেরি হয়েছিল বলে যাচ্ছেতাই করলে সকলের সামনে। আমিও—এই রইল তোমার চাকরি বলে চলে এলুম।'

'তার পর ? এখন কী করবি ?' খানিকটা যেন আড়ষ্ট হয়ে বসে থেকে বলে কমলা।

'এখন তো দিনকতক বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। তার পর আবার চাকরির জন্যে উঠে পড়ে লাগা যাবে। একটা যা হোক বাঁধাধরা ছিল বলে অত গা-ও ছিল না, এখন যা পাব তাই নেব !'

নানারকম ঘাত-প্রতিঘাতের মানসিক বৈকল্যে হেমের একবারও মনে পড়ল না যে, সে কিছুদিন ধরে সারা দুপুর বিকেল টো-টো ক'রে ঘুরছে চাকরির

জন্যেই—অন্তত এই কথাই এদের কাছে বলেছে।

কমলা পর্যন্ত একটু বিস্মিত হয়ে তাকাল এই কথায়। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। এই থিয়েটারের চাকরিটা একটা অস্বস্তিরই কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইদানীং—কিছু না বুঝেও অস্বস্তি হ'ত তার। গেল ভালই হ'ল। বেটাছেলে মোট বয়েও খেতে পারবে। আরও কিছু একটা ঘটেছে, যা বলছে তা সবটা সত্যি নয়—তা বুঝেও তাই আর সে কিছু জেরা করলে না।

সেই দিনই বিকেলে বাড়ি চলে গেল হেম। মাকে গিয়ে বললে, 'চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলুম মা। জাতও যাবে, পেটও ভরবে না, রাত জেগে জেগে শরীর কালি হতে বসেছে, অথচ তোমাদের দুটো টাকাও দিতে পারি না এক এক মাসে—অমন চাকরিতে দরকার কি? আর যদি কিছু না জোটে শাঁকে ফুঁই দেব না হয়। কী বল?'

শ্যামা উদ্দেশে দু হাত তুলে মা সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে।

॥ ২ ॥

মহাশ্বেতা অনেকদিন ধরেই অভয়পদকে খোঁচাচ্ছিল হেমের চাকরির জন্যে—এবার উঠে পড়ে লাগল।

'বলি নিজের ভেয়েদের জন্যে তো বেশ টুকটুক ক'রে চাকরি যোগাড় করতে পার—আমার ভায়ের বেলাই আর কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না—না? এতটা বয়স হ'ল. কবে বা কী কাজকর্ম পাবে আর কবেই বা বে-থা ক'রে সংসারী হবে?'

প্রথম প্রথম অভয়পদ তার স্বভাবমত চুপ ক'রেই থাকত, ইদানীং—বোধ করি বা উত্যক্ত হয়েই—দু-চারটে কথা বলে। বলে, 'আমার ভাইদের যখন চাকরিতে ঢুকিয়েছি তখন দিনকাল অন্যরকম ছিল। এখন একটা পাস নইলে কোথাও নিতে চায় না, আর নেবেই বা কেন—পাস করা ছেলেরাই কত গন্ডা ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাও এত বয়েস হয়েছে—এই প্রথম চাকরির চেষ্টা করছে তা তো আর বলা যাবে না—এর আগে কোথায় কাজ করেছে জিজ্ঞাসা করবেই—তখন কী পরিচয়টা দেব? সেখানেও তো মুখ পুড়িয়ে রেখেছে।'

'সে ওর বরাত। নইলে এই যে—তোমরাই কি চুরিটা কম করলে! লোকে বলে পুকুর চুরি করা, তুমি তো বলতে গেলে বড় বড় দীঘিই চুরি ক'রে মেরে দিলে।—বরাত, নইলে সামান্য দুটো শিশি চুরি করেই বা ধরা পড়বে কেন—আর তোমরা গাড়ি গাড়ি মাল চুরি ক'রে মেজ বোয়ের বুক-পোতা ক'রে পার পেয়ে যাবে কেন! সে ছেড়ে দাও। বলি যে যেমন—তার তেমনিও তো জুটবে। বেটা ছেলে—তার একটা মুটেমজুরের কাজও কি জোটে না?'

মেজবৌয়ের বুক-পোতা করবার অভিযোগটা প্রায় নিত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—কোন দিনই এর কোন জবাব দেয় না অভয়পদ। শেষ কথাটারই জের টেনে বলে, 'মুটে-মজুরের কাজ আবার যোগাড় ক'রে দিতে হবে কেন, সে তো পড়েই আছে।

বড়বাজারে গিয়ে দাঁড়ালেই। মোট মেলে। আর আমরা হলে থিয়েটারে চাকরি নেওয়ার আগে সেই চেষ্টাই দেখতুম।'

বার বার একই ইঙ্গিতে মহাশ্বেতা ক্ষেপে যায়। এ খোঁচা ঘরে বাইরে খেতে হয় তাকে। স্বামীর মুখেও সেই একই খোঁচার অনুবৃত্তি সহ্য হয় না। সে চাপা গলাতেই যথাসাধ্য চেঁচায়, 'কেন থ্যাটারে চাকরি ক'রে কি সে একেবারে বয়ে গেছে নাকি? কী করছে সে তাই শুনি? কটা রাঁড় রাখার কথা শুনেছ? না কি কাপ্তেনি ক'রে মোট মোট টাকা ওড়াচ্ছে!'

এর জবাবে অনেক কথাই বলা চলত। বলা চলত যে, কাপ্তেনি করার মতো চাকরি সে করে না, গেটকীপারের চাকরিতে পেটে খেতেও জোটে না। বলা চলত যে পুরো মাইনে কোন মাসেই ঠিকমতো আদায় হয় না বলে যে নাকে কাঁদে, তার পরনে দেশী ধুতি এবং জার্মানীর শাল মানায় না। কত মাইনে পেয়েছে সে আজ পর্যন্ত, আর তার কতখানি সংসারে উসুল দিয়েছে—তার হিসাবও কেউ দেখে নি কোন দিন।

কিন্তু অভয়পদ কোন দিনই এসব কথা বলে না। বলার অভ্যাস নেই তার। কোন দিনই কারুর সঙ্গে সে দুটোর বেশী তিনটে কথা বলে না—বিশেষত বিনা প্রয়োজনে। তা ছাড়া এর পরে কী শুনতে হবে তাও সে জানে। আর শুনতে হয়ও। অভয়পদকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে মহাশ্বেতা আরও ক্ষেপে যায়। গলাটা আর একটু চাপবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে সে বলে, 'বলি থ্যাটার তো ভাল, সে তো তবু বাজারের মেয়েমানুষ নিয়ে ঢলাঢলি। সে ঢলাঢলি 'তো ঘরে তোলে নি সে!'

কথাটা বলেই সেখান থেকে সরে যায় মহাশ্বেতা। অনেক দিনের পরে এই সাহসটা যে হয়েছে তার—তাতেই সে একটু অবাক হয় মনে মনে। নিজেই নিজেকে বাহবা দেয় একসময়। তবু এই খোঁচাটা দেবার পরও স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহসে কুলোয় না—কোথাও হয়তো একটা সহজাত ভদ্রতা-বোধেও বাধে। সে লেখাপড়া শেখে নি কিন্তু সে দিদিমাকে দেখেছে, মাসীমাদের দেখেছে—এমন কি মা'ও তার আজ পর্যন্ত কতকগুলো ভদ্র চালচলন ছাড়তে পারে নি – তাও সে দেখেছে। মোটামুটি একটা সংস্কার তার আপনিই থেকে গেছে ভেতরে। সামনে থাকে না তাই কোন দিন লক্ষ্যও করে না—তার স্বামীর সুগৌর বর্ণ এত বড় আঘাতেও রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে কি না।

লক্ষ্য করলে অবাক হয়ে যেত।

অভয়পদর মুখে লজ্জা কি উষ্মার কোন রক্তিমাভাই ফোটে না। প্রশান্ত মুখে হাতের কাজ করে যায়।

বাড়িতে থাকলেই—যতটুকু জেগে, থাকে—টুকটাক মেরামতির কাজ ক'রে যায় সে। যা পায় হাতের কাছে। বাইরের দিকে একটা করোগেট টিনের চালা মতোও খাড়া করেছে এই জন্যে। নানা যন্ত্রপাতি থাকে সেখানে এমন কি একটা ছোটখাটো হাপরও ক'রে নিয়েছে, কেমন চাকা ঘোরালেই আগুনটা ধরে ওঠে—

মহাশ্বেতা প্রথম প্রথম অবাক হয়ে চেয়ে দেখত। স্বামীর সঙ্গে কথা কইতে গেলে এখানে এসেই কইতে হয়—সেই হয়েছে আরও মজার ব্যাপার। 'মুখনাড়া মিন্‌সে' সাতজন্মে যদি ঘরে ঢোকে। হয় আপিস, নয় এই ছাপারখানা। রাত্তিরে শোবে তো সেই চলনে—একখানা কাঠের বেঞ্চিতে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—সমান ব্যবস্থা। শীতে দয়া ক'রে একখানা কাঁথা গায়ে দেয়, এই বোধ হয় মহার বাবার ভাগ্যি। যুদ্ধের বাজারে হাতে দু'পয়সা আসতে মেজকর্তা বাড়িতে ধনুরি ডেকে জনা-জাত লেপ তৈরী করিয়ে দিয়েছে—মায় ছেলেপুলের সুদ্ধ। তৈরী হয়েছে ওর জন্যেও—কিন্তু এক দিনও কি গায়ে দিল সে লেপ! এক দিনও না। সেবার পৌষ মাসে বর্ষা হয়ে হাড়-কাঁপানো শীত পড়েছিল—এক দিন রাত্রে শুয়ে মহাশ্বেতার মায়া হ'ল—সে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে নিজে নিজেই লেপখানা এনে গায়ে চাপা দিয়ে দিল। সকালবেলা দেখে—মাগো, মনে হলে এখনও গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছে করে ওর—সেখান পাট ক'রে কখন শাশুড়ীর দোরের সামনে রেখে এসেছে, নিজে সেই কাঁথামুড়ি দিয়েই শুয়ে আছে! ভাগ্যিস ভোরে ওঠে মহাশ্বেতা—ও-ই আগে দেখেছিল, নইলে শাশুড়ী ঠিক লেপখানা বাজেয়াপ্ত করতেন—আর প্রথম সুযোগেই বড় মেয়ের বাড়ি চালান ক'রে দিতেন। সেই থেকে নাক-কান মলেছে মহাশ্বেতা, ওকে আর কোন স্বাচ্ছন্দ্য দেবার চেষ্টা সে করে না। নষ্ট হোক দুষ্টু হোক—মেজবৌ কথাগুলো বলে ঠিক ঠিক। বলে, 'ভোগ করারও বরাত থাকা চাই, বুঝলি দিদি! বট্‌ঠাকুর গতজন্মে কি প্রাণে ধরে কাউকে কিছু দিয়ে এসেছিল যে এজন্মে ভোগ করবে!…ওরা কষ্ট করতেই জন্মেছে। গেল জন্মের পাপের সাজা!'

ঘরের ঢলাঢলি নিয়ে অভয়পদকে ইঙ্গিত করার সাহসটাও এক দিনে হয় নি মহাশ্বেতার। মেজবৌয়ের অনেক বাড়াবাড়ি সহ্য করতে হয়েছে তাকে। অনেক সাহস। কতকগুলো জিনিস যে সম্ভব তাই-জানা ছিল না মহাশ্বেতার। প্রথমটা চোখে দেখেও বিশ্বাস হ'ত না। ভয় হ'ত প্রমীলার জন্যই। এতটা সহ্য করবে না কেউ, এতটা ধৃষ্টতা এবং দুঃসাহস। মাথার ওপর ধর্ম তো আছেন। ভগবান এর সাজা দেবেনই ওকে।

কিন্তু দিনের পর দিন যায়। মাসের পর মাস। ভগবানও যেমন প্রকাশ্যে কোন সাজা দেন না, তেমনি গুরুজনরাও না। কানাকানি গা-টেপাটেপি করেন অনেকেই—তবু মুখ ফুটে প্রমীলার মুখের ওপর কিছু বলতে পারেন না। এমনই দাপট তার যে সামনে এসে দাঁড়ালেই যেন সবাই কেঁচোটি হয়ে যান আসলে ওর ক্ষুরধার রসনাকেই সবাই ভয় করে—মুখে তো আটকায় না কিছু।

বলতে যিনি পারতেন—যাঁর বলার অধিকার সর্বাগ্রে—তিনিই যে কিছু বলেন না। ক্ষীরোদা যেন বুড়ো হয়ে আরও ভীতু, আরও জবুথবু হয়ে গেছেন। বেশী ভয় তাঁর মেজছেলে আর মেজবৌকেই। আহা, দেখলেও দুঃখ হয় মহাশ্বেতার—ইদানীং কাউকে কিছু দেবার ইচ্ছে হলে কি খেতে ইচ্ছে হলে আড়ালে অভয়পদকে

বলেন, এদিক ওদিক দেখে—কেউ কাছে না থাকলে। অথচ ভয় যে কাকে তা বোঝে না মহাশ্বেতা। বড় ছেলে আর বৌ যখন মান্য করে তোমাকে, তখন এত ভয় কেন? তাও—এই তো সেবার, মুখ ফুটে বলেছিলেন মেজ ছেলেকে অনন্ত চতুর্দশীর ব্রতর কথা—তা কৈ অম্বিকাপদ তো দ্বিরুক্তি করে নি। ব্রত উদ্‌যাপনে বারোটি বামুন খাওয়াবার কথা, রীতিমতো বাড়িতে ভিয়েন ক'রে দেড়শ' লোক খাইয়ে দিল। তবে?

এই তবেটাই বুঝতে পারে না। আড়ালে গজগজ করে শুধু।

তাও প্রমীলার যে খুব দোষ তাও তো দিতে পারে না মহাশ্বেতা। সেই যা ফুলশয্যার রাত্রে 'ধাষ্টামো' করেছিল—খুবই 'গর্হিত কাজ' সন্দেহ নেই (মহাশ্বেতার যা দু-একটি সংস্কৃত সাধুশব্দ জানা আছে এই গর্হিত শব্দটি তার মধ্যে অন্যতম, যদিচ উচ্চারণ করার সময় সে অকারণে একটা হসন্ত দেয়)—তবু তার পরে সে আর ছোটকর্তাদের ধারে কাছে যায় নি। বরং ছোট বৌকে নিজে ভাল ক'রে সাজিয়ে-গুছিয়ে ছোটকর্তার ঘরে পাঠিয়ে দিত। দোষ ষোল আনা দুর্গাপদরই—এটা মহাশ্বেতা স্বীকার করতে বাধ্য। বিয়ের আট দিন কোনমতে শুয়েছিল ছোট বৌয়ের সঙ্গে, তার পর বৌ বাপের বাড়ি যেতে গোনা দুটো কি তিনটে দিন শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু প্রথম দিন ছাড়া রাত্রে থাকে নি এক দিনও। তার পরে দ্বিরাগমনের পরই কী হ'ল—ছেলে কিছুতে বৌয়ের কাছে শোবে না। আবার বলে কিনা—'অত কালো আমার ঘেন্না করে!' সেই যে ছেলেবেলায় দাদা পড়ত কথামালা না কিসের গল্প আছে—বন্দ লোকের ছুতোর অভাব হয় না—এ-ও তাই! আসলে ওর মনে আছে অন্য কথা—মন পড়ে আছে অন্যখানে!

তা যাক। বেটাছেলে একটু এদিক-ওদিক চন্‌মন করেই—বয়সকালে নানা-রকমই ক'রে থাকে, কিন্তু তাই বলে ঘরের বৌকে কে এমন ত্যাগ করে? 'কত রকম কল্লাই জানে ছোটকর্তা!' মনে মনে গজরায় মহা, 'ওসব কল্লা! আমি বেশ বলতে পারি, ও মাগীর সঙ্গে ষড় আছে দস্তুরমত।'

বাস্তবিক অসৈরণ হবারই কথা।

রোজ রাত্রে শোওয়া নিয়ে এক কেলেঙ্কারি। বাবু ঘরে শোবেন না বৌয়ের কাছে। বৌ শুতে যাবার আগেই ছেঁড়া মাদুর আর বালিশ নিয়ে ছাদে দৌড়বেন। মেঘ বৃষ্টি হ'ল তো রান্নাঘরের দাওয়ায়। একদিন মেজবৌ মাদুর লুকিয়ে রেখেছিল সবগুলো—সে বাবুর তেজ কত—বিছানা থেকে চাদর তুলে নিয়ে গিয়ে পেতে শুয়েছিলেন ছাদে।

তা তো নয়—আসলে ওটা মেজবৌকে সুযোগ দেওয়া।

মেজবৌ অমনি সেই রাত্তিরে ছুটবে ছাদে—কী সমাচার, না 'বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে পাঠাতে যাচ্ছি'।

তার পর দুপুর রাত পর্যন্ত ছাদে চলবে—মহাশ্বেতার ভাষায়—'দুপুরে মাতন'। কী যে ওদের এত কথা তা সে বোঝে না—শুধু হা-হা হি-হি হাসি আর ফিস্‌ফিস্ গল্প। যে শাসন করতে যাচ্ছে তার এত হাসি-মস্করা

কিসের ? আর রোজ রোজ এত বুঝোবারই বা কি আছে কি ? এ কী কচি খোকা ? একই তো কথা—রোজ নতুন ক'রে সেটা আওড়ালেই কি নতুন কথা হয় ? এক-আধ দিন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আড়িও পেতেছিল মহাশ্বেতা—তা শুনবে কি, নিজেরই এমন বুক ঢিপঢিপ করে যে তার আওয়াজে কিছু শোনাই যায় না। শুধু ফিস্‌ফিস্‌ আওয়াজ আর মধ্যে মধ্যে ঐ হাসি। তাই কি ছাই নিশ্চিন্দি হয়ে দাঁড়াবার উপায় আছে ? হতভাগা ছেলেমেয়েরা ঠিক সময় বুঝে তখনই উঠবে, কাকে মোতাও, কাকে দাঁড়াতে চল বাগানে—এই সব।

রোজ এই ঘটনা। দুপুরে মাতন শেষ ক'রে দুজনে নামবে। মেজগিন্নী চাপা হাসির লহর টেনে শুতে যাবে, ছোটকর্তা গিয়ে সুড় সুড় ক'রে সেঁধোবে নিজের ঘরে। তবু কিন্তু আধিক্যেতার সেইখানেই শেষ নয়—কত ঢং যে জানে ছোঁড়া ! ঘরে ঢুকবে, মোদ্দা বিছানায় শোবে না—ঢালা বিছানা ক'রে দিয়েছে মেজকর্তা রীতিমত গদিবালিশ দিয়ে—সেখানে শোবে বৌ—উনি শোবেন মেঝেতে মাদুর পেতে কিংবা অমনি। প্রথম প্রথম ছোট বৌও শুতে আসত মাটিতে, সে বাবুর প্রচণ্ড ধমক—'যাও, ওপরে গিয়ে শোও বলছি ! নইলে আমি আবার বেরিয়ে যাব !

ছোট বৌ তরলার এইতেই বেশী আপত্তি।

আহা চোখের জল শুকোয় না বেচারার—একটি দিনের জন্যও।

হোক কালো রং, চেহারাটা ওর মহাশ্বেতার কোন দিনই পছন্দ হয় নি এটাও ঠিক—তবু মেয়েটা যে খুব ভাল তা যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছে সে। ভারি লাজুক আর শান্ত। গতরও তেমনি। ভোরে উঠে সেই যে গাধার মতো খাটতে শুরু করে—রাত এগারোটার আগে এক দণ্ড বিশ্রাম নেয় না। সকলকার মুখে মুখে ছিণ্টি যোগান দিচ্ছে। ঐ ছোটকর্তারই কি কম ফৈজত। বাবুর আবার এদান্তে এক নোংরা নেশা হয়েছে, নস্যি নেওয়া—নিত্যি একরাশ ময়লা রুমাল কাচতে দিয়ে যাবে। মায় জুতোয় কালি দেওয়া পর্যন্ত শিখেছে ছোট বৌ। বলে ভাত দেবার ভাতার নয়—নাক কাটবার গোঁসাই ! কেন রে বাবু, তাকে যদি তোর পছন্দ নয়, যদি নিবিই না ঘরে—তো অত ফরমাস করিস কোন্ লজ্জায় ? ঘেন্না করে না পরের মেয়েকে অমনি ক'রে শুধু ঝিয়ের মতো খাটাতে ?

ছোট বৌও তেমনি, মুখ বুজে সব করবে। একটা কথাও শোনাতে পারে না। হ'ত মেজ বৌয়ের মতো মেয়ে তো দেখিয়ে দিত মজা। এ মেয়ে খালি কাঁদতে জানে আর খাটতে জানে। দুপুরবেলা অবধি শোয় না একটু। সব চুকল তো শাশুড়ীর পা টিপতে বসল, নয়তো এসে মহাশ্বেতার ছেলেমেয়েদের নিয়ে পড়ল। এমন কি কোলেরটার নোংরা ব্যাপারগুলো পর্যন্ত সে-ই উদ্ধার করে।

তরলার কাছে এ অবহেলাটা বড় প্রশ্ন নয়, তার কাছে সব চেয়ে মর্মান্তিক হচ্ছে অপমানটাই। চুপ ক'রেই কাঁদে—কিন্তু এক-আধ দিন, বোধ হয় মুখ না খুলে পারে না বলেই ওর কাছে দুঃখ করে, 'দিদি, সে-ই মেঝেতে শোয়, আমি তো মেনেই নিয়েছি—তবু শুধু শুধু আদ্ধেক রাত পর্যন্ত এ কেলেঙ্কারি কেন ! পাড়াসুদ্ধ লোক জানাজানি, ঢিঢিক্কার। কী লাভ হয় এতে বলতে পারেন ?

সবাই রোজ জানছে একবার ক'রে যে বৌটাকে ওর বর নেয় না। নিতে চায় না—ঘেন্না করে!'

আর একটা বড় ক্ষোভ ওর—মেজ বৌয়ের ঐ অভিনয়টা প্রত্যহ সন্ধ্যের সময় সাজাতে আসাটা। সত্যি বড় ভাল মেয়ে তরলা তাই, নইলে মহাশ্বেতা হলেও বোধ হয় এক চড় কষিয়ে দিত কোন দিন। জানিস তো তুই এ সাজের দিকে দুর্গাপদ কোনদিন ফিরেও তাকাবে না, তবে শুধু শুধু এ মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা কেন! জোর ক'রে ধরে সাজানোও চাই অথচ অর্ধেক রাত পর্যন্ত নিত্যি তার বরকে আগলে রাখাও চাই।

ছি! ছি! ঘেন্নায় মহাশ্বেতার গলা পর্যন্ত তেতো হয়ে ওঠে যেন। তাই এক-একদিন নিজের স্বামীকে অন্তত না শুনিয়ে পারে না। কিন্তু শোনালেই বা কি—এরা কি মানুষ! যেমন ইনি তেমনি মেজবাবু। 'এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার!'—অন্ধকারে ঘরে শুয়ে অথবা নির্জন পুকুরঘাটে বসে আপনমনেই হাত-পা নেড়ে বলে মহাশ্বেতা, 'এরা কি মানুষ! কেউ মানুষ নয়। মানুষের রক্ত গায়ে থাকলে—পুরুষ-বাচ্ছা হলে এ কেলেঙ্কার কিছুতে সহ্য করত না!'

স্ত্রীকে যা-ই বলুক, সত্যিই কিছু হাল ছেড়ে বসে ছিল না অভয়পদ। ভেতরে ভেতরে খোঁজখবর নিচ্ছিল নানা দিকেই। অবশেষে একটা খবর নিয়েও এল এক দিন, কিন্তু ওর প্রস্তাব শুনে হেম অবাক হয়ে গেল। বক্তব্যটার মর্মোদ্ধার করতেই বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল তার।

সকালবেলা বড় ভাগ্নে এসে খবর দিয়ে গিয়েছিল। হেম যেন বাড়ি থাকে, সন্ধ্যাবেলা অভয়পদ আসবে। অবশ্য খবর দেওয়ার দরকার ছিল না, কারণ এবার চাকরি ছেড়ে দিয়ে আসবার পর থেকে, বিশেষ কাজ না থাকলে হেম কোথাও যায় না। শুধু অনেক ফল জমলে কি কলার কাঁদিতে রং ধরলে শ্যামা জোর ক'রে পাঠায় কলকাতাতে—তা না হলে সে বাড়িতেই বসে থাকে—বাগানের তদ্বির-তদারক করে।

দরকার না থাক, খবরটা পাওয়া অবধি হেম একটু আগ্রহের সঙ্গেই অপেক্ষা করছিল তখনও। এ খবরের সঙ্গে নিজের চাকরির কোন যোগাযোগ কল্পনা করে নি। তবে অকারণে লোক পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে বলবার লোক নয় অভয়পদ এটা সে জানে। তাই কৌতূহলের শেষ ছিল না তার—হয়তো একটু দুশ্চিন্তাও ছিল। কোন বিপদের খবর নয় তো? তরুর বিয়ের খবরও হতে পারে, কিন্তু তার জন্যে তো মা রয়েছে—তার কাছে কেন?

অবশ্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। সেদিন কোন্ সাহেবের রিটায়ারমেণ্ট উপলক্ষে একটু আগেই ছুটি হয়েছিল—সুতরাং চারটে বাজার আগেই মল্লিকদের বাঁশঝাড়ের আড়ালে সেই বিবর্ণ হয়ে যাওয়া অদ্বিতীয় ছাতাটির উদয় হ'ল।

ছাতাটি পেতে দাওয়াতে বসে বিনাভূমিকাতেই একেবারে কাজের কথা পাড়ল

অভয়পদ। হরিনাথের ভাই শিবু দাদার অফিসে ঢুকেছে—মিলারের কারখানায় চাকরি করে। ওখানকার এক সেকেশনের বড়বাবুর মেয়েকে বিয়ে ক'রে ইতিমধ্যেই সে এস্টাব্লিশমেন্টে চলে গেছে। তাকে ধরলে এখনই কাজ হতে পারে একটা।

কথাটা শুনে প্রথম কিছুক্ষণ মুখে কথা যোগাল না হেমের। শিবুর কাছে যাবে সে চাকরির জন্যে! শিবু!

অনেকক্ষণ পরে যখন কথা বলতে পারল—তখন ঐ প্রশ্নটাই বেরোল, 'শিবুর কাছে যাব চাকরির জন্যে! এত কাণ্ডের পরে? কী বলছেন!'

'কেন, তাতে অসুবিধেটা কি?' স্থির অবচলিত মুখেই পাল্টা প্রশ্ন করে অভয়, 'তোমরা তাদের তো ক্ষতি কর নি কিছু, বরং উপকারই করেছ। তোমরা নিয়ে না এলে ভাজ-ভাইঝিকে পুষতেই হ'ত তাদের—যা হোক ক'রে ভাইঝিটার বিয়েও দিতে হ'ত। মুখে যতই যাই বলুক—পাড়াঘরে মুখ দেখাতে পারত না নইলে। তা ছাড়া—ধর এখানে এনেও বোনকে দিয়ে তোমরা নালিশ-মকদ্দমা করাতে পারতে—অত বড় শক্ত অসুখের ভেতর সই করিয়ে নিয়েছে দলিলে—সেটা আদালতে কতখানি টিকত তা বলা কঠিন। তোমরা তো কিছুই কর নি—ঝগড়াঝাঁটি মামলা-মকদ্দমা। তবে আর তোমাদের লজ্জাটা কি বাপু?'

যুক্তি অকাট্য। কিন্তু এভাবে ভেবে দেখে নি কোন দিন হেম। ভাবতে অভ্যস্ত নয়। সে বিমূঢ়ের মতো বসে রইল অভয়পদর মুখের দিকে চেয়ে।

তখন শ্যামাকে ডেকেও কথাটা বলল অভয়।

শ্যামাও প্রথমটা প্রবল আপত্তি ক'রে উঠেছিল, 'না না। ঐ ছোটলোকদের কাছে যাবে মাথা হেঁট ক'রে চাকরির জন্যে! ছিঃ! তার চেয়ে ও চিরকাল শাঁকে ফুঁ দিয়ে খায় সে-ও ভাল।'

'দেখুন, সে আপনাদের যা অভিরুচি। তবে চাকরির জন্যে, টাকার জন্যে মানুষ অনেকখানিই নিচু হয়। আপনারা একটু আশ্রয়ের জন্যে তো কম অপমান হন নি সরকারদের কাছে। অথচ এখন তো তাদের সঙ্গে দিব্যি সদ্ভাব। যাওয়া-আসা সবই আছে। তা ছাড়া দেখুন ছোটলোকমি তারাই করেছিল—আপনারা তো করেন নি।...আর শাঁকে ফুঁ—সে ওখানে থাকলে যাও বা হ'ত—এখানে আপনারা নতুন এসেছেন, এখানে আপনার ছেলেকে যজমানি দেবে কে? আপনাদের নামই হয়ে গেছে নতুন বামুন। পুরনো পুরুতও আছে। এই তো এতদিন ঘরে এসে বসে রয়েছে, ক পয়সা আনতে পারল?...যাই হোক, ভেবে দেখুন আপনারা!'

বলতে বলতে একেবারে উঠে দাঁড়াল অভয়পদ।

মা-ছেলে দুজনেই হাঁ হাঁ ক'রে উঠল। হেম হাত ধরে টেনে বসাল, শ্যামা ছুটে গেল ঘরে জলখাবার আনতে। জামাই অফিসের ফেরত আসবে খবর পেয়ে সে গুড় দিয়েই চন্দ্রপুলি ক'রে রেখেছিল, আর ক্ষুদ-ভাজার নাড়ু। তার সঙ্গে দুটো পাকা কলা কেটে জামাইয়ের সামনে সাজিয়ে দিলে।

অগত্যা অভয়পদকে বসতে হ'ল।

আবারও কথাটা উঠল।

প্রথম প্রথম যতটা অসম্ভব ব'লে মনে হয়েছিল প্রস্তাবটা—ক্রমশ আর ততটা অসম্ভব রইল না। প্রথম মাথা ঠাণ্ডা হ'ল শ্যামারই। রেলের চাকরি পাকা চাকরি। না হয় শত্রু হাসবে একটু প্রথম প্রথম। ভাল চাকরি আজকাল অত সোজা নয়। চাকরি পাবার সময় একটু মাথা হেঁট করতেই হয়। তার পর অত বড় অফিসে কে কোথায় থাকবে। কে-ই বা মনে রাখবে কথাটা!

'কিন্তু গেলেই কি ক'রে দেবে? মিছিমিছি সেই মুখ পুড়িয়ে যাওয়া ছোট-লোকদের কাছে!' তবু একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে শ্যামা।

'তা বোধ হয় দেবে। শিবু ঠিক ওর মায়ের মতো নয়। পথে যখনই দেখা হয়—আসা-যাওয়ার সময়—ভাইঝির খবর নেয়, আপনাদের কথাও জিজ্ঞাসা করে। তা ছাড়া হাজার হোক ছেলেমানুষ—বাহাদুরি দেখাবার লোভও তো একটা আছে!...বরং এক কাজ করা যেতে পারে। শনিবার হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকলে দেখা হতে পারে। কোন্ ট্রেনে ফেরে তা আমি জানি। কথায় কথায় চাকরির কথাটা পেড়ে দেখা যেতে পারে। তেমন বুঝলে তখন বাড়ি যাওয়া যাবে।'

তার পর একেবারে ছাতা হাতে ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'তা হলে শনিবার একটার সময় ইণ্টার ক্লাস ওয়েটিং রুমের সামনে দাঁড়িয়ে থেকো।'

হয়ত আর একটু আলোচনা করতে পারলে খুশী হ'ত এরা—একবার ব্যাকুল-ভাবে কী একটা বলতেও গেল শ্যামা, কিন্তু অনাবশ্যক বোধেই সে চেষ্টা আর করল না। জামাইকে এত দিনে ভাল ক'রেই চিনেছে। অকারণ আলোচনা সে করে না। আর তার হিসেবে কথাও সে অনেক বলেছে, বৃথা এখন আর একটি কথাও কইতে রাজী হবে না।

॥ ৩ ॥

শিবুর ক্ষমতা বা সদিচ্ছা সম্বন্ধে অভয়পদ যতই যা বলুক না কেন—শ্যামার বেশ খানিকটা সন্দেহ ছিল। যারা নিজের বংশের বৌ আর মেয়ের সঙ্গে অমন শত্রুতা করতে পারে, মতলব এঁটে যথাসর্বস্ব বঞ্চিত করতে পারে—তাদের যে কোন রকম মনুষ্যত্ব আর অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না ওর। শুধু-শুধুই শত্রু হাসাতে যাওয়া হয়তো। শত্রু হাসানোও বড় কথা নয়—যাদের মুখ দেখতে ইচ্ছে ক'রে না ইহজীবনে—তাদেরই দোরে গিয়ে 'কালামুখ নীলে ক'রে' দাঁড়ানো।—এর চেয়ে সত্যিই যেন গলায় দড়ি দেওয়াই ভাল। নিতান্ত নাকি ছেলের নামে একটা কালি থেকে গেছে, তাও পাস-করা ছেলে নয়—বয়সেরও গাছপাথর নেই—এই ভেবেই বিদ্রোহী মনকে শান্ত করে শ্যামা। এখনও যদি চাকরিতে না ঢোকে তো কবে কি হবে? এমনিতেই তো সরকাররা যখন-তখন বলে, 'ওর আর চাকরির বয়স নেই বামুনদি, মিথ্যে ও চেষ্টা করো না। বরং কোনও দোকানে খাতা লেখার কাজ-টাজ দেখ গে, হাতের লেখাটা ভাল—হয়ে যেতে পারে। তবে তাও যে পাবে বলে মনে হয় না, যা চোর-বদনাম রটে গেছে!'

এই সব কথা মনে পড়েই চুপ ক'রে যায় শ্যামা।

কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় অভয়পদর হিসাবে কিছুমাত্র ভুল হয় নি। শিবু সম্বন্ধে তার অনুমান অভ্রান্ত। সত্যিই সে অসাধ্য সাধন করলে। মাস দেড়েকের চেষ্টাতেই অফিসে বসিয়ে দিলে সে। কেরানীরই চাকরি—কারখানা বলে লোহা-পেটানোর কাজ নয়, যদিচ তখন যা হেমের মানসিক অবস্থা, লোহা-পেটানোতেও খুব আপত্তি ছিল না। মাইনেটা অবশ্য যৎসামান্য—মাসে আঠারো টাকার মতো—তবে এ মাইনে বেশীদিন থাকবে না, শিবু বার বার বেশ জোর দিয়েই সে ভরসা দিয়েছে। কোনমতে খাতায় নামটা একবার ওঠা নিয়ে কথা, তার পর একটু ভাল জায়গায় সরিয়ে দিতে কতক্ষণ!

সে যা হোক, মাইনে নিয়ে শ্যামা মাথা ঘামায় না—চাকরি একটা হয়েছে এইতেই সে খুশী। রেলের চাকরি—লোককে বলতে কইতে, বিয়ের বাজারে ছেলের দাম উঠে গেল।

কিন্তু ছেলের বিয়ের কথা এখন ভাবলে চলবে না তা শ্যামা জানে। ছেলের বয়স যতই হোক—বেটাছেলের বিয়ের বয়স পার হয় না কখনও—মেয়েকে নিয়েই এখন তার বড় সমস্যা। তরুকে আর কোনমতেই রাখা যায় না ঘরে। যা হোক ক'রে এবার পার করতে হবে। পাড়াঘরের লোক এখানকার ভাল তাই—অন্য জায়গা হলে হয়তো একটা দুর্নাম তুলে দিয়েই বসে থাকত।

শ্যামা অবশ্য ঠিক ছেলের চাকরির জন্যে বসে ছিল না। টাকা, এই বলতে গেলে বিনা আয়ে সংসার চালিয়েও, কিছু জমেছে তার। উমার কাছে যে ফল পাঠায়—কিছুদিন ধরেই তার দাম নিচ্ছে না সে। বলে দিয়েছে, 'তোর কাছেই রেখে দে, যা হোক ভিক্ষে-দুঃখু ক'রেও চালাব আমি ঠিক—এইটেই আমার ভরসা রইল। একেবারে শুধু হাতে কিছু মেয়ের বিয়ে হবে না, আর সবটাই জামাইয়ের ওপর ভরসা করা ঠিক নয়।'

জামাই টাকা দেবে তা সে জানে। এবার নিতেও তার খুব সংকোচ নেই—কারণ সে এমনি নেবে না, ধারই নেবে। ধার শোধ করতেও পারবে এ বিশ্বাস তার এখন হয়েছে। এর ভেতর সে রোজগারের আর একটা উপায় বার ক'রে ফেলেছে। এখানে চার আনা আট আনা এক টাকা ধার করবার লোক ঢের। থালা বাটি ঘটি বাঁধা রেখে ধার নেয়, টাকা মারা যাবার ভয় নেই, অথচ সুদ পাওয়া যায় ভাল। চার আনা আট আনায় এক পয়সা সুদ। এক টাকা হলেই দু পয়সা।

প্রথম প্রথম শ্যামা ফিরিয়েই দিত। সে এক যন্ত্রণা! নতুন বামুনদি একরাশ নগদ টাকা দিয়ে বাড়ি কিনেছে অথচ তার হাতে চারআনা আট আনা পয়সা নেই এ কেউ বিশ্বাস করে না। আর 'নেই' বলতে—এবং সেটা বিশ্বাস করাবার জন্যে যতখানি জোর দিয়ে বলতে হয়, ততটা জোর দিয়ে বলতে নিজেরও সংকোচে বাধে। মাথাটা বড় বেশী হেঁট হয়ে যায় যেন। তবু তাও করতে হয়েছে বাধ্য

হয়েই, কিন্তু তার পরই বুদ্ধিটা খুলে গেল। জামাই একগাদা টাকা ধার দিয়ে রেখেছে—অম্বিকাপদর নাম ক'রে দিলেও টাকাটা যে ওরই তা জানে—সুতরাং তার কাছে চাওয়া যায় না আর। অথচ আয়ের এমন পথটাও ছেড়ে দিতে মন সরে না। ছেলের রোজগার নেই, সরকারবাড়ির বাঁধা-বরাদ্দ বন্ধ—তার ওপর খরচ বেড়ে গেছে আগের চেয়ে। জামাইয়ের দেনা শোধ করতে হবে, সে তাগাদা না দিক, নিজের চক্ষুলজ্জা আছে। আগে আগে সে মনে করত যে চার আনা আট আনা পয়সা ধার করতে আসে অমনিই—চার আনার আবার সুদ কি? দৈবাৎ এক দিন সুদের হারটা শুনে আর স্থির থাকতে পারলে না। মহাশ্বেতাকে ডেকে পাঠিয়ে কাকুতি-মিনতি ক'রে তার কাছ থেকে কুড়িটা টাকা চেয়ে নিলে—ধার হিসেবেই। যুদ্ধের বাজারে যখন অভয়পদর পকেট বোঝাই থাকত তখন মহাশ্বেতা টাকাটা সিকেটা সরিয়ে হাতে দু-চার টাকা করেছে তা শ্যামা জানে। ধার বলে চাইতে মহাশ্বেতাও ইতস্তত করে নি। তবে টাকাটা নিয়ে শ্যামা কি করবে তা মহাশ্বেতাও জানতে চায় নি—শ্যামাও বলে নি। ইচ্ছে ক'রেই বলে নি। ওর এই অবস্থায় টাকা ধার নিয়ে তেজারতি কারবার করতে চায়—কথাটা অত্যন্ত হাস্যকর এবং অবিশ্বাস্য। তা ছাড়া এই টাকা খাটিয়ে রোজগার করবে সে—শুনলে মহাশ্বেতাও সে রোজগারের ভাগ চাইবে অর্থাৎ সুদ চাইবে। এমনি কথাটা মহাশ্বেতার মাথাতে যাবে না, সেদিক দিয়ে শ্যামা নিশ্চিন্ত। যার এক পয়সা আয় নেই—এতগুলি পেট খেতে—সে সুদে খাটাবার জন্যে টাকা চাইছে—এ মহাশ্বেতা কেন, কারুর মাথাতেই যাবে না।

সেই কুড়ি টাকা মূলধন খাটিয়ে ইতিমধ্যে অনেক ক-টা টাকাই করেছে শ্যামা। দুটো থলে বোঝাই হয়ে গেছে বন্ধকী বাসনে। চার আনা ধার দিলে মাসে এক পয়সা সুদ—অর্থাৎ টাকায় এক আনা। কিন্তু গোটা টাকা নিলে দু' পয়সার বেশী পাওয়া যাবে না। শ্যামা তাই চেষ্টা করত চার আনা হিসেবে ধার দিতেই। আট আনা চাইতে এলে চার আনা দিত। আবার চার আনা দিত হয়তো পরের দিন—আলাদা একটা বাটি কি একটা হাতা রেখে, এ দুটো মিলিয়ে আট আনার হিসেব ধরা হ'ত না—আলাদা আলাদা ঋণ হিসেবে পৃথক সুদ ধরে নিত। তাতে টাকা পিছু এক আনাই দাঁড়ায় মাসে।

এই সুদের প্রায় সবটাই জমে। খুব প্রয়োজন না হলে—অর্থাৎ একেবারে হাঁড়িচড়া বন্ধ না হলে এ থেকে খরচা করে না সে। তার ফলে এক দিন হিসেব ক'রে দেখেছিল যে মোট এখন তার দেড়শোর ওপর খাটছে এই কারবারে। বাসন বাঁধা রেখে কারবারের সুবিধা এই—বেশীদিন টাকা পড়ে থাকে না। পুরো মাস রাখেনা প্রায় কেউই। দরকারের জিনিস, চার আনা আজ নিলে—কাল হয়তো জন-খেটে হোক কি কারুর বাগানে কাজ ক'রে হোক মজুরি পেলেই সতেরোটি পয়সা শোধ দিয়ে গেল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের ধার করতে আসে মেয়েরা—তাদের হাতের জিনিসে টান বেশী—তারা পুরুষের অসুবিধা থাকলেও জোর ক'রে আদায় ক'রে আনে ধারের পয়সা। একবার সীতার শাশুড়ী একটা

পাইজোর রেখে পাঁচ টাকা নিয়ে গিয়েছিল টাকায় তিন পয়সা সুদে কবুল ক'রে—আর এ-মুখো হয় নি। সুদে আসলে জিনিসের দাম ছাপিয়ে গেছে কিন্তু ঠিক বেচে-কেনে নিতে সাহসে কুলোয় নি শ্যামার—কে জানে এর পর এসে যদি দাঙ্গাহাঙ্গামা করে! সেই থেকে নাকে কানে মলেছে সে—পুরো এক টাকার বেশী ধার কাউকে দেয় না, বেশী চাইতে এলে চোখ কপালে তুলে বলে, 'তিন টাকা! ওমা অত টাকা কোথা পাব বাছা! তোমরা তো বেশ লোক, দেখছ গামছা-কানি পরে থাকি, সারা দিন পাতা কুড়িয়ে নারকোলপাতা চেঁচে পেট চালাই—তার কাছে এসেছ তিনটাকা ধার চাইতে। মল্লিক-গিন্নীর কাছে যাও!' নয়তো বলে, 'চৌধুরীদের বড় বৌ থাকতে এখানে কেন এসেছ বাছা?'

চার আনা ক'রে ধার দিলে সাত দিনে উসুল হয়; তাতে—হিসেব ক'রে দেখেছে শ্যামা—গড়পড়তা এক টাকা খাটলে মাসে অন্তত পাঁচ-পয়সা আয় হয়ই। তার মানে তিনটে টাকা খাটালে এক মাসে চার আনা—সে চার আনা আবার মাসে সওয়া পয়সা দিতে থাকে। বেশী লোভে কাজ নেই তার।

টাকার জন্য কৃচ্ছ্রতা বড় কম করছে না সে। আরও করতে পারত যদি ঐন্দ্রিলাটা একটু বুঝদার হ'ত। ওর বড়লোকের হাত হয়ে গেছে। ছেলেবেলা দিদিমার সংসারে ছিল, তার পর গিয়ে পড়ল ঘোষালদের ঘরে। সেখানে ফেলাছড়ার মতো অবস্থা না হোক—প্রাচুর্য ছিল। ফলে রান্না করতে দিলেই—কিছুতে হাত-টেনে চলতে পারে না। পরিষ্কার মুখের ওপর বলে দেয়, 'ওসব ডেযো-ডোকলার রান্না কখনও শিখি নি, এখন আর শিখতে পারবও না। রাঁধতে হয় তুমি রাঁধ।'

রাঁধতে পারে শ্যামা—তার জন্য কিছু নয়। এত দিনের দারিদ্র্যই তাকে হাতে ধরে শিখিয়েছে, আদৌ তেল না দিয়ে বা মশলা না দিয়ে কেমন ক'রে রাঁধতে হয়। কিন্তু সে যদি ঐ নিয়ে থাকে তো এদিক করে কে? পাতা কুড়নো, পাতা চাঁচা, বাগানের তদ্বির করা, সুদ কষা, তেজারতি, পাইকেরদের সঙ্গে নারকোল-সুপুরি নিয়ে দর কষাকষি, টাকা আদায়—এক কথায় পুরুষের কাজ। তা ছাড়া বিনা বাজারে রান্না তার, সকাল থেকে সুষুনি কলমি শাক তুলতে, ডুমুর পাড়তে, কি কাঁচকলা গুনে দেখে কাটতেই এক প্রহর বেলা কেটে যায়। সে ছাড়া এগুলো যে আর কেউ পারবে না। তরুকে আসতে দিতে চায় না, হয়তো রং ময়লা হয়ে যাবে রোদে পুড়ে মাটি ঘেঁটে। আইবুড়ো মেয়ে, চেহারা দেখিয়ে পার করতে হবে। হেম বাইরে থাকে, আর এক-আধ দিনের জন্যে এলেও এসব উঞ্ছবৃত্তি তার দ্বারা হয় না। বড় জোর বাগানের মাটিটা কুপিয়ে দিলে কি কলাঝাড়ের এঁটে মারলে। এই কাজগুলোই তার জন্য রেখে দেয় শ্যামা।

তা ছাড়া শ্যামা দেখেছে—কাজ নিয়ে থাকলে তবু ঐন্দ্রিলা এক রকম থাকে, বসে থাকলে অহরহ ঝগড়া। দিনরাত কাকচিল বসতে দেয় না একেবারে। তার সব চেয়ে বেশী রাগ যেন তরুর ওপর—কথায় কথায় শাপশাপান্ত করে। 'দেখব দেখব, তোর তেজই বা কদ্দিন থাকে। তেজ ভাঙবে, আমার মতো হাত হবে,

—সর্বস্ব খুইয়ে তুইও পথে বসবি।' তরু শান্ত স্বভাবের মেয়ে—সে এই অকারণ বিদ্বেষ ও অহেতুক আক্রমণের কোন জবাবই দিতে পারে না, শুধু চোখের জল ফেলে। শ্যামা দু-একবার শাসন করতে যে যায় নি তা নয়, কিন্তু তাতে লাভের মধ্যে শুধু গালাগালিটা তরুর ওপর থেকে ওর ওপরই এসে পড়েছে। এমন অকথা-কুকথা বলে গালাগাল দেয় যে শুনতে কানে আঙুল না দিয়ে পারা যায় না। মেয়েকে নিয়ে হয়েছে ওর সাপের ছুঁচো ধরা, ফেলাও যায় না গেলাও যায় না।

সুতরাং রাঁধতেই দিতে হয়। আর তা নিয়ে অশান্তির শেষ নেই। এক পয়সা ক'রে তেল কিনতে পারলে হয় বটে—কিন্তু কে নিত্য দোকানে যায়? কান্তি নেই, পরের ছেলেটা সাত বছরের হয়ে মারা গেছে—এমন কেউ নেই যে বাজার-হাট করে। শেষে অনেক খেচাখেচির পর ঐন্দ্রিলাই এক ফন্দি বার করেছে, বলেছে, 'তুমি বাবা তেলের শিশিতে দাগ কেটে দিও ওষুধের দোকানের মতো। পাঁচ ছটাক তেল তো আসে—যদি আট দিন চালানোরই মতলব হয় তো আটটা দাগ কেটে দিও—কি দশটা। যা পারি যেমন ক'রে পারি আমি ঐ দাগেই চালাব।'

মেয়ের মেজাজ ভাল থাকলে শ্যামা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে, 'তেল মোটে আগে দিবি নি। যেটুকু তেল দিবি তাতে আনাজ কষাও হবে না, মিছিমিছি তেলটা মাটি। আগে নুন বাটনা দিয়ে সেদ্ধ ক'রে নিবি—পরে সুদ্ধ একটু ফোড়ন চোয়ানোর মতো তেল ঢেলে সাঁতলাবি। তাতে গন্ধটা তো হবে—তাতেই ব্যান্নন উতরে যাবে দেখবি। বলি তেলের তো কোন স্বাদ নেই—শুধু গন্ধ। যত শেষে দিবি তত গন্ধ ঠিক থাকবে। বুঝলি না? তবে লঙ্কাফোড়ন দিস্‌ নি কখনও—যেটুকু তেল তা হলে ঐ লঙ্কাতেই শুষে নেবে।'

মেয়ে হাত-পা নেড়ে বলে, 'মাইরি মা তুমি একটা পয়সা বাঁচাবার ইস্কুল খোল। বিস্তর মেয়ে পাবে বলে দিচ্ছি! চার গণ্ডা ক'রে মাইনে নিলেও তোমার পয়সা খায় কে! মেয়েরা না আসুক, পুরুষরা জোর ক'রে ভর্তি ক'রে দিয়ে যাবে।'

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে শ্যামা বলে, 'তা তো পারি খুলতে। অনেকেরই সংসার হয় তাতে, বুঝলি! বেশির ভাগই তো দেখি ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোচ্ছে না—অথচ বাইরের ঠাট বজায় দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত। কেন বাবা, যেমন আয় তেমনি ব্যয় কর না—তাতে অশান্তি হয় না কিছু। তা তো নয়, ফোতো নবাবিটুকু চাই ষোল আনা। বিশেষ দেখি মাগীদেরই নবাবি বেশী। আমি কম তেলে রাঁধতে পারি না—আমি আতেলা তরকারি মুখে দিতে পারি না—সুর টেনে টেনে আদিখ্যেতার কথা শুনলে বেম্ভাণ্ড জ্বলে যায় আমার। টাকা তো রোজগার করতে হয় না—কী কষ্টে আসে তা তোরা কি বুঝবি!'

॥ ৪ ॥

শেষ পর্যন্ত মঙ্গলার সেই সম্বন্ধই নিতে হয়। এদিকে ভাল ছেলে, কি এক বিলিতী সওদাগরী আপিসে কাজ করে, মাইনে চল্লিশ টাকা—উপরিতে দুনো পুষিয়ে যায়। একটা পাসের পড়া পর্যন্ত পড়েছিল, পাসটা দিতে পারে নি। মা-

বাপ নেই, আছে বুড়ী ঠাকুমা। বুড়ী বাপের বাড়ির দরুন কিছু জমিজমা পেয়েছিল, সে সবই আছে। হয়তো তা ছাড়াও নগদ টাকা কিছু আছে। বুড়ীর আদরেই পাস দিতে পারে নি। ঘুড়ি উড়িয়ে ডাংগুলি খেলে কাটিয়েছে। তা হোক্—মাথা আছে। কথাবার্তা পরিষ্কার। পাত্র সব দিক দিয়েই ভাল। একমাত্র দোষ ঐ সতীনের। তা সে এমন কিছু নয়—বুড়ী লেখাপড়া করিয়ে সব দিক দিয়ে পরিষ্কার ক'রে রেখেছে। সে বৌ আর তার বাবা দুজনেই সে নাদাবি-নামায় সই ক'রে দিয়েছে—জমিটা পেয়ে তারা সব স্বত্ব ছেড়ে দিচ্ছে। তা ছাড়া এই তো মোটে তেইশ বছর বয়স—'তা এ বয়সে তো কত লোকের পেরথম পক্ষই হয় না, এই তো ধর্ না কেন তোরই ছেলে, দেখতে দেখতে ঘেটের কম বয়েসটি কী হ'ল! এর পর ওর কনেই পাবি না। তখন মিছে ক'রে বলতে হবে দোজবরে, নইলে লোকে ভাববে ছেলের কোন দোষ ছিল, তা না হলে অ্যাদ্দিন বে হয় নি কেন?'

বলেন আর অন্ধকার মুখগহ্বর বিস্তার ক'রে হাসেন হা-হা ক'রে।

শ্যামা এবার মন স্থির করে। কিন্তু তাও, এ সৌভাগ্যও যেন তার বিশ্বাস হয় না। বলে, 'এ কী আর আমার বরাতে হবে মা, কতটি হেঁকে বসবে তার ঠিক কি!'

'তুই রেখে বোস দিকি! সতীনের ওপর আবার খাঁই কি! খাঁই করলে চলবে কেন। হাজার হোক একবার দাগ তো পড়ে গেছে। দোজবরে এমন ফুটফুটে মেয়ে পাচ্ছে এই কত না···সে আমি বলে দিয়েছি বুড়ীকে মুখের ওপর। ওলো বামনী কে জানিস, আমার পিসতুতো নন্দাই দুকড়ি দত্ত, সে হ'ল বুড়ীর প্রেজা। ওদের বাড়িতে আসে পেরায়। সেইখানেই দেখা আমার সঙ্গে। কথায় কথায় কথা উঠল, বুড়ী বলে আমার হারানের জন্য একটা ভাল মেয়ে দেখে দাও না। আগে মনে পড়ে নি, বলেছিলুম কায়েতের ঘর হলে দু কুড়ি দশ গণ্ডা মেয়ে এনে দিতে পারতুম—এ যে বামুনের ঘরের মেয়ে চাইছ মা।···তার পরই মনে পড়ে গেল। সোন্দর মেয়ে শুনে বুড়ী বলেছে আমার এক পয়সা চাই নি। মেয়ে পছন্দ হলে দেনাপাওনার কথাই তুলব না। যা দেবে তাই নেব। তা তোর এখন থেকে অত ভাবনা কি, মেয়ে দেখা না আগে!'

শ্যামা একটু আশ্বস্ত হয়। মেয়ে ঐন্দ্রিলার মতো রূপসী নয় ঠিকই—নাক-চোখ-মুখ একটা সাকারাও নয়—তবে আর পাঁচটা মেয়ের তুলনায় ভালই দেখতে। তা ছাড়া গৌর বর্ণটা আছে। সেখানেও হয়তো ঐন্দ্রিলার চেয়ে কিছু নিরেস—কিন্তু তবু ফরসাই যে তাতে সন্দেহ নেই। আর সর্বদোষ হরে গোরা।

'তাই তা হলে দেখাও মা। কবে কী হবে—আমি খবর পাব কী ক'রে?'

'খবর তোকে নিতে হবে না। আমি বুড়ীকে বলে দিয়েছি—সামনের রবিবার খোদ নাতিকে সঙ্গে ক'রে যাব তোদের বাড়ি। নাতি ঢুকবে না, ওখানে ঐ চৌধুরীপাড়াতেই ওর কে ফেরেন্ড আছে, তার বাড়ি গে বসে থাকবে। বুড়ী যাবে। কেমন, ঠিক করি নি?'

নিজের বুদ্ধির তারিফে নিজেই হেসে ওঠেন আবার হা-হা ক'রে।

তার পর বলেন, 'ভালয় ভালয় যে হয়ে গেলে ঘটকী-বিদেয় দিবি তো? দ্যাখ্—ভাল ঘটকী-বিদেয় কবুল না করলে ভাংচি দেব।'

'তোমার নাত্নীর বিয়ে—ঘটকী-বিদেয় আবার কি। নুন-ভাত যা জোটে খেয়ে এসো এক পেট।'

'তবেই হয়েছে।' পিঁটকী খন্ খন্ ক'রে ওঠে। ওর এই বয়সেই দাঁত পড়তে শুরু হয়েছে, কথা জড়িয়ে যায়। তাই গলায় জোর দিয়ে কথা বলা অভ্যাস হয়ে গেছে। বলে, 'মা কি কোথাও খায় নাকি? খাওয়া-দাওয়া তো ছেড়ে দিয়েছে। এখন তো মা'র কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নোংরা। দেখছ না উঠোনের মাঝখানে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ কাপড় এখনও ভিজে, সদ্য গা ধুয়ে আসছে ঘাট থেকে। ঐ যে নতুন এক ঘর পিরিলী বামুন এসেছে এখানে, ওদের বৌ সেদিন দশটা টাকা ধার নিয়েছিল একটা নাকছাবি রেখে, মা গা ধুয়ে আসছে, সেই টাকা শোধ দিয়ে গেল! তা গেল তো গেল—সে তো আর অতশত জানে না, টাকাটা দিয়ে গেল হাতে হাত ঠেকিয়ে—ব্যস্, আর রক্ষে আছে—এখন আবার পুকুরে যাবে, গলা অবধি ওলাবে, নোটখানা ধোবে—তবে ঘরে ঢুকবে।'

'নোট ধোবে কি!' প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে শ্যামা। দশ-দশটা টাকা—যদি নষ্ট হয়ে যায়! টাকা—তা সে যারই হোক—নষ্ট হচ্ছে শুনলে বুকে বাজে বৈকি।

'তবে না তো কি! ধোবে তার পর উনুনপাড়ে রেখে শুকোবে, তবে বাক্সয় তুলবে।'

'তুই থাম দিকি। হাটিপাটি পেড়ে সব কথা সবাইকে না শোনালে চলে না—না? বলে আহাম্মুক নম্বর চার—ঘরের কথা করে বার!'

মঙ্গলা রেগে গজগজ করতে করতে ঘাটের দিকে চলে যান।

শ্যামা বলে, 'তা ভিজে কাপড়ে ছুঁয়েছে তাতেও দোষ?'

'নিশ্চয়ই, কাপড়ের জলটা তো ওর ছোঁওয়া হয়ে গেলে। পুষ্করিণীতে দোষ নেই—পিতিষ্টে করা বলে। কাপড়ে বয়ে আনলে দোষ জন্মায় বৈকি!

পিঁটকী ম্লান হাসে। কারণ এটা তাদের পক্ষে—বিশেষ ক'রে তার পক্ষে আর কৌতুকের কথা নয়। এর ধাক্কা বেশির ভাগ তাকেই পোয়াতে হয়।

পাত্রপক্ষ তরুবালাকে দেখে পছন্দ ক'রে গেলেন। পাত্রের ঠাকুমা ভারি খুশী—তখনই আশীর্বাদ ক'রে যেতে চান। অতি কষ্টে নিবৃত্ত করে শ্যামা, ভাল দিন দেখে পাকা-দেখাটা করা দরকার। সিদ্ধেশ্বরীতলায় পাঁজি দেখিয়ে না এলে সে আশীর্বাদ করতে দেবে না।

হারানের ঠাকুমা বললেন, 'সে'যা হয় করো মা, কিন্তু সামনের তিন মাস বে নেই—যা করতে হবে এই মাসে। আমার এই ধর চার কুড়ি বছর বয়স হতে চলল, শরীরেরও এই অবস্থা—কবে বলতে কবে টেঁসে যাব, তখন ছেলেটা একটু ভাত-জলের পিত্যাশী হয়ে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াবে—তা হতে দোব না। মেয়ে আরও

দু-একটা দেখে রেখেছি—অবিশ্যি পছন্দের মেয়ে নয় সে সব—তবে নাপাযিমানে তাদেরই কাউকে নিতে হবে, অগত্যে। এই সাফ্ সাফ্ বলে দিলুম!'

এ মাস অর্থাৎ আর কুড়ি দিন বাকী। শ্যামার মুখ শুকিয়ে যায়।

কিছু দিতে হবে না—বুড়ী গিন্নী বলে দিয়েছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলে দিয়েছেন যে 'দানসামিগ্‌গির নমস্কারী যেন খারাপ না হয়। আমাদেরও তো পাঁচটা কুটুম্বসাক্ষেৎ আসবে, তাদের সামনে ব্যাভ্রম না হই। নগদ টাকাটা কেউ সিন্দুক খুলে দেখতে আসবে না, কিন্তু এসব সামনে থাকবে। লোকে না ভাবে এর নাতির বে হচ্ছিল না বলে কোনমতে হাভাতের ঘরের মেয়ে এনেছে।'

শ্যামা তখনই ছোটে সিন্ধেশ্বরীতলায় দিন দেখতে। এ মাসের শেষ বিয়ের দিন পড়েছে আর ঠিক বারো দিনের মাথায়। মাথায় হাত দিয়ে বসবার কথা, কিন্তু মাথায় হাত কেন, মেঝেতে মাথা কুটলেও বিয়ে হবে না তা সে জানে। বুড়ী তিন মাস অপেক্ষা করবে না—তা তার গলার আওয়াজেই বুঝেছে সে, তা ছাড়া তিন মাস অনেক সময়, শ্যামাও সে ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়। যদি আরও ভাল মেয়ে পেয়ে যায় ওরা—অথবা মাঝারি মেয়ের সঙ্গে টাকার পাওনাটা ভাল হয়—তা হলে কি আর তখন ওর মেয়ে নেবে?

অথচ বারো দিন। কী ক'রেই বা হয়!

সেই রাত্রে হেমকে পাঠায় শ্যামা বড় জামাইয়ের কাছে। এক দেনা শোধ হয় নি, আবার দেনার প্রস্তাব পাঠানো—কথাটা মুখে উচ্চারণ করতেই লজ্জায় মাথা কাটা যায়—অথচ ওরই বা কে আছে ঐ অধম-তারণ জামাইটি ছাড়া।

অভয়পদর কোমরে একটা ব্যথা ধরেছে, সে আসতে পারলে না, সে কিন্তু হেমের মুখে সব শুনে বলে দিলে, 'মাকে ও সম্বন্ধ হাতছাড়া করতে বারণ কর। যা হোক ক'রে হয়েই যাবে। ও ছেলেকে আমি জানি—প্রথম বয়সে বড় বকে গিয়েছিল, কিন্তু এখন মন দিয়ে চাকরি-বাকরি করে শুনেছি, থিয়েটারের শখ খুব—তা নিজের বাড়িতেই ক্লাব বসিয়েছে, বাইরে কোথাও যায় না। নানা ঝঞ্ঝাটে ওর কথাটা এতদিন মনে পড়ে নি। তা ছাড়া—শুনেছি কী সব ফাঁড়া-টাড়া ছিল। অবিশ্যি যদি সে সব কেটে গিয়ে থাকে তো আর আপত্তি কি!'

•

শ্যামা পরের দিন ভোরবেলাই ছুটল কলকাতাতে। উমা নতুন বাড়িতে চলে আসার পর একবার মাত্র এসেছিল সে—গোবিন্দকে সঙ্গে ক'রে। বাড়ি ঠিক মনে নেই—তবু আগে দিদির বাড়ি গেল না ইচ্ছে ক'রেই। দিদির কাছে কান্নাকাটি ক'রে মোটা কিছু আদায় করতে হবে, উমার কাছে টাকা আদায় করতে যাচ্ছে শুনলে দিদির হাত গুটিয়ে আসবে।

উমা শুনে আনন্দ প্রকাশ করলে। নিজে থেকেই বললে, থান দুই নমস্কারী সে দেবে। ওর ছাত্রীরা পুজোয় কাপড় দেয় কেউ কেউ—তা থেকে ভাল শাড়ি দুখানা তুলে রেখেছে সে তরুর বিয়ের কথা ভেবেই।

উমার তখন রান্না চড়েছে। এখানে এসে রাত্রে আর রান্নার হাঙ্গামা করে

না—বাড়ি ফিরতেই আটটা-নটা হয়ে যায়, তখন উনুন ধরিয়ে রাঁধতে বসা পোষায় না। তা ছাড়া ঘুঁটে-কয়লা খরচের কথাও ভাবতে হয়। প্রথম প্রথম রুটি ক'রে রাখত, কিন্তু সকাল দশটার রুটি রাত দশটায় এসে চিবোতে রীতিমত কষ্ট হয়। এখন অনেকখানি ক'রে সাবু ক'রে রাখে। রাত্রে এসে দুধসাবু খায়। দুধসাবু—তার সঙ্গে ঘরের নারকেল নাড়ু করা থাকলে তাই দুটো—নইলে বাজার থেকে সস্তার মিষ্টি নারকোল ছাপা বা তিলকুটো কিনে আনে—তাই। শীতকাল হলে একটু তরকারিও রেখে দেয়।

শ্যামা যখন এল তখন উমার সাবু আর একটা তরকারি নেমেছে ভাত চড়াতে যাচ্ছে। ওকে দেখে একেবারে চালেডালে চড়িয়ে দিলে। ঘরে অন্য জলখাবার ছিল না কিছু, অগত্যা দুধসাবুই একবাটি ধরে দিলে ওকে—তার সঙ্গে দুটো তিলকুটো। তার পর নিজের তোরঙ্গ খুলে (মা'র দরুণ তোরঙ্গ এটা—তার ভেতরই শ্যামা লক্ষ্য করে, এখনও কেমন মজবুত আছে, সেকালের জিনিস, ওর দাম কত। উমিটা কত কী-ই পেলে!) কাপড়ের তলা থেকে একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা টাকা-পয়সা-বার ক'রে ওর সামনে দিয়ে বললে, 'দ্যাখ দিকি গুনে কত আছে। আমার গোনা-গাঁথা নেই। যেদিন যা পাই এনে ঐতেই রেখে দিই। হিসেবনিকেশ গোনাগাঁথার সময়ই বা কৈ, করেই বা কে।'

পুঁটুলির আকৃতিটা দেখেই শ্যামা যেন অনেকখানি দমে যায়। ওর যে অনেক আশা এর ওপর। সে ব্যগ্র কম্পিত হাতে পুঁটুলিটা খুলে গুনতে বসে। টাকা, নোট, খুচরো—একগাদা। কিন্তু তবু অভ্যস্ত চোখ বুঝতে পারে এর মোট মূল্যের পরিমাণ ওর আন্দাজের চেয়ে অনেক কম।

বার বার তিনবার গোনে শ্যামা, ছিয়াশি টাকা সাত আনা।

'এ কী রে! আর?' ভগ্ন স্খলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে সে। যেন আর্তনাদের মতো শোনায় প্রশ্নটা।

'আর কোথা পাব। তোমার যা ফলবেচা টাকা সব ঐতেই আছে।'

সে কি! এ কী সব্বনেশে কথা রে। আমার যে ঢের বেশী পাবার কথা, আমি যে এর ওপর ভরসা ক'রে বসে আছি।'

'পাবার কথা!' তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে উমার কণ্ঠস্বর, 'পাবার কথা, তার মানে কি! কত পাবার কথা, তুমি জানলে কী ক'রে? এর কি কোন লেখাপড়া হিসেব-নিকেশ আছে?'

'ঠিক হিসেবনিকেশ নেই—তবু একটা আন্দাজ তো আছে। এত দিন নিই নি—এই কটি টাকা হবে কী ক'রে। তুই অন্য কোথাও রাখিস নি তো? মনে ক'রে দ্যাখ একবার বরং। ভুলে—কি এমনি—হাত-আজাড়ের অভাবে?'

মিনতির মতো শোনায় শ্যামার গলা। কিন্তু তবু তার ভেতরেই যেন একটা অন্য ধরনের সন্দেহও কোথায় উঁকি মারে।

আর সেইটে লক্ষ্য ক'রেই নিমেষে জ্বলে ওঠে উমা, 'বলছি এই সব হিসেব-নিকেশের ভয়েই তোমার ফল-বেচা টাকা আমি কোথাও রাখি না—যত কাজই

থাক, বাড়ি ফিরে আলাদা ক'রে রেখে দিই কাপড় কেচে এসে, শত কাজ ফেলে, এমন কি ইষ্টমন্ত্র জপ করবারও আগে তোমার টাকা তুলে রেখে দিই। আর কোথাও থাকে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তা ছাড়া এই টাকাটাই কি সোজা—পনেরো-কুড়ি দিন অন্তর অন্তর তো হেম দিয়ে যায় চার-পাঁচটা পেঁপে, সাত-আটটা নারকোল—তাতে এত হবেই বা কী ক'রে। কী এমন নশো পঞ্চাশ টাকা দামের জিনিস ওসব!'

'চার-পাঁচটা পেঁপে আট-দশটা নারকোল ঠিকই—কিন্তু সেই কী সাধারণ জিনিস। তা ছাড়া ছড়াকলাও তো পাঠিয়েছি, ভাল কালীবৌ কলা আমার। যেমন মোটা তেমনি বড় মোলাম কলা। একোটা কলা এক পয়সা আমার ওখানে বসে বিক্রি হয়!'

বলতে বলতে পেট-কাপড়ে বাঁধা তিন-চারখানা কাগজ বার করে শ্যামা। কান্তির ফেলে যাওয়া বাদামী কাগজের খাতা থেকে ছেঁড়া। তাইতে তারিখ দিয়ে দিয়ে সে লিখে রেখেছে কবেকার চালানে কী কী মাল এসেছে। কটা পেঁপে কটা নারকোল কটা কলা! মাল আর তার পাশে একটা আনুমানিক মূল্য। সেটা যোগ দিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় পোনে দু'শো টাকার মতো।

কাগজগুলো উমার সামনে ফেলে দিয়ে বিজয়গর্বে বলে ওঠে শ্যামা, 'এই তো! হিসেব তো সামনেই রয়েছে, আমি কি আর বিনা হিসেবে এত কথা বলছি! একশো বাহাত্তর টাকা হবার কথা—নিদেন দেড়শোও তো হবে। এত কম হয় কি ক'রে!'

উমার মুখ লাল হয়ে ওঠে, সে তাড়াতাড়ি কাগজগুলো তুলে নিয়ে চোখ বুলিয়েই ফেলে দেয় শ্যামার সামনে, 'এ কী করেছ, সব পেঁপে গড়পড়তা তিন আনা হিসেবে দাম ধরে বসে আছ, সব নারকোল তিন আনা! তাই কেউ দেয়? ছোট বড় সব একদাম? বাজারে একটা মাঝারি পেঁপের দাম চার পয়সা—সেই জিনিসের কত দাম নেওয়া যায় বল! তারাও তো বাজার যায় রোজ—না কি? খুব বড় হলে—দেখবার মতো হলে সেটায় তিন কেন চার আনাও আদায় করা যায়। তাই বলে গড়পড়তা সব তিন আনা! আর নারকোল তো তুমি বেচছ সাড়ে তিন টাকা শ—পঁয়ত্রিশ টাকা হাজার। সেই নারকোল এখানে কত দাম হবে মনে কর? বাজারে গিয়ে দ্যাখ, বড় বড় নারকোল এক একটা এক আনায় বিক্রি হচ্ছে। তাও দেইনি আমি, তবু ছ পয়সার কম নিই না কোনটা, খুব মিষ্টি মোলাম নারকোল—এমনি নানান বক্তৃতা দিয়ে গছাই। বড়গুলো দু আনা পর্যন্ত ধরি। তাও তোমার ফল তো ছোটই হয়ে আসছে ক্রমশ। দাতার নারকোল বাকিলের বাঁশ—তোমার নারকোল ছোট হবে জানা কথাই।'

হতাশ ক্ষুব্ধ মুখে বসে থাকে শ্যামা কিছুক্ষণ, তারপর রীতিমত বিরস কণ্ঠে বলে, 'কী ক'রে জানব বল, এই ফলই আগে আগে তুমি যে দামে বিক্রি করেছ সেই হিসেবেই আমি দাম ধরে রেখেছি। মেয়ের বে দিতে হবে, আকণ্ঠ দেনায় ডুবে আছি—সেই জন্যেই আরও এত হিসেব রাখা। কোথায় দাঁড়াচ্ছে সেটা

বুঝতে হবে তো। এমন জানলে সদ্য-সদ্যই নিয়ে নিতুম। তাতে ভুলচুক হবার অত পথ থাকত না। আমারই বোকামি—টাকাটা ওখানে সুদে খাটালে দশ গুণ বেড়ে যেত। উল্‌টে এ কমেই গেল আসল থেকে!'

'তার মানে কি বলতে চাইছ, পষ্ট ক'রে বল দিকি! আমি তোমার টাকা মেরে দিয়েছি—এই তো? চুরি করে খেয়েছি—না কি? বেশ তো, এতকাল ধরে ঘাড়ে ক'রে ক'রে ফিরিওয়ালার মতো বেচেছি তারও তো একটা দালালি-দস্তুরি আছে, মজুরি আছে, সেইটেই ধর না কেন!'

এবার শ্যামার হিংস্র চেহারাটা পুরোপুরি বেরিয়ে পড়ে। সে সমান তালেই জবাব দেয়, 'সে নিলেও তো বাঁচতুম—তাতে এত যেত না। এ যে মুলেই হাভাত!'

উমাও আর সামলাতে পারে না। বলে, 'ইতর ছোটলোকদের সঙ্গে ঘর ক'রে ক'রে তুমিও ইতর হয়ে গেছ, তাই এমন কথাটা বলতে পারলে। আমার কী গরজ পড়েছিল এতখানি নীচু হয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি ফল বিক্রি ক'রে বেড়াবার? এই সব ফলের যে এত দাম হতে পারে, তা তুমি জানতে কখনও? তোমার ওধারের বাজারে কী দরে বিক্রি হয়? এ পথ দেখালে কে? সে প্রবৃত্তি যদি আমার থাকত, তা হলে প্রথম থেকেই তো পয়সা সরাতে পারতুম। যে পেঁপে চার আনা পাঁচ আনায় বিক্রি করেছি এককালে, সে পেঁপের জন্যে তিন আনা দশ পয়সা দিলেও তুমি বর্তে যেতে। তোমার উপকার হবে বলেই তো করা। কারবার করছি জানলে নগদ কিনে নিয়ে কারবার করতুম—তাতে ঢের লাভ হ'ত। বেশ হয়েছে—উচিত শিক্ষা হয়েছে। তুমি যাও, কত টাকা তোমার চুরি করেছি ব'লো হিসেব ক'রে—একেবারে না পারি মাসে মাসে দিয়েও কড়াক্রান্তিতে শোধ ক'রে দেব। আর কখনও কিন্তু এ-মুখো হয়ো না। ফলও পাঠিও না।'

এবার শ্যামা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। ভয়ও হয় তার। সত্যিই যদি ফল না এখানে পাঠাতে পারে তো সিকি দামও পাবে না। অর্ধেক ফল বিক্রিই হবে না, ওখানে খদ্দের কোথা এত? আর বাজারে বসে বিক্রিই বা করতে যাচ্ছে কে?

অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বলে, 'না, না। তাই কি আমি বলছি—তা বলছি না। ভুলও তো হতে পারে—তাই বলা। আমার বড্ড ভরসা ছিল কিনা, এই টাকাটা হিসেবে ধরা ছিল তাই। চুরির কথা কে বলেছে—তোর সব উলটো-পালটা কথা—'

বলে আর আড়ে আড়ে উমার পানে তাকায়। উমার মুখ অঙ্গার-বর্ণ হয়ে উঠেছে, দৃষ্টি কঠিন। সেদিকে চেয়ে ভয়-ভয়ই করে শ্যামার। উমা কিন্তু আর জবাব দেয় না, কথাও বলে না। অগত্যা সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টাকাগুলো আর একবার গুনতে বসে। এ টাকাতে কিছুই হবে না ওর, অন্তত একশো টাকা পুরো হলেও কথা ছিল। দান-সামগ্রী, বরযাত্রী খাওয়ানো—কন্যা-যাত্রীও দু-চারজন বলতে হবে, নতুন পাড়ায় নতুন বাড়িতে এসে এই ওর প্রথম কাজ—তা ছাড়া বরের আংটি আছে, মেয়েকেও কোন্ না দুগাছা রুলি আর কানের

একটা কিছু দিতে হবে। বড় জামাইয়ের জামাই-বরণের ধুতি চাদর দেওয়া আছে— একজন তো এ দায় থেকে তো অব্যাহতি দিয়ে গেল। তবে সে বেঁচে থাকলে এ বিয়ের দায়টা সম্পূর্ণ তার ওপরই চাপাতে পারত। বড় জামাইকে অবশ্য বরণের সময় একখানা গামছা দিলেও সে কিছু বলবে না—কিন্তু তা করতে চায় না শ্যামা। জামাইয়ের মতো জামাই—সে যা করেছে ছেলেতেও তা করতে পারে না আজকাল। স্বামীপুত্র থেকে যে আশা করে নি, সেই আশা সে সফল ক'রে দিয়েছে, নিজের বাড়ি ক'রে দিয়েছে।

আবারও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শ্যামা। উমা হেঁট হয়ে খিচুড়ি নাড়ছে। মুখটাও ভাল ক'রে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না তার। রাগ করছে বটে—কিন্তু এত তফাত কখনও হতে পারে না। অন্তত আরও পঁচিশ-তিরিশ টাকা কি ওর ন্যায্য প্রাপ্য নয়? নিজেকে রীতিমত বঞ্চিত বোধ করে শ্যামা। যে হিসেবে দাম পেয়ে এসেছে এতকাল, সেই হিসেবেই সে দাম ধরেছে মনে মনে—তবে এত তফাত কেন হবে?

নিজের মনকে শাসন করতে চায় শ্যামা, উমা ঠকাচ্ছে তাকে—এমন সন্দেহ যেন সে না করে, ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। হয়তো ভুল ক'রে নিজে দু-চার আনা খরচ ক'রে ফেলেছে মধ্যে মধ্যে, মনে নেই। হয়তো আঁচলে করে নিজের পয়সাও নিয়ে গিয়েছিল, ফলের দামও সেই আঁচলে বেঁধেছে, ফিরে এসে একসঙ্গেই নিজের বাক্সয় রেখে দিয়েছে, এমনও হতে পারে। সেদিক দিয়ে একবারও ভাবছে না উমা, কেবলই রাগ করছে।

কিন্তু তাতেই কি এত তফাত হয়! অবশ্য শ্যামাও হয়তো বেশী বেশী ধরেছে হিসেব। তবে তার জন্যে না হয় পঁচিশটে টাকা কম হোক! তাই বলে এত?

একটা কুটিল সংশয় তার মনের মধ্যে একটু একটু ক'রে মাথা তোলেই, কিছুতে তাকে দমন করতে পারে না শ্যামা।...

খিচুড়ি নামিয়ে ঠাঁই ক'রে নিঃশব্দেই তাকে খেতে দেয় উমা। নিজেও খেতে বসে। কিন্তু দুজনের কেউ খেতে পারে না। উমা নিঃশব্দ দহনে দগ্ধ হচ্ছে— তার আহারে রুচি থাকা সম্ভব নয়; আর শ্যামার এই টাকার শোক। বহু ছেলেমেয়ে মারা গেছে তার, সে শোকের মতো না হোক, কাছাকাছিই এটা। তবু শ্যামা কোনমতে জোর ক'রে পাতের আহার্য শেষ করে, কিন্তু উমার পক্ষে তা সম্ভব হয় না। খানিকটা খেয়েই উঠে পড়ে।

তার পর তাকে দ্রুত কাজ সেরে নিতে হয়। বাসন-কোসন মেজে, উনুন নিকিয়ে, রান্নার জায়গা ধুয়ে একেবারে কাপড় কেচে আসে সে। এবার বেরোবে ছেলে পড়াতে। বেলা দেড়টা বেজে গেছে, দুটোর মধ্যে বেরিয়ে পড়বে।

শ্যামা ইঙ্গিত বুঝে উঠে পড়ে। তাকেও দিদির ওখানে যেতে হবে। উমার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে চলবে না। কথা আছে কিছু কিছু বাজার সেরে হেমের সঙ্গে বাড়ি ফিরবে। হেম পাঁচটার মধ্যে দিদির ওখানে পেঁছিবে।

কিন্তু কাপড় দুখানার কথা উমা আর উচ্চবাচ্য করছে না যে। সে দুটো

পেলেও তবু অনেকখানি হয়। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে শ্যামা বলে, 'হেমকে পাঠাব বরং রবিবার, শাড়ি দুটো তার হাতে দিয়ে দিস?'

'না, দাঁড়াও। তুমিই নিয়ে যাও। হেমকে পাঠাতে হবে না।'

'হেম তো আসবেই। তুই এবার যাবি তো, তরুর বিয়েতে?'

'যাব না যে তা তুমি ভাল ক'রেই জান ছোড়দি। মিছিমিছি হেমকে তার জন্যে পাঠাতে হবে না।'

উমা মায়ের দরুন দেরাজটা খুলে শাড়ি দুখানা বার করে। তার পর মায়েরই ক্যাশবাক্সটা খুলে হাতড়ে হাতড়ে কতকগুলো টাকাপয়সা বার করে। সেগুলো একটা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে শ্যামার সামনে ধরে দিয়ে বলে, 'এগুলো নিয়ে গিয়ে বাড়িতে গুনে দেখো কত আছে। আর কত দিতে হবে চিঠি লিখে জানিও—আমি মাসে মাসে যেমন ক'রে পারি না খেয়েও শোধ দেব। তবে আমার তো ন'শো পঞ্চাশ টাকা আয় নয়—খেয়ে-পরে সামান্যই বাঁচে, তার মধ্যে খাওয়াটা কমাতে পারি, তাই বাঁচিয়েই দেব।'

শ্যামা ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'আমি কি তাই বলিছি? তুই বা দিবি কেন, আর আমার হিসেবই যে বেদবাক্যি তাই বা কে বলেছে! আমি একটা আন্দাজ ক'রে রেখেছিলুম এই পর্যন্ত। আমারও তো ভুল হতে পারে।'

উমা ক্লান্ত কণ্ঠে বলে, 'ভুল দুজনেরই হতে পারে। সব চেয়ে বড় ভুল হয়েছে আমার এ কাজ ঘাড় পেতে নেওয়া, আর তোমার ভুল হয়েছে বিশ্বাস ক'রে টাকাগুলো আমার কাছে ফেলে রাখা। নাও, এখন ওঠ দিকি—আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

শ্যামা একবার ওর মুখের পানে চেয়ে শুধু শাড়ি দুখানা হাতে ক'রে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। উমা আঙুল দিয়ে টাকাটা দেখিয়ে বললে, 'ওটাও নিয়ে যাও ছোড়দি—নইলে আপসোসের সীমা থাকবে না। চক্ষুলজ্জায় টাকাটা খুইও না। তা ছাড়া বিয়েটা তো দেওয়া চাই। টাকা যখন হিসেবে কমই পড়ল, তখন ওটা দিয়ে ভোক্তন ক'রে নাও। টাকা-কুড়ির মতো হবে বোধ হয়।'

শ্যামা রাগ ক'রে বলে, 'তোর দিন দিন বড় চ্যাটাং চ্যাটাং বাক্যি হচ্ছে উমা। আমি কি বললুম আর তুই কি বুঝলি। ও টাকায় আমার দরকার নেই। মেয়ের বে আমার অদৃষ্টে থাকে তো হবেই। তোর যদি দেবার মন থাকত তো এমনিই দিতে পারতিস—এভাবে আমি নিতে পারব না।'

'সে তোমার ইচ্ছে! কিন্তু নিলেই ভাল করতে। মনে মনে চিরদিনই আমাকে চোর ধরে রাখবে। তখন এটা না নেওয়ার জন্য হাত কামড়াবে শুধু শুধু।'

সে টাকাটা তুলে রাখে আবার। শ্যামা সেদিকে চেয়ে আর একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বেরিয়ে পড়ে।

টাকাটা পেলে একশো টাকা পুরো হ'ত এটা ঠিকই। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রেই এ টাকার লোভ সংবরণ করলে সে। যদি এর পর সত্যিই আর কিছু না বেচে উমা!

তা হলে একেবারে দাঁড়িয়ে লোকসান। হেম যা ছেলে, সে কিছুতেই বাজারে গিয়ে ওসব বেচতে পারবে না। আর বেচলেই কি এত দাম উঠবে? ওর অর্ধেকও হবে না।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

তরুর বিয়ে উপলক্ষে অনেকগুলো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। আর সেজন্যে তরুর ভবিষ্যৎ ভেবে শ্যামা বেশ একটু কণ্টকিত হয়েই রইল। মহাশ্বেতা যখন ওর কোলে এসেছে তখন সব চেয়ে দুর্দিন, তবু তার বিয়েই সব চেয়ে নির্বিঘ্নে এবং এখন দেখা যাচ্ছে সব চেয়ে ভাল হয়েছে। ঐন্দ্রিলারও বিয়ের সময় অন্তত কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় নি। ওর বরাত—নইলে ঘর বর সবই ভাল পেয়েছিল; কিন্তু তরুর বিয়েটা যেন কি রকম হয়ে গেল।

প্রথমত উমার সঙ্গে কাটান-ছিড়েন হয়ে যাওয়া।

সেদিন যখন নগদ কুড়ি-পঁচিশ টাকার মায়া কাটিয়ে চলে এসেছিল শ্যামা, তখন ভবিষ্যতের কথাটাই বেশী ক'রে ভেবেছিল। উমা যে এমন কাণ্ডটা করবে তা সে একবারও ভাবে নি। এমন কি দু-তিন দিন পরে যখন কুড়ি টাকার একটা মণি-অর্ডার এল ওর নামে—তখনও ঠিক এতটা বুঝতে পারে নি। কুপনে লেখা ছিল —'তরুর আইবুড়ো-ভাতের জন্য যৎসামান্য পাঠালাম।' তাতেও ভেবেছিল যে, উমা একটু নরমই হয়েছে পরে—নইলে টাকাটা এভাবে পাঠাত না। তা ছাড়া আইবুড়ো-ভাত তো তার দেওয়া উচিতই—না হয় কিছু বেশী দিয়েছে, সাহায্য হিসেবে।

তবু অস্বস্তি একটা ছিলই। তাই বিয়ের একদিন আগে হেম যখন বাজার করতে কলকাতায় গেল তখন তার হাতে জোর ক'রেই কয়েকটা নারকোল পাঠিয়ে দিলে সে। বাজারের জন্যে বস্তা ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছিল হেম—তার মধ্যে এগুলো নিয়ে যাওয়া খুবই অসুবিধা, আপত্তিও সে যথেষ্ট করেছিল—কিন্তু শ্যামা একরকম অনুনয় বিনয় ক'রেই গছিয়ে দিলে। বললে, 'আমি বিয়ের কথা হচ্ছে বলে এসেছি, ঠিক নেমন্তন্ন সেদিন ক'রে আসতে পারি নি। একবার সেভাবে বলাও তো দরকার। দিদি যদি না-ও আসে, গোবিন্দ বৌমা যেন আগের দিন থেকে এসে থাকে, জোর দিয়ে বলে আসবি। আর উমা অবিশ্যি আসবে না, কিন্তু তবু আমাদের কর্তব্য আসতে বলা। যাচ্ছিসই যখন, সেই ঝাড়নও নিয়ে যেতে হবে—এ-কটা বয়ে নিয়ে যেতে অসুবিধা কি? ওখানে ঢেলে দিয়ে চলে আসবি, বয়ে তো বেড়াতে হবে না!'

কিন্তু হেম রাত্রে ফিরল মুখ কালি ক'রে। মাকে প্রায় যাচ্ছেতাই করলে সে, 'তুমি এই কাণ্ড ক'রে বসে আছ! মাসী তোমার পয়সা চুরি করে! আর সেই কথা বলে এসে তিন দিন পরেই আবার তার কাছে মাল পাঠিয়েছ! কী রকম বেহায়া মেয়েমানুষ তুমি! ছি ছি! আমাকে ঘুণাক্ষরেও তো বল নি এ কথা—

তা হলে কি এ দুর্মতি করতুম। একেবারে অপদস্থের শেষ! তা-ও এটুকু বুদ্ধি হ'ল না যে ব্যাপারটা একটু জুড়ুতে দাও!...তা না সাত দিনের মাথাতেই আবার সেইখানে মাল পাঠাতে গেলে! তোমার ভীমরতি হয়েছে—বেশ বুঝতে পারছি।'

না, উমা নারকোল রাখে নি। পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে এ ভূতের ব্যাগার তার দ্বারা হবে না। বোন-বোনপো খেতে পাচ্ছিল না বলেই সে এতটা নীচু হয়ে ফিরিউলীর কাজ করেছে। আর তো এখন দরকার নেই। আর কেন? তা ছাড়া ভাল ঘোড়ার এক চাবুক, তার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে—আর নয়। পাঁ্যাজ-পয়জার-গুণগার—এর মধ্যে আর সে নেই। হেম যদি এমনি যায় তো স্বচ্ছন্দে যেতে পারে—তাদের ভালবাসে উমা, কল্যাণই চায়—কিন্তু এসব কেনা-বেচার ব্যাপারে যেন আর না যায়, তা হলে ওর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এটা যেন মনে রাখে।

অগত্যা হেম সেই আট-আটটা নারকোল কমলাদের বাড়ি ঢেলে দিয়ে এসেছে। ওদের খেতে দিয়ে এসেছে। কী করবে, এত মালের মধ্যে ঐ বোঝা টেনে বেড়াবে কে!...বেশী লাভের আশা তো গেলই—আসলেও টান। এখানে শ-দরে বেচলে তবু যে কটা পয়সা হ'ত—তাও গেল। বোন-বোনপো থাক—তার জন্যে কিছু নয়, সে তো মধ্যে মধ্যে সে দেয়ও এক-আধটা—কিন্তু তারই বা এত খয়রাত করতে গেলে চলে কি ক'রে, ঐ কটা নারকোল গাছই তো ভরসা! নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেরই গালে মুখ চড়াতে ইচ্ছে করে শ্যামার—বেছে বেছে আজকের দিনই বা এত তাড়াতাড়ি করতে গেল কেন! ঘি-ময়দা-পাঁপর, একগাদা কাঁচা বাজার তার মধ্যে নারকোলগুলো বয়ে ফিরিয়ে আনা সত্যিই সম্ভব নয়। তাও হাঁদারাম ছেলে যদি 'এখন রইল পরে নিয়ে যাব' বলেও রেখে আসত। কী সমাচার—না, লজ্জা করে! এত লজ্জা কি তোদের মানায়, যারা মোটা টাকা রোজগার করে তারা লজ্জার কথা তুললে তবু সাজে!

এদিকে তো এই—ওদিকে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেলে সরকারদের সঙ্গে। 'মাথার ওপর অভিভাবকের মতো দাঁড়িয়ে থেকে উদ্ধার করিয়ে দেবেন'—এ কথা শ্যামাই বলে এসেছিল অক্ষয়বাবুকে। আর সত্যিই তার কে আছে, এক বড় জামাই, তা সে ওসব আদর-আপ্যায়ন-তত্ত্বাবধানের ধার ধারে না, নিজে ভূতের মতো খাটতে পারে শুধু। তা ছাড়া সে তো ভিয়েনের কাছেই জোড়া থাকবে—বলেই দিয়েছে যে, 'একজন শুধু বামুন ব্যবস্থা করো, যোগাড়ে দরকার নেই, আমিই যোগাড় দেব।' বড় জামাইয়ের বাড়ি, মেজ জামাই-বাড়িও বলতে হয়েছে—সদ্য সদ্য শিবু চাকরিটা ক'রে দিয়েছে,—সরকার-বাড়ি, তা ছাড়া বাড়ির ঠিক আশে পাশে যারা আছে - বাড়ি-পিছু একজন ক'রে বলতে বলতেই পঞ্চাশ-ষাটজন হয়ে গেছে। তা ছাড়া বরযাত্রীও আসবে কুড়ি-পঁচিশজন মোট—অর্থাৎ প্রায় একশোর ধাক্কা। হালুইকর বামুন তাই এবার একটা ঠিক করতে হয়েছে। তার সঙ্গে যোগাড় দেওয়া সহজ কাজ নয়, বড় জামাইকে অন্য কোন দিকে পাওয়া যাবে না।

সুতরাং সরকারদের ওপরই ভরসা।

তা অক্ষয়বাবু এসেও ছিলেন, তদ্বির-তারক করছিলেন যেমন করতে হয় তেমনিই। গোলমাল বাধল বরযাত্রী আসতে। বরের এক পিসেমশাই এসেছিলেন—গাঁজাখোরের মতো চেহারা, তেমনিই গলার আওয়াজ···পরে শুনেছে শ্যামা যে লোকটা অতি হতভাগা, এদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কও নেই, নিহাত মাথার ওপর একজনকে দাঁড়াতে হয় তাই আসতে বলেছিল বুড়ী দিদিশাশুড়ী,—তিনি এসেই তম্বি শুরু ক'রে দিলেন, 'এই দান—? দানের বাসন তো মশাই আপনাদের মেয়েই ভোগ করবে—তা ঐ ফুঁয়ে-উড়ে-যাওয়া বাসন কখানা না দিলেই পারতেন। ও আর কদিন! ও কি, বরের জুতো দেন নি ?···গরদের পাঞ্জাবি দিয়েছেন তো ? আংটি কৈ ? সেটা একটু ভারী-ভুরি দিয়েছেন, না কি সেও অমনি ফঙ্গবেনে ? বন্ধু-বান্ধবের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না তা হলে আমাদের হারান। ঘড়ি, ঘড়ি কৈ ? ঘড়ির চেহারা তো দেখছি না। ও হরি, আপনারা তা হলে ডোমের চুপড়ি ধুয়ে তোলাতে চান দেখছি···যা ছিরির ব্যবস্থা, মেয়েটাকেও শেষ অবধি ন্যাড়াবুঁচো বার করবেন নাকি ? কী ব্যাপার কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ও মশাই কন্যেকর্তা কে আছেন—একবার আসুন তো দিকি এধারে, গয়না-গাঁটি মেয়েকে কী কী দিলেন বলুন তো !'

হেম চটে আগুন হয়ে উঠেছিল, শ্যামা অতিকষ্টে তাকে সরিয়ে দিলে। তারও বুক দুর-দুর করেছিল—এ আবার কি কথাবার্তা ! না জানি কি অঘটন ঘটে !

এগিয়ে গেলেন অক্ষয়বাবু, বললেন, 'আপনি কে তা তো জানি না—বরের অভিভাবিকা যিনি এসেছিলেন দয়া ক'রে, যাঁর সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হয়েছে—তিনি জানেন আমরা কিছুই দিতে পারব না। তিনি বার বার বলেও গেছেন কিছু চাই না তাঁর। এদের বলতে গেলে ভিক্ষে-দুঃখু ক'রে যে দেওয়া—কোথায় কি পাবে বলুন। যা দিয়েছে তাতেই খুশী হয়ে আপনারা দয়া ক'রে মেয়েটি উদ্ধার করুন !'

পিসেমশাইয়ের চোখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল—হয়তো আগে থাকতেই ছিল একটু, তিনি বললেন, 'ও, আমি কে তা জানেন না ? তা মশায় কে তা জানতে পারি কি ? মশায়ের সঙ্গে এদের সম্বন্ধটা ?'

একটু অপ্রস্তুত হলেন বৈকি অক্ষয়বাবু। একটু ঢোঁক গিলতে হ'ল। বললেন, 'আমার নাম শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র দে সরকার। এঁরা—'

'এঁরা আমাদের পুরোহিত'—এই বলতেই যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু তার আগেই বাড়ি-ফাটানো হাসি হেসে উঠলেন পিসেমশাই। 'বামুনের মেয়ের কায়েত অভিভাবক। বামুনের ঘরে কায়েত কন্যেকর্তা !···ওহে জগমোহন, ব্যাপারটা তো ঘোরালো দেখছি। এখনও ভেবে দ্যাখ, এখানে দেবে কি না !···শাশুড়ী ঠাকরুন খোঁজখবর করেছিলেন তো ভাল করে ?···এই তো—কথায় বলে স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, মেয়ে-কর্তা কোন ব্যাপারেই ভাল না। এসব কি ওদের কাজ ! দশহাত কাপড়ে কাছা দিতে পারে না ওরা। কী করতে কী ক'রে বসে রইল দ্যাখ দিকি !'

এর পরে অক্ষয়বাবুর মেজাজ ঠিক রাখা শক্ত। তিনি বললেন, 'কী বলছেন মশাই যা তা। একটু বুঝে-সুঝে বলুন। ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে এসব কী কথা।'

কী, কী বললেন।... ভদ্রলোকের বাড়ি! তা যার বাড়ি—যাদের বাড়ি তারা কে? আমি বরের পিসেমশাই, ইনি জগমোহন ওর মামা—আপনি কনের কে বলুন আগে তবে এর পর কথার জবাব দেব। কথা হয় সমানে সমানে—কায়েতের সঙ্গে বামুন এ সব বে'র ব্যাপারে কথা কইবে কি?'

জগমোহন—বরের মামা বটে, কিন্তু বরেরই প্রায় সমবয়সী—সে হাঁ হাঁ ক'রে উঠল। ও পক্ষে আরও দু-চারজন তিরস্কার করলেন, বর নিজেও যেন ধমক দিল একবার। এ পক্ষে বড়জামাই এসে হাতজোড় ক'রে দাঁড়াল (হেমকে ইচ্ছে ক'রেই সামনে আসতে দিলে না শ্যামা)—পিসেমশাই শান্ত হয়ে এলেন। বোধ করি নেশাতেও আচ্ছন্ন হয়ে এসেছিলেন, তিনি তার পর থেকে সমস্ত সময়টাই ঝিমিয়ে রইলেন, কনে যখন সভায় এল তখন তার গায়ে কী গয়না আছে না আছে ফিরেও দেখলেন না। তা ছাড়া জামাইয়ের ওপর বুড়ীর যে কী পর্যন্ত ভরসা—তা বোঝা গেল যখন সম্প্রদানের পর জগমোহন বুড়ীর পাঠানো চুড়ি আর হার বার ক'রে কনেকে পরিয়ে দিতে বললে। ও'দেরই মুখ-দেখানি গহনা এগুলো, শুধু-গায়ে বৌ এসে নামবে, সেই লজ্জা থেকে বাঁচবার জন্য আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বোঝা গেল নিজের জামাই বরকর্তা থাকতে ছেলেব শালার ওপর তাঁর বিশ্বাস বেশী।

কিন্তু শান্ত হলেন না অক্ষয়বাবু। তিনি সম্প্রদান পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ঠিকই—তবে জলস্পর্শ করলেন না। ছেলেমেয়েদেরও খেতে দিচ্ছিলেন না—নিহাত শ্যামা এসে ঢিপঢিপ ক'রে মাথা খুঁড়তে ওদের খেতে বললেন। নিজে শুধু এক গ্লাস জল খেয়ে বাড়ি চলে গেলেন। অথচ এদের কি দোষ তাও বোঝা গেল না। গাঁজাখোরই হোক আর নেশাখোরই হোক—একে বরযাত্রী তায় বরের পিসেমশাই, কুটুমের কুটুম—তাকে গলাধাক্কা দেওয়া যায় না। বিয়ের রাত্রে বরযাত্রীর বহু দাপট সহ্য করতে হয়, সেটা অক্ষয়বাবুব জানা উচিত। শ্যামা অনেক বোঝালেও, কিন্তু তিনি অবুঝের মতো বাগ ক'রেই রইলেন। আশ্রয়দাতা উপকারী বন্ধু, এককালের মনিব বলতে গেলে—তিনি অভুক্ত চলে গেলেন বিয়েবাড়ি থেকে, মনটা খচখচ করতে লাগল শ্যামার। এদের অকল্যাণ বাঁচাবার জন্যেই এক গ্লাস জল খেয়ে গেলেন বটে, কিন্তু তাতে কোন সান্তনা পেলে না শ্যামা।

॥ ২ ॥

তবে যতই যা হোক—এ বিয়ে উপলক্ষে কিন্তু সব চেয়ে অশান্তি বাধালে ঐন্দ্রিলা। সেদিন উমার বাড়ি থেকে ফিরেই, শ্যামা দক্ষযজ্ঞের মধ্যে পড়ল বলতে গেলে। একে উমার সঙ্গে ঐ বিরোধ উপলক্ষে মনটা যৎপরোনাস্তি খারাপ হয়ে ছিল, তার ওপর দিদির কাছে গিয়েও খানিকটা আশাভঙ্গ হয়েছে। ইদানীং ঝি রাখতে হয়েছে, বৌমা পোয়াতি, তাকে এটা-ওটা খাওয়াতে হচ্ছে—আরও নানা কারণে সংসারের খরচ বেড়ে গেছে—অথচ গোবিন্দব অফিসের অবস্থাও নাকি টলোমলো,

এক মাসের মাইনে তিন মাস ধরে আদায় হচ্ছে—ইত্যাদি টানাটানির নানা অজুহাত দেখিয়ে দিদি দিয়েছিল মাত্র দশটি টাকা। এবার গোবিন্দ চাকরি-বাকরি করছে, আরও অনেক বেশী পাবার আশা ছিল শ্যামার, সে জায়গায় আগের আগের বারের চেয়ে কমেই গেল টাকাটা। সেখানেও একটা বহু দিনের চাপা অসন্তোষ মাথা তুলেছে—ওর এখনও ধারণা থিয়েটারে কাজ করার সময় হেম মোটা মোটা টাকা দিয়েছে বড়মাসীকে। সেদিক দিয়ে একটু কৃতজ্ঞতাও থাকা উচিত ছিল না দিদির? 'তা তো নয়—তখন খুব হাত বাড়িয়ে ফেলেছেন, এখন আর তাল সামলাতে পারছেন না ঠাকরুন! মোটা আয় একটা বন্ধ হয়ে গেছে তো!' মনে মনে যতটা ঝাঁজের সঙ্গে বলা সম্ভব ততটাই বলে সে।

একে তো এমনি নানা কারণে তিক্ত হয়ে ফিরছে, তার ওপর স্যাকরাদের বাঁশঝাড়টা ছাড়াতেই কানে এল এক বিকট চিৎকার। নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে সে চিৎকার ভয়াবহ শোনাচ্ছে—মনে হ'ল যেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।

শোনা মাত্র দারুণ বিতৃষ্ণায় মনে ভরে গিয়েছিল ঠিকই—তবু তার মধ্যেও কোথায় যেন একটা ক্ষীণ আশাও উঁকি মেরেছিল একবার। নরেন নিশ্চয়। সে-ই এসে তার অভ্যস্ত চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিয়েছে, বেধেছে বাপেতে আর বেটীতে। বহুকাল আসে নি সে, কিছুদিন ধরে সমস্ত কাজ কর্মের মধ্যে বার বারই মনে হয় তার কথা। কে জানে কোথায় আছে, কী ভাবে আছে! কোথাও হয়তো রোগে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে, মুখে জল দেবার কেউ নেই—কিংবা মুখ থুবড়ে পড়ে কোথাও মরেই গেছে হয়তো, ওরা কেউ জানতেও পারলে না। হয়তো ভিক্ষে ক'রেই খাচ্ছে—কে জানে! তার পক্ষে সবই সম্ভব।

সে আশার চমক লেগেছিল এক লহমা মাত্র। আরও দু কদম এগিয়ে যেতে যখন বোঝা গেল শুধুই নারীকণ্ঠের চিৎকার এবং একতরফা, তখন আর সে আশা রইল না। চুপ ক'রে মেয়ের গলাবাজি সহ্য করবার লোক নরেন নয়। এটা শুধুই একতরফা চিৎকার—ঐন্দ্রিলারই।

দারুণ বিতৃষ্ণায় মন ভরে গেল দুজনেরই। নিশীথ রাত্রের নিস্তব্ধতায় বহু দূর পর্যন্ত এ আওয়াজ পেঁছচ্ছে, আশেপাশে ভদ্রলোকের বাড়ি। তারা না জানি কি মনে করছে! লোকে বলে হাড়াই-ডোমাই, কিন্তু তারাও মদ খেলে চেঁচায় না। ভদ্রলোকের বাড়িতে রাতদুপুরে ডাকাতপড়া চেঁচানি—অলক্ষ্মীর দশা।

দুজনেই এগিয়ে গেল তাড়াতাড়ি।

দেখা গেল ব্যাপারটা আজ বহু দূর গড়িয়েছে। তরু শোবার ঘরে খিল দিয়ে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে। মেয়েটা পালিয়ে এসে অন্ধকারেই পুকুরঘাটে বসে আছে চুপ ক'রে। মা'র কাছে তার অন্ধকার বাগানের ভয়ও তুচ্ছ হয়ে গেছে আজ। আর ঐন্দ্রিলা একগাছা ঝাঁটা নিয়ে আস্ফালন করছে, মধ্যে মধ্যে বন্ধ দোরে লাথি মারছে এবং অবিরাম অকথ্য গালিগালাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

'কী হচ্ছে কি? ছোটলোকপনা! চুপ করবি—না কি?'

আরও যেন জ্বলে উঠল ঐন্দ্রিলা, এদিকে ফিরে যেন একপাক নেচে নিলে সে,

'কেন চুপ করব ? কিসের জন্যে মুখ বুজে থাকব চিরকাল তাই শুনি ! ঝিয়ের মত খাটব আর অপমান হব ! আমি আর আমার মেয়ে হয়েছি তোমাদের চক্ষুশূল—নয় ? মেয়েটাকে মেরে ফেলতে পারলে বাঁচো তোমরা, একটা পেট বেঁচে যায় । সেই ফন্দিই এঁটেছ মায়েতে ঝিয়েতে—আমি কি কিছু বুঝি না ? কেন, আমরা থাকলে ছোট মেয়েকে রাজরাণীর মতো বিয়ে দেওয়া যাবে না বুঝি—চক্ষুলজ্জায় বাধবে, না ? ঘোচাচ্ছি তোমাদের বিয়ে, দাঁড়াও না । ফন্দি-আঁটা বার করছি আজ !'

হয়তো আরও বহুক্ষণ এইভাবে চলত, কারণ ওর সে রণচণ্ডী মূর্তির সামনে শ্যামাও ভয় পেয়ে গিয়েছিল । সেযাত্রা রক্ষা করলে হেমই—তার অকস্মাৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটল । এরকম অকারণ কলহ আজকের নয়, এক দিনের ঘটনা নয়, এ প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে । সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করেছে তার । মাত্র কিছুক্ষণ আগেই কমলাদের বাড়ি থেকে ফিরেছে সে—হাসিতে, কৌতুকে, আদর-যত্নে অপরূপ নারীমূর্তি দেখে এসেছে । সে মধুর স্মৃতি যে মধুরতর স্বপ্নরসে মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল তা থেকে এই জাগরণ বড় বেশী রূঢ়, বড় বেশী দুঃসহ মনে হ'ল । সে এগিয়ে এসে একেবারে ওর চুলের মুঠি ধরে ঠাসঠাস ক'রে গোটাকতক চড় বসিয়ে দিলে, 'চুপ ! একেবারে চুপ ! নইলে শেষ ক'রে দেব একেবারে !'

সত্যিই কিন্তু এইতে কাজ হ'ল । স্তব্ধ হয়ে গেল একেবারে ঐন্দ্রিলা । জ্ঞান হবার পর থেকে তার গায়ে কেউ কোন দিন হাত তোলে নি ! মা-বাবা নয়—দাদা নয়, কেউ নয় । মানুষ হয়েছে সে মাসীর কাছে, দিদিমার কাছে । রাশভারী লোক ছিলেন দিদিমা, তাঁর চোখের দৃষ্টিই ছিল যথেষ্ট, কারুর গায়ে হাত তোলবার তাঁর কোন দিন দরকার হ'ত না । উমাও সেই স্বভাবই পেয়েছে কতকটা । সুতরাং এটা ওর একেবারে অভিজ্ঞতার বাইরে ।

সে খানিকটা হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইল দাদার মুখের দিকে । তার আয়ত চোখ দুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল—পলক ও পড়ছিল না । সেই ভাবে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ থাকবার পর আস্তে আস্তে এক পা এক পা ক'রে পিছিয়ে গিয়ে রান্নঘরের দাওয়ায় পেঁছে বসে পড়ল ।

তরুর মুখে তার পর ব্যাপারটা শোনা গেল ।

হঠাৎ বিকেল থেকে শুরু করেছে ঐন্দ্রিলা, একেবারে যাকে বলে গায়ে-গাছকেটে ঝগড়া বাধানো । তরুকে উদ্দেশ ক'রে বলতে শুরু করেছে, 'ঘোষালদের জাতি বলে ভাল বরও পছন্দ হ'ল না । তা তার বদলে কী এমন তালেবর জুটল শুনি ! ঐ তো ছিরির বর, দাদাবাবু বলেছে বিশববকাটে হয়ে গিয়েছিল—তাও সতীন সুদ্ধ—নিক্ না নিক্, সে কাঁটা বজায় আছে তো ! কেন, ঘোষালদের ঘরে পড়লে কী মহাভারত অশুদ্ধটা হ'ত—তোর মেজদাদাবাবু তো ঐ ঘরেরই ছেলে ! তার পায়ের নখের যুগ্যি বর পেলেও তরে যেতিস । তোদের বড্ড তেজ হয়েছে—বুঝেছিস ! এত তেজ ভাল নয় । আমি হাজার হোক তোর দিদি, বয়সে বড়—

আমাকে এত অপমান করা এত হেনস্থা করা ধর্মে সইবে না—ব'লে দিলুম!'

তরু অনেকক্ষণ ধরে শুনেছে চুপ ক'রে, তার পর আর থাকতে পারে নি—বলেছে, 'তা আমাকে এসব কথা বলছ কেন মেজদি, আমি কি আমার সম্বন্ধ ঠিক করেছি!'

'না—তা নয়, তবে তুইও জানিস। শলাপরামর্শ তো হচ্ছে দেখছি দিনরাত, মায়ে-ঝিয়ে গুজগুজ ফুসফুস। তবে একটা কথা মনে করিয়ে দিস—বেইমানি ভাল নয়। সেই ঘোষালরাই ছিল তাই তো ছেলে চাকরি পেয়েছে, কৈ আর তো কেউ পারে নি চোর ছেলেকে চাকরি ক'রে দিতে!'

এইবার বোধ করি তরুর অবিচলিত ধৈর্যও টলেছে, সে জবাব দিয়েছে, 'তা মেজদি, এত যদি ভাল ঘোষালরা তো তাদের ঘরের মেয়ে তারা পুষছে না কেন, চোরেদের ঘরে এনে তুলেছে কেন! এই তো শুনেছিলুম, জুচ্চুরি ক'রে তারা যথাসর্বস্ব তোমার নিয়ে নিয়েছে—আজ আবার এত ভাল হয়ে গেল!'

ব্যস, এইটুকুই যথেষ্ট। তার পরই একেবারে রণরঙ্গিণী মূর্তি ধরেছে ঐন্দ্রিলা, 'কী, কী বললি—তুই সুদ্ধু আমার মেয়েকে ভাতের খোঁটা দিবি! তোর খাচ্ছে সে, না তোর ভাতারের খাচ্ছে! এখনও তো ভাতার হয় নি, তবে কোথা থেকে থেকে রোজগার ক'রে আনছিস তাই শুনি, খবরটা একবার নিবড়ের পৌঁছে দিয়ে আসি। বড় বেশী খাচ্ছে, না? তাই আমি আর আমার মেয়ে হয়েছি তোদের চক্ষুশূল! কেন আমার মেয়েকে ভাতের খোঁটা দিবি তুই? পয়সা বাঁচলে কি তুই পাবি ভেবেছিস! বাঁচলে ভাইয়েরই থাকবে। তোকে বেশী ক'রে দেবে না—ভয় নেই। ভাইয়ের সংসারে এত টান—ওরে আমার ভাইসোহাগী রে!' ইত্যাদি ইত্যাদি—

তার পর থেকেই চলেছে। তরু একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে কিন্তু তাইতে ওর আরও রাগ। ক্রমশ সে আবিষ্কার করেছে যে তাকে আর তার মেয়েকে মেরে ফেলবারই ষড়যন্ত্র চালিয়েছে এরা। নিত্য নূতন অপমান তাকে করে শুধু সেই অপমানে ঘেন্না হয়ে গিয়ে পুকুরে উলবে বলে।

গজরাতে গজরাতে বোধ করি রক্ত আরও চড়েছে মাথায়। শেষে খ্যাংরা হাতে তেড়ে এসেছে—'মরতে যদি হয় তো তোকে মেরে মরব!' সে সময়ই ভয় পেয়ে কোলের ভাইটাকে নিয়ে ঘরে দোর দিয়েছে তরু। পাড়ার দু-চারজন এসেছিল কিন্তু ঐন্দ্রিলার ঐ সংহার-মূর্তি দেখে সকলেই আবার সরে পড়েছে। ইশারায় শুধু তরুকে বলে দিয়ে গেছে যে সে দোর না খোলে—কোন কারণেই।

সারারাত তেমনি স্তব্ধ হয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে রইল ঐন্দ্রিলা। শ্যামা ডাকলে না। রান্না হয় নি—বিকেল থেকেই এই কাণ্ড চলছে, রাঁধবে কে? তখন আর কারুর ইচ্ছেও হ'ল না। ঘরে মুড়ি ভাজা ছিল—একটা নারকোল কুরে নিয়ে তাই ক'জনে ওরা খেলে এক গাল ক'রে। মেয়েটাকে আগেই টেনে এনেছিল শ্যামা, তাকে দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠাল ঐন্দ্রিলাকে—সে কিছু খাবে কি না। ঐন্দ্রিলা জবাব দিলে না। মেয়েটাও কোনমতে একবার জিজ্ঞাসা ক'রেই

দৌড়ে পালিয়ে এল, 'আমার ভয় করছে দিদিমা, মা কেমন ক'রে চেয়ে আছে।'

ভয় শ্যামারও ছিল। ও যা মেয়ে, বাড়িতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারাও বিচিত্র নয় ওর পক্ষে। ওর মেয়েকে নিয়েই দোরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা, কিন্তু কারুরই সেরাত্রে ভাল ক'রে ঘুম হ'ল না।

তবে ভয়ানক কিছুই করলে না সে। তেমনি জেগে বসে রইল শুধু। পরের দিন ভোরে মেয়েটা ঘর থেকে বেরোতেই তার একটা হাত ধরে টানতে টানতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলল।

প্রথমটা অত বুঝতে পারে নি শ্যামা। একেবারে যখন ওদের বাগান পেরিয়ে আগড়ের কাছে এসে পড়েছে তখন ছুটে এসে একটা হাত ধরলে সে, 'কোথা চললি সাতসকালে! বাড়ি আয়, মেয়েটা খায় নি কাল থেকে—ওকেই বা টেনে নিয়ে যাচ্ছিস কেন ?'

আবারও ভীষণ মূর্তি হয়ে উঠল ঐন্দ্রিলার, 'খবরদার, আমাকে ধরবে তো বেটাদের মাথা খাবে—এই বলে দিলুম, পেয়ারের ছোট মেয়ের আমার মতো হাত-মাথা দেখবে। যদি মার খেয়ে অপমান হয়ে পড়ে থাকতে হয় তো শ্বশুরবাড়িতেই পড়ে থাকব—সে আমার ঢের বেশী সম্মানের। ভায়ের সংসারে ঝিয়ের মতো খেটে বকশিশ পাব মার—চড়চাপড় গায়ের কাপড়—সে আমার দরকার নেই। ঘোষালদের ঘেন্না কর তোমরা, তাদের বৌ মেয়ে রাখতে ঘেন্না করে—রাখতে হবে না তোমাদের—আমরা যেখানকার জিনিস সেখানেই যাচ্ছি।'

মেয়েটাকে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে আরও জোরে হাঁটতে শুরু করল সে।

॥ ৩ ॥

ঐন্দ্রিলা চলে যাওয়ার ফলে শ্যামা রীতিমত অসুবিধায় পড়ল। তরুর বিয়ের পর এক দিন মাত্র জোড়ে এসেছিল মেয়ে-জামাই, তার পর আর তরুকে ওর দিদি-শাশুড়ী পাঠাল না। বললে, 'আমার সংসার চলছে না বলেই তো ধেড়ে মেয়ে নিয়ে আসা। নাতির বে'র এত তাড়াও তো সেই জন্যে। আমি বুড়ো মানুষ বাতে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকি আদ্দেক দিন, ওকে ভাত জল দেয় কে! না, বৌ পাঠানো হবে না। আর—ঢের দিন তো বাপের বাড়ি রইল, আর কেন ?'

ফলে সংসারের যাবতীয় কাজ—দু বেলা রান্না, বাসনমাজা, ঘর উঠোন নিকানো ছড়া ঝাঁট—সবই শ্যামার ঘাড়ে এসে পড়ল। রান্না অবশ্য হাতিঘোড়া কিছু নয়—তবু দু বেলাই হাঁড়ি চাপাতে হয়। লিলুয়ায় যাওয়া, এখানে সাড়ে ছটার ট্রেন, বাড়ি থেকে ছটার সময় না বেরোলে সে ট্রেন ধরা যায় না। তার মধ্যে স্নান খাওয়া সারতে হবে। সুতরাং রাজগঞ্জের কলে চারটের ভোঁ বাজার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ছে হয়ত, উনুনে পাতা জেবলে দিয়ে তবে মুখহাত ধুতে যাওয়া। সে ভাত-তরকারি দুপুরে নিজে খাওয়া যায়—কিন্তু আবার সন্ধ্যের পর কিংবা রাত আটটা নটায় ফিরে যে খাবে তার সামনে আর ধরে দেওয়া যায় না।

ঐন্দ্রিলা থাকতেও ভোরের রান্না অবশ্য শ্যামাকেই রাঁধতে হ'ত, কারণ অত

ভোরে উঠে সে রাঁধতে পারবে না সাফ্ বলে দিয়েছিল—কিন্তু তার পর ছিল ছুটি, সারা দিন ধরে পুরুষ মানুষের কাজ—অর্থাৎ বাগান দেখা, ফল বিক্রি করা, পুকুরে ডিম ফোটানোর তদ্বির, পাতা কুড়োনো—ক'রে বেড়াত নিশ্চিন্ত হয়ে। ঐন্দ্রিলা থাকত হেঁসেল আর রান্নাঘর নিয়ে, ক্ষার কাচাও তার উপর ভার ছিল। এধারে বাসন মাজা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, বিছানা তোলা-পাড়া, ছড়া ঝাঁট—এগুলো ছিল তরুর। এখন সবগুলো ঘাড়ে এসে পড়ায় চোখে অন্ধকার দেখলে একেবারে।

ঐন্দ্রিলা যেদিন যায় সেদিনও শ্যামা এতটা বুঝতে পারে নি, ভেবেছিল সেখানে তারা আর কিছুতেই ঢুকতে দেবে না, দিলেও এক দিন কি দু দিন বড় জোর, তার পরই আবার ফিরে আসতে পথ পাবে না। কিন্তু হেম নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝে এল। হরিনাথের মা মাস-দুয়েক ধরে পক্ষাঘাতে পড়ে আছে বিছানায়, শিবুর নতুন বৌ পোয়াতি—কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই। এই সময় ঐন্দ্রিলা গিয়ে পড়াতে ওরা হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেয়েছে। শুধু পেট-ভাতায় এত খাটবে এমন লোক কোথায় পাওয়া যাবে? সুতরাং মৌখিক আপ্যায়নের ত্রুটি হয় নি, এখন নাকি সাশুড়ীও বৌমা বলতে অজ্ঞান। অর্থাৎ ঐন্দ্রিলা এখন সহজে ফিরছে না।

এর একমাত্র উপায় হচ্ছে আর একটি পরের মেয়ে নিয়ে আসা—অর্থাৎ হেমের বিয়ে দেওয়া। চাই কি—তাতে দেনাও খানিকটা হাল্কা হয়ে যেতে পারে। দেখতে ভাল, রেলে কাজ করে, নিজের বাড়িঘর আছে,—হাজার না হোক সাত-আট শো টাকা নগদ খুব পাবে। তাতে বিয়ের খরচ ক'রেও খানিকটা দেনা শোধ দেওয়া যাবে। চাই কি যদি একটু নিরেস মেয়ে নেয় তো দেড় হাজার দু হাজার পাওয়াও বিচিত্র নয়। তবে তা করবে না শ্যামা, সুন্দরের ঘর ওর, পণ খারাপ করবে না।

এক দিন রাত্রে ছেলেকে খেতে দিয়ে সেই কথাই তুলল শ্যামা, 'সামনের একটা মাস পরেই তো আবার বে'র মাস পড়বে—এইবার তা হলে খোঁজখবর করি—কী বলিস? জামাই বলেছেন ওঁদের জানাশোনা কোথায় একটি মেয়ে আছে—দেখতে ভাল, বড় বংশ—একবার দেখে আসব ভাবছি!'

'আবার কার বিয়ে?' অন্যমনস্ক ভাবে খাচ্ছিল হেম, হঠাৎ চমকে উঠল, 'আবার কী বিয়ে!'

'ওমা, তোর বিয়ে দিতে হবে না?'

'রক্ষে করো মা। এই রোজগারে বিয়ে! আগে দুটো দিন খেয়ে পরে বাঁচি।'

'রোজগার নিয়ে তোর কি হবে? সংসার কি তুই চালাস? তা ছাড়া এই তো আড়াইখানা পেট কমে গেল, তার জায়গায় একটা. পেট চালাতে পারব না? আর এমন কি নবাব-নন্দিনী আনব যে তার জন্যে নিত্যি কালিয়া পোলাও চাই, লালবাগানের শাড়ি ছাড়া তাঁকে পরতে দেওয়া যাবে না! আমরা যা খাচ্ছি সুষুনি শাকের ঝোল ডুমুর ছেঁচকি, সে-ও তাই খাবে।'

'না না—ওসব এখন থাক।' অত্যন্ত বিরস কণ্ঠে বলে হেম, 'চিরদিন দুঃখের পেছনে দাঁড় দিয়ে কাটল, টানাটানি আর টানাটানি—দুটো দিন হাঁফ ছাড়তে দাও। মেয়েরা তো পার হয়েছে, ছেলেকে নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন!'

'ওমা মাথাব্যথা কি সাধ ক'রে হয়, বয়স কত হ'ল বল দিকি। ঐ যে এক জন দোজপক্ষে করলে তা-ও তো তোর চেয়ে ঢের কম বয়সে।'

'তা কি হবে! আজকাল অমন অনেকে করছে। তেজবরেও তো করে ঢের লোক। একটু সামলে নাও দিকি, দেনাটা একটু কমুক। বৌ মানে তো একটা পেট নয়—এর পর যখন বাচ্ছা কাড়তে শুরু করবে তখন! কান্তিটা সামান্য একটু লেখাপড়ার জন্যে কোথায় পড়ে আছে! এই কি বিয়ে করার সময়?

তা বটে। চুপ ক'রে যায় শ্যামা।

কান্তি অবশ্য খুব খারাপ নেই। তরুর বিয়েতে এসেছিল। ঢ্যাঙা হয়েছে অনেকটা—তবু খুব রোগা হয় নি। বেশ দেখতে হয়েছে। জামা-কাপড়ও দিব্যি, হেম সেরকম জিনিস কখনও চোখে দেখে নি। গত বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠে প্রাইজ পেয়েছে। সব দিক দিয়েই ভাল। কুস্থান বটে—তা এমন কী আর, কুটুমের বাড়ি তো বটে।

খানিকটা পরে বলে, 'আমি যে আর এধারে পারছি না। একা একা।'

'বৌ এসেই কি একেবারে চার চালের ভার নেবে মাথায়! এখন দু'দিন থাক—এত বিরক্ত ক'রো না।'

হেম তাড়াতাড়ি আঁচিয়ে নিয়ে বাইরের চালা-ঘরটার বারান্দায় এসে বসে। তাই কি একটু শান্তিতে বসবার জো আছে, এমন দক্ষিণ-খোলা বারান্দা—তা গামড়া ছোবড়া আর নারকোল পাতায় বোঝাই হয়ে আছে। ওরই মধ্যে জায়গা ক'রে নিয়ে বসে বটে কিন্তু কেমন ভয়-ভয়ও করে। সাপ বিছে থাকা বিচিত্র নয় তো।

বেশী রাত হয় নি—আটটা হবে বড় জোর। কিন্তু এরই মধ্যে পাড়া-ঘর নিষুতি হয়ে এসেছে। মল্লিকদের কোন কোন ঘরে আলো জ্বলছে—বাগানের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে। স্যাকরাদের বাড়ির দিক থেকে অস্পষ্ট একটা কথা বলার শব্দও কানে আসছে। আর কোন চিহ্ন কোথাও নেই জনবসতির। বিপুল এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সব যেন লেপে মুছে এক হয়ে গেছে। এমন কি ওদের সামনের পুকুরটাও দেখা যাচ্ছে না আর ভাল ক'রে। মধ্যে মধ্যে কাতলা মাছগুলো ঘাই না মারলে পুকুরের অস্তিত্বই টের পাওয়া যেত না।

তবে হ্যাঁ—মানুষের আলো নেই কিন্তু প্রকৃতির আলো আছে। জোনাকি আছে। হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ জোনাকি। দপদপ ক'রে নিভছে আর জ্বলছে। ওর সামনে পুকুরপাড়ের যেখানটা আমড়া গাছে চালতা গাছে আর আম গাছে জড়াজড়ি, তার ওপাশে নতুন বাঁশঝাড়টা উঠেছে—সেখানের সেই জমাট অন্ধকারে যেন জীবন্ত নীহারিকার মত তাল পাকিয়ে ঘুরছে সংখ্যাহীন জোনাকির দল। তাদের সেই লক্ষ লক্ষ অগ্নিকণার ঘুরপাক খাওয়া দেখতে

দেখতে কেমন যেন ভয়-ভয় করে হেমের। মনে হয় মানুষ সংখ্যায় কত কম—এইসব পতঙ্গের তুলনায়। যদি তেমন কোন দিন আসে, ওরা আর সামান্য একটু শক্তি সঞ্চয় করে—তা হলে মানুষের কী দুর্গতিই না হবে।

এদিকে জোনাকি, ওদিকে ঝিঁঝিঁ পোকা। তার সঙ্গে গাং-ফড়িংগুলোর একঘেয়ে ডানা নাড়ার শব্দ। ঠিক ওর পিছনেই একটা ফড়িং—বোধ করি দেওয়াল আর ঢিপি-করা গামড়ার মধ্যে আটকে গেছে। মনে হচ্ছে পাশে বসে কে বাতাস খাচ্ছে পাখা নেড়ে। জানে ফড়িং—তবু যেন গা ছমছম করে কেমন। মানুষের আশেপাশে কত অসংখ্য প্রাণী রয়েছে কত রকমের, তারা নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে—মানুষের দিকে। মানুষ লক্ষ্য করে না, অবজ্ঞা করে—কিন্তু তারা লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছে ঠিকই। হয়তো হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, অপেক্ষা করছে সুযোগের—যেদিন সময় পাবে সেইদিনই মানুষের এতকালের অকারণ হিংসার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। আর করেও তো—মাতাল রমা লাহিড়ীর বৌয়ের থেকেই বুঝেছে সে। বড় মাসীমার বাড়ির কখানা বাড়ি পরেই তারা থাকত—রমা লাহিড়ী চাবি দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, রুগ্না স্ত্রী—কে আবার উঠে দোর দেয় খোলে—এই জন্যে। তার পর পাল্লায় পড়ে দুদিন মদ খেয়েছে বসে বসে কোন্ আড্ডায়, যখন খেয়াল হয়েছে এসে দেখেছে—জ্যান্ত মেয়ে-ছেলেটাকে পিঁপড়েতে খাচ্ছে। খুব অসুস্থ, উঠে কোথাও যেতে পারে নি, রাজ্যের পিঁপড়ে এসে ছেঁকে ধরেছে। রমা লাহিড়ী যখন এসেছে তখনও প্রাণটা আছে, ধুক ধুক করছে—কিন্তু তখনই তার চোখ কুরে খেয়ে ফেলেছে পিঁপড়েতে।···

শ্যামার নিজের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। 'ল্যাম্পো' নিয়ে ঘাটে এসেছে বাসন মাজতে। বাসন মাজা শেষ হলে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চাল এনে ধুয়ে রাখবে। হাঁড়িতে জল চাল ঠিক করাই থাকে, উনুনে পাতা সাজানো—ভোরে উঠে আগে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে দিয়ে তবে ঘাটে বেরোবে, প্রাকৃতিক কাজের জন্য। মোটা চালের ভাত—সেদ্ধ হতে ঠিক একটি ঘণ্টা সময় লাগে। ভাত আর একটা কিছু ভাতে নেমে গেলে—যা হোক একটা তরকারি কি ডাল চাপিয়ে দেয়। পৌনে ছটায় খেতে বসবে হেম—তার মধ্যে অন্তত ভাতগুলো ঠেলবার মতো উপকরণও একটু কিছু তৈরী করা চাই!

কষ্ট খুবই। রাত চারটেয় ওঠে—রাত নটার আগে কাজ চোকে না। কিন্তু এখন তাও ছুটি মেলে না। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে এই 'ল্যাম্পো'র ক্ষীণ আলোতেই নারকোল পাতা চাঁচবে। এক আনা সের ঝাঁটার কাঠি বিক্রি হয়—পয়সা রোজগারের ব্যবস্থা বন্ধ রাখলে তো চলবে না।

তাই বলে বিয়ে!

নিস্তব্ধ অন্ধকারে বসে বসে নিজের মনের মধ্যেটা দেখবার চেষ্টা করে। না, বিয়ের কথা ভাবতে ভাল লাগছে না আদৌ। নলিনীর স্মৃতি এখনও বড় স্পষ্ট, বড় উজ্জ্বল। ভালবেসেছিল কিনা তা এখনও বলতে পারে না—ভালবাসা কাকে বলে ঠিক জানেও না সে—তবে আজও সেই স্মৃতি মনে হলে মনটা উজ্জ্বল হয়ে

ওঠে, মনের মধ্যে দেহের মধ্যে কেমন করতে থাকে, হাতপাগুলোর একটা কাঁপন অনুভব করে। এক-এক সময় ইচ্ছে করে ছুটে যেতে—সমস্ত বিপদ তুচ্ছ ক'রে সমস্ত বাধা লঙ্ঘন ক'রে। এখনও বোঝায় মনকে, এখন তো আর সে রমণীবাবুর কর্মচারী নয়—এখন আর ভয়টা কি!

আবার মনে পড়ে যায় শেষের দিনের স্মৃতিটা, তাকে পরিহার ক'রে পালিয়ে যাওয়ার কথা—সঙ্গে উদ্বেলিত আবেগ শান্ত হয়ে আসে আপনা-আপনিই। ছিঃ! সে কি ভিখিরী, না এতই হেয়? না, দরকার নেই। ভালবাসা হয় সমানে সমানে, ভিক্ষা ক'রে চুরি ক'রে হয় না। তার যদি পয়সার জোর থাকত তা হলে কি আর সে এমন অবহেলা করতে—অবহেলারও বেশী, এড়িয়ে চলতে পারত! তা ছাড়া এ পথের এই দস্তুর। পয়সা দিয়ে কিনতে হয় যে জিনিস—বিনা পয়সায় তা চাওয়াই অন্যায়।

না, ওপথে আর যাবে না। তার চেয়ে তার যেমন অবস্থা সেই মতো থাকবে। বিয়েই করবে। বৌ অন্তত তাকে অবজ্ঞা করতে এড়িয়ে যেতে সাহস করবে না, তার ভালবাসায় খাদ থাকবে না। স্বামী-স্ত্রীর ভাগ্য একসঙ্গে জোড়া।

তবু ঠিক এখনই সে কথা যেন ভাবা যাচ্ছে না।

তার বৌ—তাকে যে মেয়ে দেবে—সে মেয়ে কেমন আর হবে। এই পাড়া-গাঁয়েরই কালো-কোলো একটা মেয়ে, যে না বুঝবে দুটো রসিকতা না বুঝবে তার সুখ-দুঃখ। যে শুধুই খাটবে খুটবে, খাবে এবং সেবা করবে।

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে যায় রাণী বৌদির কথা।

যত দেখছে অবাক হয়ে যাচ্ছে। কী প্রাণ-প্রাচুর্য! চোখেমুখে কী প্রখর বুদ্ধির আভা! অথচ মনটা কি মিষ্টি। চোখের চাহনিতে মানুষের প্রয়োজন বুঝে নেয়, আর সে প্রয়োজন মেটানোতেই যেন তার সব চেয়ে আনন্দ। যতক্ষণ হেম থাকে ওদের বাড়িতে, যেন কী এক মধুর স্বপ্নে সময় কেটে যায় ওর হাসিতে ঠাট্টাতে গল্পে মাতিয়ে রাখে সমস্তক্ষণ। তার কৌতুক প্রতি মুহূর্তে বিচ্ছুরিত হতে থাকে চারিদিকে, হাসিতে যেন সৌন্দর্যের তরঙ্গ ওঠে। এত কথাও জানে। মনে হয় দিনরাত বসে বসে শুধু ওর কথা শোনা যায়—অনন্তকালেও যেন শ্রান্তি আসবে না।

সকলের কী আর জোটে অমন বৌ! ও মেয়ে দুর্লভ। দাদার ভাগ্যটাই ভাল। সে বৌ ও ভাল ছিল, অবহেলায় কোন দিন সেদিকে তাকাল না দাদা—আর এ তো অমূল্য রত্ন—কিন্তু তাই কি এর দামও পুরোটা বোঝে!…

শরতের অসহ্য গুমোট—তবু তার মধ্যেই সারাদিনের পর ভাত পেটে পড়ায় চোখ দুটো তন্দ্রায় ভারী হয়ে আসে। কেমন যেন ঘুমে জাগরণে চিন্তায় কল্পনায় স্বপ্নে একাকার হয়ে যায় মনের মধ্যে।…

মা'র বাসন মাজা শেষ হয়ে গেছে। ধুয়ে ধুয়ে তুলছে তালের গুঁড়ির পৈঠেতে। ধোওয়ার সময় জলে নাড়া পেয়ে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে পুকুরে। তাতে ল্যাম্পোর আলোটা পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট ভাঙা ভাঙা অসংখ্য আলোর

চেষ্ট। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় হেমের মনে হ'ল আসলে রাণী-বৌদিরই হাসি গুলো, আলোর তরঙ্গ তুলে শতখণ্ডে ভেঙে ভেঙে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে।

না, এখন তার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়।

বিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

অঘ্রাণের গোড়াতেই কোথা থেকে নরেন এসে পড়ল। স্বামীকে দেখে এত আনন্দ বোধ হয় শ্যামার কখনও হয় নি। একা একা এই এত বড় বাড়িতে থাকা সারা দিন, আর ভূতের মতন পরিশ্রম ক'রে যাওয়া—এ যেন আর ও পেরে উঠছে না কিছুতেই। তেমনি হেমেরও হয়েছে আজকাল—রোজই ফিরতে রাত হচ্ছে। তাও যদি ওপরটাইম ক'রে রাত করত তো শ্যামার একটা সান্ত্বনা থাকত। দুটো পয়সা আসত তাতে। এ শুধুই আড্ডা, জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'এই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দুটো গল্পগুজব করছিলুম।' কিন্তু শ্যামা জানে বন্ধুবান্ধব কিছুই নয়, প্রত্যহ সে আজকাল বড় মাসীর কাছে যায়। টানটা কোথায় তাও বোঝে। ওর বয়েস হয়েছে ঢের, মানুষ দেখে দেখে কিছুই আর বুঝতে জানতে বাকি নেই। 'ডব্‌কা হ'ল ছোঁড়া তো ছুঁড়ীর হ'ল গোঁড়া!' যে বয়েসের যা। ঐদিকে টান না হলে আর প্রত্যহ হাওড়া থেকে সিমলে, সিমলে থেকে হাওড়া হাঁটতে পারত না। সবই জানে শ্যামা—তবে এ নিয়ে কেজিয়া করতে ইচ্ছে করে না। সম্পর্কটা বড্ড তেতো হয়ে যায়। তা ছাড়া ভয়েরও কিছু নেই। বৌমা ঠিক সে ধরনের মেয়ে নয়, সুযোগ অবসরও কম ও বাড়িতে। দিদি তো দিনরাত বাড়িতে বসে। কথা গান কীর্তন এসব শুনতেও কখনও কোথাও যায় না। আর সব চেয়ে বড় কথা, পয়সা খরচ নেই। মাসের শেষে মাইনের পাইপয়সা এনে ধরে দেয় হেম। মাসকাবারী টিকিটের টাকা আর যখন যা দরকার হয় বলে চেয়ে নেয়। এ ছাড়া আট আনা চার আনা নেয় মধ্যে মধ্যে—বলে, 'বন্ধুবান্ধবরা পাঁচদিন খাওয়ায়, তাদের না খাওয়ালে চলে না। তা আমি আর কি খাওয়াই—বেগুনি প্যাজের বড়া বড় জোর!' শ্যামা হাসে মনে মনে—বেগুনি প্যাজের বড়া ছাড়া ও পয়সাতে কিছু কেনা যায় না ঠিকই, বড় জোর দুখানা হিংয়ের কচুরি—কিন্তু সেটা যে কোথায় যায় তাও শ্যামা জানে। বৌমা ভরা পোয়াতি।

এই অবস্থায় নরেনকে পেয়ে যেন বেঁচে গেল ও।

কিন্তু এ কী অবস্থায় এল সে!

রোগা-কাঠি হয়ে গেছে। পেটটা জয়ঢাক। হাত-পাগুলো ফোলা ফোলা, মাথার চুল একেবারে পাতলা হয়ে গেছে। চোখের কোল ফুলেছে। সদ্য শোকের লক্ষণ।

শঙ্কিত হয়ে উঠল শ্যামা, বুকের মধ্যেটা ঢিব্‌ ক'রে উঠল সেদিকে চেয়ে—যতই হোক লোকটা আছে তাই হাতের লোহাগাছাটা আছে, সিঁথিটাও সাদা

নেই। সাত পাতের কুড়িয়ে যা-তা খেয়েও চলে যাচ্ছে। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে সারাদিন বাগানে ঘুরে, গাছে ঠেকো দিয়ে আর পাতা কুড়িয়ে, যা ছিরির চেহারা হয়েছে—এর পর শুধু হাত আর সাদা সিঁথি হলে একেবারেই কাঠকুড়ুনী বলবে লোকে। তা চেয়েও বড় কথা হল, লোকটা পাজী হোক, বদমাইশ হোক—চিরজন্মের সাথী। অন্য কোন পুরুষের দিকে চাইবার কখনও অবসরও হয় নি, প্রবৃত্তিও হয় নি। আশা আকাঙ্ক্ষা না হোক, জীবনের কামনা বাসনার দিকেও যদি কখনোও ক্ষণকালের জন্যও কোন আনন্দ কোন তৃপ্তি পেয়ে থাকে তো—এই লোকটাকে উপলক্ষ করেই পেয়েছে। এখনও তাই কোথায় মনের গোপন কোণে একটু কোমলতা একটু মায়া আছে লোকটা সম্বন্ধে।

কিন্তু মনে যাই হোক, মুখে বেশ খানিকটা বিদ্রূপের ভঙ্গিতেই বলে, 'বাঃ, চেহারা তো বেশ খুলিয়ে আসা হয়েছে দেখছি, এবার আর কি—খাটে তুললেই তো হয়।'

কে জানে কত দূর থেকে হেঁটে এসেছে, ক্লান্ত দেহে হেঁটে আসার ফলে হাপরের মতো হাঁপাচ্ছিল নরেন, কোনমতে রান্নাঘরের দাওয়াটাতেই বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'হুঁ। তো তেমন অবস্থা না হলে আর এ যমপুরীতে আসবই বা কেন!'

'বলি স্বগ্‌গপুরীতে থেকেই তো এমনি চেহারা খুলিয়ে আসা হয়েছে, তা সেখানে আর কটা দিন চেপে থাকলেই তো একেবারে খাঁটি স্বগ্‌গে চলে যেতে পারতে। মিছিমিছি এ যমপুরীতে কষ্ট করতে আসবার কী দরকার ছিল।'

'নইলে তোর স্বগ্‌গবাসের উপায় হয় না যে। দিনকতক সোয়ামীর গু-মুত ঘাট, নইলে পরলোকে গিয়ে কি জবাব দিবি?'

তারপর হাতের ময়লা পুঁটলিটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'নে, চুপ কর এখন—আসা-মাত্তর ফ্যাচফ্যাচানি শুরু করেছে। একটু তামাক সাজ দিকি। ঐতে সব আছে—'

'হ্যাঁ, তা আর নয়। মেয়েরা কেউ নেই—এক হাতে জুতো সেলাই চন্ডীপাঠ সব করছি, তার মধ্যে তোমাকে তামাক সেজে দিতে বসি! ওসব চলবে না, খেতে হয় সেজে খাও।···কত্তার মতো রোজগার করব, বিষয় সম্পত্তি দেখব, গিন্নীর মতো রান্নাবান্না করব, ঝিয়ের মতো ঘরবাড়ির পাট করব, বাসন মাজব, ক্ষার কাচব, আবার খানসামার মতো তামাক সাজতে বসব—এমন নিকড়ে গতর আর নেই, আমারও বয়স হয়েছে।'

'মাইরী দে বামনী, এতটা হেঁটে এসে—তবু বসতে বসতে এসেছি, এই সিদ্ধেশ্বরীতলাতেই আধ ঘণ্টার ওপর বসতে হয়েছে—তাও হাঁপ ধরেছে দেখছিস, বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। এইবারটি অন্তত সেজে দে, এখন আর পারছি না, চোখে যেন ধোঁয়া দেখছি সব!'

অগত্যা শ্যামা পুঁটলিটা খুলে নেয়। নরেনের একটা হুঁকো বাড়িতেই থাকত, সেটা ওখান থেকে এখানে আনতে ভোলে নি শ্যামা, কিন্তু তামাক নেই ঘরে।

কলকেটাও ভেঙে গেছে একদিন পড়ে গিয়ে—নরেন আর আসে না, এলে রাখবার কথাও মনে হয় নি তাই। তা ছাড়া হুঁকো কলকে তামাক সর্বদা তার সঙ্গেই থাকে—বলতে গেলে ঐগুলোই যথার্থ তার জীবনের সাথীসঙ্গী—সুতরাং জানত যে সে এলে নতুন কলকেও আনবে।

'তা সে আঁটকুড়ীর বেটীরা গেল কোথায় সব?' একটু দম নিয়ে এবং শ্যামা তামাক সাজতে বসায় কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে—প্রশ্ন করে নরেন।

'যাবে আবার কোথায়, যে যার শ্বশুরবাড়ি। তরুর বিয়ের আগে খেঁদি রাগ ক'রে নিজের শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। এখন তাদের কন্না করার লোক চাই তো—বড় বোয়ের নাকি তাই খুব আদরও হয়েছে।'

'তরুটারও বে হয়ে গেছে! ইস্। জানতে পারলে আসতুম। কত কাল যে বিয়ে-বাড়ির খ্যাট জোটে নি অদেষ্টে!'

'মুখে আগুন! নিজের মেয়ের বে, তা কেমন পাত্তর হ'ল, কোথায় পড়ল তা জিজ্ঞেস করা চুলোয় গেল—খ্যাটের চিন্তা। ঐ তো চেহারা, উদুরী ধরিয়ে বসে আছ যা বুঝতে পারছি—খ্যাট হজম হ'ত?' মুখনাড়া দিয়ে বলে শ্যামা।

কিন্তু যে ধরনের উত্তর আশা করেছিল ওদিক থেকে সে ধরনের উত্তর এল না। খালি উঠোনের কাঁটাল চারাটার দিকে কেমন এক রকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেই হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিতে নিতে বললে নরেন, 'কোন ছেলেমেয়েরই কখনও খবর নিলুম না, আজ আর নিয়ে কি করব বল্। যা ভাল বুঝেছিস করেছিস—যেমন পাত্তর জুটেছে দিয়েছিস—অদেষ্টে থাকে ভোগ করবে, আর তোর মতো পোড়া বরাত হয় তো জ্বলবে। আমার শাশুড়ী মাগীও তো খারাপ দেখে দেয় নি। তোর কী হাল হ'ল তা তো দেখলিই। ও নিয়ে আর আমি ভাবি না।'

ওর কথা বলবার ধরনে একটা কী ছিল, শ্যামা কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল, হঠাৎ কিছু জবাব দিতে পারলে না।

নরেন কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তামাক টানবার পর একটু সুস্থ হয়ে চারদিকে তাকিয়ে বললে, 'বাড়িটা মন্দ করিস নি কিন্তু—মাইরি, তোর মাথা খুব। আমাদের যথাসর্বস্ব যখন গেল তখন যদি তুই একটু সেয়ানা হ'তিস, তা হলে হয়তো সব যেত না।'

তার পর আর গোটা দুই টান দিয়ে বললে, 'বরাত! বুঝলি, সবই বরাত। নইলে অমন বুদ্ধি হবে কেন! তুই এখানে এই ইন্দির ভবন করেছিস তা তো জানি না—শুনেছি বাড়ি করেছিস, কিন্তু সে যে এমন পাকা বাড়ি, বাগান পুকুর তা ভাবি নি। ওঃ, যা কষ্ট গেল ক মাস! অসুখে ভুগছি—এ সময় কোথাও কেউ আশ্রয় দিতে কি চায়? পথে পথেই কাটল বলতে গেলে। হঠাৎ খেয়াল হ'ল তাই, লোককে জিজ্ঞেস ক'রে চলে এলুম। ভাবলুম কে জানে শরীরের এই অবস্থা—হয়তো কোথায় কোন্ দিন মুখ থুবড়ে পড়ে মরে থাকব—তোদের সঙ্গে দেখাও হবে না। আর বাড়ি একটা করেছিস যখন, একবার দেখেও নিই!'

হঠাৎ যেন শ্যামার চোখে জল এসে যায়। বহুদিনের শুষ্ক রুক্ষ চোখে তপ্ত জল ভরে আসে। প্রাণপণে অন্য দিকে চেয়ে সে-জল সামলে নেয় সে। তার পর গলাটা সহজ করার চেষ্টা করতে করতে অর্ধ-বিকৃত কণ্ঠে বলে, 'কেন, রাজ-অট্টালিকা না জানলে বুঝি আসতে নেই? যদি মাটির ঘরই হ'ত—তাতে কি তুমি থাকতে পারতে না!'

'না, তা নয়।' একটু যেন অপ্রতিভই হয়ে পড়ে নরেন—যা এর আগে আর কখনও ওকে হতে দেখে নি—বলে, 'তা নয়। মনে হ'ত কোনমতে একটু হয়তো মাথা গোঁজার কুঁড়েঘর করেছিস—ছেলেমেয়ে, ঐন্দ্রিলাটা আছে মেয়েসুদ্ধ—তার মধ্যে কোথায় আর গিয়ে সেঁধুব। শুধু অশান্তি বৈ তো নয়!'

দুঃখের মধ্যেও কুট্ ক'রে জবাব দেবার লোভ সামলাতে পারে না শ্যামা, 'থাকতে তো তুমি কখনই আসতে না। পরের বাড়িতে—তাই তো এসেছ চলে গেছ এমন কতবার। তা নিজের বাড়ি না হয় দেখেই চলে যেতে।'

'না রে—বুঝিস না। শরীর ভেঙে এসেছে। চিত্রগুপ্ত হুলিয়া বার করেছে এবার। কবে বলতে কবে এসে ক্যাঁক ক'রে চেপে ধরবে। এখন একটু একটু সেবা খাবারও লোভ হয়েছে। নিজেদের মধ্যে এসে পড়লে আর হয়তো নড়তে চাইতুম না।'

আবারও বুকের মধ্যেটা কেমন ক'রে ওঠে শ্যামার। তাই, মনটাকে শক্ত করবার জন্যই বুঝি কর্কশ কথা টেনে আনে মুখে। বলে, 'সাতজন্মের পাপ তোমার - তাই! নিজের বৌ, নিজের ছেলে, নিজের নাতনী—তাব মধ্যে এসে থাকবে, একখানা ঘরই বা কি আধখানা ঘবই বা কি! আমবা যেমন ভাবে মাথা গুঁজে থাকতুম তুমিও তাই থাকতে, তোমাকে কি তাড়িয়ে দেওয়া হ'ত! আপনার তো মনে করতে পারলে না কোন দিন, তার কি হবে।'

নরেন আর জবাব দেয় না, অন্যমনস্ক ভাবে হুঁকোয় টান দিতে থাকে। কল্কের আগুন কখন কখন নিভে এসেছে, ভেতবেব তামাকও গিয়েছে পুড়ে ঠিক্‌রে হয়ে তা বুঝতেও পারে না।

॥ ২ ॥

হেম যখন রাত্রে বাড়ি ফিরল তখন নরেন রান্নাঘরের দাওয়াতে খেতে বসেছে, শ্যামা সামনে বসে খাওয়াচ্ছে।

দৃশ্যটা এতই অভাবনীয়—বিশেষত দরজার কাছ থেকে একটা দিক মাত্র দেখা যাচ্ছিল নরেনের, ল্যাম্পেব ক্ষীণ আলোতে সেভাবে চেনা সহজ নয়, আর নরেন এত দিন বাড়ি আসে নি, তাকে দেখার সম্ভাবনাটাও ছিল সুদূর কল্পনার বাইরে-কাজেই হঠাৎ একটা লোককে মা এত যত্ন ক'রে সামনে বসে খাওয়াচেছ, অথচ পরিচিত কেউ বলেও মনে হচেছ না—চমকে ওঠবারই কথা। হেমও চমকে উঠল। খানিকটা গলা-খাঁকারি দিয়ে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে গেল।

সেই আধা-আলোতে আধা-অন্ধকারে চিনতে পারলে না নরেনও। ওর সেই

কাশির শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেই চমকে উঠল, হাতের গ্রাস হাতেই ধরে ফিরে বসে প্রশ্ন করলে, 'মশাই ? চিনতে পারলুম না তো !'

'পোড়া কপাল ! এমনি সম্বন্ধই দাঁড়িয়েছে বটে, বাপ ছেলেকে চিনতে পারে না, ছেলে বাপকে চেনে না। ও তো খোকা।'

'খোকা ? ও, আমাদের হেমচন্দর !···এসো এসো বাবাজী, এসো। বাবুই বলি—রোজগেরে বাবু যখন।'

সে আবার ফিরে বসে মুখের গ্রাস মুখে তুলল।

বাপকে দেখে পুলকিত হবার কথা নয়, তবে বাবার কথাবার্তায় এবং মা'র ধরন-ধারণে সে একটু বিস্মিত হ'ল। এ যেন কেমন অন্যরকম সুর দু'জনেরই গলায়।

হেম আসবার সময় বড়বাজার থেকে খানিকটা ডালের ক্ষুদ কিনে এনেছে শ্যামা এক-এক-দিন ভিজিয়ে বড়া করে, চালের ক্ষুদের সঙ্গে মিশিয়ে সরুচাকলিও—সেইগুলো নামিয়ে রেখে দাওয়ারই একপাশে বসল একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে।

'উঃ—কত কাল পরে বাড়ি এলুম, তোমার জননীর হাতের রান্না খাব বলে—তা তোমার গর্ভধারিণী কোথা থেকে গাঁদালপাতার ঝোল রেঁধে বসে আছেন—কাঁচকলা আর ডুমুর দিয়ে। তবে মাগী রাঁধে ভাল, অনেকদিন পরে খাচ্ছি বলে আরও—অমর্ত লাগছে যেন !'

'তা কী করব—রোগটি তো বেশ ধরিয়ে এসেছ—শুধু কাঁচকলার মন্ড খেয়েই তো থাকা উচিত।'

'তুই রেখে বোস্ দিকি। কাঁচকলার মন্ড খেয়ে থাকাচ্ছি আমি। একটা-দুটো দিন—এর বেশী আর এ পথ্যি চলছে না।'

খেয়ে উঠে শ্যামার হাত থেকে ঘটিটা নিয়ে আঁচাতে আঁচাতে বলে নরেন, এবার আর একটু তামাক দে বাপু, উনুনে তো আঙরা আছেই। বাস্তবিক, কীই বা বলি। একা এক হাতে। তা পুত্রের এবার বিবাহ দাও গিন্নী, আর কেন ?'

'ছেলে যে বিয়ে করতে চায় না !'

'ছেলে চায় না ! ছেলে আবার চাইবে কি ? আমরা হলুম ওর অভিভাবক, আমরা সম্বন্ধ ঠিক করব—সুড় সুড় ক'রে গে পিঁড়িতে বসবে। ওর চাওয়া-চাওয়ির কি ধার ধারি !'

হেম বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

'মা গামছাটা দাও। ঘাটে যাই। আর আমারও ভাত বাড়। বাজে কথা শোনবার সময় নেই ওসব।'

'ও,—মিলিটারী মেজাজ ! রোজগেরে বাবু যে। আচ্ছা, হচ্ছে হচ্ছে। মেয়ে আগে একটা লাগসই খোঁজ করি, তার পর দেখছি। মেজাজ বুঝছি। দে তামাক দে বামনী।'

হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিয়ে বাইরের ঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসে। ঐখানেই শোওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে শ্যামা।

হেম গামছা নিয়ে ঘাটে চলে গেল। তার বিস্ময়ের শেষ নেই। মা'র এত নরম হয়ে আসার কারণটা ঠিক বুঝতে পারছে না। নরেনের চেহারা খারাপ হয়ে গেছে এটা দেখেছে সে—কিন্তু সে খারাপ কতখানি তা বুঝতে পারে নি অন্ধকারে। আরও অবাক হচ্ছে সে বিধাতার যোগাযোগ দেখে। আজই রাণী বৌদি বলছিল, 'সত্যি, মেসোমশাইকে কখনও দেখলুম না, বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। যে সব গল্প শুনেছি মা'র মুখে আর তোমার মুখে—দেখবার মতো মানুষ বটে। কোথায় থাকেন একটু খোঁজ করো না ভাই—'

'জানলে তো খোঁজ করব। কোথায় থাকেন এক ভগবান ছাড়া কেউ জানে না।'

'আচ্ছা—আসবেন তো এক দিন না একদিন। খবর পেলেই আমি গিয়ে দেখে আসব, নয়তো ধরেই নিয়ে আসব এখানে। আমি গেলে ঠিক চলে আসবেন দেখো।'

'এনে কি করবে? পুষবে?' হেসে প্রশ্ন করেছিল গোবিন্দ।

'ওমা পুষব কি কথা। মেসোমশাই গুরুজন। মাথায় ক'রে রাখব। তাতে দোষই বা কি?'

'দোষ কিছু নয়। তবে ঘটিবাটি সাবধান। পোষ মানবার মানুষ সে নয়।'

'ছি ছি। কী বল যা-তা কথা। মুখের রাখঢাক নেই! ঠাকুরপো বসে আছে, ওর বাবা তো বটে।...তা ছাড়া দ্যাখ বয়স হচ্ছে, শরীর ভেঙে আসছে, এবার ঘরমুখো মন হবে,—সেবার দরকার যে এখন।'

কথাগুলো যখন হচ্ছিল হেম তখন একবারও ভাবে নি যে বাড়ি এসেই বাবাকে দেখতে পাবে আর এমন নরম মেজাজে দেখবে। শরীরের অবস্থা খারাপ বলেই হয়তো। সত্যিই এবার হয়তো ঘরমুখো মনে হয়েছে। ঐ লোক দিন-রাত বাড়ি বসে থাকবে আর অবিরত বাজে বকবে—মনে হলেই মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। অথচ মা'র যে রকম ভাবগতিক—এবার তাড়াবার মতো মনের ভাব নয়! বোধ হয় একা থাকে বলেই আরও। খবর পেয়ে যদি সত্যিই রাণী বৌদি এসে যায়? সব পারে ও মেয়ে। মুখে হয়তো খুব যত্ন-আত্তি করবে, ভক্তি-শ্রদ্ধাও দেখাবে, কিন্তু মনে মনে—? ওরই ছেলে মনে ক'রে হেম সম্বন্ধেও কি একটা খারাপ ধারণা হবে না?

কথাটা ভাবতেও যেন কেমন লাগে।

অবশ্য রাণী বৌদির বুদ্ধি খুব। বয়স কম হলে কি হবে, অভিজ্ঞতা কারুর চেয়ে কম নয়। মানুষ চেনে খুব। সত্যি এই বয়সে এত জ্ঞান কি ক'রে হ'ল, ভাবতেও অবাক লাগে। আর কী মায়া—সকলকেই যেন আপন ক'রে টানতে চায়।...

'ল্যাম্পো'র শিখাটা হেমন্তের কুয়াশাঘন রাত্রে কেমন যেন আবছা আবছা দেখায়। হাঁটু পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাণী বৌদির কথাই ভাবে হেম, মুখহাত ধোওয়া আর হয়ে ওঠে না।

অন্ধকারে উঠোনে দাঁড়িয়ে শ্যামা নরেনের সঙ্গে কথা বলছিল—সেইখান থেকেই হেঁকে বলে, 'কী রে, হিমে কতক্ষণ খালি গায়ে থাকবি ? এত কিসের মুখহাত ধোওয়া ?'

'এই যে যাই।' হেম কোনমতে একটা কুলকুচো ক'রেই জল থেকে উঠে আসে মুখের ওপরটা ভাল ক'রে ধোওয়ার কথা মনেও পড়ে না।

॥ ৩ ॥

নরেন শ্যামাকে ভরসা দিয়েছিল যে তার সন্ধানে অনেকগুলি ভাল পাত্রী আছে, দুটো-একটা দিন একটু সময়মত নেয়ে খেয়ে সুস্থ হয়ে উঠলেই সে বেরোবে মেয়ে দেখতে। কিন্তু দুটো-একটা দিন কাটাবার পর—নিয়ম মতো শ্যামার গাঁদালঝোল ভাত সত্ত্বেও—অসুস্থ হয়ে পড়ল। হাত-পা আরও ফুলে গেল, ঘর থেকে দাওয়াতে বেরোবার মতো শক্তিও আর রইল না।

নরেন বলে, 'বুঝলি বামনি—ভগা, ভগার খেলা এসব। আর দুটো দিন দেরি করলেও পথে মুখ থুবড়ে পড়তে হ'ত। এতটা পথ হেঁটে খোঁজ ক'রে ক'রে আসবার আর শক্তি হ'ত না। নিহাত মা-বাপের পুণ্যের জোর আছে তাই পথের মধ্যে গুয়ে-মুতে পড়ে মরতে হ'ল না। আর তোরও অদৃষ্টে আছে ভোগান্তি।'

আবার কখনও বলে, 'তুই গাঁদালঝোল খাইয়েই আমাকে পেড়ে ফেললি। এ তোর আড়ি-আকোচ আমি পষ্ট বলতে পারি। আমাকে জব্দ করবি বলেই—। আমার হ'ল গে অত্যেচারের দেহ, এ কখনও তোয়াজে ভাল থাকে ? এত ক'রে বললুম দুখানা বড়া ভেজে আমাকে একটু বড়ার ঝোল ক'রে দে, নিদেন পঁ্যাজ কুঁচিয়ে এখনকার একটা নতুন বেগুন পুড়িয়ে দে—তা দিলি নি। খাওয়া তো এবার ঘুচে এল।'

গজগজ করে আপন মনেই। ভাতের থালা দেখলেই ঝগড়া করে—গালাগাল দেয়।

'কী ও—গাঁদালঝোল ? কোন্ গুয়োটা খায় দেখি। সরিয়ে নিয়ে যা, সরিয়ে নিয়ে যা। আমি খাব না। উপোস ক'রে পড়ে থেকে গোহত্যে ব্রহ্মহত্যে হব বলে দিলুম।'

আবার খানিকটা হাউ হাউ ক'রে কাঁদে, 'বামনি—অক্ষ্যাম হয়ে এসে তোর দোরে পড়েছি বলেই কি এমন শোধ নিতে হয় ? আমাকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলবি ? ঐ কি কেউ খেতে পারে ?'

'না, তা পারবে কেন! শোথ ধরিয়ে এসে এখন কালিয়ে পোলাও খাবেন! নাও ওঠ, খাও বলছি ভাল চাও তো—নইলে হেম এসে টেনে ঐ পাঁদাড়ে ফেলে দিয়ে আসবে। শ্যাল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে জ্যান্তে, এত বড় বড় গো-হাড়গেল, খুবলে খুবলে খাবে, উঠে পালাবারও তো ক্ষমতা নেই। ওঠ, খেতে বসো।'

কখনও ধমক দিয়ে, কখনও ভুলিয়ে, কখনও বা ভবিষ্যতের আশা দিয়ে সেই গাঁদালঝোল আর গলাভাতই খাওয়ায় শ্যামা। রাত্রে মরি বাঁচি ক'রে বার্লিরও

ব্যবস্থা করেছে, পাড়ার লোকে বলেছে কাঁচা পেঁপে সেদ্ধ খাওয়াতে—অনেক পয়সার মায়া ত্যাগ ক'রে ভাও পেড়েছে সে গাছ থেকে, তব্ যেন দিন দিন শয্যাগতই হয়ে পড়ছে নরেন।

শেষকালে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে ডাক্তার-বদ্যি একটা কিছ্ না দেখালেই নয়। অথচ পয়সা খরচ ক'রে ডাক্তার দেখাবার কথা এখন ভাবাও যায় না—মাথার ওপর 'অস্মর' দেনা। পাড়ায় মল্লিকদেরই এক জ্ঞাতি বই দেখে একটু আধটু হোমিও-প্যাথিক ওষ্ধ দেন—তিনিও নাকি আজকাল আট আনা ভিজিট করেছেন, এক আনা ক'রে ওষ্ধের প্রিয়া। তাই যদি খরচ করবে তো পাল্কি ভাড়া ক'রে সরকারী হাসপাতালে নিয়ে যাবে না কেন? মৌড়ীর হাসপাতাল যাওয়া-আসা এক টাকা রেট, তেমন দরদস্তুর করলে বারো আনাতেই রাজী হয়ে যায়। কিন্তু সে-ও ঢের। ওদের যা অবস্থা, মরণাপন্ন রোগীর ক্ষেত্রেও বিবেচনা করতে হয়। সদ্য তর্র বিয়েতে দেনা আরও বেড়েছে জামাইয়ের কাছে, শোধের উপায় একান্ত সীমাবদ্ধ।

কিন্তু হেম অবধি চিন্তিত হয়ে পড়ে। শেষে একটা রবিবার দেখে কোনমতে ধরে ধরে রাস্তার ধারে বসিয়ে বসিয়ে—বলতে গেলে সম্প্র্ণটা বয়ে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে হাজির করে। তারা একটা মিক্সচার দেয়, আর কি বড়ি। চিঁড়ের মণ্ড, সিঙ্গি মাছের ঝোল পথ্য ব্যবস্থা।

ওখানে ওরা এসে বসে আছে কার ম্খে খবর পেয়ে অভয়পদ ছ্টে এল। তাদের বাড়িতে নিয়ে রাখবার প্রস্তাব করলে সে। কাছাকাছি থাকলে হাসপাতালে দেখাবার স্বিধা হবে—এই তার য্ক্তি। কিন্তু হেম রাজী হ'ল না। বাবাকে তার এখনও বিশ্বাস হয় না, শ্ধ্ বোন ভগ্নীপতি হলেও কথা ছিল, বাড়িতে আরও পাঁচজন আছে, দ্র্গাপদর নতুন বৌ, মেয়েরা একজন না একজন সপরিবারে থাকেই—মিছিমিছি তাদের কাছে কুটুমবাড়িতে থাকতাই।

নরেন নিজেও রাজী হ'ল না অবশ্য, 'না বাবাজী, শরীরের যা অবস্থা হয়েছে—হয়তো মাঠে ঘাটে যাবার অবস্থাও থাকবে না বেশী দিন। সেখানে মাগী করতে বাধ্য কিন্তু এখানে কে ওসব করবে বল? ভরসার মধ্যে তো কন্যা—তা তারও তিন-চারটে নেঁড়িগেঁড়ি, সেই সব সামলাবে না সংসারের কাজ করবে—না আমাকে দেখবে!...না, এখন থাক, একটু সেরে উঠি তার পর বরং এসে তোমাদের বাড়ি প্রসাদ পেয়ে যাব।'

ফেরার পথে কিন্ত্ ওভাবে আর ফিরতে দেয় না অভয়। একটা পাল্কি ডেকে তাতে ত্লে জোর ক'রে ভাড়ার পয়সাটা হেমের হাতে গ্ঁজে দেয়।

অনেক দিন অনেক কিছ্ই এই ভগ্নিপতির হাত থেকে হাত পেতে নিতে হয়েছে, এখনও হচ্ছে। মিছিমিছি এই সামান্যর জন্য প্রতিবাদও বেশী করতে ইচ্ছা হ'ল না। আট আনা পয়সা'হাত পেতেই নিলে।

অভয়ের ম্খে খবর পেয়ে মহাশ্বেতা এল বিকেলবেলা বাপকে দেখতে। তার অভ্যাসমত কোলে একটা ও হাতে একটা ছেলে নিয়ে।

নরেন তখন এক ছিলিম তামাক নিয়ে বাইরের রকে এসে বসেছে কিন্তু হুঁকোয় টান দিতে পারছে না—দুপুরের খাওয়ার পর সন্ধ্যে অবধি হাঁপানির জোরটা থাকে বড় বেশী—বসে বসে হাঁপাচ্ছে। মহাশ্বেতা এসে প্রণাম ক'রে ছেলেদের বললে, 'গড় কর সব—বেশ ক'রে পায়ে হাত দিয়ে গড় কর !'

নরেন অবাকও হ'ল, ব্যস্তও হয়ে উঠল।

'কে মা আপনি—কৈ আপনাকে তো—ও আপনি বুঝি এই চটখণ্ডীদের কেউ হন ? না কি চৌধুরীদের ? মানে আমি তো ঠিক থাকি না এখানে—'

মহাশ্বেতা এতখানি জিভ কাটে।

'পোড়াকপাল। ছেলেমেয়েদের পর ক'রে দিতে হয় বলে কি এমনি ক'রেই পর করতে হয়। নিজের মেয়েকেও চিনতে পারলে না ! আমি যে মহা !'

'অ, মহা। বেশ বেশ, বড় খুশী হলুম। হ্যাঁ, জামাইয়ের সঙ্গেও দেখা হ'ল যে। মহা ভক্তিমান ছোক্‌রা। সেই হাসপাতালেই প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিলেন। এই যে আমার পুত্র, হেমচন্দ্র, কৈ একদিনও তো দেখি না একটা কাঠি ক'রে একটু পায়ে হাত দিতে। কলি, কলি—ঘোর কলি। না-ই বা রইলুম বাড়িতে, জন্মদাতা পিতে তো বটে ! না, জামাইয়ের ভাল হবে, খুব উন্নতি হবে—মানুষের মতো মানুষ। নিয়ে যেতে চাইছিলেন বাড়িতে—বলছিলেন, ওখানে থাকলে হাসপাতালে দেখাবার সুবিধে হবে। হেমচন্দ্রেরও তাই ইচ্ছে ছিল—বুঝলে না, যা শত্রু পরে পরে—কিন্তু আমি রাজী হই নি, বলি, আমার তো একটা বিবেচনা আছে। সেখানে সে মেয়েটা কতকগুলো এণ্ডা-বাচ্ছা নিয়ে নাটা-ঝাপ্‌টা খাচ্ছে, তার মধ্যে গিয়ে উৎপাত বাড়ানো। আমি রাজী হই নি !'

তার পর নিবন্ত হুঁকোতেই গোটা-দুই টান দিয়ে একটা হাঁক দেয়, 'কৈ গো গিন্নী, কোথায় গেলে গো, একটা আসন-টাসন দাও—এঁরা সব দাঁড়িয়ে রইলেন যে ! দেখছেন তো, দেখছেন তো মাগীর বিবেচনা, চিরকাল এই ক'রে আমার হাড়মাস জ্বালিয়ে খেলে। বিবেচনা বলতে কিছু নেই ! আপনারা এসে দাঁড়িয়ে রইলেন—একটা আসন দেবে কি কিছু—। তা বরং এখানে বসতে পারেন, বিলিতী মাটির মেঝে, দিব্যি পোষ্কার !'

'ও মা, আমাকে আবার আপনি আজ্ঞে করছ কি গো ! বললুম না আমি মহা—!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—তা কি আর আমি বুঝি নি। বলি আমার তো আর ভীমরতি হয় নি। করতে হয়, ছেলেমেয়েকেও আপনি-আজ্ঞে করতে হয়। ছোটটি থাকে যখন তখন তুইতোকারি চড়-চাপড়—বড় হলে একটা অন্য ব্যবস্থা—। বোস বোস, এই তোরা বোস না সব ?'

ছেলে দুটো কোনমতে আড়ষ্ট হয়ে বসে সামনে। মহাশ্বেতা কিন্তু এক দৌড়ে ভেতরে চলে যায়। শ্যামা তখন রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে নারকোল পাতা চাঁচছে—সেখানে গিয়ে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'ও গো মাগো, বাবার যে পুরো ভীমরতি গো—আমাকে বলে আপনি, বলে বসুন—বাবা আর বাঁচবে না এ যাত্রা !'

বলেই ভ্যাক ক'রে কে'দে ফেলে মহাশ্বেতা।

নিজের মনের আশঙ্কাটা মেয়ের মনে প্রতিধ্বনিত হতে দেখে শ্যামার বুকটাও ধক্ ক'রে ওঠে হয়তো—কিন্তু সে বিরক্ত মুখেই বলে, 'ও আবার কি, এখন থেকেই প্যান প্যান করছিস কেন!...খেলে যা! এরকম অসুখ-বিসুখ করলে মাথার একটু গোলমাল হয়ই। আর যদিই বা তাই হয়, তাতেই বা এখন থেকে কান্নাকাটির কী হয়েছে। যা গুণের মানুষ! দুঃখে শ্যাল-কুকুর কাঁদবে।'

'ও মা—তা বলে—বাপ তো! কী যে বল! মানুষের জীবনে—পিতা স্বর্গ!'

'হয়েছে, হয়েছে,—থাম। তোকে আর শাস্তর থগবগাতে হবে না!'

মহাশ্বেতাকে বেশী বলতে হয় না, সব বিষয়েই তার শিশুর মত কৌতূহল। সে আবার এক ছুটেই বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় নরেনের কাছে—

'এই যে, কোথায় গিছ্‌লি আবার। বোস বোস—এখানেই বোস। পোষ্কার জায়গা—সকালেই মুছে দিয়েছে, তোর গর্ভধারিণী। তাই বলছিলুম এই শালাদের, দাদামশাইকে দেখতে এসেছিস—কী নিয়ে এসেছিস বল।...এবার যখন আসবি—মোড়ের দোকান থেকে খাস্তার গজা আর বাজার থেকে ঝাল ফুলুরি নিয়ে আসিস। বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাস নি, সাতশো রাক্ষুসীর খপ্পরে গিয়ে পড়লে আর আমি পাব না, গোরবেটার-জাতদের নুনতেল দিয়ে খাওয়াবে সব। আমাকে এইখানে চুপিচুপি দিয়ে যাস, আমি ঐ পাতার গাদার মধ্যে লুকিয়ে রাখব!'

মহাশ্বেতার চোখ কপালে ওঠে প্রায়, 'ও কি গো। তুমি তেলে-ভাজা ফুলরি খাবে কি গো। আর ঐ বাজারের খাস্তার গজা। তোমার যে শোথ রোগ হয়েছে!'

'চুপ চুপ, গাঁক গাঁক ক'রে চেঁচাচ্ছিস কেন! মাগী শুনতে পাবে যে! মিছে কথা, ওসব মিছে কথা। বুঝলি? ডাক্তারদের বাজে কথা যত সব। আমাকে না খেতে দিয়ে মারবার ফন্দি। মাগীর সঙ্গে ষড় করেছে গোরবেটারা। কিচ্ছু না, একটু হাঁপানির মতো হয়েছে তাই, আর অনেক দিন তো পোণ্টাই কিছু খাই নি—হাত-পাগুলো একটু ফুলেছে। শুনেছি ভালমন্দ খেলে সেরে যায়। মাগীর গাঁদালঝোল খেয়ে খেয়ে পাইখানাটা একটু ধরেছে, বুঝলি না, এখন এই হাঁপানিটা সারলেই—তোর বাড়ি চলে যাব। জামাই তো বলেইছেন—।'

এই বলে খানিকটা আবার বসে বসে হাঁপায়। হুঁকোটায় টান দেয়—কিন্তু সেখানে তখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সেটা দরজার কোণে ঠেস দিয়ে রেখে বসে বসেই মেয়ের কাছে এগিয়ে আসে খানিকটা। চুপি চুপি বলে, 'ওঃ, কত কাল যে যজ্ঞিবাড়ির খ্যাট জোটে নি। ভেবেছিলুম হেমচন্দরের বিয়েতে পাঁচটা দিনের খ্যাট জুটবে—এই তো ধর না দু দিন পাকা দেখা—দু বাড়িতে দু দিন, তার পর এক দিন বে আর এক দিন বৌভাত—আর পরের দিন বাসি-যজ্ঞি। আজকাল ঠাণ্ডার দিন, কিচ্ছু খারাপ হয় না। গরম ক'রে ক'রে রাখলে তিন দিন থাকে।...আপনাদের তো অনেক জানাশুনো—দিন না একটা, ভাল বংশের মেয়ে

দেখে। ও আমার রূপ চাই নি। রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাব! সোন্দর মেয়েদের বরাত ভাল হয় না। এই যে আমার ব্রাহ্মণী, বললে বিশ্বাস করবেন না—সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ ছিল—কী বরাত কি বলব। আমার সাজানো সংসার—কুবেরের ঐশ্বর্য, মাগীর পয়ে সব যেন ফুসমন্তরে উড়ে গেল। বংশ দেখে মেয়ে আনতে হয়, বংশ আর চালচলন দেখে। মানে একটু লক্ষ্মীছিরি থাকে এই আর কি! তা তেমন মহৎ-বংশের মেয়ে হলে লক্ষ্মীছিরি একটু থাকবেই। তবে পাওনা-থোওনা—তা অবিশ্যি কিছু দিতে হবে- হেমের গর্ভধারিণী যে শুধু হাত মুখে তুলবেন, তা মনে হয় না। দিন না একটু ভাল দেখে মেয়ে—আমি এই মাসেই দিয়ে দিই—'

'ও হরি। তুমি খ্যাঁট খাবে কি গো বাবা, তোমার যে পুরোদস্তুর ভীমরতি হয়েছে। তুমি আবারও আমাকে আপনি বলছ! এ তো মনে হচ্ছে তোমার আর বেশী দিন নয়—বুঝতে পারছ না!'

'আ গেল যা। গোরবেটার জাত হারামজাদী মেয়ে আমার কল্যেণ আওড়াতে এলেন। আমার মরণ টাঁকছেন বসে বসে। যা দূর হ—আমার সামনে থেকে, এ শোরের পাল সরিয়ে নিয়ে যা! হবে না, কেমন বংশের বৌ! আবাগী সব্বনাশী আমার ভীমরতি দেখছেন। তোর ভীমরতি হোক, তোমার সোয়ামীর হোক, তোর গুষ্টির যে যেখানে আছে তাদের হোক। আমার কেন হতে যাবে!'

'ওমা—এ যে একেবারে উন্মাদ পাগল হয়ে গেছে যে! আমি ভাবছি ভীমরতি। চলে আয় চলে আয়। পালিয়ে আয়।'

ছেলে দুটোর হাত ধরে টানতে টানতে ভেতরে চলে যায় মহাশ্বেতা।

মাকে গিয়ে বলে, 'কী সব কবিরাজী তেল পাওয়া যায় তাই বাবাকে লাগাও গে, এ যে একেবারে পাগলের অবস্থা!'

শ্যামা সদ্য-চাঁচা কাঠিগুলো গোছ ক'রে নারকোল পাতারই একটা সরু ছোটা দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে গম্ভীর মুখে বলে, 'তোমার এত টান থাকে আর পয়সার জোর থাকে তুমি মাখাও গে মা—আমার এত ক্ষ্যামতা নেই। আর ইচ্ছেও নেই—সত্যি কথা বলতে কি। ঐ মুখে ভাত যে বেড়ে দিচ্ছি এই ঢের!'

মহাশ্বেতা অপ্রস্তুত ভাবে বলে, 'না—ও একটা কথার কথা বললুম। বলছি যে পুরোদস্তুর ভীমরতি দেখছি বাবার।'

'তা হবে। কী আর করব বল। যতটুকু যা সাধ্যে কুলোচ্ছে করছি। করবার কথা নয়—তবু করছি।'

'তা বলছ কেন', হাত-পা নেড়ে বলে মহাশ্বেতা, 'করা উচিতও তো। হাজার হোক তোমার সোয়ামী, আমাদের বাবা। বলি এ তো ফেলবার সম্পর্ক নয় গো!'

'আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েছে। তোমার কাছ থেকে আর এই মরবার কালে উচিত অনুচিত শিখতে চাই না। আয় রে তোরা—দুটো নাড়ু খেয়ে যা!'

আগের দিন ক্ষুদভাজা গুঁড়িয়ে গুড় দিয়ে নাড়ু ক'রে রেখেছিল, তাই বার ক'রে দেয় শ্যামা নাতিদের।...

মায়ের তিরস্কার মহাশ্বেতা কোন দিনই গায়ে মাখে না, আজও মাখলে না। তা ছাড়া তার তখন কৌতূহলই প্রবল। সে আবারও বাইরে এসে দাঁড়াল। তবে খুব কাছে নয় এবার—একটু দূরে দাঁড়িয়েই বাপের ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করতে লাগল। শিশুর মতোই তার কৌতুক আর কৌতূহল।

দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও নরেনের দৃষ্টি এড়ায় নি।

সে একটু এগিয়ে রকের ধারে এসে বসল।

'ও কে? মা মহা, এদিকে এস মা, কাছে এস। ও কখন কি বলে ফেলি—শোকাতাপা মানুষ, অত ঠিক থাকে না। ওসব গায়ে মাখতে নেই। মরুক গে যাক্—বুঝছ না মা—পরের সঙ্গেই তো জীবনটা কাটল, আপনি বলে বলেই অব্যেস। পরদারেষু মাতৃবৎ—বুঝলে না, হাজার হোক আমরা গুরুবংশের ছেলে, এসব শিক্ষা যে বলতে গেলে আমাদের মাতৃগর্ভ থেকে পাওয়া। আপনি শব্দটাই আগে বেরোয়। তা ও কিছু নয়—বলছিলুম কি, মেয়ে একটা দেখতে। তোমাদের তো রাবণের বংশ, আর ও কলমির দল, একটা ডগায় টান দিলেই দেখবে সেই কত দূর থেকে আসছে। সদ্‌বংশের একটি মেয়ে এনে দাও আমাকে, আমার জ্যেষ্ঠপুত্তুরের জন্যে।'

'ও মা—তা মেয়ে মেয়ে ক'রে তো হেদিয়ে গেলে, ছেলে তোমার যে পিঁড়েয় বসতে চায় না। ওর ভগ্নিপোত পঞ্জুন্ত বলেছিল, মা তো কত ক'রে বলে—ওর একেবারে ধনুকভাঙ্গা গোঁ—আর যা বল বল, বে করতে বলো নি।'

নরেন একটা অশ্রাব্য কটূক্তি ক'রে ওঠে।

'রেখে দে দিকি তোর গোঁ। তুই মেয়ে দেখ্—মেয়ে পছন্দ হলে ওর ঘাড়কে দিয়ে বে করাব—ও তো ছেলেমানুষ। ও কেন, ওর চোদ্দপুরুষ বে করবে। উঃ! ধনুকভাঙ্গা পণ। গোরবেটার জাতের ঘাড় ধরব—পিঁড়েয় নিয়ে গে বসাব। মিলিটারী মেজাজ, ওসব মিলিটারী মেজাজ আমি ঢের দেখেছি। আমার মেজাজও কম নয়। ভাল আছি তো আছি—রাগলুম তো বাপের কুপুত্তুর। আমাকে চেনে নি এখনও। আপনি মেয়ে দেখুন। তার পর আমি আছি।'

উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় নরেন, দু পা এগিয়েও আসে। কিন্তু তার পরই পা দুটো অতিরিক্ত দুর্বল বোধ হওয়ায় রকের সিঁড়ির ওপরই বসে পড়ে ধপ ক'রে।

॥ ৪ ॥

হাসপাতালের ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও নরেনের অসুখ ক্রমাগত বেড়েই যেতে লাগল। বার বার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ব্যয়সাধ্য—তবু পর পর দুটো রবিবার হেম পাল্কি ক'রেই নিয়ে গেল, শ্যামার নিষেধ সত্ত্বেও। কিন্তু তাতেও সুস্থ হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। আর বেশী পয়সা খরচ করা ওদের ক্ষমতার বাইরে। তা ছাড়া নরেনকে নিয়ে যাওয়ার বিপদও আছে। সেখানে গিয়ে বসে থাকতে হলেই হাসপাতালের কর্মকর্তাদের কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দেয়—তখন যদি বা ধমক দিয়ে চুপ করায় হেম, ডাক্তাররা দেখার সময় তাদের মুখের উপরই গালাগাল

দিতে শুরু করে। লজ্জার শেষ থাকে না। তা ছাড়া নরেনেরও ওষুধের ওপর খুব আস্থাও নেই। অগত্যা ওরা টোটকার ওপরই সমস্তটা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। যে যা বলে—নরেনের নিজেরও অনেক রকম জানা ছিল—এটা ওটা ওষুধ এবং পথ্য পরীক্ষা চলে।

এর মধ্যে দু-একবার বিয়ের কথা তুলেছিল নরেন—হেম বেশির ভাগ সময় জবাবই দেয় নি, দিলেও মৃদু ধমক দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। 'মিলিটারী মেজাজ', 'রোজগেরে বাবুর মেজাজ' ইত্যাদি বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলেও তার বেশী কিছু বলতে সাহস করে নি আর। কিন্তু সেই ঝালটা এবং তম্বিটা গিয়ে পড়তে শুরু হ'ল শ্যামার ওপর। শ্যামা ছেলে মানুষ করতে পারে নি, সভ্যতা সহবৎ শেখাতে পারে নি, গুরুজনদের কাছে কি রকম নম্র ও বিনত থাকতে হয়—তা একটুও শিক্ষা পায় নি ছেলেমেয়েরা—বিয়ের কথায় ছেলেমেয়ের নিজস্ব মত থাকা এবং প্রকাশ করাটা নাকি সর্বপ্রকার শিক্ষা-সভ্যতার বাইরে। ইত্যাদি ইত্যাদি—

শ্যামা অনাবশ্যক বোধেই এ সবের জবাব দেয় না। তার অসংখ্য কাজ, দিনেরাতে কাজ করার সময় আঠারো ঘণ্টার বেশী নয়—এটা সে হিসেব ক'রে দেখেছে। সুতরাং এই সামান্য সময়ের মধ্যে পাগলের সঙ্গে বাজে বকে যদি দুটো মিনিটও নষ্ট হয় তো সেটা গায়ে লাগে। কিন্তু সে গায়ে না মাখলেও এক দিন এই ধরণের তম্বি হেমের কানে যেতে সে বিষম বিরক্ত হয়ে উঠল; রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে বসে বকছিল নরেন, সেখান থেকে একটা কনুই ধরে হিড় হিড় ক'রে টানতে টানতে একেবারে বাইরের ঘরে এনে বসিয়ে দিয়ে বললে, 'ফের যদি বাড়ির মধ্যে ঢুকে বাজে বকতে থাক কি ঐ সব কথা তোল তো একেবারে এমনি টেনে নিয়ে গিয়ে সরস্বতীর ধারে ফেলে দিয়ে আসব জ্যান্তে। এ বাড়িতে আর তোমার জায়গা হবে না—মনে রেখো।'

তার পর থেকেই—যেন নিজের শারীরিক দৈন্য এবং একান্ত পরনির্ভরতা উপলব্ধি ক'রেই একেবারে চুপ ক'রে গেল নরেন। হেমের আড়ালেও এ প্রসঙ্গ তুলতে সাহস করত না আর।

মাঘ মাস নাগাদ একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়ল সে। প্রাকৃতিক কাজগুলোর জন্যে অন্তত হামাগুড়ি দিয়েও বাইরে যাচ্ছিল—আর সেটুকু ক্ষমতাও রইল না। ফলে শ্যামার ঝঞ্ঝাট আরও বাড়ল। অসংখ্য কাজের মধ্যে দিনেরাতে বহুবার গিয়ে দুপুরে ডুবে আসতে হয়। মাথার সে একঢাল চুলের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই তার—সামনে তো প্রায় টাক পড়বার মতোই হয়েছে—তবু যা আছে—দিনরাত ভিজে ভিজে দুর্গন্ধ ছাড়ে, শরীর খারাপ হয়।

এ সবই লক্ষ্য করে হেম— কিন্তু কী যে করবে না ভেবে পায় না। ঐন্দ্রিলা এর মধ্যে কয়েক দিনই এসেছিল। দূর থেকে উঁকি মেরে দেখেই সরে এসেছে—বাপের কাছেও যায় নি। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে শ্যামা বলতে গিয়েছিল, 'দু-চার দিন এসে থাক্ না—আমি যে আর পারছি না।' তার জবাবে সটান বলে দিয়েছে সে, 'হ্যাঁ, এখন আসি আর ঐ বুড়োর-গু-মুত ছিষ্টি সেবার ভার আমার ঘাড়ে

ফেলে দাও। ওখানে আছি ঐ এক কড়ারে। রান্নাবান্না যা দাও করব—কিন্তু শাশুড়ীর সেবা আমার দ্বারা পোষাবে না। সেবা যা একজনের করেছি সে-ই ঢের, আর করার সাধ্য নেই!'

হেমকে কিছু বলে না শ্যামা। তার ভয় হয়—বলতে গেলে হয়তো জবাব দেবে, 'তুমি করছ কেন? ওর ওপর আমাদের কিসের কর্তব্য? যেখানে ছিল এতকাল সেখানে যাক না!'...

শ্যামা কিন্তু এখনও—এতকালের এত দুর্ব্যবহারের পরও—কেমন একটা মমতা অনুভব করে লোকটা সম্বন্ধে, এখন যদি সে না দেখে তা হলে সত্যিই হয়তো কানু পাঁদাড়ে গিয়ে পড়ে থাকবে, জ্যান্তেই শিয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে!· ·

এরই মধ্যে অকস্মাৎ একদিন—রবিবার সেটা, সকালে বসে হেম দাড়ি কামাচ্ছে—নরেন ডাকলে, 'বাবা হেম, হেমচন্দর! একবারটি এখানে আসবে বাবা?'

কন্ঠস্বরটা কেমন যেন। হেম একটু ভয় পেয়েই তাড়াতাড়ি কাছে এসে দাঁড়াল।

'একটু কাছে এসো বাবা, হ্যাঁ—এইখানটায়।'

একটু অনিচ্ছাসত্ত্বেও একেবারে বিছানার ধারে গিয়ে বসতে হয়। শ্যামা যত দূর সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে—ক্ষার কাচার তার বিরাম-বিশ্রাম নেই—তবুও রোগশয্যার কেমন একটা গন্ধ আছেই, একটা অস্বস্তি বোধ করে হেম।

নরেন কনুইতে ভর দিয়ে আধ-বসা ক'রে উঠে সহসা ওর হাত দুটো দু হাতে চেপে ধরে, তার পর হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে ওঠে—কতকটা ডাক ছেড়েই।

'কী হ'ল কী হ'ল!' ব্যস্ত হয়ে ওঠে হেম। শ্যামাও ছুটে আসে।

'বাবা হেম, আমি তোমার অক্ষ্যাম পিতা, আমি পশু, পশুরও অধম। তবু আমি তোমার জন্মদাতা, গুরুজন। তোমার হাতে ধরে ভিক্ষা চাইছি বাবা, তুমি একটি বিবাহ কর। মরবার আগে বৌমার মুখখানি দেখে যাব—জল পিণ্ডের ব্যবস্থা হ'ল জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে যাব—এ আমার বড় সাধ। এ না হলে আমি নিশ্চিন্তি হয়ে মরতে পারছি না যে বাবা। আমাকে এই ভিক্ষেটি তুমি দাও।'

আবারও হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে নরেন। দু হাতে চেপে ধরা হেমের হাতের ওপর নিজের কপালটা ঠোকে।

'আরে, আরে। এ কী বিপদ! আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে, চুপ কর। চুপ কর। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি। চুপ চুপ!'

বিব্রত হেম কী বলবে যেন ভেবে পায় না।

কোনমতে হাত দুটো টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরে চলে আসে সে। হাত দুটো কেমন একটা চিনচিন করছে যেন—বিশেষ ক'রে বাপের চোখের জল লেগে আছে যেখানে—সেইখানটায়।

শ্যামা তাকিয়ে দেখে ছেলেরও চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে, ছলছল করছে। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতে তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরিয়ে নেয়, দাড়ি কামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু শ্যামা লক্ষ্য করে, তখনও সে ভাল করে ক্ষুরটা ধরতে পারছে না—হাত দুটো কাঁপছে তখনও।...

সেই দিনই সে পাড়ার ফটিকের ভাইকে দিয়ে মহাকে ডেকে পাঠায়। ছেলের মত হয়েছে—এবার উঠে পড়ে পাত্রীর খোঁজ করুক।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

ব্যাপারটা ঘটে গেল হঠাৎই। সে-ও একটা রবিবার, রবিবার হলেই হেম একটু সেজেগুজে কলকাতায় যেত—অফিস যাওয়ার কাপড় জামা সেদিন ক্ষারে কাচা হ'ত—কাজেই ওর সেই দেশী কাপড়, আর পাম্পশু জুতো ছাড়া উপায় থাকত না। শীতকাল হলে তার সঙ্গে সেই জার্মানির শাল। সেদিনও সেই বেশেই বেরিয়েছিল। বড় মাসীমার বাড়িতে এসে দেখলে একগাদা লোক, ছোট দুখানা ঘরে থৈ থৈ করছে, রাণীবৌদির বাপের বাড়ি থেকে এসেছে সব। সুতরাং সেখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হ'ল। ছোট মাসীর কাছেও ঠিক যেতে ইচ্ছা হ'ল না—মার সেই কাণ্ডর পর থেকে একটু লজ্জাও করে বটে—তা ছাড়া সেখানে গেলে যেন বড় তাড়াতাড়ি কথা ফুরিয়ে যায়। একটু পরে বলবার মতো আর কথা থাকে না। আর কোথাও যাওয়া যায়—ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল অনেক দিন থিয়েটারের পাড়ায় যাওয়া হয় নি—গেলে কেমন হয়? গেট-কীপাররা সব বন্ধু, ওকে গিয়ে পাস লেখাতেও হবে না; তা ছাড়া থিয়েটার না দেখলেও—অনেক রকম গল্প-গুজব আছে—একটা ভাল রকম আড্ডা জমানো যেতে পারে।

মনে হ'ল বটে—সেই ভেবেই বড় মাসীমার বাড়ির গলি থেকে বেরিয়ে ওদিকের রাস্তা ধরলে—তবু একটা সংকোচ থেকেই গেল মনে মনে। আবার ঐ সংসর্গ, ঐ মেয়েমানুষটার প্রসঙ্গও হয়তো উঠবে, হয়তো তাকে দেখতেও হবে—সবটা ঠিক রুচিকর হবে কিনা এই রকম একটা দ্বন্দ্ব চলতে লাগল মনে মনে। তাই গতিটা হয়ে গেল মন্থর, কতকটা বেড়াতে বেড়াতে যাবার মতোই আস্তে আস্তে পথ চলতে লাগল। তবু, যত আস্তেই চলুক, এক সময় সেই বিশেষ রাস্তাটায় এসে পৌঁছল। এবার পা-টা যেন আরও ধীরে পড়তে লাগল, যা-হয় এখনই মন স্থির করতে হবে—যাবে না ফিরবে—আর সেই ভাবেই অন্যমনস্ক ভাবে বেড়াতে বেড়াতে এক সময় বিয়েবাড়িটার সামনে এসে পড়ল।

প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ি, ফুটপাথের ওপর পর্যন্ত লাল ভেলভেটের কানাত দিয়ে ঘেরা, ওপরে রসুনচৌকির ঘর, লোকজন, সমারোহ—সবটা গমগম করছে। ফুটপাথ ধরে চলছিল, কানাত-ঘেরা জায়গাটায় বাধা পেতে চেয়ে দেখতে হ'ল—বিয়েবাড়ি তাও বুঝল—এবং রাস্তায় নেমে ঘুরেও আসতে হ'ল। কিন্তু গতিটা বাড়ল না। সেই ভাবেই অতি ধীরে ধীরে—মানুষ উদ্দেশ্যহীন ভাবে বা অনিচ্ছায় যখন কোথাও যায় তখন যেভাবে চলে সেই ভাবেই বিয়েবাড়ির পর্দায় তৈরী ফটকটার সামনে এসে পড়ল। সেইখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন কর্মকর্তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় কর্মচারী গোছের দু-চারজন, তাঁরাই হঠাৎ 'আসুন আসুন' বলে যেন কলরব ক'রে উঠলেন, কোথা থেকে একটা একহালি বেল ফুলের মালা গলায়

এসে পড়ল, একটি ছেলে গোলাপজলের পিচকিরি দিয়ে মাথাটা প্রায় ভিজিয়ে দিলে এবং তারই মধ্যে একজন হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করলেন ভিতর দিকে। সবটা এমন অকস্মাৎ ঘটে গেল—এমন অতর্কিতে যে—ঘটনাটা কী ঘটছে ভাল ক'রে বোঝবারও সময় হ'ল না। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই, দু-তিনটে বড় বড় গাড়ি এসে থামল, সম্ভবত তা থেকে নামলেন সম্মানিত বরযাত্রীর দল, 'আসুন আসুন' 'আজ্ঞাজ্ঞে হোক' রব উঠল চারিদিকে, বাড়ির মধ্যে থেকে মোটা মোটা কর্মকর্তারা বেরিয়ে এলেন এবার অভ্যর্থনার জন্য, আর সেই গোলমাল গণ্ডগোল ভিড়ের মধ্যে কতকটা ঘটনার স্বাভাবিক স্রোতেই হেম গিয়ে পড়ল ভেতরের উঠানে—যেখানে চক-মেলানো ক'রে চেয়ার পাতা—আরও বহু নিমন্ত্রিত অভ্যাগত যেখানে বসে আছেন—সেইখানে। কতকটা অভিভূতের মতোই, তারই একখানাতে গিয়ে বসল সে।

যখন এই অনিবার্য গতি বন্ধ হ'ল—অর্থাৎ থিতিয়ে বসতে পারল তখনই প্রথম ব্যাপারটা কী ঘটল একটু ভেবে দেখবার অবসর মিলল ওর।

প্রথম যে অনুভূতিটা হ'ল ওর, সেটা কৌতুকের—মনে হ'ল এ তো মজা মন্দ হ'ল না—কোথায় যাচ্ছিল, কোথায় এসে পড়ল, এ যেন কোথা দিয়ে কী একটা হয়ে গেল। তার পর ভয় করতে লাগল। যদি কেউ চিনতে পারে, যদি কেউ এসে প্রশ্ন করে, 'আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন? কে আপনাকে নেমন্তন্ন করেছে?' যদি তাই নিয়ে কোন শোরগোল ওঠে, তখন সবাই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাইবে, সবাই দেবে ধিক্কার—সে বড় অপমান। অনেক সময় বিয়েবাড়িতে অনেক চুরিও হয়, তখন সবাইকে সনাক্ত করার চেষ্টা চলে—সেই সময়ই ধরা পড়ে যায়, কারা রবাহূত অথবা অনাহূত। যে অনিমন্ত্রিত এসেছে বলে ধরা পড়ে, তাকেই সবাই সেক্ষেত্রে চোর ভাবে—চোর না হলেও।

এই সেদিনই গোবিন্দ গল্প করছিল—ওর এক বন্ধুর বোনের বিয়েতে এক ছাদ লোক খেতে বসেছে, তার মধ্যে বন্ধুর মামা, দেখেই মন হয় খুব দুঁদে লোক—এসে একজনকে ধরলেন, 'আপনি কে মশাই, আপনাকে তো চিনলুম না! আপনি বরযাত্রী না কন্যাযাত্রী? ও বেয়াই মশাই, এদিকে আসুন তো—ইনি কি আপনাদের নিমন্ত্রিত কেউ? দেখুন তো ভাল ক'রে?' তার পর বরপক্ষের তিন-চারজনকে দিয়ে সনাক্ত করানো হয়ে গেলে তিনি কন্যাপক্ষকে ডাকলেন, 'ওহে ও ভবতারণ, এসো দিকি এদিকে—এঁকে কে নিমন্ত্রণ করেছে? চেনো নাকি এঁকে? অরুণ কোথায় গেল—অরুণ, তোমরা এঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলে? দেখ তো ভাল করে—'ইত্যাদি। সে এক হুলস্থুল কাণ্ড। তবে নাকি যে খেতে এসেছিল সে খুব চতুর—সে আসবার আগে সেই রাস্তাতেই আর একটা বিয়েবাড়ি দেখে এসেছিল—সে এক ডাক্তারের বাড়ি, দোরের বাইরে মার্বেলে নাম লেখা আছে—সুতরাং নাম জানবার কোন অসুবিধা নেই—সে বললে, 'কেন, এটা ডাঃ সামন্তর বাড়ি নয়? ডাকুন না তাঁদের কাউকে—' এই বলে অব্যাহতি পেয়ে গেল। তাও সে চলে যাবার সময় তাকেই শুনিয়েই মামা বললেন, 'ভাগ্যিস দোরের বাইরে নামটা দেখে এসেছিল—খুব পার পেয়ে গেল। তাও ভজাভজি করতে পারতুম,

কে আবার অত কাণ্ড করে—তাই ছেড়ে দিলুম। তা ব্যাটা চালাক খুব, দেখেছ, ভবতারণ, ফাঁদে পা দিলে না। ডাক্তারের নাম করলে না—তা হলেই চেপে ধরতুম, ডাক্তার তো মারা গিয়েছে—অনেকে আবার ঐ রকম ভুল ক'রে বসে। কিনা—ঠিক জানে না বলেই বললে তাদের কাউকে ডাকুন না। যা ব্যাটা যা—খুব বেঁচে গেলি।'

কন্যার বাবা ভবতারণবাবু নাকি বলেছিলেন মৃদু কণ্ঠে 'কেন দাদা এত কাণ্ড করলেন, বেচারী একপেট খেতেই তো এসেছিল। আমি বুঝেছিলুম, কিছু বলি নি।'

তাতে মামা জবাব দিয়েছিলেন, 'না হে বোঝ না—এদের মধ্যেই এমনি করেই সব চোর আসে। একবাড়ি লোক, চারদিকে জিনিস, যদি কিছু খোয়া যায়? তখন তো হায় হায় করবে!···না, না, ওসব মায়া করা কাজের কথা নয়। আর বুঝলেন প্রসাদবাবু, আমি যেন এই করতেই আছি। এই অপ্রিয় কাজটি আমাকেই করতে হয় চিরকাল। আর আমার চোখে কি ঠিক ধরাও পড়বে। মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারি যে—!'

কথাগুলো সব পর পর যেন বইয়ের পাতায় পড়বার মতো ক'রে মনে পড়ে যায় হেমের। নিমেষে এই মাঘ মাসের শীতেও ঘেমে ওঠে সে। সব কর্ম-বাড়িতেই ঐ রকম চৌকশ দু-চারজন লোক থাকে, এ তো বড়লোকের বাড়ি, বৃহৎ আয়োজন, বহু লোক—তার মধ্যে এ ধরনের অভিজ্ঞ লোকও হয়তো অনেক।···শেষে কি দারোয়ানের হাতে গলাধাক্কা খেয়ে বেরোতে হবে এখান থেকে?···তার চেয়ে সরে পড়াই ভাল এইবেলা, মানে মানে। কী করবে, 'একটু ঘুরে আসছি' বলে বেরিয়ে যাবে?···'না, আমাদের আর সব কই?' বলে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াবে—না সোজাসুজি 'ভুল হয়েছে, অন্য বাড়ি মনে ক'রে এসেছিলুম' বলে চলে যাবে সহমানে? তখন যদি আবার প্রশ্ন করে, 'কোন্ বাড়ি মনে করেছিলে'—তখন? এ পাড়ায় আর কোন বাড়িতে বিয়ে আছে কিনা তাও তো জানে না, বহুকাল পরে এ রাস্তায় পা দিয়েছে—তখন কী উত্তর দেবে?

কী করবে ভাবছে এমন সময় কে যেন এসে বললে, 'আপনারা দয়া ক'রে গা তুলুন, পাতা হয়েছে।' সবাই হৈ হৈ ক'রে উঠে পড়ল। হেমও 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' ভাবে উঠে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু সে আর বাইরের দিকে যেতে পারল না, চারিদিকের লোক যেন অপ্রতিহত বলে তাকে ভেতর দিকে ঠেলতে লাগল।

সকলেরই আগ্রহ ঐ দিকে। কে একজন যেন বললেন ওরই মধ্যে, 'সে কি হে—বর এসে পেঁছিবার আগেই বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে চলে যাব?' তাঁকে সবাই মিলে থামিয়ে দিল, 'নিন, নিন—এদের তো ছুটি দিতে হবে, বর যখন আসবে তখন থই থই করবে লোক, কজনকে বসাবে? না না, ও কাজ সেরে ফেলাই ভাল।' কে একজন বললে, 'ওহে এখনও যে ভাল ক'রে ক্ষিদেই হয় নি, রবিবারের বাজার—বেলায় খাওয়া হয়েছে।' তাকেও আবার কে থামিয়ে দিলে, 'নে নে—দুই খাওয়াই একসঙ্গে হজম হয়ে যাবে, শীতের বুড়ো রাত!'

এরই মধ্যে, প্রায় অনিচ্ছায়, হেম একসময় ছাদে গিয়ে পৌঁছয়। সিঁড়ির মুখে কে যেন বললে, 'ব্রাহ্মণরা দয়া ক'রে ঐদিকটায় যাবেন—।' সে কতকটা ভিড়ের চাপেই সেই দিকে ঘুরে গেল। ভিড় বেশ, তারই মধ্যে যতদূর সম্ভব আলসে ঘেঁষে অপেক্ষাকৃত অন্ধকারের দিকটায় গিয়ে বসল। লুচি বেগুন-ভাজা ছক্কা ডাল পাতে দেওয়াই ছিল, ওরা গিয়ে বসবার সঙ্গে সঙ্গে হুড়হুড় ক'রে পারিবেশকের দল বেরিয়ে পড়ল। তখন আর ইতস্তত করার বা পিছিয়ে যাবার সময় রইল না। অগত্যা লুচির গ্রাস মুখে তুলতে হ'ল। ঘাড় হেঁট ক'রে একমনে খেয়েই যেতে লাগল, তখন কতকটা মরীয়াও হয়ে উঠেছে—যদি অপমান হতেই হয় তো খেয়ে নিয়ে হওয়া ভাল, ঘাড়ধাক্কা খাবার আগে আশ মিটিয়ে খেয়ে নেওয়া যাক !

খেলোও প্রচুর। বহুদিনের মরা পেট, তবু প্রাণপণে আকণ্ঠ খেলো। পেটের অসুখ হয় হবে, না হয় কাল আর কিছু খাবেই না সারাদিন, তবু এসব সে ছাড়তে পারবে না। বড়লোকের বাড়ি, আয়োজনও সেই মাপে হয়েছে। এত রকমের খাবার এর আগে সে চোখে দেখে নি, অর্ধেকের ওপর খাবারের নামও জানে না। কেউ কেউ বলছে, 'ওহে এটা দাও', 'ওটা নিয়ে এস'—তখনও দেখে দেখে চিনছে কিন্তু মনে যে থাকবে না এসব নাম—সে বিষয়েও সে নিশ্চিত। মিষ্টিও হরেক রকমের, সন্দেশই তিন-চার রকম। কড়াপাক, আবারখাব, কাঁচাগোল্লা। দই ক্ষীর রাবড়ি। কিন্তু তখন আর একটি বোঁদের দানার স্থানও নেই পেটে—এসব আছে জানলে কি আর আগে অতগুলো কুমড়োকপি এঁচোড় আলুপটলের ডালনা মাছ মাংস খেত। নতুন এঁচোড় আর নতুন পটল—তাই মনে হয়েছে অমৃত ! মায়-খাস্তা কচুরি হালুয়া পর্যন্ত খেয়েছে একটু আগেই। এখন অনুশোচনায় ক্ষোভে চোখে জল আসতে লাগল। কে একজন তদ্বিরকারক এলেন শেষের দিকে, বিরাট জামিয়ার গায়ে দিয়ে, আঙ্গুলে হীরের আংটি এবং বুকে হীরের বোতাম —তাকে দেখেই হেমের বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। মনে পড়তে লাগল গোবিন্দর গল্পের সেই মামার কথা—কিন্তু তিনি সেসব দিক দিয়ে গেলেন না, 'কৈ হে কী রকম খাওয়ালে সব—এঁরা যে কিছুই খেলেন না। কী রকম রেঁধেছে ঠাকুররা—সব যে পাতে পড়ে রইল।··· কোন রকমে পেটটা ভরিয়ে নিন আপনারা। ···এ হে, কিছুই যে খেলে না তুমি ভাই !'—শেষেরটা সোজা হেমকেই।· কিন্তু ঘর্মাক্ত রুদ্ধনিঃশ্বাস হেম কোন জবাব দেবার আগেই কে একজন বলে উঠল, 'আর কত খাব বলুন হেঁ-হেঁ—কত রকম করেছেন···হেঁ হেঁ একটু একটু চাখতেই···হেঁ-হেঁ। না, ঠাকুররা আপনার রেঁধেছে খুব ভাল, কোন জিনিসটাই খারাপ হয় নি।'

'দই কেমন খেলে, দই ? কাঁসারিপাড়ার সরের দই ? বলেছি ব্যাটাকে, খেয়ে সব ভাল বললে দাম দেব—'

'ফার্স্ট ক্লাস স্যার, ফার্স্ট ক্লাস দই ! বহুকাল এমন দই খাই নি।'

'খাবে কোত্থেকে। এসব যে উঠেই গেল ক্রমশ। কে-ই বা এর কদর বোঝে, কে-ই বা এর দাম দেয় !' আর একজন বলে উঠলেন কৃতার্থভাবে।

কর্মকর্তা যথারীতি আরও দু-একবার হাত জোড় ক'রে কোনমতে পেটটা ভরিয়ে নিতে অনুরোধ জানিয়ে চলে গেলেন সেদিক থেকে। হেম হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। একছাদ লোক—বোধ হয় দু মহলের দুটো ছাদ বোঝাই লোক বসেছে—কে কাকে চেনে, কেই বা কার হিসেব রাখে! দাদার বন্ধুর বাড়ি আয়োজন সামান্য বলেই ধরতে পেরেছিলেন মামা।

এর পর এল সোনালী তবক দেওয়া পান। সবাই উঠে পড়ল হৈ হৈ ক'রে। আঁচাবার জায়গায় ভিড় দেখে দু-একজন রুমালে হাত মুছে বেরিয়ে এলেন। হেমও সেই পন্থা অনুসরণ করলে। রুমালখানায় বাড়ি গিয়ে সাবান দিলেই চলবে। তাড়াতাড়ি ভিড়ে গা ভাসিয়ে একেবারে বাইরে বেরোতে পারলে বাঁচে সে!

॥ ২ ॥

বুক ঢিপঢিপিনিটা বাড়ি এসেও ছিল। মাকে বলতে মা-ও প্রথমটা বললে, 'কাজটা ভাল করিস নি—কী দরকার বাপু, শেষে বে-ইজ্জৎ হওয়া একটা!' কিন্তু তার পরই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জেরা ক'রে বার বার শুনতে লাগল কী কী হয়েছিল এবং কোনটা কেমন হয়েছিল। প্রতিটি সুখাদ্যে যেন তার রসনা মানসস্বাদ গ্রহণ করতে লাগল সেই বার বার পুনরাবৃত্তিতে। শেষকালে অনেকক্ষণ ধরে শোনবার পর বললে, 'তা যা হোক্ বাপু, যা হয় ক'রে বিপদটা কেটে তো গেল। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে। বেশ হয়েছে। এমনি তো খাওয়া হ'ত না। আর এ তো বলতে গেলে ভগবান হাতে ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। এতে আর কী হয়েছে।'

তবু—তখনও পর্যন্ত, এমন কি বিছানাতে শুয়ে শুয়েও বার বার প্রতিজ্ঞা করলে হেম যে—এই নাক-কান মলা, এ কাজ আর নয়। কিন্তু পরের দিন, তার পরের দিন মনে মনে কথাটা যতই সে ভাবে, নানা সুঘ্রাণ-আহার্যের রসনাসুখকর স্মৃতির রোমন্থন করতে থাকে, ততই আবার লুব্ধ হয়ে ওঠে। শেষে দিনতিনেক যাবার পর মন স্থির ক'রে ফেলে—এই শনি-রবিবারও একবার বরাত ঠুকে দেখবে আর কোন এমনি বড়লোকের বাড়ি পাওয়া যায় কি না। বরং একটু দূরে থেকে দেখবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—যখন ভিড় বেশী হবে, বরযাত্রী কন্যাযাত্রীতে মাখামাখি—তখনই একফাঁকে ঢুকে পড়বে। বরযাত্রী মনে করবে কন্যাযাত্রী আর কন্যাযাত্রী মনে করবে বরযাত্রী। সেদিন বড় সকাল সকাল হয়ে গিয়েছিল।

মন স্থির করতে যা দেরি—তার পরই আগ্রহে অধীর হয়ে উঠল। আজকাল প্রায় প্রত্যহই অফিসের ফেরত বড় মাসীর বাড়ি ঘণ্টাখানেক ঘণ্টাদেড়েক কাটিয়ে যায়—সেখানে এতকাল থেকে গেছে—তাই সেটা কিছু অশোভন বা অস্বাভাবিকও দেখায় না। বড় মাসীর কাছ থেকে পাঁজিটা চেয়ে নিয়ে দেখলে রবিবার কোন 'বিয়ের দিন' নেই। শুক্রবার আর শনিবার আছে। প্রথমটা একটু দমে গিয়েছিল কিন্তু তার পরই মনে পড়ে গেল—বিয়ে না থাক রবিবার বৌভাত পড়বে অনেকগুলো।

এইভাবেই চলতে লাগল—সপ্তাহের পর সপ্তাহ। এক একটা রাস্তা ধরে

চলে—যেটা বড়লোকের বাড়ি মনে হয়, দূরে থেকে সামিয়ানা, বাড়ি ও অন্যান্য আয়োজন দেখে—ঢুকে পড়ে। ক্রমশঃ ভয় ভেঙে গেল, সাহস বাড়ল। দু-চার দিন যাবার পর সবার অলক্ষ্যে এক-আধটা সন্দেশ বা দরবেশ পকেটেও ফেলতে শুরু করল। সেজন্য বাড়তি রুমাল বা কাচা ন্যাকড়াও বাঁদিকের পকেটে রাখত, পকেটটা যাতে নষ্ট না হয়। সেগুলো মাকে এনে দিত ছোট ভাইয়ের নাম ক'রে। ভাল সন্দেশ বুঝলে শ্যামা তা থেকে একটু-আধটু নরেনকেও ভেঙে ভেঙে দিত।

একদিন এমনি এক রবিবারে একটা বড় রাস্তা দিয়ে চলছিল বিয়েবাড়ির খোঁজে —হঠাৎ দেখা হয়ে গেল শরতের সঙ্গে। হেম আস্তে আস্তেই হাঁটছিল—বেড়াতে বেড়াতে দেখতে দেখতে যাবার মতো ক'রে—জোরে হেঁটে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে বিয়ে-বাড়িতে যাওয়া যায় না—কিন্তু শরৎ আগে আগে আরও আস্তে আস্তে উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলছিল—তাই পিছন থেকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করতে করতে একসময় তাকে ধরে ফেলল।

এগিয়ে ঘুরে গিয়ে প্রণাম করতেই শরৎ থতমত খেয়ে দু পা পিছিয়ে একটু যেন অবাক হয়েই চেয়ে রইল ওর দিকে। প্রায় মিনিটখানেক সময় লাগল ওকে চিনতে। তার পরই খুশী হয়ে বললে, 'এই যে, এসো, এসো। ভাল তো?'

ওকে যে চিনতে দেরি লাগল তার কারণ ঠিক বিস্মৃতি নয়—হেম ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছে—অন্যমনস্কতা! কোথায় যেন কোন্‌ সুদূরে ওর মন নিবদ্ধ ছিল এতক্ষণ। এই পথ ধরে চললেও—এই পথ কেন, এর ধারে কাছে এমন কি এ জগতে ছিল কি না সন্দেহ। বহু দূরে থেকে ছড়ানো মনকে যেন কুড়িয়ে গুটিয়ে টেনে আনল সে।

আবারও বলল একবার—একটু থেমে, 'তার পর, সব ভাল তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি ভাল আছেন?'

'আমি?' একটু ম্লান হাসল শরৎ। উদাস করুণ এক রকমের হাসি।

তারপর পাল্‌টা প্রশ্ন করল, 'তোমার—তোমার ছোট মাসী আজকাল কোথায় থাকেন? কেমন আছেন? যাও মধ্যে মধ্যে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, যাই বৈকি! এই তো কাছেই আছেন—এই রামধন ঘোষের গলি। যাবেন নাকি? চলুন না।'

'ন্‌-না। থাক গে।'

একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই বলে শরৎ, অনিচ্ছার চেয়ে সংকোচই বেশী।

হেম চেপে ধরে, 'না কেন—এই তো। চলুন না একটু ঘুরে আসবেন। আমিও যাই নি অনেক দিন, আমারও খবর নেওয়া হবে।'

'কী আর হবে, খবর পেলাম—এই তো···অসুখ-বিসুখ করলে খবরও দিও। তা ছাড়া হয়তো এখনও বাড়ি ফেরেন নি।'

'আজ তো রবিবার, ছোট মাসী আজ বাড়িতেই আছে।'

'কেন—কোথাও যান না? তোমার বড় মাসীমা—হ্যাঁ, তোমার বড় মাসীমা

কেমন ? গোবিন্দর কি ছেলেপুলে ? সবাই একসঙ্গেই আছেন তো ?'

'না—সে তো অনেকদিন ছাড়াছাড়ি ।'

'কেন ? ছাড়াছাড়ি কেন ?'

'সে অনেক কাণ্ড । দাদার প্রথম পক্ষের বৌকে ছোট মাসীই এক রকম জোর ক'রে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছিল—সেখান থেকে ফেরার পথে ট্রেনেই কলেরা হয় ।··· তার পরই—মানে অল্পদিনের মধ্যেই দাদা আবার বিয়ে করে কি না—তাইতে ছোট মাসীর কী হ'ল, মানে সে বৌয়ের জন্যে—মোট কথা ঐ বিয়ে নিয়েই ছাড়াছাড়ি । দাদা যায়, বড় মাসীমাও যান—কিন্তু ছোট মাসী বিশেষ এ বাড়িতে আসে না । কখনও-সখনও কারুর অসুখ-বিসুখ করলে—'

'ও । তোমার ছোট মাসী তা হলে একাই আছেন ? তা চল না হয় যাই একবার । আমার নিজে নিজে হয়তো কোন দিনই যাওয়া হবে না ।'

'চলুন ।'

নিমন্ত্রণের খোঁজ আর করা হয় না । কিন্তু হেমের কেমন যেন মনে হয়, এটা ঢের ভাল হ'ল । যথার্থ একটা ভাল কাজ । ছোট মাসী বড় একা পড়ে গেছে আজকাল, বড় নিঃসঙ্গ—জীবনে বেচারীর কিছুই নেই আর, শুধু প্রাণধারণ আর প্রাণধারণের জন্যে পরিশ্রম । যদি—আশা করতেও অবশ্য ভরসা হয় না আর—যদি এই উপলক্ষে এরা দুজনে একটু কাছাকাছি আসে, ঘনিষ্ঠ না হোক, মেসোমশাই যদি আসা-যাওয়াও করে মধ্যে মধ্যে—তবু দুটো কথা কইবার লোক পায় ছোট মাসী ।

'তা কোথায়···মানে কার সঙ্গে আছেন তোমার ছোট মাসী ?' যেতে যেতেই প্রশ্ন করে শরৎ ।

'ওঁরই এক ছাত্রীর বাড়ি । তার অবশ্য বিয়ে-থা হয়ে গেছে—তবে সেই জানাশুনোতেই এঁদের এখানে ঘর পেয়েছেন । এঁরাও ব্রাহ্মণ—'

'ও । তা আমরা গেলে—মানে আমি গেলে কেউ কিছু বলবে না তো ?'

অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে, কেমন এক রকম ছেলেমানুষের মতোই প্রশ্ন করে শরৎ ।

'সে কি ! কে আবার কি বলবে ? আপনারই তো—'

'আপনারই তো সবচেয়ে বেশী অধিকার সেখানে যাবার'—বোধ হয় এইটেই বলতে চাইল হেম—লজ্জায় কথাটা শেষ করতে পারল না ।

সামান্য একটু হেঁটেই উমার বাড়ি পেঁছিল ওরা ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বহুক্ষণ, উমা আহ্নিক সেরে মারই পুরনো বড় মহাভারতখানা খুলে বসেছে সবে । বহুবারের পড়া—তবু আর কোন ভাল বইয়ের অভাবে তা-ই পড়ে মধ্যে মধ্যে । সপ্তাহের ছটা দিন মনে হয় বড় বেশী পরিশ্রম, আর পেরে ওঠা যাচ্ছে না, একটু বিশ্রাম পেলে ভাল হয়—অথচ রবিবারটাও বড় বেশী মন্থর, বড় বেশী কর্মহীন—দুঃসহ ঠেকে ।

হেমের গলা পেয়ে খুশী হয়েই উঠল উমা । ছোড়দির সম্বন্ধে যা-ই মনোভাব থাক, বোনপো বোনঝিদের সে পছন্দ করে । বিশেষ ক'রে হেম—দীর্ঘদিনের

ঘনিষ্ঠতায় বিশেষ স্নেহের পাত্র হয়ে উঠেছে।

শুধু হেম মনে ক'রে সাগ্রহে হলেও সহজ ভাবেই দোর খুলে দিয়েছিল উমা—কিন্তু হেমের পিছনে নতমুখে যে লোকটি দাঁড়িয়ে, তাকে দেখে চমকে উঠল সে। বরং বলা চলে ভূত দেখার মতোই চমকে উঠল। কারণ বহুকাল—বহু দীর্ঘকাল আসে নি শরৎ, পথেঘাটেও দেখা হয় নি।

আরও চমকে উঠল ওরা ঘরে ঢুকতে।

হ্যারিকেনের আলো, তবু তাতেই যা চোখে পড়ল তা-ই ঢের।

এ কী চেহারা হয়েছে শরতের! এ কি তার সেই স্বামী—শুধু যার চেহারার কথা শুনেই অগ্রপশ্চাৎ কিছু ভাবতে দেয় নি দিদি, কিছু খোঁজ করতে দেয় নি মাকে! সেই রূপবান কান্তিমান স্বামী তার!

উমার বিস্মিত, স্তম্ভিত দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে হেমও ভাল ক'রে—যেন নতুন ক'রে চেয়ে দেখল মেসোমশাইয়ের দিকে। সত্যি, এ কী বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে ওঁর! চুলগুলো প্রায় সব পেকে গেছে, গায়ের বিশেষত গলার চামড়া শুধু কুঁচকে যায় নি, রীতিমত ঝুলে পড়েছে, চোখের দৃষ্টিটাও হয়ে উঠেছে কেমন যেন ঘোলাটে বিবর্ণ!

বোধ হয় ওদের দৃষ্টিতে নীরব প্রশ্নটা ফুটে উঠেছিল, শরৎ একটু অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললে, 'কেমন আছ?'

ওর সেই প্রশ্নেই মনে হয় সংবিৎ ফিরে এল উমার, একটা হাসির ভঙ্গী ক'রে বলল, 'আমি আর খারাপ থাকব কেমন ক'রে। যমের অরুচি তো! কিন্তু তুমি তো বেশ কাজ সেরে এনেছ বলেই মনে হচ্ছে—এখন পা-পা ক'রে ঐ ঘাটের দিকে এগিয়ে গেলেই তো হয়!'

'তা আর হচ্ছে কৈ? তা হলে তো বেঁচেই যাই। সরকারী আইন না থাকলে সত্যিই পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতুম। আর বাঁচার শখ নেই—দরকারও নেই কিছু।'

একটু ম্লান হাসল শরৎ। তার পর বলল, 'একটা আসন-টাসন দাও—আর দাঁড়াতে পারছি না। আজকাল একটু হাঁটলেই হাঁটু দুটো কেমন ভেঙে আসে।'

'এই যে দিই—। তা তুমি ঐ বিছানাতেই বসো না।'

'না না। পথের কাপড়। মিছিমিছি তোমার পরিষ্কার বিছানাটা—।'

'তা বটে।' হেম ছিল বলে বাকী কথাটা মুখে এসেও আটকে গেল। 'কোন দিনই তো আমার বিছানাটা ছুঁলে না। পরিষ্কার শুদ্ধই রইল চিরকাল! ঐটের সম্বন্ধেই তোমার যত বিবেচনা!' এমনি অনেক কথাই গলার কাছ পর্যন্ত এসেছিল, বলা হ'ল না। সে তাড়াতাড়ি নিজে যে মাদুরটায় বসেছিল, সেইটেই এগিয়ে দিয়ে বললে, 'বসো না, দুজনেই বসতে পারবে।'

শরৎ বসল। মনে হ'ল যেন পা দুটো ভেঙে বসে পড়ল, যেন আর দাঁড়াতে পারছিল না। কে জানে কেন, ওর অবস্থা দেখে উমার আজ এই মুহূর্তে একটা অপরিসীম মমতা বোধ হ'ল। বড় বেচারা—বড় হতভাগা লোকটা। সে বিছানা থেকে নিজের বালিশটা নামিয়ে দিয়ে বলল, 'এইটের ঠেস দিয়ে ভাল ক'রে বসো।'

তার পর গলার কাছে ঠেলে-ওঠা একটা কি অবাধ্য বস্তুকে দমন করতে করতেই হেমের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'তার পর ? তোদের খবর কি ? তরুরা কেমন আছে ? পাঠিয়েছিল ওরা এর মধ্যে একবারও ? খেঁদি কোথায় ?'

'খেঁদি তরু সব শ্বশুরবাড়ি। সেই তো মুশকিল হয়েছে। বাবা যে ফিরে এসেছেন।'

'ফিরে এসেছেন—তার মানে ? তিনি তো আসেনই মধ্যে মধ্যে।'

'না। তা নয়। একেবারে পাকাপাকি। এখানেই আছেন। শরীর একেবারে গেছে তো। বোধ হয় এবার—। মা'র খুবই কষ্ট হচ্ছে, সংসারের সব কাজ—মা'র আবার আরও কতক বাড়তি কাজ আছে—সে তো তুমি জানই—তার ওপর বাবার সেবা। দিনের মধ্যে চোদ্দবার পুকুরে ডুব দিতে হচ্ছে!'

'বাবা, এমন ! একেবারে অশক্ত হয়ে পড়ে তবে বুঝি স্ত্রীপুত্রের কথা, বাড়ির কথা মনে পড়েছে। তা হলে ছোড়দির তো খুব চলছে। তা তুই এবার একটা বিয়ে-থা কর—বয়স তো পেরিয়ে গেল।'

উমা কথাটা শেষ করার আগেই—এর খোঁচাটা যে অন্যত্রও লাগতে পারে মনে পড়ায়—শরতের মুখের দিকে চাইল। সে তখন বালিশটা টেনে একটা হাঁটু উঁচু ক'রে আর একটা পা সেই উরুর ওপর তুলে আধশোয়া ক'রে বসেছে, দুটি চোখই তার বোজা—মুখেও কোন বেদনা বা আঘাতের চিহ্ন নেই, যেমন ভাবহীন থাকে সাধারণত প্রায় তেমনিই, শুধু লক্ষ্য ক'রে দেখে উমা—কপালে ওর বড় বেশী রেখা পড়েছে, যা পড়া উচিত তার চেয়ে যেন ঢের বেশী।

হেম ওদের দিকে অত লক্ষ্য করে নি—তার মনে নিজের ভবিষ্যতের প্রশ্নটাই সবচেয়ে বড়—সে হ্যারিকেনের দিকে চেয়ে ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠে বললে, 'হুঁ ! মা তো দিনরাত খ্যাচ্-খ্যাচ্ করছে, কিন্তু মাইনে তো ঐ, তার ওপর আবার খরচা বাড়ানো—। বড় ভয় করে। মাথার ওপর অসুমর দেনা, মা যে কোথা থেকে কবে কি শোধ করবে তা জানি না।'

'মা তো তোর ঐ ক'রেই করছে সব, যখন তোর মাইনে বলতে কিছু ছিল না, তখনও তো চালিয়েছে। তিনটে মেয়ের বিয়েও দিলে। তা ছাড়া দুটো পেট তো কমেও গেছে। তরু নেই, খেঁদি নেই—'

'তেমনি বাবা আছেন। তা নয়—। ভাবছি তাই।'

শরৎ কি তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'ল নাকি ?

উমা গলাটা অকারণেই ঈষৎ একটু উঁচু ক'রে বলে, 'কতক্ষণ বেরিয়েছিস বাড়ি থেকে ? খাবি কিছু ? ঘরে অবশ্য নারকোল নাড়ু আছে, কিন্তু—। খাবার আনাব ?'

প্রশ্নটা যথাস্থানেই পৌঁছয়। শরৎ এবার নড়েচড়ে বসে। বলে, 'আমার জন্যে কিছু আনিও না।'

'কিছুই খাবে না ? একটু মিষ্টি ?'

'না। মিষ্টি সহ্য হয় না। বড় অম্বল হয়। চা নেই তো ঘরে—না ?'

'ঘরে নেই—তবে বাড়িওয়ালাদের কাছে আছে। ওদের একটা উনুন জ্বলছেই দিনরাত, শুধু চায়ের জন্যে। ক'রে দিচ্ছি আমি।'

'না, না। থাক গে—আবার অত হাঙ্গামা করতে হবে না। পরের কাছে চেয়ে-চিন্তে—'

'তাতে কোন হাঙ্গামা নেই। ওরা চোদ্দবার চিনি চেয়ে নিয়ে যায় আমার কাছ থেকে। ওরাই ক'রে দেবে এখন—'

উমা ভেতরে যায়। দু কাপ চা চাই, আর ওদের কোন লোক যদি কখানা হিঙের কচুরি এনে দিতে পারে।

কিন্তু ইতিমধ্যে হেমেব মাথা খুলে যায়। সে হঠাৎ উঠে পড়ে বলে, 'আমি চট ক'রে একটু ঘুরে আসছি মেসোমশাই—যাব আর আসব। এই পাড়াতেই একটু কাজ আছে। এলুম যখন—'

শরৎ যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। একলা উমার সঙ্গে মুখোমুখি এই নির্জন ঘরে বসতে বোধ করি ভয়ই করে ওর। বলে, 'আরে ও কি, কোথায় যাবে? বসো না। আমিও তো উঠব—। তোমার মাসী হয়তো তোমার জন্যে খাবার আনতে গেল—'

'যাব আর আসব মেসোমশাই, পাঁচ মিনিটের মধ্যে।'

শরৎ আর কিছু বলবার আগেই বেরিয়ে যায় সে।

উমা যখন খাবার আর চা নিয়ে ফিরে আসে, তখন হেম নেই। শরৎ একা তেমনি চোখ বুজে বসে আছে।

'ও কি—হেম কোথা গেল?'

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুরে আসছি বলে কোথায় গেল। এই পাড়াতেই নাকি ওর কী কাজ আছে!'

'দ্যাখ দিকি, দুষ্টু ছেলে। চা-টা নষ্ট হবে।' উমা এই বয়সেও রাঙা হয়ে ওঠে কি?

'দুষ্টু—? ও!' শরৎও মুখ টিপে হাসে। লজ্জিত হাসি। তার পর বলে, 'নষ্ট হবে কেন, তুমি খাও না।'

'না। ও আমার সহ্য হয় না। খাই না যে একেবারে তা নয়, এদের পাল্লায় পড়ে সর্দি-কাশি হলে খেয়েছি—কিন্তু রাত্রে ঘুম হতে চায় না!'

'তা হোক। খাও একটু। একা খাব!'

শরৎ বাকী কাপটা ওর দিকে ঠেলে দেয়, হাতে তুলে দিতে বুঝি সংকোচে বাধে।

উমা অগত্যা কাপটা টেনে নেয়। হেমের জলখাবারের রেকাবিটা তক্তপোশের নীচে সরিয়ে রেখে শরতেরটা সামনে একটু ঠেলে দেয়। বলে, 'খাও। মিষ্টি নয়, হিঙের কচুরি। নারকোল নাড়ু একটা দিয়েছি, না খেতে চাও খেও না। ঘরে তৈরী ছিল, তাই—'

শরৎ নীরবে কচুরির থালা টেনে নেয়; চিবোতেও থাকে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে।

উমা চায়ে একটা চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করে, 'তোমার কী হয়েছে ? শরীর খারাপ ? অসুখ ধরিয়েছ নাকি ?'

'অসুখ ? না—তেমন কিছু নয়, মোটামুটি ভালই আছে শরীর। তবে খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম হচ্ছে তো। হোটেলের খাওয়া কোনকালে সয় না আমার, অথচ তাই খেতে হচ্ছে—দু বেলাই।'

'কেন ? তার—তার মানে ? হোটেলে কেন ?'

কণ্ঠটা বড় বেশী যেন তীক্ষ্ণ শোনায় উমার। সে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ে। যে প্রদেশে সে গিয়ে পড়ছে সেখানে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ।

শরৎ চায়ের পেয়ালায় একটু চুমুক দিয়ে, বেশ সহজ কণ্ঠেই বলে, 'গোলাপী মরে গেছে। ছেলেমেয়ে দুটো সুদ্ধ। এক রাত্তিরে তিনজনই গেল কলেরায়, শুধু আমারই কিছু হ'ল না। তার পর আর কি—এই !'

উমা উত্তর দিলে না। ওর বুকে যে তুমুল আলোড়ন উঠেছে, তাতে সহজ ভাবে কথা বলা আর সম্ভব নয়। রক্তের সে উত্তাল গতির শব্দ বাইরে থেকেও যেন কান পেতে শোনা যায়। সহস্র প্রশ্ন ঠেলাঠেলি করে মনের মধ্যে, সহস্র অভিমান, সহস্র অনুযোগ। কিন্তু কিছুই বলে না সে, বলতে পারে না। শুধু হাত দুটো বড় বেশী কাঁপতে শুরু হয় বলে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখে।

চা-টা শেষ ক'রে শরৎও কাপটা নামিয়ে রাখে। দুখানা কচুরি খেয়েছে, আর নারকোল নাড়ুটা। আরও দুখানা কচুরি পড়ে রইল, কিন্তু এখন আর ওর পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয় বুঝেই উমা অনুরোধ করল না। তা ছাড়া সেদিকে ওর দৃষ্টিও ঠিক পুরোটা ছিল না, মনও নয়। মন বহুদিনের ফেলে আসা দীর্ঘ মরুদিন-গুলিতে বিচরণ করছিল, বহু নালিশ, বহু হাহাকার, বহু ব্যর্থতা সেখানে।

অনেকক্ষণ পরে কথা কইতে পারল উমা। একটা ডেয়ো পিঁপড়ে ক্রমাগত চক্রাকারে আলোটার পাশে ঘুরছে, সেইদিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'তা আর কোথাও —মানে আর কোন আত্মীয়—'

'নাঃ। তেমন আর কে আছে। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে তো বহুকালই ছাড়াছাড়ি, কে কোথায় আছে তাও জানি না। তেমন পয়সা থাকলে তারাই হয়তো খবর পেয়ে এসে জুটত, তাও তো নেই। এখন আমার বোঝা বইবার মজুরি পোষাবে না !'

একটু হাসল সে। তার পর বলল, 'আরও কত দিন বাঁচতে হবে তাও তো বুঝতে পারছি না—নইলে সব বেচে কিনে দিয়ে কোন তীর্থে চলে যেতুম।... ছোট প্রেস, বেচতে গেলে তিন-চার হাজারের বেশি উঠবে না—সে টাকা সম্বল ক'রে কোথাও যাওয়া যায় না, ভরসা হয় না !'

আবারও কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

যে কথাটা গলার কাছে ঠেলাঠেলি করছে সেই থেকে—সেটা কিছুতেই বলতে পারে না, সে অনুরোধ করতে পারে না। অথচ লোকটার জন্য এ কী প্রবল অনুকম্পা বোধ করছে ও, এ কী অকারণ মমতা। এমন কি—সেই স্ত্রীলোকটার

মৃত্যুসংবাদও, এর দিকে চেয়ে যেন দুঃসংবাদ বলেই মনে হচ্ছে।

শরৎ আবারও যেন চোখ বুজে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ উঠে বসে বলে, 'হেম তো এল না। আমি তা হলে উঠি আজ—কী বল!'

আর না বললেই নয়! এ সুযোগ এবং সুবিধা কবে আসবে আবার কে জানে, আবার কত কাল পরে দেখা হবে!

মরীয়া হয়েই বলে ওঠে উমা, 'তা তোমার প্রেস তো এমন খুব বেশী দূরে নয়, এখান থেকে খেয়ে গেলেই তো হয়!'

'তোমার এখান থেকে?'

'হ্যাঁ? তাতে দোষ কি?'

'না, দোষ কিছু নেই। তবে তুমি একার মত যা হয় দুটি রাঁধ চুড়ুর-বুড়ুর—তার মধ্যে আমি আবার—।...মিছিমিছি তোমার ঝঞ্ঝাট বাড়ানো। থাক, আর কটা দিন দেখি। তার পর একেবারে শরীর ভেঙে গেলে তাই হয়তো এসে উঠতে হবে তোমার ছোড়্দির বরের মতো। বোনে বোনে তোমাদের বরাত কিন্তু বেশ!' হেসে বলল শেষের কথাগুলো, একটু ঠাট্টার সুরেই।

'না। তার বরাত আমার চেয়ে ঢের ভাল। সে ছেলেমেয়ে পেয়েছে, সংসার পেয়েছে, নিজের বাড়িঘর করতে পেরেছে। তার স্বামী পশু হোক, সে পশুকেও সে পেয়েছে, অন্তত কিছুদিনের জন্যে। আমি কি পেলুম?'

এতক্ষণের সমস্ত সংযমের ও সংকোচের বাঁধ বুঝি ভাঙে। চেষ্টা ক'রেও কথাগুলোকে বুঝি আটকাতে পারে না উমা।

শরতের মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে যায়, লজ্জায় অপমানে এবং হয়তো বা বেদনাতেও মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে আস্তে আস্তে বলে, 'মাপ কর। সত্যিই আমার অপরাধের সীমা নেই। কথাগুলো আমার আরও ভেবে বলা উচিত ছিল।'

সে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে গিয়ে পায়ে জুতোটা গলিয়ে একসময়, বাড়িরও বাইরে বেরিয়ে যায়।

উমা আর কিছুই বলতে পারে না। আটকাতেও পারে না ওকে। ব্যাকুলভাবে একবার ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু বাড়িতে আরও বহু লোক। ওদের কাছে অপরিচিত একটা পুরুষদের পিছু পিছু গিয়ে হাত ধরে বা মিনতি ক'রে টেনে আনা সম্ভব নয়।

এ কী করল ও, এ কী বলল! যা বলতে গিয়েছিল তার উল্টোটাই বলে বসল। এই সময় একটু সেবা, একটু সান্ত্বনা, একটু সাহচর্য দেবার জন্যই বুঝি মনটা উন্মুখ হয়ে ছিল, সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল মন—কিন্তু সে বার্তা তো ওর কথায় প্রকাশ পেল না, কঠোর নির্ঘাত আঘাতে সে তো সরিয়েই দিল আরও দূরে—

এ সময় যদি হেমটাও থাকত—

সব লজ্জা ত্যাগ ক'রে সে হেমকে দিয়ে ডেকে পাঠাত।

কিন্তু হেম আর এল না। তখনও নয়—তার পরেও নয়। সে রাতেই আর ফিরল না সে।

ওদের দীর্ঘ নিভৃত অবসর দিয়েই চলে গিয়েছিল—কিন্তু উমা সে অবসরকে কোন কাজেই লাগাতে পারল না। এতদিন ছিল আত্ম-অনুকম্পা আর দুর্জয় অভিমানের মধ্যে একটা আশ্রয়—অদৃষ্টের পরিহাসে সেটুকুও ঘুচে গিয়ে সে জায়গায় দেখা দিল অনুশোচনা।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

হেম বিয়ে করতে রাজী হয়েছে, কথাটা মহাশ্বেতা ও-বাড়ি থেকে ফেরবার পর আর কারুরই জানতে বাকী রইল না। বাকী থাকবার কথাও নয়—আনন্দের কথা, উল্লাসের কথা। গোপন করবারও কোন কারণ মনে পড়ে নি মহাশ্বেতার।

কিন্তু সে-রাত পোহাবার আগেই, কথাটা এত 'গাব্‌জাবার' জন্যে—তার অনুতাপের শেষ থাকে না। কে জানত যে মেজবৌয়ের একটি বোন হাতের কাছে যোগানো ছিল!

প্রমীলা সোজাসুজি বলে নি মহাকে, সাহসে কুলোয় নি বোধ হয়। কারণ মহাশ্বেতার মুখ আজকাল একটু একটু খুলছে, ইদানীং সে ওকে শুনিয়েই নানা কথা বলে, ওর প্রতি মনোভাব যে মহাশ্বেতার ভাল নয় সেটা কারুর কাছেই আর গোপন নেই। বিশেষত বড় আর ছোট হয়েছে এক-জোট। প্রমীলার প্রতি এতদিনের সমস্ত বিদ্বেষ তরলার প্রতি সহানুভূতি রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। ওকে উপলক্ষ ক'রে সে বিষ উদ্গার করার সুবিধা হয়েছে খুব—আর তরলাও যেন একমাত্র আশ্রয় হিসেবেই, তার বড় জাকে অবলম্বন করেছে।

সুতরাং সন্ধ্যাবেলা পুরুষরা অফিস থেকে ফিরতেই প্রমীলা কথাটা বলেছে অম্বিকাকে, অম্বিকা বলেছে দাদাকে।

অভয়পদ অবশ্য শুনে বলেছিল, 'তাই নাকি? তা তুমিই বলো না তোমার বৌদিকে!'

'না দাদা—তুমিই বলো। মেজ বৌ অতি-অবিশ্যি ক'রে বলে দিয়েছে।'

'বলছ,তা বলব ওকে। কিন্তু এ তো তোমার বা মেজবৌমারই বলবার কথা।'

আর কিছু বলে নি সে। শুধু ঈষৎ একটু ভ্রূ কুঁচকে—অভয়পদর পক্ষে সেইটাই অবশ্য যথেষ্টর বেশী—ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়েছিল। অম্বিকা সে দৃষ্টির সামনে সংকুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকেছে।

রাত্রে শুতে যাবার আগে অভয়পদ স্ত্রীর ঘরে এসে দাঁড়াল। স্ত্রীর ঘরই বলতে হয়—কারণ অভয় কোন দিনই সে ঘরে শোয় না। চলনে তার সেই অদ্বিতীয় কাঠের বেঞ্চিটিই এ জগতে বোধ হয় তার একমাত্র বাসা।

'কী গো, কি সমাচার। আজ যে এ ঘরে?' চিমটি কেটে বললে মহা।

অভয়পদ সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, 'হেম নাকি বিয়ে করতে রাজী

হয়েছে ? মা নাকি তোমায় মেয়ে দেখতে বলেছেন !'

'বাব্‌বা, এরই মধ্যে তোমার কাছে পর্যন্ত খবর পেঁছে গেছে ! আমিই তো বলব ভাবছিলুম। তা বেশ তো, দ্যাখ না—একটা ভাল-দেখে মেয়ে। বাবা বলে দিয়েছেন বেশ সদ্‌বংশের একটি মেয়ে দেখতে—'

অভয়পদ মুহূর্তকাল মৌন থেকে বললে, 'অম্বিকে বলছিল মেজ বৌমার নাকি একটি বোন আছে, আপন খুড়তুতো না জ্যাঠতুতো বোন—তাকে একবার দেখবার কথা !'

'কে ! কার কথা !' চাপা গলায় যত দূর ফেটে পড়া সম্ভব তাই পড়ে মহাশ্বেতা, 'মেজ বোয়ের বোন ! এই কথা পেড়েছে ওরা ? সাহস বটে, বলিহারি যাই ! আস্পদ্দা !'

অভয়পদর মুখে কোন বিস্ময় ফোটে না ; বরং বেশ যেন প্রশান্ত মুখেই প্রশ্ন করে, 'কেন এতে আর সাহসের কী আছে। তোমরা মেয়ে খুঁজছ—তাদের ঘরে আছে, এই তো !'

'হ্যাঁ—জেনেশুনে ঐ ঝাড়ের বাঁশ আমি বাপের বাড়িতে ঢোকাই ! আমার কি হায়া-পিত্তি সব ঘুচে গেছে ? ও বেউড় বাঁশের ঝাড়, ও রক্ত যেখানে আছে সেখানে কোন কাজ করব না আমি, করতে দেব না। এই আমার পষ্ট কথা। তা তুমি রাগই কর আর গোসাই কর !'

অভয়পদ মুচ্‌কি হাসে একটু, বলে, 'তুমি যেখান থেকে মেয়ে আনবে সে কোন্‌ ঝাড়ের হবে তা কী ক'রে জানছ ? বাইরে থেকে কার কতটুকু বোঝ ?'

'সে বরাতে যা আছে তা হবে। তাই বলে জেনেশুনে ঐ ডাকাত মেয়ের বোনকে—না সে আমি পারব না !'

'তা হলে এই কথাই আমি ব'লে দেব তো ?' একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে প্রশ্ন করে অভয়পদ।

'দাও না। তাতে কি হয়েছে ? আমি কি ভয় করি নাকি ? অত ভয় কিসের ? তোমার কাছে তোমার মেজ ভাই গুরু গোবিন্দ আর মেজ ভাজ মা গোঁসাই হতে পারে, আমার কাছে নয় !'

কথাটা সম্ভবত যথাযথই জানিয়েছিল অভয়পদ। ফলে মেজবৌ যাকে বলে 'নিজমূর্তি'-ধরা, তাই ধরলে। ঠিক মুখের ওপর বা স্পষ্ট ক'রে না বললেও, কারুরই আর বুঝতে বাকী রইল না যে এ সব শব্দভেদী বাণ কার উদ্দেশে বর্ষিত হচ্ছে।

ভোরবেলা হয়তো উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে দুর্গাপদকে উপলক্ষ ক'রে বলে, 'লোকে কথায় কথায় বলে বংশ। ভাল বংশ দেখে কাজ করতে হয়। ওসব আমি মানি না। এই যে আমার বড় জা, লোকে বলে বোকা—তা বোকাই বলুক আর যা-ই বলুক অমন নিপাট ভালমানুষ তো কই বড় একটা দেখা যায় না। মনে যা এল মুখে বলে ফেললে, কখনও রেখে-ঢেকে কথা কইতে জানে না। মন গঙ্গাজল। আর দ্যাখ কাজে কর্মে আহারে ব্যাভারে বাড়ির বড় বৌয়ের যেমন হওয়া উচিত

ঠিক তেমনি—নয় কি ? কিন্তু বংশ দেখতে গেলে কি ও মেয়ে আনা চলত ? তুমিই বল না ছোট্-ঠাকুরপো, গুরুজন—বলা অবিশ্যি উচিত নয়, গোমাম করি এইখান থেকেই—কী মানুষ বল তো ওর বাবা ? ঐ বাপের এই মেয়ে—ভাবাই যায় না। না, ওসব কিছু নয়, যাকে যেমন তৈরী করছেন ভগবান !'

সে কথা কানে যাওয়ার কোন অসুবিধে নেই। কারণ বড় বৌ হয়তো তখন রান্নাঘরে ডাল সাঁত্লাচ্ছে। সে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে, 'আমার বংশ ! আমার বংশের কথা কেউ যেন না মুখে আনে। বাবা যা-ই হোক, কত বড় গুরুবংশ আমাদের, দুশো আড়াইশো ঘর শিষ্য-যজমান ছিল ঠাকুরদার। কত লোক নিত্যি তাঁর পাদোকজল খেত। একজনকে দেখে বংশ বিচার করা যায় না।'

'আমিও তো তাই বলি ছোট্ ঠাকুরপো—একজনকে দেখে বংশ বিচার করা ঠিক নয়। কে কেমন তাও কেউ ঠিক ক'রে বলতে পারে না। ন্যাবা হলে মানুষ সব হলদে দেখে শুনেছি, কারুর ওপর কারুর রীষ থাকলে তার সব খারাপ দেখে। কিন্তু যথাধর্ম কার মনে কী আছে কেউ কি বলতে পারে ? ওপরটা দেখে বিচার করা চলে না।'

মহাশ্বেতা নিজের ফাঁদে নিজে আটকে পড়ে গজরায় শুধু—লাগসই জবাব একটাও খুঁজে পায় না।

কোন দিন হয়তো আঘাতটা একেবারে সোজা এসে লাগে—বল্লমের আঘাতের মতো।

'বলি আমি কার ঘরে কী আগুন লাগিয়েছি—কার ভাতারপুতকে ছিনিয়ে নিয়েছি যে আমার ঝাড়ে-বংশে সব খারাপ হয়ে গেল ? আমি কি কাউকে ভাঙিয়ে নিয়েছি কলিয়ে সলিয়ে ? আমি কারুর পেছনে ঘুরি ? আর কারুর পেছনে না ঘুরে যদি আমার পেছনেই কেউ ঘুরে মরে—সে কি আমার দোষ ?··· তোরা ভোলাতে পারিস না কেন ? আমি কি চেষ্টা ক'রে কাউকে ভোলাই ? · এটি মনে রেখো পুরুষ রূপেও ভোলে না বয়সেও ভোলে না—ভোলে গুণে। নিজেদের দোষ কেউ দেখতে পায় না—শুধু শুধু নিজের খামতি পরের দোষ বলে চালাতে চেষ্টা করে।'

এ আঘাত অবশ্য বড় বৌয়ের চেয়ে ছোট বৌকেই লাগে বেশী। সে এসে কান্নাকাটি করে বড় জায়ের কাছে, 'দিদি আপনারা তো দেখেশুনেই কালো বৌ আনলেন অমন সুন্দর পুরুষের জন্য—এখন আমাকে দোষ দিলে চলবে কেন ? এ তো ইচ্ছে ক'রে আমাকে জব্দ করা !'

আঘাত আসে তরলার ওপর অন্য দিক দিয়েও।

এর পর যেন আরও বাড়ায় প্রমীলা। ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে দুর্গাপদর সঙ্গে হাসিঠাট্টা গল্পগুজব বাড়িয়ে দেয়। আজকাল সন্ধ্যে থেকেই দুজনে ছাদে বসে থাকে,—রাত্রের রান্না মেজবৌ ছেড়েই দিয়েছে দীর্ঘকাল—একবার শুধু খেতে নামে, আবার উঠে যায়, রাত দেড়টা-দুটো পর্যন্ত বসে বসে গল্প করে।

'কিসের এত কথা ওদের, কিসের এত গল্প বলতে পারিস না ছোট বৌ ?

ফুসমন্তর ঝাড়ে বসে বসে—না কি ? নাকি গুণজ্ঞান ক'রে পাথর ক'রে বসিয়ে রাখে। আর তুক-গুণের কথা বলবই বা কি, বাড়িসুদ্ধ লোককেই তো গুণ ক'রে রেখে দিয়েছে। নইলে ভাসুর সোয়ামী শাশুড়ী সব বিদ্যমান থাকতে এমন বেলেল্লাগিরি ক'রে পার পেয়ে যায়—এ কখনও শুনি নি বাপু! তা ছাড়া শরীরেও তো কুলোয়! মেজবৌ না হয় সারা দুপুর ঠেসে ঘুমোয়—ওর এক রকম পুষিয়ে যায়—কিন্তু ছোট কর্তাকে তো সাতটায় ভাত খেতে বসতে হয়, ওর চলে কী ক'রে ?'...

ইদানীং—মহাশ্বেতা শিখিয়ে দেওয়াতেই—কিছুদিন ধরে দুর্গাপদ গিয়ে শোবার পর তরলা নেমে এসে ওর বিছানাতে বসে পা টিপে দিচ্ছিল। প্রথম প্রথম দু-চার দিন নিষেধ করলেও শেষ পর্যন্ত প্রবল বাধা কিছু দেয় নি। দু-চার দিন পরে নিষেধও করত না। ব্যাপারটা বেশ সহজেই মেনে নিয়েছিল। প্রত্যহই তরলা এসে নিঃশব্দে পা টিপতে বসত, পা টেপার মধ্যেই একসময় ঘুমিয়ে পড়ত দুর্গাপদ—ওর নিঃশ্বাসের শব্দে ঘুম গাঢ় হয়েছে বুঝতে পেরে তরলা ফিরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুত—এবং আরও বহুরাত্রি পর্যন্ত জেগে কাটাত।

কিন্তু মহাশ্বেতার সঙ্গে মেজবৌয়ের এই প্রত্যক্ষ বিরোধের পর দুর্গাপদ বহু রাত্রে ফেরে, তখন—সারাদিনের পরিশ্রমের ফলে—তরলার চোখের পাতা ভেসে আসে ঘুমে, এক-এক দিন টেরও পায় না কখন এসে শোয়। যদি বা ঘুম ভেঙে উঠে যায় অথবা জোর ক'রে চোখে জল দিয়ে জেগে থাকে—দুর্গা আর ওকে ছুঁতে দেয় না পা। বলে, 'ঢের হয়েছে, জুতো মেরে গরু দানে আর কাজ নেই! হেন কুকথা নেই যা আমার নামে তোমরা রটাচ্ছ না—আবার এ লোক-দেখানো পতিভক্তি কেন ? যাও শুয়ে পড় গে।'

তাতে তরলা হয়তো জবাব দেয়, 'আমি কি বলেছি কিছু, আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন ?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, কে বলছে আর কে কার পেছনে কলকাঠি নাড়ছে সব আমি জানি, থাক্। খবরদার আমার পায়ে হাত দিতে এলে এবার এমন কটু দিব্যি দেব যে টের পাবে মজা! দূর ক'রে দেব ঘর থেকে!'

লজ্জায় অপমানে ভয়ে কাঠ হয়ে যায় তরলা।

পরের দিন বড় জায়ের কাছে বলে, 'গত জন্মে কত পাপ করেছিলুম, কোন্ সতীলক্ষ্মীকে কী বঞ্চিত ক'রে এসেছিলুম তাই এ জন্মে সব পেয়েও বঞ্চিত হলুম। এমন ঘর বর গয়না কাপড়—এমন আপনার মতো জা, নির্বিরোধী শাশুড়ী—কটা মেয়ে পায় ? সব পেয়েও আমি আজ কাঙ্গাল। শুধু এই ভেবেই নিজের হাতে প্রাণটা বার করতে পারি না দিদি, নইলে উপায় সব জানি। বলে আত্মহত্যা মহাপাপ, সে জন্মের পাপের ফলে এই ভুগছি আবার মহাপাপ বাড়বে! শুধু সেই জন্যে পিছিয়ে আসি—ভাবি থাক, সব পাপের প্রায়শ্চিত যেন এই জন্মেই হয়ে যায়। কিন্তু আর সহ্য হচ্ছে না। আর পারছি না মাথার ঠিক রাখতে।'

'তা দিনকতক বাপের বাড়ি ঘুরে আয় না ছোট বৌ!'

'ছিঃ! তারা তো সবাই জানে—আমি না বললে কী হবে, জানতে কিছু কি বাকী আছে?··· সে বাড়িতে পা দেব কোন্ মুখে। সবাই আহা-উহু করবে, দয়ার চোখে দেখবে—সে আরও বেশী অসহ্য। তা ছাড়া তারা তো কিছু কম করে নি—যথাসাধ্য খরচ ক'রেই বিয়ে দিয়েছে—তার ওপর তাদের ঘাড়ে চাপব! বাপ-মা'র জ্বালার ওপর জ্বালা! আর বিয়ের পর বাপের বাড়ি পড়ে থাকা মানেই ঝি হয়ে থাকা। শ্বশুরবাড়িতে সব সহ্য করা যায়—এতকাল আদরের পর বাপের বাড়িতে হেনস্তা হলে বড় অসহ্য লাগে দিদি। না, যদি বেরোতে হয় তো মরাই বেরোব।'

'বাপ রে! অমন কথা বলিস নি। আমি বলছি,—তুই সতীলক্ষ্মী মেয়ে, তোর হক্ তুই একদিন ফিরে পাবিই! দুটো দিন সবুর কর।'

॥ ২ ॥

কথাগুলো যখন বলেছিল মহাশ্বেতা তখন তা যে এত শিগ্‌গির ফলে যাবে, তা বোধ হয় সে নিজেও আশা করে নি।

আর এমন মর্মান্তিক ভাবেই ফলল।

মর্মান্তিক বৈকি! মেজ বৌ অন্য সব ব্যাপারে যতই মহার ওপরে টেক্কা দিক, একটা ব্যাপারে মহাই তাকে টেক্কা দিয়েছে। সন্তান বলতে এ বাড়িতে যা কিছু মহাশ্বেতারই। প্রমীলার একটি মেয়ে হয়ে বহুদিন আগে মরে গিয়েছিল—আর কিছুই হয় নি। হবেও না আর—তাই সকলে জানত। মহাশ্বেতা সগর্বে বুক ফুলিয়ে বলত সবাইকে, 'মন্দর মত গাছে চড়লে কী জলে ঝাঁপাই-ঝুড়লে মন্দই হয়ে যায়—বুঝলি। সব তাইতে হামবড়া, কত্তামি। তাই ভগবান বললে কত্তামি নিয়েই থাক, তোকে আর গিন্নেমো করতে হবে না। ওর তো আগাগোড়া বাঁজা মেয়েমানুষের লক্ষণ, একটা হয়েছিল কি ক'রে তাই ভাবি।··· সে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে—আর নয়, এটি জেনে রেখো!'

কিন্তু নজব পড়ল মহাশ্বেতারই।

কিছুদিন ধরেই খেয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে চলে যায় মেজবৌ। কেন যায় অত কেউই মাথা ঘামায় নি, হঠাৎ একদিন মহার বড় ছেলেটা বললে, 'মা জান —মেজকাকী রোজ খেয়ে উঠেই বমি করে!'

'তাই নাকি, কে বললে বে।'

'আমি দেখেছি, যা খায় বমি ক'বে আসে। সকালে আজকাল কিছু খেতে চায় না দেখ না? খেয়েই বমি করতে হয় যে।···মেজকাকী বাঁচবে—হ্যাঁ মা?'

মহাশ্বেতা এখন আর এসব ব্যাপারে অনভিজ্ঞ নেই।

সেদিন দুপুরে রান্নাঘরে তিন জায়ে খেতে বসেছে, ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করছে মেজবৌ—হঠাৎ মহার মনে পড়ে যায় কথাটা।

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে মেজবৌয়ের মুখের দিকে। চোখের কোলে কালি পড়েছে, মুখের চেহারাটাও যেন কেমন কেমন।

'হ্যাঁলা মেজবৌ—তোর রকম-সকম তো ভাল বোধ হচ্ছে না !'

'সে তো তোমার কোন দিনই ভাল বোধ হয় না দিদি !'

'নে রঙ্গ রাখ।...দেখি জামাটা খোল তো--'

এবার মেজবৌও লজ্জিত হয়, 'কী যে বল দিদি তার ঠিক নেই।'

'ওমা তা এখানে আবার লজ্জা কি, পুরুষ তো কেউ নেই। আর তোর কি এখনও লজ্জার বয়স আছে ?'

'যাও! দেখবেই বা কি! তোমার বুঝি এখন জ্ঞানবুদ্ধি খুব হয়েছে? নিজে তো এককালে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছিলে মরে যাচ্ছি বলে—'

'ও। তাই বল! তা হলে মেজকত্তার য়্যাদ্দিন পরে জলপিণ্ডির ব্যবস্থা হচ্ছে! আজ আসুক মেজকর্তা বাড়িতে—সন্দেশ আদায় না ক'রে ছাড়ছি না। ভোদা গয়লার দোকানে অর্ডার দেওয়া রাজভোগ খাওয়াতে হবে।'

'নাও। নাও। ওসব বলো না খবরদার। বুড়ো বয়েসে—লজ্জা করে।'

'লজ্জা আবার কি লা! তোর যেমন কথা। এ তো আনন্দের খবর।'

কথাটা বলতে বলতেই কিন্তু যেন মহাশ্বেতা গম্ভীর হয়ে ওঠে। পরাজয় তো বটেই—সেই সঙ্গে যেন কতকটা আশাভঙ্গও। স্বামী যে যথাসর্বস্ব মেজ ভাইয়ের হাতে তুলে দিচ্ছে তার তবু একটা সান্ত্বনা এত দিন ছিল যে—হয়তো এ যা-কিছু একদিন তার ছেলেরাই পাবে।

তবু—মনে মনে যতই পরাজয়ের গ্লানি এবং আশাভঙ্গের বেদনা বোধ করুক, শিশু-সুলভ কৌতুকবোধ ওকে বেশীক্ষণ চুপ ক'রে থাকতে দেয় না। কথাটা বিকেলের মধ্যেই শাশুড়ীর কানে ওঠে, তিনি বলেন, 'ওমা তাই নাকি?' ষাট ষাট। আজ বাপু তা হলে বড় বৌমা পাঁচ পয়সার বাতাসা আনিও, সন্ধ্যেবেলা হরির নোট দিতে হবে। খবরটা যখন আজই কানে পেঁছিল—'

'কী যে বলেন মা। পাঁচ পয়সার বাতাসা কি। এমন একটা শুভ খবর! অন্তত সওয়া পাঁচ আনা বলুন। উচিত তো পাঁচ সিকের দেওয়া।'

'তা না হয় সওয়া পাঁচ আনাই আনিও। কে জানে বাপু, পাঁচ পয়সার বাতাসাই তো জানি ঢের। বরাবর আমাদের হরির নোট হলে—'

'বরাবর কজন লোক ছিল মা! এখন ঘেটের বাড়িতেই কতজন লোক।'

'তা দ্যাখ বাপু যা ভাল বোঝ!'

মেজকর্তা আসতেও আর এক চোট চোঁচামেচি হয়। বড়বৌ দু হাতে পথ আগলে দাঁড়ায়, 'উঁহু—তা হবে না! আজ সটে-পটে ধরেছি—সন্দেশ আর রাজভোগ নিয়ে এলে তবে বাড়ি ঢুকতে পারবে। ডুবে ডুবে জল খাওয়া—ভাবো যে শিবের বাবাও টের পাবে না—না?'

'নাও, আজ আবার এ কী মূর্তি! বলি—হ'ল কি এত সন্দেশ খাওয়াবার মতো?'

'কী আবার হবে—জলগণ্ডুষের ছল! উঃ, কী চাপতেই পার মাইরি! সত্যি সত্যি আমি ছাড়ব না বলে দিলুম, আমাকে চেনো নি!'

অম্বিকাপদর মুখেও সলজ্জ হাসি ফোটে।

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। আজ এখনই কি ক'রে হয়। মাস-কাবার হোক। কোথায় কি তার ঠিক নেই—'

'তা শুনছি না বাপু। নিদেন এখন যা আছে পকেটে বার কর তো।'

সত্যি-সত্যিই পকেট ঘেঁটে সাড়ে তেরো আনা পয়সা বার ক'রে নেয় মহাশ্বেতা। বড় ছেলেকে খটির বাজারে পাঠায় গরম রসগোল্লা আনতে।

এত চেঁচামেচি দুর্গাপদর কানে না পেঁছানোর কথা নয়।

সে যেন একটু অবাকই হয়ে যায়।

বার বার তাকায় মেজ বৌয়ের দিকে। কথাটার সত্যাসত্য যাচাই করতে চায়। কিন্তু একবারও চোখে চোখ পড়ে না দুজনের। মেজবৌ যেন সযত্নেই এড়িয়ে চলে দুর্গাপদর চোখ।

অন্য দিন সন্ধ্যার পরই ছাদে যায় দুজন। আজ প্রমীলা গিয়ে দেখে তখনও দুর্গাপদর দেখা নেই। তার ওপর নীচে থেকে বড় বৌ হেঁকে বলে, 'ওলো ও মেজ বৌ, খোঁপায় খড়কে কাঠি গুঁজেছিস তো? তোদের তো ভয়ডর নেই— আমরা মরি যে বুক কেঁপে। তা ছাড়া, এখনই তো তোর ভাসুর হরির নোট দেবে—সেরে একেবারে টং-এ উঠলে হ'ত না।'

প্রমীলা তরতর ক রে নেমে আসে।

'ও কী হচ্ছে দিদি! বট্‌ঠাকুর বাড়ি এসেছেন, ও কী চেঁচামেচি হচ্ছে! কী মনে করছেন বল তো!'

'কী আবার মনে করবেন। ভাইয়ের বংশরক্ষে হচ্ছে এই মনে করছেন!'

গলা কিছুমাত্র চাপবার চেষ্টা না ক'রেই হাসতে হাসতে জবাব দেয় সে। বেগতিক দেখে প্রমীলা আর বেশী ঘাঁটায় না, তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে।

দুজনে দেখা হয় একেবারে রাত্রে খাওয়ার পর।

দুর্গাপদ একটু দেরি ক'রেই দাঁত খুঁটতে খুঁটতে ছাদে ওঠে।

'কি ব্যাপার গো, ছোটবাবুর আজ যে দেখাই নেই!'

দুর্গাপদ তখনই কোন জবাব দেয় না। ধীরে সুস্থে, দাঁতে খড়কে দেওয়া শেষ হলে খড়কেটা ফেলে দিয়ে একেবারে সোজাসুজি প্রশ্ন করে, 'কৈ, এসব কথা আমাকে বল নি তো এক দিনও—'

'কী কথা? ও, নাও। এ আবার কি একটা বলবার মতো কথা! বুড়ো বয়েসে—'

'বুড়ো বয়সে হতে পারে—বলতেই যত লজ্জা!'

'আর কীই বা বলব! বা রে, এসব কথা বুঝি মুখ ফুটে বলে কেউ নিজে নিজে! জানি—জানতে তো পারবেই—'

'হুঁ।' দুর্গাপদ ট্যাঁক থেকে নস্যির কৌটোটা বার করে।

'কী হ'ল—আজ যে মনটা ভার-ভার? এই খবরেই নাকি?'

'হওয়া তো উচিত।'
'কেন? বা রে। এর সঙ্গে তোমার কি?'
'না—তাই ভাবছি!'
'কী ভাবছ তাই তো শুনতে চাইছি।'
'শুনে লাভ কি!'
'তবু—'
'ভাবছি সবাই তো দিন কিনে নিলে। আমিই বোকা—চিরদিন যাত্রার বাইরেই রইলুম, আসরে ঢোকা আর হ'ল না।'
'থাকছ কেন। আসরে ঢুকতে কে বারণ করেছে? দিন কিনে নিতেই বা কে আটকে রেখেছে?' তীক্ষ্ম কণ্ঠে প্রশ্ন করে প্রমীলা।
দুর্গাপদ নীরবে বসে নস্যি নেয়।
'কী, উত্তর দিলে না যে?'
'উঠি। ঘুম পাচ্ছে।' দুর্গাপদ সত্যিই উঠে দাঁড়ায়।
'ও আবার কী। সে কি কথা? এরই মধ্যে?' প্রমীলা ওর কোঁচাটা চেপে ধরে।
কোঁচাটা এক রকম জোর ক'রেই ছাড়িয়ে নেয় দুর্গাপদ। ধীর ও নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে, 'বড় বৌদি ঠিকই বলছিলেন—এ অবস্থায় এত রাত্রে ছাদে ওঠা তোমার ঠিক নয়। পেটে যেটা এসেছে—নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তুমি আর এসো না রাত্তির বেলা—'
'আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি ছোট বৌয়ের আঁচলের তলায় ঢোক গে যাও!' রাগ ক'রে বলে ওঠে প্রমীলা।
দুর্গাপদ এ আক্রমণেও বিচলিত হয় না। বরং ধীরে সুস্থে ছাদ থেকে নামবারই উদ্যোগ করে।
• এবার প্রমীলা এসে দু হাত দু দিকের কাঠে দিয়ে দরজা আটকে দাঁড়ায়।
'ও কী হচ্ছে ছেলেমানুষি। বসবে চল। এরই মধ্যে নামতে হবে না!'
অন্ধকার—তবু উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলোতে মোটামুটি নজর চলে একটা। বড় সাংঘাতিক কটাক্ষ মেজবৌয়ের চোখে। অগত্যা দুর্গাপদকে ফিরে গিয়ে বসতে হয়।
কিন্তু প্রমীলা বুঝতে পারে যে তার এ বিজয় ক্ষণস্থায়ী। ওদের আড্ডা আর জমবে না আজ। একথা সেকথার পর—এবং সে কথাও বড় শুষ্ক, বড় প্রাণহীণ, বড়ই জোর ক'রে বলা—গোটাকতক হাই তুলে দুর্গাপদ আবারও উঠে পড়ে হঠাৎ এক সময়।
'শরীরটা ভাল নেই, বড় ঘুম পাচ্ছে আজ!' কৈফিয়ত স্বরূপ বলে সে।
কিন্তু প্রমীলা সে কৈফিয়তের জবাব দেয় না। বাধাও দেয় না আর। কাঠ হয়ে বসে থাকে শুধু।

দুর্গাপদ যখন নিজের ঘরে এল তখন তরলা বসে হ্যারিকেনের আলোতে—

ওদের বাড়ির অদ্বিতীয় বই—পুরনো রামায়ণটা পড়ছে। অসময়ে এত সকাল সকাল স্বামীকে ফিরতে দেখে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয় সে। স্থানকালপাত্র সব ভুলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে।

সে দৃষ্টির সামনে কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়ে দুর্গাপদ। আপন মনেই 'শরীরটা ভাল নেই' বলে মাদুরের দিকে হাত বাড়ায়। তরলা তাড়াতাড়ি উঠে এসে নির্দিষ্ট স্থানে মাদুরটা পেতে দেয়, বালিশ এনে সাজিয়ে দেয়—তার পর তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে নিজের বিছানায় এসে শোয়।

বার বার 'ঘুম পেয়েছে' বলে নেমে আসা সত্ত্বেও দুর্গাপদর চোখে কিন্তু ঘুম নামে না। বার-বারই এপাশ ওপাশ করে। 'উঁ-আঁ'-ও করে মধ্যে মধ্যে।

শেষ পর্যন্ত তরলার আর স্থির থাকা সম্ভব হয় না। নেমে এসে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে, 'পা টিপে দেব ?'

এতকাল পরে 'দাও' বলতে সংকোচে বাধে। কিন্তু নিষেধও করে না। সেইটেই সম্মতি বলে ধরে নিয়ে তরলা পা টিপতে বসে।

অনেকক্ষণ পরে স্থির হয়ে আসে দুর্গাপদ, সেই নিথর ভাবটাকেই ঘুম বলে ধরে নিয়ে তরলা আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে নিজের বিছানায় শোয়। বহুদিন পরে এইটুকু সাহচর্য লাভ ক'রেই তার তৃপ্তি হয় বুঝি খানিকটা। আজ তারও তন্দ্রা আসে তাড়াতাড়ি।

কিন্তু একটু পরেই হঠাৎ কার একটা হাত গায়ে লাগতেই ভয়ে অস্ফুস্ট একটা শব্দ ক'রে চমকে উঠে বসে।

'ভয় নেই, ভয় নেই, আমি!' চাপা গলায় বলে দুর্গাপদ। সে বিছানার এক পাশে এসে বসেই বোধ করি ওকে ঠেলেছে।

শুধু চাপা নয়, অস্বাভাবিক কোমলও শোনায় ওর কণ্ঠস্বর।

শরীরটা বড্ড ভার-ভার লাগছে, গা-হাত-পা কামড়াচ্ছেও খুব। মেঝেয় শুতে সাহস হচ্ছে না ঠিক। ভাবছি এখানেই—'

'না, না। আপনি এখানেই শুয়ে পড়ুন। আমি বালিশ এনে দিচ্ছি।'

সে উঠে তাড়াতাড়ি দুর্গাপদর বালিশ দুটো এনে দেয়। তার পর নিজের বালিশটা টেনে নিয়ে মেঝেয় শোবার উপক্রম করতেই দুর্গাপদ খপ্ ক'রে ওর একটা হাত ধরে ফেলে।

'না, না। তুমি মেঝেয় শুচ্ছ কেন। এইখানেই তো ঢের জায়গা রয়েছে, শোও না।'

থর থর করে কেঁপে ওঠে তরলা। সেই হাতটা যেন অবশ হয়ে আসে।

'না, না। আপনার অসুবিধা হবে হয়তো—' অতি কষ্টে বলে শেষ পর্যন্ত।

'কিচ্ছু অসুবিধা হবে না। এ তো দুজনের মতোই বিছানা।...তা ছাড়া তোমার অভ্যেস নেই, মেঝেয় শুলে তোমার শরীর খারাপ হবে। এখানেই শোও।'

শেষের দুটি কথা আদেশের মতোই শোনায়।

অগত্যা বালিশটা যথাস্থানে রেখে কোনমতে গুটিসুটি মেরে একেবারে

ঘেঁষে শোয় তরলা —মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রেখে।

শোয়—কিন্তু আর তন্দ্রা আসে না চোখে; এইটুকু অধিকার লাভকেই অচিন্তিত-পূর্ব সৌভাগ্য বলে মনে হয়। বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়তে থাকে। জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে থাকার জন্যেই বোধ হয়—ঘেমে নেয়ে ওঠে।

মনে হয় দুর্গাপদও জেগে আছে। বিঘতখানেক মাত্র ব্যবধান সুতরাং নিশ্বাসের শব্দ তো বোঝা যায়ই—সামান্য মাত্র নড়াচড়াও অনুভব করা যায়।

খানিক পরে—বোধ হয় মিনিট-পনেরো পরে হঠাৎ দুর্গাপদর একটা হাত ওর গায়ে এসে পড়ে।

'এত জায়গা থাকতে অমন গুটিসুটি মেরে শুয়েছ কেন ?···অমন ক'রে শুয়ে কেউ ঘুমোতে পারে ? ভাল হয়ে শোও, নইলে আমার মনে হবে যে আমি তোমার অসুবিধে করলুম—আমার জন্যেই তোমার ঘুম হচ্ছে না।'

আজ কি তরলার মাথা খারাপ হয়ে গেল ? না সে অসুস্থ হয়ে প্রলাপের ঘোরে এসব শুনছে ?

অদ্ভুত বিচিত্র ওর মনের গতি। সে এখন প্রাণপণে মনে করবার চেষ্টা করে আজ সকালে উঠে কার মুখ দেখেছিল। দিদির—না তার ছোট ছেলেটার ? না, বোধ হয় স্বামীরই—কিন্তু সে তো ঘুমন্ত মুখ···

দুর্গাপদর হাত ওকে সামান্য আকর্ষণ করে নিজের দিকে।

সে হাত ক্রমে যেন ওর দেহের অত্যন্ত নিভৃত, অত্যন্ত কোমল প্রদেশে পেঁছয়।

'ইস, কী ঘেমেছ। দ্যাখ দিকি—এই গরমে এমন ক'রে গায়ে কাপড় জড়িয়ে এতটুকু হয়ে শুলে ঘামবে না ! এদিকে এসো এদিকে এসো—ভাল ক'রে শোও !'

এবার আর তরলা স্থির থাকতে পারে না।

তার এতকালের সমস্ত বেদনা ক্ষোভ অভিমান অশ্রুর বন্যায় বেরিয়ে আসতে চায়। দুর্গাপদর সবল আকর্ষণে তার বুকের মধ্যে এসে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

'নাও। এ আবার কী কাণ্ড। কান্নাটান্না থামাও বাপু। আমি আবার এসব ছিঁচ-কাঁদুনেপনা দেখতে পারি না। কান্নার হয়েছে কি ?'

তার পর একটু বিব্রত, একটু অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'বাতাস করব ? খুব গরম হচ্ছে ?'

ততক্ষণে ওর হাত তরলার সুপুষ্ট, সুগঠিত, যৌবন-প্রস্ফুটিত দেহ যেন লেহন করতে থাকে। সে স্পর্শে ও আকর্ষণে তরলা অর্ধমূর্ছিতের মতো পড়ে থাকে। এইটুকুর জন্যই হয়তো সে সেই বিবাহের দিন থেকে বা সে-সম্ভাবনা থেকেই বুভুক্ষু ছিল—কিন্তু বিধাতা সে সাধনার বস্তু যখন অপ্রত্যাশিত ভাবেই দিলেন, তখন তা উপলব্ধি করারও যেন অবস্থা রইল না। বহু পরস্পর-বিরোধী আবেগের সংঘাতে শুধু দেহ নয়, মনটাও যেন অনড় অবশ হয়ে রইল।

দুর্গাপদ তাকে আরও কাছে টেনে নেয়। আরও নিবিড় হয়ে ওঠে তার বাহুবন্ধন—

পরের দিন ভোরবেলা দোর খুলে বেরোতেই প্রথম যার সঙ্গে তরলার চোখোচোখি হ'ল—সে প্রমীলা।

দোতলায় দালানের কোণে নীচের সিঁড়িতে নামবার মুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—এই দিকেই চেয়ে। তরলা আর একটু কাছে আসতে যেন সাপের মতো হিস্ হিস্ ক'রে ওঠে, 'তোকে এমন ঝোড়ো কাকের মতো দেখাচ্ছে কেন লা ছুট্কী—রাত্তিরে ঘুম হয় নি বুঝি ?'

তরলাও মেয়েরই জাত। সাধারণত এদের কাছে মাথা হেঁট ক'রেই থাকে সে, কথার ঘা দেওয়া অভ্যাস নেই তার ; কিন্তু আজ বোধ করি বহু দিনের বহু বেদনাই তার কণ্ঠে বিষ যোগায়। সে শান্ত ভাবেই জবাব দেয়, 'না মেজদি, আমার ঘুম যেমন হওয়া উচিত তেমনিই হয়েছে, কিন্তু আপনি এত সকালে উঠেছেন যে ? আপনার রাত্তিরে ঘুম হয়েছিল তো ? না কি সারারাত আমার ভাবনা ভেবেই কাটিয়ে দিলেন ?'

এবার আর প্রমীলা কণ্ঠের বিষ ঢাকবারও চেষ্টা করে না। বলে, 'বাঃ, কথা ফুটেছে যে। তাই তো বলি পাখি কিসের টানে দাঁড়ে ফির্ল। ভাল মানুষ ছোটবোয়েরও বাড়ির হাওয়া লেগেছে তা হলে !'

তরলা কিন্তু আর কথা বাড়ায় না। তার মন তখন—পরিপূর্ণ না হোক অনেকখানি তৃপ্তিতে ভরে আছে। পাওনার মাধুর্যটা যে পুরোপুরি মধুর হতে পারে নি তার কারণ এই স্ত্রীলোকটারই বিষস্মৃতি তার সঙ্গে মিশিয়ে ছিল বলে। তবু—যেটুকু পেয়েছে সেইটুকুই সে আপন মনে রোমন্থন ক'রে ভোগ করতে চায় আজ—যে প্রসন্নতার আমেজ থাকলে তা সম্ভব, সেটা এখন এর সঙ্গে কথা কাটা—কাটি করলে থাকবে না, বিষ উঠবে আকণ্ঠ ফেনিয়ে।

সে প্রমীলার পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

অবশেষে মহাশ্বেতাই একটি পাত্রী খুঁজে বার করে। ওর শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কেই—জাঠতুতো ভাসুরের মেয়ের ননদ। জানাশুনা ঘর, মেয়েটিও নাকি ভাল। ভাসুরঝি লীলা তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ একেবারে—কাজে কর্মে বিবেচনায় ব্যবহারে—সব দিক দিয়েই নাকি ঘরে আনবার মতো। খুব নাকি বড় বংশও ওদের ; উলুবেড়ের কাছে যে গ্রামে ওদের বাড়ি—ওরা এককালে সেই গ্রামেরই জমিদার ছিল। এখন বহু সরিকে ভাগ হয়ে গিয়ে পড়ন্ত অবস্থা। লীলার শ্বশুর কোন্ এক বাঙালীর বাড়ি চাকরি করেন—সামান্য কিছু জমিজমাও আছে, যোগেযাগে চলে যায়। লীলার বর অবশ্য রেলে কাজ করে—তেমনি তার নিজেরও বেশ একটি সংসার হয়ে গেছে বলতে গেলে। পাঁচটি ননদ ওর—এইটি মেজ। বড়র বিয়ের দেনাই নাকি এখনও শোধ হয় নি, সুতরাং পাওনা-থোওনা বিশেষ হবে না, সে আভাসও দিয়েছে লীলা।

সব খবর নিয়ে মহা ছুটল মায়ের কাছে। মেয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়ে হাত-পা নেড়ে বলল, 'মেয়ে দেখতেও কুচ্ছিত নয়, রংটা নাকি শুনেছি খুবই উজ্জ্বল! একেবারে যাকে বলে ফিট্ গৌরবর্ণ। মোদ্দা ঐ কথা—টাকার কামড় কর তো হবে না। তবে তাও বলি—গোচ্ছার টাকা দিয়ে যে সোন্দর মেয়ের বে দেবে—সে তোমার ঘরে দেবে না। কী আছে তোমার বল? ছেলে একটা পাস করে নি—চাকরিও বেশী দিনের নয়। সম্পত্তি বলতে তো এইটুকু এক বাড়ি—বাঁশের কেল্লা।...কেন দেবে বলতে পার? টাকা চাইলে কুচ্ছিত মেয়ে নিতে হবে—এই পষ্ট কথা বলে দিলুম। কী করবে ভেবে দ্যাখ।'

শ্যামার জবাব আসতে বিন্দুমাত্র দেরি হয় না। সে বলে, 'তবে মা শুধু গরাসও মুখ তুলতে পারব না—আমারও এই সাফ কথা। মেয়ের বের দেনা শোধ করতে না পারি সে আলাদা কথা, কিন্তু তাই বলে দেনা ক'রে ছেলের বিয়ে দেব সে বান্দা আমি নই। কথা পেড়ে দ্যাখ—একেবারে যদি ডোমের চুপড়ি ধুয়ে ঘরে তোলাতে চায় তো মেয়ে দেখে কাজ নেই।'

মহাশ্বেতা যতটা উৎসাহ নিয়ে ছুটে এসেছিল ঠিক ততটাই নিরুৎসাহ হয়ে ফিরল। কিন্তু দেখা গেল লীলার সাংসারিক জ্ঞান ওর চেয়ে অনেক বেশী। সে বললে, 'এখন থেকে ওসব কথা বলে তেতো ক'রে দরকার নেই কাকীমা, মেয়েটা আগে দেখিয়ে দাও, যদি মেয়ে পছন্দ হয় তো দিদ্‌মাও অনেক নরম হয়ে আসবে—আর ওরাও—সামান্য জন্যে তখন তৈরী সম্বন্ধ ভাঙতে চাইবে না। দু পক্ষই তখন অন্য সুর ধরবে দেখো!'

যুক্তিটা সকলেরই মনে ধরে। সবাই সায় দেয় ওর কথায়।

মেয়ে-দেখানোর ব্যবস্থাও লীলাই ঠিক করে একটা। শ্যামা হবু কুটুমবাড়িতে মেয়ে দেখতে যাবে না, অথচ সে ছাড়া কে-ই বা মেয়ে দেখবে! রায় দেবার মালিক যখন সে-ই, তারই দেখা দরকার। আবার মেয়ে এনে দেখানোও বড় অপমানের কথা—পাত্রীপক্ষ যত গরিবই হোক. এককালের জমিদারী রক্ত এখনও গায়ে আছে, তারা রাজী হবে না। অগত্যা ঠিক হ'ল যে, শ্যামাদেরই পাড়ায় মেয়ের এক কাকীর বাপের বাড়ি—মেয়ে কাকীর সঙ্গে সেখানে বেড়াতে আসবে, শ্যামা সেখানে গিয়েই দেখবে।

মেয়ে এক কথাতেই পছন্দ হ'ল শ্যামার।

রংটা—রাণী বৌয়ের মতো অত গোলাপী নয়, হলুদের ওপর উজ্জ্বল, কতকটা দুর্গাপ্রতিমার মতো। প্রতিমার মতোই একটু ওপর-দিকে-টানা চোখ, ভুরু তো যেন কে বসে বসে এঁকেছে মনে হয়। থাই-মুখটিও চমৎকার। দোষের মধ্যে কপালটা একটু উঁচু—আর গড়নটাও খব পুরন্ত গোছের নয়, একটু যেন রোগাটে। তা হোক—এতটাও আশা করে নি শ্যামা। আশা বেশী থাকলে মানুষের মন খুঁতখুঁত করে—প্রত্যাশাই যেখানে অনেক কম যেখানে একটু বেশী পেলেই খুশী হয়ে ওঠে সে। শ্যামাও দুটো একটা কথা কয়ে, হাত-পাগুলো একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বেশ প্রসন্ন মুখেই বললে, 'তা এধারে তো মন্দ নয়—তা মেয়ে, মেয়েই

বলি, লীলার সম্পর্কে তুমি তো আমার মেয়ের বেয়ান হলে গো—চুলটা বেঁধে রেখেছ বাছা, ওটা তো দেখবার উপায় রাখ নি!'

'ওমা তার আর কি হয়েছে—দেখুন না।'

মেয়ের কাকী খোঁপা এলিয়ে বিনুনি খুলে চুল ছড়িয়ে দেন। ঘন কালো চুলে সারাপিঠ ঢেকে যায়। চুলের রাশ। শ্যামা আরও খুশী হয়—খুব লম্বা নয় চুল। শাস্ত্রে নাকি লেখে পায়ের গোছ পর্যন্ত চুলের কথা—কিন্তু শ্যামা দেখেছে যে খুব লম্বা চুল হলে মেয়ের ভাগ্য ভাল হয় না।

'না—তা চুলও তো দিব্যি! তা হ্যাঁগা বাছা—কী যেন নাম বললে, কনকরেণু? বড্ড গালভরা নাম বাপু, কনকই বলি শুধু, তা দ্যাখ আমার ঘর করতে পারবে তো? গরীবের সংসার, পাতার জ্বালে রান্না, ঝি-চাকর নেই—ঘরের পাট, বাসন মাজা সবই নিজেদের করতে হয়—গিয়ে নাক তুলবে না তো?'

মেয়ের হয়ে কাকীই জবাব দেয়, 'কী যে বলেন আঁবুই মা! আমাদের সংসারেই কি ঝি-চাকর আছে? সে ক্ষ্যামতা কৈ? তবু তো আপনাদের বাড়ি ধান সেদ্ধ করতে হয় না, গোরুর পাট নেই! আমাদের তো পরিপূন্ন ষোল আনাই সব বজায় রাখতে হয়। এর ওপর আউতি-যাউতি নোক-নৌকতা কুটুম্বিতে—সে সবও তো আছে গো।'

'তা বটে। সে সব আমার কিছু নেই। মহাদের মতো ঠাকুরও নেই একটা। সে সব পাট অনেক দিন চুকে গেছে। যা কিছু নিজেদেরই পেট-পুজোর ধান্দা। তা দ্যাখ। লীলাকে বল অভয়ের সঙ্গেই কথাবার্তা কইতে। যা করবেন জামাই-ই করবেন। মেয়ে আমার অপছন্দ নয়—এইটুকু বলতে পারি।'

লীলার খুড়শাশুড়ী তখনই পাঁচ পয়সার বাতাসা কিনতে পাঠান—খাড়াখাড়া হরির লুট দিতে হবে।

দিন তিনেক পরে একটা শনিবার দেখে অভয়পদ এল। এ তিন দিন সে বৃথা ব্যয় করে নি—ও-পক্ষের সঙ্গে কথা কয়েই এসেছে—তা শ্যামা জানে। তাই সে পরনের খাটো কাপড়খানাকে টানাটানি ক'রে ঘোমটা দেবার একটা বৃথা চেষ্টা করতে করতে বেরিয়ে এল একটু উৎসুক হয়েই। সহজ ভাবে এখন কথা কয় বটে—কিন্তু জামাইয়ের সামনে ঘোমটা না দিয়ে বসে না সে আজও।

বিনা আমন্ত্রণে বসা এবং বিনা ভূমিকায় কথা বলা চিরদিনের অভ্যাস অভয়পদর। সে শাশুড়ীর পেতে-দেওয়া পিঁড়িটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে নিজের অদ্বিতীয় ছাতিটি পেতেই রান্নাঘরের রকের ধারে বসল। তারপর একেবারেই আসল কথাটা পাড়ল। কাঁটাল গাছটার দিকে চেয়ে বলল, 'আমাকে আর এর মধ্যে জড়ালেন কেন—হাজার হোক আমাদের কুটুমের মেয়ে।'

'তুমি ছাড়া আর আমার কোন্ কাজটা হচ্ছে বাবা, চিরদিনই তো সবই তুমি ক'রে এলে। তুমিই আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান। এখন এর বেলা আর কার কাছে যাব বল? তা ছাড়া তুমি কি আর জ্ঞাতি ভাইয়ের মেয়ের শ্বশুরবাড়ির দিক টেনে আমার লোকসান করাবে!'

মিনিটখানেক মৌন থেকে অভয়পদ জবাব দিলে, 'লোকসান যাতে হয় তার ব্যবস্থা আপনিই খানিকটা ক'রে এসেছেন ! একেবারে এক কথায় অন্যপক্ষকে জানিয়ে দিয়ে এলেন যে তাদের মেয়ে আপনার পছন্দ হয়েছে—তারা খানিকটা জো পেয়ে তো যাবেই। এসব ক্ষেত্রে একটু রেখে ঢেকে মনের কথাটা জানাতে হয়।'

শ্যামা ঘোমটার মধ্যেই এতখানি জিভ কাটে। কথাটা তার ভেবে দেখা উচিত ছিল। সত্যিই মেয়ে দেখে অমন ক'রে গলে যাওয়া তার উচিত হয় নি !

অভয়পদ আবারও একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'দু'শ এক টাকা নগদ, চুড়ি হার কানে মাকড়ি—আর যেমন দানসামিগ্‌গিরি দিতে হয় তা দেবে—বরের আংটি জোড়। নমস্কারী খান-আষ্টেক পর্যন্ত। এর বেশী বাড়ানো গেল না !'

'মোটে দু'শ এক ! কী হবে বাবা তাতে ? তা ছাড়া বরের ঘড়ি-বোতাম—কিছু দেবে না ? না না—অত কমে আমি পারব না !'

অভয়পদ প্রশান্ত মুখ কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। সে শুধু বলে, 'তা হলে ওদের না বলে দিই ?'

শ্যামা এবার বিষম বিব্রত বোধ করে। এই এক মানুষ, দুটো পরামর্শ করার উপায় নেই ! মাঝামাঝি কোন কথা বোঝে না—একেবারে হ্যাঁ কি না—বলে দাও !

সে বেশ খানিকটা বিপন্ন কণ্ঠেই বলে, 'একেবারে না-ই বা বলবে কেন ? মানে একটু বেগ দিয়ে দেখলে হয় না ? ওদের কি একেবারে ধনুর্ভঙ্গ-পণ ? বিয়ে ভেঙে যাবার মতো দেখলে আবার খানিকটা বাড়বে হয় তো !'

অভয়পদ ঘাড় নেড়ে বললে, 'যতটা টানবার তা আমি টেনেছি—ওরা আর বাড়াতে রাজী নয়। অবশ্য অবস্থাও ওদের খারাপ। এর ওপর যে খুব বাড়াতে পারত তাও মনে হয় না। এক উপায় আছে, তত্ত্ব—গায়েহলুদ, ফুলশয্যে—যদি গায়ে গায়ে কাটান দেন। তাতে আপনার খরচটা কমে একটু !'

'তেমনি ঘরে আসবে না তো কিছু ! প্রথম ছেলের বিয়ে—ফুলশয্যের তত্ত্ব আসবে না—সেটাই বা কেমন কথা ! তা ছাড়া একটা ভাল কাপড়, হলুদ মাখার একখানা আটপৌরে কাপড়, একটু দইমাছ—এগুলো তো পাঠাতেই হবে। লক্ষণ-অলক্ষণের কথা তো আছে ! তার ওপর আর ক'টা টাকা খরচ করলেই আমার তত্ত্ব সাজানো হবে। ওদেরও ধর—ক্ষীর-মুড়কির বাটি, ফুলের রেকাব, মেয়ে-জামাইয়ের কাপড় এগুলো তো বাদ দিতে পারবে না।'

এই পর্যন্ত বলে থেমে যায় শ্যামা। বেশ একটু সাগ্রহেই জামাইয়ের মুখের দিকে চায়—অর্থাৎ এক্ষেত্রে আর কী করা যেতে পারে—কিছু একটা সদ্‌যুক্তি চায় সে।

কিন্তু অভয়পদ সেদিক দিয়ে যায় না। শুধু নিস্পৃহভাবে বলে, 'বেশ, তা হলে আপনার যা শেষ কথা বলে দিন। আর কতটা পর্যন্ত আপনি তা থেকে নামবেন তাও বলে দিন—আমি সেই মতো বুঝে না ক'রে দেব !'

শ্যামা অসহায় ভাবে চারদিকে চায়। এসব সে করে নি কখনও। ভেবেও রাখে নি। কিন্তু এই একর্মানিষ্যি—এর সঙ্গে কথা বলাও যা দেওয়ালকে বলাও তাই।

সে খানিকটা চুপ ক'রে থেকে কতকটা প্রশ্ন করার ভঙ্গীতেই বলে, 'যদি নগদটা চারশ এক করতে বলি—আর বোতাম ঘড়ি, রাজী করাতে পারবে না ?'

'মনে তো হয় না। আমি খানিকটা চেষ্টা করেছিলুম বৈকি! যা বলেছে তার ওপর আর সামান্য কিছু বাড়ানো যায়! অত বেশী বাড়বে না।'

শ্যামা চুপ ক'রে থাকে। কি বলবে ভেবে পায় না কিছুতেই।

অভয়পদও উত্তরের অপেক্ষা করে খানিকটা। তার পর বলে, 'তা হলে ঐ কথাই বলি—আপনি যা বললেন! রাজী না হয়, আবার অন্য মেয়ে খুঁজতে হবে।'

টাকাটা বড়ই কম। যা আশা করেছিল তার থেকে বেশ খানিকটা কম। দেনা শোধ তো হবেই না, বিয়ের খরচটা চালানোও মুশকিল। কিন্তু মেয়েটাও বড় ভাল। বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, লাজুক ধরনের মেয়ে। আজকাল যেমন ঘরে ঘরে হয়েছে বেহায়া-বাচাল, পুরুষের-ঘাড়ে-পড়া মেয়ে—তেমন নয়। ঠিক হাতছাড়া করতেও মন চায় না।

অবশেষে প্রায় মরীয়া হয়েই মনস্থির ক'রে ফেলে সে।

বলে, 'অন্তত যদি বোতামটাও দেয়, আর একশটা টাকা নগদ বেশী—তা হলেও হয়। সেইটাই বলে দ্যাখ না।'

'যে আজ্ঞে। তাই বলব।'

কার বিবাহোপলক্ষে কুণ্ডুদের বাড়ি থেকে পাওয়া বাসি লুচি আর মোণ্ডা ছিল—জামাইকে জল খেতে দিল শ্যামা। কিন্তু আজ অভয়পদ কিছু খেলে না। বললে, 'আজকাল প্রায়ই বিকেলের দিকে একটু ক'রে অম্বল হচ্ছে। বাসি লুচিটা আর খাব না। আচ্ছা, তা হ'লে আসি।'

ছাতাটি বগলে ক'রে বেরিয়ে গেল সে।

॥ ২ ॥

পরের দিন অভয়পদ এল একেবারে মেয়ের বাপ পূর্ণ মুখুজ্জে মশাইকে সঙ্গে ক'রে। নইলে নাকি উপায় ছিল না—উনি কাল থেকে এসে তাঁর বেয়াইবাড়ি অর্থাৎ অভয়পদর জ্ঞাতিদাদার বাড়ি বসে আছেন—একটা হেস্তনেস্ত না ক'রে যাবেন না। তা ছাড়া যাকে মেয়ে দেবেন তাকে এবং তার বাড়ি-ঘর দেখারও একটা কৌতূহল আছে বৈকি। একেবারেই সব পাট চুকিয়ে দিতে চায় অভয়পদ।

শ্যামা একটু বিব্রত বোধ করে। প্রথমত এসব কথা কওয়া তার অভ্যাস নেই। এতকাল কন্যাপক্ষের হয়ে দয়া ভিক্ষাই ক'রে এসেছে—পাত্রপক্ষের হয়ে সে ভিক্ষা কী ক'রে ফিরিয়ে দিতে হয় শেখে নি। তা ছাড়া ছেলের বাবা যখন রয়েছে তখন উচিত তার কাছেই নিয়ে যাওয়া—নইলে ওরাই বা কি ভাববে ? অথচ যা ছিরির মানুষ—

কিন্তু অভয়পদ দেখা গেল আটঘাট বেঁধেই এসেছে।

তার শ্বশুরমশাইয়ের শয্যাশায়ী অবস্থা, দীর্ঘকাল গ্রহণীতে ভুগে মাথাটারও একটু গোলমাল হয়েছে—এ সব কথাই পূর্ণবাবু জানেন। তাঁকে বাইরের ঘরের

দিকেও নিয়ে যায় নি অভয়—রান্নাঘরের দাওয়াতেই এনে বসিয়েছে। সুতরাং সেদিক দিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।

অগত্যা শ্যামাকে খাটো কাপড়টা পাল্‌টে একমাত্র পোশাকী শাড়ি পরে বেরোতে হয় হবু বেয়াইয়ের সামনে। অভয়পদকে মধ্যস্থ রেখে ঘোমটার মধ্য দিয়েই কথা বলে সে। কিন্তু তবু দেখা গেল দরদস্তুর টানাটানিতে সে সত্যিই অনেক বেশী পটু অভয়পদর চেয়ে। কন্যাপক্ষের যথারীতি অনুনয়-বিনয়, হাত জোড় করা, এমন কি কান্নাকাটির মধ্যেও কথার পিঠে কথার প্যাঁচ লাগিয়ে তিনশ' এক টাকায় রাজী করাল সে। তার সঙ্গে সোনার বোতামটাও।

তবে একটা কথা নিয়ে যান পূর্ণ মুখুজ্জে মশাই—গায়ে-হলুদের তত্ত্বে বাহুল্য কিছু করবে না শ্যামা, কারণ ও পক্ষ থেকে তার যোগ্য ফুলশয্যা পাঠাবার ক্ষমতা নেই।

'এমনিতেই—এত দিন যা করি নি তাই করতে হবে—খানিকটা ধানজমি ছাড়তে হবে। সম্বচ্ছরের চালটা আসত—তা আর আসবে না। কিন্তু উপায়ও তো আর নেই। ধার করবার যত জায়গা ছিল তা বড় মেয়ের বিয়েতে শেষ করেছি —আর কেউ ধার দেবে না।'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন পূর্ণ মুখুজ্জে মশাই।

অবশ্য এ প্রতিশ্রুতি প্রসন্ন মনেই দেয় শ্যামা। বাহুল্য করবার ক্ষমতা কই তার? তারও তো ঐ তিনশ' এক টাকা পুঁজি। দেনা এমনিতেই যথেষ্ট আছে —ছেলের বিয়েতে দেনা করতে রাজী নয় সে। আর করবেই বা কোথা থেকে? ধার দিতে তো ঐ এক জামাই—তাকে কত দোহন করবে?

অতঃপর ছেলে দেখে জলখাবার খেয়ে প্রসন্নমনেই বিদায় নেন পূর্ণবাবু। ছেলে দেখে ভারী খুশী—প্রকাশ্যেই স্বীকার ক'রে গেলেন যে এমন রূপবান জামাই তাঁর বংশে জাঠতুতো খুড়তুতো জ্ঞাতি জড়িয়ে আর একটিও হয় নি।

শ্যামারও মনটা অনেকদিন পরে বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। নতুন কুটুমকে জলখাবার খাওয়াতে নগদ ছ' আনা পয়সা বেরিয়ে গেল—কারণ তাঁর সামনেই জামাইকেও দিতে হ'ল, সেখানে কিছু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা যায় না—তবু তাতেও দুঃখিত নয় শ্যামা। তার হেমের বিয়ে হবে, বৌ আসবে—এ স্বপ্ন সেই যেদিন হেম ভূমিষ্ঠ হয়েছে সেই দিন থেকেই মনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে! শুধু ইদানীং চারিদিক থেকে যখন দুর্ভাগ্য ঘিরে ধরেছিল তখন যেন আর কল্পনা করতেও সাহসে কুলোত না। একান্ত দুরাশা বলে মনে হ'ত। কিন্তু আজ আর তা দুরাশা নেই, আজ তা বাস্তব—আজ তা হাতের মধ্যে এসে গেছে। এত দিনে তার সত্যিকারের সংসার হতে চলেছে—এই মুহূর্তে আরও কিছু বেশী খরচ হলেও বোধ করি দুঃখিত হ'ত না সে।

ওরা চলে গেলে শ্যামা নরেনের কাছে এসে বসল। মনটা বড়ই খুশী আছে, আজ আর এটাকে সময় নষ্ট বলে মনে হ'ল না।

নরেন বিস্মিত হ'ল। স্ত্রীর দর্শন প্রয়োজনের সময় ছাড়া দুর্লভ। বললে, 'আজ যে এমন অকালে-সকাল বামনী—ব্যাপার কি ?'

'খোকার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল যে। সামনের মাসের দোসরাই দিন ঠিক হ'ল।' শ্যামা হাসি-হাসি মুখে বলে।

'কী হ'ল ? বে ঠিক হয়ে গেল ? কার বে ? খোকা—মানে আমাদের হেমচন্দরের ?'

বলতে বলতেই বিষম উত্তেজিত হয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না—আবার এলিয়ে পড়ে হাঁপাতে থাকে।

'হ্যাঁ—তা নইলে খোকা আবার কে !'

'কী রকম ? আমার ছেলের বে আমি জানলুম না—আমার সঙ্গে কথা হ'ল না—বে ঠিক হয়ে গেল ! বলি ঠিকটা করলে কে ? কার এত বড় হেকমত ! আমি গার্জেন থাকতে আমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে আমার ছেলের বে ঠিক করে ! বলি কে—কে ঠিক করলে তাই শুনি ? সেই গোরবেটার জাত হারামজাদা জামাই নাকি ? য়্যাঁ ?'

'দ্যাখ—খবরদার জামাইকে গাল দিও না বলে দিলুম। সাতজন্ম অমন জামাইয়ের পাদোক জল খেলে তবে যদি মানুষ হতে পার। অমন জামাই পেয়েছিলে তাই সাতগুষ্টি তরে গেল। তাও কি তুমি করেছ—নিহাত আমার বাপ-মা'র পুণ্যের জোর ছিল তাই ঐ পাত্তরে মেয়ে দিতে পেরেছি !'

'থাম্ থাম্—অত আর লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়তে হবে না। মোদ্দা ও বিয়ে হবে না। নেই মাংতা বিয়ে—নেই মাংতা বৌ !···ঠিক করেছেন ! ঠিক অমনি করলেই হ'ল ! তুই কি জানিস—এর সব নেম-কানুন ! বংশ দেখতে হবে, গাঁই-গোত্তর মিলোতে হবে—দেনা-পাওনা আছে—তবে তো বে ঠিক হবে। কথায় বলে লাখ কথা না হলে বে হয় না। উনি অমনি এক কথায় বে ঠিক ক'রে ফেললেন। নে যা—এখনই খবর পাঠা, ওসব চলবে না, বে দিতে হয় মেয়ের বাপ এসে আমার কাছে হাত জোড় ক'রে বসুক !'

'হুঁ ! কত বড় গার্জেন আমার এলেন রে, ওঁর কাছে হাত জোড় ক'রে বসবে ! তুমি কে যে তোমার কাছে মেয়ের বাপ আসবে ? সে সম্পর্ক রেখেছ ? না বাপের কেমন কাজ করেছ ?···আমিই তার বাপ মা দুজনের কর্তব্য ক'রে এসেছি চিরকাল—আমিই কথা দিয়েছি। আমারই ঝকমারি হয়েছিল তোমাকে খবর দিতে আসা। তুমি কি মানুষ—যে মানুষের মতো কথা বুঝবে !'

'কী, কী বললি ! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ! এত বড় কথা বললি আমাকে ! কী বলব ভগবান মেরে রেখেছেন তাই—এত অঙ্গ থাকতে পা দুটোই নিয়ে নিয়েছেন—নইলে নোড়া দিয়ে তোর ঐ বত্রিশ পাটি দাঁত ভেঙে চোপ্‌রা করা বার ক'রে দিতুম।...আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেহি, এয়সা দিন নেহি রহেগা—একবার কি উঠব না ! তখন এর সুদসুদ্ধ যদি আদায় না করি তো—'

বলতে বলতে—বোধ করি নিঃশ্বাসের অভাবেই চুপ করতে হয়। আবার যখন

বলতে শুরু করে তখন কণ্ঠস্বর অনেকটা কোমল শোনায়, 'হাতি যখন দ'কে পড়ে ব্যাঙেও তাকে চাট্ মারে। কী বলব নিহাত নাতোয়ান হয়ে পড়েছি তাই। এমন করিস নি বামনী, ভাল হবে না। ধম্মে সইবে না। একটা অনাথ পঙ্গু লোককে এমন ক'রে দু পায়ে থ্যাঁৎলাতে নেই—'

বলতে বলতেই বোধ হয় একটা অসীম আত্মকরুণা বোধ করে সে। হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ওঠে আপন মনেই। কিন্তু সে কান্না শ্যামার কানে যায় না। তার অনেক আগেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। দামী কাপড়টা ছেড়ে আবার গুছিয়ে তুলে রাখা দরকার। পাতার আঁন্ডিল পড়ে আছে। সামনে এত বড় কাজ—তার আর আগে বাড়ি পরিষ্কার করতে হবে, দুটো পয়সাও দরকার।

পাকা দেখা চুকে গেলে ফর্দ করতে বসতে হয়। বাজারের ফর্দ, নিমন্ত্রণের ফর্দ সবই করতে হবে! লোক বলতে তো মা আর বেটা ঐ দুটি প্রাণী। কারুর সঙ্গে একটা পরামর্শ করবে এমন কেউ নেই। অভয়পদ এ সবে আসতে চায় না, মহার তো মাথারই ঠিক নেই। লোক-খাওয়ানোর ফর্দ—ঘি ময়দা আনাজ মাছ দই—এ ফর্দ কত লোক হবে বললে অম্বিকাপদ ক'রে দেবে। নিখুঁত হিসেব তার, কম-বেশি কখনও হয় না। কিন্তু তার আগে কাকে কাকে এবং মোট কজনকে বলা হবে তার ফর্দটা করা দরকার।

মোটামুটি হেমের ভাষায় 'লিস্টি'টা সহজেই হয়ে যায়। তিন ঘর কুটুমবাড়ি, পাড়াঘরে একটি একটি, সরকার বাড়ি সব। কলকাতায় গোবিন্দ, গোবিন্দর বৌ —ওদের বাড়িওলাদের একজন। এতকাল ঐ বাড়িতে ছিল হেম, খুবই জানাশুনো দহরম মহরম। না বললে খারাপ দেখায়। সবাইকে বলাই উচিত, অন্তত একজনকে বলতেই হবে।

'এ ছাড়া', ছেলের মুখের দিকে চেয়ে শ্যামা বলে, 'তোমার বন্ধুবান্ধব কাকে কাকে বলবে, কে আছে ভেবে দ্যাখ। তার পব বরযাত্তর কাকে বলা হবে—সেটাও লিখে নাও। ওদের বলেছি জনকুড়ি-পঁচিশের বেশী হবে না। আর বরযাত্তর নিয়ে যাওয়া তো নয়, ফুলশয্যের অতটি লোকই নিয়ে আসবে ওরা।'

শেষের কথাগুলো হেমের কানে যায় না। তার বন্ধুবান্ধব কে আছে—যাকে বিয়েতে বলা যায়, তাই ভাবতে থাকে সে। বন্ধুই বা কৈ তার? পুরনো রং-কলে দু-একজনের সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গতা হয়েছিল বটে, কিন্তু তাব পর বহুকাল তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই, বাদ দিলেও চলবে। এ অফিসে এখনও পর্যন্ত এমন কেউ হয় নি, যাকে বন্ধু বলা যায়। বললে পুরো সেকশনটাকেই বলতে হয়। তার দরকার নেই। সে ক্ষমতাও নেই ওর। এক আছে থিয়েটারের কজন। কানাই নন্দ, ওদের কাউকে না বললেও দক্ষিণাদাকে বলা দরকার। সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী তার।...থিয়েটারে না হয় যাবেই না, বাড়ির ঠিকানা জানে, সেখানে গিয়ে বৌয়ের কাছে বলে আসবে। তা হলেই খবর পেঁছিবে তার কাছে।

দক্ষিণাদার নামটা লেখে হেম।

'তার পর ? আর— ?' শ্যামা প্রশ্ন করে।

'কান্তিকে তো আনতে হবে। কেন তাও জানাতে হবে। রতনদিকে বলা উচিত নয় ?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হেম চায় মায়ের দিকে।

'ওমা, তাকে তো বলতেই হবে। ভাল ক'রে বলে আসবি তাকে। সে তো আসবেই না, মিছিমিছি পাওনাটা ছাড়ি কেন!'

'যদি আসে ? কান্তিকে অত ভালবাসে—আসতেও পারে হয় তো!'

একটু যেন উৎসুক, সতৃষ্ণ নয়নে মা'র দিকে চায় সে।

'আসে তো আসুক না। ভয়টাই বা কিসের! আজকালকার দিনে কে কার অত খবর রাখে! আর রাখলেও—এখন আর সেদিন নেই যে লোকে মুখের ওপর কিছু বলবে কিংবা না খেয়ে চলে যাবে সবাই।'

এইটেই শুনতে চাইছিল হেম। কারণ তার মনের মধ্যে একটা বাসনা জেগেছে ক'দিনই—বিয়ের কথাটা পাকা হয়ে যাবার সময় থেকেই—নলিনীকে নিমন্ত্রণ করলে কী হয় ?

ভালবাসা ? না, ভালবাসা আর নেই। বিদ্বেষ তো নেই-ই। সে সব ছেলেমানুষি অনেকদিন চলে গেছে। এখন নলিনীর স্মৃতির সঙ্গে একটা স্নিগ্ধ মাধুর্যই জড়িয়ে আছে মনের মধ্যে। আর কৃতজ্ঞতা। অনেক দিয়েছে সে। কাঙালকে নিয়ে গিয়ে—সত্যি-সত্যিই হাত ধরে নিয়ে গিয়ে—রাজসিংহাসনে বসিয়েছে। যা পেয়েছে তার জন্যই যথেষ্ট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, আরও কী পায় নি, কী পেতে পারত সে হিসেব করার কোন অধিকার ওর নেই।

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে ল্যাম্পোর আলোতে ফর্দ তৈরি হচ্ছিল। ল্যাম্পোর সেই কম্পিত ধূমমলিন শিখাটার দিকে চেয়ে কত কি ভাবতে লাগল হেম। কত ছোট ছোট টুকরো টুকরো কথা—কত অকিঞ্চিৎকর ঘটনার স্মৃতি। নলিনীকে ঘিরে ওর প্রথম-যৌবন-স্বপ্নের সহস্র ইতিহাস।…

প্রচণ্ড হাই তুলে শ্যামা একসময় প্রশ্ন করে, 'কী হ'ল, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি ? কাজটা শেষ ক'রে ফেল্ না বাপু।'

সত্যিই যেন চমকে জেগে ওঠে হেম, একটু অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'দেখি, এখন আর মাথায় কিছু ঢুকছে না, বড্ড ঘুম পেয়েছে—কাল সকালে তখন আর একবার ভেবে দেখব কারুর নাম বাদ পড়ল কিনা!'

সে আর শ্যামার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না ক'রেই একেবারে উঠে দাঁড়ায়। যদিও—বিছানাতে শুয়ে বহুক্ষণ, বহুরাত্রি পর্যন্ত তার চোখের পাতায় তন্দ্রার আভাস পর্যন্ত নামে না।

॥ ৩ ॥

আর সব নিমন্ত্রণই সন্ধ্যার পর করা সম্ভব কিন্তু নলিনীকে বলতে গেলে দুপুরে যেতে হবে। সুতরাং যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন—হেম পুরোপুরি অফিস থেকে ডুব মারল। কামাই তার বড় একটা হয় না, এক দিন 'সিক-রিপোর্টে' কোন ক্ষতি

হবে না।

অবশ্য মাকে সেকথা জানানো চলবে না। তা হলেই হাজার গণ্ডা কৈফিয়ত। নলিনীর কথাটা এখন বলতে চায় না সে। সেদিন গোলেমালে চলে যাবে—কে আর তখন খুঁটিয়ে কৈফিয়ত নিচ্ছে? সুতরাং যথারীতি ভোরবেলা খেয়েই বেরিয়ে পড়ল এবং সোজা গোবিন্দর বাড়ি উঠে—সারা সকাল আড্ডা দিয়ে, গোবিন্দর অফিসের বেলা করিয়ে আর একবার বড় মাসী আর রাণী বৌদির সঙ্গে ভাত খেতে বসল। ওদের কাছেও ভাঙলে না কথাটা, শুধু বললে, 'এমনিই শরীরটা ভাল লাগল না, তাই ডুব মারলুম। বারো মাসেই তো ঠিক ঠিক হাজরে দিচ্ছি—এক দিন না গেলে আর কী হবে?'

তবু কমলা সন্দিগ্ধ সুরে বলে, 'দেখিস, চাকরি-বাকরি নিয়ে টানাটানি হবে না তো?'

'পাগল হয়েছ তুমি! এ কি মার্চেণ্ট অফিস? রেল আপিসে অত সহজে চাকরি যায় না।'

গোবিন্দ ও গোবিন্দর বৌ বিয়েতে যাবে। রাণী বৌদির ইচ্ছা দু দিন আগেই যায়—মেসোমশাইকে দেখবার আর তাঁর সঙ্গে গল্প করবার জন্য প্রাণটা ছট্‌ফট করছে ওর—কিন্তু 'এই এক পোড়া মেয়ে, পেটে এসে ইস্তক শত্রুতা করছে!' তখন কমলা যেতে দেয় নি—ভরা পোয়াতি বলে। এখনও আগে যেতে দিতে তার আপত্তি—কোলে কচি মেয়ে, সেখানে গেলে সবাইকে বিব্রত করবে, নিজেও বিব্রত হবে। ঠিক হ'ল যে বিয়ের দিন ভোরবেলা ওরা চলে যাবে—গায়ে হলুদের পালা চুকিয়ে ওখানেই দুটি মাছভাত খেয়ে ফিরে আসবে—গোবিন্দ ওকে এখানে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আবার বরযাত্রী বেরোবে। ওরা যে ট্রেনে রওনা হবে সেই ট্রেনেই গোবিন্দ কলকাতা থেকে উঠবে—ঠিক রইল। বৌভাতের দিন ওরা যাবে একেবারে বিকেলে—সেদিনটা কোনমতে রাত কাটিয়ে ভোরবেলা ফিরবে। সেদিন কমলাও যাবে কথা আছে। উমা কোনমতেই যাবে না—তা হেমও জানে। তবুও সে বলেছিল একবার, উমা তারই হাতে তার আইবুড়ো ভাতের কাপড় একখানা আর মিষ্টি বাবদ একটা টাকা দিয়ে দিয়েছে।

গোবিন্দদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দক্ষিণাদার বাড়ি হয়ে যখন কম্বুলেটোলার সেই বিশেষ পরিচিত বাড়িটির সামনে এসে দাঁড়াল তখন বেলা দুটো বাজে। সময়টা হিসেব করাই ছিল, কিন্তু তবু একেবারে বাড়ির সামনে এসে পড়ে থমকে দাঁড়াল। কড়াটা নাড়তে গিয়েও হাতটা সরিয়ে নিলে। এতক্ষণ একটা আবেগের বশে সে ঝোঁকের মাথায় চ'লে এসেছে—সব কথা থিতিয়ে ভাবতে পারে নি। যদি নলিনী কথা না কয়? যদি এড়িয়ে চলে সেদিনের মতো? অনেক দিন পরে এসেছে সে সত্যি কথা—কিন্তু তাতেই যে নলিনীর মত পরিবর্তন হবে তার ঠিক কি? কিংবা যদি কড়া নাড়তেই কিরণের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? 'তুমি আবার কী মনে ক'রে এদিকে এসেছ বাছা, তোমার লজ্জা নেই? আভি নিকালো হিয়াসে'! বলে চেঁচিয়ে ওঠে সে? না, থাক বরং। একবারের অপমান যথেষ্ট।

সেখে গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাবার দরকার কি! যে জীবন থেকে চলে গেছে চিরকালের মতো—তাকে আর টানাটানি করতে গিয়ে লাভ নেই।

হেম ফিরে দাঁড়াল। ফিরেই যাবে সে। ডাকবে না। তবু আর একবার পিছন ফিরে বাড়িটার দিকে না চেয়ে পারল না। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই খুট ক রে দরজাটা খুলে গিরিধারী বেরিয়ে এল।

'আসুন আসুন দাদাবাবু। ভেতরে আসুন। ফিরে যাচ্ছেন কেন? দিদিবাবু বোলাচ্ছেন আপনাকে।'

'দিদিবাবু কেমন ক'রে জানলেন?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে হেম।

'জানালা দিয়ে দেখল যে।'

অগত্যা ফিরতে হয়।

সিঁড়ির মুখেই দাড়িয়ে ছিল নলিনী, আগের মতো। কাছে আসতে একটু এগিয়ে এসে গলায় আঁচল দিয়ে ঢিপ ক'রে এক প্রণাম করে সে।

'ওকি, ওকি—ও আবার কি?' বিব্রত হেম দু পা পিছিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। হাতটা ধরে ফেলে আটকানো উচিত ছিল কিনা ভাবতে ভাবতে আর কিছু করা হয় না।

'তা হোক, ব্রাহ্মণ মানুষ। একে তো কত অন্যায় করেছি। সেদিন থেকে কী জ্বালায় জ্বলছি মনে মনে তা কি বলব। এই দিনটির জন্যেই অপেক্ষা ক'রে ছিলুম। বলি আর কোন দিন কি একটু নিরিবিলি দেখা হবে না! মা কালীর কাছে কত মানত করেছি।·· যেদিন শুনলুম চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছ—সেদিন থেকে কেঁদে বাঁচি না। বলি আমার জন্যেই বামুনের ছেলের ভাত-ভিক্ষে নষ্ট হ'ল—এ মহাপাপ রাখব কোথায়?'

দুপুরবেলা ভাড়াটেরা দোর বন্ধ ক'রে ঘুমোচ্ছে। তবু গলা নামিয়ে ফিসফিস ক'রেই বলছিল নলিনী। তার সেই প্রায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠের অস্ফুট কথায় হেমের সর্বাঙ্গে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল।

'চল চল—ওপরে চল। আমার কপাল—এইখানেই দাঁড় করিয়ে রেখে বকছি।'

হাত ধরে নিয়ে যায় ওপরে, আগের মতোই। সেই ঘর, সেই শয্যা।

যেন বহুদিন-আগে-স্বপ্নে-দেখা কোন্ এক রাজ্যে ফিরে এল সে। নেশা লাগে হেমের। কত দিন কত রাত কী ঐকান্তিক কামনাতেই এই ঘরে আবার ফিরতে চেয়েছে সে, অন্তত একটিবারের জন্যও।

একেবারে নিচের ঢালা বিছানাটাতে বসিয়ে অভ্যাসমতো জামাটা খুলে নেয় নলিনী, গেঞ্জিটাও। তার পর ঠিক গা ঘেঁষে না হলেও কাছে এসে হাওয়া করতে বসে।

'তার পর? এখন কি করছ?'

'রেলে কাজ করছি।' গলায় একটু জোর দিয়েই বলে সে।

'ওমা, তবে তো ভালই হয়েছে। শাপে বর। রেলের কাজে শুনেছি বেশ পয়সা।'

'সে সব কাজে নয়। আমাদের আপিসের চাকরি। এখানে পয়সা নেই।'

'তা হোক, বাঁধা কাজ তো। মাসকাবারে মাইনেটা হাতে পাবে। এ যা ছিরির কাজ ছিল। ঝ্যাঁটা মারো!'

'তা তুমি সেদিন অমন ক'রে আমাকে এড়িয়ে গেলে কেন?' ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন ক'রে বসে হেম। বহুদিনের নিরুদ্ধ অভিমানে গলাটা কেঁপে যায় ওর।

'সেদিন'টা যে কোন্ দিন তা বুঝিয়ে দিতে হয় না। সেদিনের জ্বালা না হোক, ব্যথা বুঝি নলিনীরও কম ছিল না। উত্তর দিতে গিয়ে চোখে জল এসে যায় তারও। মুখ নামিয়ে ধরা গলায় বলে, 'যদি তোমার চোখ থাকত তো দেখতে পেতে--আমার মতো অবস্থায় পড়লে বুঝতে। সেদিন তোমাকে এড়িয়ে গিয়ে বুঝি আমার খুব সুখ হয়েছিল! কী শাসনে যে ছিলুম তা তো জান না। বুড়ো বয়সে সেদিন মা আমাকে ধরে মেরেছে পর্যন্ত। তার ওপর ভয় দেখিয়েছিল, থিয়েটারে এসে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকবে। বিষম ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম তাই। ···সারারাত সেদিন শুধু কেঁদেছি তোমার জন্যে। তাই কি ছাই—প্রাণ খুলে কাঁদবার জো আছে। সে মিন্‌সে তো পাশে শুয়ে—টের পেলেই হাজারো জবাবদিহি!'

চোখে বুঝি জল এসে যায় হেমেরও। নলিনীর মুখখানা তুলে ধরে কোঁচার খুঁটে মুছিয়ে দিতে ইচ্ছে করে তার চোখ দুটো। নলিনী আর সামলাতে পারে নি নিজেকে। টপটপ ক'রে জল ঝরে পড়েছে তার গাল বেয়ে। কিন্তু সাহস হ'ল না হেমের, নিজেরও ভেঙে পড়বার ভয়ে।

সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রসঙ্গটা পাল্‌টে দিলে।

'তা আজ তোমার মা কোথায়?'

আঁচলে চোখের জল মুছে নিয়ে—ধরা গলাতেই হাসির আভাস এনে বললে, 'ওমা, তা জান না বুঝি? আমি বলি খবর নিয়েই এসেছ। মা যে আজ তিন মাস আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কাশী গিয়ে আছে!'

'কেন—ঝগড়া কেন?'

'সে অনেক কথা?'

'কি শুনি শুনি—' সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে হেম।

একটু একটু ক'রে নলিনী খুলে বলে ইতিহাসটা। দীর্ঘ কাহিনী—তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে—যে, রমণীবাবু আর নলিনীর ঘরে আসেন না। কালো বলে যে নতুন মেয়েটা এসেছিল সখীর ব্যাচে—ঢ্যাঙা ফরসা মতো—হেম যখন ছিল সে তখন সবে এসেছে—দর্জিপাড়ায় বাড়ি, ওর মা খুব নামকরা বাড়িউলি, সেই মেয়েটাকে নিয়েই আছেন। অনেকদিন ধরেই ঝুঁকেছিলেন, নলিনী লক্ষ্য করেছিল ঠিকই—কিন্তু বকাবকি করলে কান্নাকাটি করলে দিব্যি গালতেন, মিছে কথা বলতেন—দুদিন হয়তো আসতেনও ঠিক—আবার ডুব মারতেন। শেষে তিতিবিরক্ত হয়ে নলিনীই হাল ছেড়ে দিলে! একদিন স্পষ্ট বলে দিলে রমণীবাবুকে যে তাঁর আর আসবার দরকার নেই।

এই নিয়েই ঝগড়া কিরণের সঙ্গে। কিরণ হাল ছাড়তে রাজী নয়। সে অনেক কিছু মতলব এঁটেছিল—মাদুলি-কবচও মেয়েকে পরিয়েছিল গোচ্ছার। শেষে প্রস্তাব করেছিল তারকেশ্বরে নিয়ে যাবার, সেখানে নাকি ধন্না দিতে হবে। প্রকাসী মাসী নাকি ঐখানে ধন্না দিয়ে সত্যেনবাবুকে চিরকালের মতো বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু নলিনী কিছুতেই রাজী হয় নি। সে বড় অপমান। তা ছাড়া তারকনাথের কাছে ধন্না দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে এমন কিছু তালেবর নয় রমণীবাবু। এদান্তে বড্ড কঞ্জুস হয়ে গেছে যেন আরও, হাত দিয়ে জল গলে না। আর দরকারই বা কি, নলিনীরও তো মুখ বদল করতে ইচ্ছে হয়। না হয় থিয়েটারের চাকরি আর করতে পারবে না—চোখের সামনে সতীন রাণীগিরি করবে, সে দেখা বড় কঠিন—কিন্তু বাড়িটা তো আছে, যা ভাড়া পায় তাতে টেক্স-খাজনা দিয়ে নুনভাতও তো জুটবে' সেটা তো আর রমণীবাবু কেড়ে নিতে পারবে না। কিরণের সেকথা পছন্দ হয় নি, আসলে এমন ভাবে হাল ছেড়ে দেওয়াটাই পছন্দ নয় তার—এক কথা দু কথায় ধুন্ধুমার ঝগড়া বেধে গিয়েছিল, নলীনীও আর রাগ সামলাতে পারে নি—বলেছিল, 'বেশ করব, আমার যা খুশি তাই করব, তোমার কি ? আমি তোমার খাই, না তুমি আমার খাও ?' তাইতেই অভিমান হয়েছে, কাশী চলে গেছে। বলে গেছে 'ভিক্ষে ক'রে খাব, ছত্তরে খাব—অন্নপূর্ণার গলিতে আঁচল পেতে বসব—তবু তোর অন্ন আর খাব না।'

'তা'—একটু হেসে বলে নলিনী, 'সেখানে আমাদের জানাশোনা অনেকে তো আছে, দশ টাকা ক'রে পাঠাচ্ছি—নিচ্ছে তো শুনছি। না নিয়ে আর কি করবে ? ফিরেও আসবে তা জানি, রাগ ক'রে কত দিন থাকবে।'

'এখন তা হলে কার কাছে আছ ?' প্রশ্ন করে হেম, 'থিয়েটারে আর যাও না বুঝি ?'

'না, সেই দিন থেকে আর যাই নি। বাবু মাসকাবারের মাইনেটা পাঠিয়ে দিয়েছিল—ফিরিয়ে দিয়েছি।⋯ এখন আসেন আমাদের মুখুজ্জে মশাই—ওঁরই, মানে রমণীবাবুরই বন্ধু, ওঁর সঙ্গেই আসতেন-টাসতেন। অনেকদিন ধরেই ছোঁক ছোঁক করছিলেন—নিহাত বন্ধুর ব্যাপার বলেই কথাটা পাড়েন নি। বাবুকে ছেড়েছি শুনেই ছুটে এসেছেন। মাইনে ও-ই আছে, এধারেও দেয় থোয় মন্দ না। কামায় তো ভাল ; খুব নাকি বড় চাকরি, বছর-খানেকের মধ্যেই নাকি আরও উঁচুতে উঠবে, তখন এক খাস বড়সাহেব ছাড়া ওর মাথার ওপর কেউ থাকবে না ⋯এ আমি ভালই আছি ভাই, থিরেটারের মেহনতটা তো বেঁচে গেছে!'

তার পরই কেমন এক রকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে হেমের দিকে চেয়ে বলে, 'তা তুমি এসব জান না—তো আজ হঠাৎ কী মনে ক'রে এসে পড়লে ?'

হেম রাঙা হয়ে ওঠে একেবারে। সলজ্জ হেসে বলে, 'আমার যে বিয়ে। তোমাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছি।'

'বিয়ে ? তোমার ? ওমা কী হবে !' প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে নলিনী, 'তা এতক্ষণ একটা কথাও বল নি ! কী চাপা লোক রে বাবা ! তা বেশ, ভালই হয়েছে।

সত্যি, বয়স তো হয়েছে—এবার ঘরবাসী হওয়া দরকার। না, বড় আনন্দ হ'ল শুনে···কোথায় বিয়ে? কত পাচ্ছ? মেয়েটি কেমন? কত বয়স তার—মানাবে তো?' একসঙ্গে একশোটা প্রশ্ন করে সে।

'রোস রোস – এক এক ক'রে বল। তুমি যে তুবড়ি ছুটিয়ে দিলে!'

সংক্ষেপে পাত্রী, তার বয়স, বাড়িঘর এবং সম্ভাব্য রূপের একটা বিবরণ দেয় হেম।

নলিনী সত্যিই খুশী হয়েছে মনে হ'ল ওর বিয়ের কথা শুনে। ছুটে চলে গেল বাইরে—গিরিধারীকে পাঁচ রাস্তার মোড় থেকে রাজভোগ আনতে পাঠালে। ছেলেমানুষের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল যেন।

'চা খাবে? খাও আজকাল? এখন মুখুজ্জ্যে সাহেবের জন্যে চায়ের পাট হয়েছে বাড়িতে। ও'র মুহুর্মুহু চা চাই।'

তার পর আতিথেয়তা সারা হলে বলে, 'তা সত্যিই নেমন্তন্ন করছ তো? যাব? কোন কথা উঠবে না? মানে কোন আবার ফ্যাঁসাদে পড়বে না তো আমার জন্যে? কি বলবে?'

'কিছুই বলব না। বলব আলাপী লোক। বলব আমার আগের মনিবের বৌ। গায়ে কি তোমার কিছু লেবেল মারা আছে?'

'না থাকলে ভালই। আমি কিন্তু বাপু সত্যিই যাব। গিরিধারীকে সঙ্গে ক'রে বাবুর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ঠিক চলে যাব।'

'নিশ্চয়ই যেও। ইস্টিশানে নেমে একটা পাল্‌কি নিয়ো—ব'লো যে নতুন বামুনদের বাড়ি—ঠিক নিয়ে যাবে।···তুমি কী বলবে বাবুকে?' হেম মুখ টিপে হেসে জিজ্ঞাসা করে।

নলিনী হেসে জবাব দেয়, 'বলব তোমার সতীনের বে।···এ তো সুবিধে গো। বিয়ের নেমন্তন্নে যাচ্ছি আমোদ করতে—অন্য রকম সম্পর্ক হলে কি কেউ যায়—না যেতে পারে? কিছু খারাপ ভাববে না। বলব থিয়েটারের চেনাশুনো নেমন্তন্ন করেছে—অনেক ক'রে যেতে বলেছে! আর কিছু বলবে না। সে রকম লোক নয়—সন্দ-বাই নেই।'

'এবার উঠি তা হলে, আরও দু-এক জায়গায় যেতে হবে।'

মুখে বলে হেম, কিন্তু তখনই ওঠে না। কী যেন একটা অপূর্ণ রয়ে যায়, কিসের জন্য যেন মনটা সতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। যে মোহ তার আর নেই বলে কিছু দিন আগেই মনকে আশ্বাস দিয়েছে, সেই পুরাতন মোহই আচ্ছন্ন করেছে তার বুদ্ধি-বৃত্তিকে। পরিচিত পরিবেশ প্রাক্তন অভিজ্ঞতার মধুস্মৃতি জাগিয়ে তুলছে। সেই স্মৃতির রসে মন আবিষ্ট হয়ে উঠেছে। কেমন যেন একটা অস্থিরতা অনুভব করছে ভেতরে ভেতরে। বুকের মধ্যেটা কাঁপছে একটু একটু।

নলিনী কিন্তু ওর কথাটাকে সহজ ভাবেই নিয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে আলনা থেকে ওর জামা আর গেঞ্জিটা নিয়ে এসে দাঁড়াল।

'কি হ'ল—উঠবে বললে যে? না কি একটু বসবে?'

হেম সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে ওর একটা হাত ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করলে। মৃদু আকর্ষণ—সুতরাং প্রস্তুত না থাকলেও হুমড়ি খেয়ে পড়বার মতো কিছু নয়, নলিনী অল্প চেষ্টাতেই সামলে নিলে নিজেকে। এ আকর্ষণের অর্থ তার অজানা নয়। সে এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হেমের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। ও বিহ্বল দৃষ্টিও সে চেনে। পুরুষের এ আকর্ষণ আর ঐ বিহ্বল দৃষ্টির অর্থ তার কাছে পরিষ্কার।

সে প্রবলবেগে ঘাড় নাড়লে, 'না না, ছি! বিয়ে করতে যাচ্ছ, একটা ভদ্দর-লোকের মেয়েকে হাত ধরে ঘরে আনছ—কত শিবপুজো ক'রে কত আশা নিয়ে সে আসছে বল দিকি! আর এসব করো না, যা করেছ করেছ—তখন কোন দোষ ছিল না। কিন্তু এখন আর নয়। আমারও বহু জন্মের পাপ এ জন্মে ভোগ করছি—আবার সতীলক্ষ্মী বামুনের মেয়ের কাছে জেনেশুনে পাপের ভাগী হতে পারব না। কিছু মনে করো না—লক্ষ্মীটি, তুমি আজ বাড়ি যাও!'

ওর হাত থেকে জামা দুটো নিয়ে কোনমতে গলাতে গলাতে বেরিয়ে আসে হেম। আজও সেইদিনকার মতো নিষ্ফল আবেগে সমস্ত শরীর কাঁপছে তার—আজও অপমানে না হোক—লজ্জায় পা দুটো তেমনি টলছে, প্রায় সেদিনের মতোই স্খলিত পদে বেরোতে হ'ল এ বাড়ি থেকে—তেমনি বলতে গেলে হাতড়ে হাতড়ে। তবে সেদিন অপমানটা বাইরে, সহস্র চক্ষুর সামনে—আজ সবটাই ভেতরে। আজ আত্মগ্লানি ও আত্মধিক্কারই প্রবল।···

ছি ছি, নলিনী কি ভাবলে তাকে! কী ছোটই হয়ে গেল ওর কাছে!

আর কি কোন দিন ওর দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারবে?

নলিনী সদর দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিল, সে পেছনে থেকে চুপি চুপি বললে, 'আমার ওপর রাগ ক রে যাচ্ছ না তো লক্ষ্মীটি, আমার অপরাধ নিও না। কথাগুলো ভেবে দেখো।'

হেম সে কথার জবাব দিলে না। ফিরে তাকালেও না আর। তবে সে রাগে নয়, লজ্জায়।

॥ ৪ ॥

হেমের বৌভাত উপলক্ষে শ্যামাকে আর একটি যা কাজ করতে হ'ল, তা তার চিরকাল মনে থাকবে। এত নিচে যে সে নামতে পারে, তা এত দিনের এত জীবন-যুদ্ধের পরেও ধারণা ছিল না তার। আর বুদ্ধি বটে বড় জামাইয়ের—এ বুদ্ধি সাত বছর এক পায়ে দাঁড়িয়ে ভাবলেও তার মাথাতে আসত না।

কম করতে করতেও প্রায় সওয়া-শ লোক হয়ে গেল বৌভাতে। তিন মেয়ের বাড়ি, সরকারদের বাড়ি—তার ওপর কুটুমবাড়ি, এই তো পুরো একশোর ধাক্কা। তা ছাড়া পাড়াঘরে একটি একটি বলতে হয়েছে। প্রথম ছেলের বিয়ে—ভিন্ন পাড়ার লোকও দু-একজন সে বলেছে, একটু মাতব্বর দেখে দেখে।

এসেছিল অনেকেই। নলিনীও সত্যি-সত্যিই এসেছিল। তবে তাকে চেনবার

জো ছিল না. ভোল পাল্‌টে এসেছিল একেবারে। সাদা গরদের শাড়ি পরে ঘোম্‌টা দিয়ে যখন পাল্‌কি থেকে এসে নামল, তখন হেমও প্রথমটা চিনতে পারে নি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাল্‌কির পেছনে গিরিধারীর দিকে নজর গিয়েছিল তাই রক্ষা—নইলে হয়তো বোকার মতো প্রশ্ন ক'রে বসত, 'কোথা থেকে আসছ গা পাল্‌কিওলারা ?'

অবশ্য নলিনীর আসল পরিচয় কেউ সন্দেহ না করলেও ওর ঐ অতিরিক্ত সম্ভ্রান্ত বেশভূষা ও ধরনধারণের জন্যেই বিস্ময় ও কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়েছিল কিছু কিছু—অনেকের কাছেই জবাবদিহি করতে হয়েছিল হেমকে। বিশেষ ক'রে সোনার মাকড়ি দিয়ে বৌয়ের মুখ দেখার ফলে আরও চাঞ্চল্য।

'ইটি কে গা হেম—ঠিক চিনতে পারলুম না তো—'

'হ্যাঁ হে হেমচন্দ্র,—উনি, মানে—তোমার—কুটুমবাড়ির কেউ নাকি ?'

এক-একজন এক-একবার ডেকে ডেকে প্রশ্ন করেন।

সকলকেই এক উত্তর দিয়েছিল হেম, 'আমার পুরনো মনিবের স্ত্রী। তিনি আসতে পারেন নি, উনি একাই চলে এসেছেন। আমাকে খুব স্নেহ করেন কিনা—'

কিন্তু প্রত্যেকবারই কান-মাথা গরম হয়ে উঠেছে তার, লজ্জায় ঝাঁ ঝাঁ করেছে মাথার মধ্যে।

সবচেয়ে বিপদে পড়েছিল প্রমীলাকে নিয়ে। তার চোখ যেন অন্তর্ভেদী—মুচ্‌কি হেসে প্রশ্ন করেছিল, 'তা হ্যাঁ দাদা, তোমার মনিবগিন্নীর তো নোয়া একগাছা আছে দেখছি সোনা বাঁধানো—কিন্তু সিঁথির সিঁদুর কী হ'ল !'

এক মুহূর্তে ঘেমে উঠেছিল হেম। ঠিক কোন উত্তর যোগায় নি। ভাগ্যে সেখানে মহা দাঁড়িয়ে ছিল—সে বোকার মতো জবাব দিলে, 'পরতে নেই হয়তো ক'দিন—মাথা ময়লা হয়েছে !'

বেঁচে গেল হেম। বললে, 'সত্যি, এসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন মেজদি ? মেয়েলী ব্যাপারের আমি কি জানি ?'

কিন্তু প্রমীলাও ছাড়বার পাত্রী নয়। সোজা হেমের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'ওঁকে জিজ্ঞাসা করব নাকি ?'

'করো না।'

'কিছু দোষের হবে না ?'

'তা জানি না। বুঝে দেখ।' সেখান থেকে সরে পড়েছিল হেম। কে জানে যা মেয়ে—হয়তো কী অপমানই বা ক'রে বসবে। হয়তো জানাজানি হয়ে যাবে।

কিন্তু প্রমীলা আর একটু বাঁকা হেসেছিল শুধু।

একফাঁকে একটু নিভৃতে দেখা হতে হেমই বলেছিল, 'একজন জিজ্ঞেসা করছে সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন ?'

নলিনী প্রস্তুত হয়েই এসেছে। বললে, 'ওমা, সিঁদুর বাঁধা রেখেছি যে—ওঁর অসুখের মানসিক।' বলে হাসল সে। একটু অপ্রতিভ হাসি।

'সে তো শুনেছি লোহা-সিঁদুর দুই-ই বাঁধা রাখতে হয়।'

'তা কেন—যার যা মানসিক।' প্রশান্ত কণ্ঠে বলে নলিনী।

রতন আসে নি। নিমন্ত্রণ করতে যাবার সময়ই বলে দিয়েছিল,। 'না ভাই, আমি কোথাও যাই না—জানেনই তো। থিয়েটারে বায়স্কোপেই যাই না। একেবারে মরে এ বাড়ি থেকে বেরুব—এই ইচ্ছে। কান্তি যাবে বৈকি। তবে বেশী দিন আগে পাঠাব না, একজন মাস্টার রেখেছি ওর জন্যে, মিছিমিছি পড়ার কামাই হবে। এবার ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে উঠল দেখে মাস্টারমশাই একজন ব্যবস্থা করেছি। সামনের বারেই তো ম্যাট্রিক দেবে—যদি একটা জলপানি পায় তো আর কারুর স্বারস্থ হতে হবে না—নিজেই নিজের পড়ার খরচ যোগাতে পারবে।'

মাস্টার রাখার খবরটা এরা কেউ জানত না। শুনে শ্যামার মনখারাপও হয়ে গেল যেমনি—তেমনি নতুন একটা আশাও মনের সঙ্গোপনে উঁকি মারতে লাগল। ছেলে যেন বড্ড পর হয়ে যাচ্ছে। বড়লোক-ঘেঁষাও হয়ে যাচ্ছে হয়তো। এর পর কি আর ওদের ঘরে বাস করতে পারবে? শাক ডাঁটা ডুমুর-সস্‌সড়ি ভাত কি মুখে রুচবে! তা ছাড়া জলপানি পেয়ে যদি আরও পড়ে তো—চাকরি-বাকরিই বা কি করে করবে। শ্যামা কি চিরকাল এই দুঃখের পেছনে দাড় দিয়ে বেড়াবে? অথচ সেই সঙ্গে একটা অত্যন্ত গোপন দুরাশা, একটা সুদূর কল্পনাও মনে জাগছে। এত যখন করেছে তখন নিশ্চয়ই ভালবাসে কান্তিকে, ওর তো ছেলেপুলে নেই, অগাধ ঐশ্বর্য লোকে বলে। কে জানে, মা সিদ্ধেশ্বরী যদি মুখ তুলে চান, ওকেও দিয়ে যেতে পারে হয়তো!

বিয়ের দিন সকালে দারোয়ান এসে কান্তিকে পেঁছে দিয়ে গেল। তার সঙ্গে একখানা দামী দেশী ধুতি, একথালা গোলাপছাপ সন্দেশ আর একটা সোনাবাঁধানো চিরুনি বৌয়ের জন্য। কিন্তু সেটাও তত বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে পারল না—যতটা করল কান্তি নিজে। ছেলেকে দেখে সবাই অবাক। কেউ যেন চিনতেই পারে না। যেমন ঢ্যাঙা হয়েছে, তেমনি সুন্দর। শুভ্র গৌর বর্ণ, আয়ত চোখ, দীর্ঘ পক্ষ্ম—গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁটের ওপরে সামান্য একটু গোঁফের আভাস—কচি কিশলয়ের মতো। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। আর বেশ-ভূষাই বা কি। চুনট্‌ করা দেশী কাপড়, সিল্কের পাঞ্জাবি, পাম্পশু জুতো, আঙুলে একটা শীল আংটি। ফুলবাবু একেবারে।

সকলের সপ্রশ্ন ও সবিস্ময় মিলিত দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে ঘেমে ওঠে কান্তি। তার যেন কেমন লজ্জা করতে থাকে। হেম পর্যন্ত একটা স-স্‌ শব্দ ক'রে ওঠে, মাকে বলে, 'কী সুন্দর চেহারা হয়েছে মা কান্তিটার—যেন রাজপুত্তুর, না?'

এই উপমাটাই বার'বার মনে হচ্ছিল শ্যামার। রাজপুত্র ছাড়া আর কিছু মনে পড়ে না কান্তিকে দেখলে। রূপকথার রাজপুত্র একেবারে। আনন্দে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। তার গর্ভের কোন সন্তানই তো ফেলনা নয়—সবাই সুন্দর। ঐন্দ্রিলা আর কান্তির তো কথাই নেই। ওদের বাপও ঐ বয়সে—। রংটাই যা খুব উজ্জ্বল ছিল না, কিন্তু মুখচোখ ঐ কান্তির মতোই ছিল ঠিক। আজও সেই

প্রথম চার চোখে চাওয়ার কথা মনে হলে কী রকম করতে থাকে বুকের মধ্যে। সেই মানুষ বদ্‌স্বভাবের গুণে ঘুরে ঘুরে আর অত্যাচার ক'রে ক'রে কী পোড়া কাঠই হয়ে গেল। আর সে নিজেও, তার রূপটাই কি সোজা ছিল! সেই রূপ, সেই রংই তো পেয়েছে ওরা। আজ আর কিছুই নেই তার—একেবারে ঘুঁটেকুড়ুনী কাকতাড়ানী হয়ে গেছে। আজ কান্তির মা বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হয় তার। কে জানে, ওদের লজ্জা হয় কি না।

কান্তি ওদের চোখ এড়াতেই বাবার ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। নরেনও ওকে চিনতে পারে নি। অনেকটা ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কে বাবাজী তুমি, চিনতে পারলুম না তো? তুমি বুঝি আমার হেমচন্দরের শালা?'

লজ্জার ওপর লজ্জা। পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে ঘাম মুছতে মুছতে বলে, 'বা রে! আমি তো কান্তি। একবার উঠে বসতে পারবেন? পায়ের ধুলো নেব।'

'কে? কা—। ও আমাদের কান্তি। আরে, এ যে নবকাত্তিক একেবারে। ময়ূরে গিয়ে চড়ে বসলেই তো হয়। বাঃ, এমন সাজালে কে? সেই কসবী মাগী বুঝি? আর কি—নজরে পড়ে গিয়েছিস দেখছি। চেপেচুপে থাক্‌—দিন কিনে নিতে পারবি। উঁঃ—আবার রুমালে খোসবো। বাবুয়ানার কিছু বাকী নেই। হবে হবে—ও বয়সে ঐ—এ বয়সে এই। আমিও বাবু ছিলুম বৈকি এককালে! তবে এমন মাল-দার কারুর নজরে পড়তে পারি নি এই যা—আমার কপালে জুটেছিল যত খোলার ঘরের মাগী—।'

কান্তির প্রণাম করা হয় না, সেখান থেকে ছুটে পালায়। লজ্জায় আগুন হয়ে উঠেছে তার কানের ডগাগুলো, মুখে কে যেন মুঠো মুঠো আবীর ঢেলে দিয়েছে।

ঝকমারি হয়েছিল তার বাবাকে ঘাঁটাতে আসা। জেনে-শুনেও আসাটা তার উচিত হয় নি।

অবশেষে রান্না ঘরে গিয়ে দাঁড়াতে শ্যামা একটু অবসর পায় প্রশ্নটা করবার।

'হ্যাঁ রে, তোব রতনদি তোকে খুব ভালবাসে, না? এসব কবে কিনে দিলে রে?'

'কী সব—এই কাপড়জামা? দাদা যেদিন বলে এসেছিল সেই দিনই দর্জিকে ডেকে পাঠিয়ে জামার মাপ দিয়েছে।'

'ভাল হয়ে থাকিস বাপু, মন দিয়ে লেখাপড়া করিস। কত খরচ করছে বল দিকি। আবার তো শুনছি মাস্টার রেখে দিয়েছে একজন—?'

'হ্যাঁ। বারণ করলুম অত ক'রে, শুনলে না। এত লজ্জা করে—তাই কি কম, পনেরো টাকা মাইনে নেন মাস্টার মশাই। অন্য কোন ইস্কুলের মাস্টার একজন। কী জেদ চাপল—খরচার ভূতে পেয়েছে যেন।'

'ভালই তো। এর আর ভূতে পাওয়া-পাওয়ি কি। ভগবানের ইচ্ছেয় আছে ঢের—তোকে ভালবাসে খরচ করছে। মানুষ হয়ে যদি উঠিস কোন দিন—ওকে দেখিস। এই কথাটা ভুলিস নি।'

তার পরই আর একবার ছেলের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে শ্যামা বলে, 'তা তুই তো সেজেছিসও খুব ভাল। একেবারে বাবুদের মতোই। এমন কাপড় পরতে শিখলি কোথায় ?'

'এ তো রতনদি নিজে হাতে পরিয়ে দিলেন আসবার সময়।'

বলতে বলতেই কান্তির সুগোর মুখ আবারও আবীর-রাঙা হয়ে ওঠে।

শ্যামা বলে, 'তাই নাকি—তাহলে তোর মায়ায় খুব জড়িয়ে পড়েছে বল্—আহা নিজের একটা নেই তো—ছেলের মতোই দেখে আর কি !'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে, সেটা তৃপ্তির কি ঈর্ষার—তা বোধ হয় নিজেও বোঝে না।

কিন্তু সে সব কথা কান্তির কানে যায় না। তার হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায়। কাপড় পরিয়ে দেওয়াটা আজ নতুন নয় অবশ্য—আজকাল প্রায়ই ইস্কুলে যাবার সময় রতন ওকে কাপড় জামা পরিয়ে চুল আঁচড়ে বই খাতা গুছিয়ে দেয়—মোক্ষদাদির আবার তাতে একটু রাগ হয় তা এমন কি কান্তিও বোঝে—মুখে যদিও বলে, 'ভাল তোমাকে বরাবরই বাসে দিদি—কিন্তু এদান্তে যেন বড্ড মায়ায় জড়িয়ে পড়েছে। তা তুমিও যে বড্ড নিপাট ভালমানুষ—ভালবাসা আদায় করবার ঐ তো কৈশল কিনা। এমনিধারা ছেলের ওপরই মায়া পড়ে যে !'

তার জন্যে নয়—আজ আসবার সময় যা কাণ্ড করলে রতনদি—কাপড় জামা পরিয়ে মাথা আঁচড়ে নিজের আঁচল দিয়ে মুখের তেল-তেল ভাবটা মুছিয়ে দিয়ে দুটো কাঁধ ধরে যেন খানিকটা দূরে দাঁড় করিয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল ওর দিকে, তারপর আবার একটু কাছে টেনে দাড়ির কাছে দুটো আঙুল দিয়ে মুখটা তুলে ধরে বললে, 'সত্যিই তোকে যেন মনে হচ্ছে কোন রাজপুত্তুর, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে কোন্ রাজকন্যাকে আনতে যাচ্ছিস্। আমার কিন্তু ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।'

তারপর যা কোন দিন করে না রতনদি—সুগভীর স্নেহে ওকে একটি চুমো খেয়েই যেন শিউরে উঠে ঠেলে সরিয়ে দেয় খানিকটা—কতকটা আপন মনেই বলে ওঠে, 'না না—গরীব বামুনের ছেলে তুই, তোকে যে মানুষ হতে হবে। রাজকন্যের ফাঁদ ভাল নয়। আর এমনি সাজিস নি তুই। এসব ভাল নয়, ভাল নয়।'

বা রে ! যেন কান্তিই সাজবার কথা বলেছে, ভাল জামার আব্দার ধরেছে ! আর কোন দিন সাজবে না সে, রতনদি বললেও সাজবে না।

ঐন্দ্রিলা বিয়ের খবর পেয়েই চলে এসেছিল। ওখানে যে সে আর টিকতে পারছে না তা অন্য লোকের মুখে আগেই শুনেছে শ্যামা। সে জানতো যে এবার একদিন মান খুইয়ে নিজেকেই ফিরতে হবে। ওখানে হরিনাথের মা একটু সেরে উঠেছেন, বাইরে বেরোতেও পারছেন দেয়াল ধরে ধরে, বসে বসে যা কাজ তা তো অনেকটাই ক'রে দিচ্ছেন—সুতরাং তারও প্রয়োজন কমেছে, এরও স্বভাব নিজের উগ্রমূর্তি ধারণ করেছে। আগে সকলে গরজে সহ্য করত ওর মেজাজ—এখন করে না। ফলে খিটিমিটি বাধতে বাধতে একেবারে ডাকাত-পড়া ঝগড়া

শুরু হয়ে গেছে। দু'দিন পরে অপমান হয়েই বেরোতে হ'ত হয়তো—হেম গিয়ে পড়াতে বেঁচে গেল দু পক্ষই। ঐন্দ্রিলা পরের দিনই চলে এল। ওরাও আর ধরে রাখবার চেষ্টা করলে না। কিংবা কবে ফিরবে তাও প্রশ্ন করলে না।

যাই হোক—এখানে এসে, বোধ হয় অনেক দিন পরে, কতকটা নতুনের মতো বলেই সে খাটছিল খুব। বলতে গেলে বেঁচে গিয়েছিল শ্যামা ওকে পেয়ে। ঘরদোর সাফ্ করা, কাচাকুচি—এতগুলি লোকের রান্না—চার চালের ভার তুলে নিয়েছিল মাথায়। বৌ আসবার পর থেকেই আবার কোথায় কি মাথার মধ্যে গোলমাল বেধেছে। রাগ-রাগ ভাব। বৌভাতের দিন সকালে সেটাই চরমে উঠল—একেবারে অসহযোগ। শ্যামা চোখে অন্ধকার দেখলে। হালুইকর বামুন এসেছে মোটে একজন, অভয়পদ যথারীতি তাকে যোগাড় দিচ্ছে, তার দ্বারা বাড়ির রান্নার কোন সুসার হবে না। অথচ এদিকেও তো লোক কম নয়। এসব করে কে? 'পাঁচ-ব্যান্নন' ভাত বোয়ের হাতে তুলে দিতে হবে। তার একটু নেমরক্ষে পায়েস চাই, কলার বড়া চাই। তরুকে সে কখনও করতে দেয় নি এসব কাজ,—অভ্যস্ত নয়। মহার রান্না অভ্যাস আছে খুব—কিন্তু তার কোলের ছেলেটা ক'দিন ধরে ভুগছে—তাকেই বা কে দেখে! ছেলেটাকে কেউ নিলে সে করতে পারত। নেয় কে?

অগত্যা শ্যামা যুদ্ধের দিকে না গিয়ে সন্ধির দিকে গেল। হাতে পায়ে ধরে, অজ্ঞাত এবং সম্ভবত অকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে কোন মতে কাজে লাগাল তাকে আবার। কিন্তু সে আগুন একেবারে নেভে নি—ছাই-চাপা পড়েছিল মাত্র। হঠাৎ আবার সন্ধ্যের দিকে ধূমায়িত হয়ে উঠল। কিন্তু তখন কুটুম্বসাক্ষাৎ এসে পড়েছে, ঐটুকু বাড়িতে লোক গিসগিস করছে—তখন আর ওর মান ভাঙাবার সময় নেই। সে চেষ্টাও করলে না শ্যামা, শুধু সবাইকে টিপে দিলে, ওকে কেউ না ঘাঁটায়। কর্মবাড়িতে কেলেংকারি হওয়া ঠিক নয়।

সেই মেজাজেই ছিল সে—কিন্তু একসময় বোধ হয় আবিষ্কার করলে যে সবাই তাকে এড়িয়ে চলছে। আর যাই হোক—বোকা নয় ঐন্দ্রিলা। এমন একঘরে হয়ে থাকার অর্থটা সকলের চোখে পড়বে—হয়তো নতুন কুটুমদেরও। কী মনে করবে তারা—ঝগড়াটি বদনাম তো আছেই, সেটা এবার হয়তো সেখান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে আর সে বড় অপমানের কথা হবে—তাই বুঝেই হঠাৎ যেন আবার সক্রিয় হয়ে উঠল সে, এবং নিজে যেচে সেধে কাজকর্ম হাতে তুলে নিতে লাগল। কন্যাপক্ষের মেয়েদের আদর-আপ্যায়ন রসিকতা কোনটাই বাদ গেল না। শুধু তাই নয়, মেয়েদের খাওয়ানোর সময় পরিবেশন করার ভার একার ওপরই তুলে নিলে। আর সেই অতিসক্রিয়তার সময়ই ছুটোছুটি করতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেল দাওয়ার নিচেটায়—যেখানে মাটির গেলাসগুলো ধুয়ে উপুড় ক'রে রাখা হয়েছিল—একেবারে তার ওপর। ফলে অবশিষ্ট সমস্ত গেলাসগুলোই ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। ভাগ্যে তখন পরিবেশন ক'রে খালি একটা গামলা হাতে ফিরছিল, নইলে তরকারি কম পড়ে যেত। কারণ সবটাই মাপা ওদের। কিন্তু

লোকসান যা হ'ল তাও কম নয়। তখন রাত দশটা বেজে গেছে, এখানে আর এ বস্তু পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ তখনও কমপক্ষে পঞ্চাশজন লোক বাকী। যার-পর-নাই কুটুম্ববাড়ির পুরুষরাই বাকি। স্থান সংকীর্ণতার জন্যে অল্প অল্প ক'রে লোক বসানো হচ্ছিল।

শব্দ পেয়ে ছুটে এল অনেকেই। হেমই এসে হাত ধরে তুললে। হেমের ইঙ্গিতেই লোকসানটার কথা কেউ উচ্চবাচ্য করলে না। ঐন্দ্রিলা এমনিতেই যথেষ্ট অপ্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু ক্ষতিটা নিয়ে বেশী আলোচনা করলে হয়তো এখনই ভিন্ন মূর্তি ধারণ করবে। কুটুম্বরা থাকতে থাকতে অন্তত চেঁচামেচি হওয়া ঠিক নয়। তা ছাড়া লেগেছেও খুব। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না সে, হয়তো কেটেকুটেও গেছে। এখন কিছু বলা আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া সমান।

রাণী এসে ঐন্দ্রিলাকে ধরে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় শুইয়ে জল দিয়ে চুঁচে দিতে লাগল। শ্যামা তখন বসে পড়েছে। এত পেতল কাঁসার গেলাস নেই যে মান রক্ষা হয়।

শব্দ পেয়ে অভয়পদও ছুটে এসেছিল। শ্যামা আজ মাথায় কাপড় দিতেও ভুলে গেল তার সামনে। প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে বললে, 'এখন উপায় ?'

'উপায় আছে বৈকি। গেলাস আনিয়ে দিচ্ছি। ব্যস্ত হবেন না।'

হেম বিস্মিত দৃষ্টিতে ভগ্নীপতির দিকে চেয়ে বললে, 'এখন কোথা থেকে আনাবেন ? সব তো দোকান বন্ধ ক'রে বাড়ি চলে গেছে !'

'সে যা হয় হয়েই যাবে।'

অভয়পদ সরে যায় সেখান থেকে। একটু পরেই শ্যামা ঘাটের দিকে যেতে—পাশ থেকে ডেকে বলে, 'শুনুন একটু।'

অভয় তাকে নিভৃতে কথা কইবার জন্য ডাকবে—এ একেবারে অভাবনীয়। শ্যামা বুঝল গুরুতর কোন কথা আছে।

'কী বাবা ?' বলে এগিয়ে গেল সে।

আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। পাতা গেলাসগুলো ঐ ওধারে বাঁশ-ঝাড়ের গোড়ায় ফেলা হচ্ছে তো—ওদিকটা অন্ধকার, কেউ দেখতে পাবে না। আগের গেলাসগুলো সব ভাঙ্গে নি নিশ্চয়, বেছে নিয়ে গোটাকতক ঐ ধারের ঘাট থেকেই ধুয়ে নিন ভাল ক'রে।'

কথাটা বোধগম্য হতে সময় লাগল শ্যামার।

তারপর অস্ফুট-কণ্ঠে দুটি শব্দ শুধু উচ্চারণ করলে, 'ঐ এঁটো গেলাস ?'

'অত ভাবতে গেলে আর চলবে না। কাঁসার গেলাস তো মেজে নেন—তাই নিন। বেশ ক'রে মাটি দিয়ে রগড়ে মেজে নিন। তেলটাও উঠে যাবে তাতে, গন্ধও থাকবে না। মাটি তো শুদ্ধ—হাতে মাটি ক'রে শুচি হন—মাটি দিয়ে মেজে এঁটো বাসন শুদ্ধ করেন। মাটির গেলাসে দোষ কি…নইলে কি বে-ইজ্জৎ হবেন ?'

তা বটে। আবার আগের যুক্তিগুলো তেমন নয়। শেষের যুক্তিটাই প্রবল।

শ্যামাকে বেশী বলতে হয় না। সে 'আচ্ছা' বলে সরে পড়ে। তার পর একটা গামছা নিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ঐ দিকের ঘাটে যায়। পাড়ে কাপড়টা ছেড়ে রেখে হাতড়ে হাতড়েই আবার যায় বাঁশঝাড়ের দিকে। সেখান থেকে হাত দিয়ে দিয়ে দেখে আস্ত গেলাস তুলে নেয় ত্রিশ-চল্লিশটা—তার পর সেগুলো বয়ে বয়ে নিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ধুয়ে নেয় মাটি বুলিয়ে। সেগুলো আবার পাড়ে তুলে রেখে একটা ডুব দিয়ে আসে একেবারে।

ওদিকে কারবাইডের উজ্জ্বল আলো, লোকের ভীড়, কোলাহল। এদিকের অন্ধকার পুকুরপাড়ে কারুর নজর চলবার কথা নয়—চললও না। শুধু সতর্ক ও সজাগ ছিল অভয়পদই, তাকে ইঙ্গিতও করতে হ'ল না, শাশুড়ীকে আবার ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে দেখেই সে-ও অন্ধকারে চলে গেল।

একটু পরে গেলাসগুলো এনে দাওয়ায় নামিয়ে দিয়ে সহজ ভাবেই হেমকে বললে, 'এই নাও গেলাস। এতেই হবে বোধ হয়, না হয় বাড়ির লোক যা হয় ক'রে চালিয়ে নেবে। একেবারে ধুয়েই এনেছি—বসিয়ে দাও গে পাতে পাতে।'

এই ভগ্নীপতিটিকে বহুবার অসাধ্য-সাধন করতে দেখেছে সে—সুতরাং হেম আর খুব একটা বিস্ময়বোধ করল না। কোন প্রশ্নও করল না। পাতা পড়ে গিয়েছিল—তাড়াতাড়ি গিয়ে গেলাসগুলো সাজিয়ে দিলে।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

ভাল ক'রে আলাপ পরিচয় হবার আগেই নতুন বৌ কনক আর হেমের মনের মাঝখানে কোথাও একটা প্রায়-অদৃশ্য পাঁচিল উঠল।

কনক হেমকে ঠিক বুঝতে পারল না। হেমও তাই। অথচ সে ভুল বোঝা-বুঝিটা এতই সামান্য, এতই অকিঞ্চিৎকর যে ব্যাপারটা অপরেরও অনুমান করা সম্ভব নয়।

ফুলশয্যাটা হয়েছিল ওদের রান্নাঘরে। তক্তাপোশ একটা আগেই কোথা থেকে আধ-পুরনো কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিল অভয়পদ, সেটা স্থানাভাবে তখনকার মতো রান্নাঘরেই রাখা হয়। এখন একবাড়ি লোক থৈ থৈ করছে—বড় ঘর ওদের ছেড়ে দিলে এরা শোয় কোথায়? তাই শেষ পর্যন্ত রান্নাঘরেই ফুলশয্যার ব্যবস্থা করতে হ'ল। আর ফুলশয্যা নামেই। রাত তো কাবার হয়েই এসেছে। কতটুকুই বা শোওয়া—নিয়মরক্ষা বই তো নয়।

কিন্তু তার পরের দিনও হেম যখন হুকুম করলে রান্নাঘরে ওদের বিছানা করতে, তখনই সকলেই অবাক হয়ে গেল। রান্নাঘর অবশ্য বড়ই—তবে মেটে ঘর, গোলপাতার চাল! জানালাগুলো নিতান্ত খুপরি খুপরি। শ্যামা আপত্তি করলে, এমনও তার মনে হ'ল একবার যে, গতকাল ওখানে ফুলশয্যার ব্যবস্থা হওয়াতে একটু অভিমানই হয়েছে ছেলের। মহা ছিল সেদিনও—সে বললে, ওমা, কী খিটকেল! লোকে বলবে যে আমাদের জন্যেই—। সে ভারি মন্দ কথা হবে

বাপু।' তবু, ঐন্দ্রিলা সকলেই কুণ্ঠিত বোধ করতে লাগল। শ্যামা বুঝিয়ে বলতে গেল, 'কাল সব গোবিন্দর বৌ-টৌ ছিল, সে একরকম কথা। আজ আর দরকার কি বাপু। আমাকে তো বাইরের ঘরে শুতেই হবে, ঐ রুগী একা তো আর ফেলে রাখা যায় না। নিয়ে দিয়ে থাকবে তো খোকা, খেঁদি আর তার মেয়ে। তরু আর মহা একটা রাত থাকবে—কালই চলে যাবে ওরা। একটা দিন কোনমতে দালানেই বেশ থাকবে'খন। নয়তো মহাই না হয় ছেলে নিয়ে রান্নাঘরে শুক। কি বাইরের ঘরেও থাকতে পারে—'

হেম একটু অসহিষ্ণুভাবেই তাকে থামিয়ে দিলে, 'আমি ওখানেই শোব। যদি কোন রাজনন্দিনীর মেটে ঘরে শুতে অসুবিধে হয়—সে যেন বড় ঘরে শোয়।'

এবার শ্যামা একটু আশ্বস্ত হ'ল। হাসলও মনে মনে। জানালার বাইরেই বোন-ভাগ্নী থাকলে ছেলে-বোয়ের সারারাত বকর বকর করার অসুবিধা হবে।

হেসেছিল কনকও। একে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে সে—তায় তার বাবা যা-ই বলুন না কেন, আঠারো বছর বয়স হয়ে গেছে তার। সে অনেক কিছুই বোঝে। তার অবশ্য মেটে ঘরে শুতে আপত্তি নেই—অভ্যাসও আছে, তার বাপের বাড়িও পাকাঘর মেটেঘর মিলিয়েই—কিন্তু রান্নাঘর আলাদা। ধোঁয়া ঝুল কালি—মনে করলেই কেমন হয়। অবশ্য পাতার জ্বালে রান্না বলে শ্যামা আজকাল প্রায় দাওয়াতেই বাইরের উনুনেই রান্না করে, নিতান্ত বর্ষাবাদল না হলে আর ঘরের উনুন জ্বালে না, তবে তাতেও ধোঁয়া ঢোকে বৈকি! তবু—এসব অসুবিধা সত্ত্বেও—খুশীও হয়েছিল কনক বরের বিবেচনা দেখে। ফুলশয্যা হতে হতে কাল রাত তিনটে বেজে গিয়েছিল—ক্লান্তিতে ঘুমেতে দুজনের অবস্থায় শোচনীয়, তা ছাড়া ওরা দুজনেই জানত যে এই শেষরাত্রেও অনেক জোড়া কান পুকুরের দিক থেকে ঘুরে এসে জানালার গোড়ায় আড়ি পেতেছে—রাণীদির মিষ্টি হাসির শব্দ তো স্পষ্ট শুনেছে কনক—সুতরাং কথাবার্তা কইবার কেউ চেষ্টাও করে নি ওরা। ওদের আসল ফুলশয্যাটা বলতে গেলে আজকেই হবে—প্রথম আলাপ ও পরিচয়টা। সেদিক থেকে একটু নিভৃত অবসর মন্দ নয়।

কিন্তু সেইখানেই কোথায় একটা মস্ত গণ্ডগোল হয়ে গেল।

বৌ বলতে দুটি বৌকেই হেম ভাল ক'রে কাছ থেকে দেখেছিল। গোবিন্দরই দুই বৌ, তারা ও রাণী। দুজনেই সপ্রতিভ। তারার বয়স হয়েছিল, তা ছাড়া সে বাইরের মেয়ে, লজ্জা করতে শেখার অবসর পায় নি। আর রাণীর বয়সের তুলনায় একটু বেশী সপ্রতিভ, বরং প্রগল্‌ভও বলা যায়। কিন্তু সে প্রগল্‌ভতা মুগ্ধই করে মানুষকে। এ দুজন ছাড়া দেখেছিল সে মহাদের বাড়ির প্রমীলাকেও, কাছ থেকে না হলেও যাতায়াতে অনেকবারই দেখেছে। অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে, কথা কইবার সময় সে বুদ্ধির দ্যুতি তার চোখে মুখে বিচ্ছুরিত হয়। কথাতে তার ক্ষুরের ধার। বেঁধে তবু ভাল লাগে। আর দেখেছে নলিনীকে—প্রগল্‌ভও নয়, বুদ্ধিমতীও নয়—তবু বেশ কথা বলে। সহজ ভাবেই বলে।

এদের দেখেই অভ্যস্ত সে—তাই মেয়েদের যে কথা বলাতে হয়, লজ্জা ভাঙাতে

হয়—তা জানে না। জোর করবার কথা তো কল্পনারই বাইরে, তাই সে সাধারণ ভাবে সহজ ভাবেই কথা কইতে গেল কনকের সঙ্গে। কিন্তু কনক এটা আশা করে নি। একে সে একটু বেশী লাজুক, তায় জ্ঞান হওয়া থেকে অর্থাৎ কৈশোরে পা দেওয়া থেকে অপর বিবাহিতা মেয়েদের কাছ থেকে শুনে আসছে যে বরেরা অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রে কনে-বৌদের কথা বলায়। আর সে সাধ্য-সাধনার আগে ওদের কাছে ধরা দিতে নেই, তাতে খেলো হয়ে যেতে হয়।

সুতরাং কনক থতমত খেয়ে গেল। অবাকও হয়ে গেল বেশ খানিকটা। আদৌ কথার উত্তর দিতে পারলে না অনেকক্ষণ। তার পর যখন হেম প্রায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে তখন দু-একটা উত্তর দিল বটে—সে উত্তর বা সে কথার ধরন হেমের ভাল লাগল না। সে সংক্ষিপ্ত উত্তরের মধ্যে কনকের বিস্ময়-বিহ্বলতা, এত দিনের স্বপ্নে রূঢ় আঘাত লাগার বিমূঢ়তা এবং কিছুটা আশা-ভঙ্গের বেদনা অনুভব করার মতো শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা হেমের ছিল না। অপর কোন নব-বিবাহিত বন্ধুর সঙ্গে এই ধরনের সরস আলোচনা করা তার ভাগ্যে কোন দিনই হয়ে ওঠে নি। সুতরাং কনকের সহজভাবে কথা বলার সাময়িক অক্ষমতাকে স্থায়ী অক্ষমতা মনে করলে সে। তারও মন বিগড়ে গেল।

ওদের সে প্রথম পরিচয়ের ধরনটা একটু নমুনা থেকেই বোঝা যাবে :

হঠাৎ একসময় হেম জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার বয়স কত ?'

কনক নির্বাক্।

'কী হ'ল—বয়সটাও জান না নাকি ?'

অনেকগুলো উত্তর মনের মধ্যে গলার কাছে ঠেলাঠেলি করছিল।

বলতে পারত যে, 'জানব না কেন, কী বললে তুমি খুশি হবে সেইটেই যে জানি না।'

অথবা পাল্টা প্রশ্ন করতে পারত যে, 'কেন বল দিকি, বয়স জেনে তবে ভালবাসবে ?' বলতে পারত যে, 'কোন্ বয়সটা তোমার পছন্দ বলে দাও—আমি সেই বয়সেরই।'

কিন্তু হেমের ঐ কাঠ-কাঠ প্রশ্নের ধরনে কিছুই বলা হ'ল না। বলা হ'ল না কনকের রসের অভাবে নয়—সে রসের উৎসে পৌঁছতে পারার অক্ষমতার জন্য। ভাল পারুসির হাতের আঘাত না খেলে খেজুরগাছ রস দেয় না—বাছুরে না চুঁ মারলে গোরুরও দুধ বেরোয় না। সুতরাং অসহিষ্ণু ধমকে কনকের কথা কণ্ঠেই রয়ে গেল। কোনমতে শুধু ঢোক গিলে বললে, 'সতেরো পূর্ণ হয়েছে।'

'তবে তোমার বাবা কমিয়ে বললেন কেন ? তিনি কি মনে করলেন কনের বয়স কম জানলে আমি আহ্লাদে আটখানা হব ?'

এ কথার জবাব নেই। কিন্তু হেম আরও খোঁচায়।

'কী বাক্যি হরে গেল যে ! আমি কি কচি খোকা—যে কম বয়স না হলে বিয়ে হ'ত না ? আমার ঢের বয়স হয়ে গেছে। আরও বুড়ো মেয়ে হলেও আমার চলত !

কনক শুনেই যায়। এর উত্তর কি দেবে ?

কিন্তু হেমই আবার খুঁচিয়ে তোলে কথাটা, 'কী, বাপের নিন্দে শুনেই রাগ হয়ে গেল বুঝি ? যার মেয়ের এত আত্মসম্মান জ্ঞান তার অমন জলজ্যান্ত মিছে কথা বলাটা ঠিক হয় নি !'

অগত্যা মুখ খুলতে হয় কনককে। সে জড়িয়ে জড়িয়ে থতিয়ে থতিয়ে বলে, 'বাবা কেন কিসের জন্যে কি বলেছেন—কি কী করেছেন তা আমি কেমন ক'রে জানব !'

'অ। জানো না। তবু ভাল।'

তার পর হয়তো কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে থাকে।

খানিক পরে আবার হয়তো হেম বলে, 'তা আমার কত বয়স তা তো তুমি জানতে চাইলে না !'

উত্তরটা ঠোঁটের ডগাতেই এসেছিল কনকের, 'জেনেই বা লাভ কি, বুড়ো বর জানলেও তো আর বিয়ে ফেরত নিতে পারব না। শুধু শুধু মন খারাপ ক'রে লাভ নেই।' এও মনে হয়েছিল বলে যে, 'শিব যত বুড়োই হোন গৌরীর কাছে তিনি চিরযুবো।'

কিন্তু কিছুই বলতে পারলে না। এর কাছে এসব কথা বলতে যেন ইচ্ছা করল না। তার ওপর সংকোচও একটা ছিল বৈকি। ছেলেবেলা থেকে মা কাকী জেঠী মাসীর দল কেবল ভয় দেখিয়েছেন—'দেখিস জিভ সামলে থাকিস, শ্বশুর বাড়িতে যেন বেহায়া নাম কিনিস নি। বরের সঙ্গে কথা কইবিও বুঝে-সমঝে, বর বাচাল ভাবলে মনে মনে ঘেন্না করবে।'

শুধু বললে, 'কী দরকার ?'

'জানতে ইচ্ছে ক'রে না ?'

'না।'

এরই মধ্যে একবার হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল হেম, 'রাণী বৌ—মানে আমাদের বড় বৌদিকে কেমন দেখলে বল তো ?'

তার পর উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই, একটু যেন বেশী আগ্রহেই বলে ওঠে, 'কেমন কথাবার্তা বলেন শুনেছ ? লেখাপড়া-জানা মেয়েরা ওঁর কাছে দাঁড়াতে পারে না !'

হঠাৎ যেন কনকের মুখের ওপর এক ঘা চাবুক মারলে কে।

এতক্ষণের সমস্ত প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রশ্নের যে তফাত আছে—এতক্ষণকার প্রশ্নের ধরনে যে নিস্পৃহতা ঔদাসীন্য এমন কি বিতৃষ্ণার ভাব ছিল—এই প্রশ্নে যে তার কিছুই নেই, বরং আগ্রহে আকুলতায় এই কিছুক্ষণ আগেকার কঠিন কণ্ঠস্বরও যেন কী এক জাদুমন্ত্রে মধুর হয়ে উঠেছে—সেটা তার মনের নজর এড়াল না। কতকগুলো আত্মরক্ষার বর্ম মেয়েরা নিয়ে জন্মায়, কর্ণের সহজাত কবচের মতো—সেগুলো ওদের স্বাভাবিক বৃত্তিও বটে। বিশেষ ক'রে যে মেয়ে পল্লীগ্রামে বহু পরিজনের সংসারে মানুষ হয়েছে তার এ বৃত্তিগুলো শাণিত হয়ে থাকে। কনকও সঙ্গে সঙ্গে অনুমান ক'রে নিল—ঐ সূর্য চোখের সামনে থেকে চোখ

ধাঁধিয়ে রেখেছে বলেই প্রদীপের আলো চোখে ধরছে না। দামী বিলিতী চন্দ্র-মল্লিকার কাছে কুন্দ হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছে।

সে শুষ্ক কণ্ঠে একটা 'বেশ' বলে পাশ ফিরে শুল—তাদের দাম্পত্যজীবনের প্রথম স্মরণীয় প্রণয়-রজনীর বিশ্রম্ভালাপে যবনিকা টেনে দিয়ে।

হেমও আর কথা বাড়াল না। বোধ করি রাণী বৌদির কথা মনে হতেই তার মনও সেই মাধুর্য-রসে নিষিক্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই রসেই ডুবে থাকতে চাইল সে।

কিন্তু তবু, একটু বিরক্তও হ'ল। মনে হ'ল বিধাতা বেছে বেছে তার অদৃষ্টেই এক বোদা মেয়ে রেখে দিয়েছিলেন। প্রাণহীন কাঠের পুতুল। সংসারে হয়তো কাজে লাগতে পারে, তার কাজে লাগবে না।

সে বুঝতে পারল না যে, যে মেয়েই আসুক, তার আশাভঙ্গ হ'তই। আসলে তার আশাটা যে কতদূর গড়ে উঠেছে—সেই খবরটাই জানত না সে। চোখের সামনে রাণী বৌদি নিত্য নূতন রূপে উদ্ভাসিত, বিলাতি হীরের অসংখ্য পলে বিদ্যুতের আলো পড়লে যেমন চারিদিক থেকে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কতকটা তেমনি। আর তাইতে চোখ ধেঁধেই গেছে তার, অল্প কোন আলো আর চোখে লাগবার কথা নয়।

সুতরাং মনের অগোচরে যে আশা, যে ইচ্ছা গড়ে উঠেছিল, সেইখানে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগল। আশাটার খবর জানত না, আঘাতটা জানল। মনটা বিরূপ হয়ে উঠল তার ফলে। সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়েও নিল নিজেকে। পরের দিন থেকে আর আলাপের চেষ্টাও করল না। তা ছাড়া তার এমন দরকারও নেই, বিয়ে তো করেছে সে মা আর বাবার পীড়াপীড়িতে—তারাই ঘর করুক বৌ নিয়ে, তাদের কাজে লাগলেই হ'ল।

তার প্রয়োজন ?

না, তার কোন প্রয়োজন নেই। মনের প্রয়োজন এ মেয়ে মেটাতে পারবে না। সে আর একজন মেটাচ্ছে—প্রয়োজনের বেশী। পাত্র উপ্‌চে উঠেছে সে মাধুর্যের সুরায়। দৈহিক ?—না, যত দূর নিজের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায়—সে তাগিদও খুব নেই। ও জিনিসটাতেই তেমন যেন প্রবল আসক্তি আর নেই। নলিনী একটা অভ্যাসের সৃষ্টি করেছিল। সেদিন তার কাছে গিয়ে সেই অভ্যাসটাই তাকে টেনেছিল—নইলে মেয়েদের সম্বন্ধে ভাবতে গেলেই ঐটে আগে মনে হবে, সে রকম মানসিক গঠন ওর নয়। রাণী বৌদিকে দেখে তার মন ভরে আছে সত্য কথা—কিন্তু ঐ পর্যন্তই, দেহের দিক দিয়ে কখনই ভাবে না সে। তার দীপ্তিতে সে মুগ্ধ। তার বেশী কিছু নয়। শুধু দেখতে চায় তাকে। কাছে বসতে চায়। তার নিত্য নূতন রূপ দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে, নিত্য নব নব বিস্ময়কর কথা শুনে মন ভরে যাবে। আর কিছু চায় না।

॥ ২ ॥

কনক এত কথা জানে না। জানা সম্ভবও নয় কোন সাধারণ মেয়ের পক্ষে। হেমের ঔদাসীন্যে সে যেন কাঠ হয়ে উঠল। একটা চাপা অভিমানও বোধ করল বটে—কিন্তু সে অভিমান ত্যাগ করতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না, যদি কোন্ পথে কী ভাবে ত্যাগ করলে তাঁদের সম্পর্কটা সহজ হয়ে উঠবে বুঝতে পারত। এখন কী করা উচিত, তার দিক থেকে কী করবার আছে, তাও যে সে ভেবে পেল না।

এই ভাবতে ভাবতেই সপ্তাহ কেটে গেল। বাপের বাড়ি যাবার ছুটি মিলল মাত্র পনেরো দিন। শ্যামা বললে, 'আমি একা আর পেরে উঠি না—বড্ড নাটা-ঝামটা খেতে হয়। আরও আমার সেই জন্যে সাত-তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দেওয়া। বৌমাকে কিন্তু বেশী দিন ফেলে রাখতে পারব না বেই মশাই!'

পূর্ণবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন একেবারে, 'সে কি কথা, ও তো এখন আপনারই মেয়ে, আপনাদের সম্পত্তি। তা ছাড়া আমরাই বা রাখতে চাইব কেন? ঢের দিন তো পুষলুম, আবারও?'

সুতরাং পনেরো দিন পরেই ফিরে আসতে হ'ল।

অবশ্য পনেরো দিন কম নয়—যদি সেটুকু সময়েরও সদ্ব্যবহার করতে পারত। পরামর্শ দেবার লোক কম ছিল না, নিজের ও জেঠতুতো খুড়তুতো মিলিয়ে বোনই ওরা অনেক, ওপরে নিচে কাছাকাছি বয়সেরই পাঁচ-ছজন—তা ছাড়া পাড়ার সমবয়সী বন্ধুরা তো ছিলই। কিন্তু কনক কারুর কাছেই মন খুলতে পারল না—পরামর্শ চাওয়াও হ'ল না। কোথায় একটা আত্মসম্মানবোধে বাধল। কেমন ক'রে যেন আপনা থেকেই অনুভব করলে যে এ বড় অপমানের কথা। আর সকলের জন্যেই তাদের বর পাগল, তবু তো তারা কেউই তার মতো সুন্দর নয় অথচ তার বরই তার সম্বন্ধে উদাসীন—একথা কি ওদের বলা যায়? বললে তারা আহা উহু করবে, সহানুভূতি জানাবে, কিন্তু সে তো করুণা। এই বয়সে সকলের, বিশেষত সমবয়সীদের কৃপার পাত্রী হয়ে লাভ নেই। সকলে যখন চারিদিক থেকে ঘিরে ধরল তাকে—তার দাম্পত্যপ্রণয়ের বিশেষ অভিজ্ঞতার ইতিহাস শোনবার জন্য, তখন সে যতটা পারল পূর্বশ্রুত বহু কাহিনীর ভাণ্ডার থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে একটা কাল্পনিক চমৎকার প্রথম প্রণয়ের ইতিহাস খাড়া করল। শ্রোত্রীরা যে তখনকার মতো একটু ঈর্ষিত হয়েই বিদায় নিল—সেইটেই বড় লাভ।

তার পর এখানে ফিরে আবার যথাপূর্বং।

বরং আগের চেয়েও খারাপ।

হেম যেন আরও সুদূর—আরও কঠিন হয়ে গেছে।

কথা যে একেবারে কয় না—তা নয়। হুকুম ফরমাশ—'এটা দাও, ওটা তুলে রাখ, জামাটায় সাবান দিও'—সহজেই করে। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। আসেও সে প্রত্যহই বহু রাত ক'রে। এত রাত পর্যন্ত কোথায় থাকে সে—সংকোচে কথাটা

শাশুড়ীকেও জিজ্ঞাসা করতে পারে না—ভাববেন হয়তো যে এরই মধ্যে বৌ ছেলের ওপর খবরদারি করছে। হেমকে তো জিজ্ঞাসা করা সম্ভবই নয়। তবে অনুমান করতে পারে সে। খেতে বসে এক-একদিন মা-ছেলে বা দাদা-বোনে যে টুকরো টুকরো কথা হয়—তা থেকে বোঝে যে সে অনুমান ওর মিথ্যাও নয়। প্রায় প্রত্যহই বড় মাসীমার বাড়ি যায় হেম। এ ছাড়া থিয়েটারেও যায় শনি-রবিবার ক'রে। বিয়ের নেমন্তন্নেও যায় হামেশা, প্রায় প্রত্যেক বিয়ের দিনেই যায়। ওকে এত লোক কী সূত্রে নেমন্তন্ন করে তা ভেবে পায় না কনক। শুধু খেয়েই আসে না, মধ্যে মধ্যে ছাঁদাও নিয়ে আসে।

বহু কথাই বলতে ইচ্ছা করে তার স্বামীকে। বহু অনুযোগ, বহু প্রশ্ন। কিন্তু কাকে বলবে ভেবে পায় না। রাত দশটায় এসে খেয়েই শুয়ে পড়ে—ওঠে ভোর পাঁচটায়। ছটার মধ্যে স্নান ক'রে খেয়ে বেরিয়ে যায়। এ মানুষ যদি নিজে থেকে কথা না বলে তো ওর পক্ষে বলা কঠিন। তা ছাড়া সংকোচ করতে করতে বাধার একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সৃষ্টি হয়েছে—নিজে থেকে যেচে মান ভাঙাতে যাওয়া—ভারি লজ্জা করে ওর। তা ছাড়া মান ভাঙাবেই বা কী ক'রে? যে অপরাধ ও করে নি সেই অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে?

অবশ্য কথা কয় না—মানে গল্প করে না বলে যে সেবাও নেয় না—তা নয়। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ সেবা ছাড়া অসাধারণও কিছু কিছু নেয় বৈকি। এবার আসবার সময় মা বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছেন, 'খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে বসবি, তিনি শুতে যাও বললে তবে যাবি। আর রোজ জামাইয়ের পা টিপে দিবি—পুরুষমানুষ, খেটে-খুটে ঘুরে ঘারে আসে—ওটুকু ওদের দরকার। দেখিস—যেন শ্বশুরবাড়িতে আমাদের মুখ নষ্ট করিস নি—কেউ না বলতে পারে যে মা মাগী কোন সহবৎ শেখায় নি মেয়েকে।'

মা'র প্রথম উপদেশ মানা কঠিন নয়। কারণ শাশুড়ীই ওর জন্য অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করেন। হেমের খাওয়া হলে সেই পাতে ওকে খেতে দিয়ে শাশুড়ী ননদও খেতে বসে যায়—খাওয়া একসঙ্গেই চোকে—ঐন্দ্রিলা রাত্রে মুড়ি খায় বেশির ভাগই, কোন দিন জুটলে এক-আধখানা রুটি—সে তো আগেই উঠে গিয়ে শুয়ে পড়ে—শাশুড়ী জেগে বসে থাকেন, কখন তার সকড়ি মুক্ত করা, বাসন মাজা শেষ হবে সেই জন্য। সে যখন ঘাটে যায়—শ্যামাও আলো হাতে ক'রে গিয়ে দাঁড়ায়। সোমত্থ বউ, এত রাত্রে বাইরের ঘাটে যাওয়া ঠিক নয়। সে ফিরে এসে বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতে সদর বন্ধ ক'রে শ্যামা চলে যায় বাইরের ঘরে, সুতরাং কনকের আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন থাকে না।

দ্বিতীয় উপদেশটা নিয়েই একটু বিপদে পড়েছিল সে। প্রথম দিন অযাচিত অনিমন্ত্রিত ভাবে স্বামীর পায়ে হাত দিতে বেধেছিল তার। সব চেয়ে ভয়, এটাকে না সে প্রণয়-ভিক্ষা বলে মনে করে। অবশ্য মনে ক'রে যদি সদয় হয় তো বেঁচে যায় কনক—কিন্তু তবু পায়ে ধরে ভালবাসানো—ছিঃ! মনে হলেই কেমন হয়। আরও ভয় যদি পা সরিয়ে নেয়, যদি রূঢ়ভাবে সেবা প্রত্যাখ্যান করে?

খাঁক পা দিয়ে হাত সরিয়ে দেয় ?

কিন্তু কোন আশা বা কোন আশঙ্কাই তার ফলল না। হেম নির্বিবাদে চুপ ক'রে শুয়ে রইল। বাধাও দিলে না, নিষেধও করলে না—কৃতজ্ঞতা স্বরূপ একটা মিষ্টি কথাও বললে না। সব চেয়ে বিপদ থামতেও বললে না—সে কি সারারাত টিপে যাবে নাকি—এমনি ? কী মনে করে হেম—তার রাজপ্রাপ্য ? অবশেষে অনেকক্ষণ পরে ক্লান্ত হয়ে আপনিই থামল কনক। তাতেও কোন সাড়া এল না ও তরফ থেকে। একটু পরে পাশে শুয়ে বুঝল সাড়া দেবার অবস্থাও নেই—হেম গাঢ় ঘুমে অচেতন। হয়তো অনেকক্ষণই এইভাবে ঘুমোচ্ছে সে। ক্ষোভে অপমানে কনকের চোখে জল এসে যায়। কান্নাটা আরও লজ্জার বুঝেই কোন মতে আত্মসংবরণ করে।

কিন্তু তার চেয়েও লজ্জাকর আর একটা ঘটনা ঘটল দিন কতক পরে। যেটার জন্য এত আকিঞ্চন, এত সাধনা—সব মেয়েরই যা কাম্য—তা যখন এল তখন সেটা পাওয়ার লজ্জাতেই যেন মরে যেতে ইচ্ছা করল কনকের।

রোজই পা টেপে সে। নীরবে নিঃশব্দে সেবা করে যায়, আর অম্লানবদনে সে সেবা গ্রহণ করে হেম। থামতে বলে না কোন দিনই, প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ে সে সেবা নিতে নিতেই। কনক আজকাল সেয়ানা হয়ে গেছে, সে দশ-বারো মিনিট পা টিপেই শুয়ে পড়ে, ওঁর রাজনিদ্রার জন্য অপেক্ষা করে না।

এরই মধ্যে একদিন—এই পা টেপার সময়ই হেম ওর একটা হাত ধরে আকর্ষণ করল নিজের দিকে।

পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই সত্য কথা—তবু নারীর সেই স্বাভাবিক অনুভূতি, সহজাত বৃত্তিই তাকে যেন সতর্ক করে দিল। সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর—একটা অজ্ঞাত আশা ও আশঙ্কায়। তবু ঠিক কি ব্যাপারটা তা তখনও বুঝতে পারে নি বলে বাধা দিতেও পারলে না—একটু কঠিন হবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হেমের সবলতর আকর্ষণে একেবারে তার পাশে এসে পড়ল।

সে আকর্ষণের পূর্ণ অর্থ বুঝতে দেরি হ'ল না অবশ্য।

সেদিন আর ঘরে শুয়ে থাকতে পারে নি কনক, হাতড়ে হাতড়ে অন্ধকারেই বেরিয়ে এসে বাইরের দাওয়ায় পড়েছিল। সারারাত ধরে কেঁদেছিল সে—প্রণয়হীন সম্ভাষণহীন চুম্বনহীন দাম্পত্যমিলনের এই অপমানে। একবার পুকুরে গিয়ে গা ঢেলে দেবার কথাও যে মনে জাগে নি তা নয়—কিন্তু নিহাত প্রথম বয়স, বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা বহু স্বপ্ন তার মানস-ভবিষ্যতে, সেই আশা ও স্বপ্নই তাকে এইভাবে সর্বনাশের দিকে যেতে বাধা দিল। ভোরবেলা শাশুড়ীর দোরখোলার শব্দে আবার ধীরে ধীরে সে ঘরেই ফিরে এল—সেই অভিশপ্ত শয্যার দিকে।

হেম তখন অগাধে ঘুমোচ্ছে।

কাজটা ক'রে ফেলে হয়তো সে একটু অনুতপ্ত হয়েছিল, কিন্তু একটা মনগড়া সান্ত্বনা ঠিক ক'রে নিতেও বেশী বিলম্ব হয় নি তার। নিজের একটা অকারণ

অহংকার, মিথ্যা আত্মমূল্যবোধই তাকে সে সান্ত্বনা যোগাল। যেন রাণী বৌদির মতো মেয়ে, প্রমীলার মতো মেয়েই তার প্রাপ্য ছিল! কনকের মতো জড় প্রাণহীন মেয়ে দিয়ে তাকে ঠকানো হয়েছে। সে মেয়েকে যা দিয়েছে এই ঢের—তাকে অনুগ্রহই করা হয়েছে।

আর একটা সূক্ষ্ম অহংকার তার চূর্ণ হয়েছে। জৈবিক প্রয়োজন তার নেই বলে সে ভেবেছিল মনে মনে—সে ভাবনা মিথ্যা হয়ে গেছে। এখন একটা মিথ্যা অহংকারকে আর একটা মিথ্যা অহংকার দিয়ে ঢাকা ছাড়া উপায় কি?

॥ ৩ ॥

চুরি ক'রে নেমন্তন্ন খাওয়াটা যেন হেমকে এক নেশায় পেয়ে বসেছে! এটা ঠিক খাওয়ার লোভ নয়, হয়তো সেটা প্রথম প্রথম একটু ছিল কিন্তু এখন আর নেই, তা সে হলফ ক'রে বলতে পারে। খাওয়ার সময় যেটা ছিল সে সময়ই খেতে পায় নি—ফলে খাওয়ার শক্তিটাও গেছে কমে। জলখাবার খাওয়া ওর কোনকালে অভ্যাস নেই, ছুটির দিনেও সেই একেবারে বেলা বারোটা-একটা নাগাদ ভাতে-জলে বসে। কমলার বাড়িতে যখন থাকত ছুটির দিন সকালে সেখানে হাজির থাকলে গোবিন্দ জোর ক'রে কিছু খাওয়াত—এখানে সে বালাই নেই। শ্যামার মনেও পড়ে না সে কথা। এখন বৌ আসার পর ছেলের ভাতের সঙ্গে একমুঠো চাল বেশী নেয় সেই ভাতই একগাল ক'রে কনক ও সীতা খায় সকালবেলা। সেই তাদের জলখাবার। ছুটির দিনে ওদের জন্যে দুটি মুড়ি ব্যবস্থা। তাও অনেক দিন ভুলে যায় শ্যামা। নিহাত সীতা কান্নাকাটি করে তাই ঐন্দ্রিলা বার ক'রে দেয়, চক্ষুলজ্জার খাতিরে বৌদিকেও দিতে হয়। নইলে কনক কিছুতেই মুখ ফুটে চাইতে পারত না। হেম তার দু বেলা দু মুঠো ভাত—যে কোনও উপকরণ দিয়ে হোক—এই পেলেই খুশী। তাও উপকরণের দিকে ভাল ক'রে চেয়েও দেখে না কোন দিন। প্রথম বয়সে লোভ সংবরণ করতে বাধ্য হয়েছিল বলেই—এখন পেটে ক্ষিদে এবং খাবারের দোকানে থরে থরে সুস্বাদু মিষ্টান্ন সাজানো থাকলেও, সে খাবার খাওয়ার কথা মনে পড়ে না ওর। এমন কি পকেটে পয়সা থাকলেও না।

না, লোভটা বড় কথা নয়। এর মধ্যে একটা অন্য আনন্দ আছে। ঠকাবার আনন্দ। নিজের চতুরতার সাফল্যের আনন্দ, কৃতিত্বের আনন্দ। ভয় আছে, এখনও মাঝে মাঝে খুবই ভয় করে—যখন কোন কোন কর্মবাড়িতে তীক্ষ্ণদৃষ্টি দু-একজন লোকের সামনে পড়ে যায়, ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে দেখে তারা, ফিস-ফিসও করে তাকে নিয়ে—তখন বুকের মধ্যে দুর-দুর করে বৈকি? একবার একটা জায়গায় অবস্থা এমন হয়ে উঠল যে ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে পালাতে হ'ল শেষ পর্যন্ত। না খেয়েই বাড়ি ফিরতে হ'ত—যদি না আর একটা বাড়িতে ঠিক সেই সময় বরযাত্রীর নামবার সময় হ'ত। সে বরকর্তা কেমন এক রকম অন্যমনস্ক ধরনের মানুষ—পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওর কনুইটা ধরে ফেলে, 'ও কি বাবা,

তুমি যাচ্ছ কোথায় ? এসো এসো। এই দ্যাখ ছেলেমানুষ, পালাবার ফিকিরে ছিলে বুঝি ?' বলে ঠেলে দিলেন ভেতর দিকে। সে বাড়িটাও ছোট, বসবার জায়গা কম, কন্যাকর্তা সেইখান থেকেই কতক বরযাত্রীকে একেবারে পাচার করলেন ছাদে। নির্বিঘ্নে খেয়ে নেমে এল।

অবশ্য এ বিপদে খুব কমই পড়তে হয়েছে তাকে। কারণ বড় বিয়েবাড়ি ছাড়া সে ঢোকে না, ছোট মাপের কাজে ধরা পড়বার ভয় বেশী। তবে খুব তীক্ষ্নদৃষ্টি লোক দু-একজন থাকে সব জায়গাতেই, যাদের নজর এড়ানো শক্ত, যারা অতিথির মুখ দেখলেই রবাহূত বা অনাহূত বুঝতে পারে।

তবু বিপদ আছে বলেই উত্তেজনাও আছে। আর সেই উত্তেজনাটাই হ'ল আসল নেশা। সেই নেশাতেই পেয়ে বসেছে তাকে।

আগে ছিল হেম সম্পূর্ণ একা, তাতে বেশী ভয়-ভয় করত—এখন ওর এই কারবারে একজন অংশীদার জুটে গেছে। সে হ'ল দুর্গাপদ—মহার দেওর।

এক দিন, কী একটা ছুটির দিনে লগন্‌সা পড়েছে। হেম সেজেগুজে এসে শ্যামবাজারের দিকের একটা রাস্তা ধরে চলতে চলতে বিয়েবাড়িগুলোর আয়তন এবং সমারোহ দেখে অভ্যাগতের একটা আনুমানিক সংখ্যা হিসাব করছে মনে মনে—এমন সময় প্রায় সামনাসামনি ধাক্কা লেগে গেল দুর্গাপদর সঙ্গে।

'আরে, তুমি এখানে কী করছ! এত সাজগোজ ? বিয়ের নেমন্তন্ন নাকি ?'

'হ্যাঁ। তা তুমিই বা এখানে কোথায় ?'

'গিছলুম একটু এক বন্ধুর বাড়ি। অনেক দিন ধরেই বলছে আসতে, সময় আর হয় না। আজ মরীয়া হয়ে বেরিয়ে পড়লুম—তা দ্যাখ না—ভাবলুম এত পয়সা খরচা ক'রে এলুম, রাত্তিরের খ্যাটটা সেরে যাব—ব্যাস, আজই বাবু উধাও, তিনি আবার কোন্ তালে গেছেন কে জানে! অবিশ্যি আমি আসব বলে রাখি নি—খুব দোষ দেওয়াও যায় না। যাক্—তুমি যাও, আমিও চলি—'

তার পর ঈষৎ ঈর্ষাতুর দৃষ্টিতে আর একবার তার সাজ-পোশাকের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি তো দিব্যি চললে এখন কালিয়া পোলাও খেতে, আমি এখন যাই, দেখি কী জোটে—যদি জল দেওয়া ভাত চাট্টি থাকে তো রক্ষে, নইলে আবার চাপাতে বলতে হবে। এক কেলেঙ্কারি আর কি!...তা বলে তো সারারাত পেটে কিল মেরে শুয়ে থাকা যায় না—কী বল ? আমি আবার মরতে কেন যে আমার ভাত রাখতে বারণ ক'রে এলুম তাও জানি না।'

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনের দিকে এগোয়।

হেম ওর একটা হাত ধরে ফেলে, 'তা তুমিও চল না।'

'আমি ? আমি কোথায় যাব ?'

'কালিয়া পোলাও খেতে!'

'হ্যাঁ, তোমার নেমন্তন্ন তুমি সেজেগুজে এসেছ—আমি সেখানে যাব কি ?'

'কেন—তোমারও তো দিব্যি ধোপদস্ত কাপড়জামা দেখছি।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য আছে। আজই তো ভাঙবার দিন। তা ছাড়া কলকাতায়

বন্ধুর বাড়ি আসছি—তোমাদের ওখানে যে বেশে যাওয়া চলে তা তো আর এখানে চলবে না।'

'তবে আর কি—চল চল। রাত হয়ে যাচ্ছে।' সে দুর্গাপদর হাত ধরে টানে সত্যিই।

'আরে—আরে—টানছ কোথায়! এমন ভাবে বিনা নেমন্তন্নে—'

'আমাকেই বা কে গলায় কাপড় দিয়ে হাত-জোড় ক'রে নেমন্তন্ন করেছে!'

'তার মানে?' দুর্গাপদর দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, 'তবে তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'যেখানে ভাল ব্যবস্থা পাব সেখানেই।'

ওর বিস্ময় লক্ষ্য ক'রে হেম হাসে। তার পর সংক্ষেপে ব্যাপারটা খুলে বলে। প্রথম দিনকার আকস্মিক ব্যাপারটা থেকে কী ক'রে এটা পেশায় দাঁড়িয়ে গেল।

'তাই নাকি! ওঃ, চালাক বলে আমাদের খুব অহঙ্কার ছিল। যা হোক দেখালে বটে। খুব দুর্জয় সাহস তো তোমার!'

'নাও—যাবে তো চল। এখনও না কোথাও ঢুকে পড়তে পারলে ভিড় কমে যাবে, মওকা পাব না।'

'যাব? অনেকদিন ভালমন্দ কিছু খাই নি বটে। সেই যা তোমার বিয়েতে —তা সে আবার আমার দাদার ম্যানেজমেন্ট তো, জুত হয় নি।'

উৎকৃষ্ট ভোজ্যের কল্পনাতেই তার দু চোখ লুব্ধ হয়ে ওঠে। দুর্গাপদ চিরদিনই খেতে ভালবাসে।

হেম আর কথা না বাড়িয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় তাকে।

সেই সূত্রপাত। এখন দুর্গাপদ ওর এই অভিযানে নিত্যসঙ্গী। আগে থেকে পাঁজিপুঁথি দেখে ঠিক ক'রে রাখে—কোন্ দিন কোন্ ট্রেনে আসবে, কারুর সে ট্রেন হঠাৎ ফেল হয়ে গেলে অপরজন কোথায় অপেক্ষা করবে, ইত্যাদি। দুর্গাপদ অবশ্য আর একটা ভাল ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছে ইতিমধ্যে। হাওড়া স্টেশনের চায়ের স্টলে একটি ছেলে কাজ করে—তার দাদা দুর্গাপদর অফিসের বেয়ারা। সেই হিসেবেই জানাশুনো। অফিসের দিনেও ভারী লগন্‌সা পেলে ছাড়ে না ওরা, সকালবেলাই ধোয়া জামাকাপড় এনে তার কাছে জিম্মা ক'রে দিয়ে যায়, অফিসের ফেরত স্টেশনে এসে ওয়েটিংরুমে মুখহাত ধুয়ে কাপড় পাল্‌টে 'নিমন্ত্রণ রক্ষা' করতে বেরোয়। রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে আবার সেই ছোকরার কাছ থেকেই ময়লা কাপড়জামা নিয়ে নেয়।

একদিন এই বিয়েবাড়ির সন্ধানেই গিয়ে পড়েছিল ও অঞ্চলে। সকাল সকাল লগন সেদিন—ওদেরও সেটা শনিবার, কোন অসুবিধাই হয় নি—তাড়াতাড়ি খাওয়া চুকে গিয়েছিল বরং, সেইটেই সুবিধা। অনেকটা সময় হাতে আছে বলে আস্তে আস্তে গল্প করতে করতে ফিরছিল। অন্যমনস্ক হয়েই হাঁটছিল, তবু এক সময় কেমন যেন মনে হ'ল জায়গাটা ওর খুব অচেনা নয়। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নজরে

পড়ল—সামনেই শরতের ছাপাখানা।

দুর্গাপদকে একটু দাঁড়াতে বলে হেম এগিয়ে গেল ওদিকে। ঘরে আলো জ্বলছে যখন—প্রেস খোলা আছে নিশ্চয়। আর মালিকও তা হলে আছেন। অনেকদিন শরতের সঙ্গে দেখা হয় নি। বিয়েতে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল, তখনও দেখা পায় নি—জমাদারের কাছে লিখে রেখে গিয়েছিল। শরৎ যেতে পারে নি। আইবুড়োভাতের কাপড় ও মিষ্টি বলে চারটে টাকা মনি অর্ডার ক'রে পাঠিয়েছিল। সেই কুপনেই লিখে দিয়েছিল, 'শরীর খুব খারাপ যাইতেছে, আবার হাঁপানির মতো হইয়াছে—যাইতে পারিলাম না সেজন্য খুব দুঃখিত, আর এক দিন গিয়া বধূমাতাকে দেখিয়া আসিব' ইত্যাদি।

শরীর খারাপ জেনেও এতকালের মধ্যে খবর নেওয়ার কথা মনে পড়ে নি, সেজন্য বড়ই লজ্জিত বোধ করতে লাগল হেম। অনেক আগেই এক দিন আসা উচিত ছিল।

কিন্তু ভেতরে উঁকি মেরে দেখলে শরৎ নেই।

সে জায়গায়—ওরই চেয়ারে বসে আছে আর একজন লোক। শরতের কর্মচারীদের চেনে হেম, তারা কেউ নয়। কর্মচারী শ্রেণীর বলে মনেও হ'ল না।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে হেম ওপরে উঠে গেল, 'শরৎবাবু নেই?'

যে বসে ছিল, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী একটি লোক, সে একটু অবাক হয়েই তাকাল ওর দিকে, 'তিনি তো আর বসেন না এখানে—বহুদিন হ'ল বসছেন না।'

'বসছেন না? আর এখানে আসেনই না?'

'না। তিনি প্রেস ছেড়ে দিয়েছেন।'

'ছেড়ে দিয়েছেন? মানে বেচে দিয়েছেন?'

'না, বেচে ঠিক দেন নি। লীজ দিয়েছেন, আমিই লীজ নিয়েছি। মাসিক ভাড়া বন্দোবস্ত। মালপত্র টাইপ মেসিন সব তাঁর অবশ্য, তাঁকে জিজ্ঞাসা না ক'রে কিছু হস্তান্তর করতে পারব না। আমার শুধু নেড়েচেড়ে চালানো। তাঁর তো আর নিজে দেখা সম্ভব নয়!'

'কেন—তাঁর কি খুব অসুখ?'

'দেখুন', ছেলেটি বিজ্ঞভাবে বলে, 'খুব যে একটা অসুখ তা বলতে পারি না। হাঁপানির মতো হয়েছে, হজমের গোলমাল—আছে আরও এটা ওটা—তবে আসলে মনটাই গেছে ভেঙে আর কি। এসব আর পেরে ওঠেন না। যোঝবার শক্তিটা চলে গেছে।'

তার পরই কী মনে ক'রে যেন সচেতন হয়ে উঠল নতুন মালিক।

'কাজ-কর্ম কিছু আছে নাকি? থাকলে স্বচ্ছন্দে দিয়ে যেতে পারেন।...সেই সবই—কম্পোজিটার জমাদার সব ঠিকই আছে—আমি কাউকে ছাড়াই নি। শরৎবাবু নেই বলে কাজের কোয়ালিটি কিছু খারাপ হবে না।'

'না, আমি কাজ দিতে আসি নি—আমি তাঁর আত্মীয়।'

'আত্মীয়—অথচ কোন খবর রাখেন না!' লোকটির কণ্ঠে ঈষৎ বিদ্রূপের

দূরে। বোধ হয় আশাভঙ্গ-জনিত ক্ষোভের ফল সেটা।

'না, দূরে থাকি কি না। তা সেই বাসাতেই আছেন কি না জানেন?'

'না না, থাকেন এই কাছেই। নতুনবাজারের পাশে একটা মেসেতে। খুব কষ্টেই আছেন ভদ্রলোক। যান না, দেখেই যান একবার। আমি ঠিকানা লিখে দিচ্ছি।'

সে একটা চিরকুটে বাড়ির নম্বর ও গলির নাম লিখে দেয়।

হেম আবার রাস্তায় ফিরে এসে দুর্গাপদকে বলে, 'তুমি যাও ভাই দুর্গা, আমার একটু ফিরতে দেরি হবে।'

'কেন বল দেখি—কী ব্যাপার এখানে?'

'এ আমার মেসোমশাইয়ের প্রেস। খবর নিতে গিয়েছিলুম, শুনলুম খুব অসুখ। মনে করছি একবার দেখেই যাই—। আবার অন্য এক দিন এত দূরে উজোন ঠেলে আসা—।'

দুর্গাপদকে বিদায় দিয়ে খুঁজে খুঁজে অতি কষ্টে মেস-বাড়িটা বার করলে হেম। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের গলি থেকে একটা কানাগলি বেরিয়েছে, তার মধ্যে একটা অতি পুরাতন জরাজীর্ণ বাড়ি। সদরের কাছ থেকেই ভিজে-ভিজে ভ্যাপ্‌সা গন্ধ পাওয়া যায়। কেরানীর মেস নয়, নতুন বাজারের যত দোকানদারদের কর্মচারীর মেস। দোকানদারেরা অনেকে বাসায় বা বাজারের ওপর ঘরভাড়া ক'রে থাকে। কর্মচারীদের আরও সস্তায় থাকা দরকার। আঠারো, কুড়ি, বাইশ, এই সব মাইনে বেচারীদের। বাড়িটাও সেই মাপেরই। তবু খরচ কমাবার জন্য একটা ঘরে ছটা পর্যন্ত বিছানা ফেলতে হয়েছে। ওপরতলায় সম্ভবত চৌকির বালাই নেই, নিচের ঘরে তবু একটা করে আমকাঠের চৌকি ফেলা আছে।

সদরের পাশে গলির দিকে যে ঘর—সেই ঘরেই শরৎ থাকে, একতলাতে। স্যাঁত্‌স্যাঁত করছে ভিজে ঘর—সেইখানেই চৌকির ওপর বসে হাঁপাচ্ছে সে। অন্ধকারেই বসে ছিল, এখানে এত আলোর সুবিধে নেই—'গেস্ট্ এসেছে' ঠাকুর হেঁকে বলায় চাকর এসে একটা হ্যারিকেন বসিয়ে দিয়ে গেল মেঝের ওপর। তাতে আলোর চেয়ে ধোঁয়াই বেশী, দেখতে দেখতে কেরোসিনের গন্ধে ঘরটা ভরে উঠল। হোক্ ক্ষীণ আলো—তবু কঙ্কালসার দেহটা দেখতে কষ্ট হয় না। সেই রূপের এই পরিণতি! হেমের চোখে জল এসে যায় যেন।

'এসো এসো বাবা, বসো। এখানে এলে কী ক'রে? ঠিকানা—? ও, প্রেসে গিছলে বুঝি?...তার পর, খবর সব ভাল তো? বিয়ে চুকে গেল নির্বিঘ্নে—? বৌমা কেমন হলেন? তোমার মা'র সঙ্গে বনছে তো?'

কষ্ট ক'রে ক'রে হলেও অনেকগুলো কথাই বলে শরৎ। একা একা মুখ বুজে থাকা সারা দিনরাত। দোকানীর মেস, সবাই ভোরে উঠে চলে যায়—মাঝে একবার খেতে আসে—তা তখনও কথা কইবার মতো যথেষ্ট ফুরসত থাকে না তাদের—রাত্রে ফেরে এগারোটা-বারোটায়, ক্লান্তিতে মড়ার মতোই এলিয়ে পড়ে। অনেক দিন পরে পরিচিত লোকের সঙ্গে কথা কইতে পেয়ে যেন বেঁচে যায় সে।

হেম কতকটা স্তম্ভিত হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল, সে এবার বললে, 'কিন্তু এ কী হাল হয়েছে আপনার? আপনি ডাক্তার-টাক্তারও দেখান না বুঝি?'

'ডাক্তার আর কি করবে? বয়স হলে এসব অমন হয়। আর ডাক্তার দেখিয়ে বেঁচেই বা লাভ কি বেশী দিন, তাড়াতাড়ি সরে পড়তেই তো চাই!'

'তাই বলে এই ঘরে—এমনি ভাবে? একে আপনার হাঁপানির মতো হয়েছে, তার ওপর এই ভিজে ঘরে বাস করছেন? সে বাসা ছাড়লেন কেন? মেসে আসবার কী দরকার পড়ল?'

'না বাবা, সে যেন টিঁকতে পারলুম না কিছুতেই। একা একা—। তা ছাড়া এক জায়গায় থাকা এক জায়গায় খাওয়া—এ আর পোষাল না।'

'তা এই মেস ছাড়া কি আর মেসও জোটে নি আপনার? কলকাতায় কী আর এর চেয়ে ভাল মেস ছিল না?'

একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসল শরৎ।

'তা ঢের ছিল বৈকি। তবে কি জান—আমার যেন আর কিছুতেই কোন হ্যাঙ্গাম করতে ইচ্ছে করে না। আমারই এক কম্পোজিটার এই মেসে থাকত—সে সন্ধান দিলে, চলে এলুম। কে আবার ঘোরে, খোঁজ করে—অত মেহনত পোষায় না। তা ছাড়া এর কতকগুলো সুবিধেও আছে—ছাপাখানাটা কাছে, ওদের কোন দরকার হলেই ছুটে আসে, জেনে যায়। গঙ্গাটাও বেশী দূর নয়—টানটা একটু কমলেই মনে করছি রোজ গঙ্গাস্নান ধরব—তোমার মাসীর মতো। আর কী জান, সস্তাও খুব—সাত টাকায় খাওয়া থাকা!'

'কিন্তু এত সস্তার আপনার দরকারই বা কি? এত কি টাকার অভাব আপনার পড়ল যে দশ-বারো টাকার একটা মেসেও থাকতে পারেন না! কত দেয় আপনাকে ওরা প্রেসের ভাড়া?'

'ও, তাও জেনে এসেছ! আচ্ছা বটে অনাদি ছোকরা, সকলের সঙ্গে হাটিপাটি পেড়ে ঘরের কথা বলা চাই। তা ভাড়া মন্দ দেয় না। চল্লিশ টাকাই দেয় মাসে। তেমনি খরচও তো দেদার—কাপড় আছে জামা আছে—ডাক্তার-বদ্যি আছে—কী নেই বল? তবু দশ-বারো টাকা কি আর খরচ করতে পারি না—তা পারি। অন্য একটা মতলব আছে। কখনও তো টাকা জমাতে পারলুম না, রোজগার কম করি নি—কিন্তু থাকল না একটা পয়সাও। কত কর্তব্যেই তো ত্রুটি রয়ে গেল—মধ্যে মধ্যে বড্ড গ্লানি বোধ হয় বাবা মনটার মধ্যে। তাই বাসার পাট উঠিয়ে মালপত্তরগুলো বেচে যখন থোক্ টাকা খানিকটা হাতে পাওয়া গেল, তখনই এই মতলবটা মাথায় এল। মরবার আগে যদি আর কিছু জমাতে পারি, দুটো টাকা মিলিয়ে—। যাক্ সেকথা, তোমার আর শুনে কাজ নেই।…ও হরি, তুমি এখনই উঠে দাঁড়ালে যে—বসো বসো। কিছু একটু আনাই খেয়ে যাও।'

'না না—এক জায়গায় নেমন্তন্ন ছিল, আপনার ওই ছাপাখানার পাড়াতেই—একপেট খেয়ে আসছি। ওসব দরকার নেই। আর এক দিন তখন—।

আজকের মতো উঠি।'

'উঠবে? তা ওঠ।' একটু যেন ক্ষুণ্ণ কণ্ঠেই বলে শরৎ, 'তোমার তো আবার সেই হাওড়ায় গিয়ে ট্রেন ধরা। রাতও হয়ে যাচ্ছে বটে। আচ্ছা, এসো তা হলে। মোদ্দা মধ্যে মধ্যে—যদি এদিকে কাজকর্ম কিছু থাকে, একটু খবর নিয়ে যেয়ো বাবা।'

তার পর আরও খানিকটা ইতস্তত ক'রে—প্রথম থেকে যে প্রশ্নটা ঠোঁটের কাছে ঠেলাঠেলি করছিল, হেম ঘরের বাইরে পা দিতেই যেন হঠাৎ সেটা ক'রে ফেলে, 'তোমার—তোমার ছোট মাসী ভাল আছেন? গিয়েছিলেন নাকি তোমার বিয়েতে?

'না, উনি তো কোথাও যান না। তবে ভালই আছেন—যত দূর জানি। ক'দিন আগেও বড়দার সঙ্গে নাকি দেখা হয়েছিল।'

'বড়দা—মানে গোবিন্দ?…অ। ভাল থাকলেই ভাল। আচ্ছা এসো।'

॥ ৪ ॥

হেম কিন্তু তখনই বাড়ির দিকে গেল না, বরং উলটো দিকেই হাঁটতে শুরু করল। এখনই উমার বাড়িতে যাবে সে। আজই এর একটা বিহিত ক'রে ফিরবে—তা সে যত রাতই হোক।

উমা তখন সবে পড়িয়ে ফিরে কাপড় কেচে পুজোয় বসতে যাচ্ছে। হেমের গলায় আওয়াজ পেয়ে তাড়াতাড়ি এসে দোর খুলে দিলে।

'কী রে, এত রাত্রে হঠাৎ? খবর সব ভাল তো?' উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করে উমা।

'আমাদের খবর সব ভাল। আজ এদিকে এসে পড়েছিলুম—খবর নিতে মেসোমশাইয়ের ছাপাখানায় গিয়েছিলুম—তাই।'

বুকের মধ্যেটা কেমন যেন ঢিব্ ক'রে ওঠে উমার। সে কোন প্রশ্নও করতে পারে না। অসহায়ভাবে হেমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শুধু। হঠাৎ যেন পায়ের জোরটাও কমে যায় অনেকখানি। একটু কাঁপুনির ভাব টের পায় নিচের দিকটায়। তাড়াতাড়ি কপাটটা ধরে ফেলে সে।

'না—না। সে রকম কিছু নয়। বলছি, ব্যস্ত হয়ো না।' উমার অবস্থাটা হ্যারিকেনের আলোতেও লক্ষ্য করে হেম।

উমা আশ্বস্ত হয়ে ভেতরে এসে ওকে পথ ছেড়ে দেয়। মাদুরটা বিছিয়ে বসতেও দেয়।

একটু হাসিও পায় নিজের অবস্থা লক্ষ্য ক'রে। স্বামী বলে যাকে ডাকবার কোন অধিকারই নেই—এক বিয়ের রাতের কটামন্ত্র ছাড়া—তার জন্যই তার এ কি উৎকণ্ঠা! এ কী শুধু নিজের এই এয়োস্ত্রী অবস্থার সুবিধার জন্যই? মাছ খাওয়া তো সে ছেড়েই দিয়েছে বহুকাল। শুধু এই লালপাড় শাড়ি, এই লোহা-গাছটা আর শাঁখা দু'গাছা! ব্রত-পার্বণে ছাত্রীদের বাড়ি থেকে কিছু পাওনা

হয়—এই তো !

হেম মাদুরে বসে বলে, 'মেসোমশাই প্রেস লীজ দিয়ে দিয়েছে—মানে ভাড়া আর কি ! প্রেসে আসেও না, বসেও না, দেখাশুনোও করে না। শরীরে আর কিছু নেই—দেখলে চিনতে পারবে না তুমি—কঙ্কালসার হয়ে গেছে একেবারে—ঐ বাহারে চোখদুটো তেমনি না থাকলে চিনতে পারতুম না সত্যিই। হাঁপানির মতো হয়েছে নাকি—বসে বসে হাঁপাচ্ছে। তার ওপর সে বাসা-টাসা সব উঠিয়ে দিয়ে—বললে বিশ্বাস করবে না—নতুন বাজারের পেছনে এক এঁদো গলির ভাঙা পুরনো ড্যাম্প বাড়ির এক মেসে একতলার ঘরে আছে। এ আত্মহত্যা ছাড়া আর কি ?···কলকাতায় যে অমন বাড়ি আছে তা না দেখলে বিশ্বাস হ'ত না আমার !'

'কেন ? আর মেস পায় নি ? বাড়িই বা ছাড়লে কেন ? না কি পয়সা নেই ?'

কণ্ঠস্বরটা যেন অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ শোনায়। উমা নিজেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ে নিজের গলার আওয়াজে। আসলে কঠিন করবার প্রাণপণ চেষ্টাটাকেই অন্তরের ব্যাকুলতা যে বিদ্রূপ ক'রে গেল—এ তীক্ষ্ণতা যে ব্যগ্রতারই নামান্তর তা কি হেমের বুঝতে বাকী থাকবে !

হেম অবশ্য কী বোঝে তা সে-ই জানে। সে একটু বোধ হয় ভয় পেয়েই যায়। সামান্য একটু হাসবারমতো ভঙ্গী ক'রে বলে, 'সে বাড়িতে একা একা নাকি থাকতে পারছিল না, তাই মালপত্র সব বেচেকিনে সে বাড়ি একেবারে ছেড়ে দিয়ে ঐ মেসে এসে উঠেছে। ছাপাখানার দরুন ভাড়াই পায় মাসে চল্লিশ টাকা—তবু বেছে বেছে ঐ সাত টাকার মেসে এসে না উঠলে চলছিল না !···আসলে ওঁর কথার ভাবে যা বুঝলুম—এখন টাকা জমিয়ে যাচ্ছে—বোধ হয় তোমাকে দিয়ে যাবে বলে।'

শেষের কথাগুলো একটু ভয়ে ভয়েই বলে হেম।

আর ভয়ের কারণও যে ছিল—তা বোঝা গেল বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।

উমার সে তপ্তকাঞ্চন বর্ণের কিছুই আর নেই সত্য কথা—রোদে পুড়ে জলে ভিজে বাইরে ঘুরে ঘুরে মুখটা তামাটে হয়ে গেছে একেবারে—তবু অপমানের এবং উষ্মার গাঢ় লাল রংটা হেমের চোখে পড়ে। আগুনের মতোইজ্বলেওঠে উমা। বলে 'হ্যাঁ, অনেক তো দিয়েছে—ঐ উপকারটাই বাকী আছে শুধু। মরবার সময় টাকা দিয়ে স্বামীর কর্তব্য ক'রে যাবে—না ! আস্পদ্দা !'

হেম চুপ ক'রে বসে থাকে। সে যা বলতে এসেছিল—এ যেন উল্‌টোটা হয়ে গেল। কিন্তু একটু পরে উমাই শান্ত হয়ে আসে। হেমের কথাগুলো—আগের কথাগুলো যেন মনেমনে একবার উচ্চারণ করে। 'কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছে।' 'দেখলে চেনা যায় না।' 'একা সেই ভিজে ঘরে বসে বসে হাঁপাচ্ছে।' 'এ আত্মহত্যা ছাড়া আর কি।'

ওর মনে পড়ে সেদিনের কথাগুলো। শরতের সেই বিবর্ণমুখে বেরিয়ে যাওয়া।

সেই অসহায় দীন ভঙ্গিটা। সে চলে যাবার পর অনুতাপের শেষ ছিল না উমার। কে জানে সেদিনের সেই আঘাতের ফলেই লোকটা এমনভাবে নিজেকে শেষ ক'রে দিচ্ছে কিনা।

হঠাৎ যেন ছট্‌ফট্‌ ক'রে ওঠে সে ভেতরে ভেতরে। কিন্তু প্রাণপণে সে আকুলতা দমন ক'রে মুখে শুধু বলে, 'তা এ কথা এত রাত্তিরে আমাকে বলতে এলি কেন?'

হেম তবুও চুপ ক'রে থাকে। কেন এনেছে সেটা যেন বলতে আর ভরসা পায় না। তার উত্তরে আবার জ্বলে উঠবে কিনা কে জানে।

'এখানে—মানে আমার কাছে এনে রাখতে চাস?' যতদূর সম্ভব শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করে উমা। হঠাৎ এ আশ্চর্য শক্তি কোথা থেকে পেল ও আত্মদমন করবার, নিজেই ভেবে অবাক হয়ে যায়।

'নইলে মেসোমশাই আর বাঁচবে না।'

এতক্ষণে কথাটা বলে ফেলে যেন বাঁচল হেম।

এবার উমার চুপ ক'রে থাকার পালা।

কত কী মনে হচ্ছে তার। কত বিস্মৃত স্মৃতি ভিড় ক'রে আসছে চিন্তার দরজায়। কত ভুলে যাওয়া আবেগ উদ্বেল হয়ে উঠছে। যে সব চিত্তবৃত্তি মরে গেছে ভেবেছিল—সেইগুলোই জেগে উঠেছে আবার—একসঙ্গে।

মনের ঝড় কান পেতে কি বাইরে থেকে শোনা যায়?

কার বুকে উঠেছে ও ঝড়? কার মনে বেধেছে লড়াই?

উমা যেন বহু দূর থেকে নিরাসক্ত ভাবে চেয়ে থাকবার চেষ্টা করে। যেন অনেকখানি ব্যবধান থেকে শোনার চেষ্টা করে সে ভয়ংকর কোলাহল।

তার পর—তেমনি যেন অনেক দূর থেকেই ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করে সে, 'সে কি আসবে মনে করিস?'

'তুমি—তুমি বললেই আসবে। তুমি একবার যেতে পার না?'

'আমি যাব—সেই মেসে? লোকে বলবে কি?'

'তুমি বাইরে গাড়িতে বসে থেকো। সে গলিতে তো গাড়ি যাবে না। দূরেই থাকতে হবে। তুমি চল লক্ষ্মীটি!'

'আমার এত করার গরজ?

আবারও তীক্ষ্ম কণ্ঠে প্রশ্ন করে উমা। কিন্তু এবার হেমও বুঝতে পারে—এ প্রশ্ন হেমকে নয় তার—নিজেকে।

সুতরাং সে চুপ ক'রেই থাকে। উমাই একবার অসহায় ভাবে চারদিকে চায়। এই ঘরে মা'রই আসবার বোঝাই। সেদিকে চেয়ে মাকে মনে করবার চেষ্টা করে সে। বোধ হয় মা'র এই স্মৃতির মধ্যে থেকে তাঁর একটা নির্দেশ পাবারও আশা করে।

সেদিকে চেয়েই মনে হয়—কে যেন মনের মধ্যে বলছে, 'তুমি বড় ছোট হয়ে যাচ্ছ উমা। এখনও এই অভিমানের ঊর্ধ্বে উঠতে পার নি?'

সত্যি—অভিমান কি কখনও মরে না ?

তার পর কতকটা ছেলেমানুষের মতোই বলে, 'এই তো ঘর। বাড়িওলাই কি রাজী হবে ? আর সে যে বড় লজ্জার কথা—এখন এ কথা বলতে যাওয়া !'

'আমি—আমি একবার বলে দেখব ?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে হেম।

'না না—সে আরও লজ্জার কথা। তুই একটা কাজ করতে পারবি বাবা ? কাল তো রবিবার, সকাল ক'রে খেয়ে-দেয়ে চলে আসবি একবার ?'

'নিশ্চয় আসব। আমি আটটার মধ্যে পেঁছে যেতে পারি।'

'না না—খেয়ে-দেয়ে দশটা-এগারোটায় আসিস, তা হলেই হবে।'

হেম খুশী হয়ে চলে যায়।

উমা আর একবার অসহায় ভাবে তাকায় ঘরটার দিকে। যেন মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যেকার বাতাস কমে গেছে একেবারেই। শ্বাস নেওয়া যাবে না একটু পরে। যেন অদৃশ্য এক শক্তি তার গলা টিপে ধরছে।

সে ছুটে গিয়ে ঘরের বাইরে ভেতরের খোলা উঠোনটায় দাঁড়াল।

পরের দিন হেম যখন এল—তখনও উমার চোখ লাল, হয়তো রাত্রিজাগরণের ফলেই। সম্ভবত সারারাতই ঘুমোতে পারে নি বেচারী। তার দিকে তাকিয়ে হেমের কষ্টই হতে লাগল। কেনই বা এর মধ্যে জড়াতে গেল ওকে! সত্যিই যার কাছ থেকে এতটুকু কিছু পেলে না—তার প্রতিই বা কর্তব্যপালনের কী এত গরজ! উমা কিন্তু কথা কইল খুব সহজ ভাবেই।

'বাড়িওলাদের বলে মত করিয়েছি। বুড়ো মানুষ থাকবেন, বাইরের পাইখানা আর কলতলা ব্যবহার করবেন—ওঁদের আপত্তি হবে না। শুধু তাই নয়, ওঁরা এই সিন্দুক আর দেরাজটা আপাতত ওঁদের ঘরে রাখতে রাজী হয়েছেন। যদি ওঁরা পাশের ছোট ঘরটা খালি ক'রে সারিয়ে দিতে পারেন তো চার-পাঁচ টাকা ভাড়া বেশী দেব তাও বলেছি।···সে থাক গে, তোকে একটা কাজ করতে হবে—কোথায় তক্তপোশ পাওয়া যায় আমি তো জানি না—খোঁজ ক'রে একটা কিনে আনতে হবে।···টাকা নিয়ে যা—একজনের মতো ছোট তক্তপোশ, নইলে ধরবে না। আর দ্যাখ, একটা পাশবালিশ চাই। ভাল বড় তৈরী পাশবালিশ ওয়াড়সুদ্ধ কিনে আনিস। যে মুটেতে তক্তপোশ আনবে তাদের দিয়েই এই দেরাজ সিন্দুক ওপরে ওদের ঘরে বই করতে হবে।'

হেম এতটা আশা করে নি। সে মহা উৎসাহে টাকা নিয়ে বাজারে চলে গেল।

মুটে দিয়ে মাল সরিয়ে চৌকি পেতে যখন ঘর ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে স্নান ক'রে এল উমা—তখন বেলা তিনটে।

এতক্ষণে খেয়াল হল হেমের।

'তুমি কিছু খেলে না তো মাসী ?'

'সকালে পুজো সেরে একটু জল খেয়ে নিয়েছিলুম। আর কিছু লাগবে না।

চল বেরিয়ে পড়ি। সন্ধ্যের সময় একেবারে রাঁধব।'

'দাঁড়াও। তোমার না হোক, আমার ক্ষিদে পেয়ে গেছে ছুটোছুটি ক'রে। আগে একটু খাবার আনি।'

হেম ছুটে গিয়ে খানকতক কচুরি আর দুটো কি মিষ্টি নিয়ে আসে।

উমা ম্লান হাসে। এ ক্ষিদে যে ছেলের কিসের তা বুঝতে তিলমাত্র বিলম্ব হয় না তার। সে প্রতিবাদও করে না, অনাবশ্যক বুঝেই। মিছিমিছি কথা-কাটাকাটি ক'রে লাভ নেই—সেই ধরপাকড়, পীড়াপীড়ি। কোন তর্ক-বিতর্কেই তার রুচি নেই আর। যা করতেই হবে বুঝছে তার জন্য দেরি করতেও ইচ্ছে করে না। আসলে সে ক্লান্ত। করছে, সবই করছে ও—কিন্তু ভেতরে ভেতরে এ যে কী প্রচণ্ড অবসাদ আর সীমাহীন ক্লান্তি—তা শুধু সেই বুঝছে।

হেম ছুটেই ফিরল খাবার নিয়ে—নিজেই পাতা খুলে দু ভাগ ক'রে সাজাল। এক ভাগ এগিয়ে দিল মাসীর দিকে। হয়তো প্রচণ্ড একটা প্রতিবাদ আসবে ভেবেছিল, কিন্তু কিছুই করল না উমা, শুধু বলল, 'দাঁড়া জল গড়াই একটু।'

তারপর নিঃশব্দেই খেতে শুরু করল।

ছোট মাসীর বড়ই খিদে পেয়েছিল—মনে মনে ভাবে হেম।

শরতের দিক থেকেও যতটা প্রবল আপত্তি উঠবে—যতটা বেগ পেতে হবে রাজী করাতে—বলে আশংকা করেছিল হেম, ততটা কিছুই হ'ল না। শুধু যখন সে গিয়ে বললে, 'ছোট মাসী বাইরে গাড়িতে বসে আছে, আপনাকে ডাকছে', তখন প্রথমটা শরতের একটু দেরি হয়েছিল কথাটা বুঝতে। মুহূর্তকয়েক তাকিয়ে ছিল হাঁ ক'রে হেমের মুখের দিকে। তার পরই বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, 'কে, কে ডাকছে বললে—তোমার ছোট মাসী? কেন বল তো? কোন বিপদ-আপদ নাকি?…চল চল আমি যাচ্ছি!'

ব্যস্ত হয়েই উঠে দাঁড়িয়েছিল। রোগা মানুষ, দুর্বল শরীর—পাছে আবার ছুটে যাবার চেষ্টা করে বলে হেমই তাড়াতাড়ি ওর হাতটা ধরে ফেলে, 'না না, তেমন কিছু নয়, ব্যস্ত হবেন না আপনি। আস্তে আস্তে চলুন!'

সে-ই হাত ধরে নিয়ে চলল গাড়ি পর্যন্ত।

'কী ব্যাপার—তুমি এমন হঠাৎ?'

গাড়ির সামনে গিয়ে প্রশ্ন করে শরৎ।

সত্যিই তার দিকে চেয়ে প্রথমটা যেন চিনতে পারে না উমা। এই কি সেই মানুষ! তার চোখে যেন অকারণেই জল এসে যায়। সে তাড়াতাড়ি মুখটা নিচু ক'রে বলে, 'আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। উঠে এসো।'

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। শরতের আবারও খানিকটা সময় লাগে বুঝতে।

'নিয়ে যেতে মানে—? তোমার কাছে? বাস করব?'

'আমার কাছে না হলে আর নিয়ে যাবার কথা তুলব কেন?'

'ও, হেম সেদিন দেখে গিয়ে বলেছে বুঝি? তা এই ঘাটের মড়াকে আবার

সেধে কেন ঘাড়ে চাপাচ্ছ মিছিমিছি ?'

'ঘাটের মড়া বলেই তো ঘাড়ে চাপাচ্ছি। এই সময়ই তো আমার দরকার।'

আরও একটা কথা মুখে এসেছিল। মনে হয়েছিল বলে, স্ত্রীর প্রয়োজন দুর্দিনে—রক্ষিতা সুখের দিনের সঙ্গিনী। কিন্তু দুর্বার বলে মনকে শাসন করে ও। কটু কথা আর বলবে না। তা ছাড়া সে স্ত্রীলোকটা মৃত। সেও ভালবাসত নিশ্চয়। থাক।

শরৎ একটু হাসে। বলে, 'তা বটে। মলেও—খবর পেলে তোমাকেই যা কিছু শ্রাদ্ধ-শান্তি করতে হবে। এমনিই শাস্তরের আইন। তা আজই যাব ? এখনই ? জিনিসপত্রগুলোর কিছু করা হ'ল না যে—!'

'তুমি উঠে এসে বসো, তোমার পা কাঁপছে। জিনিস—হেমকে বলে দাও, মোটামুটি যা আছে নিয়ে আসুক। বাকী যা আর একটা রবিবার এসে হেমই নিয়ে যাবে। টাকাকড়ি যদি ওদের পাওনা থাকে তো তাও চুকিয়ে দাও।'

'না, টাকা আগাম দেওয়া আছে। আর সে কীই বা টাকা।…আচ্ছা, হেম তুমি চাকরটাকে ডাক তো, রঘু ওর নাম। ওকে বলে দিই—বিছানা-বাক্সগুলো তোমাকে দিয়ে দেবে।'

সে ক্লান্তভাবেই গাড়িতে উঠে সামনের দিকটায় বসে পড়ে।

বাড়িতে এসে মুখ-হাত ধোবার জল দিয়ে প্রশ্ন করে উমা, 'রাত্রে কী খাও ?'

রাত্রে ? কী খাই ?' আবারও হাসে শরৎ, 'ভাল থাকলে দু-একখানা রুটি খাই ভাতও খাই এক-আধ দিন—নইলে দুধসাবু। মানে খেতুম। তবে এখানে মেসে তো ঢালা ব্যবস্থা। অত তোয়াজ করে কে! ভাল থাকলে যা পারি খাই—নইলে একটা মিষ্টি আনিয়ে খেয়ে শুয়ে থাকি। দুধসাবু খেলেই ভাল থাকি!'

'তবে তো আমারও সুবিধে। আমার তো ঐ খাদ্য।'

সে ছোট উনুনটায় গুল ধরিয়ে সাগু চাপিয়ে দেয়।

তার পর নতুন চৌকিটাতে পরিপাটি ক'রে বিছানা করতে থাকে।

বিছানা ক'রে সদ্য কেনা পাশবালিশটা যখন সাজিয়ে রাখছে—শরতের মনে পড়ে গেল কথাটা।

ভোলে নি উমা। কথাটা ভোলে নি। এ বোধ হয় কোন মেয়েই ভুলতে পারে না।

নিজের অন্যায়ের বিপুল আয়তনটা এই প্রথম যেন উপলব্ধি করে শরৎ।

ওদের ফুলশয্যার রাত্রে শরৎই পাশবালিশটা আড়াল দিয়েছিল—সদ্য-বিবাহিত স্বামী আর স্ত্রীর মাঝখানে, পাছে ছোঁয়া লাগে। রক্ষিতার প্রতি একনিষ্ঠা বজায় রাখতে স্ত্রীর স্পর্শদোষ বাঁচিয়েছিল।

সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একটু করুণ হাসি ফুটে উঠল শরতের মুখে। প্রায় চুপি চুপি বললে, 'পাশবালিশটা ভোল নি দেখছি!'

'না। কিছুই ভুলি নি। ও কি ভোলবার!' প্রায় সহজ কণ্ঠেই বললে উমা, তবু তখনই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওর সামনে না চোখের জল পড়ে,

গলা না কেঁপে যায়। বড় বেশী দৈন্য প্রকাশ পাবে তা হলে।...

নতুন শয্যা, নতুন মানুষ।

এই প্রথম স্বামী তার ঘরে শয্যা গ্রহণ করছেন। তবু কত দূর! কত ব্যবধান!

আলোটা নিভিয়ে নিজের বিছানায় এসে শুতে শুতে সেই কথাটাই মনে হ'ল উমার।

এ কি এই কয়েক হাতের ব্যবধান মাত্র? দুটো বিছানার মাঝখানে এই সামান্য দূরত্ব? এ যেন ওদের মধ্যে জন্মজন্মান্তরের যুগযুগান্তরের সুবিপুল ব্যবধান। সে ব্যবধান আর ঘুচবে না। ঘুচবে না বলেই সে নিজে এই ছোট্ট ব্যবধানটির ব্যবস্থা করেছে। বিরাট অন্তরালের প্রতীক স্বরূপ, সেদিনের সেই অন্তরালের স্মৃতি স্বরূপ—পাশবালিশটা কিনে আনিয়েছে।

যত দিন স্বামীকে সে কাছে পায় নি—যখন কাছে পাওয়ার কোন আশাও ছিল না—তত দিন তখনও কোথায় যেন একটা অতি ক্ষুদ্র, অতি ক্ষীণ আশা বেঁচে ছিল। আজ স্বামী তার কাছে ফিরে এসেছেন, হয়তো অবশিষ্ট চিরদিনের জন্যই ফিরে এসেছেন– তবু আজ সে নিজে হাতেই সে আশার সমাধি রচনা করল—ঐ পৃথক শয্যাটি পরিপাটী ক'রে পেতে দিয়ে।

আজ আর সম্ভব নয়। আর কিছুতেই সম্ভব নয়। আজ এক শয্যায় শুতে গেলে বিপুল পরিহাস হয়ে দাঁড়াত। ভাগ্যের বহু পদাঘাত সহ্য করেছে সে—আর নয়।

অন্ধকার ঘরে, অন্ধকার শয্যায় হাতড়ে হাতড়ে এসে শুয়ে পড়ল সে। অনেক --অনেক দিন পরে প্রায় মরুভূমি-হয়ে-যাওয়া শুষ্ক চোখে কোথা থেকে অশ্রুর উৎস জেগেছে। দুই চোখ জ্বালা ক'রে জল এসে ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। আলোর একটা ক্ষীণ আভাস পর্যন্ত না।

কত দিন পরে মাকে মনে পড়ছে তার।

'মাগো এবার আমাকে নাও। আমাকে নাও। কত দিন ভুলে থাকবে আর?'

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

এ বাড়িতে কনকের পক্ষে একমাত্র বৈচিত্র্য—এবং বোধ হয় কিছুটা আনন্দ ও সান্ত্বনার স্থলও হ'ল নরেন। বস্তুত নরেন যদি না থাকত তো সে টিঁকতে পারত না। হয়তো পাগল হয়ে যেত এত দিনে। স্বামী উদাসীন, প্রায় গৃহত্যাগী—ছুটির দিন সকালে মাত্র ক'ঘণ্টা সময় সে জেগে এ বাড়িতে থাকে—কিন্তু সেও ভোর থেকে স্নানাহারের সময় পর্যন্ত তার বাগানেই কাটে। ননদ বিদ্বিষ্ট—দিনরাতই কলহের সহস্র ফাঁদ পাতছে—অতি কৌশলে সে ফাঁদ এড়াতে হয়। কনকের অপরিসীম ধৈর্য তাই, নইলে প্রতি মুহূর্তেই দারুণ ঝগড়া বাধত। তার বিবাদের ফাঁদ এড়াতে হয় মানে তাকেও এড়াতে হয়। সামনে পড়লেই

বাক্যবাণ ছুটতে থাকে—কাঁহাতক সহ্য হয় মানুষের। তাঁর ভয়ে ভাগ্নী সীতাটার সঙ্গেও কথা কইতে পারে না। আড়ালে আবডালে কথা করে দেখেছে—সে মেয়ে আবার এমন, কার সঙ্গে কী কথা হ'ল প্রত্যেকটি মার কাছে গিয়ে গল্প করে। তা থেকে বহুদিন ঝগড়ার সূত্রপাত হয়েছে। কনক প্রাণপণে মুখ বুজে (এবং কানও সম্ভবত, নইলে সেকথা হজম করা শক্ত) থেকে তা এড়িয়েছে। শাশুড়ীই সাবধান ক'রে দিয়েছেন, 'কেন মা ওদের সঙ্গে কথা কইতে যাও, খুব দরকার না থাকলে কয়ো না। ও ঝাড়বংশই পাজী, বুঝছ না?'

এ তিনজনকে আর শিশু-দেওরকে বাদ দিলে আর যে সুস্থ লোক এ বাড়িতে আছে—শ্যামা, সেও তার ওপর ঠিক যেন প্রসন্ন নয়। অথচ কেন যে নয়, তা কনক ভেবে পায় না। সে তার কাকী-জেঠীমার সমস্ত উপদেশ পালন ক'রে আদর্শ বধূ হবারই চেষ্টা করে। তার বাড়িরও আর কোন মেয়ে কিন্তু এতটা পারত না। কাজও একা এক-হাতে যতটা করা সম্ভব ততটাই করে—একটি কাজও ফেলে রাখে না। শ্বশুরের নোংরা কাজগুলো শাশুড়ী তাকে করতে দেন না—বার বার স্নান করতে হয় বলে। ওর একঢাল চুল, ভিজে থাকলে অসুখ করবে। শ্যামার চুল অসম্ভব পাতলা হয়ে গেছে, সামনেটা—মানে সিঁথির কাছটা তো চক্‌চকে টাকের মতোই হয়ে উঠেছে—সুতরাং তার দশবার স্নান করলেও ক্ষতি হয় না। এ ছাড়া ভোরের রান্নাটা তার—সেও গরজে, বাসিপাট সারতে হয় কনককে। শুধু বাসিপাট কেন—ঘর-দোর ঝাড়া-মোছা, রান্নাঘর দাওয়া উঠোন নিকোনো, ক্ষার কাচা, বিছানা তোলাপাড়া, বাসন মাজা—কী নয়? ঐন্দ্রিলার যেদিন মেজাজ ভাল থাকে সেদিন সে-ই রাঁধে—কিন্তু সে আর কদিন? তার অসহযোগের দিনই তো বেশী। সে সব দিনে কনককেই রান্না করতে হয়। এ ছাড়া শাশুড়ীর ব্যক্তিগত সেবাও করতে প্রস্তুত ছিল—যদি তাঁকে একদণ্ড স্থির দেখতে পেত! শ্যামা তার স্বামী-সেবার মুহূর্তগুলি ছাড়া অষ্টপ্রহরই থাকে তার পাতা-গামড়া গাছপালার ঠেকো এবং নারকেল সুপুরি ও সুদের হিসেব নিয়ে। রাত্রে অন্ধকারেও হাত থামে না—তখন চলে পাতা চাঁচা। (অন্ধকারে হাতও কাটে না তো—অবাক হয়ে কনক ভাবে এক-এক দিন।)... তাও শ্বশুরের খাওয়ানো নাওয়ানো ইত্যাদি বড় কাজগুলোর ভার তার ওপরই। তবু শাশুড়ীর মন পায় না কেন? ছেলে খুব বেশী ভালবাসলে অনেক সময় শাশুড়ীদের হিংসে হয় বৌদের ওপর। তার ঠাকুমা বলেন, 'ও হ'ল গে সতীনের হিংসে', মাগো কী নোংরা কথাই বলতে পারেন ঠাকুমা! কিন্তু এক্ষেত্রে তো সে কারণও নেই। সেটা নিশ্চয়ই এত দিনে লক্ষ্য করেছেন শাশুড়ী। তবে? সে কি এত ভাল, এত নির্বিবাদী, এত ঠাণ্ডা বলেই তাঁর রাগ? কোন খুঁত ধরে কি দোষ ধরে তাকে তিরস্কার করতে পারেন না বলেই? এক-এক সময় সেইটেই মনে হয় কনকের।

সুতরাং শ্বশুর ছাড়া এ বাড়িতে কোন আশ্রয় নেই তার।

নরেনও অষ্টপ্রহরই তার খোঁজ করে,—'কৈ গো, আমার মা-লক্ষ্মী কোথায়

গেলে গো মা, আমার মা-জননী? এসো মা এসো।…একটু বোস্ না মা কাছে, আমার কাছে বসলে তবু দু দণ্ড জিরোতে পারবি। নইলে ঐ মাগী—ও কি কম হারামজাদা মেয়েমানুষ—ও তোর মুখে রক্ত উঠিয়ে ছাড়বে, এই বলে দিলুম। খাটিয়ে খাটিয়ে মারবার জন্যেই তোকে এনেছে। জানিস না ওকে। ওদের ঝাড়ে-বংশে খচ্চর।…নিজে শুধু বসে বসে পাতা চাঁচবে আর পাতা কুড়োবে! ঐ পাতা ওর সঙ্গে স্বগ্গে যাবে। ঐ পাতায় ওর মুখে নুড়ো জবালা হবে। ঝাঁটা মারো ঝাঁটা মারো।'

তার পরই গলাটা নামিয়ে বলে, 'দিস না মা, আজ যখন কাঁচকলা সেদ্ধটা দিবি—তার সঙ্গে ঐ যে তোদের উঠোনে ধানিলঙ্কা আছে—ঐ একটু টিপে আর অমনি এক ফোঁটা তেল। শুধু শুধু ঐ কাঁচকলা সেদ্ধ যে আর খেতে পারি না—মুখে চড়া পড়ে গেল। আর কীই বা হচ্ছে! ওতেই কি আমি সেরে উঠছি?…দিবি মা? জিভটায় তবু একটু ছড়াঝাট পড়ে—?'

করুণ কণ্ঠে মিনতি করে।

মায়াও হয় কনকের, মন কেমন করে। সে নরেনের পূর্ব ইতিহাস কিছুই জানে না—ক'দিনে শাশুড়ী আর ননদের কথাবার্তার ফাঁকে আভাসে-ইঙ্গিতে যেটুকু জেনেছে—তাতে এমন কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না—সুতরাং তার মন-কেমন করার অনেক সঙ্গত কারণ আছে। তবু সে হেসে ঘাড় নাড়ে, 'না বাবা, সে আমি পারব না। মা আমাকে জ্যান্তে পুঁতবেন তা হলে। আপনার শরীর তাতে বড্ড খারাপ হবে। আর তা ছাড়া মরিচের গুড়ো তো একটু দেওয়া হয়—'

'হয়েছে? বিষমন্তর কানে ঢুকিয়েছে? দলে টেনে নিয়েছে মাগী? বাঁচলুম বাছা। জানি, মেয়েছেলে মাত্তরেই বেইমানের ঝাড়—। এ বাড়ির মাটির দোষ যে। এসেই অমনি গোড়ে গোড় পড়েছে।…যা দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে—ছোটলোকের মেয়ে গোরবেটী হারামজাদী—যা!'

কনক হাসতে হাসতে উঠে যায়। রাগ হয় না তার। এ গালাগাল গায়ে লাগে না। ছেলেমানুষের ছেলেমানুষিই মনে হয়।

আবার দু দণ্ড বাদেই ওদিক দিয়ে যেতে দেখলে ডাক পাড়বে, 'কৈ গো, আমার বৌমা কোথায় গেলেন! সন্তানকে একেবারেই ভুলে রইলেন যে।'

কিংবা বলবে, 'আর কবে কি করবি বেটী, আমার দিন যে ফুরিয়ে আসছে। এই বেলা আয়, দুটো-চারটে শলা দিয়ে যাই। আমার কথা শুনে রাখ্—নইলে ওদের সঙ্গে পেরে উঠবি কেন? দেখছিস ঐ মাগীর পাল্লায় পড়ে আমারই হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেল।'

আপন মনেই এসব কথা বকে যায় সে, কনক আসুক বা না আসুক।

শ্যামা এক-এক দিন হাসে, আবার এক-এক দিন অন্য মেজাজে থাকলে দাঁত কিড়মিড় করে, 'মুখে আগুন তোমার! আগুন পড়েও কাজ নেই। মুখখানি পচুক তোমার। লোকে বলে সর্ব অঙ্গ থাকতে মুখটি পুড়ুক—আমি তাও বলি না! পচুক, পচুক ও বেইমানের জিব পচে খসে পড়ে যাক। দিনরাত গু-মুত

খাটাচ্ছি তবু সেই এখনও আমার পেছনে না লাগলে আমাকে না গাল দিলে পেটের ভাত হজম হয় না।'

কনক হেসে বলে, 'কার ওপর রাগ করছেন মা? ওঁর কি জ্ঞান আছে কী বলছেন?'

'তুমি জান না মা, জ্ঞান নেই তাতেই ঐ, জ্ঞান থাকলে অষ্টপ্রহর আমার চোদ্দ-পুরুষকে চোদ্দবার নরকে ডোবাত।'

আবার মধ্যে মধ্যে নরেন চিনতেও পারে না কনককে। এসে দাঁড়ালে বলে, 'কে-ও—কে? ও মল্লিকদের বাড়ি থেকে এসেছেন বুঝি! বসুন, বসুন, আর কী দেখতে এসেছেন? কিছু কি আর আছে? ওরে কে কোথায় গেলি রে, একটা আসন দিয়ে যা না—মাগীর চিরদিন সমান গেল, ভদ্দরলোকদের আদর অভ্যর্থনা কিছু শিখলে না কোন দিন। আমাদের গা ইস্‌পিস্‌ করে এসব অসৈরন দেখলে, বুঝলেন না? আমরা কত বড় গুরুবংশের ছেলে—এসব যে নিয়ে জন্মেছি আমরা।...তা বসুন, ঐখানেই বসুন। ময়লা নোংরা যা দেখছেন আমার বিছানায়—মেঝে দিব্যি পোষ্কার—বৌমা আমার চোদ্দবার মুছে নিচ্ছেন। যাব যাব—একটু ভাল হয়ে উঠি, আপনাদের বাড়ি যাব। আর এই তো এখানেই রইলুম, ব্রতে কম্মে যখন ডাকবেন যাব।'

উঠোন থেকে শ্যামা শুনতে পেয়ে বলে, 'এ যে একেবারে সপষ্ট ভীমরতি ধরল দেখছি। কাকে কি বলছ, ও তো তোমার ব্যাটার বৌ।'

'ভীমরতি তোর ধরুক, তোর ছেলেমেয়েদের ধরুক। তোর চোদ্দগুষ্টির যে যেখানে আছে তাদের ধরুক। আমি চিনতে পারছি না। আসুন মা বসুন। ভাববেন না আমার সত্যি-সত্যিই মাথার গোলমাল হয়েছে—ওদিক থেকে আলোটা এসে পড়েছে কি না তাইতেই—'

তার পর বলে, 'বসুন মা, বসুন।'

কনক হাসি চাপতে পারে না বহু চেষ্টাতেও। বলে, 'ও কি, আমাকে বসুন বলছেন কেন?'

'দোষ নেই। কিচ্ছু দোষ নেই। বৌমা তো—মা যখন বলেছি তখন আর কথা কি। কখনও আপনি বলব কখনও তুই বলব। এ যে আপনার জিনিস—মনের মত জিনিস। কখনও মাথায় কখনও পায়ে। সংসারের দস্তুরই যে এই। আর আপনাকে আপনি বলব না তো কাকে বলব মা—কত বড় বংশের মেয়ে আপনি। বলি আমার তো এ তল্লাটের কোন বামুন-বাড়ি জানতে বাকি নেই। পূর্ণ মুখুজ্জেদের কত বড় বংশ ছিল, আজই না হয় দেখছেন অমনি ট্যানাপরা ছাতি-বগলে মুখ শুকিয়ে ঘুরছে—নইলে ওরাই তো ছিল ওখানকার জমিদার। তবে কী জানেন মা—এসব বুঝবে কে আজকাল? ইজ্জৎ বলুন, মর্য্যেদা বলুন—এ বোঝে সমানে সমানে। আমারাই কি একটা সাধারণ লোক।'

তার পর আবারও গলাটা অস্বাভাবিক নেমে আসে।

'দে না মা, একগাল চাল-কড়াই ভাজা একটু অল্প ক'রে তেলহাত বুলিয়ে?

বাকি শরীরটাই না হয় পড়েছে—দাঁত তো দেখছিস্, বাত্রিশপাটি বজায় আছে ঠিকঠিক। যার যা ধম্ম, দাঁতের কিছু চিবোবার না দিলে চলে? গলা ভাত আর চিঁড়ের মণ্ড খেয়ে খেয়ে দাঁতে জং ধরে গেল যে।...আচ্ছা চাল-কড়াই ভাজা না দিতে চাস্—নিদেন দুটো কাঁটালবীচি পুড়িয়ে দে!'

কনক নেতিসূচক ঘাড় নাড়লেই সঙ্গে সঙ্গে তার পিতৃবংশ সম্বন্ধে মত পাল্‌টে যায়, 'তা দেবে কেন? তা দিলে যে তবু সদ্‌বংশের পরিচয় দেওয়া হবে। গোরবেটি হারামজাদী মেয়ে আমার যেমন—খুঁজে খুঁজে কনে ঠিক করলেন। মাথা কিনলেন আমার। ছোটলোকের ঝাড় ওরা—ওদের চিনি না! ওদের সাত পুরুষ ডাকসাইটে ছোটলোক। মেয়ে আমার বেছে বেছে সেই ছোটলোকের ঝাড় ঘরে এনে পুরলেন।...একের নম্বর মামলাবাজ কুচকুরে লোক সব—মামলা ক'রে ক'রে সব্বস্বান্ত হয়ে গেল, তবু মামলা ছাড়তে পারলে না। ছোট লোকের বেটী ছোটলোক!'

আবার এক-এক দিন কী হয়—হঠাৎ কনকের রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, 'এসো মা এসো। দেক দিকি—এসে দাঁড়ালে ঘর যেন জ্বলে উঠল। মা আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। তা হ্যাঁ মা, একটা কথা বলছি—মনে কিছু ক'রো না—আমার ঐ মিলিটারী মেজাজের ছেলে, ঐ হেমচন্দরের কথা বলছি গো—উনি রোজ রোজ অত রাত ক'রে ফেরেন কেন মা? কী এমন ওর রাজকার্য চলে রাত তেরোটা অব্দি?'

কনকের হাসি হাসি মুখে যেন একটা ছায়া ঘনিয়ে আসে। মাথা হেঁট করে বলে, 'তা আমি কেমন ক'রে জানব বলুন!'

'সে কি কথা। জানি না বললে চলবে কেন? জান, খোঁজ নাও। জিজ্ঞেস কর, কৈফেত চাও। এত রাত অব্দি কোথায় কী ভাবে থাকে জানা দরকার। এ যে অতিশয় মন্দ কথা, যৎপরোনাস্তি খারাপ কথা। ঘরে এমন রূপের ঢাল বৌ, সে কোথায় আপিস কামাই ক'রে পেছনে পেছনে ঘুর ঘুর করবে, না—রাতদুপুর ক'রে বাড়ি ঢোকে। আমি যে সব টের পাই। না মা, খবরদার অত ঢিল দিও না। রক্ত বড় খারাপ ওর, ভারি বদ্ বীর্যে জন্ম। রাশ এতটুকু আলগা দিয়েছ কি মরেছ, দেখছ না ঐ ক'রে তোমার শাশুড়ী মাগীর হাড়ীর হাল হ'ল। বাপ কি বেটা সিপাই কি ঘোড়া—কুছ না হয় তো থোড়া থোড়া! আমি ঐ ক'রে ওর মার সব্বনাশ করলুম, আবার ও ধরেছে তোমাকে। তোমার শাশুড়ীর রূপটাই কি কম ছিল মা, বললে বিশ্বাস করবে না ঐ পোড়া চেলাকাঠের রং এককালে ছিল ঠিক বসরাই গোলাপ। আর তেমনি দুগ্‌গোপ্রতিমের মতো মুখ। এখন যা দেখছ তা দেখে বুঝতে পারবে না সে চেহারা। আমার হাতে পড়ে সেই চেহারা এই হয়েছে। না মা, এখন থেকে যদি রাশ না টেনে ধর, শতেক-খোয়ার ক'রে ছাড়বে। আমার বংশ আমি ভাল রকম চিনি!'

শামা দোরের বাইরে থেকে খরখর ক'রে ওঠে, 'হ্যাঁ তোমার বংশ শুধু হলে তাই দাঁড়াত বটে, তবে রক্তটা যে আমার। অমন ছেলে লোকে তপস্যা ক'রে পায়

না··· কেন মিছিমিছি বিষমন্তর ঢোকাচ্ছ ওর কানে তাই শুনি ! অমন কুমন্ত্রণা যদি দাও, বৌকে আর এ ঘরে আসতে দেব না !'

'না না বামনী, রাগ করিস নি। ভালর জন্যেই বলছি, তোর বরাত দেখেই আক্কেল হয়ে গেছে যে! সেই জন্যেই ভয় হয় !'

ওঃ, কত দরদ রে। এত দরদ তো কখনও বুঝি নি! আক্কেল হ'ল এই মরবার কালে—বলতে গেলে শয়ে উঠে? দু দিন আগে হলে যে তবু কাজ দিত— তুমিও জুড়োতে আমিও জুড়োতুম !'

'বরাত, বুঝলি বামনী, তোরও বরাত আমারও বরাত। নইলে এমন হবে কেন?···কৈ গো বোমা, অমন হাঁ ক'রে সঙের মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন—একটু তামাক সাজ না !'

॥ ২ ॥

বর্ষাটাকেই ভয় ছিল সব চেয়ে বেশী—সেই বর্ষা পার হয়ে যখন পুজো পর্যন্ত কেটে গেল তখন যেন মনে মনে একটু আশ্বস্ত হ'ল শ্যামা। হয়তো আর একটা বর্ষা পর্যন্ত টিঁকিয়ে রাখা যাবে। খুবই কষ্টকর—এই শয্যাগত রোগীকে সামলানো— বিশেষ সে যা ছেলেমানুষের মতোই অবুঝ—তবু শ্যামা তার মৃত্যুকামনা করে না ঃ 'আহা, বাঁচুক—আমি যত দিন আছি, আমার ওপর দিয়েই যাক—আর কাউকে তো জ্বালাচ্ছে না !'

হেমও যে ঠিক ওর মৃত্যু চায় তা নয়। একটু জ্বালাতন বোধ হয় এটা ঠিকই —তবু মানুষ তো। স্বাভাবিক অবস্থায় কোন মানুষই বোধ হয় কোন মানুষের মৃত্যু কামনা করে না।

মহা তো মহাখুশী। একটা গর্ব করার মতো কথা পেয়েছে সে। রান্নাঘর থেকে শুরু ক'রে পথেঘাটে সর্বত্র গলা চড়িয়ে খবরটা দেয়, 'হবে না? বলি মা'র এয়োতির জোর নেই?···মা কি একটা যে সে সতী? ঐ পুরুষের সঙ্গে ঘর করেছে তবু কখনও একবার উঁচু পানে চেয়ে দেখে নি। দেখছ না এখনও মা'র সিঁথির সিঁদুর কী রকম ডগডগ করছে লাল। আর শাঁখারই বা কী জেল্লা। ঐ জোরেই বাবা আবার ঠেলে উঠবে ঠিক—দেখো তোমরা !'

শুধু অভয়পদই ঘাড় নাড়ে, 'বলা যায় না ঠিক। অনেক সময় পচা বর্ষাও কাটে কিন্তু নতুন হিমের সময়টা কাটতে চায় না। পুরনো রুগী বেশী কাবু হয় শীতের মুখটায়।'

দেখা গেল অভয়পদর কথাটাই ফলে যায় শেষ পর্যন্ত। মহার আশা ব্যর্থ ক'রে এবং তার স্বামীর আশঙ্কা সত্য ক'রে অঘ্রানের শেষের দিকটায় একেবারে ফুলে পড়ে নরেন। দিনরাত পড়ে পড়ে হাঁপায়—জল পর্যন্ত সহ্য হয় না, এমন অবস্থা।

শ্যামার মুখ শুকিয়ে ওঠে। দু-তিন দিন দেখে হেমকে ডেকে বলে, 'আর একবার না হয় বড় ডাক্তারবাবুকেই ডাক। বাঁচবে না হয়তো, তবু লোকে বলবে যে একেবারে বিনাচিকিচ্ছেয় লোকটাকে মেরে ফেললে, সে বদ্‌নামটা তো বাঁচবে।

তুই রবিবার সকালেই বরং নিয়ে আয় ডাক্তারবাবুকে—'

হেম বোঝে যে লোকে যত না বলুক—মা'র মনই বলছে কথাটা। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। শনিবার সকাল ক'রে বাড়ি ফিরে বড় ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনে।

তিনি এসে গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়েন।

বাইরে গিয়ে বলেন, 'এ আমাদের ক্ষমতার বাইরে। হার্ট খুব ড্যামেজ্‌ড্‌—লিভারে আর কিছু নেই। আমার তো মনে হয় আর ওষুধ-বিষুধে পয়সা খরচ ক'রে লাভ নেই। অবিশ্যি কলকাতা থেকে নীলরতন সরকার-টরকারকে আনলে কী হবে জানি না—ও'রা কিছু করতে পারবেন কিনা। আমার আর কিছু করবার নেই। বরং টোট্‌কা-টুট্‌কি করা ভাল—অনেক সময় তাতে খুব ভাল রেজাল্‌ট্‌ পাওয়া যায়!'

হেম বলে, 'কিন্তু আগে কথাবার্তা সব গোলমাল হয়ে যেত—এখন সেগুলো বেশ পরিষ্কার।'

'ও অমন হয়। এসব রোগীর মরবার আগে মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়। লোকে বলে না হেগো রুগী মুখে দড়। ওটা তাই—'

অর্থাৎ যাকে বলে 'এলে দিয়ে যাওয়া' তাই গেলেন।

খবর পেয়ে মল্লিকদের বড় গিন্নী দেখতে এলেন। ক্ষীরোদাও অতিকষ্টে পাল্কি ক'রে একদিন দেখে গেলেন।

সবাই উপদেশ দিয়ে গেলেন শ্যামাকে, 'করছ কি, একটা প্রাচিত্তির—চান্দ্রায়ণ করিয়ে দাও। আর কেন?'

শ্যামা আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাল ক'রে চোখ রগড়ে মুছে স্বামীর কাছে এসে বসে। গলাটাকে নিয়েই যেন মুশকিলে পড়ে।...সহজ স্বাভাবিক আওয়াজ যেন আর বেরোতে চায় না।

অনেক কষ্টে, খানিকটা একথা সেকথার পর কথাটা পাড়ে, 'সবাই বলছে, বড় বেয়ানও বলে গেলেন, একটা চান্দ্রায়ণ করিয়ে দিতে—আর ঐ সঙ্গে একটা অঙ্গ প্রাচিত্তির। ওতে নাকি কষ্টটা কমে, অনেক সময় পরমায়ুও ফিরে পায়!'

নরেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়েই যেন ঝেঁজে ওঠে, 'কে, কোন্‌ গুয়োটা বলেছে তাই শুনি! গাঁজা গাঁজা, বুঝলি—স্রেফ গাঁজা। ছাই হয়। কী হবে প্রাচিত্তির ক'রে তাই শুনি—পয়সা বড় সস্তা হয়েছে তোর, না?'

'পয়সা সস্তা হবে কেন—কী কষ্টের পয়সা তা তো দেখতেই পাচ্ছ।...লোকে বলে—তাই! বলে মহাপাতক কেটে যায়, শরীরটা ঝরঝরে হাল্‌কা হয়ে ওঠে—'

'তুই থাম দিকি। ওসব আমার মতো বামুনদের পয়সা আদায়ের ফিকির! যদি পাপ ধরতে হয়—এ জীবনে এত পাপ করেছি যে তা তোর ও একহন্দর প্রাচিত্তিরেও কাটবে না! আবার এধারে তো তোদের শাস্তরেই বলেছে—একবার রামনামে যত পাপ হরে—মানবের সাধ্য কি যে তত পাপ করে।...তা একবার না হয় রামনামই ক'রে নিচ্ছি। আমার ওপর বিশ্বাস না হয়, তুই-ই না হয় দিনে দশবার ক'রে কানের কাছে রামনাম শুনিয়ে যাস্‌। চান্দ্রায়ণ! এক দিন উপোস ক'রে

খানিক ভেজাল ঘি খেলেই যদি সেরে উঠত আর ড্যাং ড্যাং ক'রে স্বর্গে যেত তা হলে আর ভাবনা ছিল না !'

একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে বোধ হয় খুব কষ্ট হয়, খানিকটা মড়ার মতো পড়ে হাঁপাতে থাকে।

খানিক পরে আবার চোখ খুলে বলে, 'ওসব বুজরুকি—বুঝলি বামনী—বুজরুকি। ভড়ং। ও আমিও ঢের করেছি। মন্তর যা পড়িয়েছি তা আমিই জানি—তাইতেই তারা সব নিশ্চিন্ত হয়ে স্বর্গে চলে গেছে।'

'হ্যাঁ—সবাই তোমার মতো বামুন কি না।' শ্যামা রাগ ক'রে বলে।

'সব সমান, সব সমান। কী জানিস, গুয়ের এপিঠ আর ওপিঠ। শোন্, তোকে এইবেলা চুপি চুপি একটা কথা বলে যাই—মাছ আর তোকে কে কত খাওয়াচ্ছে তা নয়—আমি থাকতেই তো মাছ খাওয়া বন্ধ হয়ে আছে বলতে গেলে। তবে—নিজে পুকুর করেছিস, মাছ-টাছ যদি ভাল ওঠে কোন দিন—মানে আমি যাবার পর বলছি—এদিক ওদিক দেখে দুখানা খেয়ে ফেলিস। কিছু দোষ হবে না। আমি বলে গেলুম। দোষ হয় আমার হবে। আমার ও তো পাপের ভারা পূর্ণ আছেই—তাতে আর একটু-আধটু চাপলে টেরও পাব না। কিছুতে কিছু হয় না বুঝলি। হবেই বা কি—মাকড় মারলে ধোকড় হয়, চালতো খেলে বাকড় হয়—শুনিস নি ছেলেবেলা? তাই! চোখ বুজলেই সব ফক্কিকার। অনেক দেখলুম, অনেক পুণ্যাত্মাও দেখলুম। কিছু না, কিছু না!'

শ্যামা আর বসতে পারে না। চোখের জল যে এই লোকটার জন্যেই তার এমন অবাধ্য হয়ে উঠবে তা কে জানত!

মহা শুনে কান্নাকাটি করে। স্বামীকে বলে, 'একখানা ভাল লালপাড় শাড়ি আনিয়ে দাও, আর মাছের মুড়ো—মাকে খাইয়ে আসি গিয়ে।'

অভয়পদ বলে' 'বল এনে দিচ্ছি। কিন্তু দু'দিন আগে খাওয়াতে পারতে, এখন কি আর মুখে উঠবে! এখন মাছের মুড়ো খাওয়াতে যাবার মানে কি আর তিনি বুঝবেন না।'

'তবু এসব করতে হয়। তুমি বড় সবতাইতে খুঁত কাট বাপু। তুমি বারণ করছ, এর পর লোকে বলবে অত বড় মেয়েটা ছিল, কিছু করলে না—'

'না, না—তুমি কর গে। আমি বারণ করি নি। দুর্গোকে বল—ও ভাল মাছ আনিয়ে দেবে।'

নরেন স্বয়ং ছেলেকে ডেকে পাঠায়। কাছে এলে বলে, 'বসো বাবা, বসো। দুটো কথা বলে নিই। দু'দিন পরে তো আর বলা হবে না। তুমি আমার সুপুত্তুর—আমিই কু-পিতা, কখনও কিছু কবতে পারলুম না, তা বলছি কি—সবই তো বুঝছ, তোমার গর্ভধারিণীর খাওয়া-পরা তো সব ঘুচতে চলল। এইবেলা একদিন একটু ভাল ক'রে মাছভাত খাইয়ে দাও। বৌমাকে বল, রেঁধেবেড়ে খাওয়াবে।'

তার পর একটু থেমে বোধ করি বা হেমের উত্তরেরই আশা করে।

কোন জবাব না পেয়ে আবার বলে, 'আর আমাকেও—যদি কিছু খাওয়াতে ইচ্ছে করে তো এইবেলা খাইয়ে দাও। আর ধরাকাঠ ক'রে কী হবে—বুঝতেই তো পারছ ধরাকাঠের বাবা করলেও বাঁচাতে পারবে না। বিবেচনা কর, মাগী তো চান্দ্রায়ণ প্রাচিত্তির করবে বলে ক্ষেপে উঠেছিল, তাতে তো এককাঁড়ি টাকা খরচ হ'ত—সেটা বাঁচিয়ে দিলুম। ছেরাদ্দশান্তিতে বেশী খরচ করো না—মরা গরু ঘাস খায় না। তা ছাড়া ও কত ছেরাদ্দ তো করালুম আমি, ভুজ্জিই বল পিণ্ডিই বল সব বামুনকে দেওয়া। কুশের বামুন খাড়া ক'রে তাকে তেল জল অন্নবস্ত্র দেওয়া। কেন রে বাপু? বলে জ্যান্তে দিলে না মুখে তুলে, মলে দেবে বেনার মুলে। তার চেয়ে তুমি আমাকেই যা হয় ভালমন্দ খাইয়ে দাও। যদি সেই বামুনকেই খাওয়াতে হয়—আমাকে খাওয়াতে দোষ কি? আমিও ধর গিয়ে তো বামুন। বামুন তায় বয়োজ্যেষ্ঠ তায় গুরুজন। যারপরনাই তোমার পিতা!'

হেম চুপ ক'রেই থাকে। তারই বা মনটা ক'দিন এত খারাপ লাগছে কেন তা বোঝে না।

অনেকক্ষণ পরে শুধু জিজ্ঞাসা করে, 'তা তোমার কি খেতে-টেতে ইচ্ছে হয়?'

'আমার? আমি বাবা সর্বভুক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার খাওয়ার ইচ্ছে। যা পার খাইয়ে দাও।'

'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খাওয়াবার তো আমার ক্ষমতা নেই। খুব বেশী যা খেতে ইচ্ছে হয় তাই বল।'

'খুব বেশী—?' খানিকটা ভেবে নেয় নরেন, তার পর বলে, 'কদিন ধরে প্যাতক্ষীরে বোঁদে ফেলে খেতে ইচ্ছে করছে খুব। তা পাতক্ষীর না পাও—একটু রাবড়ির ঝোল? আর একটু মাংস। করার অসুবিধে হয় কলকাতার কোন হোটেল থেকে একটু কিনেও আনতে পার। চার পয়সা—দু আনা? দেয় দেয়,—অমন ভাঁড়ে ক'রেও দেয়।'

হেম সেই দিনই খুঁজে খুঁজে একটু ক্ষীর আর বোঁদে কিনে আনে। মাংস বাড়িতেই রাঁধাবার ব্যবস্থা করে। মাছ মাংস তো হয়ই না কোন দিন, হলে তবু বৌটাও খেতে পারবে একটু। জলের মতো ডাল আর ডুমুর থোড় কাঁচকলা খেয়ে খেয়ে তো পেটে চড়া পড়ে গেছে। একেই পাত্‌লা পাত্‌লা গড়ন—তার ওপর এই খেয়ে রোগাও হয়ে গেছে খুব—সেটা এমন কি তারও চোখে পড়ছে কিছুকাল থেকে।

অভয়পদ প্রায় রোজই সন্ধ্যার সময় এসে খোঁজ নিয়ে যায়।

একদিন কাছে এসে বসতে নরেন গলাটা নামিয়ে বললে, 'বাবা অভয়, তোমাকে আর কী বলব তুমিই বলতে গেলে আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান—চিরদিন এ সংসারটা তো তুমিই ঠেললে। তা রইল সব, দেখোশুনো।...হ্যাঁ, বলছিলুম কি, বলতেও লজ্জা করে, কখনও তো এক পয়সার বাতাসা কোনদিন এনে দিতে পারি নি—তোমার কাছে এসব বলাও ঠিক নয়—'

বাধা দিয়ে অভয়পদ প্রশ্ন করে, 'খাবেন কিছু—বিশেষ কিছু খেতে ইচ্ছে করে?'

'ঠিক ধরেছ বাবা, মনের কথা টেনে নিয়ে বলেছ!' মহাখুশী হয়ে ওঠে নরেন—'বিশেষ কিছু নয়, খরচ-অন্তর করাতেই চাই নে তোমায়, শুধু একখানা প্যাজের বড়া আর একটা ঝাল-ফুলুরি'।

অভয়পদ তখনই বেরিয়ে গিয়ে কিনে আনে বাজার থেকে।

শ্যামা যেন শিউরে ওঠে, 'ঐ রুগীকে দেবে আবার, বাজারের তেলেভাজা ?'

'কি হবে মা না দিয়েই বা ? বুঝতেই তো পাচ্ছেন—! আত্মা খেতে চাইছে যখন এত ক'রে—দিয়েই দিন। এর পরে নইলে বহু আপসোস হবে। আর আমি এনেছিও একখানা ক'রেই ঠিক। বেশী দেব না!'

সে দুটো খুব তৃপ্তি ক'রে খায়। ক্ষীর-বোঁদেও চেটে খেয়েছিল—কিন্তু মাংস মুখে দিতে পারলে না। মুখে দিয়েই থু-থু ক'রে ফেলে দিলে। কেমন একরকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে পুত্রবধূর দিকে চেয়ে বললে, 'এইবার সত্যিসত্যিই শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে মা চিত্রগুপ্তের পেয়াদা। নইলে মাংস আমার মুখে তেতো লাগে! না, আর দেরি নেই।'

দেরি যে আর নেই তা সকলেই বোঝে এবার।

হেম কৌশল ক'রে বাপের মাংসর সঙ্গে একটু মাছ কিনে এনেছিল—সঙ্গে বসে খেলে—অত টের পায় নি শ্যামা। কিন্তু মহাশ্বেতা যেদিন তিন-চার রকম মাছ নিয়ে এসে রাঁধতে বসল সেদিন আর তার আসল অর্থটা শ্যামার বুঝতে বাকী রইল না। অভয়ের আশঙ্কাটাই আর একবার সত্য হ'ল। মেয়ে আর বৌ জোর ক'রে শ্যামাকে ধরে এনে পাতের কাছে বসাল বটে কিন্তু সেই সুস্বাদু মাছের একটা টুকরোও মুখে দিতে পারল না সে। ভাত ভেঙে মুখে দিতে গিয়ে পাতের পাশেই হাহাকার ক'রে আছড়ে পড়ল।

'কেন এনেছ এসব মা, এ তো আমি খেতে চাই নি। যেদিন থেকে আমার হরিনাথ গেছে সেইদিন থেকেই তো আমি পারতপক্ষে মুখে তুলি নি এসব। এতে ক'রে কি আমার লোহা-সিঁদুর বাঁচবে মা ?···সেই তো আমার আসল, সে-ই তো আমার সব।···ভগবান সব দিক দিয়ে মেরেছেন আমাকে চিরকাল, এইটুকু শুধু দিয়ে রেখেছিলেন—তাও কেড়ে নিচ্ছেন এবার। ওরে, ওর কি এই মরবার বয়স হয়েছিল—না বুড়ো হয়েছিল ও ? কেন এল এতকাল পরে আমার কাছে—এ কি এই দাগা দেবে বলে ? তার চেয়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াত, কোথায় থাকত কী খেত তা খবরও রাখতুম না, সেই তো ভাল ছিল। তেমনি ক'রেই ওকে বাঁচিয়ে রাখলেন না কেন ভগবান।'

সেদিন আর খাওয়াই হ'ল না কারুর।

মহা তবু জোর করতে যাচ্ছিল, কনক ইঙ্গিতে নিষেধ করলে। তার বয়স কম কিন্তু নারীহৃদয়ের সহজাত সহানুভূতি দিয়ে এটা বুঝেছিল যে, এ খাওয়ার চেয়ে শাস্তি মেয়েমানুষের আর কিছু নেই।

॥ ৩ ॥

এমনি করে প্রায় একুশ-বাইশ দিন এখন-তখন হয়ে কাটবার পর নরেনের ফুলোগুলো আবার একটু কমতে শুরু হ'ল। এই ক'দিন যে টনটনে জ্ঞান ছিল সেটাও চলে গেল, আবার সেই আগেকার আধো-আচ্ছন্ন ভাবে ফিরে গেল। কথাবার্তায় গোলমাল হতে লাগল।

সকলে ভাবল, এ টালটাও সামলে গেল—আবার ক'টা দিন অন্তত যুঝবে।

পর পর তিন শনি-রবিবার কোথাও ঘোরা হয় নি হেমের, সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। রাণীবৌদি এর মধ্যে দুবার এসে দেখে গেছে। নতুন গুড়ের সন্দেশ এনে নিজের হাতে খাইয়ে একরাশ আশীর্বাদ নিয়ে গেছে নরেনের—কিন্তু তাতে মন ভরে না। আড্ডার আলাদা সুখ। সুতরাং সে-শনিবার হেম প্রতিজ্ঞা করেই বেরিয়েছিল যে অন্তত সন্ধ্যা পর্যন্ত আড্ডা না দিয়ে সেদিন সে বাড়ি ফিরবে না। তার ওপর অফিসে গিয়েই শুনলে ওদের এক প্রাক্তন সাহেব বিলেতে মারা গেছেন, কাল খবর পেঁছেছে—আজ সেই শোকে দু'ঘণ্টা আগে ছুটি হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই বারোটাতে ছুটি সেদিন, তার দু'ঘণ্টা আগে—অর্থাৎ দশটাতেই সেদিন বেরিয়ে পড়তে পারবে। এটাকে সে ঈশ্বরেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বলে মনে করল।

কলকাতায় নেমে প্রথমেই সিমলের রাস্তা ধরল। কমলারা তখন খেতে বসেছে। গিয়েই তো কেড়ে-বিগড়ে রাণীবৌদির পাত থেকে খানিক ভাত তুলে খেয়ে নিলে, বড় মাসীর কাছ থেকে খানিকটা আমড়ার অম্বল। তারপর গোবিন্দর মেয়েটাকে নিয়ে লোফালুফি করল কিছুক্ষণ—এক কথায় অনেক দিন পরে অনেকটা হৈ-হৈ ক'রে যেন বাঁচল সে।

বেশ হাসি-খুশিতেই কাটছিল, কিন্তু খানিকটা গল্প করার পর নাতনী ও ঠাকুমা দুজনেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল রাণী। ইঙ্গিতে হেমকে পাশের—অর্থাৎ নিজেদের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, 'একটা কথা জিজ্ঞেসা করব ঠাকুরপো, ঠিক ঠিক উত্তর দেবে?'

হেম রীতিমত ঘাবড়ে গেল ওর কথা বলার ভঙ্গীতে। এ যেন নতুন এক রাণীবৌদি। এ মূর্তির সঙ্গে তো সে পরিচিত নয়! সে একটু ভয়ে ভয়েই বললে, 'কী ব্যাপার বল তো? কিসের কথা?'

'তুমি বৌকে নাও না কেন?'

ঠিক এই প্রশ্ন এবং এত স্পষ্টভাবে—শোনবার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না হেম। সে চমকে উঠল।

'কে বললে তোমাকে? যে বলেছে সে—সে মিথ্যে ক'রে লাগিয়েছে!'

'ভয় নেই, কনক বলে নি। সে মেয়েই সে নয়। তার বুক ফাটে তো মুখ ফাটবে না। ওসব মেয়েদের আমি ভাল ক'রেই চিনি। বিষম আত্মসম্মান জ্ঞান কনকের!'

'তবে—?'

'ওগো মশাই, আমাদের চোখ আছে, আমরা ঘাস খাই না। আমাকে তো চেন, পেটের কথা তোমারও জানতে কিছু বাকী নেই আমার। বল না কবে কোথায় কী ক'রে এসেছ সব বলে দিচ্ছি। ওকি, মুখ শুকিয়ে উঠল যে। ভয় নেই—জানলেই বলতে হয় না। কিন্তু এ আলাদা কথা। বড্ড ভুল করছ ঠাকুরপো। বাইরে বাইরে ঘুরে শুধু এঁটোপাত চাটাই সার হয়—আসল ভোজের স্বাদ তাতে মেলে না। তোমার বাবাও আর এক রকম ভাবে বাইরে বাইরে ঘুরেছিলেন - জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল তাঁর—অকালে বুড়ো হয়ে কী অবস্থায় মরছেন দেখতে তো পাচ্ছ। কী লাভ এমন এর দোরে ওর দোরে ঘুরে বেড়িয়ে আড্ডা দিয়ে বলতে পার ?'

'তুমিও এই কথা বলছ ? আমি আসি সেটা পছন্দ কর না ?' আহত কণ্ঠে বলে হেম।

'ছিঃ ! সে কথা বলছি না। কিন্তু তুমি কি পেলে ? দুটো মুখের কথা, হাসি, গল্প—এই তো ? বুকে হাত দিয়ে বল দিকি ! সুখ তোমার অন্যত্র। ঘরে সুখের সরোবর টলমল করছে—তা ফেলে আদাড়ে-পাঁদাড়ে খানা-ডোবায় ডুবতে যেও না। অনেক ভাগ্য ক'রে অমন বৌ পেয়েছ। আমার মতো রূপ নয় সে আমিও জানি ; এও জানি—তোমাকে বলেই বলছি, লোকে শুনলে অহঙ্কার বলবে—আমার মতো রূপ পথেঘাটে পড়ে থাকে না ! তা নিয়ে আপসোস ক'রে লাভ নেই ! যা পেয়েছ তাও কম না। তা ছাড়া ওর মনটা বড় ভাল, বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে। ওকে সুখী করো—তার চারগুণ সুখ তোমার লাভ হবে।'

আব্‌হাওয়াটা কেমন যেন বিশ্রী হয়ে গেল। থমথমে গম্ভীর।

এই জন্যে কি তিন সপ্তাহ পরে ছুটে এল সে আড্ডা দিতে ?

ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল সে একটা বেজে গেছে। হঠাৎ উঠে পড়ল।

রাণীবৌদি হেসে বললে, 'এখন কোথায় চললে তাও জানি। আমার কথা পছন্দ হ'ল না—কিন্তু একদিন বুঝবে। সেদিন না হায় হায় করতে হয় ! আমি খুব বোকা নই—আমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে না দিয়ে ভেবে দেখো।'

'তুমি বোকা ? তোমাকে যে বোকা বলে—শুধু সে-ই বোকা নয় তার ঝাড়েবংশে বোকা। গুপ্তকবির কবিতা—তুমিই শোনাচ্ছিলে না সেদিন ? আচ্ছা এখন আসি--'

হেসে, কথাটাকে হাল্‌কা ক'রে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে হেম। আর এক মুহূর্তও যেন ওর সামনে থাকতে সাহস হয় না। সাংঘাতিক মেয়ে। ঠিক কতটা জানে আর কতটা ওপর-চাপ—সেটুকু খোঁজ করতেও সাহসে কুলোয় না ওর।

•

হেম সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা নলিনীর বাড়িতেই যায়। রাণী ধরেছিল ঠিকই। হয়তো ঘড়ির দিকে তাকানো থেকেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু এ যাওয়াতে দোষ নেই। বিয়ের পর আরও কয়েকবার এসেছে। বসে গল্প ক'রে খেয়ে চলে গেছে। কিরণ ফিরেছে কাশী থেকে—তবে সে কিরণ আর নেই—এখন

ঝাঁজ অনেকটা কমে গেছে। হেমকেও সে আর খুব অপছন্দ করে না। বরং এক-এক দিন সেও বসে গল্প ক'রে যায় খানিকটা।

আজ অবশ্য কিরণ ছিল না। নলিনী একাই ছিল। এটা ওটা খুচরো গল্প, কিছু থিয়েটারের গল্প করে—নলিনী এখন আবার থিয়েটারে যাচ্ছে, অন্য থিয়েটার —হঠাৎ হেমের বিয়ের প্রসঙ্গে চলে এল। বললে, 'দ্যাখ হেমবাবু, সেদিন থেকে একটা কথা কইব কইব ক'রে আর বলা হয়ে ওঠে নি। অবিশ্যি বিয়ের কনে দেখেছি সেই এক দিন—কিন্তু বৌ তুমি বাপু ভাল পেয়েছ। তুমিই জিতেছ। আমি তো বলব অমন বৌ পাওয়া তোমার ঠিক হয় নি। তা তুমি এখনও এমন ক'রে এর দোরে ওর দোরে আড্ডা দিয়ে বেড়াও কেন?'

'তবে কি দিনরাত বোয়ের কাছে ধন্না দিয়ে বসে থাকব?' বিরক্ত হয়ে ওঠে হেম।

'তা বলি নি, তুমি রাগ ক'রো না। ঘরবাসী তুমি ঠিক হও নি। অনেক দেখলুম, মানুষের মুখ দেখলে বুঝতে পারি। এখনও বাউণ্ডুলে আছ। আর কেন? ঘরে লক্ষ্মী এসেছেন, ঘরবাসী হও গে। যেদিন দেখব তাঁর তৃপ্তি তোমার মুখে ফুটেছে—সেদিন বুঝব তুমি যথার্থ ঘরবাসী হয়েছ। সেদিন দু রাত আড্ডা দিলেও দোষ হবে না।'

হেম এই প্রসঙ্গটাতেই কেমন অস্বস্তি বোধ করে। দু-একটা অন্য কথা পাড়বার চেষ্টা করে কিন্তু আর যেন আলাপটা ঠিক জমে না। শেষে সে সেখান থেকেও উঠে পড়ে।

'ও কি—এরই মধ্যে চললে কোথায়?'

'ঘরে। ঘরবাসী হতে!...তুমিই তো উপদেশ দিলে!' ঈষৎ তিক্ততা ফুটে ওঠে ওর গলায়।

খপ ক'রে ওর কনুইটা ধরে ফেলে নলিনী, 'অমনি বাবুর রাগ হয়ে গেল বুঝি? আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে, আর কিছু বলব না, আমার ঘাট হয়েছে, বসে যাও একটু।'

হেম এবার হেসে ফেলে। বলে, 'তা নয়, বাবার অসুখ তো খুব—তিন শনি-রবিবার তো বেরোতেই পারি নি। সকাল ক'রে ফিরতেই হবে। আর এক দিন তখন আসব।'

'অসুখের নাম করলে কী বলব আর! মিথ্যে বলে থাক তো তোমার ধর্ম্ম জানে। এসো তা হলে, দুগ্গা দুগ্গা!'

তবু তখনই ঠিক বাড়ির পথ ধরতে পারে না হেম। তখনও বেলা রয়েছে বেশ। শীতের সূর্যও পাটে বসে নি। কী ভেবে সে পায়ে পায়ে তার পুরনো থিয়েটারের আড্ডাতেই গিয়ে ওঠে।

সেদিন শনিবারে, সকাল করেই থিয়েটার আরম্ভ হবে। গেট-কীপাররা এসে গেছে সকলেই। আর থিয়েটার না থাকলেও এসে এখানেই জড়ো হয় ওরা। হেমকে

দেখে সকলেই হৈ হৈ ক'রে উঠল। দক্ষিণাদার মুখে ওরা বিয়ের খবর পেয়েছে। কানাই বললে, 'কী বাবা—সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার শিব্‌স্ ফাদার ডোন্‌ট্ নো!···ওসব চলবে না—একদিন ভাল ক'রে খাওয়াও! আর এক দিন কেন, আজই হোটেলে বলে দাও—ঢাকাই পরোটা আর কোর্মা!'

নন্দ বাধা দিয়ে বললে, 'দূর! এ হোটেলে তো খাচ্ছিই। একঘেয়ে খাওয়া। টাকা ছাড়ুক, এক দিন কোন চীনে হোটেলে খাওয়া যাক। ওদের ওখানে ভাত-ভাজা নাকি খুব ভাল করে—কুঁচো চিংড়ি ফোড়ন দিয়ে!'

'দূস্!' কানাই উড়িয়ে দেয়, 'পয়সা খরচ ক'রে আবার কেউ কুঁচো চিংড়ির ফোড়ন খেতে যায়! ও তো দু'বেলাই খাচ্ছি। আর কি জোটে বল—চার পয়সায় কুঁচো চিংড়ি এই তো বাস্তুদেবতা। আর ভাত-ভাজা—সেও হামেশা—ভাত বেশী হলেই বৌদি ঐ কম্ম করে—তেলের ওপর পঁ্যাজ কুচিয়ে দিয়ে ভেজে নেয়! বলে খাও, চীনেবাজারী পোলাও।···না না, আমার এই ঢাকাইপরোটাই ভাল।'

'হবে হবে। এক দিন হবে।' বলে কাটিয়ে দেয় হেম, 'বাবার খুব অসুখ যাচ্ছে—এখন তখন অবস্থা।'

বলেই ভুলটা বুঝতে পারে হেম। কানাই সঙ্গে সঙ্গে কুট ক'রে বলে ওঠে, 'বাবার এখন-তখন অবস্থা আর তুমি থ্যাটারে বসে আড্ডা দিচ্ছ। ভ্যালা মোর বাপ্ রে।'

'না, এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলুম তাই।'

বলেই সরে পড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু সরে পড়া হয় না। দক্ষিণাদার সামনে পড়ে যায়। দক্ষিণাদা বলেন, 'কী রে—তোর বাবার অসুখ বলছিলি না? আমার কানে গেছে ঠিক—বাপের অসুখ আর তুমি এখানে শনিবার বজায় দিতে এসেছ?'

'না—না—এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম—তাই একটু খবর নিতে—'

'হাওড়া থেকে হাওড়ায় ট্রেন ধরবে—এদিক দিয়েই বা যাও কেন?···দ্যাখ্ আমি তোর সব খবর রাখি, কেন যে একটা মায়া পড়ে গেছে তা জানি না, তুই রাগ করিস তবু না বলে থাকতে পারি না···তুই এখনও রাত নটা-দশটা অবধি টো-টো ক'রে পথে পথে ঘুরিস প্রত্যহ—বহু লোক তোকে দেখতে পেয়ে আমাকে এসে বলেছে। নলিনীর কাছেও মাঝে মাঝে যাস শুনেছি। ওর ভাড়াটে রেণু আমাদের এখানে বেরোচ্ছে তো—সে-ই এসে বলে। কেন রে? বৌ মনে ধরে নি? দিব্যি খাসা বৌ তো দেখে এলুম। ওরে অমন করিস নি—ছেলেবেলায় যা ছোঁক ছোঁক করেছিস—এ বয়সে আর ঘুরে বেড়াস নি। আমার কথা শোন, ঠেকে শেখা আমার। ঘরে মন বসা। এখনও যদি ঘরে না আটকে যাস তো চিরকাল আমার মতো এই রকম ভেসে ভেসে বেড়াবি—জোয়ারের গুয়ের মতো কোন ঘাটে ঠাঁই হবে না। যতই হোক ঘরের বৌ—দোষ হোক ঘাট হোক সে সে ফেলতে পারবে না।'

কী বিপদ! আজ কার মুখ দেখে কলকাতায় পা দিয়েছিল কে জানে!

তার ভুরু কোঁচকানো দেখেই দক্ষিণাদা মক্কের ভাবটা বুঝতে পারেন, 'কী, পছন্দ হ'ল না তো কথাটা ! রাগ হয়ে গেল তো !'

'আপনার কথায় কবে রাগ করি দক্ষিণাদা, আপনি যে আমার ভালর জন্যেই বলেন তা এখন অন্তত খুব বুঝি। মনটাই ভাল নেই। চলি এখন !'

তবু ঠিক তখনই হাওড়ায় গেল না। সোজা ঘুরে পাঁচ সের আলু কিনে এটা ওটা সওদা ক'রে হাওড়ার মোড়ে কপি দর ক'রে ছটার ট্রেনে যখন সে বাড়ি ফিরল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। বেশ নিশ্চিন্ত মনেই ফিরছিল—হঠাৎ ওদের বাড়ির সামনের রাস্তায় পড়েই মনে হ'ল বাইরের ঘরে যেন বড় বেশী লোক। হ্যারিকেনের স্তিমিত আলো—তবু বাইরে এত জমাট বাঁধা অন্ধকার যে তাইতেই অত দূর থেকেও অনেকগুলো মাথা নড়বার আভাস পাওয়া গেল।

উদ্বিগ্ন হয়েই জোরে জোরে পা চালাল সে। বাড়িতে ঢুকে বাগানটা পেরোতে পেরোতেই নজরে পড়ল পুকুরের ধারে কে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু চমকেই উঠত হয়তো—অমন সাদামত কী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে দেখে—কিন্তু সেই মানুষটাই ওকে চিনতে পেরে প্রায় ছুটে কাছে এল, 'ওগো, আজকেই কি এত দেরি করতে হয় ! দ্যাখ গে, বাবার বোধ হয় শেষ অবস্থা—'

কনক। এর আগে কোন দিন 'তুমি' বলে নি সে। প্রথম দিন আপনি বলেছিল, তারপর আর বিশেষ প্রয়োজনই হয় নি, সামান্য যা কথা হয়েছে তাতে তুমি-আপনি এড়িয়ে গেছে। আজকের এই উদ্বেগের মধ্যেও সেটা লক্ষ্য করে হেম।

আলুর পুঁটলিটা ছুঁড়ে রকে ফেলে দিয়ে ঘরে ঢুকল সে। এসেছে অনেকে। প্রমীলার কোলে কচি ছেলে সে আসতে পারে নি—মহা এসেছে, তরলা এসেছে, তিন ভাই-ই এসেছে অভয়পদরা। অম্বিকাপদ মাথার কাছে বসে চেঁচিয়ে গীতা পাঠ করছে। অর্থাৎ শেষ অবস্থারই আয়োজন যে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হেম একটু বিহ্বল হয়েই চাইল অভয়পদর দিকে।

'হঠাৎ কী হ'ল এমন—। এই তো আমি দেখে গেলুম—কৈ তেমন তো কিছু—'

অভয়পদ বাইরে গিয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলল। এরা কেউই টের পায় নি। আজকাল প্রায়ই ঝিমিয়ে পড়ে থাকত, সেই রকমই ছিল। আজকাল ঘুমোলে নরেনের একটু নাকডাকার মতো আওয়াজ হ'ত। নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে আওয়াজটা হচ্ছিল, সেটাকেও ওরা নাকডাকার শব্দই ভেবেছিল। শ্যামা অনেক মৃত্যু দেখেছে কিন্তু সে-ও ধরতে পারে নি। অভয়পদ এসেছে চারটে নাগাদ, সে ঘরে ঢুকেই বুঝেছে শ্বাসের শব্দ এটা। ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে এনেছে। তিনিও বলে গেলেন যে তাই—আর খুব বেশী বিলম্ব নেই। তখন যতটা সম্ভব সকলকে খবর দিয়েছে। শুধু কান্তিকে খবর দেওয়া যায় নি। আর তরু পোয়াতি—তার দিদিশাশুড়ী পাঠায় নি।

পাথর হয়ে গিছল হেম

শোক? ঠিক শোক নয় হয়তো—কেমন একটা বিমূঢ়তা। হাত-পায়ের জোরটাই কেমন যেন কমে গেছে।

ভেতর থেকে অম্বিকাপদ ডেকে বলে, 'হেম, এবার তোমার শেষ কাজটা কর, মুখে একটু জল দাও আর তারক-ব্রহ্ম নামটা—'

'হেম' শব্দটা কানে যেতে সহসা মৃত্যু-পথযাত্রী যেন একটু নড়ে ওঠে। ঠোঁটটা কাঁপে তার। একটু চেষ্টার পর চোখটাও খুলে যায়।

'আহা রে। ছেলেকে দেখবার জন্যেই প্রাণটা এতক্ষণ ছিল'—কে একজন মহিলা বলে ওঠেন। সম্ভবত পাড়ার কেউ।

গলা জড়িয়ে গেছে। আওয়াজটাও নাকী হয়ে উঠেছে। নাকটা ভেঙে গেছে নিচের দিকটা—

'কে, হেম? মানে আমাদের হেমচন্দর? কৈ বাবা? কোথায়?'

হেম ছুটে গিয়ে মুখের কাছে উপুড় হয়ে বসে।

'কিছু বলবে আমায়?'

'না, কী আর বলব। তুমি জ্ঞানবান ছেলে। সুপুত্তুর। মাগীকে দেখো—অবিশ্যি ও ভাঙবার মেয়ে নয়।…পথের ভিখিরী করেছিলুম—আবার কেমন বাড়িঘর করেছে দেখছ না। ও খুব শক্ত মেয়েমানুষ। তবে কঞ্জুষ হয়ে যাচ্ছে, হাড় কঞ্জুষ। বৌমাকে দেখো, আর মেয়েগুলোকে। আমার বলাও হয়তো বৃথা, না বললেও দেখবে। বৌমা বড় লক্ষ্মী মেয়ে। ওকেই দেখো। মাগী ওকে জ্বালাবে। আর ঐ খেঁদীটা।'

জড়িয়ে জড়িয়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে আবার হঠাৎ চুপ ক'রে যায়।

'তাউই মশাই, তাঁকে ডাকুন। ভগবানকে ভাবুন। হেম নাম কর!' অম্বিকা জোবে জোরে বলে।

হেম নাম করতে থাকে। পাশ থেকে অভয়পদও করে।

নরেন যেন একটু বিরক্ত হয়।

'আ মলো, কানের কাছে চেঁচায় দেখ না। একটু ঘুমোতেও দেয় না।'

চুপ ক'রে যায় আবার।

এবার কণ্ঠশ্বাস শুরু হয়েছে, শুধু নালির কাছটা ধুক ধুক করছে।

আরও আধঘণ্টাখানেক এইভাবে কাটল। হেম একটু জল দেবার চেষ্টা করল, সে জল পুরোটা গলায় গেল না—কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

তার পর আবার একটু প্রাণের লক্ষণ দেখা দিল মুমূর্ষুর। ঠোঁট দুটো আবার কাঁপতে শুরু করল।

কে একজন বললেন, 'শোন শোন, কী বলছে শোন—'

হেম অভয় দুজনেই ঝুঁকে পড়ল মুখের কাছে।

ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ শব্দ, তবু কথাগুলো বুঝতে পারা যায় শেষ পর্যন্ত।

'ওরে কে কোথায় আছিস বাবারা, আমাকে বাড়িটা একটু দেখিয়ে দিবি?

শুনেছি নতুন বাড়ি করেছে, খুব ভাল বাড়ি। দে না বাবা কেউ দেখিয়ে, আমি যে আর ঘুরতে পারছি না!'

আবার চুপ ক'রে যায়।

গলার কাছের নড়াটাও বন্ধ হয়ে আসে এবার। শুধু নাকের কাছটা কাঁপতে থাকে।

সেটাও একসময় স্থির হয়ে গেল।

চির অশ্রান্ত, চির অস্থির, ভবঘুরে পথিকের পায়েও বুঝি শ্রান্তি নেমেছে এবার। এবার সে আশ্রয় খুঁজছে একটু। আশ্রয় আর বিশ্রাম। কে জানে ইহলোকে যা মিলল না—পরলোক গিয়ে তা মিলবে কি না। গৃহহারা তার যথার্থ গৃহ খুঁজে পাবে কি না।

শবযাত্রীরা শব নিয়ে চলে গেছে অনেকক্ষণ। স্ত্রী-কন্যাদের হাহাকারও শান্ত হয়ে এসেছে অনেকটা। কাল পাড়ার অনেকেই এসেছিলেন, সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা ধোয়া-মোছার কাজে লেগে গেছেন। এক বিধবা মহিলা শ্যামাকে ধরে বাইরের সিঁড়িতে বসে আছেন। ওরা ফিরলে শেষ কাজটুকু তাঁকেই সারতে হবে।

আর কোন কাজ নেই। পাগলকে নিয়ে, রোগীকে নিয়ে আর ব্যস্ত থাকতে হবে না। ক্লান্ত শিথিল পায়ে কনক এসে রান্নাঘরের পিছনে জানলাটার কাছে দাঁড়াল। অদ্ভুত একটা শূন্যতা বোধ করছে সে। এখনও এদের কাউকে আত্মীয় বলে ভাবতে পারে নি। আবাল্য সে পরিবেশে সে দেখেছে, তার সঙ্গে কিছুই মিল নেই এখানকার। সম্বন্ধ আছে ঠিকই—কিন্তু তবু কেউই আজ পর্যন্ত আপন হয়ে উঠতে পারে নি এটাও ঠিক। একমাত্র যে জোর ক'রে খানিকটা স্নেহ আদায় করেছিল সেও চলে গেল। এ যেন ওর কী একটা মনোভাব—তা ও নিজেই ভাল ক'রে বুঝতে পারছে না যেন। কে জানে এবার সে কাকে নিয়ে জীবনের আশ্রয় রচনা করবে। সে কোথায় খুঁজে পাবে তার বাসা।

তরলা এসে পাশে দাঁড়াল।

'—খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছে—না ভাই? এক বছর ধরে সেবাশুশ্রূষা করা—নাড়া-ঘাঁটা—ফাঁকা তো লাগবেই। অসহায় অবুঝ বুড়ো মানুষ—অনেকটা ছোট ছেলের মতোই তো হয়ে যায়। বড্ড মায়া পড়ে কিন্তু—'

তা বটে। ছেলেই ছিল তার। কাল সকালে নরেনই সেকথা স্বীকার ক'রে গেছে।

কথাটা মনে পড়ে গেল কনকের। কাল সকালবেলাই—বার্লি খাওয়াতে গিয়েছিল সে, অত্যন্ত ধূর্তের মতো এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে নরেন বলেছিল, শোন্ মা একটু—এক মিনিট এদিক আয়। একটা কথা বলে যাচ্ছি মা। বাইরের ঐ পগারধারে নোনা গাছটার গোড়ায় সাড়ে এগারোটা টাকা পোঁতা আছে। মাগীকে দিই নি, ওর তো রাঘববোয়ালের হাঁ, পেটে পড়লে আর বেরোত

না। ভেবেছিলুম যদি একটু সুস্থ হয়ে উঠতে পারি, পায়ে একটু জোর পাই তো ঐ কটা টাকা পুঁজি ক'রেই আবার সরে পড়ব। তা আর হ'ল না দেখছি। কটা টাকা তুইই নিস মা। তোকেই মা বলেছি, তুই আমার যথার্থ মা। নিজের মাকে তো কোন দিন হাতে তুলে দিলুম না একটা পয়সাও, চিরজন্ম ওরই যথা-সর্বস্ব দোহন ক'রে গেলুম উল্‌টে। তবু তুই নিলে একটু শান্তি পাব। নিবি তো—দ্যাখ মরার আগে সব বন্ধন খুলে দিয়ে যেতে হয়, নিজের বলে কিছু রেখে যেতে নেই। বল্ আমাকে কথা দে—ওটা তুই খুঁড়ে বার ক'রে নিবি ?'

কথা দিয়েছিল কনক।

নেবেও সে একসময়। যদি এর মধ্যে বাপের বাড়ি যেতে পারে তো ঐ টাকায় সেখানে মনের মতো ক'রে দুটি-তিনটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে দেবে। সর্ববন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে দেবে সে।

সোহাগপুরা

উৎসর্গ

শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

প্রীতিভাজনেষু

সন্ধ্যার কিছু আগেই বিরাট দলটি শহরের প্রবেশপথে এসে পেঁছেছিল ; ইচ্ছে করলে যারা আগে এসেছিল তারা শাজাহানাবাদের ফটক পেরিয়ে শহরে ঢুকে পড়তে পারত, কিন্তু দলের কিছু কিছু লোক তখনও পিছিয়ে পড়ে—সবাই না এলে ঢোকা যায় কি ক'রে ? লাহোর থেকে এতদিনের পথ একসঙ্গে এসেছে, সকলেরই সুখ-দুঃখ সকলে নিয়েছে ভাগ ক'রে ; আজ পথের প্রান্তে এসে একদল স্বার্থপরের মতো ভেতরে চলে যাবে বাকী সবাইকে ফেলে, এটা কারুরই ভাল লাগল না। শহরে পেঁছিলে তো ছাভাছাড়ি হবেই, তবু যতক্ষণ পারা যায়, ভাগ্যটা ভোগ ক'রেই নেওয়া যাক না !

কিন্তু শেষ দলটি—অর্থাৎ রুগ্ন পীড়িত পঙ্গুর দল যখন এসে পেঁছিল তখন সূর্য অস্ত গেছে। তারা আসছে 'বহ্‌ল্' বা বয়েল গাড়িতে শুয়ে, তাদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না—এদের মতো হেঁটে বা উটে চেপে এলে হয়তো আগেই পেঁছিতে পারত !

তবে কারণ যাই হোক, ফটক বন্ধ করার ভার যাঁর হাতে—করিম বক্স সাহেব —কোন রকম দয়াধর্ম করতে রাজী হলেন না। ফটক বন্ধ হয়ে গেছে আজকের রাতের মতো—এবং বন্ধই থাকবে। এক খোদ বাদশা অথবা উজীর-এ-আজম, এঁদের সই করা পরোয়ানা ছাড়া এ ফটক খোলবার শক্তি কারো নেই।

যাত্রীর দল নানা রকম যুক্তি প্রয়োগ করতে লাগলেন, 'আমরা তো চার দণ্ড আগেই এসে পেঁছেছি খাঁ সাহেব, আপনি তো দেখেছেন !'

করিম বক্স তাঁর ঘুলঘুলি দিয়ে বিরাট দলটির দিকে চেয়ে প্রশান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, 'তখন ঢোকেন নি কেন, ফটক তো খোলাই ছিল।'

'পীড়িত আতুর লোকগুলোকে ফেলে কেমন ক'রে ঢুকি বলুন ? ওদের জন্যেই তো—'

'তার আর আমি কি করব বলুন। একটু অপেক্ষা করুন, ভোরবেলাই শহরে ঢুকবেন। এখন গেলেও তো অসুবিধা, এই রাতেরবেলা সরাইখানা দেখে খুঁজে নেওয়া—হয়তো জায়গা পাবেন না।'

'তা না পাই, তবু শহরের পথে রাত কাটানোও ভাল। কতদূর থেকে আসছি বোঝেন তো !'

'বুঝি বৈকি। কিন্তু আমি নাচার।'

গোলাম আলি খাসুন্নিয়াৎ খাঁ এ দলের মাতব্বর গোছের একজন। তিনি নাকি মিয়া তানসেনের বংশধর, তাই তাঁর খাতির বেশি। তিনি এবার এগিয়ে এলেন, আদাব জানিয়ে একটা চোখ একটু টিপে বললেন, 'কী করলে ফটক খোলে, সেইটেই যদি মেহেরবাণী ক'রে জানিয়ে দিতেন। বলি, সেলামী-টেলামী কিছু

ধরে নেওয়ার রেওয়াজ আছে কি ?'

শেষ প্রশ্নটা বেশ চুপি-চুপিই করলেন গোলাম আলি।

'তওবা তওবা! আপনি বাওরা হয়েছেন খাঁ সাহেব? ভুলে যাবেন না বাদশা আলমগীর আজও দিল্লীর তখ্তে রাজত্ব করছেন।'

হ্যাঁ—নামে মাত্র করছেন, তখ্ৎ-এ-তাউস থেকে হাজার কোশ দূরে থাকেন তিনি। এখানকার এই দরওয়াজা একদিন একটু পরে বন্ধ হ'ল কিনা—এ খবর সেখানে পেঁছবে না।'

'ওটা আপনার মস্ত ভুল খাঁ সাহেব। আলমগীর বাদশাকে শুধু-শুধুই দুনিয়ার বাদশা বলা হয় না। তাঁর কান বহুদূর অবধি মেলা আছে, তাঁর হাতও অনেক দূর পেঁছয়। মাপ করবেন খাঁ সাহেব, আর বেশী তকরার করতে পারব না। নমাজের সময় পার হয়ে এল।'

করিম বক্স তাঁর ঘুলঘুলির কপাটটা বেশ একটু জোরেই বন্ধ ক'রে দিলেন।

গোলাম আলি বিরস বদনে ফিরলেন সেখান থেকে। যাবার সময় কখন যে তাঁর বালিকা মেয়েটি সঙ্গে গিয়েছিল তা তিনি টেরও পান নি। সে এতক্ষণ চুপ ক'রে তার বাপজানের পিছনে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল, এখন একেবারে কথা কয়ে উঠতে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হলেন।

মেয়ে গম্ভীর মুখেই প্রশ্ন করল, 'তখ্ৎ-এ-তাউস কেমন দেখতে বা'জান? খুব সুন্দর দেখতে? আর খুব কিম্মৎ ওর?'

'আমি তো দেখি নি মেরে লাল, শুনেছি যে সেদিকে চাওয়া যায় না। তার জহরতের দিকে চাইলে চোখ ঝলসে যায়।···তুই দেখবি?'

'শুধু দেখে কি হবে বাবা?' প্রশান্তমুখে উত্তর দেয় ঐটুকু মেয়ে।

'তবে? কি করবি?'

'চড়ব বাবা।'

'দূর পাগলী—তখ্ৎ-এ-তাউসে চড়বি কি! সে কেবল বাদ্শারাই চড়তে পারেন।'

'বাদ্শার বেগমরা?'

'না—কৈ, তা তো শুনি নি!'

চুপ ক'রে রইল লালী। লালী নাম—কিন্তু গোলাম আলি আদর ক'রে ডাকেন 'লাল' বলেই। তাঁর ছেলে আছে তিনটি—তবে তারা কেউই মানুষ নয়। তাদের তিনি ছেলে বলে স্বীকারই করেন না। এই লালই আজ একাধারে তাঁর ছেলে মেয়ে দুই-ই।

অনেকক্ষণ পরে লালী বেশ দৃঢ়কণ্ঠেই বলল, 'তা হোক। আমি চড়বই বাবা, দেখে নিও!'

'দূর পাগলী।···কোথা থেকে একটা পাগলী এসেছে আমার কাছে। এসব কথা বেশী বলিস নি। সরকারী কোন লোকের কানে গেলে হয়তো গর্দানা যাবে।'

লালী চুপ ক'রে যায়।

ফটকের বাইরে এমনি প্রত্যহই বহুলোককে এসে পড়ে থাকতে হয়। সারারাত ধরে এসে লোক জমে—রীতিমত মেলা বসে যায় এক একদিন।

সুতরাং মেলার মতো দোকানপাটও বসে কিছু কিছু।

রুটি-কাবাব, দুধ-দহি-রাবড়ি—এসবের দোকান ; সরাব-ওয়ালা থেকে শুরু করে ওস্তাগর, চামার পর্যন্ত বসে যায় পথের ধারে ধারে। দু-চারজন লোক গান-বাজনা ক'রে পয়সা রোজগারের ফিকিরে থাকে। নোংরা ঘাঘরা-পরা নাচওয়ালীও আসে। এরই মধ্যে দু-একজন হিন্দু গণৎকার কপালে ফোঁটা-তিলক লাগিয়ে সামনের মাটিতে আঁকজোক কেটে চট পেতে বসে থাকে। এদের কারুরই সারাদিন পাত্তা থাকে না, এদের কারবার শুরু হয় সূর্যাস্তের পর—ফটক বন্ধ হ'লে।

গোলাম আলি তখনই তাঁর রিসাদারদের কাছে ফিরে গেলেন না—মেয়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে এই মেলা দেখতে লাগলেন। বিবি রুটি পাকাবার তোড়জোড় করছেন সবে—এখনও খানা তৈরী হ'তে অনেক দেরি। এর মধ্যে ফিরে গিয়েই বা লাভ কি? শুতে তো হবে আকাশের নিচেই, পথের ধুলোর ওপর—তার জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। আশেপাশে দু-একটা চটী বা সরাই আছে, কিন্তু সেগুলো এতই নোংরা যে, তার থেকে পথে থাকাই শ্রেয় বোধ হ'ল গোলাম আলির কাছে।...

উদ্দেশ্যহীন ভাবেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন গোলাম আলি। জুতোতে একটা তালি দেওয়া দরকার ছিল। চামারকে দিয়ে সেটা করিয়ে নিলেন। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিক নাচ দেখলেন। একটা লোক জমিয়ে গজল গাইছিল, তাও শুনলেন খানিকটা। কিন্তু কিছুই বেশীক্ষণ ভাল লাগল না। মেয়ের হাত ধরে অন্যমনস্কভাবে এগিয়েই চললেন।

হঠাৎ হাতে টান পড়তে চমকে ফিরে তাকালেন। মেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, তাইতেই টান পড়েছে হাতে। কৌতূহলী হয়ে চেয়ে দেখলেন—এক গণৎকারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে লালী।

'কি রে?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন গোলাম আলি।

'হাত দেখাব বা'জান!

'দূর! হাত দেখাবি কি? মিছিমিছি কতকগুলো পয়সা নষ্ট!

জ্যোতিষী সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল: 'কিছু না—কিছু না, খাঁ সাহেব। পয়সা আর এমন কি?...বড় সৌভাগ্যবতী মেয়ে আপনার! দেখে দিই না হাতটা। এক ঢেবুয়া দেবেন—আর বেশী কি চাইব!'

'এক ঢেবুয়া? ইস্। ঢেবুয়ার অনেক দাম।'

'বেশ, এক ছিদাম এক দামড়ি যা হয় দেবেন। যা আপনার খুশি!'

'দেখাই না বা'জান!' মেয়ের কণ্ঠে অনুনয়।

অগত্যা রাজী হন গোলাম আলি।

হেসে বলেন, 'দেখাও! যা ধরবে তা তো ছাড়বে না তুমি।···দাও হে, দেখে দাও। বেশ ভাল ভাল কথা বলবে আমার মাকে।'

সামনে মশালের মতো একটা চেরাগ জেবলে বসেছিল গণৎকার। তিন-চারটে সল্‌তে একত্রে পাকানো। বদনার মতো একটা লোহার গোল পাত্রের নলে লাগানো আলো—লোহারই শিক প‍ুঁতে বসানো সেটা। তার আলোতে লালীর হাতটা মেলে দেখলে সে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ম‍ুখ তুলে হাসি-হাসি ম‍ুখে বললে, 'মিছে ক'রে বানিয়ে বলবার কোন দরকার নেই খাঁ সাহেব। মেয়ের হাত আপনার সত্যিই ভাল। খ‍ুব বড়লোক হবে—পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। তবে শেষ বয়সে একটু গোলমাল আছে। একটু দ‍ুঃখের যোগ—

অসহিষ্ণ‍ু কণ্ঠে লালী বলে উঠল, 'শেষ বয়স নিয়ে আমি একটুও মাথা ঘামাচ্ছি না, এখনকার কথা বল। আমি বেগম হতে চাই। বাদশার বেগম! হতে পারব?'

আবারও তার সেই ছোট্ট লালপদ্মের কোরকের মতো হাতখানির উপর ঝ‍ুঁকে পড়লেন গণৎকার। অনেকক্ষণ ধরে দেখে বললেন, 'না। সে সম্ভাবনা নেই। বেগম হতে পারবে না।'

বালিকার স‍ুন্দর বাঁকা দ‍ুখানি ভ্র‍ু নিমেষে কুঞ্চিত হয়ে উঠল। স‍ুগৌর কপোল লাল হয়ে উঠল রাগে। সে এক ঝট্‌কায় হাতটা ওর হাত থেকে টেনে নিয়ে বললে, 'ঝ‍ুট্‌। সব ঝ‍ুট্‌। তু ম কিচ্ছ‍ু হাত দেখতে পার না। বেগম আমি হবোই—এই তোমাকে বলে দিলাম। বাদশার বেগম! লালকিলার তখৎ-এ তাউসে বসবই।'

গণৎকারও যেন একটু চটে উঠল। বললে, 'অনেক কষ্ট ক'রে এ বিদ্যা শিখেছি, রাস্তায় বসলেও আমি মিছে কথা বলে লোক ঠকিয়ে খাই না।···বাদশার বেগম তুমি হতে পারবে না কোনদিন।'

'হবোই।' দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বলে লালী।

গণৎকারের পাশে এক ব‍ুড়ী বসে ছিল এতক্ষণ, বোধ হয় হাত দেখাবার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সে এবার বলে উঠল, 'তোমাদের আমাদের মতো ঘর থেকে বাদ্‌শারা বেগম নিয়ে যান না মা—বড় জোর বাঁদী কি নাচওয়ালী হয়ে বাদ্‌শার মেহেরবাণী পেতে পার।'

'কেন নিয়ে যাবেন না? আমি বাবার ম‍ুখে সব শ‍ুনেছি—ন‍ুরজাহাঁ বেগম কী এমন খানদানী ঘরের মেয়ে ছিলেন?'

'ও, তোমার ন‍ুরজাহাঁ হবার শখ?' ব‍ুড়ী হেসে ওঠে। খ‍ুব খানিক হেসে বলে, 'তা খ‍ুবস‍ুরৎ আছে বেটি।···দ্যাখো, কোন শাহজাদার নজরে যদি পড়ে যাও।'

গোলাম আলি অসহিষ্ণ‍ু ভাবে জেব থেকে একটা দামড়ি বার ক'রে গণৎকারের সামনে ছ‍ুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'চলে আয় দিকি! যত সব বাজে বাজে কথা!'

হাত ধরে একরকম টানতে টানতেই মেয়েকে নিয়ে গেলেন তিনি।

ততক্ষণে রুটি পাকানো হয়ে গিয়েছিল। ওদের দেখে গোলাম আলির বিবি বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে উঠলেন, 'এই তো ছিরির খাওয়া—শুকনো রুটি শুধু। না একটু কাবাব, না কিছু—ডালও পাকাতে পারলুম না। তাও বুঝি শুকনো হাড় ক'রে না খেলে চলে না?'

'কী করব—তোমার এই মেয়ে!...উনি গণৎকারকে দিয়ে হাত দেখাবেন—বাদশার বেগম হবেন!...আসতে কি চায়!'

'আদর দিয়ে দিয়ে ওর দিমাগটি তুমিই বিগড়ে দিচ্ছ আলি সাহেব! কেবল বড় বড় কথা ওকে আরও শোনাও! নে এদিকে আয়। খেতে বোস! বেগম হবে! বাদশাব বেগম! আলমগীর বাদশার উমর সত্তর বছর পেরিয়ে গেছে—অনেকদিন আগেই। বুড়োর ঘর করতে পারবি?'

স্থির নিশ্চিন্ত কণ্ঠে লালী উত্তর দেয়, 'কেন, ওঁর ছেলেও তো একদিন বাদশা হবে, কিংবা তার ছেলে। এই বাদশাই যে চাই তা তো বলি নি!'

'পোড়া কপাল আমার! ঘুঁটেকুড়ুনীর বেটি বেগম হবেন!...ওরে তুই এমন কিছু রূপসী নোস। তোর মতো রূপ অনেকেরই আছে। বাদশার হারেমে যারা বাঁদীগিরি করে—তারাও তোর চেয়ে ভাল দেখতে। তুই তো আমার মতোই দেখতে হয়েছিস, সবাই বলে। তোর বয়সে আমারও ঐ রকম রূপ ছিল! কী হ'ল তাতে?'

'যার যা সাধ মা। তুমি তো বেগম হতে চাও নি। আমি চেয়েছি।'

মোটা মোটা কাঠের জ্বালে তৈরী রুটি, পলাশ পাতায় ক'রে কাঁচা পিয়াজের কুঁচি আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে এগিয়ে দিলেন লালীর মা ওদের দিকে। খেতে খেতে গোলাম আলি স্ত্রীর সঙ্গে নানা বিষয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন। লাহোরে ওঁদের পশমী জিনিসের কারবার ছিল বহুদিনের। পৈতৃক কারবার—এক ভাই ছিল তার বখ্‌রাদার। ভাই গানবাজনা নিয়েই থাকে—কিছুই করে না। এই নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি মারামারি হওয়াতে সে কারবার গুটিয়ে দিল্লিতে এসেছেন। হিন্দুস্তানের সবচেয়ে ভারি শহর, রাজধানী। এখানে মুনাফা অনেক বেশী হবে। পরামর্শটা সেই দিক ঘেঁষেই চলেছে। ওঁর এক খুড়শ্বশুরের আতরের দোকান আছে চাঁদনীতে, তাঁকে খুঁজে বার করতে পারলে একটা সুরাহা হবেই। চাঁদনীতে ঘর পাওয়া শক্ত—তা তিনি এতকাল এখানে আছেন, ঘর একখানা কি আর খুঁজে দিতে পারবেন না? আর অমনি কাছাকাছি একটা বাসা? আপাতত শহরে পেঁছে কোন সরাইখানাতেই ডেরাডাণ্ডা ফেলতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।...নানা রকমের স্বপ্ন-কল্পনা, ভবিষ্যতের নানারকম ছবি।

লালীর এদিকে কান ছিল না, সে শান্ত এবং নির্বাক ভাবে বসে বসে রুটি চিবুতে লাগল। শুকনো মোটা রুটি, নুনই তার উপকরণ। গলা খুব শুকিয়ে উঠলে পিঁয়াজ চিবোও, নয়তো লঙ্কা। আচ্ছা, বেগমরা কি খায়? তারাও কি এই আটার রুটিই খায়? না কেবল পোলাও খেয়ে থাকে? রুটি খেলেও তাদের উপকরণ আলাদা, বা'জানের মুখে গল্প শুনেছে, শাহজাহান বাদশার

অড়র ডাল তৈরী হত—একসের দালে একসের ঘি দিয়ে। কাবাব, কোর্মা, কোফতা—কত কীই নাকি রোজ হয়—বাদশার খুশী হলে কোনটা খান, নয়তো খান না। খেলেও একটুখানি হয়তো মুখে দেবেন।…আচ্ছা—বাদশার বেগমরাও নিশ্চয়ই অমনি খান—

একবার ইচ্ছা হ'ল বা'জানকে কথাটা জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নেয়, কিন্তু সাহসে কুলোল না। আবারও হয়তো ঠাট্টা শুরু হয়ে যাবে—আর মায়ের বকুনি। ওরা মোটে কথা বোঝে না।

আহারের পর সেইখানেই একটা বিছানার মতো পাতা হ'ল। উটটাও শুয়েছে—উটের গা-ঘেঁষে আগাগোড়া বোরখা মুড়ি দিয়ে শুলেন লালীর মা, তাঁর কোলের কাছে লালী। একটু দূরে গোলাম আলীর বিছানা পড়ল। ঘুম তো হবেই না—পথে শোওয়ার জন্যে নয়, এ কদিন পথে-পথেই রাত কাটানো অভ্যাস হয়ে গেছে—উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় ঘুম আসা কঠিন। এমনি একটু আরাম ক'রে নেওয়া। অবশ্য ভয়ডরও বিশেষ কিছু নেই, চারিদিকে অমন তিনশ লোক ছড়িয়ে শুয়ে আছে—এই ময়দানের ওপরই। সবাই দীর্ঘদিনের সঙ্গী, আত্মীয়ের মতোই হয়ে গেছে।

'ঘুম হবে না' বলে শুলেও একটু পরেই লালীর মার নিঃশ্বাস গাঢ় হয়ে এল, গোলাম আলি সাহেবেরও নাক ডাকতে লাগল একটু একটু ক'রে। শুধু সত্যিই ঘুম এল না লালীর। দিল্লিতে এসে পড়েছে ওরা। সন্ধ্যার আগে দূর থেকে জামি মস্‌জিদের চূড়ো দেখিয়েছেন ওর বাবা। আর লালকিলার লাহোরী ফটকের ওপরের নহবৎখানা। ত্রিপোলিয়া ফটক। উটের ওপর থেকে স্পষ্ট দেখা গেছে। আরো দূরে কুতুব।

কিন্তু ওসব বাজে, ওসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না লালী। লালকিলা। লালকিলায় বাদ্‌শারা থাকেন—আর বেগমরা। 'সুনেরী নহর' বয় সেখানে, গুলাবের ফোয়ারা ছোটে। দিনরাত বাঁদীরা গান গায় আর নাচে—

দূরে এখনও কারা গান-বাজনা করছে। কান পেতে শোনে লালী। আরও দূরে ঘুঙুরের আওয়াজ। নাচওয়ালীরা এত রাত্রেও বিশ্রাম পায় নি—এক-আধটা দেবুয়ার লোভে এখনও মেহনৎ ক'রে যাচ্ছে সমানে। কী-ই বা পাবে বেচারীরা, দীর্ঘপথ আসতে রাহীদের সবাইকারই জেব্ খালি হয়ে গেছে।

এদের দিন চলে কি ক'রে?

শুয়ে শুয়ে আকাশের তারার দিকে চেয়ে ভাবে লালী। এই এক আধ দেবুয়া ক'রে ক্‌-টাই বা হয়! একটা সারেঙ্গী, একটা তবল্‌চী, দুটো নাচউলী। কুলোয় ওদের?

না—বড়ই দুর্দশা ওদের। আর কীই বা হবে! যেমন চেহারা, তেমনি শিক্ষা-দীক্ষা আর তেমনি পোশাক। ওরা কি আর আমীর-ওমরাহ্ রইসদের বাড়ী মুজরো পাবে!

বা'জানের মুখে শুনেছে, দিল্লীতে এমনও নাচউলী আছে—হাজার আশরফি যার একদিনের রোজগার! এখনকার আলমগীর বাদ্‌শা বড় বেরসিক তাই—নইলে শোনা যায় আগেকার বাদশারা হামেশাই ভাল ভাল নাচওয়ালীদের তলব করতেন। বহু নাচওয়ালী বাদশার হারেমে ঘর করেছে। বা'জানের মুখে না শুনলেও এমনধারা গল্প এবার আসতে আসতে বহুলোকের মুখেই শুনেছে সে।

হঠাৎ উঠে বসল লালী। আড়-চোখে একবার মার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। বোরখায় মুখ ঢাকা, জেগে আছে কি ঘুমিয়ে আছে বোঝবার উপায় নেই। তবু নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এসেছে যখন—নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে। বা'জানেরও নাক ডাকছে—গভীর ঘুম।

লালী নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। চটিটাতে পা লাগাল না—হাতে ক'রে নিয়ে খানিকটা এসে তবে পায়ে দিল। তারপর সাবধানে ঘুমন্ত আধাঘুমন্ত রাহীদের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল, যেদিক থেকে ঘুঙুরের শব্দ আসছিল সেই দিকে। কেউ কেউ তখনও খানা-পিনা করছে, কেউ বা এমনি কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে তামাক খেতে খেতে খোশ-গল্প করছে। তারা আড়ে তাকিয়ে দেখলও কেউ কেউ—কিন্তু এতদিনে গোলাম আলির ধিঙ্গী মেয়েটার রকম-সকম সবাইকারই গা-সওয়া হয়ে গেছে—তারা কেউই বিস্মিত হ'ল না।

একেবারে শেষের দিকে গিয়ে নাচওয়ালীদের দেখা মিলল।

নাচ শেষ হয়ে গেছে তখন—ওদের মালিক সারেঙ্গী এবার একটা দোকানের সামনে আলোতে বসে পয়সা গুনছে। মিলেছে সামান্যই। সুতরাং মুখ সকলেরই অপ্রসন্ন। নর্তকী দুজন ক্লান্তিতে সেই ধুলোর ওপরই এলিয়ে পড়েছে। এত বড় রাহীর দল দৈবাৎ মেলে—তাতেও এই সামান্য আদায়! সারেঙ্গীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বড় রকমের একটা ভ্রূকুটি। এখনই এদের খোরাকীর পয়সা দিতে হবে—কোথা থেকে দেয়?

এরই মধ্যে লালী কাছে গিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করল, 'তোমরা দিল্লিতে থাক?'

সারেঙ্গী অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল—বছর আটেক-নয়ের ভারি সপ্রতিভ ফুটফুটে মেয়ে একটি। বয়স্কাদের মতো ওড়নাটা মাথায় জড়িয়েছে ঘোমটার আকারে—

দেখে কৌতুক বোধ করারই কথা—কিন্তু সারেঙ্গীর সে রকম মনের অবস্থা নয়, সে বিরক্ত হয়েই বলল, 'কেন? তোমার কি দরকার তাতে?'

'আমার একটু দরকার আছে। বল না, তোমরা কোথায় থাক।'

ততক্ষণে তবল্‌চী সামনে সরে এসে বসেছে। সে বললে, 'হ্যাঁ, আমরা দিল্লীতে থাকি, শাহ্‌জাহানাবাদে। কেন? তোমার কেউ আছে সেখানে?'

'না। কেউ নেই।'

এই পর্যন্ত বলে কেমন যেন থতিয়ে থেমে গেল লালী। তারপর, খানিক পরে—হঠাৎ যেন মরীয়া হয়েই বলে ফেলল, 'আচ্ছা, সেখানে বড় বড় সব নাচউলীরা কোথায় থাকে জান তোমরা? ভাল ভাল নাচউলী—যারা আমীরদের

বাড়ী নাচে, তোমাদের মতো রাস্তার নাচউলী নয়।'

নর্তকী দুজন তখনও পর্যন্ত এলিয়েই পড়ে ছিল। কখন পয়সা পাবে তবে রুটি কিনবে। দুখানা রুটি আর এক লোটা জল। পেটে কিছু না পড়লে আর নড়বার শক্তি ফিরবে না। কিন্তু এই অপমানসূচক কথাতে তারাও উঠে বসল। একজন, অপেক্ষাকৃত বয়স্কা যেটি, উঠে বসে কর্কশ কণ্ঠে বললে, 'আ মর! এ-ডেঁপো ছুঁড়ির কথা দেখ না! যা যা, সরে পড়্।'

কিন্তু তবল্‌চী তাতল না। তার দৃষ্টি বরং আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে হাত বাড়িয়ে ওর একটা হাত ধরে টেনে কাছে আনল, 'কেন বল তো? আমি জানি তাদের ঠিকানা। তুমি নাচ শিখবে, নাচওয়ালী হবে?'

হাতটা একটানে ছাড়িয়ে নিলে লালী, কিন্তু নিজে সরে গেল না। তেমনি শান্ত স্থির কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁ। আমি নাচ শিখতে চাই। ভাল নাচ। যাতে ওমরাহ্‌দের আসরে ডাক পড়ে। চাই কি বাদ্‌শার হারেমেও পেঁছিতে পারি।'

ঐটুকু মেয়ের মুখে এই কথাতে অবাক হওয়াই উচিত। এরাও কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো ওর মুখের দিকে। কেবল তবল্‌চীর চোখে ধূর্ত দৃষ্টি—বেড়ালের মতো জ্বলছে। সে বলল, 'হ্যাঁ—সে ব্যবস্থা আছে। খুব বড় নাচওয়ালীর কাছে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তার কাছে বাঁদী হয়ে ঢুকতে হবে। কিছুদিন বাঁদী হয়ে সেবা না করলে সে নাচ শেখাবে না। দ্যাখো—রাজী আছ?'

'আছি।' এতটুকু দ্বিধা বা সংকোচ নেই ওর মুখে।

'তোমার বাপ-মা কোথায়? তাঁরা কি রাজী হবেন?'

'না। আমি লুকিয়ে চলে যাব, তোমাদের সঙ্গে!'

'কিন্তু সে তো হবে না! নেবে কেন! বাপের কাছ থেকে কিনবে সে, দলিলে সই করিয়ে নেবে দস্তুরমতো!'

এইবার লালী যেন একটু বিচলিত হ'ল। হতাশায় বিবর্ণ হয়ে উঠল তার মুখ।

'দাম দিয়ে কিনবে? ক্রীতদাসী? বাঁদী!'

'হ্যাঁ। এই-ই দস্তুর। নইলে তারা শেখায় না। তোমাকে ভাল ক'রে শেখাবে—বুড়ো বয়সে তোমার রোজগারে খাবে ব'লে—নইলে তাদের কী গরজ? ওরা নিজের মেয়েকে শেখায় আর কেনা-বাঁদীকে শেখায়!'

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল লালী অনেকক্ষণ। তারপর ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'তুমি—তোমরা কেউ আমাকে মেয়ে ব'লে বেচতে পারো না?···দামটা তোমরাই তো পাবে!'

তবল্‌চী অস্ফুট কণ্ঠে "বাহবা বাহবা" বলে আরও কাছে এগিয়ে এল··। আবারও ওর একখানা হাত ধরলে, "তুমি বাবা ব'লে মেনে নেবে আমাকে, সেখানে গিয়ে গোলমাল করবে না? ঠিক বলছ?'

'ঠিক বলছি, খোদা কসম।'

'তাহলে এখনই চলো। তোমার বাপ-মা ওঠবার আগেই বহু দূরে স'রে পড়তে হবে, তারা উঠলে তো বিষম গোলমাল বাধাবেই। কোতোয়ালকে জানাবে হয়ত—হৈচৈ পড়ে যাবে। শেষে আমাদের ধরে ফাটকে পুরবে।'

'কিন্তু যাবে কি ক'রে? ফটক যে বন্ধ।'

'আমরা এখন কোন দেহাতে গিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকব। এদিক দিয়ে ঘুরে মেহ্‌রৌলি যাবো, সেখানে আমার এক আড্ডা আছে—গোলমাল মিটলে একদিন দিনের বেলায়ই তোমাকে বোরখা পরিয়ে সঙ্গে নিয়ে শাহ্‌জাহানাবাদ ঢুকব।'

'বেশ, চল। আমি তৈরী।'

নাচওয়ালী দুজন অবাক হয়ে চেয়েই ছিল এতক্ষণ ওর দিকে, আর শুনছিল ওর কথা—এবার আর থাকতে পারলে না। অল্পবয়সী যেটি, সেটি প্রশ্ন করল, 'এমনি ভাবে এক কথায় বাপ-মাকে ছেড়ে চলে যাবে? মন কেমন করবে না'।

'বা রে! মন-কেমন করবে কেন? বা'জান তো আমার শাদির জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছে। দিল্লিতে গিয়ে একটু গুছিয়ে বসতে পারলেই আমার শাদি দিয়ে দেবে। তখন তো দূরে যেতেই হবে। তাছাড়া—'

বলতে বলতে চুপ ক'রে যায় লালী।

'তাছাড়া কি, বল? কিসের জন্যে, কোন্ লোভে তুমি এ পথে আসছ? তোমার বাপ-মায়ের অবস্থা তো ভালই মনে হচ্ছে তোমার পোশাক-আশাক দেখে।'

'এটুকু ভালতে আমার চলবে না। আমি চাই খুব বড়লোক হ'তে। হীরা জহরৎ মোহর নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে। আমি বাদশার বেগম হতে চাই। বিয়ে হয়ে বাদশার হারেমে যেতে পারব না তো—দোকানদারের মেয়ে আমি—তাই ঠিক করেছি, নাচওয়ালী হয়েই ঢুকব।'

'বাদশার হারেমে যাবে! তোমার আশা তো বড় কম নয়!···বড় কিম্‌তি খোয়াব* দেখছ! দেখো সাবধান, খোয়াব টুটে গেলে না বেকুফ্ ব'নে যাও!'

লালীর পদ্মপত্রের মতো আয়ত চোখে নিমেষে বিদ্যুৎ খেলে যায়। পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস আর ওদের ক্ষুদ্রতার প্রতি উপেক্ষা—ওর কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'খোয়াব কিসের! এ আমি জেগে দেখছি। খোয়াব নয়। এ হওয়াই চাই। আর তখন—আম্মাজান আমাকে হারিয়ে যত চোখের জল ফেলবে, তার দুনো ওজনের মতি গুণে দেব তাঁকে। আর তোমাদের, তোমাদেরও ভুলব না। এই তোমারা সবাই—তোমাদের এমন উঁচুতে তুলে দেব, এ মুলুকের সমস্ত আমীর তোমাদের সেলাম জানাবে সকাল-সন্ধ্যায়। আজ যে পথের ধুলোয় এক টেবুয়ার জন্য নেচে গেলে—সেই ধুলো মোহরে ঢেকে তার ওপর নাচবে একদিন!'

গোলমাল হৈ-চৈ হ'ল বৈ কি!

গোলাম আলি কোতোয়ালকে মোটা নজর দিয়ে বললেন, 'যেমন ক'রেই হোক্

* কিমতি খোয়াব—দামী বা মূল্যবান স্বপ্ন।

আমার লালীকে খুঁজে দিন হুজুর। আমার ঐ এক মেয়ে। যা কিছু ওরই সুখের জন্য!'

কোতোয়ালও সে নজরের নিমক রেখেছিলেন। খোঁজখবর বড় কম করেন নি। আশপাশের সাতখানা গাঁয়ে লোক লাগিয়েছেন, শাহ্‌জাহানাবাদ, শিরি, তুঘলকাবাদ—শহরের কোনও কোণ বাদ রাখেন নি। কিন্তু কোথাও খবর পাওয়া গেল না। লালী যেন বাতাসে উবে গেল। ওদের দলের প্রত্যেক লোককেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে—ওরা অনেকেই দেখেছে তাকে, গভীর রাত্রে একা নিঃশব্দে হেঁটে যেতে, তবে শেষ অবধি কোথায় যে গেল তা কেউ বলতে পারলে না।

জানত একটা লোক—যে দুধ-দহির দোকানের সামনে বসে ওরা কথা কয়েছিল সেই দোকানদার। কিন্তু সে ঐ সারেঙ্গী ও তবল্‌চীর বহুদিনের বন্ধু, সে চুপ ক'রে রইল।

নাচওয়ালীদেরও খবর করা হয়েছিল। কিন্তু তারাই বা কি জানে? তারা তার পরের দিন সহজ ভাবেই নাচতে এসেছিল, তাদের বিশেষ সন্দেহ করার কথাও কারুর মনে আসে নি।

লালীর মা মাথা খুঁড়ে নিজেরই ললাট রক্তাক্ত ক'রে তুললেন শুধু। কেঁদে কেঁদে শুধু নিজেরই চোখ অন্ধপ্রায় ক'রে তুললেন। সে অপরিমাণ চোখের জলও না পারল দিল্লির রুক্ষ বালুময় রাজপথকে সিক্ত করতে, আর না পারল ভাগ্যদেবতার কঠিন হৃদয়কে কোমল করতে।

পাঁচ সাত দিন—এক মাস দু মাস—বসে বসে বৃথা চেষ্টা ক'রে গোলাম আলি হাল ছেড়ে চলে গেলেন আজমেঢ়। জীবনের বাকী কটা দিন যা হয় ক'রে গুজরান করা, এই তো! মোটা টাকা রোজগারের আশা বা ইচ্ছা কিছুই নেই যখন—তখন একটা তীর্থস্থানে থাকাই ভাল। দিনান্তে দুজনের দুখানা রুটি, মিলেই যাবে। না হয়, আজম শরীফের দরগায় বসে ভিক্ষা করতে তো পারেন!

কত কি স্বপ্ন—কত কি উচ্চাশা নিয়ে দিল্লী এসেছিলেন—এই নিষ্ঠুর নগরীর দ্বারপ্রান্তেই জীবনের যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে ভগ্নহৃদয়ে চলে গেলেন মরুভূমির পথ ধরে।

এ জিন্দিগীও তো মরুভূমি হয়ে গেল। মিলবে ভাল!

॥ দুই ॥

মেহ্‌রৌলিতে পেঁাছে দলের সঙ্গে লালীর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। কারণ দলের মালিক সারেঙ্গী নুরুদ্দীন মিয়া শেষ পর্যন্ত এসব ঝামেলায় যেতে রাজী হ'ল না। কোতোয়ালকে তার বড় ভয়। একবার মিথ্যে একটা মামলায় জড়িয়ে পড়ে তাকে কয়েকদিন ফাটকে বাস করতে হয়েছিল। সেই থেকে সে কোতোয়ালীর সাতশ' হাত দূরে থাকবার চেষ্টা করে। প্রথম থেকেই এত ঝুঁকি নেওয়াতে তার আপত্তি ছিল—তার ওপর মেহ্‌রৌলিতে পেঁাছে যখন শুনল যে, এরই মধ্যে চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেছে—কোতোয়াল সাহেব নিজে এ বিষয়ে উদ্যোগী এবং

সক্রিয়—তখন একেবারেই বেঁকে দাঁড়াল সে। তবলচী রাজু মিয়াকে সোজাই বলে দিলে, 'ওসব হ্যাঙ্গামে আমি নেই রাজু মিয়া ; সাফ্ সাফ্ কথা আমার। করতে হয় তুমি করো—কিন্তু তাও তফাতে!'

রাজু মিয়ার ধূর্ত চোখ দুটি ধূর্ততর হয়ে উঠল, তারই একটা চোখ মটকে গলাটা নামিয়ে জবাব দিল, 'তাতে আমি খুব রাজী আছি—সোদা শেষে আবার বখরার সময় এসে হিস্সা চাইবে না তো?'

'না, না।'

'জবান দিচ্ছ?'

'দিচ্ছি।'

তবলচী রাজু মিয়া আর কথা না বাড়িয়ে কোমরে-বাঁধা ডুগি-তবলাটা খুলে কাঁধে ফেললে, তারপর লালীর একটা হাত ধরে ওদের উলটো-পথে হাঁটতে শুরু করল।

কিন্তু দিল্লী শহরের বহু গলিঘুঁজি পেরিয়ে, অনেক পথ হেঁটে শেষ পর্যন্ত রাজু মিয়া লালীকে যেখানে এনে তুললে—আর যাই হোক্—সেটা কোন নাচওয়ালীর বাড়ী নয়। অন্তত নাচের কোন আয়োজন বা সরঞ্জামই তার চোখে পড়ল না। তাছাড়া, পাড়াটাও যেন কেমন-কেমন!

সে রাজু মিয়ার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করল, 'এ আমাকে কোথায় আনলে?…তুমি যে বলে এনেছিলে—বড় নাচউলীর কাছে পেঁছে দেবে!'

নিঃশব্দ হাস্যে রাজু মিয়ার ঠোঁট দুটি বিস্ফারিত হয়ে পানের-ছোপ-খাওয়া দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল। এখানে আসতে আসতেই তার মতলব উলটে গেছে। বেশী লোভ তার। · একটু পরে হাসি সামলে বললে, 'থামো থামো বেগম সাহেবা, তুমি যে একেবারেই ওপরে উঠতে চাও। বলি লাফ্ দিয়ে কি কুতুবে ওঠা যায়? শুনেছি 'আড়াইশ'র ওপর সিঁড়ি ভাঙ্গতে হয় ওপরে চড়তে হলে—

লালী এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, 'ওসব আমি জানি না। আমি এখানে থাকব না।'

রাজু মিয়াও এক লাফে এগিয়ে এসে ওর হাতটা চেপে ধরল—এবার বজ্রমুষ্টিতে একেবারে—তার তব্লা-বাজানো আঙ্গুলগুলো লোহার সাঁড়াশির মতো লালীর নরম হাতে চেপে বসল।

রাজু অস্ফুট একটা গালাগালি দিয়ে বলল, 'আরে তুমি যে ক্ষেপে উঠলে দেখছি! একেবারেই কোন্ নাচওয়ালীর কাছে উঠব? বলতে কইতে হবে—দরদস্তুর আছে, তাদের পছন্দ-করানোর কথা আছে—তবে তো! এ আমার চাচীর বাড়ী, সাক্ষাৎ চাচী। এখানে ক'দিন থাকো, দু'চার দিন সর-ময়দা মাখিয়ে তোমার রঙের জেল্লা আরও খোলাই—তারপর বাইজী মহল্লায় নিয়ে যাব। এখন এই অবস্থায় নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালে কেউ ফিরেও তাকাবে না!'

কথাটা খুব অযৌক্তিক নয়। যদিচ ওর হাসি, চাউনি এবং এখন এই সাঁড়াশির-মতো-ক'রে হাত চেপে ধরা—কোনটাই ভাল লাগছে না, তবু লালী

আস্তে আস্তে নরম হয়েই এল। ইতিমধ্যে রাজ্জু মিয়ার চাচীও বেরিয়ে এসেছে। বিপুল মেদ, ভারি ভারি রুপোর গহনা, মেদীপাতায় রঙানো হাত্-পা, চোখে সুর্মা—সবটা মিলিয়ে এক তাজ্জব ব্যাপার। পাহাড়ের মতো দেহ মেয়েছেলেটার, শুধু সেই দিকে চাইলেই ভয় করে।

চাচী থপ্‌থপ্‌ করতে করতে এসে ওকে একেবারে কোলের মধ্যে টেনে নিলে, 'হায়! হায়! কী খুবসুরৎ বেটি রে আমার!…বাহবা বা!…কোন ভয় নেই বেটি, আমার কাছে থাক, খেলা কর, ফুর্তি কর, খাও-দাও—তোফা আরাম!…বলি আমি রাজুরও চাচী যখন—তোমার তো নানীর মতোই! আমাকে তোমার ভাল লাগছে না?'

লালী সোজা মুখ তুলে ওর সেই বিরাট গোল মুখখানার দিকে চেয়ে বললে, 'না, একটুও না।'

অপমানে চাচীর রং-করা মুখখানাও রাঙা হয়ে উঠল—তবু হেসেই বললে, 'আচ্ছা দু দিন থাক—ভাল লাগবে বৈকি, খুব ভাল লাগবে। তখন আর আমাকে ছাড়তে চাইবে না।'

এই ব'লে আবারও একটু হাসল সে। কেমন এক রকমের বিশ্রী হাসি। লালীর গা ঘিন-ঘিন ক'রে উঠল যেন। সে ওর কোল থেকে নেমে আসবারও চেষ্টা করলে, কিন্তু ততক্ষণে চাচীর বাহু-বন্ধন আরও নিবিড় হয়ে এসেছে, তার মধ্যে থেকে মুক্তি পাওয়া বালিকার সাধ্যের বাইরে।

বেশীক্ষণ চেষ্টা করতে হ'লও না—একরকম কোলে ক'রেই ওকে তুলে এনে চাচী একটা ঘরে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিলে—তারপর বিদ্যুৎগতিতে ভারী কপাট দুটো বন্ধ ক'রে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিলে।

এরপর আর রাজু মিয়ার দেখা পায় নি লালী। কোনদিনও না। শুধু ঘরের ভেতর থেকে শুনেছিল কতকগুলো টাকা গুনে দেওয়া ও নেওয়ার শব্দ। আর চাপা হাসির আওয়াজ। ক্রমে সেটুকুও মিলিয়ে গেল।

চাচী খুশী হয়েছিল লালীকে পেয়ে, খুশী হয়েই দাম দিয়েছিল। মোটা দাম। কিন্তু তখনও লালীকে চেনে নি সে। খানিক পরে খানা নিয়ে ঘরে ঢুকতে ওর সে খুশির আর কোন কারণ রইল না।

এক কোণে একটা খাটিয়ার ওপর স্থির হয়ে বসে ছিল লালী। চাচী ঘরে ঢুকতে কোন গোলমাল করলে না, চেঁচামেচি করলে না—কান্নাকাটি তো নয়ই —শুধু ওর মুখের দিকে শান্ত চোখ মেলে বললে, 'আমাকে এমন ক'রে এখানে আটকে রাখলে কেন?'

'টাকা দিয়ে কিনেছি তোমাকে—লাভ পেলেই বেচব।'

'কাকে বেচবে?'

'যার কাছে বেশী দাম পাব। অনেক টাকা দিয়েছি, চাইও অনেক।'

'দাম তুমি যত খুশি নাও। আমি তো নিজেই বলেছিলুম। মোদ্দা আমাকে কোন নাচওয়ালীর কাছে বেচে দাও!'

'নাচওয়ালীরা বেশী দাম দিতে চায় না। ওদের মেয়ের অভাব নেই।'

'তবে কাকে বেচবে?'

'খোজার দল আসে খোঁজ করতে। এমনি কারবারীরাও আসে। দূর দেশে চালান দেবে তারা, মোটা দাম দিয়ে কিনবে।...তাছাড়া, বেচতে না-ও পারি। আমার কাছে থাকবে—রোজগার করবে। তোমার যা সুরৎ—মোটা টাকা রোজগার হবে আমার!'

আবারও সেই হাসি। বিশ্রী, গা-ঘিন-ঘিন করা হাসি।

লালী কিন্তু বিচলিত হ'ল না, বললে, 'দ্যাখো, আমাকে জোর ক'রে কিছু করাতে পারবে না। তুমি আমাকে কোন নাচওয়ালীর কাছে বেচে দাও। এখন দাম তো পাবেই, এর পর যখন খুব—খুব বড়লোক হব, তোমাকে অনেক টাকা দেব। যে দামে কিনেছ তার চারগুণ! আমার নসীবে আছে আমি টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলব।'

'সেই জন্যই হয়তো বেচব না তোমাকে! তুমি আমার কেনা বাঁদী, তোমার সব রোজগারই তো আমার।'

'রোজগার? আমি নাচ গান না শিখলে কিসে রোজগার করব?'

প্রশ্নটায় এই প্রথম বিব্রত বোধ করল চাচী, বলল, 'ও আর একটু বড় হও—বুঝবে!'

'বলই না।'

'এই ধরো—খুব বড়লোকের সঙ্গে তোমার শাদি দেব!'

ঠোঁট উলটে লালী বললে, 'কত বড়লোক? পারবে বাদশা—কি কোন শাহজাদার সঙ্গে শাদি দিতে?'

'ইস! তোমার আশা তো কম নয়!...'

'হ্যাঁ—ঐ রকম আশা আমার। নইলে আমি তোমাদের ঐ রাজু মিয়ার সঙ্গে আসতুম না। আমার বাবা খুব গরীব নয়।'

'আচ্ছা, ওসব কথা এখন থাক্, রুটি কখানা খেয়ে নাও দিকি—লক্ষ্মী মেয়ের মতো।'

'আমাকে ছেড়ে দাও। কোতোয়ালের কাছে খবর গেলে রক্ষা থাকবে না। সারা শহরে আমার খোঁজ চলছে, এই পথে আসতে আসতেই শুনেছি!'

চাচী হাসল। সানন্দ সরল হাসি।

'তুমি এ ঘর থেকে বেরোতে পারলে তো কোতোয়াল সাহেব খবর পাবেন। ...ওসব ভরসা ছাড়। ঢের ছেলেমানুষী হয়েছে, খেয়ে নাও।'

'আমি খাব না।'

'খাবে না?'

'না। ছেড়ে দাও আমাকে; এ বাড়ীতে কিছুই খাব না আমি।'

'আচ্ছা দেখা যাক—ক'দিন উপোস করে থাকতে পার!'

চাচী আবারও কপাট বন্ধ ক'রে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু লালী সত্যিই খেল না। সেদিনও না, তার পরের দিনও না।

চাচী এবার সত্যি-সত্যিই ভয় পেয়ে গেল।

'কোড়া লাগিয়ে তোমাকে শায়েস্তা করতে পারি—তা জান'? রাগ ক'রে বললে সে।

উপবাসে প্রায় নেতিয়ে পড়েছিল, তবু হার মানবার মেয়ে নয়। লালী সমান তেজের সঙ্গে জবাব দিলে, 'তাতে কি আমাকে খাওয়াতে পারবে? না তোমার দাম উসুল হবে।'

রাগে নিজের হাত নিজে কামড়ায় চাচী। অনেক মেয়েকেই সে শায়েস্তা করেছে এই বয়সে, কিন্তু এমন সাংঘাতিক মেয়ে তো কখনও দেখে নি! সত্যিই কিছু কোড়া লাগানো যায় না, নরম চামড়া—দাগ বসে যাবে। আর অমন চামড়াই যদি না রইল তবে দাম উঠবে কিসে! নইলে চেঁচাবার ভয় সে করে না। মুখে কাপড় গুঁজে দিলেই হবে।···একবার একটা মেয়েকে ঐভাবে ঢিট করতে গিয়ে মুশকিল বেধেছিল—পিঠে চিরদিনের মতো দাগ হয়ে গেল—আর কিছুতেই ভাল দাম পেল না।

অগত্যা অন্য পথ ধরলে চাচী।

খুব মিষ্টি গলায় বোঝাতে বসল।

'কেন বেটি অমন করছিস! সত্যি বলছি, এই কসম খেয়ে বলছি, আমার কথা শুনে চল্—টাকা-পয়সা হীরে-জহরতে ডুবে থাকবি। সত্যিই তোর নসীবে দৌলত আছে—তাই খোদা তোকে আমার কাছে এনে ফেলেছেন!'

'আমি শুধু টাকা-পয়সা চাই না নানী, আমি শাহী তাজ চাই! তখৎ-এ-তাউসে বসতে চাই!'

'এ যে পাগলের মতো কথা হ'ল। যা অসম্ভব তা আমি বলব না। বাদ্শা শাহ্জাদার কথা ছেড়ে দাও—বাদ্শা শাহ্জাদারা তো আমার বাড়ী আসবেন না—ধরে নিয়ে গিয়ে হারেমে পুরবেন। তাতে আমার লাভ কি? তবে হ্যাঁ—যা রয় সয়, নবাব সুবাদার পর্যন্ত চেষ্টা করলে দিতে পারব তোমাকে।···তাছাড়া টাকা যদি চাও—দক্ষিণের কারবারীরা আছে—হীরে-জহরতে মুড়ে দেবে।'

'না, নানী। বাদশা কি শাহ্জাদা ছাড়া আমি রাজী নই। তুমি আমাকে ছাড়। আমি বলছি, আমার যা জেদ তা আমি মেটাবই। আর সেদিন—তোমার এই টাকা—তোমার যত আশা—তার দশগুণ শোধ করব!'

আবারও চটে ওঠে চাচী, গালিগালাজ করে, চড়ও একটা বসিয়ে দেয় ওর গালে। তাতে শুধু লালীর নরম গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে যায়, আর কোন ফল হয় না। নিষ্পলক শুষ্ক চোখ মেলে দেওয়ালের দিকে চেয়ে কাঠের মতো শুয়ে থাকে সে।

কিছুতে, কোন মতে ওকে শায়েস্তা করতে না পেরে যেন ক্ষেপে যায় চাচী।

কী করবে সে, কেমন ক'রে ঢিট করবে ওকে! ঐ এক ফোটা জিদ্দী মেয়ের জন্যে কি এতগুলো কর্করে মোহর জলে যাবে?

অনেক ভেবেও যখন কূল-কিনারা পায় না—তখন ছুটে যায় সে জুহরার কাছে। গলির মোড়ের সব্‌জীওয়ালী জুহরা তার অনেকদিনের আর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

সব শুনে জুহরাও অবাক হয়ে যায়।

'তাজ্জব তো!...কত বড় মেয়ে রে সে?'

'কত আর—বড় জোর দশ বছরের হবে।'

'বলিস কি, তার এত জেদ? এত বুকের বল? চল তো দেখে আসি।'

জুহরা এসে কাছে বসে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে লালীকে সব কথা। তারপর প্রশ্ন করে ওকে, 'আচ্ছা ধরো তোমাকে ভাল নাচ শেখাবার ব্যবস্থা ক'রে দিলুম—কিন্তু তাতেও যদি বড়লোক হ'তে না পার—কোন বাদ্‌শা শাহ্‌জাদার নজরে না পড়—তাহলে, আমাদের টাকাগুলো কী হবে?'

অসহিষ্ণু কণ্ঠে লালী ব'লে উঠল, 'কেন ওসব বাজে বাজে কথা বলছ! শাহী তাজ একদিন আমার পায়ে লোটাবে। কেউ আটকাতে পারবে না—কিছুতেই না। ঐ তখৎ-এ-তাউস আমার হবে। হিন্দুস্তানের মানুষগুলো আমার কথায় মরবে বাঁচবে—এ আমার হবেই। তখন—'

'তখন? কি হবে তখন?'

'তখন তোমরা যা চাও, যত চাও তোমাদের দেব। দু হাত ভ'রে দেব—সোনা, চাঁদি, জহরৎ! এ বুঝবে না, তুমি বুঝবে আমার কথা—তুমি একটা উপায় ক'রে দাও—আমি তোমাকে রাণী ক'রে দেব, জায়গীর দেব তোমাকে। তুমি হাতীতে চেপে যাবে বেগমদের মতো!'

জুহরা এক দৃষ্টে কেমন একটা অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ছিল ওর মুখের দিকে, এখনও তেমনি ভাবে চেয়ে প্রশ্ন করলে, 'আর যদি না পার?'

লালীও কিছুক্ষণ স্থির হয়ে চেয়ে রইল ওর দিকে, তারপর বললে, 'আমি যে সুযোগ চাইছি তা যদি আমাকে দিতে পার তো আজ থেকে ষোল বছরের মধ্যে তোমার জায়গীর তুমি পাবে—নইলে, নইলে-ষোল বছর পরে আমি নিজে এসে দাঁড়াব তোমাদের কাছে। তখন আমাকে নিয়ে যা-খুশি ক'রো তোমরা। যাকে খুশি বেচে-দিও। খোদা কসম।'

জুহরা বাইরে বেরিয়ে এসে বললে, 'এ আলাদা জিনিস আমিনা, যা এতদিন ঘেঁটেছিস সে জিনিস নয় এ। শাহীতখ্‌তে বসবার মতোই মেয়ে এ। ছেড়ে দে একে, পারবি না সামলাতে। অনেক টাকা তো করেছিস, একবার ছেড়ে দিয়ে দ্যাখ্‌ না। জুয়াও তো খেলিস তুই—মনে কর বড় রকমের জুয়া খেলছিস একটা।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমিনা বলে, 'জানি না। যা খুশি কর তুই! ভাল এক আপদ এনে জোটাল রাজু মিয়া!'

জুহরা লালীর পাশে এসে বসল। ওর গায়ে হাত রেখে বলল, 'তোমার কথা বিশ্বাস করলাম আমি। তুমি যা চাও, তা-ই ব্যবস্থা ক'রে দেব। আমার

সঙ্গে চল—ফাতিমা বিবির কাছে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে ; তার এই কাজই, মেয়েদের নাচ গান শিখিয়ে তৈরী ক'রে নবাব বাদ্‌শার হারেমে পাঠায় সে। …কেমন খুশী তো ?'

'খুশী।'

'তাহ'লে এখন একটু দুধ খেয়ে নাও অন্তত। নইলে হাঁটতেই পারবে না যে।'

লালী ওর মুখের দিকে চেয়ে কী যেন দেখে নিল একটা, তারপর যেন একান্ত নির্ভরে ওরই হাত ধরে উঠে বসে বলল, 'কৈ দাও দুধ, খাচ্ছি।'

॥ ৩ ॥

শাহ্‌জাদা মির্জা মুইজউদ্দীন বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। জীবন থেকে রঙ ও রসই যদি চলে গেল তো জীবনে রইল কি ?

কিছুই ভাল লাগে না। স্ত্রীগুলো একঘেয়ে। বাঁদীগুলো সব কেমন কেমন, কাঠের পুতুল—শুধু জানে পয়সা আদায় করতে আর হুকুম তামিল করতে। ওদের মধ্যে প্রাণ নেই। ভাল নাচওয়ালী কেউ তাঁদের ত্রিসীমানায় আসে না। বাদ্‌শা আলমগীর ছিলেন বেরসিক, বাহাদুর শা কৃপণ—তাই ভাল ভাল বাইজী ও নাচওয়ালী যারা, তারা বহুদিনই সরে পড়েছে দিল্লি থেকে এদিক ওদিক—লক্ষ্মৌ আগ্রায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তাঁদের দিন কাটে কি ক'রে ?

জীবনে 'মজা' কৈ ?

শাহ্‌জাদার ইয়াররা তাঁর মেজাজের তল পায় না। তাদের যথাসাধ্য এনে যোগায়, কিন্তু মুইজউদ্দীনের মন খুশী হয় না তাতে। এক এক সময় মনে হয়, তিনি কি চান তা তিনি নিজেও জানেন না !

হঠাৎ একদিন কথায় কথায় বলে বসলেন, 'শুনেছি অনেক গেরস্ত ঘরে বিবিরা মরদদের ধরে মার দেয়—আমি যদি বাদশার ঘরে না জন্মে গেরস্ত ঘরে জন্মাতুম তো ঢের ভাল হ'ত !'

'বিবির হাতে মার খেতেন খুশী হয়ে ?'

'মন্দ কি। তবু তো নতুন রকম হ'ত। এ আর ভাল লাগে না, এই একঘেয়ে জীবন !'

শাহ্‌জাদার প্রিয় বয়স্য ইমাম আলি হঠাৎ বলে উঠল, 'বেগম না হোক্‌, এমনি নাচওয়ালী কিন্তু আমি দেখেছি শাহ্‌জাদা। সে ভারী মজার মেয়ে।'

'কী রকম, কী রকম ?' মুইজউদ্দীনের সুরারক্ত চোখ দুটি উৎসুক হয়ে ওঠে।

'সে নাকি মুজ্‌রো করে শুধুই নাচের, কিছুতেই কাউকে ধরা দেয় না। তার সুখ্যাতি শুনে,—লাহোরের সুবাদার যখন দিল্লি যান তখন বায়না দিয়েছিলেন। মোটা টাকার বায়না—পাঁচশ মোহরের মুজ্‌রো, একশ মোহর তো বায়নাই দেওয়া হয়েছিল। নাচ শেষ হ'তে সুবেদার ওর হাত ধরতে গেছেন—হাত ছিনিয়ে নিয়েছে। বলে, পাঁচশ 'মোহরে আমার নাচ পাওয়া যায় নবাব

সাহেব, আমাকে পাওয়া যায় না। নবাব হেসে বলেছেন, চটছ কেন বাইজী, না হয় পাঁচশ মোহর আরও নেবে। সে বলে, তাও নয়, যে দামে আমি নিজেকে বেচব তা ঠিক করাই আছে। সুবেদার প্রশ্ন করেছিলেন—কী সে দাম বল, এখনি দিচ্ছি। উত্তর এল—সে দাম আপনি দিতে পারবেন না। কি দাম এমন?…না, বাদশাহী তাজ। এক বাদশার কাছে ছাড়া আর কারও কাছে ধরা দেব না।'

'বটে বটে—বড় তাজ্জব মেয়ে তো!' শাহজাদা সোজা হয়ে বসলেন।

'শুনুন এখনও, এরই মধ্যে কি? ওর কথা শুনে ঠাট্টা মনে ক'রে সুবাদার জোর ক'রে টানতে গেছেন, ওর কোমরে ছিল শঙ্কর মাছের এক চাবুক, যা নাকি জড়ানোই থাকে কোমরে—যেখানে যখন মুজরো করতে যায়—বার ক'রে সটান সুবেদারের মুখে এক ঘা। কপাল ফেটে রক্ত ঝরে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তো বাপ্ ব'লে ছেড়ে দিলেন, নাচওয়ালী বেরিয়ে এল ঘর থেকে!'

'এমন গুস্তাকী! তা সুবাদার এমনি এমনি ছেড়ে দিলেন?' জিজ্ঞাসা করলে মীর বক্স।

'কী করবেন? এসব জানাজানি হ'লে যে আরও কেলেঙ্কারি। তাই কিল খেয়ে কিল চুরি করলেন!'

শাহজাদা, ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন একেবারে, 'ইমাম আলি, কোথায় সে থাকে, তাকে এখনই তলব কর।'

'উঁহু শাহজাদা, সে হবার উপায় নেই। ঐ ঘটনার পর থেকে সে পরের বাড়ি মুজরো করাই ছেড়ে দিয়েছে, এখন কেউ নাচ দেখতে চাইলে তার বাড়ি যেতে হবে!'

'তাই না হয় যাই চল। এখনই যাই।'

'ধীরে শাহজাদা, ধীরে। সে নাচওয়ালী থাকে দিল্লীতে, আপনি এখন মুলতানে। ইচ্ছে করলেই যাওয়া যাবে না। এমন কি বাদশা শাহজাদাদেরও ভগবান উড়ে যাবার ক্ষমতা দেন নি। আপনি আজ রওনা হ'লেও পৌঁছতে এক মাস। তাছাড়া আজই হঠাৎ মুলতান ছাড়বার কী কৈফিয়ৎ দেবেন বাদশাকে?'

'তুমি বড় সব তাইতে দমিয়ে দাও ইমাম আলি।' অপ্রসন্ন মুখে বলেন শাহজাদা।

•

হজরৎ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মেলায় বহু দেশ থেকে বহু লোক আসে। হরেক রকমের লোক। গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত, সাধু ফকিরও আসে।

তীর্থযাত্রীরা আসে নানা দেশ থেকে—তামাম হিন্দুস্থান তো বটেই, বাইরেও সুদূর তাতারীস্তান কাজাগীস্তান ইরাক ইরাণ থেকে আসে মানসিকের পুজো শোধ করতে—কেউ আসে মানসিক করতে। জাগ্রত পীর আছেন এখানে নিজামুদ্দিন সাহেব, তাঁর মর্জি হ'লে রাত এখনও দিন হয়ে যেতে পারে।

যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে আরও বহুলোক আসে। চিরকাল সব দেশেই, সব ধর্মের সব তীর্থেই আসে এরা। আসে তীর্থযাত্রীদের ইহলোকের সম্বল কিছু

খসাতে। আসে নানান পণ্য নিয়ে কারবারী দল। আসে রোজা-ওঝা-গুণীন্। জড়ি বুটি নিয়ে আসে হাকিম বৈদ্যেরা। দৈব ওষুধ নিয়ে এসে ভাসে যাযাবর বেদেরা। সব চেয়ে বেশী আসে দৈবজ্ঞ বা জ্যোতিষীর দল। ছোট বড় মাঝারি—নানান দামের ও নানান ধরণের। কেউ কেউ পথের দুদিকে বসে যায় খুঙ্গিপুঁথি নিয়ে, কেউ বা দরগার উঠোনেই জাঁকিয়ে বসে। কেউ আবার দরগার আশেপাশে যে সব সাময়িক চালা তোলা হয়, তারই একখানা ভাড়া ক'রে বসে যায়।

এবার এসেছেন দক্ষিণ ভারত থেকে বিখ্যাত দৈবজ্ঞ মৌলবী জনাব আল্লাবক্স সাহেব। এসেছেন তিনি তীর্থ করতে, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি দু'পয়সা কামিয়ে নেওয়া যায় তো ক্ষতি কি? "এক পন্থ দৈব কাজ'—আসা যাওয়ার খরচাটা উঠেও হয়তো দু'পয়সা থাকতে পারে।

আল্লাবক্স সাহেবের খ্যাতি খুব। দাক্ষিণাত্য থেকে সে খ্যাতি তাঁর পৌঁছবার বহু আগেই দিল্লি পৌঁছে গেছে। ফলে দিনে রাতে একটু ফুরসুৎ নেই। তাঁর ঘরে লোকের ভিড় লেগেই আছে। মেলার মধ্যে কী ক'রে যেন রটে গেছে মৌলবী সাহেব ত্রিকালজ্ঞ—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান তাঁর নখদর্পণে, অভ্রান্ত তাঁর গণনা, যাকে যা বলেছেন তা-ই সত্যি হয়েছে। আর একটা বড় কথা, তিনি আমীর রইস লোকেদের কাছ থেকে যেমন মোটা টাকা আদায় ক'রে নিচ্ছেন, তেমনি গরীব লোক—যারা পীর সাহেবের নাম ক'রে বলছে যে তাদের কিছু দেবার সামর্থ্য নেই—তাদের হাত বিনা পয়সাতেই দেখছেন। অথচ তাই ব'লে অবহেলাও করেছেন না, ভাল ক'রেই দেখছেন।

শাহ্‌জাদা মির্জা মুইজুদ্দীনও মেলাতে এসেছেন। নিজামুদ্দীন সাহেবের মেলাতে তিনি প্রায়ই আসেন—মানে কাছাকাছি থাকলেই। শাহ্‌জাদা বিলাসপ্রিয় এবং নারীসঙ্গলিপ্সু হ'লেও মোল্লা-ফকীরে তাঁর অচলা ভক্তি, তা এ অঞ্চলের সবাই জানে; এই মেলাতে বহু ভাল ভাল ফকীর দরবেশ আসেন, অন্য সময় তাঁদের দেখা মেলে না।

শাহ্‌জাদাও জ্যোতিষী আল্লাবক্সের নাম শুনেছেন বৈকি!

কামবক্স যেদিন জুলফিকর খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন সেদিন এই আল্লাবক্সই নাকি তাঁকে নিষেধ করেছিলেন—কামবক্স শোনেন নি। তার ফল কী হয়েছে তা সবাই জানে। শাহ্‌জাদারও একটা জরুরী প্রশ্ন আছে, জীবনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সেটা।

তাই তিনিও ঘুরতে ঘুরতে এক সময় জ্যোতিষীর চালার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু সেখানে তখন মস্ত গোলযোগ চলছে। এক তরুণী নাচওয়ালী এসেছে হাত দেখাতে। তার আগে থেকেও বহু লোক এসে দাঁড়িয়ে আছে—একে একে ডাকছেন মৌলবী সাহেব কিন্তু সে মেয়েটি অপেক্ষা করতে রাজী নয়। তাই নিয়ে তকরার চলেছে। সে বলছে, 'আমার এতক্ষণ অপেক্ষা করার সময় নেই, মৌলবী সাহেবকে বলো তাঁর কত টাকা চাই আমি দিচ্ছি—আমার হাত আগে দেখে দিতে হবে।'

মৌলবী সাহেবের মুন্সী বলছেন, 'মৌলবী সাহেবের অমন টাকায় দরকার নেই। বেইমানীর টাকা তাঁর কাছে হারাম!'

'টাকার আবার দরকার নেই কার? বাদশার তো অত টাকা—তিনিও টাকা পেলে খুশী হন!' ঝেঁজে ওঠে মেয়েটি।

চেঁচামেচি গণ্ডগোল বেড়েই যায়। ঝোপড়ার মতো ঘর, ভেতরে বসে মৌলবী সাহেবের কাজ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। তিনি মুন্সীকে ডেকে পাঠান খোঁজ করতে—ব্যাপার কি?

সব শুনে মৌলবী সাহেব বললেন, 'দাও বাপু ওকে পাঠিয়েই দাও—চেঁচিয়ে মাথা ধরিয়ে দিলে একেবারে। এমন করলে কাজ করব কি ক'রে?'

কিন্তু মুন্সী সে অনুমতি নিয়ে বাইরে আসার আগেই বাইরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেল—

'শাহ্‌জাদা! শাহজাদা! শাহ্‌জাদা এসেছেন!'

শাহ্‌জাদা যদিচ সাধারণ পোশাকে, সিপাহী শান্ত্রী না নিয়েই এসেছেন, এমন কি ঘোড়াও রেখে এসেছেন বহুদূরে—ফকীর দরবেশদের মেলায় এলে এমনি ভাবেই আসেন তিনি বরাবর—তবু তাঁকে এতবড় মেলায় কেউ চিনতে পারবে না—তা সম্ভব নয়।

মুন্সীর কানেও সে রব পেঁছেছিল বৈকি। তাই বেরিয়ে এসে মেয়েটিকে পাঠাবার কথা আর তাঁর মনে রইল না, তিনিও আভূমি-নত হয়ে কুর্নিশ করতে করতে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন বাদ্‌শাজাদাকে অভ্যর্থনা জানাতে।

'আসুন আসুন, শাহ্‌জাদা আসুন। কী ভাগ্য আমাদের!'

শাহ্‌জাদা মুইজুদ্দীনও প্রসন্ন বরাভয়ের হাসি হেসে এগিয়ে আসছেন—হঠাৎ মেয়েটি একেবারে বিদ্যুৎবেগে পথ আগলে দাঁড়াল।

'কখনও না। আমার বেলা কত বড় বড় কথা বেরোচ্ছিল, অনেক নিয়ম-কানুন শুনছিলাম, শাহ্‌জাদা আসতেই সব উল্‌টে গেল একেবারে! শাহ্‌জাদাই হোন আর যে-ই হোন, আমার পরে আসতে হবে।'

শাহ্‌জাদা ভ্রূকুটি ক'রে তাকালেন। চোখে চোখে মিলল। ভ্রূকুটি মিলিয়ে গেল তাঁর।

অপূর্ব সুন্দরী, তন্বী ছিপছিপে একটি মেয়ে, আয়ত চোখে তার আবেশ নয়—বহ্নি! রোষরক্তিমা তার গুলাবী-বর্ণে আরও দীপ্তি এনে দিয়েছে, ক'রে তুলেছে আরও মোহনীয়।

মেয়েটার ধৃষ্টতায় উপস্থিত সকলেরই চোখ কপালে উঠেছে। ওর গর্দান তো যাবেই—আর যাওয়াই উচিত—তাদেরও না সেই সঙ্গে যায়! শাহ্‌জাদা না মনে করেন তারাও ওর সঙ্গের লোক। একজন তো নিজের গলাটায় একবার হাত বুলিয়ে নিল—অধিকাংশই খানিকটা ক'রে সরে দাঁড়াল, বেশ একটা ব্যবধান রচনা ক'রে।

মুন্সীও ঘেমে উঠেছেন এই কল্পনাতীত গুস্তাকীতে।

'কী বলছ বহন! ইনি যে শাহ্‌জাদা!'

'শাহ্‌জাদা তো কী হয়েছে। বাদশা হ'লেও আমি যেতে দিতুম না! নিয়ম যা তা সকলের পক্ষেই নিয়ম। আমাকে তখন অত কথা বলেছিলেন কেন? আমিও তো বেশী টাকা দিতে চেয়েছিলাম। কত টাকা দেবেন শাহ্‌জাদা? আমি তার দুনো দেব!'

এই অসহনীয় ধৃষ্টতায় শাহ্‌জাদার বন্ধুরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ইয়ার জঙ্গ্‌ কোমরের তলোয়ারে হাত দিলেন, গোলাম আখ্‌তার ভীষণ ভ্রূকুটি ক'রে এগিয়ে এলেন। ইমাম আলি শুধু পিছন থেকে চুপিচুপি শাহ্‌জাদার কানে কানে বললে—'এ-ই সে নাচওয়ালী আলিজা, যার কথা বলেছিলাম আপনাকে।'

সে সংবাদ শোনবার আগেই শাহজাদা আকৃষ্ট হয়েছেন। তিনি হাতের ভঙ্গীতে গোলাম আখ্‌তারকে নিবৃত্ত ক'রে মধুর হেসে এগিয়ে এলেন দু'পা। মিষ্টকণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা, সে ঝগড়া আমি করব না। কিন্তু বাদ্‌শাজাদার আগে ভেতরে যেতে চাইছ, তোমার পরিচয় কি? নাম?'

এবার চোখটা একটু নামাল সে। ঈষৎ যেন সংকোচও প্রকাশ পেল কণ্ঠস্বরে, তবু সে সতেজেই জবাব দিল—

'নাম পরিচয় জেনে কি হবে জনাব? ধরুন আমি পথের ভিখিরী। কিন্তু তা হ'লেও আমার প্রাপ্যের দাবি আমি ছাড়ব কেন?'

'না, এমনি। আমার দাবি আমি যাকে ছেড়ে দিচ্ছি তার নামটাও জানব না?'

মেয়েটির শুভ্র মুখে এবার আর এক রকম রক্তিমাভা খেলে গেল। এবার রোষ নয়—লজ্জা। সে ধীরে ধীরে জবাব দিল, 'আপনার এ বাঁদীর নাম লাল কুঁয়র, লালীও বলে কেউ কেউ। আমি সামান্য এক নাচওয়ালী!'

ওর কপোলের সুগৌর শুভ্রতার সঙ্গে লালিমার যে অপরূপ খেলা চলছিল, সেই দিকে মুগ্ধ নেত্রে তন্ময় হয়ে চেয়ে ছিলেন শাহ্‌জাদা। এবার হেসে বললেন, 'বিনয় ক'রে বাঁদী বলে পরিচয় দিয়েছ—পাঁচজনের সামনে, সেই-মতো যদি তোমাকে এখন দাবি করি পিয়ারী?'

তারপর উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাবে বললেন, 'বেশ তো—এত বিবাদের কি আছে? চলো না আমরা একসঙ্গেই যাই মৌলবীজীর কাছে। কারুরই অপরের কাছে দাবি ছাড়বার দরকার নেই।'

লাল কুঁয়র এইবার মাথা নত ক'রে অভিবাদন জানাল, 'আপনিই আগে চলুন জনাবালি!'

মৌলবী আল্লাবক্স সাহেব বহুক্ষণ চেয়ে রইলেন নর্তকীটির মুখের দিকে। হাতখানাও দেখলেন একবার। তারপর বললেন, 'তোমার ভাগ্য দেখা আমার হয়ে গেছে বহিন। বলো এবার কি জানতে চাও?'

'আপনি তো সবই জানেন। মন বুঝেই উত্তর দিন!'

'ও, আমাকে পরখ করতে চাও?' হাসলেন আল্লাবক্স। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ হবে, যা তুমি চাও, তা পাবে। বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন, নিরাপদ নিশ্চিন্ত

জীবন, সব কিছু ত্যাগ ক'রে এই দীর্ঘকাল সাধনা করেছ যার জন্যে—তা মিলবে তোমায়। দীন-দুনিয়ার মালিক তামাম হিন্দুস্তানের কোন বাদ্‌শা তোমার পদানত হবেন। আমি জেনেশুনেই বলছি শাহ্‌জাদা, জ্যোতির্বেত্তার অপরাধ ক্ষমা করবেন। তুমি সেই সাম্রাজ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। উচ্চপদস্থ লোককে টেনে নামাবে তার সম্মানের আসন থেকে। আর যারা পথের ভিখিরী তাদের তুলে বসাবে রত্ন-আসনে। কুকুরকে যেমন ক'রে উচ্ছিষ্ট হাড়ের টুক্‌রো দেওয়া হয় তেমনি অনায়াসে রাজ্যখণ্ডও তুমি বকশিশ করবে লোককে। মণিমুক্তা বিলোবে মুঠো মুঠো। তুমি জাহান্নমে যাবে আর সেই সঙ্গে টেনে নিয়ে যাবে তোমার বাদ্‌শাকেও। তোমাকে বরণ ক'রে চরম সর্বনাশকেই বরণ করবেন তিনি। তবে একটা কথা—তুমি যা চাও, এতকাল যা চেয়েছ তা পাবে, কিন্তু ক্ষণকালের জন্য। তোমার স্বভাবের দোষেই আবার তা হারাবে তুমি। মাত্র—'

লাল কুঁয়র মৌলবী সাহেবের মুখের কাছে দুই হাত তুলে, যেন তাঁর মুখ চেপে ধরবার ভঙ্গিতেই বললে, 'থাক থাক মৌলবীজী, সে খবর না শুনলেও চলবে। কতকাল ভোগ করব তার জন্যে আমি মোটেই ব্যস্ত নই। আশা যদি আমার সফল হয়—একদিনের জন্যে হ'লেও আমি খুশী। শেষের খবরটা আর আগে থাকতে না-ই শুনলুম!'

'বেশ। তাই হোক!'

আল্লাবক্স এবার শাহ্‌জাদার দিকে ফিরলেন।

'আপনার ভাগ্য কি এই মেহ্‌রারুর সামনেই গণনা করাবেন শাহ্‌জাদা?'

'খুশিসে। এই মেহ্‌রারুকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই—শুধু দিল নয়—জিন্দিগীও দিয়ে দিয়েছি যে! এখন থেকে আর আমার জানও আমার নয় মৌলবীজী!'

একটু হাসলেন আল্লাবক্স। উন্মাদ দেখেশুনে আগুনে হাত দিতে যাচ্ছে দেখলে মানুষ যেমন হাসে, ছোট ছেলেমেয়েদের ছেলেমানুষীতে যেমন অভিভাবকরা হাসে—তেমনি।

তারপর গলা নামিয়ে বললেন, 'যা জানতে চান তা বলছি। তখৎ-এ-তাউস আপনি পাবেন। দৈবাৎ পাবেন, আপনার গ্রহসংস্থান অনুকূল বলে। আপনার চেয়ে যারা যোগ্যতর তারা হারবে এবং মরবে—শুধু অদৃষ্টের জন্য! কিন্তু তখ্‌ৎ আপনি রাখতে পারবেন না জনাব। এক স্ত্রীলোক আপনার সর্বনাশের মূল হবে, সে-ই টেনে নিয়ে যাবে আপনাকে জাহান্নমের দিকে। শুধু সে আপনারই সর্বনাশের হেতু হবে না শাহাজাদা, সমস্ত মুঘল বংশের সর্বনাশের হেতু হবে সে। সে ঐ তখ্‌ৎ-এ তাউসকে এমন নিদারুণ পঙ্ককুণ্ডে নিক্ষেপ করবে যে—তা থেকে আর কেউ টেনে তুলতে পারবে না সে তখ্‌ৎ! সাবধান জাহাঁপনা।...পুরুষকার দৈবকেও লঙ্ঘন করে মধ্যে মধ্যে—এখন থেকে সর্তক হোন। নিজেকে সংযত করুন। স্ত্রীলোকের মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন।'

'যথেষ্ট মৌলবীজী।...শুধু আর একটা কথা বলুন দেখি, এখন—এই মুহূর্তে যে স্ত্রীলোকটির চিন্তা আমার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে—তাকে আমি

পাব কি না।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আল্লাবক্স বললেন, 'পাবেন। সে-ই আপনার নিয়তি।'

'ব্যস!···সে হুরী এসে যদি আমার হাত ধরে, চোখ বুজেই তার সঙ্গে চলব মৌলবী, সে বেহেস্তেই নিয়ে যাক—আর জাহান্নমেই নিয়ে যাক। তার তখ্‌ৎ সে নামিয়ে পাঁকে ফেলে তাও ভাল। শুধু আজ থেকে আমরণ সে যেন আমার পাশে থাকে!'

'থাকবে, তা থাকবে।' দৈববাণীর মতো যেন কোন্ দূর থেকেই বলেন আল্লাবক্স। তেমনি নির্মম শোনায় তাঁর কণ্ঠস্বর।···

জেব থেকে রুমালেবাঁধা মোহর জ্যোতিষীর সামনে রাখলেন বাদ্‌শাজাদা মুইজুদ্দীন। লাল কুঁয়রের মোহরের ওপরই পড়ল সেগুলো, ঈষৎ শব্দ ক'রে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে লাল কুঁয়রের দিকে চেয়ে গাঢ়কণ্ঠে ডাকলেন, 'পিয়ারী!'

'আপনার বাঁদী শাহ্‌জাদা!' মধুর কণ্ঠে জবাব দিল লালী।

বুনো পাখী বুঝি তার মনের মতো খাঁচা খুঁজে পেয়েছে।

॥ চার ॥

১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি অন্ধকার শীতার্ত রাত্রি। একে পৌষ মাস তায় কয়েকদিন ধরে অবিশ্রান্ত বর্ষণ গেছে—হাড়ভাঙ্গা শীত চারিদিকে। আকবরাবাদ থেকে সোজা যে শাহী সড়কটি দিল্লি পর্যন্ত গেছে—সেই প্রশস্ত রাজপথেরও কোথাও কোন জনমানবের চিহ্ন নেই।

তবু, পরাজিত আশাহত সম্রাট জাহান্দার শাহ্ সে-পথে যেতে সাহস পান নি। এই কিছুক্ষণ আগেই প্রচণ্ড যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়েছেন। হয়তো এখনো সম্পূর্ণ সর্বনাশ হয় নি তাঁর। হয়তো এখনও কোথাও আশ্রয় পেলে আর একবার তিনি যাচাই করতে পারেন ভাগ্যকে। কিন্তু সে দূরের কথা। এখন তিনি পলাতক মাত্র। তাই তিনি যাচ্ছিলেন লোকালয় এড়িয়ে একটি 'বহল' বা বয়েল গাড়িতে চড়ে মাঠ ভেঙে—ক্ষেতের মধ্য দিয়ে। শাহী সড়ক বাদ্‌শাহেরই সড়ক, আজ বিকেল পর্যন্ত এই সড়কের তিনিই মালিক ছিলেন। আজও হয়তো আইনত তিনিই মালিক—তবু সে পথে উঠতে সাহস হচ্ছে না তাঁর। রাজপথ আজ রাজার অগম্য। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও তাঁর পিছনে ছিল লক্ষ সৈন্য। আর এখন—একমাত্র সেবক এই আজম খাঁ ভরসা।

হ্যাঁ, আরও একজন আছে বৈকি, তাঁর পিয়ারী লাল কুঁয়র।···জাহান্দার শা ওরই মধ্যে আর একটু গা ঘেঁষে বসলেন তাঁর প্রেয়সীর।···আর কাউকে তাঁর দরকার নেই। লাল কুঁয়র থাকলেই বেহেস্ত্ও রইল তাঁর হাতের মুঠোয়। এই তো, অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আসতে আসতে নিজের কানেই তিনি শুনলেন—তাঁরই একজন প্রজা বলছে, 'জাহান্দার শা সত্যিকারের বীর ছিলেন। শুধু ঐ বাঁদীটা—নাচউলীটার পাল্লায় পড়ে আজ তাঁকে হিন্দুস্তানের তখ্‌ৎ হারাতে হ'ল।'···হিন্দুস্তানের তখ্‌ৎ হারাতে হ'ল কিনা তা এখনও তিনি জানেন না—

কিন্তু হ'লেও দুঃখ নেই। লাল কুঁয়রের জন্য তিনি তামাম হিন্দুস্তান কেন—সাঁত্যকারের দুনিয়ার বাদশাহীও হারাতে রাজী আছেন। ওকে ছেড়ে বেহেস্তেও লোভ নেই তাঁর।

'উঃ!' অস্ফুট একটা আর্তনাদ ক'রে উঠলেন লাল কুঁয়র—বেগম ইমতিয়াজ মহল।

'কি হ'ল পিয়ারী? লাগল?'

'আর পারি না। এই শক্ত গাড়ি আর এই ঝাঁকানি। সারা গা আড়ষ্ট হয়ে গেল!'

'তাই তো!' কষ্ট জাহান্দার শাহেরও কিছু কম হচ্ছিল না। কিন্তু জাহান্দার শা যোদ্ধা, কিছুকাল আগেও নিয়মিত লড়াই এবং কুচকাওয়াজ করেছেন। ঘোড়ার পিঠে একাদিক্রমে আটপ্রহর কাটানোও তাঁর অভ্যাস আছে। গোরুর গাড়ির এই ঝাঁকানি তাঁর কাছে এমন কিছু কষ্টকর নয়। কিন্তু লাল কুঁয়রের কথা যে আলাদা। ননীর মতো নরম ওঁর শরীর। বাদশা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আজম খাঁকে ঈষৎ ঠেলা দিয়ে বললেন, 'মহম্মদ মিয়া, গাড়িটা কোথাও একটু দাঁড় করালে হয় না? পিয়ারীর বড় কষ্ট হচ্ছে।' ওর জন্যে কোন ঝুঁকি নিতেই তিনি পিছপা নন। সত্যি কথা বলতে কি—সাম্রাজ্যের ওপর আজ আর খুব লোভ নেই তাঁর। যা কিছু করেছেন এই সিংহাসন বাঁচিয়ে রাখতে—তা তো লাল কুঁয়রেরই জন্য!

আজম খাঁয়েরও কষ্ট কম হচ্ছিল না। কারণ সে খানসামা হ'লেও বাদশারই খানসামা—আজ সে নিজেই ছোটখাটো একটা জায়গীরের মালিক। তবু ওরই মধ্যে বসে বসে সে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিল। সে ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে বললে, 'এখানে কোথায় দাঁড় করাবো বলুন, এই মাঠের মধ্যে!'

জাহান্দার শা মুগ্ধ বটে, নির্বোধ নন। আজম খাঁয়ের বিরক্তি তাঁর কাছে গোপন রইল না। তিনি এবার অন্য পথ ধরলেন, 'কিন্তু আমারও যে বড় পিপাসা পেয়েছে মহম্মদ মিয়া, একটু জল না খেয়ে আমি তো পারছি না!'

লাল কুঁয়র নিজেই এবার মৃদু ধমক দিলেন, 'কী হচ্ছে আদিখ্যেতা তোমার! এখন যত তাড়াতাড়ি কোন নিরাপদ জায়গায় পৌঁছনো যায় ততই তো ভাল!'

'না না। তুমি কোথাও একটা কারুর ঘরবাড়ি দেখে গাড়ি দাঁড় করাও মহম্মদ মিয়া। একটু জল খেয়ে হাত-পা একবার ছাড়িয়ে নিই।…ঐ যে একটা আলো দেখা যাচ্ছে না?…ঐখানে বোধ হয় গাঁ আছে একটা।'

সত্যিই একটা আলো দেখা যাচ্ছিল। এরা কেউ লক্ষ্য করে নি। আজম খাঁ অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে গাড়োয়ানকে সেই দিকে গাড়ি চালাতে বললে। অনেকটা ঘুরেই যেতে হ'ল—ওদের পথ যেদিকে সেদিকে নয়—অযথা খানিকটা দেরি। কী আর করা যাবে—'বাদশা'র হুকুম!

গাঁ নয় ঠিক—গাঁয়ের বাইরেই ঘরটা, যেখানে আলো জ্বলছিল। আজম খাঁ আশ্বস্ত হ'ল খানিকটা। বাদশাকে এ অঞ্চলের অনেকেই দেখেছে।…দেখলেই

চিনতে পারবে। তারপর? বকশিশের লোভে কী না করতে পারে মানুষ? বিজয়ী ফররুখশিয়ারের কাছে ধরিয়ে দিতে পারলে অনেক হাজার টাকা ইনাম মিলবে। কাল সকালে যত তাড়াতাড়ি হোক্ হাজাম ডেকে বাদ্‌শার দাড়িগোঁফ-মাথা কামিয়ে দেওয়া দরকার। চট্ ক'রে যাতে মেয়েছেলে সাজিয়েও অন্তত নিয়ে যাওয়া যায়।

আজম খাঁর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল।

গন্তব্যস্থানে তারা এসে গেছে। গাড়ি থেকে আগেই নেমে পড়েছেন সম্রাট। সেই নিশীথ রাত্রের আলেয়ার-আলোজ্বলা বাড়িটায় তারা পেঁছে গেছেন বুঝি—

বাড়ি নয়, নিতান্তই কুটির। খাপরার চাল, খান দুই মেটে ঘর। সামান্য একটু বেড়া দেওয়া উঠোনের মতো। ওধারে বোধ হয় আরও ঘর ছিল, মাটির চওড়া দেওয়ালগুলো ভেঙ্গে পড়ে আছে। উঠোনেরই এক কোণে ভাঙা চারপাই একখানা পড়ে রয়েছে—তার নিচে একটা কালো কুকুর শুয়ে। কুকুরটা গাড়ির আওয়াজ পেয়ে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে।

ঘরের দু'টি মাত্র অধিবাসী ওদের চোখে পড়ল। একটি তরুণ এবং একটি কিশোরী। সম্ভবত স্বামী-স্ত্রী। ঘরের দাওয়াতে চেরাগ জেবলে বসে এত রাত পর্যন্ত ওরা দশ-পঁচিশ খেলছিল। অন্তত ওঁদের তাই মনে হ'ল। হঠাৎ এমন সময় এদিকে একখানা বয়েলগাড়ি আসতে দেখে বিস্মিত হয়ে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিল, এখন সশস্ত্র আজম খাঁ ও জাহান্দার শা'কে গাড়ি থেকে নামতে দেখে ওদের মুখ শুকিয়ে উঠল।

আজম খাঁ এক লহমায় অবস্থাটা বুঝে নিল। সেই ক্ষীণ আলোতেও ওদের মুখভাব তার চোখ এড়ায় নি। তাড়াতাড়ি গিয়ে বলল, 'আমরা রাহী, এই পথে যাচ্ছিলুম—বড় তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল খাওয়াতে পারো নওজওয়ান?'

ততক্ষণে লাল কুঁয়রও নেমে পড়েছেন। তাঁকে দেখে মেয়েটি একটু আশ্বস্ত হ'ল। তাড়াতাড়ি ছুটে তাঁর হাত ধরে এগিয়ে নিতে এল—'আসুন, আসুন বাইসাহেবা, বসুন।' সে নিজে যে চাটাইটায় বসে এতক্ষণ খেলছিল, সেই চাটাইতেই ওঁকে বসাল।

চাষীর মেয়ে, ধুলোর মাঝে মানুষ। রঙ্গীন ঘাঘরা আর কাঁচুলি যৎপরোনাস্তি ময়লা। হাতেও ধুলোকাদার অভাব নেই। মেয়েটি এসে হাত ধরাতে ঘৃণায় কি লাল কুঁয়র শিউরে ওঠেন নি?…উঠলেও মুখে তা প্রকাশ পেল না। অতিরিক্ত মনের জোরে প্রশান্তমুখে হাসি ফুটিয়ে ওর সঙ্গে এসে বসলেন সেই চাটাইয়ের উপরেই। ভেলভেটের শালোয়ার তো তাঁর আগেই বয়েলগাড়িতে ময়লা হয়েছে—তার ওপর আর মায়া নেই।

ছেলেটি ততক্ষণে ঘর থেকে একটা চারপাই এনে উঠোনে পেতে দিয়েছে পুরুষদের বসবার জন্যে।

মেয়েটি আগের মতোই নিচু গলায় বললে, 'আগুন করব একটু?'

'না না বাঁদিন, কিছু দরকার নেই। তোমার মরদকে বল শুধু একটু জল তুলে দিক্‌।'

'মরদ' অর্থাৎ সেই ছোকরাটি তার আগেই লোটা বার ক'রে মাজতে বসে গিয়েছে ঐ মাজা লোটা কাদাসুদ্ধ দড়ি বেঁধে ডুবিয়ে দেবে কুয়ায়। প্রথম যে জল উঠবে তাতেই ধোবে তার মাটি। তারপর আবরে ডুবিয়ে তুলবে পানীয় জল।...এই এ দেশের দস্তুর! আজম খাঁ তা জানে। সে চুপ ক'রেই রইল। সম্রাটের অত লক্ষ্য নেই, তিনি সেই সংকীর্ণ খাটিয়াতেই এলিয়ে প'ড়েছেন তখন। আফিংয়ের কৌটোটা 'জেব'-এই ছিল ভাগ্যিস। নেশাটা বেশ চড়েছে এখন।

লাল কুঁয়র এতক্ষণে মেয়েটির দিকে ভাল ক'রে তাকাবার অবকাশ পেয়েছেন। পনেরো-ষোল বছর বয়স হবে—কিন্তু একেবারেই চাষীর ঘরের মেয়ে বলে বোধ হয় না। অদ্ভুত, আশ্চর্য সুন্দরী। বাদ্‌শার হারেমেও অগ্রগণ্য হবার মতো রূপ এর। ওর স্বামীর দিকে আড়ে দেখলেন। বলিষ্ঠ সুশ্রী চেহারা—কিন্তু সে সাধারণ। নিতান্তই সাধারণ। এদেশে এমন চেহারা হামেশাই চোখে পড়ে—পথে মাঠে ঘাটে। এ মেয়ের পাশে দাঁড়াবার মতো নয়—

লাল কুঁয়র মুগ্ধ চোখে চেয়ে হেসে বললেন, 'এত রাত অবধি দশ-পঁচিশ খেলছিলে তোমরা? ভোরের তো খুব বেশী দেরি নেই!'

'তাই নাকি? কে জানে!' দীর্ঘ পক্ষ্মঘেরা পদ্মপলাশের মতো চোখ দুটি মেলে আকাশের দিকে চায় সে। তারপর আরও ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বলে, 'বুড়ী শাস আছে যে। দিনের বেলায় তো মরদের সঙ্গে কথাই কওয়া যায় না! তা' ছাড়া খেলতে দেখলে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে একেবারে।...বুড়ী ঘুমোলে তবে খেলতে বসি!'

'আর বুড়ী যদি উঠে পড়ে হঠাৎ—?'

কৌতুকের ছোঁয়াচ লাগে বুঝি লাল কুঁয়রের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনেও।

'ও...সে ভয় নেই। সে ভোরের আগে ওঠে না। উঠলেও আগে তো একদণ্ড কাশবে খক্‌খক্‌ ক'রে। সে-শব্দ পেলেই দীয়া নিভিয়ে আমরা শুয়ে পড়ব!'

ততক্ষণে ছেলেটি বড় লোটা ভ'রে জল নিয়ে এসেছে।

'কে জল খাবেন?'

মেয়েটি চোখের নিমেষে উঠে দাঁড়ায়।

'দাঁড়াও, শুধু জলটা খাবেন!...তাই তো ঘরেও তো, কিছু নেই।...গুড় আছে একটু। এ-বছরের নতুন আখের তাজা গুড়।...খাবেন?'

'গুড়?' হঠাৎ সম্রাট হা হা ক'রে হেসে উঠলেন।

'তা মন্দ কি হে মহম্মদ মিয়া! কখনও তো' খাই নি।...খেয়েই দেখি। শরবতের কাজ করবে।'

'আপনাদের কি খিদে পেয়েছে? ঘরে অবিশ্যি কিছুই নেই। ভুজা আছে কিছু কিছু—মকাই, চানা। খেতে পারবেন?...যদি একটু অপেক্ষা করেন, গম

তেজে আমি বার ক'রে রুটিও ক'রে দিতে পারি।'

'না, না, দরকার নেই। জলই দাও—'

লাল কুঁয়র হাত পেতে বসেন। মেয়েটা ঘরের ভিতর থেকে মুঠি গুড় এনে কয়েকটা ক'রে দেয় পুরুষদের হাতে। ওড়নায় মুখটা ঈষৎ ঢেকে নিয়েছিল সে ইতিমধ্যে—তবু জাহান্দার শা'হের লুব্ধ চোখ জ্বলে ওঠে। গুড় মুখে ফেলে তিনি ব'লে ওঠেন, 'বাঃ!' কিন্তু সে হয়তো শুধু গুড়ের জন্যেও নয়।

সকলের জল খাওয়া শেষ হ'তে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'লেন এঁরা। মেয়েটি হঠাৎ বলে ওঠে, 'দাঁড়ান একটু। ঘরে আর তো কিছুই নেই, একটু দুধ খেয়ে যান অন্তত।'

'দুধ? দুধ কোথা পাবে বাছা এত রাত্রে?' লাল কুঁয়র বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

'ঐ যে—' গোরুটার দিকে দেখায় সে।

তারপর স্বামীকে বলে, 'ওগো, দাও না একটু দুধ দুয়ে—'

'দেরি হয়ে যাচ্ছে।' আজম খাঁ মনে করিয়ে দেয়।

সম্রাট ফিস্ ফিস্ ক'রে বলেন, 'না হে। দিচ্ছে, একটু খেয়েই নাও। আবার কখন যে কোথায় কি জুটবে তা তো জানো না।'

ছেলেটি ততক্ষণে গোরুটাকে ঠেলে তুলে বাছুর ছেড়ে দিয়েছে। মেয়েটি ওর কাছাকাছি ভাঙ্গা চারপাইয়ের একটা খুরোর ওপর আলোটা বসিয়ে অন্ধকারেই ঘরে ঢুকল। একটু পরে বেরিয়ে এল ময়লা একটা ছেঁড়া ন্যাকড়াতে চারটি 'ভুজা' এবং কয়েক ডেলা গুড় বেঁধে নিয়ে। সোজা এগিয়ে এসে গাড়োয়ানের হাতে দিয়ে বললে, 'গাড়িবান্ ভেইয়া, এ'টা তোমার কাছে রেখে দাও। ভুখ্ লাগে তো খেয়ো।'

গাড়োয়ান সাগ্রহেই নিল হাত পেতে। ইতিমধ্যে তার বয়েল দুটোকেও ডাবা ভরে জল দিয়ে গেছে ছোকরা। বড় ভাল শানদার ছেলেমেয়ে এরা। খোদা এদের সুখে রাখবেন।···

লাল কুঁয়র এগিয়ে এসে মেয়েটির কাঁধে হাত রাখলেন। চুপিচুপি বললেন, 'এমন খুবসুরৎ মেয়ে তুমি। বাদ্শার হারেমেই তোমাকে মানায়। এখানে এই চাষীর ঘরে মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছ!'

'কষ্ট কি?···কষ্ট তো কিছু না। আমি বেশ আছি। আমাদের যা জমি সব যদি আবাদ করি তো রাজার হালে চলে যায়। মরদ তো ইচ্ছে ক'রেই কিছু করে না।—কষ্ট ক'রে ফসল ঘরে তুলি আর জাঠ লুটেরারা এসে লুটে নিয়ে যায়। ···বাদ্শা! বাদ্শা যদি বাদশার মতো হতেন তো ভাবনা ছিল কি! গরিব প্রজারা নিজেদের চাষের ফসল ইচ্ছামতো খেতে পায় না—তাঁরা অথচ বাদ্শাহী করেন!'

জাহান্দার শা এগিয়ে আসছিলেন, হয়তো কি বলতেনও। আজম খাঁ তাঁকে

টেনে নিয়ে গেল গাড়ির দিকে। ইঙ্গিতটা জাহান্দার বুঝলেন। আর কথা কইলেন না। বোকার মতো আজম খাঁর মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন শুধু।

লাল কুঁয়র বললেন, 'তা তোমাদের চলে কিসে?'

'কম কম চাষ করি। শুধু খাবার মতো। সবজী কলাই কিছু কিছু—যা লুটেরারা নিতে পারে না। গোরু ভঁইস্ মিলিয়ে ষোলটা ছিল আমাদের, তাও ওরা নিয়ে গেছে। একটা বাছিয়া ছিল—বড় হয়ে দুধ দিচ্ছে, তাই খাই।'

'এত কষ্ট না ক'রে তুমি তো আরামেই থাকতে পারো। যাবে বাদ্‌শার হারেমে? আমার সঙ্গে চল, আমি ব্যবস্থা ক'রে দেব।'

'ছি ছি!' কঠিন হয়ে ওঠে মেয়েটির মুখ, 'ওসব কথা মুখে আনবেন না! হারেমে যায় এক রাজা-রাজড়ার ঘরের মেয়েরা, নবাবের মেয়েরা। আর যায় নাচওয়ালী কসবীরা, বাঁদীরা। আমি যাব কি দুঃখে! আমার মরদই আমার কাছে বাদশা বাই-সাহেবা!'

ভাগ্যে ততক্ষণে দুধ দুয়ে এনেছে ছেলেটি। নইলে লাল কুঁয়রের মুখের অপমান-রক্তিমা বোধ হয় সে চেরাগের আলোতেও ধরা পড়ত। কতকগুলো বড় বড় কী গাছের পাতাও ছেলেটা এনেছে যোগাড় ক'রে। ঠোঙার মত ক'রে পাতাগুলো ওদের হাত দিয়ে আলগোছে দুধ ঢেলে দিতে লাগল সে।

লাল কুঁয়র দুধ নিতে নিতে ভাল ক'রে তাকালেন ছেলেটির দিকে। ওর বয়সও বেশী নয়। কুড়ি-বাইশ হবে হয়তো। ওদের দেখতে দেখতে তাঁরও কি ভুলে-যাওয়া কোনো সুদূর অতীতের স্মৃতি মনে পড়ে যায়?

কোন ফেলে আসা কৈশোরের স্মৃতি?

যে বয়সে এবং যে-সময়ে সারারাত জেগে দশ-পঁচিশ খেলার কথাও অসম্ভব মনে হয় না?

তিনিই কি সুখী হয়েছেন বাদ্‌শার হারেমে পেঁাছে?

রাজ্যেশ্বর সম্রাট তাঁর পদানত। নুরজাহাঁর মতো হাতের মুঠোয় শুধু নয়—সত্যিই পায়ের তলায়। বীর যোদ্ধা আজ অমানুষ হয়ে গেছেন—তাঁরই জন্যে। তবুও কি সুখী আজ তিনি?

নুরজাহাঁই কি সুখী হ'তে পেরেছিলেন কোনদিন!…

গাড়ি তৈরী। অসহিষ্ণু আজম খাঁ তাড়া দেয়!

অকস্মাৎ এক কাণ্ড ক'রে বসলেন লাল কুঁয়র। নিজের গলা থেকে একটি মুক্তার মালা খুলে নেন। সাতনরী মালার একটি। অতিকষ্টে ছাড়িয়ে নেন। তারপর মেয়েটির হাতে সেটা গুঁজে দিয়ে বলেন, 'এইটে রাখো বহিন। প'রো তুমি। তোমার গলাতেই মানাবে।…আমাকেও মনে পড়বে।'

মেয়েটি প্রবলবেগে ঘাড় নেড়ে হারটা আবার ওঁর হাতে ফিরিয়ে দেয়, 'পাগল নাকি, এসব নিয়ে আমরা কি করব? লোকে হাসবে আমার গলায় মতির মালা দেখলে।…একটা রুপোর হাঁসুলীই নেই।'

'তা হোক্। এমনিই রেখে দাও। মনে ক'রো না আমি তোমাকে যা-তা

জিনিস দিচ্ছি। ঝুটো নয়, আসল মতির মালা!'

'তবে তো আরও ভাল! লুটেরারা এতদিন শুধু মাল নিয়ে যেত—এবার আরও কোথায় কি আছে ভেবে জানেও মারবে। আগুনে ঝলসে ঝলসে মারে ওরা—বলে, খবর দাও কোথায় কি আছে! না, না বাই-সাহেবা, এসবে আমার দরকার নেই। এসব আপনারাই বোঝেন, আপনাদের কাছেই এর কিম্মৎ। এ আপনি নিয়ে যান! অসময়ে এলেন, কিছু খাওয়াতে পারলুম না—সেইটেই আমার দুঃখ রইল। সকাল অবধি থেকে গেলে দু'খানা রুটি গড়ে খাওয়াতে পারতুম!'

লাল কুঁয়র খানিকটা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর কী ভাবলেন কে জানে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ঠিক বলেছ বহিন। কীই-বা কিম্মৎ এর—কয়েক হাজার টাকা হয়তো! তোমার উপযুক্ত নয়। তোমার যা আছে তা আমার ঘরে নেই!'

মেয়েটি হয়তো বুঝল ওঁর কথা—হয়তো বুঝল না। সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েই রইল। লাল কুঁয়র ধীরে ধীরে আবার বয়েলগাড়িতে গিয়ে উঠলেন। আলোটা কাছে থাকলে দেখা যেত—বহুকাল পরে ওঁর চোখের পাতা ভিজে উঠেছে।

সম্রাট দেখলে বিস্মিত হতেন বৈকি! লাল কুঁয়রের চোখে জল— এ যে অবিশ্বাস্য!

॥ পাঁচ ॥

আবার শুরু হ'ল সেই কণ্টকর, মন্থর যাত্রা। শুষ্ক কঠিন মাঠের ওপর দিয়ে, আল ডিঙ্গিয়ে ধাক্কা খেতে খেতে চলেছে বয়েলগাড়ি। সে ধাক্কাতে এক একবার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছেন ওঁরা। আবার নিচে নামছেন। কখনও কখনও পরস্পরের গায়ে আছড়ে পড়ছেন সজোরে।

তবু ওঁদের কারুরই মুখে কোন কথা নেই। মহম্মদ মিয়া উৎকণ্ঠিত—বিপদ কখন কোথা দিয়ে আসে তার ঠিক নেই। সে তো যাবেই, তার জায়গীর বাড়ি ঘর ছেলেমেয়ে তিনটি বিবি—কিছুই বা কেউই থাকবে না হয়তো। কোনমতে এ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেলে এখন সে বাঁচে।

জাহান্দার শা?

তিনি বহুদিনই নিজের কথা নিজে ভাবা ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রিয়তমার নূপুর-শিঞ্জিত কমল-কোমল পা দুটিতে নিজের সমস্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভাবনা-চিন্তা, ইষ্ট-অনিষ্ট, ইহকাল-পরকাল সব কিছু সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এমন আত্মসমর্পণ তাঁর পূর্ব-পুরুষ—জাহাঙ্গীর বাদশা করেছিলেন বলে শুনেছেন। কিন্তু তাও বোধ হয় এতটা নয়। সেই প্রেয়সী পাশে বসে আছে—তাইতেই তিনি সুখী। তার পরের কথা আর এখন তিনি ভাবতে রাজী নন। তাছাড়া আফিং-এর নেশাও চড়েছে, কষ্ট যেটুকু হচ্ছিল, একটু দুধ খেয়ে নেবার ফলে সেটুকুও গেছে। তিনি এখন চমৎকার একটি তন্দ্রাচ্ছন্ন নিশ্চিন্ততার মধ্যে ডুবে আছেন।

লালকুঁয়রও ঠিক এই মুহূর্তে এই শোচনীয় দুর্ঘটনা, এই হয়তো-বা সর্বনাশা

পরাজয় আর তার অবশ্যম্ভাবী ফল—আসন্ন মেঘকজ্জল ভবিষ্যতের কথা ভাবছিলেন না। তাঁর মন চলে গিয়েছিল সুদূর অতীতে। অনেক, অনেকদিন আগেকার একটি অপরাহ্নে। তিনিও এতক্ষণ একটা অভিভূত অবস্থায় ছিলেন—হঠাৎ ঐ মেয়েটির কথা তাঁকে যেন উন্মনা অস্থির ক'রে তুলেছে।

নূরজাহাঁ? হ্যাঁ, নূরজাহাঁ হ'তেই চেয়েছিলেন তিনি। আর সে সাধ তাঁর মিটেছে। মিটবে বলেছিল সেই জ্যোতিষীও। সেই সাংঘাতিক, নিষ্ঠুর জ্যোতিষী—ত্রিকালবেত্তা মৌলবী আল্লাবক্স সাহেব।

দেখতে দেখতে চোখের সুমুখ দিয়ে অতীতের ক'টা বছর পেরিয়ে চলে গেল। হজরৎ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগার বাইরে দরমার বেড়া দেওয়া ঘরে একটা চৌকির ওপর বোখারার কার্পেট বিছানো—তার ওপর বসে ছিলেন সৌম্য প্রৌঢ় একজন। মৌলবী আল্লাবক্স। তিনি বলেছিলেন, 'দীন দুনিয়ার মালিক তামাম হিন্দুস্তানের কোনো বাদশা তোমার পদানত হবেন। হ্যাঁ, পদানতই হবেন।··· তুমি সেই সাম্রাজ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। যারা পথের ভিখিরি তাদের তুলে রত্ন-আসনে বসাবে। কুকুরকে দেওয়া উচ্ছিষ্ট হাড়ের টুকরোর মতো রাজ্যখণ্ড বকশিশ করবে তুমি লোককে। মণিমুক্তো বিলোবে মুঠোমুঠো।···'

কিন্তু ঐখানেই যদি থামতেন তিনি!

তা থামেন নি। আল্লাবক্সের সামনে ঐ যে মেয়েটি বসে আছে তার পদ্ম-কোরকের মতো হাতখানি মেলে তাকেও যেন চেনেন লালকুঁয়র। অনেক দিনের কথা ঃ বহু অনাচারে, মদ্যপানে, তার চেয়েও বেশি—অহঙ্কারের চড়া নেশায়—চোখ আজ ঝাপসা হয়ে গেলেও, ওকে চিনতে পারেন বৈকি। ওর নাম ছিল লালী। তখনও ইমতিযাজ মহলের জন্ম হয় নি। সেই সময়কার কথা।

ঐ লালীকে সম্বোধন ক'রে কঠিন কণ্ঠে আরও কয়েকটি কথা বলেছিলেন মৌলবী আল্লাবক্স সাহেব। রূঢ় মেঘমন্দ্রস্বরে ভয়ঙ্কর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'তুমি জাহান্নমে যাবে আর সেই সঙ্গে টেনে নিয়ে যাবে তোমার বাদশাকেও।···আর একটা কথা, তুমি যা চাও তা পাবে কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। তোমার স্বভাবের দোষেই আবার তা হারাবে তুমি।'

আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন। হয়তো আজকের এই ভবিষ্যতটিকে তিনি এঁকে দেখাতেন, কিন্তু সেদিনের অসহিষ্ণু, নির্বোধ লালীর তা শোনবার ইচ্ছা বা অবসর ছিল না। সে তাঁর মুখই চেপে ধরতে গিয়েছিল।

অথচ তা সবই তো ফলল। তাঁর প্রত্যেকটি কথাই। সেদিন যদি লালী তাঁর কথা শুনত, যদি এতটুকু সাবধান হ'ত—যদি সামান্য মাত্র সচেতন হ'ত নিজের আচরণ সম্বন্ধে—তাহ'লে হয়তো আজ লালকুঁয়রের অদৃষ্ট অমনভাবে সুতোয় বাঁধা অবস্থায় প্রজ্বলিত নরকাগ্নির ওপর দুলত না। অন্ধকার ভবিষ্যৎ এমনভাবে তার নগ্ন চেহারা নিয়ে ভয়ঙ্কর মুখব্যাদান ক'রে দাঁড়াত না সামনে এসে।

'পুরুষকার মাঝে মাঝে দৈবকেও লঙ্ঘন করে—এখন থেকে সতর্ক হোন্···' বলেছিলেন আল্লাবক্স ভাবী বাদশা জাহান্দার শা'কেও। কিন্তু সতর্ক তাঁরা

কেউই হন নি।

এখনও সব যায় নি এটা ঠিক। এখনও হয়তো সময় আছে, এখনও কোন কোন সেনানায়ক, কোন কোন আমীর এসে আবার তাঁদের পাশে দাঁড়াতে পারে, হয়তো আর একবার ভাগ্য-পরীক্ষার অবসর মিলবে, হয়তো সে পরীক্ষায় আবারও চাকা উল্‌টে যাবে। কিন্তু—

কিন্তু—সে ভরসা যে আর নেই, তা নিজের মনের মধ্যেই কেমন ক'রে যেন বেশ বুঝতে পারছেন লালকুঁয়র। কারণ—সে ভরসার মূল পর্যন্ত তিনিই যে নষ্ট ক'রে দিয়েছেন। নিজের ভবিষ্যতের সমস্ত পথ নিজেই নষ্ট করেছেন বসে বসে। যেমনভাবে একদা তাঁরই সুরাফেনোন্মত্ত খেয়াল-খুশিতে লালকিলার প্রাসাদ-দুর্গ থেকে সুদূর জাহান-নুমার অরণ্য পর্যন্ত সমস্ত প্রাচীন বনস্পতি-গুলিকে কেটে ফেলা হয়েছিল, একটির পর একটি, সেই ভাবেই। সেদিন হঠাৎ বুঝি মনে হয়েছিল ঐ অভ্রচুম্বী গাছগুলো তাদের সুবিশাল শাখা-প্রশাখা মেলে ওপর থেকে স্পর্ধিত অবজ্ঞায় তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। কেউ ওপর থেকে তাঁকে দেখবে—এ চিন্তাও সেদিন ছিল অসহ্য। তাই বহুদিনের বহু প্রাচীন বৃক্ষ—স্বর্গত বহু বাদ্‌শার দূরদৃষ্টি ও সৌন্দর্যপ্রিয়তায় বহু নিদর্শন—একদিনের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়েছিল তাঁর হুকুমে। কারও স্পর্ধা সইতে পারবেন না তিনি—কী অন্তঃসারশূন্য স্পর্ধাই না তাঁর ছিল। এই তো একটু আগে সামান্য একটা চাষীর মেয়ে কি অনায়াসেই না সেই নিষ্ফল উদ্ধত স্পর্ধাকে ভূমিসাৎ ক'রে দিল। মাথা হেঁট ক'রে চলে আসতে হ'ল তাঁকে।

হ্যাঁ—আজ বেশ বুঝতে পারছেন। চোখ খুলে গেছে তাঁর—হয়তো বা এইমাত্র ঐ মেয়েটিই খুলে দিয়েছে—আজ বুঝতে পারছেন যে তাঁর ও তাঁদের বন্ধু কেউ নেই। আর তার জন্য দায়ী তাঁরাই। কতকগুলো অকারণ অর্থহীন খামখেয়াল—শ্রান্তিহীন মদমত্ততা—ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছে তাদের—যারা বন্ধু হ'তে পারত! আর সেই খেয়াল এভাবে নির্বিচারে চরিতার্থ ক'রেই কি সুখী হয়েছেন তিনি? মনে তো হয় না।

বেচারী বাদ্‌শা জাহান্দার শা। বীর, ধর্মভীরু, সহিষ্ণু বাদ্‌শা—হয়তো সত্যিকারের ভাল বাদ্‌শাই হ'তে পারতেন—যদি না এই মায়াবিনী ডাকিনীর কুহকে ভুলতেন। অন্ধভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি—অগ্রপশ্চাৎ, বর্তমান-ভবিষ্যৎ, ইহকাল পরকাল কিছু ভাবেন নি! যদি তিনি একটুও কঠোর হতেন! যদি তিনি ওর এই উন্মত্ততাকে একটু শাসন করতেন, তাহ'লে এই পাঁচমাসেই এমন ভাবে, এত কষ্টে অর্জিত, এত রক্তসমুদ্র পার হওয়া, এত প্রাণক্ষয়ের মূল্যে কেনা বাদ্‌শাহী এত সহজে এই শাহীসড়কের মাটিতে এসে পেঁছিত না। শাহীসড়কেই বা স্থান কৈ? প্রাণভয়ে সড়ক বাঁচিয়ে মাঠের ওপর দিয়েই তো চলেছেন তাঁরা। শশকের মতো মাটির আড়ালে আশ্রয় খুঁজছেন!

এই অভিশাপই তো দিয়েছিল একজন।

কে যেন দিয়েছিল?

সর্বাঙ্গ শিউরে মনে পড়ল কথাটা। রাজপুত্র মির্জা মহম্মদ করিম।
সে শিহরণ জাহান্দার শা নেশার আচ্ছন্নতার মধ্যেও টের পেলেন।
'কি হ'ল পিয়ারী? কি হ'ল?'
'কিছু না।'
'শীত করছে বোধ হয়? শিউরে উঠলে টের পেলাম যে!'
সস্নেহে ও সযত্নে জাহান্দার প্রিয়তমাকে বাহুবেষ্টনে টেনে নিলেন কাছে।

॥ ছয় ॥

চোখের ওপর থেকে বিস্মৃতির পর্দা দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে। বাইরের জোনাকীজ্বলা অন্ধকারে অতীতের ইতিহাস যেন আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

মির্জা মহম্মদ করিম; আজিম-উশ-শানের বড় ছেলে, বাহাদুর শার আদরের পৌত্র।

হ্যাঁ। এই তো মাত্র ক-মাস আগের কথা।

বেচারী সেদিনের আকাশে বাপের অদৃষ্টলিপি পাঠ করেছিল বোধ হয়। আর সেই সঙ্গে নিজেরও। তাই যুদ্ধ শেষ হবার আগেই সে পালাতে চেয়েছিল এই কুৎসিত ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব থেকে, এই মূঢ় আত্মকলহ থেকে, বহু—বহুদূরে কোথাও। কিন্তু পারে নি, অদৃষ্ট এসে পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। অভিশাপ, এক নারীর অভিশাপ নিয়তির সর্পিল আকর্ষণে বেঁধে এনে নিক্ষেপ করেছিল—আর এক নিষ্ঠুরা, প্রতিহিংসাপরায়ণা নারীরই পদতলে—

এ গল্প শুনেছেন লালকুঁয়র তাঁরই এক দাসীর মুখ থেকে।

খুব বেশীদিনের কথা নাকি নয়। জাহান-নুমার বাদ্‌শাহী অরণ্যে শিকার করতে গিয়েছিলেন মহম্মদ করিম। শিকারে দারুণ নেশা ছিল তাঁর—সামনে শিকার পেলে কিছুই মনে থাকত না। সেদিনও এক বন্য বরাহের পেছনে দৌড়তে দৌড়তে সঙ্গী সাথী অনুচরদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহুদূরে এগিয়ে গিয়েছিলেন—সে শিকার যখন অবশেষে নিহত হ'ল তখন দেখলেন তিনি একা পড়ে গেছেন। শ্রান্ত হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে বিশ্রাম করছিলেন এক গাছতলায়। এমন সময়ে ঘুরতে ঘুরতে সেইখানেই এসে পড়েছিল রুক্সানা। যাযাবর বেদের মেয়ে, আর্মানী রক্ত বুঝি ছিল তার দেহে, তাই পরনের মলিন ঘাঘরা ও কাঁচুলি, স্বভাব-সুশ্রী সেই মেয়েটির রূপ ও যৌবন ঢাকতে পারে নি, সামান্য-ছাইচাপা প্রবল অগ্নির মতোই তা জ্বলছিল।

সে রূপে শাহ্‌জাদার তাতারী রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠবে, সে আগুনে, পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চাইবেন—তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

মেয়েটি এসেছিল গোপনে চুরি ক'রে খরগোশ মারতে, আর জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে। কাজ সারাও হয়েছিল—কারণ, তার মাথায় কাঠের বোঝা, পিঠের থলিতে দুটো মরা খরগোশ।

হঠাৎ সামনে করিমকে দেখে চমকে উঠেছিল সে, ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল।

শাহ্জাদা বলে অবশ্যই চিনতে পারে নি, পারলে হয়তো ভয়ে মরেই যেত। এমনি তাঁর বেশভূষা ও আকৃতিতেই সে যথেষ্ট ভয় পেয়েছিল—যে-ই হোক, যদি বাদশাহী পাহারাদারদের হাতে ধরিয়ে দেয় তো তারা জ্যান্ত অবস্থাতেই কুকুর দিয়ে খাওয়াবে। সাধারণতঃ ওরা অরণ্যের এত গভীরে ঢোকে না, ধার থেকে কিছু কিছু ইন্ধন আর খাদ্য আহরণ ক'রে সরে পড়ে। শুধু মানুষ নয়—শ্বাপদ জন্তুর ভয়ও তো আছে! কিন্তু আজ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিল সে, তাই কোথায় চলে এসেছে তা সে নিজেই জানে না।

ভয়ে দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল রুস্তানা, করিম অভয় দিয়ে ডাকলেন, 'এই ছোরী শোন, এদিকে এসো। ভয় কি? কিছু ভয় নেই।'

সে মুগ্ধ-কণ্ঠে সত্যকার আশ্বাস ছিল বোধ হয়, মেয়েটি ফিরে এল। ভয়ে ভয়ে—তবু কাছেই এল শেষ পর্যন্ত।

'কী বলছ?'

'তুমি কে? এখানে কেন এসেছিলে? এখানে বাদ্শা আর শাহ্জাদারা ছাড়া কারুর আসবার হুকুম নেই তা জানো না? এমন কি আমীররাও আসতে পারেন শুধু শাহ্জাদাদের সঙ্গেই—'

মাটির দিকে চোখ নামিয়ে রুস্তানা বললে, 'জানি। মাফ করো আমাকে। আমি অত বুঝতে পারি নি। তাছাড়া আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

'ও, পথ হারিয়ে ফেলেছ? তাই নাকি!'

হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন শাহ্জাদা।

'আমি সত্যিই পথ হারিয়ে ফেলেছি, বিশ্বাস করো। সেই থেকে কত খুঁজছি। সন্ধ্যে হয়ে এল, এর পর হয়তো বাঘে ধরবে। আমাকে—আমাকে দয়া ক'রে পথটা দেখিয়ে দেবে?'

সে থর-থর ক'রে কাঁপছে।

সুশ্রী, ভঙ্গুর, কোমল দেহলতা। দেহবল্লরী বলাই উচিত, এত কোমল ও ভঙ্গুর। ঐ শুকনো কাঠের বোঝাটাও যেন ওর পক্ষে বহন করা বিস্ময়কর।

'দেবো দেবো। একটু বসো। বোঝাটা এখানে নামাও না। বড্ড থকে গিয়েছি, সারাদিন পরিশ্রম ক'রে। একটু বসো, আমি যখন যাবো, তোমাকেও পথ দেখিয়ে দেবো। দেখেছ—ঐ দাঁতালো বুনো বরাটাকে আমি মেরেছি!'

'তাই বুঝি?'

চোখ দুটো বড় বড় ক'রে তাকায় রুস্তানা।

'বাপ রে! সাংঘাতিক বরা। সত্যিই তুমি মেরেছ?'

'হ্যাঁ। ঐ দেখ ওর গায়ে আমার তীর। দেখছ না, অমনি তীর আমার কাছে এখনও রয়েছে!'

তা বটে?

সপ্রংশস নেত্রে রুস্তানা তাকায় ওঁর দিকে। বলিষ্ঠ বীরের দেহ, সুশ্রী সুপুরুষ। হ্যাঁ—এঁর পক্ষে সম্ভব।

সে কাঠের বোঝাটা নামিয়ে সামনে বসে। শাহ্‌জাদার মিষ্ট কণ্ঠে আর অমায়িক ব্যবহারে তার ভয় ভেঙ্গে গেছে।

এদিকে মোহের ঘোর নিবিড় হয় শাহ্‌জাদার চোখে। ভয়ে আর পরিশ্রমের ক্লান্তিতে—হয়তো বা কিছুটা লজ্জাতেও—রুস্তানার মুখ রক্তাভ হয়ে উঠেছিল, সে লালিমা ওর সুগৌর কপোলে এখনও লেগে আছে। এখনও জড়িয়ে আছে ললাটের কোলে কোলে চূর্ণ কুন্তলের সঙ্গে একটি সামান্য স্বেদরেখা। ঈষৎ-উদ্ভিন্ন ওষ্ঠের ওপরেও মুক্তাবিন্দুর মতো ঘাম জমে আছে। উত্তেজনায় বুকটা উঠছে নামছে দ্রুত তালে—কাঁচুলির ওপর থেকেই তার সম্পদ মনে বিভ্রান্তি জাগায়।

শাহ্‌জাদা আর একটু কাছে সরে আসেন।

'তুমি তো বেদের মেয়ে, হাত দেখতে জানো?'

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল সে।

'জানি বৈকি। কেন, তুমি হাত দেখাবে নাকি?'

'দ্যাখো না একটু—'

আর একটু কাছে সরে এসে ডান হাতখানা মেলে ধরেন শাহ্‌জাদা।

রুস্তানা ওঁর হাতখানা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, 'সন্ধ্যে হয়ে আসছে, এ আলোতে কি দেখা যাবে?'

'যা পারো একটু দ্যাখো—'

শাহ্‌জাদা আবারও হাতখানা ওর চোখের সামনে তুলে ধরেন—ওর বুকের কাছাকাছি। ওর নিঃশ্বাস এসে পড়ে ওঁর হাতে—যৌবনের তপ্ত নিঃশ্বাস। সে নিঃশ্বাসের বাতাসে নেশা লাগে।

নিজের হাতে ওঁর হাতখানা আলোর দিকে তুলে ধরল রুস্তানা। আশ্চর্য, সারাদিন যাকে কাঠ কুড়িয়ে বেড়াতে হয় তার হাতও এত নরম? আর এত উষ্ণ? একটু আর্দ্র, বোধ হয় ঘামেই—কিন্তু তবু ঠাণ্ডা নয়। বরং বেশী গরম।

গরম তুলোর স্পর্শ সে হাতে।

ওঁর হাত যখন দেখতে শুরু করে রুস্তানা, তখন একটু সকৌতুক হাসিই লেগে ছিল তার মুখে, কিন্তু হাত দেখতে দেখতে সে হাসি মিলিয়ে গেল, ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে উঠল মুখ। হাতখানা নামিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমার হাত আমি দেখব না—'

আলো কমে এসেছে, বনের মধ্যে ছায়া নামছে। তবু এত কম নয় যে ওর মুখ দেখতে পান নি শাহ্‌জাদা। তিনি সে মুখের সব পরিবর্তনই লক্ষ্য করেছেন। তিনি সজোরে ওর হাত সরিয়ে আবার নিজের হাত তুলে ধরলেন, 'না, বলো। বলতেই হবে তোমাকে।'

'বলব না আমি। হাত ভাল নয় তোমার! দেখব না ও হাত।'

'কোন ভয় নেই। খারাপ হ'লে খারাপই বলো। নির্ভয়ে বলো। অশুভ ভবিষ্যৎ শোনবার শক্তি আর সাহস আমার আছে।'

রুস্তানারও যেন জেদ চেপে যায়।

'না, আমি বলব না। এ কি জবরদস্তি নাকি?'

'হ্যাঁ—ধরো তাই।'

'জানো আমি বেদের মেয়ে। আমরা সাংঘাতিক। আমাদের সঙ্গে জবরদস্তি করতে এসো না।'

'আর তুমি জানো আমি শাহ্‌জাদা? এ বন আমার ঠাকুর্দার। এই কাছেই আমার রক্ষী আর পাহারাদাররা আছে। যদি তাদের ডাকি তোমার অবস্থাটা কি হবে জানো?'

'তুমি—আপনি শাহ্‌জাদা?'

আড়ষ্ট অবিশ্বাসভরা কণ্ঠে কোনমতে প্রশ্ন করে রুস্তানা।

'হ্যাঁ। আমি শাহ্‌জাদা মির্জা মহম্মদ করিম।...নাও, এখন যা বলি শোন—'

'আমার গোস্তাকি মাফ্ করবেন শাহ্‌জাদা। কিন্তু না শুনলেই ভাল হ'ত। কেন জিদ করছেন?

'তবু শনব—বলো তুমি।...আমি সিংহাসন পাবো কোনদিন? তখৎ-এ-তাউস?'

'না। আপনার শিগগিরই মৃত্যুযোগ আছে। অপঘাত মৃত্যু, আর—আর এক নারী হবে আপনার মৃত্যুর কারণ।'

'নারী? আওরৎ? ..ভাল ভাল।...বেশ গুনেছ তুমি, বা।'

জোর ক'রে হেসে ওঠেন মহম্মদ করিম। অবিশ্বাসের হাসি।

'মাফ্ করবেন শাহ্‌জাদা। আমি যাই। সন্ধ্যে হয়ে এল। এর পর একেবারেই পথ খুঁজে পার না।'

'দাঁড়াও। সময় হ'লে পথ আমিই দেখাব।'

কেমন যেন রূঢ়, কর্কশ শোনায় শাহ্‌জাদার গলা।

তবুও রুস্তানা একটা পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু তিনি ওর একখানা হাত ধরে আকর্ষণ করলেন নিজের দিকে। সবলে, সজোরে,—

'ও কি, ও কি করছেন। ছাড়ুন আমাকে, ছাড়ুন শাহ্‌জাদা। আপনার পায়ে পড়ি—'

মির্জা মহম্মদ করিম তাকে তখন ছাড়েন নি। ছাড়তে পারেন নি। রক্তে অভিশাপ আছে তাঁর। সেই অভিশাপই রক্তে নেশা জাগিয়ে তুলেছিল!

তারপর অবশ্য নিজের ঘোড়ায় চাপিয়ে ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন জঙ্গলের বাইরে পর্যন্ত। অন্তত পথ দেখিয়ে দেবার অধিকারটুকু চেয়েছিলেন। টাকাও দিতে চেয়েছিলেন অনেক। যতগুলি মোহর ওঁর জেব-এ ছিল, সব। কিন্তু রুস্তানা তাতে রাজী হয় নি। নমনীয় ভঙ্গুর দেহ সন্দেহ নেই—মনটা কিন্তু ইস্পাতের মতোই কঠিন। প্রথম বিস্ময়ের আঘাতটা সামলাতে যা একটু দেরি হয়েছিল, তারপরই সে আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে উঠল। সহজ ভাবেই কাঠের বোঝাটা উঠিয়ে নিলে মাথায়, খরগোশের থলেটাও আগের মতোই কাঁধে ফেলল।

তারপর—মাথা নিচু ক'রে নয়—বরং সোজা সামনের দিকে চেয়েই এগিয়ে চলল নিজের পথে।

তবু মহম্মদ করিম খানিকটা এসেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে, অপরাধীর মতোই ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে। আবারও কী একটা বলতে গিয়েছিলেন—বোধ হয় পথ দেখিয়ে দেবার কথাই—হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়েছিল সেই বেদের মেয়েটি, অবাস্তব রকম কোমল কণ্ঠে বলেছিল, 'আমাকে আর পথ দেখাতে হবে না জাহাঁপনা—পথ আপনি দেখিয়েই তো দিয়েছেন।...কিন্তু, কিন্তু—আপনার প্রয়োজনের সময় আপনি পথ খুঁজে পাবেন তো?...তখন আপনার ভাগ্য জানতে চেয়েছিলেন না?—শুনুন—দুটি নারীর অপমান আপনার মৃত্যুর কারণ হবে। একটি এইমাত্র যা হ'ল—তার ফলে আপনার চরম দুর্দিনে আপনি বুদ্ধিভ্রংশ হবেন। আর একটি শেষ পর্যন্ত সব চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে আপনার মৃত্যুর কারণ হবে। যান শাহ্‌জাদা, আপনার নিজের পথে যান। স্বল্প দিনের পরমায়ু আপনার—যে কটা দিন হাতে আছে ভোগ ক'রে নিন!'

অপমানে, ক্রোধে এবং সম্ভবত কিছুটা আতঙ্কেও শাহ্‌জাদার মুখ অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ সময় লাগল তাঁর যেন—ভাষা খুঁজে নিতে। শেষে কোনমতে বলে উঠলেন, 'এত গোস্তাকি তোমার! জানো—জানো—তোমাকে আমি—'

'কি, বলুন। থামলেন কেন? আমার আর কী ক্ষতি করতে পারেন আপনি, দেহটা তো গেলই, এখন প্রাণটা? বেশ তো, তীর ধনুক তলোয়ার—কোনটারই তো অভাব নেই। বসিয়ে দিন—এই আমি বুক পেতে দিচ্ছি।'

সে সত্যি সত্যিই বুক খুলে দেয়। সেদিকে চেয়ে মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ ক'রে ওঠে মহম্মদ করিমের।

তাড়াতাড়ি মাথা নামিয়ে নেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে রুস্তানা আবার শান্ত ভাবে বুকের ওপর কাঁচুলি টেনে দিয়ে নিজের পথ ধরে।...

রুস্তানার সে অভিশাপ ফলতে দেরি হয় নি।

তারিখটা মনে আছে লালকুঁয়রের—১১২৪ হিজরীর ৯ই সফর। জাহান্দার শা যেদিন প্রথম যুদ্ধ শুরু করেন আজিম-উশ-শানের বিরুদ্ধে।

সারা দিনের যুদ্ধের পরই মহম্মদ করিম যেন কেমন ক'রে মনে মনে ভাগ্যলিপি পড়তে পেরেছিলেন—তাঁর এবং তাঁর বাবার। ওঁরই এক 'খাবাস'* বলেছিল, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরার পথে সন্ধ্যার মুখে পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে তিনি নাকি একটি বেদের মেয়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। তাতেই তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। ভয়ে তিনি কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েন। তাঁবুতে ফিরে আসতে খাবাস তাড়াতাড়ি শরবতের পাত্র এনে সামনে ধরেছিল কিন্তু রণ-শ্রান্ত শাহ্‌জাদা সেদিকে আর ফিরেও চান নি, সেই অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় তখনই আবার ঘোড়ায়

*খাবাস—খাস খানসামা—Valet

চেপে কোথায় যেন রওনা হয়েছিলেন।

ঐ খাবাসের মুখেই শোনা—তিনি পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, এই যুদ্ধ থেকে, যুদ্ধের ফলাফল থেকে, ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের সর্বনাশা পরিণাম থেকে—এমন কি রাজৈশ্বর্য থেকেও, বহু দূরে কোথাও।

কে জানে হয়তো বা লাহোর থেকে বহুদূরে, শহর দিল্লীর উপান্তে জাহান-নুমা শিকার অরণ্যের ওপারে গিয়ে কোন বেদের আস্তানা খোঁজ করতেই চেয়েছিলেন তিনি। সেখানের কোন একটি মেয়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে ক্ষমা ভিক্ষা করতেই যাচ্ছিলেন হয়তো বা। আর সে ক্ষমা পেলে এই রাজভোগ থেকে বহুদূরে সেই অরণ্য-আবাসেই জীবনের বাকী ক'টা দিন কাটিয়ে দিতেন, চেয়ে নিতেন সেই নারীর কাছেই সামান্য একটু আশ্রয়।

কিন্তু তা হয় নি।

মির্জা মহম্মদ করিম নাকি পথ খুঁজে পান নি!

ওঁদের শিবির থেকে বেরিয়ে দিল্লী যাবার যে সোজা রাস্তা সেটা কোথাও দেখতে পান নি। শুধু তাই নয়—সারারাত নিজের তাঁবুর বাইরে চক্রাকারে ঘুরেছেন, আচ্ছন্নের মতো—ভূতগ্রস্তের মতো, কোথাও কোনমতে এতটুকু পথ খুঁজে পান নি।

প্রত্যুষে ঐ খাবাসই নাকি তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখতে পায়। ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত প্রায় মনিবের চেহাবা দেখে সে আর তাঁবুতে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে নি বরং রাজপুত্রের পোশাক ছাড়িয়ে সাধারণ পোশাকে, সাধারণ একটা ঘোড়ায় চাপিয়ে নদীর ওপারে কাট্‌রা-তাল-বাঘায় তারই পরিচিত এক জোলার ঘরে রেখে আসে। ওখানে ক'দিন আত্মগোপন ক'রে থাকেন যেন—এই অনুরোধই করে আসে সে—যত দিন না এই রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝড় থেমে যায়, ঘোলাজলের ঘূর্ণি থিতিয়ে যায়।

নিয়তি।

একটি ভুল হয়েছিল ওদের দুজনেই। পোশাক বদলাবার সময় নতুন পোশাকের জেব-এ টাকাপয়সা দেবার কথা খাবাসের মনে হয় নি, ওঁরও মনে পড়ে নি নেবার কথা। ফলে শাহ্‌জাদা সেই জোলার বাড়ি উঠেছিলন কপর্দকশূন্য অবস্থায়।

জোলার অবস্থা ভাল ছিল না। তখন ওখানে কারুরই অবস্থা ভাল থাকার কথা নয়। যুদ্ধ বেধেছে—ভাড়াটে সেনাতে ছেয়ে গেছে ও অঞ্চল। লুঠতরাজ ছাড়া আর কিছু জানেই না তারা। কাজেই বাজারহাট সব বন্ধ, জোলারা কাপড় বুনে বসে আছে—বিক্রীর পথ নেই, যদিচ লুঠ হবার পথ অবারিত।

গরিবের সংসারে তাদের খাবার মতোও কিছু ছিল না। অতি কষ্টে মকাইয়ের ছাতু দুটি যোগাড় হয়েছিল—তাও সকলের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তবু তারই একটি ভাগ তারা অতিথিকে দিয়েছিল। আগের দিনের অনাহারের পর সেই সামান্য অনভ্যস্ত খাদ্য—তরুণ শাহ্‌জাদার কিছুই হয় নি তাতে। এর পরও দুটি দিন সম্পূর্ণ অনাহারে কাটাবার পর শাহ্‌জাদার মনে পড়েছিল যে তাঁর হাতে তখনও

দুটি মূল্যবান আংটি আছে, একটি হীরার ও একটি চুনির। তিনি জোলাকে ডেকে চুনির আংটিটাই খুলে দিয়েছিলেন—বলেছিলেন শহরের মারোয়াড়ী-পটিতে গিয়ে ওটা বেচে আটা দাল ঘি সংগ্রহ করতে।

জোলা বেচারী বুঝতে পারে নি অত। সে-ও ক'দিন ধরে সপরিবারে উপবাসী—আংটি পেয়ে প্রায় নাচতে নাচতেই গিয়েছিল শহরে। কিন্তু একে তার অনাহার-শীর্ণ চেহারা, তায় জীর্ণ মলিন বেশ। তার হাতে অত বড় সাচ্চা চুনির আংটি দেখে মহাজনের সন্দেহ হবার কথা। সুবৃহৎ পাথরটির দাম অন্তত তিনশ মোহর।

মহাজন জেরা শুরু করলেন—কঠিন জেরা।

বোধ হয় তাঁর মনে হয়েছিল যে চোরাই মাল—ধমকধামক করলে জলের দামে বেচে চলে যাবে লোকটা। জোলা গরীব কিন্তু চোর নয়। এই আকস্মিক অপবাদে সে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠল—বার বার শপথ ক'রে বলতে লাগল যে তার ঘরে এক অতিথি এসেছেন, সেই অতিথিই তাকে এ আংটি দিয়েছেন—বিশ্বাস না হয় ওরা কেউ চলুক, দেখে আসুক, নিজের চোখে।

শুধু মহাজনের ব্যাপার হ'লে কথাটা সেইখানেই মিটে যেত। কিন্তু কী কাজে সেখানে এসেছিল হিদায়ৎ কেশ—সে আগে ছিল হিন্দু, রাজ-সরকারে চাকরি পাবার লোভে ধর্মত্যাগ করেছে অনায়াসে। সে এই ঘটনার মধ্যে নিজের উন্নতির উপায় পরিষ্কার দেখতে পেলে। ঈশ্বরের যোগাযোগ নিশ্চয়—তাঁরই অনুগ্রহ। সে মহাজনকে চোখ রাঙিয়ে জোলাকে নিয়ে গেলে উজীর জুলফিকর খাঁর তাঁবুতে। তারপর সেখান থেকে কয়েকজন সিপাহী নিয়ে গিয়ে সে-ই ধরে নিয়ে এল মির্জা মহম্মদ করিমকে।

তবু হয়তো হতভাগ্য রাজকুমার প্রাণে বেঁচে যেতেন।

জাহান্দার শা তো ক্ষমাই ক'রে ছিলেন। হুকুম দিয়েছিলেন দিনকতক শুধু নজরবন্দী ক'রে রাখতে।

কিন্তু তাঁকে বাঁচতে দেন নি লালকুঁয়র।

কারণ লালকুঁয়র ভুলতে পারেন নি একটা কথা। মর্মদাহকারী অপমান একটা। অপমানটা সুতীক্ষ্ণ কাঁটার মতো তখনও বিঁধে ছিল বুকে—

অবশ্য খুব বেশী দিনের কথাও নয়, বাহাদুর শা তখন তখৎ-এ-তাউসে।

মহম্মদ করিম খোজা সর্দার জাবেদ খাঁর মারফৎ প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছিলেন লালকুঁয়র যদি মালিক বদল করতে রাজী থাকে তো মির্জা মহম্মদ করিম তাকে নিজের আশ্রয়ে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন!

সে প্রস্তাবে ঠিক অপমান বোধ করার কথা নয়। লালকুঁয়রও করেন নি। এ প্রস্তাবকে তাঁর রূপ যৌবন ও নৃত্যপটুত্বের প্রাপ্য স্বীকৃতি হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। শুধু বলে পাঠিয়েছিলেন, যে লালকুঁয়রের আপাতত মালিক বদল করার কোন অভিপ্রায় নেই। কুমার এ প্রস্তাব পাঠিয়েও ভাল কাজ করেন নি,

তাঁর চাচা জানতে পারলে এ ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন না। তাছাড়া লালকুঁয়র হলেন সম্পর্কে কুমারের চাচী, তাঁকে এ ধরনের প্রস্তাব পাঠাবার আগে একটু লজ্জা বোধ করা উচিত ছিল।

এটুকু বলতে হয়েছিল শোভনতার খাতিরেই।

তার জবাবে শাহ্‌জাদা যে কথাগুলো বলে পাঠিয়েছিলেন,—তা গরম লৌহ-শলাকার মতোই কানে বিঁধেছিল লালকুঁয়রের।

শাহ্‌জাদা বলে পাঠিয়েছিলেন, নাচওয়ালী বাঁদীরা কখনই, কোন কারণেই বাদ্‌শাজাদার চাচী হ'তে পারেন না। বাঁদী টাকা দিয়ে কেনাবেচা যায়—সে সম্পত্তি। লালকুঁয়রের ইতিহাস তাঁর শোনা আছে, সিংহাসন এবং টাকা—এই লোভেই তিনি নির্বোধ মুইজ-উদ্দীনের সঙ্গে যেচে ঘনিষ্ঠতা করেছেন। এ কথা সবাই জানে যে বাদশার ছেলেদের মধ্যে আজিম-উশ-শানই যোগ্যতায় সকলের শ্রেষ্ঠ, তিনিই ভাবী বাদ্‌শা। মহম্মদ করিম তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র—সুতরাং তখৎ-এ-তাউসে বসবার আশা করিমেরই বেশী। সেদিক দিয়ে নাচওয়ালীর মালিক-নির্বাচনে একটু ভুলই হয়েছে। তাছাড়াও—টাকাও যে আজিম-উশ-শানেরই বেশী তাই বা কে না জানে। টাকাই যখন লক্ষ্য, তখন টাকার প্রতিযোগিতাতেও মুইজ-উদ্দীন পিছিয়ে যাবেন। লালকুঁয়র যেন কথাটা ভেবে দেখে ভাল ক'রে।

লালকুঁয়র এই আঘাতে যতটা বিচলিত হয়েছিলেন—এতটা বোধ হয় কখনই হন নি। এ অপমান তাঁর সর্বাঙ্গে বিছার বিষের মতোই জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। সে জ্বালা এমনই যে, অপর কাউকে দগ্ধ না করা পর্যন্ত বুঝি তার শান্তি হয় না। তিনিও দগ্ধ করতে চেয়েছিলেন ঐ ধৃষ্ট, গর্বিত মূর্খ রাজকুমারকে।

কিন্তু তখন কিছুই করতে পারেন নি।

জাহান্দার শাকে বলেছিলেন বৈকি!

জাহান্দার শা তখন দিল্লী থেকে বহুদূরে। বাদ্‌শার কাছে নালিশ জানিয়ে একটা খৎ পাঠানো ছাড়া আর কিছুই ক'রে উঠতে পারেন নি। তার জবাবে বাহাদুর শা শুধু জানিয়েছিলেন যে, ছেলেমানুষরা চিরদিনই ছেলেমানুষি করে—তা নিয়ে যে বয়স্ক লোকেরা মাথা ঘামায় বা বিচলিত হয়, তারা হয় নির্বোধ নয় বেকার। এর মধ্যে কোন্ শ্রেণীতে প্রিয় পুত্র মুইজ-উদ্দীনকে তিনি ফেলবেন তাই ভেবে পাচ্ছেন না। তবে কি এই বুঝতে হবে যে পুত্র মুইজ-উদ্দীনকে যে রাজকীয় কাজে তিনি পাঠিয়েছেন—পুত্র তার কিছুই দেখেন না? তা ছাড়া একটা নাচওয়ালী রক্ষিতার কথা পিতাকে লেখার আগে তাঁর আর একটু বিবেচনা করা উচিত ছিল। ইত্যাদি—

সে চিঠির জবাব দেবার সাহস মুইজ-উদ্দীনের হয় নি। তারপর তিনি হয়তো ভুলেই গিয়েছিলেন কথাটা।

লালকুঁয়র ভোলেন নি নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁর কানে করিমের গ্রেপ্তারের সংবাদটা পোঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই এ খবরটাও পোঁছল যে বাদ্‌শা তাকে ক্ষমা করেছেন। শুধু নজরবন্দী রাখার হুকুম হয়েছে। আর তাকে আশ্রয় দিয়েছেন

জুলফিকর খাঁ। সে বড় কঠিন ঠাঁই।

ক্ষোভে ও রোষে হাত কামড়ালেন লালকুঁয়র কিন্তু হাল ছাড়লেন না। জুল-ফিকর খাঁই বোধ হয় একমাত্র লোক যিনি নতুন বাদ্‌শার প্রিয়তমা রক্ষিতার অনুগ্রহের পরোয়া করেন না। অন্তত সে অনুগ্রহের আশায় নিরপরাধ লোককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে রাজী হবেন না।

কিন্তু তিনি না হ'লেও—সে রকম লোক আছে বৈকি!

খাঁ-জাহান কোকলতাশ খাঁ তেমনই একজন লোক। তাকেই ডেকে পাঠালেন লালকুঁয়র। তার কাছে আগ্রা দিল্লীর খবর চাইলেন কিছু কিছু। যেন সেই জন্যই ডেকেছেন। কথা-প্রসঙ্গে মহম্মদ করিমের অতীত ধৃষ্টতার কথা বললেন। মহম্মদ করিমের শাস্তি হ'লে তিনি খুশী হতেন সে কথাও জানালেন। কিন্তু কি আর করা যাবে? বাদ্‌শা ন্যায়পরায়ণ, তিনি বিচার ক'রে যা ব্যবস্থা করেছেন —ঠিকই করেছেন।

কোকলতাশ খাঁ সব শুনলেন মন দিয়ে।

তারপর মহম্মদ করিমের চাকরদের ডেকে একটু কড়া জেরা চালাতেই বহু কথা বেরিয়ে গেল। জাহান-নুমার অরণ্যে সেই বেদের মেয়েটির ঘটনাও নাকি আড়াল থেকে প্রত্যক্ষ করেছিল কোন্ অনুচর। সেটাও শোনা গেল।

কোকলতাশ খাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তিনি নতুন ক'রে শাহানশার দরবারে বিচার চাইলেন।

প্রজা সকলেই। বাদ্‌শা পিতার মতো—তাঁর কাছে সব প্রজাই সমান। শাহ্‌জাদা মহম্মদ করিম অনাথা বালিকার উপর অত্যাচার করেছেন। দরিদ্র তারা, গৃহহীন, নিরাশ্রয়—তবু প্রজাই। এর বিচার না করলে ধর্মাধিকরণের মর্যাদা থাকবে না।

লালকুঁয়র উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। জগতের সমস্ত নারীজাতির হয়ে নারীর এই অপমানের প্রতিকার প্রার্থনা করলেন।

ক্লান্ত উত্ত্যক্ত বাদ্‌শার তখন অত কথা ভাববার সময় নেই। তিনি কি দিনরাত এই সব কচ্‌কচি নিয়ে থাকবার জন্যেই সিংহাসনে বসেছেন? সুতরাং বেশী কথা বলতেও হ'ল না—চোখের পলকে প্রাণদণ্ড হুকুম হয়ে গেল।...

বাদ্‌শার দুধ ভাই আলি মুরাদ খাঁ-জাহান কোকলতাশ খাঁ লালকুঁয়রের অনুরোধে আমীর-উল-উমারা বা দ্বিতীয় মন্ত্রীর পদ পেলেন।

কিন্তু—না, না। এত নিষ্ঠুরতার প্রয়োজন ছিল না। এত নিষ্ঠুর হ'তে চান নি বাদ্‌শার প্রিয়তমা বাঁদী ইমতিয়াজ মহল। মর্মান্তিক অপমানের জ্বালা সর্বাঙ্গে বিষের দাহ ছড়ানো সত্ত্বেও না।

কোকলতাশ খাঁ একটু বেশী নিমকহালালী করতে গিয়েছিলেন। তিন দিন নাকি অনাহারে ছিলেন শাহ্‌জাদা মির্জা মহম্মদ করিম। সেই অবস্থায় ঘাতকরা তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল। কোকলতাশের পায়ের কাছে বসে পড়ে হাতজোড় ক'রে তিনি দু'খানা রুটি আর এক লোটা জল চেয়েছিলেন। উচ্ছিষ্ট

পোড়া রুটি, রাস্তায় ফেলে দেওয়া রুটিতেও আপত্তি নেই জানিয়েছিলেন—কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেন নি খাঁ সাহেব।...

মৃত্যুর আগে কুমার বলে গিয়েছিলেন, 'আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হ'ল, খোদার দরবারে আমি এখন দয়া পাবো, তা জানি—কিন্তু বাঁদী লালকুঁয়রের প্রায়শ্চিত্ত বাকী রইল। এ দৃশ্য এখন সে আড়াল থেকে দেখে আনন্দ পাচ্ছে হয়তো—কিন্তু আরও এই রকম দৃশ্য তাকে দেখতে হবে, তখন আর আনন্দ পাবার কারণ থাকবে না। আমারই মতো অবস্থা হবে, ভীত শশকের মতো এতটুকু আশ্রয় খুঁজে বেড়াবে—সে আশ্রয় সেদিন মিলবে না। আমারই মতো নতজানু হয়ে প্রাণভিক্ষা করতে চাইবে—সে ভিক্ষা কেউ দেবে না। সেদিন মনে পড়বে আজকের কথা। কঠোরতর প্রায়শ্চিত্ত তোলা রইল তার। তখন আজকের কথা মনে হয়ে সে অনুতাপ করবে—এই আমি বলে গেলাম।'

বাঁদী লালকুঁয়র!

বেগম ইমতিয়াজ মহল কথাটা শুনে হেসেছিলেন। ঐ আভিজাত্যটুকুই বুঝি কুমারের এখনও অবশিষ্ট আছে। দুর্বলের ব্যর্থ অহংকার!

॥ সাত ॥

সেদিন হেসেছিলেন। কিন্তু আজ শিউরে উঠলেন বেগম ইমতিয়াজ মহল। মনে হ'ল সেই অভিশাপ তার বীভৎস নিষ্ঠুর নির্মম চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—এই বাইরের কুয়াশা-ঢাকা অন্ধকারের চেয়েও অন্ধকার তাঁর ভবিষ্যৎ। কিন্তু অন্ধকার হ'লেও বুঝি ভাল ছিল। তার এ ভয়ংকর চেহারাটা চোখে পড়ত না।

'কী হ'ল, কি হ'ল পিয়ারী?' অকস্মাৎ নেশার ঘোর থেকে জেগে উঠে প্রশ্ন করেন জাহান্দার শা।

'কিছু না। তুমি ঘুমোও।' বলেন লালকুঁয়র। সস্নেহে জাহান্দার শার একটা হাতের ওপর হাত বুলোন আস্তে আস্তে।

ছেলেমানুষ হয়ে পড়েছেন বাদশা। একেবারেই ছেলেমানুষ। আর সে তো তাঁরই জন্য।

'তুমি জাহান্নামে যাবে আর সেই সঙ্গে তোমার বাদশাকেও নিয়ে যাবে' বলেছিলেন জ্যোতিষী আল্লাবক্স। তাই তো হ'ল। তাই তো করলেন লাল-কুঁয়র। জাহান্দার শাকেও সেদিন সতর্ক করেছিলেন আল্লাবক্স; যদি তিনি তাতে কান দিতেন।

'আর কত দূর মহম্মদ মিয়া?'

প্রশ্ন করেন বাদশা।

'বেশী দূর আর নেই জাহাপনা। ঐ যে দূরে শাহজাহানবাদের আলো দেখা যাচ্ছে। আর পাঁচ ছ' দণ্ডের মধ্যেই আমরা ওখানে পেঁছিব।'

'বেশ বেশ। পেঁছিলেই ভাল। একটু অন্ধকার থাকতেই পেঁছিতে চাই।

নইলে আবার সারা দিনটা কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। আর পিয়ারীরও বড় কষ্ট হচ্ছে। দিল্লীতে পৌঁছলে উনি অন্তত ওঁর নিজের ডেরায় গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারেন।'

বেশ অনায়াসেই বলেন কথাগুলো।

ক্ষোভ, অভিমান, অপমানবোধ, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা কিছুই যেন নেই।

এ অবস্থার জন্য ওঁর এই প্রিয়তমা বাঁদীই দায়ী।

অন্ধকারে নিঃশব্দে কংকনপরা হাত তুলে ললাটে আঘাত করেন। ওরে অন্ধ, ওরে দৃষ্টিহীনা—আজকের এই চোখ সেদিন তোর কোথায় ছিল?

বেচারী জাহান্দার শা! শুধু বর্তমানটা সঁপেই যদি নিশ্চিন্ত হতেন তো কথা ছিল না। ভবিষ্যৎও সঁপে দিয়ে বসে ছিলেন এক পথের কুড়োনো নাচ-ওয়ালীর পায়ে। কোন দিকে তাকান নি, কারুর কথা ভাবেন নি।

একে একে পর করেছেন সবাইকে। যারা আজ সম্রাটের পাশে দাঁড়াতে পারত, যারা সাম্রাজ্যের স্তম্ভ হ'তে পারত তাদের সবাইকে একান্ত অবহেলায় সরিয়ে দিয়েছে ঐ নাচওয়ালী।

আজ এ বিপদে শুধু মাত্র জুলফিকর খাঁকে ভরসা ক'রেই চলেছেন বাদ্‌শা। সে জুলফিকর খাঁরও খুব প্রসন্ন থাকবার কথা নয় তাঁদের ওপর। নানা কারণেই তাঁরা বার বার খোঁচা দিয়েছেন প্রধান উজীরকে। এই তো সেদিনও—চিনকিলিচ খাঁর ব্যাপারেই—

চিনকিলিচ খাঁ বীর, চতুর এবং দুঃসাহসী। তিনি যদি আজ ওঁদের ওপর প্রসন্ন থাকতেন! অথচ কী তুচ্ছ কারণেই না অত বড় মিত্রকে প্রবল শত্রু ক'রে দিয়েছেন।

সে কী ছেলেমানুষি! আজ মনে পড়লে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়।

কোন্ এক উন্মাদ মুহূর্তে, বাল-চপলতায় জুহরা সব্‌জীওয়ালীকে কথা দিয়ে ছিলেন যে যদি কখনও 'দিন' পান তো তাকে জায়গীর দেবেন, সে হাতীতে চড়ে বেড়াবে। তার কাছে ঋণ ছিল সন্দেহ নেই, সে ঋণ শোধ করতেও তিনি বাধ্য—কিন্তু সমস্তরই একটা সীমা আছে, সেইটে মনে পড়ে নি। জায়গীর দিয়েছিলেন, হাতীও দিয়েছিলেন—আর সেই সঙ্গে দিয়েছিলেন অতিরিক্ত প্রশ্রয়। ফলে তার স্পর্ধার বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল।

আর জুহরার পক্ষে এ পরিবর্তন—এ তো আবুহোসেনের গল্পকথা। অবিশ্বাস্য।

সুতরাং সে যে জায়গীর ও হাতী পাবার পর প্রত্যহই লোকলস্কর নিয়ে হাতীতে চেপে ঘুরে বেড়াতে শুরু করবে, এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে! সেই ভাবেই একদিন যেতে যেতে ফৈজ-বাজার এলাকার এক গলি-পথে ওদের দেখা। চিনকিলিচ খাঁ আসছিলেন পাল্‌কীতে—জুহরা হাতীতে। আর সে হাতীর পিছনে অন্তত পঁচিশ জন চাকর। সরু পথ—দুজনের এক সঙ্গে দু'দিকে যাওয়া সম্ভব নয়, একজনকে এক ধারে সরে একপাশ করে দাঁড়াতে হয়।

চিনকিলিচ খাঁ চিরদিন লোকের কাছে সম্ভ্রম পেতেই অভ্যস্ত। তিনি আশা করছিলেন জুহরাই পথ ছেড়ে দেবে। 'হঠাৎ বাদ্‌শা' জুহরার এ ধৃষ্টতা সহ্য হ'ল না। তার হুকুমে তার 'নৌকর'রা রূঢ়ভাবে ধাক্কা দিয়ে ওঁর পাল্‌কী সরিয়ে পথ ক'রে দিলে। তাও সহ্য করেছিলেন চিনকিলিচ খাঁ, কিন্তু জুহরার বুঝি মনে হ'ল যে হঠাৎ বাদ্‌শাহীটা যথেষ্ট দেখানো হ'ল না! সে হাতীর ওপর থেকে চেঁচিয়ে বললে, 'কে রে? ওঃ, সেই কানা মুরুব্বীর ছেলেটা বুঝি?'

চিনকিলিচ খাঁর বাবা শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন—কিন্তু অন্ধ হয়েও তিনি বিশ বছর সেনাপতির চাকরি করেছেন—নিজে যুদ্ধেও গিয়েছেন। গাজী-উদ্দীন খাঁ ফিরুজ জঙ্গকে স্বয়ং আলমগীর বাদ্‌শাও সমীহ করতেন।

এ স্পর্ধা চিনকিলিচের সহ্য হয় নি। তাঁর সঙ্গে যে শাস্ত্রী ছিল তারা সংখ্যায় অল্প—কিন্তু যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। খাঁর ইঙ্গিত পাবার পর জুহরাকে উচিত শাস্তি দিতে বিলম্ব হয় নি তাদের। স্বয়ং জুহরাকেও হাতী থেকে টেনে নামিয়ে পথে হেঁটে যেতে বাধ্য করেছিল তারা।

জুহরা কাঁদতে কাঁদতে এসে নালিশ করেছিল বেগম ইমতিয়াজ মহলের কাছে। অভিমানে জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি জাহান্দার শাকে দিয়ে একেবারে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা সই করিয়ে জুলফিকর খাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

সে আদেশ অবশ্যই উজীর পালন করেন নি। প্রিয়তমার তাগাদায় বাদ্‌শা অনুযোগও করতে গিয়েছিলেন সেজন্য—জুলফিকর খাঁর কাছে মৃদু ধমক খেয়ে শেষ পর্যন্ত চুপ ক'রে যান। সে কথা কি চিনকিলিচ খাঁ ভুলে যাবেন?

—না জুলফিকর খাঁই ভুলবেন!

পথের ধুলো মানুষ স্বেচ্ছায় মাথায় করে সে আলাদা কথা—কিন্তু সে ধুলো যদি জোর ক'রে মাথায় চাপাতে যায় তো কখনই সহ্য করে না কেউ। জাহান্দার শা শখ ক'রে তাঁকে শিরোধার্য করেছেন, জাহান্দার শা উন্মাদ। তাই ব'লে কি সবাই উন্মাদ হবে?…

সবচেয়ে ভুল করেছিলেন বাদশা এই সৈয়দ আবদুল্লা খাঁকে শত্রু ক'রে—কিন্তু যে জন্যও কি লালকুঁয়র দায়ী নন?

সৈয়দ হাসান খাঁ আর সৈয়দ হোসেন খাঁ—এঁদের দুজনের কেউই ঠিক সাধারণ লোক নয়। সৈয়দ বংশের ছেলে ব'লে নয়, বিখ্যাত বীর যোদ্ধা ও শাসক সৈয়দ-মিয়ার ছেলে বলেও নয়—এঁরা নিজেরাই যথেষ্ট কৃতী। এই বয়সেই বার বার নিজেদের শৌর্য ও রণদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আলমগীর বাদ্‌শার রাজত্বকালেই এঁরা দায়িত্বপূর্ণ পদ পেয়েছিলেন। জাজাউর যুদ্ধক্ষেত্রে এঁরা দু ভাই না থাকলে শাহু আলম বাহাদুর শা কোনও দিন সিংহাসনে বসতে পারতেন কিনা সন্দেহ! অথচ বাহাদুর শা পরে এঁদের সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করেন নি, মুইজ-উদ্দীন তো বার বার অভদ্রতাই করেছেন। তবু এঁরা তো আগে কোন শত্রুতা করেন নি। আজিম-উশ-শানের অনুগ্রহেই এঁরা সামান্য দুটি সুবেদারী পেয়েছিলেন—তবু আজিম-উশ-শানের পতনের পর জাহান্দার শা

সিংহাসনে বসেছেন খবর পেয়ে তাঁকেই তো বাদশা খাঁজে মেনে নিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন!

কিন্তু লালকুঁয়র তা হ'তে দেন নি।

অনেকদিন আগে—জাহান্দার শা তখন মুইজ-উদ্দীন মাত্র—তাঁর তাঁবুতে গান বাজনার এক জলসায় নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন হাসান ও হোসেন দুই ভাই। লালকুঁয়র উপস্থিত ছিলেন, মুইজ-উদ্দীনের আসন থেকে একটু দূরে বসে ছিলেন। তাঁবুতে ঢুকে মুইজ-উদ্দীনকে অভিবাদন জানাবার পরই সকলে তাঁর সামনে গিয়ে মাথা হেঁট করে ছিল—করে নি কেবল এই দুই ভাই। সে কথা ভোলেন নি লালকুঁয়র।

তাই লাহোরের যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভের পরই যে ব্যক্তিটি সবচেয়ে বেশী মাথা হেঁট ক'রে তাঁকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন—রাজী মহম্মদ খাঁ—তাকে পুরস্কৃত করতে গিয়ে প্রথমেই মনে হয়েছিল ও'র এই দুটি ভাইয়ের কথা। সঙ্গে সঙ্গে হাসান বা আবদুল্লা খাঁর এলাকা কারামানিকপুরের সুবেদারী বকশিশ করেছিলেন তাকে। আবদুল্লা খাঁ নতুন বাদশাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেই চিঠির জবাবে গেল এই হুকুম!

তার ফলে—হ্যাঁ, তার ফলেই জাহান্দার শার বাদশাহীর প্রথম পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল। রাজী খাঁর প্রতিনিধি আবদুল গফুর সৈন্যসামন্ত নিয়ে আবদুল্লা খাঁকে তাড়াতে গিয়ে কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এল!

তার পর অবশ্য জাহান্দার শা সে ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে ফল কি হয় তা বালকেও জানে। আবদুল্লা খাঁ আর হুসেন খাঁ মাত্র দু'জনের চেষ্টাতেই তো বলতে গেলে ফররুখশিয়ার আজ বিজয়ী আর জাহান্দার শা পরাজিত!

গোরুর গাড়ি চলেছে এখনও মাঠের ওপর দিয়ে, আল্ থেকে নামতে গিয়ে এখনও বার বার ঠোক্কর খাচ্ছেন ও'রা। কিন্তু লালকুঁয়রের সে দিকে লক্ষ্য নেই। তিনি নিজের নির্বুদ্ধিতার কথাই ভাবছেন শুধু।

আজ যদি বাদশার আত্মীয়স্বজনরাও কেউ প্রসন্ন থাকতেন ও'র ওপর।

রাক্ষসী লালকুঁয়র ও'র ছেলেদের পর্যন্ত বিদ্বিষ্ট ক'রে তুলেছেন! যে ছেলেরা তাঁকে মহিষীর সম্মান দিতে চায় নি তাদের সবাইকার সঙ্গেই বাপের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, এমন কি শেষ দুটিকে তো কারাগারেই পাঠিয়েছেন বাদশা। ও'র হুকুমেই সে 'হুকুমনামা'য় সই করেছেন শাহানশাহ। নইলে বাপের স্নেহ ছোট ছেলেদুটির ওপর কম ছিল না!

অন্তত বাদশা বেগমও যদি একটু খুশী থাকতেন! আলমগীরের কন্যা, বাহাদুর শার ভগ্নী—জিন্নত-উন্নিশা বেগম সারা হিন্দুস্তানের সম্ভ্রমের পাত্রী। বিদুষী ও বুদ্ধিমতী শুধু নন—রাজনীতিতেও গভীর জ্ঞান তাঁর। সেজন্যে সকলেই তাঁকে সমীহ করে, ভয় করে। আজ তিনি যদি বিজয়ী ফররুখশিয়ারকেও

কোন অনুরোধ করেন তো তার সাধ্য নেই সে অনুরোধ ঠেলে। কিন্তু জাহান্দার শার জন্য কোন অনুরোধই তিনি করবেন না—তা লালকুঁয়র জানেন। কারণ তিনি তো পিসীকেও বাদ্‌শার শত্রু ক'রে দিয়েছেন। যেহেতু আলমগীরের দুহিতা বাদ্‌শা-বেগম পথের নাচওয়ালীকে বেগম বলে স্বীকার করতে রাজী হন নি—সেই হেতু প্রকাশ্যে, মুখের সামনে কুৎসিত ভাষায় গালি দিয়েছেন লালকুঁয়র সেই মহিমময়ী মহিলাকে। আগে দিল্লীতে থাকলেই প্রতি জুম্মাবারে জাহান্দার শা প্রণাম করতে যেতেন পিসীকে—লালকুঁয়রের অসন্তোষের ভয়ে তাও বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন—এমন কি ডেকে পাঠালেও যান নি কোন দিন। আজ কোন মুখে গিয়ে তাঁর কাছে অনুগ্রহ চাইবেন বাদ্‌শা ?

অকস্মাৎ চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়ল।

গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে।

'কী হ'ল, কী হ'ল ?' জাহান্দার শা চমকে জেগে ওঠেন।

'দিল্লী।' সংক্ষেপে উত্তর দেয় আজম খাঁ।

দু-হাতে চোখ রগড়ে বাদ্‌শা ভাল ক'রে চোখ চেয়ে দেখেন। শাহ্‌জাহানাবাদের আলো জ্বলছে চারিদিকে। এখন আর দূরে নয়, শহরের মধ্যেই এসে পড়েছেন তাঁরা—

'তা'হলে মহম্মদ মিয়া, তুমি এঁকে নিয়ে চলে যাও।'

'আপনি ?'

'আমি একাই যাবো উজীরের বাড়ি।'

'কিন্তু এখনও ভেবে দেখুন জাহাঁপনা—এখনও সময় আছে। দীর্ঘদিন আপনি মুলতানে ছিলেন, সেখানে আপনাকে সবাই চেনে, ভালবাসে। বন্ধু-বান্ধবের একেবারে অভাব হবে না। সেখানে গেলে এখনও হয়তো একটা উপায় হয়। আমি মিনতি করছি আপনাকে—'

'তুমি জুলফিকর খাঁকে চেনো না মহম্মদ মিয়া। সে বীর, সাহসী, বুদ্ধিমান। সে ইচ্ছে করলে এখনও অনেক খেলা দেখাতে পারবে। সে বেচারী সেদিন শেষ পর্যন্ত আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিল, তা শোন নি ? হয়তো সেদিনই ভাগ্যের চাকা ঘুরে যেত। সে আমাকে সাহায্য করবেই। আমি এখনই এই অবস্থায়, এই ধূলিধূসরিত দেহে ক্লান্ত পদে তার কাছে গিয়ে সাহায্য চাইব—সে আমাকে সাহায্য না ক'রে থাকতে পারবে না মহম্মদ মিয়া।…তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। সে আমার বিশ্বস্ত সেবক।…কী বলো পিয়ারী ? তোমার কি মত ?'

অবসন্ন ক্লান্তভাবে গাড়ির টপ্পরে মাথা রেখে বসেছিলেন লালকুঁয়র। মাথা তুলে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি আর কোন মত দেব না শাহান্‌শা, তুমি যা ভাল বোঝ তাই করো। আমি আর কিছু বুঝতে পারছি না। আমার বুদ্ধিতে চলে তোমার অনিষ্টই হয়েছে বার বার, এবার থেকে তুমি তোমার বুদ্ধিতেই চলো।'

ভারী খুশী হলেন জাহান্দার শা।

'শুনলে তো মহম্মদ মিয়া। আমি যা বলছি তাই শোন। ওঁকে নিয়ে

চলে যাও সোজা ও'র বাড়ি। আমি আসাদ খাঁ আর জ়ুলফিকর খাঁর সঙ্গে কথাটা সেরেই চলে যাচ্ছি—'

•

।। আট ।।

জ়ুলফিকর খাঁ অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর এতখানি বয়স হ'ল—এর ভেতরে এতটা অবাক বোধ হয় আর কোন দিন হন নি। একবার মনে হ'ল যে তিনি ভুল শুনেছেন—কিন্তু না, আসাদ খাঁর কণ্ঠস্বরে তো কোন জড়তা কি সংকোচ নেই। যা বলেছেন বেশ পরিষ্কার ক'রেই বলেছেন।

আসাদ খাঁর বয়স হয়েছে। তিনি যৌবনকাল থেকেই—নামে না হোক—কাজে এই এত বড় সাম্রাজ্যের উজীর-উল্-মুলুক বা প্রধান মন্ত্রী। আলমগীর বাদ্শার একান্ত বিশ্বাসভাজন লোক ছিলেন তিনি। বাহাদুর শা তাঁকে পিতৃ-বন্ধুর মতই সম্মান করতেন। আর জাহান্দার শা তো বলতে গেলে তাঁর ওপরই সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। তিন পুরুষের অনুগ্রহপুষ্ট ও আস্থাভাজন প্রধান অমাত্য তিনি—তাঁর মুখে এ কী কথা?

অতি কষ্টে, অনেকক্ষণ থেমে জ়ুলফিকর খাঁ বললেন, 'কি বলছেন আপনি বাপজান?'

আসাদ খাঁ প্রশান্ত মুখেই উত্তর দিলেন, 'ঠিকই বলছি, এ ছাড়া তোমার এবং আমার বাঁচবার কোন পথ নেই।'

তবু বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন জ়ুলফিকর খাঁ।

আসাদ খাঁর আশি বছরের ওপর বয়স হ'ল। তিনি দেখলেন অনেক। তিনি জানেন রাজনীতিতে দয়াধর্মের কোন স্থান নেই, এখানে কে কতটা সুবিধা ক'রে নিতে পারে, শুধু সেইটেই বড় কথা। "রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই—" কবির একথা চিরদিনই সত্য।

জ়ুলফিকর খাঁও যে সে কথা জানেন না তা নয়। তিনিও দেখেছেন ঢের। কিন্তু তবু তাঁর কথা একটুখানি স্বতন্ত্র। তিনি আসাদ খাঁর মতো শুধুই ঝুনো রাজনীতিক নন—তিনি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, বীর। বীরের হৃদয় থেকে কৃতজ্ঞতা ও বিবেক বুঝি একেবারে লোপ পায় না কখনই—তাই তিনি মনেপ্রাণে ঠিক মেনে নিতে পারলেন না কথাটা। এতখানি বিশ্বাসঘাতকতা, এতখানি প্রবঞ্চনা করতে যেন মন সায় দেয় না কোন কারণেই।

জাহান্দার শাকে বলতে গেলে তিনিই সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। বাহাদুর শার মৃত্যু আসন্ন জেনে, ভাই আজিম-উশ-শানের হাতে বন্দী হবার ভয়ে মুইজ-উদ্দীন যেদিন পালিয়ে যান, সেদিন তাঁর সঙ্গে একশ'টির বেশী অনুচর ছিল না। একরকম কপর্দকহীন তিনি তখন—কোন সৈন্য বা সেনাপতি সেদিন মুইজউদ্দীনের পতাকাতলে গিয়ে সমবেত হবে—সেকথা কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। আজিম-উশ-শানের সৌভাগ্য-রবি তখন মধ্যগগনে—তাই সকলে তাঁকেই সেলাম দিতে দৌড়েছিল।

দৌড়েছিলেন জুলফিকর খাঁও। হয়তো সেদিন যদি আজিম-উশ-শানের এক সামান্য কর্মচারী অমন উদ্ধত অবহেলার সুরে জুলফিকর খাঁর চিঠির জবাব না দিতেন, তাহ'লে ইতিহাসই যেত বদলে, আজ দিল্লীর তখ্‌ৎ-এ-তাউসে আজিম-উশ-শানই শোভা পেতেন, জাহান্দার শাকে সে সিংহাসনের ত্রিসীমানার মধ্যেও পৌঁছতে হ'ত না। সেই চিঠি পেয়েই না অপমানে জুলফিকর খাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল—এবং তিনি নিজের লোকজন নিয়ে তৎক্ষণাৎ সোজা চলে গিয়েছিলেন মুইজ-উদ্দীনের তাঁবুতে! জুলফিকর খাঁ মুইজ-উদ্দীনের দলে যোগ দিয়েছেন শোনবার পরই একে একে এসে জুটেছিলেন অপর সেনানী এবং রাজপুরুষরা। তাঁরই মন্ত্রণা আর চক্রান্তে জাহান্দার শার বাকী দু ভাইও তাঁর পক্ষে যোগ দিয়ে লড়েছিলেন—নইলে জাহান্দার শার একার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হ'ত না তাঁর মেজভাইকে হারানো। সেদিন বাহাদুর শার সমস্ত রাজশক্তি এবং বহুদিনের সযত্ন-সঞ্চিত পূর্ণ কোষাগার ছিল আজিম-উশ-শানের করতলগত।

তার পর—

আজিম উশ-শানের পরাজয়ের পরও—বাকী দুই ভাইকে সামলানোও কি সম্ভব হ'ত জাহান্দার শার? বিশেষতঃ জাহান শা'র কাছে তো পরাজিত হ'তেই বসেছিলেন সেদিন—জুলফিকর খাঁ না থাকলে কেউ বোধ করি বাঁচাতে পারত না তাঁকে। শুধু শৌর্য নয়—তাঁর বুদ্ধিও—সেদিন নিষ্কণ্টক ক'রে দিয়েছিল মুইজ-উদ্দীন বা জাহান্দার শার সিংহাসন।

অর্থাৎ এক কথায় জুলফিকর খাঁই বলতে গেলে হাত ধরে এনে জাহান্দার শাকে বসিয়েছিলেন দিল্লীর শাহী তখ্‌তে। সেই জাহান্দার শাকে আজ এমনি ভাবে ত্যাগ করবেন? ত্যাগ করলেও না হয় তবু কথা ছিল—এ যে তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যু এবং চরম দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দেওয়া।

'না, না, তা সম্ভব নয় বাপজান! এখনও সময় আছে, আমি ওঁকে নিয়ে মুলতান কিংবা দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যাই। দাক্ষিণাত্যে এখনও আমার ডাকে লক্ষ সৈন্য এবং ক্রোর ক্রোর টাকা আসবে তা আমি জানি। তারপর ফররুখশিয়াকে ঐ সিংহাসন থেকে টেনে নামাতে আমার বেশীক্ষণ সময় লাগবে না!'

'মূঢ়!' প্রবীণ এবং বিচক্ষণ আসাদ খাঁর দৃষ্টিতে তীব্র ভৎসনা ফুটে উঠল। আবারও তিনি বললেন, 'মূঢ়! কালের রেখা ফুটে উঠেছে আশমানে—তুমি পড়তে পারছ না? জাহান্দার শার কাল ফুরিয়ে গেছে, তার সৌভাগ্য-রবি এখন অস্তাচলে।...তাকে আমরা সিংহাসনে বসিয়েছিলাম ঠিকই—কিন্তু সে আসনের মর্যাদা সে রাখতে পারে নি। দিল্লীর শাহী-তখ্‌ৎকে সে পঙ্ককুণ্ডে নামিয়েছে। আলমগীরের আসনে বসবার সে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত প্রমাণ ক'রে দিয়েছে নিজেকে। তার অপদার্থতায় সামান্য চাষী থেকে শুরু ক'রে দিল্লীর ধনী নাগরিক পর্যন্ত সবাই বিরক্ত। এখন তাকে আবার সেখানে বসাবার চেষ্টা করলে আমরাই হেয় হয়ে যাব প্রজাদের চোখে।'

তা ঠিক।

জুলফিকর খাঁও তা স্বীকার করেন।

গত কয়েকমাসেই জাহান্দার শা তাঁর আচার-আচরণে, তাঁর নির্বোধ প্রমোদ-বিলাসে এবং সাম্রাজ্যের প্রতি অসীম ঔদাসীন্যে নিজেকে একান্ত হাস্যাস্পদ ক'রে তুলেছেন। তাঁকে আবার সিংহাসনে বসানোর চেয়ে হয়তো একটা মর্কটকে বসানোও ভাল। এমন এমন কাজ করেছেন তিনি, যা একেবারে উন্মাদ না হ'লে কেউ করে না। কিন্তু তবুও—

আসাদ খাঁ ছেলের মন বুঝে আবারও বললেন, 'পরশু তো তুমি যুদ্ধটা জিতেই এনেছিলে প্রায়—অকারণে ভয় পেয়ে আর বেগমের পরামর্শে যদি জাহান্দর অমন ভাবে পালিয়ে গিয়ে গা-ঢাকা না দিতেন তাহ'লে আজ তো এসব কোন প্রশ্নই উঠত না। বুঝতে হবে স্বয়ং খোদাই বিরূপ হয়েছিলেন ওঁর নির্বুদ্ধিতায়। তিনিই যোগ্যতর লোককে সিংহাসনে বসিয়েছেন। তাঁর বিধানের বিরুদ্ধে যাওয়া কোনমতেই তোমার উচিত হবে না বৎস।'

'বেশ, তাই যদি মানেন তা'হলে তাঁকে ফিরিয়ে দিই, তিনি যা পারেন নিজেই করুন। কিন্তু একে ভূতপূর্ব মনিব—ভূতপূর্বই বা বলি কেন, এখনও পর্যন্ত আমরা নতুন কোন মনিবের নিমক খাই নি—তায় শরণাগত, তাঁকে মিথ্যা স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া—না না, বাপজান, এ নিমক-হারামি খোদা কখনও ক্ষমা করবেন না।'

'জুলফিক্কর খাঁ, আমি তোমার বাবা, আমার বয়স বেশী, অভিজ্ঞতাও বেশী।...আত্মরক্ষা সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ ছাড়া আমাদের বাঁচবার কোন পথ নেই। ফররুখশিয়ারের বাবার সঙ্গে আমরা যে দুশমনি করেছি, তার সঙ্গেও যা করলুম—তা সহজে ভোলবার নয়। একমাত্র উপযুক্ত উপঢৌকন বা মূল্য পেলে সে আমাদের রক্ষা করতে পারে। জাহান্দার শা-ই সেই উপঢৌকন, আমাদের ক্ষমার সেই মূল্য। তিন তিন বাদশার নৌকরি ক'রে যে বিপুল ঐশ্বর্য জমিয়েছি, যে প্রতিপত্তি করেছি—সেই ঐশ্বর্য লুটেরাদের পেটে যাবে, সেই প্রতিপত্তি ধুলোয় লুটোবে—তাই কি তুমি চাও? অন্য কোন পথ খোলা নেই বৎস, যা বলছি তাই শোন। দিল্লির দরওয়াজা বন্ধ ক'রে দিয়ে ফররুখশিয়ারকে ঠেকাবে কিংবা দাক্ষিণাত্যে গিয়ে বাহিনী গড়বে—এ তোমার উপযুক্ত কথা তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কার জন্যে করবে? সমস্ত ওমরাহ্ জাহান্দার শার আচরণে বিরক্ত, প্রজারা উত্ত্যক্ত—যত ওস্তাদ খেলোয়াড়ই হও বৎস, একেবারে ফুঁকো কানাকড়ি নিয়ে খেলা যায় না, এটি স্মরণ রেখো।'

জুলফিক্কর খাঁ এবার নীরব হলেন।

তিনি বীর বটে, যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর বুদ্ধি কারুর চেয়ে কম নয়, কিন্তু রাজনীতি তাঁর বাপজান তাঁর চেয়ে ঢের বেশী বোঝেন। আসাদ খাঁর সেই ঝুনো বুদ্ধিকে বরাবরই জুলফিক্কর খাঁ সমীহ বা ভয় ক'রে এসেছেন—আজও সেই ভয়ের কাছেই মাথা নোয়ালেন তিনি। সত্যিই তো—সেদিন যদি আগ্রার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অমন ক'রে কাপুরুষের মতো পালিয়ে না আসতেন জাহান্দার

শা, হয়তো আজও তাঁর সিংহাসন তাঁরই থাকত। বলতে গেলে স্বেচ্ছায় হারালেন তিনি—জুলফিকর খাঁ আর কী করবেন!

কাপুরুষ! ভীরু! অপদার্থ!

আলমগীরের পৌত্র, শাহজাহানের প্রপৌত্র স্ত্রীলোকের পরামর্শে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে ছিলেন। তাতেও অপমানের শেষ হয় নি, তারপর নাকি দাড়িগোঁফ কামিয়ে বোরখায় মুখ ঢেকে বয়েলগাড়িতে চেপে মেঠোপথ ধরে এখানে এসেছেন চুপিচুপি চোরের মতো! তার চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মরে যেতে পারলেন না?

সেই মুখ নিয়ে আবার এই নিশীথরাত্রের অন্ধকারে একা পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়িয়েছেন নিজেরই এক কর্মচারীর দেউড়ীতে—আশ্রয় এবং আশ্বাসের জন্যে! ঠিকই বলেছেন বাপজান, ওকে দয়া করলে খোদাতায়লা অসন্তুষ্ট হবেন।

জুলফিকর খাঁ মন স্থির করলেন।

তারপর মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিয়ে প্রাসাদের একটি নির্জন ঘরে এনে অস্নাত, অভুক্ত, পথশ্রান্ত, আশ্রয়প্রার্থী সম্রাট্—নিজেরই মনিব—জাহান্দার শাকে বন্দী করতে খুব বিলম্ব হ'ল না। বন্দী করলেন—এবং আসাদ খাঁর সঙ্গে সই ক'রে এক চিঠি পাঠালেন নতুন বাদ্‌শা ফররুখশিয়ারের কাছে। কাজটা তাঁরা দু'জনে ভুলই ক'রে ফেলেছেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে সে ভুল এখন তাঁরা বুঝতে পেরেছেন এবং সেজন্যে খুবই অনুতপ্ত। যদি বাদ্‌শা তাঁর এই বান্দাদের অপরাধ ক্ষমা করেন তো বান্দারা অতঃপর কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবা করবে এবং তাঁর কাজে জীবন উৎসর্গ করবে! অবশ্য অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একটি কাজ তাঁরা অগ্রিম ক'রেই রেখেছেন। বাদশার পরম শত্রু অপদার্থ মুইজ-উদ্দীনকে তাঁরা বন্দী করেছেন। এখন অভয় পেলেই সেই শত্রুকে তাঁরা নতুন বাদ্‌শার পদপ্রান্তে পৌঁছে দেবেন, ইত্যাদি—

সে অভয়ও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই এসে পৌঁছল। বাদ্‌শা তাঁদের পরমাত্মীয় বলেই মনে করেন। তিনি আগেই দু'জনকে ক্ষমা করেছেন। তাঁরা যেন অবিলম্বে বাদ্‌শার দরবারে হাজির হন।

আসাদ খাঁ নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলেন।

কিন্তু জুলফিকর খাঁ কিছুতেই স্বস্তি পান না কেন?

আবারও আসাদ খাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন তিনি—'এখনও সময় আছে বাপজান। আপনার বুদ্ধি আর আমার তরবারি, আপনার টাকা আর আমার খ্যাতি—দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে গেলে, হয়তো আমরা এ সিংহাসন নিজেদের জন্যেই জিতে নিতে পারব—'

'চুপ কর! ছেলেমানুষী করিস নে।...মুঘলবংশের সিংহাসন—কার্যত না হোক, নামে অন্তত একজন মুঘলকেই সেখানে বসিয়ে রাখতে হবে।...ভয় কি? আমাকে বাদ দিয়ে আজিম-উশ-শানের বেটা এত বড় সাম্রাজ্য চালাতে সাহস

করবে না। তুই নিশ্চিন্ত থাক্।'

এর পরের দিনই খবর পাওয়া গেল —নতুন বাদ্‌শা আগ্রা থেকে দিল্লির দিকে রওনা হয়েছেন। দিল্লিতে যে প্রবল প্রতিরোধের ভয় করেছিলেন জুলফিকর খাঁর কাছ থেকে—সে ভয় আর নেই ; শত্রুও করতলগত—লালকিলার বিশেষ বন্দীশালায় জাহান্দার শাকে রাখা হয়েছে, হাতে হাতকড়া এবং পায়ে বেড়ি দিয়ে। নতুন উজীর সৈয়দ আবদুল্লা খাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে গেছেন আসাদ খাঁ, সত্যি-সত্যিই শরণাগত, তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং আপাততঃ নিশ্চিন্ত, কোন তাড়া নেই। ধীরে সুস্থে এগোচ্ছেন বাদ্‌শা, একটু একটু ক'রে—পাঁচ সাত ক্রোশ অন্তর-অন্তর তাঁবু পড়ছে। আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটছে।

অবশেষে—পনেরো-ষোল দিন পরে বাদ্‌শা এসে পৌঁছলেন খিজিরাবাদে, দিল্লী থেকে মাত্র আড়াই ক্রোশ দূরে। আসাদ খাঁ আর অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে থাকতে পারছেন না তখন—তিনি এসে আবারও নতুন উজীরকে ধরলেন। কিন্তু দেখা গেল যে নতুন বাদ্‌শাহও ইতিমধ্যে কম ব্যস্ত হয়ে ওঠেন নি। তাঁর পুরাতন ও বিশ্বস্ত সেবক তকরাব খাঁকে পাঠালেন তিনি আসাদ খাঁ ও জুলফিকর খাঁকে সসম্মানে তাঁর দরবারে নিয়ে যাবার জন্যে।

জুলফিকর খাঁ তবুও ইতস্তত করেন। হঠাৎ বাদ্‌শার এত আগ্রহ কেন ?

আসাদ খাঁকে বলেন, 'আপনিই আজ যান বাপজান। অবস্থাটা কি হয় তা দেখে আমি বরং কাল যাবো !'

আসাদ খাঁ দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়েন,—'সে কোন কাজের কথা নয়। তাতে বাদ্‌শা আরও চটে যাবেন। নানারকম সোবে করবেন।'

তকরাব খাঁ বলেন, 'বৃথাই আপনি ভয় পাচ্ছেন খাঁ সাহেব। আমি বলছি কোন ভয় নেই !'

জুলফিকর খাঁ বললেন, 'আপনি কথা দিচ্ছেন ?'

'এই কোরান স্পর্শ ক'রে বলছি—আমার দেহে রক্তবিন্দু থাকতে আপনার কোন অনিষ্ট হবে না।'

জুলফিকর খাঁ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'চলুন বাপজান। আমি তৈরী !'……

তার পরের কথা সবাই জানে।

আসাদ খাঁকে দেখে নতুন বাদশা আলিঙ্গন ক'রে পাশে বসালেন। আসাদ খাঁ সম্রাটকে খুশী করার জন্যে ছেলের দুই হাত একটা রুমাল দিয়ে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি নত মস্তকে অপরাধীর মতো সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'আসামীকে এনে আপনার পায়ের কাছে ফেলে দিলুম শাহানশাহ্, আপনি যা খুশি শাস্তি দিন এবার !' সবিনয়ে জানালেন আসাদ খাঁ।

বাদ্‌শা যেন শিউরে উঠলেন, 'এ কি ! বাঁধন কেন ? ছি ছি !'

তাঁর ইঙ্গিতে তাড়াতাড়ি কারা সব ছুটে এসে জুলফিকর খাঁর বাঁধন খুলে দিলে।

জ্বলফিকর খাঁ এবার এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন নতুন মনিবের সামনে। বাদ্‌শা নিজে তাঁর হাত ধরে উঠিয়ে নিজের পাশেই বসালেন। কুশল-বিনিময়ের পর নিজের হাতে খিলাত দিলেন—নতুন পোশাক ও রত্নহার !। নিশ্চিন্ত হলেন বাপ-বেটা দু'জনেই।

তখন নমাজের সময় হয়েছে। বাদশা খাজা কুতবউদ্দীন বখ্‌তিয়ারীর সমাধিতে যাচ্ছেন নমাজ পড়তে। তিনি আসাদ খাঁকে বললেন, 'আপনি এবার গিয়ে বিশ্রাম কর্নন গে—ভাইয়াজী বরং থাক। আমি নমাজ সেরে এসে ওঁর সঙ্গে কথা কইব। কেমন ?'

আসাদ খাঁ কুর্নিশ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। বাদ্‌শাও রওনা হলেন পীরের দরগার উদ্দেশ্যে। হেসে জ্বলফিকর খাঁকে বলে গেলেন, 'আপনি তাহ'লে কিছু খাওয়া-দাওয়া কর্নন ততক্ষণ, বেলাও তো হ'ল ঢের। আমি আপনার জন্যে কিছু খানা বরং এখানেই পাঠাতে বলে দিচ্ছি !'

জ্বলফিকর খাঁ আভূমি নত হয়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

কিন্তু বাদ্‌শা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে গজিয়ে উঠল প্রায় দু'শ তাতারী সৈন্য। চারদিক থেকে ঘিরল তারা নিরস্ত্র জ্বলফিকরকে।

তারপর ? প্রথমে খানিকটা বিচারের প্রহসন চলেছিল। বাদ্‌শা লোক মারফৎ একটার পর একটা ওঁর অপরাধের কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠাতে লাগলেন। কেন জ্বলফিকর আজিম-উশ-শানের বিরোধিতা করেছিলেন ? কেন মির্জা মহম্মদ করিমকে মেরেছিলেন তাঁরা ? ··এমনি হাজারো কৈফিয়ৎ ! প্রথম প্রথম দু'একটার উত্তর ভাল ভাবেই দিয়েছিলেন জ্বলফিকর খাঁ। তারপরই বুঝলেন যে এটা একটা ছুতো মাত্র। মরতে তাঁকে হবেই। মিছিমিছি নতি-স্বীকার ক'রে লাভ কি ? তখন উদ্ধতভাবে জবাব দিলেন, বাদ্‌শার মারতে ইচ্ছা হয়েছে তাঁকে, সোজাসুজি মারুন। এ অভিনয়ের প্রয়োজন কি !

সঙ্গে সঙ্গে সেই দু'শ তাতারী ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। কেউ লাগাল তাঁর গলায় ফাঁসি, কেউ উঠে নাচতে লাগল তাঁর বুকের ওপর—প্রাণ বেরোবার অনেক পরেও তাঁর মৃতদেহে পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত করতে লাগল কেউ কেউ। অর্থাৎ যে যতটা বাহাদুরী নিতে পারে !

বলা বাহুল্য—ততক্ষণে আসাদ খাঁর বাড়িও ঘেরাও করেছে বাদ্‌শার লোক। বহু বৎসরের সঞ্চিত ঐশ্বর্য, খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং একমাত্র পুত্র—দিগ্বিজয়ী বীর পুত্র—একদিনেই সব হারালেন বৃদ্ধ ! অথচ এইসব বাঁচাবার জন্যেই এতবড় গর্হিত কাজ করেছিলেন তিনি। শরণার্থী মনিবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। এই সব পার্থিব ঐশ্বর্যের জন্যেই—মূল্য দিয়ে যে ঐশ্বর্য কেনা যায় না, ইমান আর ইজ্জৎ খুইয়েছিলেন।

কিন্তু এখানেই কি শেষ ?

পরের দিন নতুন বাদ্‌শা দিল্লী প্রবেশ করছেন। লোকে লোকারণ্য পথের দু'পাশে। বিরাট মিছিল চলেছে লালকিলার দিকে। পুরাতন বাদ্‌শার পতন

ঘটেছে—নতুন বাদশা বসবেন তখ্‌ৎ-এ তাউসে। নতুন খেতাব ও খেলাত বর্ষিত হবে, শহরের বাড়িতে বাড়িতে পুষ্প-সজ্জা, রাত্রে আলো দিতে হবে—(নতুন উজীরের হুকুম) বাজিও পুড়বে পথের মোড়ে মোড়ে।

চলেছেন নতুন বাদ্‌শা—হাতীর ওপর সোনার হাওদায় বসে। মাথায় রাজছত্র, ময়ূর-পালকের বিরাট পাখা দিয়ে বাতাস করছেন স্বয়ং মীরজুমলা। দু'পাশ থেকে মুঠো মুঠো টাকা পয়সা ছড়ানো হচ্ছে রাজপথে—কাড়াকাড়ি ক'রে তা কুড়িয়ে নিচ্ছে গরীব-দুঃখীরা।

সুপুরুষ বাদ্‌শা। মুখে তাঁর প্রসন্ন হাসি। হেসে হেসেই অভিবাদন নিচ্ছেন পথের দুধারে দাঁড়ানো প্রজাদের কাছ থেকে।

কিন্তু বাদ্‌শার হাতীর পিছনেই ও হাতীটা কিসের ?

কী বীভৎস দৃশ্য ওটা ?

সবাই প্রশ্ন করে সবাইকে।

হাতীর ওপরে একটা শবদেহ, মুণ্ডহীন। না, ঐ যে, মুণ্ডটাও কে যেন একজন বর্শার বল্লমে বিঁধিয়ে ধরে আছে না ? কার শব ওটা ?

আরে, ঐ তো জাহান্দার শার দেহ !

ক'দিন আগেও যিনি ছিলেন কোটি কোটি প্রজার দণ্ডমুণ্ডের মালিক, তাঁরই মুণ্ডের এই অবস্থা ! কিন্তু তা তো হ'ল। পেছনে ওটা আবার কি ? আর একটা হাতীর ল্যাজে-বাঁধা ওটা আবার কার দেহ ? পা বাঁধা, মাথাটা নিচের দিকে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে, হাত দুটো লুটোচ্ছে ভুঁয়ে—পথের ধুলোয় ঘষতে ঘষতে চলেছে ! ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত দেহ, নীল বিকৃত মুখ—কিছুই চেনা যায় না।

অবশেষে উত্তরটাও ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে—ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে একজন বলে আর একজনকে—সেনাপতি জুলফিকর খাঁর মৃতদেহ ! আমির-উল উমারা, মীর বক্সী—দুর্ধর্ষ, অপরাজেয় বীর জুলফিকর খাঁ।

কালকে যে সবার ওপর ছিল, আজ সে সবার অবজ্ঞাত। এই-ই বুঝি দুনিয়ার নিয়ম !

প্রকাশ্যেই দর্শকরা চোখের জল ফেলেন ! দীর্ঘনিঃশ্বাসের একটা আতপ্ত তরঙ্গ ওঠে বাতাসে. সে শব্দ বুঝি বাদ্‌শাও পান। তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হয় একবার। কিন্তু দিল্লীর লক্ষ লক্ষ নাগরিককে নিঃশ্বাস রোধ করতে বলবেন—এত সাহস বুঝি তাঁরও নেই। তাই নিঃশব্দে এই অপ্রকাশ-অভিযোগ হজম করেন।

কিন্তু প্রশ্নের তো এইখানেই শেষ নয়।

তৃতীয় হাতীর ঠিক পরেই, অর্থাৎ জুলফিকর খাঁর গলিত শবদেহের পিছনেই মূল্যবান ভেলভেট মোড়া হাতীর দাঁতের পালকিতে বসে ও বৃদ্ধ কে চলেছেন ?

চেনো নাকি ওঁকে ?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আসে চারদিক থেকে—ওঁকে কে না চেনে—উজীর-এ-আজম আসাদ খাঁ। নতুন বাদ্‌শার বিজয়-উৎসবে আনন্দ প্রকাশ করতে মিছিলে যোগ দেবেন বৈকি উনি ! নইলে চলবে কেন ? বাদ্‌শা যদি অসন্তুষ্ট হন !

হ্যাঁ—আসাদ খাঁই বটে। প'চাশি বছরের বৃদ্ধ। মাথা উঁচু করে বসে আছেন পাল্‌কিতে। দৃষ্টি স্থির, সামনের দৃশ্যে আবদ্ধ। চোখে এক ফোঁটাও জল নেই, বুকে হাহাকার আছে কিনা কে জানে! ঠোঁট দুটি নড়ছে শুধু নিঃশব্দে—কী বলতে চাইছেন কে জানে। হয়তো বা ঈশ্বরকেই ডাকছেন এতদিন পরে, অবশেষে!...

শেষ পর্যন্ত বুঝি কার দয়া হ'ল। আকবরাবাদী মসজিদের সামনে এসে হুকুম পাওয়া গেল, আসাদ খাঁর বয়স হয়েছে—মিছিলের সঙ্গে যদি না যেতে চান তো এইখানেই বিশ্রাম করতে পারেন!

পাল্‌কি নামানো হ'ল মসজিদের সামনে, পথের ধুলোর ওপর।

চলে গেল জলুস—বাদ্য ভাণ্ড-কোলাহল। নবীন বাদ্‌শার জয়ধ্বনি দূরে যেতে যেতে এক সময় বহুদূর বাতাসে মিশে গেল। শুধু আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন ক'রে সেই বহু সহস্র লোকের পায়ের ধুলো জমে রইল অনেকক্ষণ। তারপর সে ধুলোও থিতিয়ে গেল এক সময়। নগরের বাইরে গ্রাম-প্রান্তের পথ নিঃশব্দ ও জনহীন হয়ে উঠল আবার। কিন্তু আসাদ খাঁ ছুটি পেলেন না, সেই ভাবে সেই পাল্‌কির মধ্যেই বসে রইলেন তিন-চার ঘণ্টা।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পর নতুন উজীরের বুঝি মনে পড়ল কথাটা। একটা পুরোনো বাড়ির একখানা কামরায় আপাততঃ আশ্রয় দেওয়া হ'ল—তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সবাইকে।

অবশ্য বেশী জায়গার আর প্রয়োজনও নেই।

একবস্ত্রে প্রাণ নিয়ে আসতে পেরেছেন শুধু তাঁরা।—

তারপর?

তারপর আর কি?

জুলফিকর খাঁর অপরাধ অল্প—তাই তিনি মরে অব্যাহতি পেলেন। কিন্তু আসাদ খাঁ ঈশ্বরের অমোঘ এবং অব্যর্থ ন্যায়বিচারের জীবন্ত সাক্ষ্যস্বরূপ বেঁচে রইলেন, আরও অনেক দিন। নিজেরই রচিত কৃতকর্মের শ্মশানে বসে রইলেন তিনি।

।। নয় ।।

'বহল' বা বয়েলগাড়িখানা তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ ধরে। গাড়োয়ান ঠিক তাগাদা না করলেও—হয়তো এখনও তার মন থেকে পূর্বের সম্ভ্রমবোধ সবটুকু মুছে যায় নি—বারকয়েক সামনে এসে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ধরে অপেক্ষা ক'রে ক'রে ফিরে গেছে।

না, আর দেরি ক'রে লাভ নেই।

লালকুঁয়র অভিভূত, আচ্ছন্নের মতোই উঠে দাঁড়ান। যে সিপাহীরা পাহারা দিচ্ছে, তারাও অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে ক্রমশ, একটু পরে হয়তো ধমকই দেবে। বান্দার বান্দা ওরা—কয়েকদিন আগেও তাঁর একটুকু প্রসন্ন দৃষ্টিলাভের আশায়

পিছনে পিছনে পদচিহ্ন লেহন ক'রে ফিরেছে—ওদের কাছ থেকে ধমক খাওয়ার জন্য অপেক্ষা না করাই ভালো। এখনও যে দেয় নি, সেইটেই যথেষ্ট অনুগ্রহ। দিলে কিছুই করবার নেই—আরও অনেক অপমানের সঙ্গে সেটুকুও হজম করা ছাড়া।

কারাগারের আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ সিঁড়িপথ দিয়ে সেইভাবেই—অভিভূতের মতোই বেরিয়ে এলেন লালকুঁয়র। কারাগার ঠিক কি রকম তা তিনি জানতেন না, কখনও দেখেন নি। তবে অনেককেই এখানে পাঠিয়েছেন এটা ঠিক—তার মধ্যে কাউকে হয়তো সম্পূর্ণ বিনাদোষেই। লজ্জার সঙ্গে হ'লেও সে কথাটা স্বীকার করতে তিনি বাধ্য। ভাই, বোন, ভগ্নীপতি, অথবা ভাগ্নে কি ভাইপো—এমন কি তাঁর পেয়ারের বাজনদারদেরও সামান্য মাত্র অপ্রীতিভাজন যে হয়েছে, তাকেই নির্বিচারে পাঠিয়েছেন এখানে—হয়তো এখানকার চেয়েও কোন জঘন্য স্থানে। ক'দিন আগেই একজন রক্ষী তাঁকে জানিয়েছে—এই প্রথম যে,—এটা ঠিক সাধারণ কারাগার নয়! সম্মানিত বন্দীদেরই শুধু এখানে রাখা হয়। ত্রিপোলিয়া ফটকের এই বন্দীশালা—এ শুধু রাজনৈতিক বিশেষ বন্দীদের জন্যেই। মাটির নিচে সার-সার বহু অন্ধকার কারাগৃহ আছে এই কিলাতেই—ইঁদুর-চামচিকা-আরশুলা-অধ্যুষিত গহ্বর কতকগুলো—সেখানে আজও বহু বন্দী জীবন্ত-সমাহিত অবস্থায় রয়েছে। লালকুঁয়রই হয়তো পাঠিয়েছেন কত লোককে। রাজা বদলাল, রাজশক্তি হাতবদল হ'ল, কিন্তু তাদের কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না। ঘামাবেও না। ঐ একটা জায়গায় কতকগুলি প্রাণী আজও দ্বিতীয় নূরজাহার সর্বময় কর্তৃত্বের অস্তিত্ব বহন ক'রে চলবে।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহাঁ!

হ্যাঁ। লালকুঁয়রের দিনকতক শখ হয়েছিল দ্বিতীয় নূরজাহাঁ হবার। বামন হয়ে চাঁদ ধরবার শখ। সে শখ ভালো ক'রেই মিটল!…

ক মাসেই শেষ হয়ে গেল সব। সম্রাজ্ঞী নূরজাহাঁর পরিণতিও ছিল বৈকি তাঁর চোখের সামনে। কিন্তু লালকুঁয়র সতর্ক হন নি। সে ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারেন নি। অন্তত এত শীঘ্র সব ফুরিয়ে যাবে তা তিনি ভাবেন নি। জাহান্দার শাহের জীবিতকালের মধ্যেই এ অবস্থা ঘটবে তা কল্পনাও করতে পারেন নি। ভেবেছিলেন, এখন কিছুকাল অন্তত নিশ্চিন্ত।

তাও—নূরজাহাঁর ঠিক এতটা দুরবস্থা হয় নি। তিনি তবু একটা স্বতন্ত্র বাসা পেয়েছিলেন। তার সঙ্গে নাকি পেয়েছিলেন বার্ষিক একলক্ষ টাকা ভাতা আর অসংখ্য দাসদাসী। শাহ্‌জাহান বাদ্‌শা নিজে ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। তবে নূরজাহাঁ ছিলেন বাদ্‌শার বিবাহিতা স্ত্রী, আর লালকুঁয়র রক্ষিতা উপপত্নী মাত্র—বাঁদী। এই তো তাঁর পরিচয়!

কথাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে একটা উষ্ণ বিদ্রোহ, একটা নিরুদ্ধ আক্রোশ নিজের বিরুদ্ধেই যেন মাথা তুলে দাঁড়ায়।

কিসের বিবাহিতা স্ত্রী? নূরজাহাঁ যতই হোন—নিকায়-বসা বিধবা বৈ তো

নয়। লালকুঁয়র একদা রাস্তার নাচওয়ালী ছিলেন বটে, কিন্তু ঠিক সাধারণ নাচওয়ালীর মেয়ে তিনি নন। ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতসাধক মিয়া তানসেন তাঁর পূর্বপুরুষ—অনায়াসে তিনি সে পর্যন্ত পর পর নাম বলে যেতে পারেন পিতৃপিতামহের। তিনিও সুগায়িকা, তাঁর কণ্ঠস্বরও সে পরিচয়ের স্বীকৃতি বহন করছে। বলতে গেলে এই কণ্ঠস্বরেই জাহান্দার শা মুগ্ধ হয়েছিলেন এতকাল। মুগ্ধ বললেও হয়তো যথেষ্ট বলা হয় না; সে মোহ তাঁকে অমানুষে পর্যবসিত করেছিল।

'কী হ'ল ?'

যে দুজন রক্ষী তাঁর সঙ্গে যাবে ব'লে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই ভোর থেকে—তাদেরই একজন অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করল। কিলাদার ইয়ার খাঁ এতটুকু অনুগ্রহ করেছেন তাঁকে—সঙ্গে দুজন রক্ষী দিতে রাজী হয়েছেন। নইলে যা যৎসামান্য ধূলিগুঁড়ি নিয়ে তিনি যাত্রা করছেন—এটুকুও পৌঁছবে না শেষ পর্যন্ত।

সেই অসহিষ্ণু প্রশ্নে চমক ভাঙল যেন লালকুঁয়রের। তিনি চমকেই উঠলেন।

দিবাস্বপ্নের মধ্যে কখন যে মন্থর গতি একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, তা তিনি টেরও পান নি। সত্যিসত্যিই থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন কখন! অপ্রতিভ লালকুঁয়র মাথা নিচু ক'রে নেমে এলেন তাড়াতাড়ি।

সাধারণ কাপড়ের কানাত দিয়ে ঘেরা অতিসাধারণ একটা বয়েলগাড়ি; তলায় বাঁশের চালির ওপর ঘাস বিছানো, তার ওপর একটা জাজিম পাতার কথাও কেউ ভাবে নি।

না, হাতী তো নয়ই।

আজ আর তাঁকে হাতী পাঠানোর কথা কারুরই মনে পড়া সম্ভব নয়। হয়তো তেমনভাবে সবিনয় প্রার্থনা জানালে, কিলাদার ঘোড়া একটা দিতে পারতেন। কিন্তু সে ভিক্ষা চান নি লালকুঁয়র। তাঁর যা অবস্থা—আজ ঐ কাপড়েঘেরা বয়েলগাড়িই ভালো। তার ওপর মিছিমিছি খানিকটা দেরি ক'রে ফেলেছেন তিনি—মাঘের সকাল, তবু বেশ ফরসা হয়ে গেছে চারদিক। সূর্য উদয়ের আগেই শহরের সীমাত্যাগ করবেন তিনি—এই ইচ্ছা ছিল। সেই মতোই ইয়ার খাঁ সব ব্যবস্থাও করেছিলেন। তাঁর নিজের দোষেই অনর্থক দেরি হয়ে গেল খানিকটা।

গাড়িতে ওঠবার আগে আবারও এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন লালকুঁয়র। একবার তাকিয়ে দেখলেন পিছন দিকে—এইমাত্র ফেলে-আসা সেই ভয়ঙ্কর কারাগারটার দিকে। আজ প্রথম তাঁর মনে হ'ল, এই লালকিলা যেন এক দানবের আস্তানা। ঐ যে লাল পাথরের ত্রিপোলিয়া ফটক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর পিছনে—প্রভাতী আলো ও রাত্রির কুয়াশায় মাখামাখি হয়ে—ও যেন জড় পাষাণের তৈরী ইমারত নয়—ওটাও একটা দানব! এখনই, তিনি গাড়িতে উঠে বসলেই, যেন খলখল ক'রে হাসতে হাসতে ছুটে এসে ওর পাষাণ-মুষ্টিতে চেপে ধরবে তাঁর গলা।

লালকুঁয়র শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি বোরখায় মুখ ঢেকে গাড়িতে উঠে বসলেন।

রইল তাঁর সব কিছু পিছনের ঐ দুঃখময় রিক্ত ভয়ংকর কারাগারে পড়ে। তাঁর শক্তি, তাঁর মহিমা—তাঁর বাদশা।

দর্পহারী খোদা বুঝি তাঁকে শেষ শিক্ষা দেবার জন্যেই টেনে এনেছিলেন ঐ কারাগারে। দর্পে ও দম্ভে উন্মত্ত হয়ে কাউকেই কখনও গ্রাহ্য করেন নি তিনি।

তারই পুরস্কার মিলল আজ হাতে হাতে। যে বাদশার শক্তিতে তাঁর শক্তি, যাঁর জন্যে এত দম্ভ—তাঁকেই বা কী অবস্থায় দেখলেন তিনি! লাল পাথরের ঠাণ্ডা ঘর, একটু শয্যা পর্যন্ত দেয় নি তাঁকে ওরা—মাত্র ক'ঘণ্টা আগেও যিনি ছিলেন দুনিয়ার বাদশা, ওদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। ওজু করার একটা বদনা, আর জলের জন্যে একটা মাটির ঝাঁঝর—আসবাব বলতে এই। একটা সানকিতে ক'রে দিয়ে যেত খানকতক পোড়া রুটি। লালকুঁয়রের কুকুররাও কখনও খায় নি সে রকম খাবার!

তবু, তাই খেয়েও যদি জাহান্দার শা'কে বেঁচে থাকতে দিত ওরা! তিনি তো আর কিছুই চান নি ওদের কাছে, শুধু লালকুঁয়রকে কাছে পেতে চেয়েছিলেন মাত্র; ঐ একটিই মাত্র প্রার্থনা তিনি জানিয়েছিলেন বন্দী হবার পর। প্রেয়সী লালকুঁয়র যেখানে থাকবে সেইখানই তাঁর কাছে বেহেস্ত্—তা হোক-না কেন তা কঠিন, শীতল, নগ্ন পাথরের কারাগার। সেটুকুও দিতে পারল না ওরা—শুধু বাঁচবার অধিকারটুকু! প্রায়শ্চিত্ত করারও অবসর মিলল না লালকুঁয়রের। জীবনের শেষ ক'টা দিন ওঁর পাশে পাশে থেকে একটু সান্ত্বনা, একটু আনন্দ দেবার চেষ্টা করবেন তিনি—নিজের বেদনার পাত্র প্রণয়ের সুধারসে পূর্ণ ক'রে তৃষিত ওষ্ঠে তুলে ধরে বাদশার শেষ মুহূর্ত'ক'টিকে সান্ত্বনাময় ক'রে তুলবেন, আর সেই সঙ্গে নিজের অসংখ্য অপরাধের মার্জনা চেয়ে নেবেন—সামান্য এই সুযোগটুকুই বাদশার দীনতমা বাঁদী লালকুঁয়রকে কেউ দিলে না। কেউ না বলে দিক, আজ লালকুঁয়র বোঝেন যে—তিনিই এই অবস্থার জন্যে, এই সাংঘাতিক সর্বনাশের জন্যে মুখ্যত দায়ী। তিনি আর তাঁর লুব্ধ ক্ষমতাপ্রিয়তা। দ্বিতীয় নূরজাহাঁ হবার নির্বোধ মূঢ় লালসা। নূরজাহাঁর শক্তির এতটুকু কণামাত্রও ছিল না তাঁর—বাদশাহী করতেও তিনি চান নি—তিনি শুধু চেয়েছিলেন রাজ্যেশ্বরকে পদানত ক'রে, দুনিয়ার সকলের অবনত মাথার ওপর দিয়ে কারুকার্যখচিত এই চটিজুতা-সুদ্ধ হেঁটে যেতে—

হায়রে মূর্খতা!

সে মূর্খতার শাস্তি পেয়েছেন বৈকি লালকুঁয়র। হাতে-হাতেই পেয়েছেন। আজ নয়—এমন কি, কাল জাহান্দার শা'র অসহায়, অপমানকর ভয়াবহ মৃত্যুতেও নয়—পেয়েছেন প্রায় এক মাস আগেই—যেদিন 'আসন্ন বিজয়ের সামনে দাঁড়িয়েও পরাজয় বরণ ক'রে নিতে হয়েছিল, লালকুঁয়রের নির্বুদ্ধিতার জন্যেই খানিকটা—সেই দিনই। একমুহূর্ত আগেও যিনি ছিলেন বাদশা—সেই জাহান্দার শাকে নিয়ে যেদিন গোপনে সকলের দৃষ্টির অগোচরে এইরকম

বয়েলগাড়িতে ক'রে পালাতে হয়েছিল, সেই দিনই। সেনাপতি জ্বলফিকর খাঁ সারা যুদ্ধক্ষেত্র খুঁজে বেড়িয়েছিলেন, তারপরও, হয়তো তখনও দুজনে দেখা হ'লে ইতিহাস অন্যরূপ হ'ত। কিন্তু তিনিই তা হ'তে দেন নি। অথচ কী পরিণামের মধ্যেই না লালকুঁয়র টেনে এনেছিলেন রাজ্যেশ্বর স্বামীকে তাঁর! স্বামী-ই বলবেন আজ তিনি—জাহান্দার শা তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই জীবনে এত ভালবাসেন নি, সুখে দুঃখে জীবনের অংশভাগিনী করেন নি। হৃতসর্বস্ব বন্দী অবস্থায় যেদিন এই পাষাণ কারাগারে ঢোকেন—সেদিনও তিনি শুধু একটি ভিক্ষাই জানিয়েছিলেন।—লালকুঁয়রকে কাছে চেয়েছিলেন। লালকুঁয়র এসে পেঁছিতে আনন্দের কী অনির্বচনীয় হাসিই না ফুটে উঠেছিল বাদশার মুখে! বলেছিলেন, রক্ষীদের সামনেই বলেছিলেন—'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আর কোনও চিন্তা নেই আমার—আর কিছুই চাই না।'

উঃ, সেদিনের কথা মনে হ'লে বুক ফেটে যায় লালকুঁয়রের।

লালকুঁয়রই সেজন্য দায়ী। ঘোড়ার পিঠের ওপর থেকে তিনিই জোর ক'রে টেনে নামিয়ে এনেছিলেন জাহান্দার শাকে। তারপর চুল-দাড়ি-কামানো ছদ্মবেশী বাদশাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন এমনিই এক বয়েলগাড়িতে চেপে। সেদিন যদি যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দিতেন বাদশাহ—মৃত্যুর অধিক এত অপমান সইতে হ'ত না অন্তত।

যেমন জোর ক'রে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন, তেমনি যদি জোর ক'রে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে পারতেন—বহুদূর দেহাতে কোথাও, যেখানে উচ্চাশা আর উচ্চাভিলাষ পথে পথে এমন সর্বনাশের জাল পেতে রাখে না—সেখানে দুজনকে নিয়ে দুজনে তাঁরা অনায়াসে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতেন। আসবার পথে গাজীমণ্ডীতে একান্ত নিঃস্ব যে তরুণ দম্পতিটিকে তিনি দেখে এসেছিলেন—তাদের মতো—স্বচ্ছন্দে না হোক, শান্তিতে ও সুখে।

কিন্তু তা তিনি পারেন নি। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বাদশার ইচ্ছাকে পদদলিত ক'রে নিজের ইচ্ছার রথচক্রে পিষ্ট করেছিলেন—কেবল ঐ দিনটি ছাড়া, যেদিন ধূলিধূসরিত, ক্লান্ত, হতোদ্যম জাহান্দার শা একাকী লজ্জাবনত শিরে তাঁরই বান্দা আসাদ খাঁ আর জুলফিকর খাঁর দোরে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আর সেই একান্ত আস্থা এবং নির্ভরতার বদলে পেয়েছিলেন চরম বিশ্বাসঘাতকতা।.

উঃ, মানুষ এমন অমানুষও হয়!

মাথার ওপর খোদা আছেন বৈকি। সকলের মাথার ওপরই আছেন তিনি। যেমন লালকুঁয়রের মাথার ওপরও ছিলেন—তেমনি ওদেরও। জাহান্দার শা'র অপরাধ কম, তাই অল্পের ওপর দিয়েই কেটে গেল। লালকুঁয়র রইলেন সারা-জীবন-ব্যাপী স্মৃতির তুষানলে দগ্ধ হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে—তাঁর হিমালয়-সমান পাপ ও দম্ভের।

সান্ত্বনা এই, বেইমান-দুটো হাতে-হাতেই বকশিশ পেয়ে গেছে তাদের বেই-মানির। বাপ ও বেটা। ওদের বেলাও খোদার এতটুকু হিসাবে ভুল হয় নি।

জুলফিকর খাঁ নাকি এতটা করতে রাজী হন নি। এমন কি তিনি বাদশাকে নিয়ে মুলতানে কি গুজরাটে কি বিজাপুরে—কোথাও পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, সেখান থেকে আবার সৈন্য সংগ্রহ ক'রে জাহান্দার শা'র সিংহাসন পুনরুদ্ধার করার প্রস্তাবও করেছিলেন। কিন্তু ঐ বৃদ্ধ আসাদ খাঁর জন্যেই তা সম্ভব হয় নি। বুড়ো বাপের বুদ্ধি আর হুকুম বহুদিন ধ'রে মানতে অভ্যস্ত জুলফিকর খাঁ অবশেষে আত্মসমর্পণ করেছিলেন বাপের কাছে। তাই জুলফিকর খাঁ অল্পেই রেহাই পেলেন প্রাণটা দিয়ে। জাহান্দার শা'র মতোই সরল বিশ্বাসে এসেছিলেন নতুন বাদশার দরবারে। আর সেখানে—নিজে যা দিয়েছিলেন তাই ফিরে পেলেন জুলফিকর খাঁ। মিছরির মতো মিষ্টিকথার ভেতর দিয়ে নেমে এল ঘাতকের তীক্ষ্ণ ছুরি তাঁর গলায়!···

কিন্তু জুলফিকর খাঁর এই পরিণতির জন্যেও কি এই হতভাগিনী রাক্ষসী লালকুঁয়র দায়ী নয়?

সেই ইতিহাস আর কেউ না জানুক, লালকুঁয়র জানেন বৈকি!

এসব খবর তিনি ত্রিপোলিয়া ফটকের কারাগারে বসেই পেয়েছেন। আজই পেয়েছেন। চোরের মতো এসেছিল হিদায়ৎ কেশ। কাঁপছে সে, ঝড়ের-মুখে-কাঁপা-বেতের ডগার মতোই কাঁপছে। শাহজাদা মির্জা মহম্মদ করিমের মৃত্যুর কারণ সে—একথা সে ভোলে নি। সম্ভবত নতুন বাদশাও ভুলবেন না। চুলে বাঁধা তরবারি ঝুলছে তার মাথার উপর। তাই সে ইমতিয়াজ-মহলের কাছে এসেছিল শেষবারের মতো অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে। বেগমসাহেবা যদি দয়া ক'রে একটু কাগজে লিখে দেন যে, হিদায়ৎ কেশ মহম্মদ করিমকে ধরিয়ে দিয়েছিল—এ কথাটা ঠিক নয়, তাঁরাই খবর পেয়ে ওকে হুকুম করেছিলেন করিমকে ধরে নিয়ে আসতে!

নির্বোধ হিদায়ৎ কেশ! এখনও সে ওঁকে ধরে 'তরে' যাওয়ার আশা করে! ফুটো নৌকায় চেপে তুফানের মাঝে সাগর পার হ'তে চায়। জানে না যে ওঁর সমর্থনই তার বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে হয়তো। ইমতিয়াজ মহল তাকে রক্ষা করতে চান, সেইটেই অপরাধের বড় প্রমাণ বলে গণ্য হবে—

তাছাড়া প্রকাশ্য বিচার হবে—এটাও কি সে আশা করে এখনও? জুলফিকরের ভাগ্য দেখেও শিখল না সে? এ বাদশা জাহাঙ্গীর নন, শাহজাহান নন—প্রকাশ্য বিচারের ভানও করবেন না ইনি।

তবু দিয়েছিলেন লিখে। দুঃখের মধ্যেও হাসি পেয়েছিল তাঁর, তবু লিখে দিয়েছিলেন। না দিয়ে পারেন নি। লোকটা কাঁপছিল। বেতের মতোই কাঁপছিল। ভয়ে একটুকু হয়ে গিয়েছে। ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষুদ্র প্রাণ! তা নইলে সামান্য একটু অনুগ্রহের আশায় ছত্রমলের ছেলে ভোলানাথ হিদায়ৎ কেশ হ'ত না। স্বার্থে সে অন্ধ তাই যথার্থ স্বার্থ কোন্‌টা দেখতে পায় না। স্বার্থবোধ আছে, স্বার্থ-বুদ্ধি নেই। নইলে সদ্যবিধবা অনাথিনীর কাছে আসত না নিজের

জন্যে সুপারিশনামা লিখিয়ে নিতে। প্রায় তখনই এসেছে সে—বাদ্‌শার ঐ শোচনীয় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই।

হৃদয়হীন মূর্খ! তবু বাঁচবে না, তবু বাঁচবে না। মির্জা মহম্মদ করিমের সেই শোচনীয় মৃত্যু তার অভিসম্পাতের কলঙ্ক-রেখা এঁকে দিয়েছে ওর ললাটে! সে দেখতে পাচ্ছে না—কিন্তু লালকুঁয়রের কাছে ওর ভবিষ্যৎ স্পষ্ট—প্রভাত-সূর্যের মতোই স্পষ্ট!

হিদায়ৎ কেশই বলে গিয়েছে খবরটা।

জুলফিকর খাঁ নাকি শেষ পর্যন্ত ইতস্তত করেছিলেন। কিন্তু বাদ্‌শার প্রেরিত দূত তকরাব খাঁ কোরান স্পর্শ ক'রে আশ্বাস দেন তাঁকে। অভয় এবং আশ্বাস। এতবড় শপথের পর চক্ষুলজ্জার খাতিরেও অন্তত জুলফিকর খাঁ আর সঙ্কোচ বা আশঙ্কা প্রকাশ করতে পারেন নি।

বেচারী তকরাব খাঁ! জুলফিকরের হত্যাকাণ্ডের পর নাকি তিনি পাগলের মতো হয়ে উঠেছেন। গত দুদিন তাঁর আহার নিদ্রা কিছুই নেই—একটু জল পর্যন্ত মুখে দেন নি তিনি। তাঁর মনে হচ্ছে যে, যে হাতে কোরান স্পর্শ ক'রে তিনি মিথ্যা শপথ করেছেন, সেই হাত তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে। তাঁর আর পরিত্রাণ নেই। ইহজন্মে তো নয়ই—পরজন্মেও আল্লার দরবারে এতটুকু করুণা পাবার পথ আর রইল না।

তকরাব খাঁ জানেন না—হয়তো কোনদিনই জানতে পারবেন না যে—তিনি মিথ্যা শপথ করেন নি! জানতে পারবেন না এই জন্যে যে, বাদ্‌শার মর্জির কৈফিয়ৎ নেবার অধিকার কারও নেই। তবু তো তিনি—জুলফিকর খাঁকে আনতে যাবার আগে, বলতে গেলে চরম ধৃষ্টতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিলেন বাদ্‌শাকে, 'সম্রাট কি আসাদ খাঁয়ের মৃত্যু চান?'

বাদ্‌শা উত্তর দিয়েছিলেন, 'নিশ্চয়ই না। তাঁরা সম্মানিত ব্যক্তি। আমার আত্মীয়ের মতো। সসম্মানে নিয়ে এস তাঁদের। ব'লো যে কোন ভয় নেই। তাঁদের সম্বন্ধে আমার এতটুকু আর বিরূপতা নেই মনের মধ্যে।'

বাদ্‌শাও তখন আন্তরিক ভাবেই বলেছিলেন কথাটা। তবু অত নিঃসন্দেহে বলা উচিত হয় নি তাঁর—এটাও ঠিক। কারণ তিনি ঠিক নিজের মর্জির ওপর নির্ভর করেন নি এ ব্যাপারে। তাঁর বাপের পিসী মহামান্য বাদ্‌শা-বেগমের কাছে মত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তিনি হয়তো মনে করেছিলেন জিন্নত-উন্নিশা তাঁর বাবার স্নেহভাজন ও বড় ভাইয়ের শ্রদ্ধাভাজন আসাদ খাঁ বা তাঁর ছেলেকে ক্ষমা করবারই পরামর্শ দেবেন।

কিন্তু কার্যত তা হয় নি।

বাদ্‌শা বেগম জুলফিকর খাঁকে বধ করারই উপদেশ দিয়েছিলেন। সে উপদেশ অবহেলা করতে পারেন নি নতুন বাদ্‌শা।

বাদ্‌শা-বেগম কেন এই উপদেশ দিয়েছিলেন—তা কেউ জানে না। বাদ্‌শাও না। কিন্তু লালকুঁয়র জানেন। অন্তত অনুমান করতে পারেন।

হিদায়ৎ বলেছে তাঁকে। অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে খবরটা দিয়েছে সে। সংবাদ সংগ্রহই পেশা তার। দুই পুরুষের পেশা। সে হ'ল শাহী দরবারের 'ওয়াকিয়া-নিগার-ই-কুল' *—'সংবাদ-সরবরাহ্-কারক'। তার আগে তার বাবাও এই কাজ করত। সুতরাং খবর নেওয়াটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। সম্ভবত ভুল হয় নি হিদায়তের।

সাংঘাতিক খবর দিয়েছে সে।

বাদ্‌শার চিঠি নিয়ে যে ব্যক্তি তাঁর পিতামহীর কাছে গিয়েছিল তার হাতে তিনি জবাব দেন নি—কথাটা ভেবে দেখতে সময় নিয়েছিলেন। চিন্তা করার পর তাঁর মতামত লিখে তিনি পাঠিয়েছিলেন তাঁরই মীর-ই-সামান্ সাদুল্লা খাঁর হাত দিয়ে।

সে চিঠি সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় দেয় নি সাদুল্লা খাঁ। আর কেউ না জানুক হিদায়ৎ কেশ জানে। চিঠি নিয়ে শাহী শিবিরে পেঁছে ওরই মধ্যে একটু নির্জন স্থান বেছে নিয়েছিল সে। সেইখানে বসে কৌশলে মোহর ভেঙ্গে আদ্যোপান্ত চিঠিটা পড়েছিল—তারপর, চিঠির যে অংশে ছিল 'না বায়াদ কুশ্‌ত্' অর্থাৎ বধ করা ঠিক হবে না—সেই অংশের 'না' শব্দটি—তীক্ষ্নধার ছুরির ডগা দিয়ে চেঁচে তুলে ফেলেছিল সাদুল্লা খাঁ। ফলে উপদেশটা দাঁড়িয়েছিল—'বায়াদ কুশ্‌ত্।' অর্থাৎ মেরে ফেলাই উচিত।

সাদুল্লা খাঁ খুবই নির্জনে বসে এ কাজ করেছিল। সে ভেবেছিল যে কেউ জানতে পারবে না তার জালিয়াতির কথা। বাদ্‌শার কাজের কৈফিয়ৎ চাওয়ার ধৃষ্টতা কারুর হবে না—সম্ভবত বাদ্‌শা-বেগমেরও না! তাছাড়া নানা ঘটনার আবর্তে হতভাগ্য জুলফিকর খাঁর মৃত্যুটা মানুষের মনে হয়তো চাপা পড়েই যাবে।

সে নিশ্চিন্ত হয়ে সেই জাল চিঠি বাদ্‌শা ফররুখশিয়ারের হাতে তুলে দিয়েছিল।

কেউ দেখে নি ভেবে নিশ্চিন্তে ছিল সাদুল্লা খাঁ। সে ভুলে গিয়েছিল যে সব অসৎ কাজেরই সাক্ষী রাখেন ভগবান—কাউকে না কাউকে। একজন দেখেছিল ঠিকই। হিদায়ৎ কেশ দেখেছিল ঘটনাটা, আদ্যোপান্তই দেখেছিল। প্রথম থেকে সাদুল্লা খাঁর মুখভাবটা ও লক্ষ্য করেছিল। মুখভাবে চাপা উত্তেজনা আর আশঙ্কা ঢাকতে পারে নি সাদুল্লা খাঁ। সেই মুখ দেখেই নিঃশব্দে ওর পিছু নেয় হিদায়ৎ। ছুঁচোর মতোই ছায়ায় ছায়ায় তার গতিবিধি—ছুঁচোর মতোই নিঃশব্দ তার চলন। এমন কি তার নাকি নিঃশ্বাসেরও শব্দ হয় না। তাই তার উপস্থিতি একটুও টের পায় নি সাদুল্লা খাঁ।

হিদায়ৎ কেশের নাকি এও একটা বড় অস্ত্র। তার বিশ্বাস সাদুল্লা খাঁ এবার উজীর হবে। প্রধান উজীরও হ'তে পারে হয়তো। লোকটার খুব বুদ্ধি, আর খুব করিতকর্মাও। না পারে এমন কাজই নেই। ওর উন্নতি অবধারিত। আর সেই সময়—এই জালিয়াতির ইতিহাস রইল হিদায়তের হাতে—কাফেরদের ভাষায়

* বর্তমান স্টাফ রিপোর্টার বলতে যা বোঝায়।

ব্রহ্মাস্ত্র একেবারে।

তখন ওর মাথায় পা দিয়ে উঁচুতে পৌঁছতেও হিদায়তের অসুবিধা হবে না।

জুলফিকর খাঁর ওপর সাদুল্লা খাঁর রাগের কারণও একটা বলেছিল হিদায়ৎ কেশ। বাহাদুর শার উজীর মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মহব্বৎ খাঁর যখন সে পদ পাবার কোন আশা রইল না—তখন সাদুল্লা খাঁ উঠে-পড়ে লেগেছিল ঐ পদের জন্য। সেই সময় জুলফিকর খাঁও চেষ্টা করেছিলেন তাঁর বাপকে ঐ পদটা দেওয়াতে। আসলে আসাদ খাঁই তো উজীরী করে আসছেন—সেই আলমগীর বাদশার আমল থেকেই—শুধু অতি দীন অবস্থা থেকে তিনি উঠেছিলেন বলেই 'উজীর' পদবীটা তাঁকে দেওয়া হয় নি। এবার এ পদবী তাঁর পাওয়া উচিত—জুলফিকর খাঁ এই কথাটাই বাহাদুর শাকে জানিয়েছিলেন।

অবশ্য আসাদ খাঁ পদবীটা পান নি—একই পরিবারের হাতে সাম্রাজ্য-শাসনের সব ভার তুলে দেওয়াটা পছন্দ হয় নি বাহাদুর শার। কিন্তু তবু ওদের জন্যই সাদুল্লা খাঁও (তখন তিনি হিদায়ৎ-উল্লা মাত্র) সে পদবী পান নি। জুলফিকর খাঁকে চটাতে সাহস হয় নি বাদশার, তাই স্বয়ং শাহজাদা আজিম-উশ'শানকে, নামে অন্তত, উজীর-এ-আজম ক'রে সাদুল্লা খাঁকে ওয়াজারাত খাঁ উপাধি দিয়ে তাঁর অধীনে দেওয়ানের পদ দিয়েছিলেন।

সেই রাগই নাকি ভুলতে পারেন নি সাদুল্লা। সেই রাগ এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কা! জুলফিকর খাঁকে যদি নতুন বাদশা ক্ষমা করেন তো প্রধান উজীরের গদীটা এবারও তাঁর নাকের সামনে থেকে ফস্কে যাবে হয়তো। তাই পথের কাঁটাটাই চিরদিনের মতো দূর করতে চেয়েছিলেন সাদুল্লা খাঁ।

সাদুল্লা খাঁর জালিয়াতির কারণ হিদায়েৎ কেশ যাই দিক, লালকুঁয়র জানেন আসল কারণ।

লালকুঁয়রই সেই কারণ। পরোক্ষভাবে তিনিই দায়ী।

লালকুঁয়রের রূপের সুরা যাদের একেবারে উন্মাদ করেছিল—হিদায়ৎ-উল্লা খাঁও তাঁদের একজন।

হ্যাঁ—উন্মাদই হয়ে গিয়েছিল হিদায়ৎ-উল্লা খাঁ।

তখনও জাহান্দার বাদশা হন নি, শাহজাদা মুইজ-উদ্দীন মাত্র, মুলতানের শাসনকর্তা।

কী একটা মেলা উপলক্ষে শাহজাদা লাহোরে এসেছিলেন। সেই সময়েই হিদায়ৎ-উল্লা খাঁ বা ওয়াজারাত খাঁ দেখা করতে আসে শাহজাদার সঙ্গে। লালকুঁয়র সঙ্গেই ছিলেন ; ওঁকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকা অসম্ভব ছিল মুইজ-উদ্দীনের পক্ষে, তাই তিনি ওঁর সম্বন্ধে কোন পর্দাই মানতেন না। রথে অথবা হাতীতে চড়ে প্রায়ই একত্রে বেড়াতে যেতেন, এমন কি বাজারেও যেতেন মধ্যে মধ্যে —সমস্ত বাদশাহী ঐতিহ্য লঙ্ঘন ক'রে। বাদশা হবার পরও লালকুঁয়রের ধৃষ্টতা

তাঁকে ঐভাবে হাটে-বাজারে টেনে নিয়ে গেছে। আরও অসংখ্য উপায়ে বাদশাহী শালীনতা, মর্যাদাবোধ এবং আদবকায়দা ভঙ্গ করিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু সে কথা যাক্।—ওয়াজারাত খাঁর বিনয়-নম্র ব্যবহারে খুশী হয়ে মুইজ-উদ্দীন লালকুঁয়রের একখানা গান শুনে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বসলেন! সে-ই ওঁদের দু'জনের চোখে চোখে মিলল। অথবা হিদায়ৎ-উল্লারই চোখে পড়ল জ্বলন্ত শিখার মতো একটি নারী-লাবণ্য। লালকুঁয়র শুধু ভাল নর্তকীই ছিলেন না, সুগায়িকাও ছিলেন। কিন্তু গান কী শুনেছিল তা ওয়াজারাত খাঁ আজও জানে না। সে অবাক হয়ে দেখেছিল, শুধুই দেখেছিল। তারপর সে মজলিশ থেকে বেরিয়ে এসেছিল মোহাচ্ছন্ন অভিভূতের মতোই। এমন কি বেরিয়ে আসবার সময় বাদ্শাজাদাকে কুর্নিশ করবার কথাও ভুলে গিয়েছিল সে। অবশ্য মুইজ-উদ্দীন তাতে রাগ করেন নি। তাঁর প্রিয়তমাকে দেখে ও তার গান শুনে বেচারীর মাথা ঘুরে গেছে—এই ভেবে বরং আনন্দই পেয়েছিলেন খুব। হা-হা ক'রে হেসেছিলেন অনেকক্ষণ ধরে। লালকুঁয়রের চিবুকটি ধরে একটু নেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'দিলে তো বেচারীর জিন্দিগীটি নষ্ট ক'রে? যাহোক স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘর করছিল বেচারী—এখন মাথাটি এমন ঘুরিয়ে দিলে, ও কি আর কাজকর্ম ক'রে খেতে পারবে ভাবছ? বে-হোঁশ দিওয়ানা হয়ে পথে পথে ঘুরবে—তোমার নাম জপ করতে করতে!'

লালকুঁয়রও হেসেছিলেন খুব। তারপর বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, সবাই তোমার মতো কিনা! অমনি মেয়েছেলে দেখলে আর দিওয়ানা হয়ে গেল!'

'আচ্ছা দ্যাখো! বলি শুরুতেই তো মালুম পেলে!...দরবারের কায়দাই ভুলে গেল। আমার ঠাকুর্দার আমল হ'লে এখনই গর্দানা যেত।'

সত্যিই বেচারী ওয়াজারাত খাঁ যেন দিওয়ানা হয়েই গিয়েছিল।

কিন্তু এ আর একরকম।

জোর-জবরদস্তি নয়! ষড়যন্ত্র ক'রে জাহান্দারের সর্বনাশও করতে চায় নি। এমন কি প্রেম নিবেদন ক'রে লালকুঁয়রকে উত্ত্যক্ত ক'রেও তোলে নি। নীরবে একতরফাই ভালবেসে গেছে সে, নিঃশব্দে পুজো ক'রে গেছে। প্রতিদান চায় নি। শুধু চেয়েছে যতটা সম্ভব কাছে কাছে থাকতে। তাই থেকেওছে—কারণে অকারণে ছুতো ক'রে তাঁর চারপাশে ঘুরেছে অহরহ। শুধু দুটি চোখের দৃষ্টি অবিরাম তাঁর পায়ে এক মুগ্ধ হৃদয়ের কাকুতি নিবেদন করেছে। দেখেই খুশী ছিল সে, দেখে আর তাঁর হুকুম তামিল ক'রে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ খেয়ালও চরিতার্থ করতে পারলে যেন অনুগৃহীত বোধ করত সে।

লালকুঁয়র ভক্তের এই বিনম্র আচরণে খুশী হয়েছিলেন। অবশ্য খুশির বেশী কিছু নয়। যে যাই বলুক—অনেকেই অনেক কথা বলে তা তিনি জানেন, লোকে মনে করে শুধুই অর্থলোভে, শুধুই সিংহাসনের লোভে নির্বোধ জাহান্দারের ঘাড়ে চেপেছেন তিনি, তাঁকে দিয়ে বাঁদর-নাচ নাচিয়েছেন—কিন্তু আসলে তা নয়। লোভ ছিল তার—আজ কেন, কোন দিনই তিনি তা অস্বীকার করেন নি। শাহী

তাজ তাঁর পায়ে লোটাবে, তখ্‌ৎ-এ-তাউস নিয়ে তিনি ছিনিমিনি খেলবেন—এ শুধু লোভ নয়—উদগ্র কামনাই ছিল তাঁর। কিন্তু তবু—জাহান্দার শার মতো সর্বগ্রাসী সর্ববিধ্বংসী প্রচন্ড প্রেম না থাক, তাঁরও অন্তরের প্রেমের আসনটি তিনি জাহান্দার শাকেই দিয়েছিলেন, সে আসনে আর কোনদিনই কাউকে বসান নি। তার চেয়ে উচ্চ আসন হয়তো দিয়েছিলেন—সে তাঁর অহমিকাকে, কোন মানুষকে নয়। তাই ওয়াজারাত খাঁর আচরণে খুশী হয়েছিলেন বটে কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামান নি। তাঁর আত্ম-অহঙ্কার তৃপ্ত হয়েছিল ওর পূজায়—ঐ পর্যন্ত। ভক্ত যে প্রসাদও প্রার্থনা ক'রে তা তিনি একবারও ভেবে দেখেন নি।

অবশ্য ওয়াজারাত খাঁও—আজ পর্যন্ত সে স্পর্ধা প্রকাশ করে নি—এটাও ঠিক। আজ সে পুরাতন মনিবকে পুরাতন পাদুকার মতোই ত্যাগ ক'রে নতুন মনিবের পাদুকা লেহন করতে গেছে বটে কিন্তু সে তো আরও অনেকেই গেছে। আত্মরক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। নিজের এবং নিজের স্বজনের জীবন-ধন-মান রক্ষা করতে যদি সে ডুবন্ত ফুটো নৌকো ত্যাগ ক'রে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য নতুন নৌকোয় পা দিয়ে থাকে তো দোষ দেওয়া যায় না একটুও। যতদিন জাহান্দার শা একেবারে না ডুবেছেন ততদিন তো সে ত্যাগ করে নি তাঁকে!

বরং—যে উজীরীর পদ নিয়েই জুলফিকর খাঁর সঙ্গে তার মনোমালিন্য—জাহান্দার শা সিংহাসনে বসার পর স্বাভাবিক ভাবে যখন জুলফিকর খাঁ উজীরী নিলেন, তখনও সে তাঁদের ত্যাগ করে নি। সেও অনায়াসে সৈয়দদের মতো পূবের দিকে চলে যেতে পারত, পারত ফররুকখশিয়ারের পতাকাতলে গিয়ে সমবেত হ'তে। তাহ'লে আজ এমন অবিসংবাদীভাবে সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ প্রধান উজীর হয়ে বসতে পারতেন না। অন্তত শেষ পর্যন্ত ওয়াজারাত খাঁর সঙ্গে আপস রফা করতে হ'ত একটা।

তা সে করে নি।

অনায়াসেই সে ছেড়ে দিয়েছে তার বহুদিনের ঈপ্সিত পদ জুলফিকরকে। এমন কি জুলফিকর খাঁর প্রাধান্যও মেনে নিয়েছে সে সবিনয়ে। অনেকেই বিস্মিত হয়েছিল এই আচরণে কিন্তু লালকুঁয়র হন নি। তিনি জানতেন কেন সে যায় নি, কেন বিদ্রোহ করে নি। কেন সে এত পদ থাকতে বাদ্‌শার খান-ই-সামানের পদটি চেয়ে নিয়েছে।

সে শুধু লালকুঁয়রের কাছে কাছে থাকবার জন্যে।

শুধু তাঁকে নিয়ত চোখে দেখবার সুযোগের জন্যেই। নিরবে নিঃশব্দে চোখে চোখে ভক্তের অন্তরের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যটি নিবেদন করার জন্যে।

তার এই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার তপস্যায় খুশী হয়েছিলেন তার দেবী। অবশ্য সর্বশ্রেষ্ঠ ফল, পরম সিদ্ধি তাকে দিতে পারেন নি—তবে কিছু বর দিয়েছিলেন বৈকি!

হিদায়ৎ-উল্লা খাঁর শুধু উজীর হবার বাসনাই ছিল না।

শাহ্‌জাহান বাদ্‌শার বিখ্যাত উজীর সাদুল্লা খাঁর খেতাবটিও তার কাম্য ছিল।

ইতিহাসে সেও সাদুল্লা খাঁ নামে পরিচিত হবে। বহুদিন পরের ইতিহাস-পাঠকদের মনে দুই লোক এক নামে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে—এ গোপন উচ্চাশাও ছিল বোধ হয়।

তাই দেওয়ানী পাবার পর সে ঐ উপাধিটি প্রার্থনা করেছিল বাদশার কাছে। কিন্তু মুক্তহস্ত উদার বাহাদুর শা তার বেলাতেই কৃপণ হয়ে গিয়েছিলেন, সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন নি। দরখাস্তের কোণে স্বহস্তে লিখে দিয়েছিলেন—'নামে সাদুল্লা খাঁ হয়ে লাভ কি? কাজে হ'তে পারে?—সাদুল্লা খাঁ ইতিহাসে একজনই জন্মেছিলেন, সে খেতাব অত সহজ নয়। প্রার্থীকে সায়েদুল্লা খাঁ উপাধি দেওয়া গেল।'

সামান্য তফাৎ। তবু হিদায়ৎ-উল্লা খুশী হয় নি। নতুন উপাধি ব্যবহারও করে নি সে। ওয়াজারাত খাঁ নামেই স্বাক্ষর করত চিঠিপত্র ও দলিল।

তার মনের এই গোপন ক্ষতটির ইতিহাস জানতেন লালকুঁয়র। ওয়াজারাত খাঁই তার এই ক্ষোভ জানিয়েছে বহুদিন—কথা প্রসঙ্গে।

শাহী-তখ্‌ৎ করায়ত্ত হবার পর চারিদিকে যখন অবিশ্বাস্য অনুগ্রহ বর্ষণ করতে শুরু করেন লালকুঁয়র, তখন সর্বাগ্রে তাঁর এই ভক্তটিকেই মনে পড়েছিল। তাকে তার ঈপ্সিত উপাধিটি দান করেছিলেন।

হিদায়ৎ-উল্লা খাঁ উজীরী পেল না বটে—উপাধিটা পেল।

ছায়ার মতোই কাছে কাছে থাকত সাদুল্লা খাঁ—খান-সামান!*

ছোটখাটো আদেশ পালন করতে পারলে সামান্যতম খেয়াল মেটাতে পারলেও নিজেকে কৃতার্থ মনে করত সে! অনেক সময় মুখে তা প্রকাশ করতেও হ'ত না, চোখের ইঙ্গিতেই ইচ্ছা বুঝে নিয়ে কাজে পরিণত ক'রে দিত।

আর তখন খামখেয়ালের শেষও তো ছিল না।

উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন লালকুঁয়র। ক্ষমতার সুরা আকণ্ঠ পান ক'রে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়েছিলেন। মনে হয়েছিল আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপই বুঝি হাতে এসেছে। পথের ভিখারী বাদশার বাদশা হবার স্বপ্ন দেখেছিল, সে স্বপ্নও যখন মিটেছে তখন সবই মিটবে। এ সৌভাগ্যের শেষ হবে না কোনদিন। খোদা বিশেষ প্রসন্ন তাঁর ওপর—স্বয়ং খোদারই পরোয়ানা বুঝি তাঁর ললাটে। মাতাল যেমন মদের মাত্রা বাড়িয়ে যায়, তেমনি তিনিও ক্ষমতা-পরীক্ষার মাত্রা বাড়িয়েই যাচ্ছিলেন দিন দিন।

চরম হ'ল সেদিন।

হ্যাঁ—এই সেদিন, গত শ্রাবণ মাসে।

ওঁর মনে হচ্ছে বহু যুগের কথা। বহু অতীত যুগ আগের।

* খানসামা শব্দটি সম্ভবত এই থেকেই এসেছে। কিন্তু বাদশার খান-সামান বলতে বোঝাত Lord High Steward.

শাওন-ভাদোঁর † জলকেলি তখনও শুরু হয় নি—অপরাহ্নের বিশ্রামের পালা চলেছে। সামান-বুরুজে বসে আছেন বাদশা ও তাঁর প্রেয়সী। সামনে যমুনা বয়ে চলেছে। শীত বা গ্রীষ্মের নীলসলিলা ক্ষীণাঙ্গী কিশোরী নয়—আষাঢ়-শ্রাবণের গৈরিকবর্ণা পূর্ণ-যুবতী যমুনা, উদ্দাম গতিতে বয়ে চলেছে তার পথে—অসংখ্য ছোটখাটো আবর্ত সৃষ্টি করতে করতে।

অলস অপরাহ্ন—শরবৎ, তামাক আর রসিকতায় কাটছে। মদের পালা তখনও আরম্ভ হয় নি। দিবানিদ্রার পর দুজনেই বেশ প্রকৃতিস্থ। সুতরাং অপ্রকৃতিস্থতার অজুহাত দেওয়ারও উপায় নেই।

সেই খরস্রোতা নদীতেও খেয়া পারাপার চলছিল। বিরাট একটি নৌকা-বোঝাই অসংখ্য নরনারী পার হচ্ছিল সে সময়। ওপারের গাঁ থেকে এপারে এসেছিল মাল বেচতে, গম দাল সব্জী, আরও কত কী। অন্য প্রয়োজনেও এসেছিল হয়তো। এখন ফেরত-যাত্রী সব। সবারই তাড়া আছে—ওপারে পেঁছেও হয়তো বহুদূরে গ্রামে হেঁটে যেতে হবে। দু'তিন ক্রোশ বা তারও বেশী। তাড়া না করলে সন্ধ্যার আগে পেঁছতে পারবে না। পথঘাট ভালো নয়। জাঠ ডাকাতদের অত্যাচারে অল্প দু-চার সিক্কা টাকা নিয়েও সন্ধ্যার পর চলাফেরা করা নিরাপদ নয় ওপারে।

তাই নৌকাটিতে যা লোক ওঠবার কথা, তার চেয়ে ঢের বেশী লোক উঠেছিল। সত্তর-আশি জনের কম নয়। নৌকা আর সামান্যই জেগে আছে জল থেকে। মনে হচ্ছে জলের ওপরই বসে আছে লোকগুলো।

তা হোক। এমনিই প্রত্যহ যায় ওরা। আর কতক্ষণেরই বা পথ। বাতাস অনুকূল—পূর্ণপালে চলেছে নৌকা, এখনই ওপারে পেঁছে দেবে। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন সবাই।

বাদশাই কথাটা তুললেন, 'দ্যাখো লোকগুলোর কাণ্ড। এতগুলো লোক চাপিয়েছে নৌকোয়, একজনও যদি এদিক ওদিক নড়াচড়া করে তো নৌকো যাবে উল্টে। আর নদীর যা অবস্থা, বর্ষার ভরা নদী—ঐ স্রোতে পড়লে আর কাউকে বাঁচতে হবে না! আচ্ছা বেঅকুফ ওরা, ইজারাদার তো পয়সার লোভে লোক তুলবেই—ওদের প্রাণের ভয় নেই?'

লালকুঁয়রও চেয়ে ছিলেন সেদিকে। হঠাৎ বাদশার কোলের কাছে হেলে পড়ে বললেন, 'আমি কখনও নৌকোডুবি দেখি নি! তুমি দেখেছ শাহান্‌শা?'

'দেখেছি বৈকি। পাঞ্জাবে ছিলুম,—ইরাবতী, শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা,—সাংঘাতিক নদী সব। কত লোক মরে ফি-বছর নৌকোডুবিতে!'

'লোকগুলো ছট্‌ফট্ করে খুব? হাঁকড়-পাঁকড় করে আর জল খায়—না?'

'হ্যাঁ—তা করে।'

'ভারি মজা লাগে দেখতে, না? আমি কখনও দেখি নি! তুমি সব জিনিস

† লালকিল্লার প্রমোদ-উদ্যান। এখানে বাদশারা শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে রাত্রি যাপন করতেন। জলকেলিও চলত।

বেশ একা একা ভোগ ক'রে নিয়েছ—আগে ভাগেই। যাও!'

কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে ফরাসির নলসুদ্ধ বাদশার হাতটা একটু নেড়ে সরিয়ে দেন ইমতিয়াজ মহল।

অপ্রতিভের মতো মুচকি মুচকি হাসেন বাদশা। বলেন, 'ভয় কি—এদের যা অবস্থা, এখানে বসে বসেই একদিন দেখবে!'

'হ্যাঁ—তাই নাকি! কবে ডুববে, হা-পিত্যেশ ক'রে বসে থাকি!'

বাদশা জবাব দিতে পারেন না।

পিছনেই ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে ছিল সাদুল্লা খাঁ। শুনেছিল সবই। দয়িতার অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর বুঝি কাঁটার মতো বিঁধেছিল বুকে!

নিঃশব্দেই সরে গিয়েছিল সে।—

পরের দিন সব আয়োজন তৈরী ছিল।

নৌকো-ভরা লোক যাবে। সে নৌকা মাঝ-নদীতে উলটে দেওয়া হবে।

ইচ্ছা ক'রেই। স্বেচ্ছায় ডোবাতে হবে। সেইরকম হুকুম দেওয়া হয়েছে ইজারাদারকে।

না হ'লে তারই শুধু গর্দান যাবে না, তার সপুরী একগাড়ে যাবে।

ডোবাতে হবে মাঝি-মাল্লাদেরই। তাদের ওপর হুকুম হয়েছে—তারা সাঁতরে পারে চলে আসবে।

কিন্তু তাদের মুখ শুকিয়ে উঠেছে। সাঁতার জানে তারা, কিন্তু শ্রাবণের এই উন্মত্ত খর-তরঙ্গিণী নদীতে সাঁতার দেওয়া! আর এখনকার এই বিপুল প্রশস্ত নদী। সে কি মানুষের সাধ্য! মৃত্যু যে নিশ্চিত! তারা বেঁকে দাঁড়াল। রাতারাতি পালাবে তারা, যেখানে হোক। জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। তারপর চলে যাবে দেহাতে কোথাও। তারা খেটে খেতে এসেছে, বেঘোরে জান দিতে আসে নি। যেখানে হোক খেটে খেতেও পারবে।

ইজারাদার চোখে অন্ধকার দেখলে। ওরা অনায়াসেই পালাতে পারে—কিন্তু সে কোথায় যাবে, ঘর-বাড়ি আত্মীয়স্বজন ছেড়ে?

সে লোকটি সারারাত ঘুমোতে পারল না। ভোরবেলাই ছুটল তার আত্মীয় মুনিম খাঁর কাছে। মুনিম খাঁ উজীরকে গিয়ে জানালেন।

তখন ঠিক তাঁর দরবারে আসবার সময়।

সেই মুখেই সংবাদটা শুনে ক্রোধে ও ঘৃণায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চলে এসেছিলেন জুলফিকর খাঁ। জুলফিকর খাঁ তখন প্রায় সর্বশক্তিমান। কাউকেই ভয় করবার তাঁর কোন কারণ ছিল না।

অবশ্য বাদশার সামনে কি করতেন তা বলা যায় না। ভাগ্যক্রমে তখনও বাদশা দরবারে দেখা দেন নি। সারারাত্রির উন্মত্ত উৎসবের পরে সুরাপানোন্মত্ত বাদশার বেশ একটু বিলম্বই হ'ত ঘুম ভেঙ্গে উঠতে। ঠিক সময়ে দরবার নেওয়া কোনদিনই হয়ে উঠত না তাঁর।

বাদ্‌শা না এলেও সভাসদদের সভায় হাজির থাকতে হ'ত। সেদিনও ছিলেন সবাই। খান-সামান সাদুল্লা খাঁও ছিল। আর সভায় ঢুকতেই তাঁর সামনে পড়ে গেল সাদুল্লা খাঁ।

জুলফিকর খাঁ রাগ সামলাতে পারেন নি। সমস্ত আদবকায়দা ভুলে প্রচণ্ড একটি চপেটাঘাত করেছিলেন সাদুল্লা খাঁকে। সবাই অবাক! অনেকেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন আসন ছেড়ে। যতই হোক—পদস্থ আমীর সাদুল্লা খাঁ—তাঁকে এমন অপমান! অনেকেরই মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে।

সাদুল্লা খাঁ যুদ্ধ-ব্যবসায়ী নয়, যোদ্ধা তো নয়ই। তবু সেও তরবারিতে হাত দিয়েছিল বৈকি।

কিন্তু চরম অবজ্ঞায় সেদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সবাইকে নিরস্ত করলেন জুলফিকর খাঁ। বললেন, 'ভাই সব, আমার অপরাধ নেবেন না। আমি যা করেছি, হঠাৎ করি নি, জেনে বুঝেই করছি।···বরং বলা চলে একে চড় মেরে একটা অন্যায় কাজ করেছি, আমার হাতেরই অপমান করেছি। এ লোকটা অমানুষ—পশু, পশুরও অধম। এ কি করেছে জানেন?'

সেই মুহূর্তে বাদশা এসে পড়েছিলেন।

কথাটা তখনকার মতো স্থগিত রেখে সবাই অভিবাদনে নত হয়ে দাঁড়িয়েছিল—তবু সকলকার চোখে-মুখের উত্তেজনা বাদ্‌শার চোখ এড়ায় নি। তিনি আসনে বসেই কারণ জানতে চেয়েছিলেন সে উত্তেজনার।

জুলফিকর খাঁ সাদুল্লাকে কিছু বলবার অবকাশ দেন নি। নিজেই এগিয়ে এসে অভিবাদন ক'রে বলেছিলেন, 'শাহান্‌শা, আমি এই লোকটাকে চড় মেরেছি।'

'সে কি? আমার খান-সামানকে? কেন? কী আশ্চর্য! এ আপনার কি মতিগতি?' বাদ্‌শা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

'শুনুন জনাবালি, কাল নাকি আপনার সামনে মাননীয়া ইমতিয়াজ মহল কি লঘু আলাপপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তিনি কখনও নৌকোডুবি দেখেন নি। হঠাৎ নৌকোডুবি হ'লে লোকগুলো কেমন হাঁক-পাঁক করতে করতে মরে—সেই বিষয়ে অলস কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন। সেইখানে ছিল ঐ ইতরটা, সে কথা শুনে তাঁর মনোরঞ্জন ক'রে ইহকালে নিজের কিছু সুবিধা ক'রে নেওয়ার জন্য ঐ লোকটা কি করেছে জানেন? খেয়াঘাটের ইজারাদারকে হুকুম দিয়েছে যে আজ বিকেলে আপনারা যখন সামান-বুরুজে বসে থাকবেন তখন এক নৌকো-যাত্রীসুদ্ধ মাঝ-দরিয়ায় নৌকো ডুবোতে হবে।···দু'চারজন হ'লে চলবে না, নৌকো-ভরা লোক থাকা চাই, অন্তত সত্তর-আশিজন!'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে যে অস্ফুট গুঞ্জন উঠেছিল তার মধ্যেকার ধিক্কারের সুরটুকু কান এড়ায় নি বাদ্‌শার। তাই প্রেয়সীর খুশিভরা মুখের কথা চিন্তা ক'রেও এতবড় অন্যায়ে সায় দিতে পারেন নি তিনি। ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলেন, 'না, এটা তোমার একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যাচ্ছিল সাদুল্লা খাঁ। মাননীয়া বেগম সাহেবা ওটা—কী বলে এমনিই

বলেছিলেন, তুমি এই কাণ্ড করেছ শুনলে তিনি খুশী হতেন না নিশ্চয়।…যাক্ গে যাক্, আপনিও কাজটা ভাল করেন নি উজীর সাহেব। সাদুল্লা খাঁ মানী ব্যক্তি—এমন ভাবে প্রকাশ্যে অপদস্থ করাটা ঠিক হয় নি। যাক্ এখন আপনারা ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন।…সাদুল্লা, উজীর সাহেব তাঁর কাজের জন্য খুবই অনুতপ্ত। তিনি ক্ষমা প্রার্থনাই করছেন। তুমিও কিছু মনে রেখো না।'

অগত্যা জুলফিকর খাঁকেও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছিল। লোক-দেখানো ক্ষমাও করতে হয়েছিল সাদুল্লা খাঁকে। দুজনে আলিঙ্গনও করেছিলেন দুজনকে শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু সে অপমান কি সত্যিই ক্ষমা করেছিল সাদুল্লা খাঁ!

নিশ্চয় করে নি। আর সেইদিনের সেই ঘটনার ফল স্বরূপই জুলফিকর খাঁকে আজ প্রাণ হারাতে হ'ল। ইতিহাস না জানুক—লালকুঁয়র জানেন—একথা!

জুলফিকর খাঁ!

অকস্মাৎ যেন শিউরে উঠলেন লালকুঁয়র, কথাটা মনে পড়ে গিয়ে। একটা অস্ফুট আর্তস্বরও বেরিয়ে এল তাঁর গলা চিরে।

'কী হ'ল?' গাড়োয়ান ভয় পেয়ে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে।

রক্ষীরাও কাছে এগিয়ে আসে।

'কী হয়েছে, বাই-সাহেবা?'

ভাগ্যিস বোরখায় ঢাকা ছিল মুখ, নইলে সে মুখের পাংশু বিবর্ণতা দেখলে ওরা হয়তো আরও ভয় পেত।

কোনমতে কষ্টে উচ্চারণ করলেন কথা ক'টা, 'আমরা, আমরা কোন্ দরওয়াজা দিয়ে বেরুব এখান থেকে? দিল্লী-দরওয়াজা নয় তো?'

'না, না।' তাড়াতাড়ি আশ্বস্ত করে গাড়োয়ান, 'আমরা তো লাহোরী দরওয়াজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছি! কিলা থেকে বেরিয়ে এসেছি অনেকক্ষণ।'

তাও তো বটে।

বহুক্ষণই তো প্রাসাদ-দুর্গ ছেড়ে চলে এসেছেন তাঁরা—তাঁরই তো ভুল!

আশ্বাস পেলেন বটে, কিন্তু সান্ত্বনা পেলেন না।

চোখ ফেটে হু-হু ক'রে জল বেরিয়ে এল এবার।

শাহান্‌শাহ বাদ্‌শা, রাজাধিরাজ স্বামী তাঁর। সুন্দর সুপুরুষ, দুনিয়ার মালিক।

ওঁকে মেরেও তাদের আশ মেটে নি। তাঁর বাহুবন্ধনের মধ্যে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁরই চোখের সামনে গলা টিপে হত্যা করেছে। তবুও বুঝি প্রাণ বেরোয় নি—তৈমুরের রক্ত, জেঙ্গিজ খাঁর রক্ত মিশেছে ওঁদের ধমনীতে, অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে জন্মান ওঁরা, সহজে ওঁদের প্রাণ বেরোয় না। তাই, তাই—অয় খোদা—শেষ পর্যন্ত জুতোসুদ্ধ, লোহার-নাল বাঁধানো নাগরা-জুতো পরা পায়ে,

পেটেরও নিচে—লাথি মেরে মেরে মেরেছে ওঁকে—বান্দার বান্দা পথের কুকুর কতকগুলো !

তবুও মরতে পারে নি হতভাগী। সে দৃশ্য দেখেও পাথরে মাথা কুটে মরবার মতো সৎসাহস জাগে নি ওঁর। এত প্রাণের মায়া !···

আর ওদেরও আশ মেটে নি।

রাজ্যেশ্বরের মুণ্ডহীন কবন্ধ হাতীর লেজে বেঁধে মিছিলের আগে আগে নিয়ে ঘুরেছেন নতুন বাদ্‌শা ফর্‌রুখশিয়ার।

ওরে মূঢ়, ওরে নির্বোধ, তোরই কৃতকর্মের মধ্যে থেকে শিক্ষা নিতে পারলি না? বাদ্‌শাহীর এই পরিণাম, রাজশক্তির এই অসহায় অবস্থা চোখে দেখেও সেই বাদ্‌শাহীর আনন্দে এবং গর্বে বুক ফুলিয়ে মিছিল ক'রে বেড়াতে ইচ্ছা হ'ল।

আসবে, ওরও পুরস্কার আসবে খোদার কাছ থেকে !

তা লালকুঁয়র জানেন। আরও সাংঘাতিক, আরও শোচনীয়। আরও অপমানকর কোনও পরিণতি ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

নতুন বাদ্‌শার পরিণাম—সে তো স্পষ্ট রক্তের অক্ষরে লেখা রয়েছে ঐ বালির ওপর—ঐ দিল্লী-দরওয়াজার সামনে, যেখানে জাহান্দার শা আর জুলফিকর খাঁর দলিত পিষ্ট খণ্ড-বিখণ্ড শবদেহে পড়ে আছে অবহেলায়—শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য হয়ে—

সবাই পড়েছে হয়তো সে লিপি—অন্ধ ঐ নতুন বাদ্‌শা ছাড়া।

হায় মূঢ়, সম্মান পাবার লোভ আছে, কিন্তু সে সম্মানের মূল্য জানো না? নিজের জ্যেষ্ঠতাত এবং বাদশা—তাঁর মৃতদেহটা সমাধি দেবার সহজ সৌজন্যটুকুও মনে পড়ল না?

ক্ষোভ নয়, উষ্মা নয়—ফর্‌রুখশিয়ারের জন্য অনুকম্পাই বোধ করছেন লালকুঁয়র।

গাড়ি কখন চলছে এবং কখন থামছে—লালকুঁয়র তার খবরও রাখেন নি। খাওয়া? না, তাঁর খাওয়ার দরকার হয় নি। শুধু জল একটু একটু চেয়ে খেয়েছেন মধ্যে মধ্যে।

কোথায় যাচ্ছেন তা তিনি জানেন।

সোহাগপুরা !

পুড়ে-নিঃশেষ-হয়ে-যাওয়া তুবড়ির খোলাগুলিকে যেমন ঝাঁট দিয়ে একটা ঝুড়িতে তুলে রাখা হয়, কোন এক অবসর সময়ে বাইরের মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার অপেক্ষায়—তেমনি ঐ 'বেওয়াখানা'তেও বাদ্‌শার হারেমের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা গিয়ে বাসা বাঁধেন একে একে, চরম ডাক পড়ার দিনটির অপেক্ষায়। তাঁরাও মাটিতে যাবার জন্যেই বসে থাকেন ওখানে—জীবনের বাকী ক'টা দিন, যতদিন না আল্লার করুণা মৃত্যুরূপে মুক্তির মধ্য দিয়ে নেমে আসে। সামান্য কিছু কিছু খাদ্য আর মাসিক হাত খরচা—এই বরাদ্দ, আর মাথা গোঁজার মতো একখানা ঘর।

সেটুকুও যে জোটে তা-ই ভালো।

নইলে হয়তো আজ হাত পেতে ভিক্ষাই করতে হ'ত।

বাদ্‌শার ঘরণীরা অনেকেই আছেন সেখানে। বিবাহিতা স্ত্রী বেশির ভাগই। সেখানে লালকুঁয়রের থাকার ব্যবস্থা—একটা বিশেষ অনুগ্রহই বলতে হবে।

মনে আছে প্রথম যখন এই জায়গাটির নাম শুনেছিলেন—তখন শুধু একটু কৌতুকই অনুভব করেছিলেন। কথাটা কী প্রসঙ্গে উঠেছিল তাও মনে আছে। আজিম-উশ-শানের পতনের পর—তাঁর হারেমের কী হ'ল, তারা কোথায় গেল—অলস কৌতূহলে প্রশ্ন করেছিলেন লালকুঁয়র। তার জবাবে সদা-বিনত ওয়াজারাত খাঁ জানিয়েছিলেন, 'তাঁদের প্রায় সকলকেই সোহাগপুরায় পাঠানো হয়েছে। শুধু তাঁদের কেন—জাহান শা, রফি-উশ-শান—এঁদের হারেমও বেশির ভাগই ঐখানে পাচার করা হয়েছে।'

সোহাগপুরা! সেটা আবার কি?' বঙ্কিম-ভ্রূ ঈষৎ বাঁকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন লালকুঁয়র।

'আজ্ঞে—বেওয়া-মহল। মানে লালকিলায় তো অত জায়গা হয় না। কতকগুলো অনাথা বেওয়া মেয়েছেলে রেখেই বা লাভ কি? ঝগড়া করবে আর ষড়যন্ত্র করবে বৈ তো নয়। সে কিচিকিচি কি ভাল? তাই শাহ্‌জাহান বাদ্‌শার আমল থেকেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামান্য কিছু খোরাকী দেওয়া হয়, তাইতেই তাদের বাকী দিন কটা চলে যায়।'

খুব খানিকটা হেসেছিলেন লালকুঁয়র। আশ্চর্য! তখন কিন্তু একবারও একথাটা মনে আসে নি—কল্পনার সুদূরতম সম্ভাবনাতেও—যে একদা হয়তো তাঁর ভাগ্যেও ঐ পরিণাম অপেক্ষা করছে!

সোহাগপুরা! বেশ নামটি। কী চরম অপমানই না মিশে আছে ঐ নামটিতে, কী মর্মান্তিক বিদ্রূপ। কোন্ হৃদয়হীন পিশাচ এ নাম দিয়েছিল কে জানে!

অথবা—যা সত্যকার সোহাগ, যার ক্ষয় বা রূপান্তর নেই—সেই আল্লার সোহাগের জন্য তপস্যা করার সুযোগ মেলে ওখানে, এই ইঙ্গিতই লুকিয়ে আছে ঐ নামটিতে। কে জানে!···

লালকুঁয়র তা জানেন না, এত মাথা ঘামাতেও রাজী নন। জীবন ফুরিয়ে গেছে তাঁর, আছে শুধু প্রাণ। সেইটুকুও নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, যেখানে হোক এক জায়গায় বসে। সেখানকার নাম কি তা ভেবে লাভ নেই। সামনে পিছনে, ডাইনে বামে যতদূর দৃষ্টি যায়, ধু ধু করছে সবটা—মরুভূমির বালির মতোই ধূসর পাণ্ডুর তাঁর ভাগ্য। ঐ যে বালির ওপর পড়ে আছে শাহান্‌শার প্রাণহীন মৃতদেহটা—ঐ বালির মতোই।

অবসন্ন, ক্লান্ত চোখে চেয়ে আছেন লালকুঁয়র বাইরের প্রকৃতির দিকে। শীতজর্জর রাত্রি নেমেছে দু'দিকের দিগন্তজোড়া মাঠে। অন্ধকারে একাকার

হয়ে গেছে মাঠ ঘাঠ সব। বহুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার গাড়ি ছেড়েছে—আরও খানিকটা চলে কোন্ এক সরাইতে গিয়ে থামবে তারা বাকী রাতটুকুর মতো। রক্ষীদের তাড়া আছে দিল্লী ফিরে যাবার। সেখানে নতুন বাদ্শা—নতুন সরকার। মুঠো মুঠো টাকা উড়ছে সেখানের বাতাসে। এই 'মুর্দা' আগলে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানোতে রুচি নেই তাদের।

লালকুঁয়র কিছুই বলেন নি।

চলা আর থামা দুই-ই তাঁর কাছে আজ সমান। অবসাদ ক্লান্তি সব যেন অর্থহীন হয়ে পড়েছে। ঘুম নেই চোখে। ঘুম আসবে না আরও বহুকাল। ঘুমোতে সাহসও হয় না, যদি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেন—আর স্বপ্নে সেইসব সাংঘাতিক দৃশ্য দেখতে হয়! তার চেয়ে বাকী সারা জীবনটা জেগে কাটানোও ভালো যে।

হঠাৎ একসময় চোখে পড়ল—দূরে একটা আলো জ্বলছে।

এটা কি সেই গ্রাম? গাজীমণ্ডী? সেই আলো?

আজও কি সেই দম্পতি তেমনি ব'সে দশ-পঁচিশ খেলছে?

সেই চরম দুর্দিনের আগের দিনটি—দিল্লী পৌঁছবার আগের দিন রাত্রে এমনি এক বয়েলগাড়ি ক'রে যাচ্ছিলেন ওঁরা, হয়তো এই পথ দিয়েই, কে জানে! এমনি দূরের একটা আলো দেখে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বস্ত সেবক মহম্মদ মিয়া ছিল সঙ্গে—সে রাজী হয় নি থামতে, কিন্তু বাদ্শার পিপাসা পেয়েছিল এই অজুহাতে তাকে সম্মত করেছিলেন শাহান্‌শাহ্। আসলে—কথাটা মনে পড়তেই দুই চোখ জ্বালা ক'রে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ল আজও—একভাবে বসে বসে লালকুঁয়রের—তাঁর প্রিয়তমার পিঠ ব্যথা করছিল ব'লেই পিপাসার কথাটা তুলেছিলেন বাদ্শা, নইলে ক্ষুৎ-পিপাসা দমন করতে তৈমুর-বংশীয়েরা ভালরকমই জানেন। লালকুঁয়রের অসুবিধার কথা তুললে মহম্মদ মিয়া গাড়ি থামাতে দিত না—কিন্তু ওঁর সামান্য অসুবিধাও যে শাহান্‌শাহের কাছে অসহ্য!—তাই ঐ অভিনয়টুকু করতে হয়েছিল।

হায় রে নাচওয়ালী! এই ভালবাসা পাবার এতটুকু যোগ্যতাও যদি তোর থাকত!

অকস্মাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে লালকুঁয়র সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন গাড়োয়ানকে, 'তুমি এ অঞ্চলটা চেনো? ঐ-যে দূরে আলো দেখা যাচ্ছে—ওখানে কি কোন গ্রাম আছে?'

'জী, মালেকান!...আমার বাড়িই এদিকে। যতদূর মনে হচ্ছে ওটা গাজীমণ্ডী।'

'গাজীমণ্ডী'!

সেদিন অপমানাহত হয়ে চলে যাবার সময়ও—বোধ করি সে অপমান এক বিচিত্র জ্বালা ও অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল বলেই—ওদের কথা ভোলেন নি,

মহম্মদ মিয়াকে বলে গ্রামের নামটা সংগ্রহ করেছিলেন।

হ্যাঁ ঠিকই মনে আছে—গাজীমণ্ডী।

লালকুঁয়র যেন অস্থির হয়ে পড়লেন। নিশ্চয়ই সেই আলো···সেই ছেলেটি আর তার সেই বৌ। ছেলেমেয়ে দুটি সারারাত জেগে আজও হয়তো দশ-পঁচিশ খেলছে। কে কোথায় বাদশা হ'ল আর কে কোথায় মারা গেল—কার বাদশাহী কবে ফুরোল এবং কার বাদশাহীর শুরু হ'ল, কিছুরই ধার ধারে না ওরা। কারুর তোয়াক্কা রাখে না। নিজেদের নিয়েই নিজেরা মশগুল। ঘরে পুরো বছরের খোরাকও থাকে না, সম্বলের মধ্যে একটি গোরু। তবু কী আনন্দে থাকে! ঐ আনন্দের একটুও যদি পেতেন তিনি!

মিনতির সুর ফুটে ওঠে লালকুঁয়রের কণ্ঠে, 'গাড়িওয়ালা, ঐ গাঁয়ে একবার একটু নামবে? ঐ যে আলোটা যেখানে জ্বলছে?···ওরা আমার জান-পছানা লোক। ওখানে একটু জল খেয়ে নিতাম।'

গাড়োয়ান ইতস্তত ক'রে বললে, আমি তো থামতেই পারি মালেকা, বয়েল দুটোকে একটু জল খাওয়াতে পারলে ভালোই হ'ত। কিন্তু সিপাহীজীরা নারাজ হবেন না তো?'

লালকুঁয়র আরও মিনতি করেন। খুব চুপি চুপি বলেন, 'তুমি একটু বুঝিয়ে বলো না। বলো যে, নইলে বলদ আর চলতে পারছে না। আমি তোমাকে বকশিশ দেব আলাদা।'

তবু গাড়োয়ানের দ্বিধা কাটে না, 'দেখবেন মালেকা, আমি কোন ফ্যাসাদে পড়ব না তো?'

'না না। আমি তোমাকে জবান দিচ্ছি, খোদা কসম।'

হায় রে! ফ্যাসাদ বাধাবার মতো এতটুকু ক্ষমতাও যদি কোথাও অবশিষ্ট থাকত!

গাড়োয়ান অগত্যা রক্ষীদের ডেকে থামার প্রস্তাব করল। সামান্য একটু তকরারও লাগল বৈকি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা যেন অল্পেই রাজী হয়ে গেল; হয়তো ওদেরও একটু বিশ্রাম দরকার হয়ে পড়েছিল। তার ফলে একসময় 'বহল'-খানা প্রশস্ত রাজপথ ছেড়ে মাঠ ধরল।

আগ্রহে অধীর হয়ে উঠলেন লালকুঁয়র।

কেমন আছে ওরা কে জানে! হয়তো তেমনিই আছে।

তিনিই না ওদের কোনও বিপদে ফেলেন শেষ পর্যন্ত! সশস্ত্র রক্ষী দুজন সঙ্গে আছে। মেয়েটিও অপূর্ব সুন্দরী।

দুর্ভাগ্যের মজাই হচ্ছে এই। অভাগা শুধু নিজেই জ্বলে না, আরও বহু লোককে জ্বালায়। যেখানেই যায়—নিজের গায়ের আগুন চারিদিকে লাগিয়ে বেড়ায় সে।

কিন্তু ভগবান বুঝি শেষ পর্যন্ত মুখ তুলে চাইলেন।

রক্ষীদের একজন একটু কেশে গলা সাফ ক'রে এগিয়ে এল গাড়ির কাছে।

'বেগমসাহেবা!' কণ্ঠে কেন প্রার্থনারই সুর ওর। এখনও তার কাছে কারও কিছু প্রার্থনার আছে নাকি?

'বলো, ইরাদৎ খাঁ।'

'ইয়াসিন বলছিল, এখানে নাকি খুব ভালো শরাব পাওয়া যায়। বড্ড জাড়াও পড়েছে। যদি কিছু মেহেরবানি হ'ত আপনার—'

তাঁর মেহেরবানি? তার সঙ্গে—

ও হো, ওরা টাকা চাইছে কিছু।

কামিজের জেবে হাত ঢুকিয়ে একটা সোনারই টাকা বার করলেন লালকুঁয়র।

'কিন্তু তোমাদের আবার কোথায় পাবো? মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকবে কোথায়—'

'তাই কখনও পারি? দু'দণ্ডের মধ্যেই আমরা এসে এই বড় বটগাছটার তলায় হাজির হবো। তারপর আপনার মর্জি, যখন খুশি আসবেন আপনি।'

অস্ফুট কণ্ঠে অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দেন লালকুঁয়র। বহুদিন পরে ধন্যবাদ দেওয়ার মতো একটা কারণ পাওয়া গেল।···

আলোটা ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসে।

সত্যিই কি ঐ আলোটা ওদেরই?

কী যেন নাম ওদের?

মনে পড়েছে। সেবার গাড়িতে ওঠবার পর গাড়োয়ান জানিয়েছিল। তাঁর খেয়াল হয় নি কিন্তু সে জেনে নিয়েছিল ওদের নাম। হাসতে হাসতেই বলেছিল সে। ঝব্বু বুঝি ছেলেটার নাম। আর ওর বৌ-এর—? হ্যাঁ, হ্যাঁ—গুল্লু।

গুল্লু। তা গোলাপের মতোই সুন্দর গুল্লু। কে ওর এমন নাম রেখেছিল কে জানে, হয়তো কোন কবিই হবে।

ওর রূপ দেখে সে-রাত্রে লালকুঁয়র—বাদশার পেয়ারের বেগম ইমতিয়াজ-মহল—যেন অনুগ্রহ ক'রেই ওকে বাদশার হারেমে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, সেদিন গুল্লুও তার জবাব দিয়েছিল মুখের মতো। বলেছিল, এক রাজার মেয়ে কিংবা নাচওয়ালী ছাড়া হারেমে কারও যাওয়া উচিত নয়।···তবু চৈতন্য হয় নি ইমতিয়াজ-মহলের। নিজের গলার বহুমূল্য মুক্তার মালা দিতে চেয়েছিলেন ওদের; সে মালাও সমান তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করেছিল গুল্লু।

আজ বুঝেছেন যে ওরাই বুদ্ধিমান।

ওরা ঢের বেশী সুখী। সত্যকার ঐশ্বর্য—সুখ বা শান্তি—বাদশার প্রাসাদে নেই। আছে ওদেরই কাছে।···

আজও 'বহল'-এর আওয়াজ পেয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ঝব্বু আর গুল্লু। মুখে ওদের আজও তেমনি উদ্বেগ আশঙ্কা।

লালকুঁয়র ব্যাপারটা আন্দাজ ক'রেই, তাড়াতাড়ি বোরখাটা খুলে ফেললেন। ম্লান চেরাগের আলো—তবু গুল্লুর চিনতে অসুবিধা হ'ল না। আশ্বাসের ও অভ্যর্থনার হাসিই ফুটে উঠল তার মুখে।

'আসুন, আসুন! ইস্‌ এ কী চেহারা আপনার ক দিনেই? কোন বেমারীতে পড়েছিলেন কী? আপনার খসম কোথায়?'—

লালকুঁয়র ম্লান হাসলেন একটু। কথাটা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যেই পাল্‌টা প্রশ্ন করলেন, তোমার শাস্‌ কোথায়? ঘুমুচ্ছে আজও?…তোমরা কি করছিলে—দশ-পঁচিশ খেলছিলে বুঝি তেমনি?'

লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে গুল্লু। অপ্রতিভ ভাবে হেসে বলে, 'তা আজ তেমন রাতও হয় নি। আমাদের তো খাওয়াই হয় নি এখনও…ভালোই হয়েছে—সেদিন আপনাকে কিছু খেতে দিতে পারি নি, আজ রুটি তৈরি আছে। বেজোরের রুটি আর ঠেঁটির চাট্‌নি। পিঁয়াজও বোধ হয় দু'চারটে আছে ঘরে।'

গাড়োয়ান বয়েল খুলছিল পিছনে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ সে ব'লে উঠল, 'কাকে কি বলছ, মুলুকী বহন? ওঁকে চেন?' তারপর ব্যাকুল লালকুঁয়র কোনরকম বাধা দেবার আগেই ব'লে শেষ ক'রে দিল, 'উনি হলেন মালেকা-ই-জমান ইমতিয়াজ-মহল বেগম-সাহেবা—! উনি তোমার বেজোরের রুটি আর ঠেঁটির চাট্‌নি খাবেন?'

গুল্লুর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল নিমেষে। বিস্ময় বিস্ফারিত ওর দুটি চোখে ফুটে উঠল এক অবর্ণনীয় বিহ্বলতা। আর ঝব্বু যেন পা টিপে টিপে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

লালকুঁয়র এগিয়ে যাচ্ছিলেন গুল্লুকে জড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিতে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আবেগ দমন করলেন তিনি। মালেকা-ই জমান তো উপহাস! ইমতিয়াজ-মহলের আসল পরিচয় পেলে ওরা হয়তো ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে।

লালকুঁয়র—পথের নাচওয়ালী।

দুনিয়ার মালিককে—শাহান্‌শাকে যে এই পাঁকে নামিয়ে এনেছে, কোটি কোটি প্রজার জীবন নিয়ে যে খেলেছে ছিনিমিনি—এতবড় সাম্রাজ্যকে ঠেলে দিয়েছে জাহান্নমে—তার মতো ঘৃণার পাত্রী আছে! তিনি জানেন, আজ থেকে বহুকাল অবধি, হয়তো বা অনন্তকাল, মানুষ তাঁর নাম স্মরণ ক'রে অভিসম্পাত বর্ষণ করবে!

মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন ইমতিয়াজ-মহল।

অনেকক্ষণ সময় লাগল গুল্লুর নিজেকে সামলে নিতে।

তারপর সে যেন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে শুষ্ককণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'বে—বেগম সাহেবা? মালেকা-ই-জামান্‌। আমাদের মাফ করবেন, অত না বুঝেই বলেছি—'

ইমতিয়াজ-মহল চোখ তুললেন, দুই চোখে তাঁর এবার ভাদ্রের বন্যা নেমেছে। গাঢ় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু আমার যে বড়ই ভুখ লেগেছে বহন! আমাকে খেতে দেবে না কিছু?'

গুল্লুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, 'খাবার তো রয়েছে, মালেকান্‌, কিন্তু

সে যে আমাদের ঘরে-ভাঙা চোখড়সুদ্ধ আটার রুটি, সে তো আপনি খেতে পারবেন না ! অবশ্য ঘিউ আছে ঘরে—'

'খুব পারব, বহন। তুমি এখনই দাও। আজ ক'দিন কালো পোড়া রুটি ছাড়া আর কিছুই যে জোটেনি। কাল থেকে তাও পেটে পড়ে নি।'

ঝব্বু এগিয়ে এসে একরকম ধাক্কা দিয়েই গুল্লুকে সক্রিয় ক'রে তুলল, 'তুই যা দিকি, খাবার সাজিয়ে দে। গাড়িবান ভাইয়াকেও দিস্ এক সানকি। কিন্তু—'

এবার তার মুখেও বিপন্ন ভাব ফুটে ওঠে, 'বসতে দেব কোথায় ? ঐ চারপাইটায় কি বসতে পারবেন ?'

সে ছুটে গিয়ে খেজুরপাতার অদ্বিতীয় চাটাইখানা পেতে দেয় তার ওপর। তারপর ছুটে চলে যায় কুয়া থেকে জল তুলতে।

লালকুঁয়র শ্রান্তভাবে বসে পড়েন চারপাইটাতেই। এতক্ষণ কোন ক্লান্তি, কোন শারীরিক ক্লেশের বোধ ছিল না— কিন্তু এবার যেন পা ভেঙে আসছে।

একটা পেতলের থালা ক'রে খানকতেক মোটা মোটা ঘি-মাখানো রুটি আর তার ওপর পলাশপাতায় খানিকটা চাটনি, পিঁয়াজ-কুঁচি, নুন আর লংকা এনে গুল্লু তাঁর সামনে নামিয়ে রাখল। ঝব্বু ততক্ষণ বড় একটা লোটা ভরে জল নিয়ে এসেছে।

আঃ ! ঠাণ্ডা কনকনে জল মুখে মাথায় অনেকক্ষণ ধরে থাব্ড়ে থাব্ড়ে দিলেন লালকুঁয়র। খেলেনও খানিকটা। খালি পেটে ঠাণ্ডা জল পড়ে যন্ত্রণায় পেটটা কুঁচ্কে কুঁচকে উঠতে লাগল কিন্তু উপায় কি, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে ছিল, সে গলা দিয়ে শুক্নো রুটি নামত না।

খেতে খেতে খেয়াল হ'ল লালকুঁয়রের।

'কিন্তু তোমাদের তৈরী রুটি তো আমরা খেলাম, তার পর ?'

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল গুল্লু। তার তখন ভয় অনেকটাই ভেঙে গেছে। সে হেসে বললে, 'বেশ লোক তো আপনি ! খেয়েদেয়ে এখন খবর নিচ্ছেন ? ভয় নেই—আমাদের অনেক ছাতু ভাঙা আছে ঘরে, তাল ক'রে মাখব আর দুজনে নুন লংকা আচার দিয়ে খাবো তোফা।'

ঝব্বু পেছনে দাঁড়িয়ে হাত কচ্লাচ্ছিল—সে এবার প্রশ্ন না ক'রে থাকতে পারল না। বলল, 'কিন্তু এভাবে একা কোথায় যাচ্ছেন, হজরৎ বেগম-সাহেবা ?'

মুহূর্তকাল পাথরের মতো বসে রইলেন লালকুঁয়র। তারপর বললেন, 'সোহাগপুরা।'

'সোহাগপুরা !' সবিস্ময়ে ব'লে উঠল ঝব্বু, তারপর—সতর্ক হবার কোন প্রয়োজন আছে কিনা বোঝবার আগেই—তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'বেওয়া-মহল ?'

মাথা হেঁট ক'রে রুটি চিবোতে লাগলেন লালকুঁয়র।

গুলুর এতক্ষণে খেয়াল হ'ল। সে কেমন একটু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, 'আচ্ছা সে-রাত্রে আপনার সঙ্গে যিনি ছিলেন—তিনি, মানে তিনিই কি—?'

'হ্যাঁ গুলু বোনটি, তিনিই তোমাদের বাদশা ছিলেন তখনও পর্যন্ত। বাদশাকেই জল খাইয়েছিলে সেদিন।'

'ছিলেন মানে—? তিনি আর নেই বাদশা?'

'কেন, তোমরা শোন নি কিছু?'

'আমরা আর কি শুনব মালেকান্? লড়াই চলছে খুব জোর—এই শুনেছি। দিনরাত ভয়ে ভয়ে থাকি। আর কি শুনব?'

'বাদশা জাহান্দার শা—মানে, আমার মালিক—আর বাদশা নেই। ফররুখশিয়ার এখন নতুন বাদশা।'

'তাই নাকি?…তাহ'লে তিনি—মানে আপনার মালিক, তিনি—?'

থালাটা নামিয়ে উঠে দাঁড়ান লালকুঁয়র।

'তাঁকে কাল খুন করেছে বেইমানের বাচ্চারা। তিনি আর নেই। তাই তো আমি বেওয়া-মহলে চলেছি, বোন!'

ঠোঁট-দুটো কাঁপতে থাকলেও, যতদূর সম্ভব সহজ কণ্ঠেই কথাগুলো বলেন লালকুঁয়র।

ঝব্বু হায়-হায় ক'রে ওঠে, 'করলি কি মুখপুড়ী, মালেকানের খাওয়াটা পণ্ড ক'রে দিলি?'

গুলু তার আগেই ছুটে এসে ওঁর হাত দুটো চেপে ধরেছে। তারও দুই চোখে জল, 'আমি মাফ চাইছি মালেকান্, রুটি ফেলে উঠবেন না। দোহাই আপনার।'

ম্লান হেসে বাঁ-হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন লালকুয়ঁর, 'আমার খাওয়া হয়ে গেছে, বোন। আর কত খাবো?'

গাড়িতে বয়েল জুড়ে অসহিষ্ণু গাড়োয়ান তাড়া দিচ্ছে। আর দেরি করা চলবে না কিছুতেই। লালকুঁয়র উঠে দাঁড়ালেন।

'একটা কথা বলব, মালেকান্? এত মেহেরবানি করছেন ব'লেই বলছি।'

'বলো, বোন!'

'কী হবে বেওয়া-মহলে গিয়ে? এইখানেই থাকুন না! আমরা দুজন আপনার বান্দা আর বাঁদী হয়ে থাকব। আরাম পাবেন না গরীবের ঘরে ঠিক কথা—কিন্তু সেবা পাবেন।'

'কী বলছিস, গুলু? উনি থাকবেন এই ঘরে?' মৃদু ধমক দেয় ঝব্বু।

ঝব্বু ভাইয়া, এ-যে কতবড় লোভের কথা আমার কাছে, তা তুমি বুঝবে না। আমিও একদিন পথের মেয়েই ছিলাম,—খুব বেশীদিন শাহী ইমারতে বাস করি নি।…আর করলেও অরুচি ধরে যেত এমনিতেই। তার চেয়ে এই আমার কাছে স্বর্গ। তাই তো ছুটে এসেছি। কিন্তু—' দূর অন্ধকার শূন্যের দিকে

চেয়ে যেন কী একটা কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করেন লালকুঁয়র, শিউরেওঠে তাঁর দেহ। বলেন, 'না না, দরকার নেই, ভাইয়া। আমার সর্বাঙ্গে এখনও সে-নরকের গন্ধ লেগে আছে—আমার নিশ্বাসে আছে সর্বনাশ! কে জানে তোমাদের কাছে থাকলে হয়তো স্বর্গেও আগুন লাগবে। তার চেয়ে আমি যাই এখন—আমি যাই! আবার আসব বহন, এমনি হঠাৎ এসে হঠাৎ চলে যাবো। আমাকে একেবারে ভুলে যেয়ো না।'

'আমাকে নেবেন মালেকান্ সঙ্গে? বাঁদী কেউ না থাকলে বড় অসুবিধা হবে না?' গুল্লু বলে।

'ছি! তুমি তোমার স্বামীর ঘর সুখে আর সৌভাগ্যে ভরিয়ে তোলো। আমার দুর্ভাগ্যের বাতাস না লাগে তোমার সংসারে—'

লালকুঁয়র গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু তখনই ঠিক উঠতে পারলেন না। কী যেন একটা বলতে গিয়েও বলতে পারছেন না। অনেকটা ইতস্তত ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সেদিন আমার কাছ থেকে মুক্তোর মালা নাও নি বহন,—ঠিকই করেছিলে। কিন্তু আজ আমাকে কি কিছু একটা দিতে পারো না? কোন একটা স্মৃতিচিহ্ন তোমাদের?'

'আমাদের? আমাদের কী আছে?'

বিপন্ন মুখে দুজনে দুজনের দিকে তাকায়।

নিরবে আঙুল দিয়ে গুল্লুর হাতের অনামিকাটা দেখিয়ে দেন লালকুঁয়র। ক্ষয়ে-যাওয়া সামান্য একটি চাঁদির আংটি।

লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে গুল্লু, বলে, 'এ জিনিস কিছুতেই আপনার হাতে তুলে দিতে সাহস হবে না, মালেকান! এ বড়ই সামান্য, যা-তা একেবারে!'

'তবু তোমার হাতের ছোঁয়া আছে তো!'

লালকুঁয়র নিজেই খুলে নিলেন ওর হাত থেকে। তারপর সেই সামান্য বেঁকে-যাওয়া আংটিটা সযত্নে।সন্তর্পণে নিজের আঙুলে পরলেন—জাহান্দার শার দেওয়া বড় লাল পাথরের আংটিটার পাশাপাশি।

॥ দশ ॥

পাঁচিলে ঘেরা অনেকটা জায়গা—তারই মধ্যে খুপরি খুপ্রি বাড়ি—একটা বড় দোতলা টানা বাড়িও আছে, অসংখ্য ঘর তার, সেও অমনি খুপরি খুপরি—এই হ'ল মুঘল রাজবংশের বেওয়া-মহল বা সোহাগপুরা। এরই এক একটি ঘরে বাস করতে দেওয়া হয় এক-একজন মহিলাকে, যিনি হয়তো কিছুদিন আগেও অসংখ্য দাসদাসী নিয়ে লালকিলার প্রাসাদদুর্গে বাস করেছেন। বাদ্শা বা বাদ্শাজাদাদের স্ত্রী আর সেই সব প্রধানা রক্ষিতা—যারা উপপত্যন্তর গ্রহণ করতে চায় নি—তাদের এখানে পাঠানো হয়, বাকী জীবনটা কাটাবার জন্য। নতুন বাদ্শার দয়া হ'লে দু'দশ সিক্কা বা তঙ্কা মাসোহারাও মেলে। নইলে শুধু এই আশ্রয়টুকু এবং একজনের মতো সিধা। জ্বালানি কাঠও নিজেদের

কিনতে হয়, অথবা যোগাড় করতে হয়। তবে যাঁরা আসেন তাঁদের সঙ্গে গহনাপত্র, ক্ষেত্রবিশেষে কিছু নগদ টাকাও থাকে, তাইতেই কোনমতে বাকী জীবনটা শুধু প্রাণধারণ ক'রে থাকতে পারেন।

দিল্লী থেকে আগ্রা যাবার পথে যমুনা বহু জায়গাতেই খুব বেশীরকম এঁকে-বেঁকে গেছে। তারই একটা বাঁকের মুখে এই বিচিত্র উপনিবেশ। যমুনার ধার দিয়ে দিয়েই চওড়া বড় শাহীসড়কটা চলে গিয়েছে বটে, কিন্তু অনেক জায়গায় এই আকস্মিক বাঁক এড়িয়ে যতটা সম্ভব সোজা রাখার জন্য পথটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে নদী থেকে বেশ একটু দূর দিয়েই। এমনিই একটা জায়গায়—নদী ও সড়কের মাঝামাঝি এই সোহাগপুরা উপনিবেশ। সড়ক থেকে অনেকখানি নেমে এসেছে এই জমিটা। বেশ নিচু, বর্ষাকালে যমুনা যখন রণ-রঙ্গিণী সংহারিণী মূর্তি ধারণ করে তখন হামেশাই এই পাঁচিলে ঘেরা উপনিবেশের মধ্যে জল চলে আসে। তখন প্রায় দ্বীপের মধ্যে বাস করে এই বেওয়ারা। দুর্গতির শেষ থাকে না।

কিন্তু তবু বেঁচে তো থাকে।

দীর্ঘদিনই বেঁচে থাকে কেউ কেউ। নিত্য নানা দুর্গতি সয়ে ওদের জীবনী-শক্তি যেন বেড়েই যায়।

আর এই বাঁচতে পেরেই যেন ওরা কৃতার্থ। এর জন্যই, এই কোনমতে বাঁচবার সৌভাগ্যটুকু দেওয়ার জন্যেই শাহী দরবারের কাছে ওরা কৃতজ্ঞ।

স্যাঁৎসেতে ভিজে জমি, বর্ষাকালে সাপ মশা বিছের আবাদে পরিণত হয় বলতে গেলে, চারিদিকে নিবিড় অরণ্য—নয়তো কিছু কিছু জাঠ চাষীদের গ্রাম—তবু আশ্রয়! আশাহীন, আনন্দহীন, ভবিষ্যৎহীন কয়েকটি জীবনের দীর্ঘকালব্যাপী মৃত্যুর সাধনা-কেন্দ্র।

মরণেরই তপস্যা করে ওরা—বেঁচে থেকে।

এখানে প্রথম প্রথম যারা আসে, তাদের কারুরই বিশ্বাস হয় না কথাটা। ভাগ্যের এই একেবারে বিপরীত পরিবর্তন মন মানিয়ে নিতে পারে না কিছুতেই। দিনরাত তাদের কাটে একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে। এ পরিবেশ, এই জীবন এবং জীবনধারণের এই সামান্য উপকরণ সবই অবিশ্বাস্য মনে হয়। মনে হয়, 'না না, এ হতে পারে না, এ ঠিক নয়—একটা দুঃস্বপ্ন। এখনই এ স্বপ্ন ভাঙ্গবে, নিস্কৃতি পাবো আমরা।'

তারপর একটু একটু ক'রে কাল সেই নির্মম সত্যটিকে উদ্ঘাটিত করে। একটু একটু ক'রে সয়ে আসে জীবনটা। তারপর সত্য অবস্থাটা বিশ্বাস করতে এক সময় আর কোন অসুবিধাই থাকে না।

লালকুঁয়রও প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেন নি। সত্যিই কি এই তাঁর পরিণাম হল! সত্যিই এইখানে, এই অবস্থায়, এই পরিবেশে তাঁকে জীবনটা কাটাতে হবে—হয়তো বা দীর্ঘ জীবনই?

না—না। তা হ'তে পারে না। এ কখনও হ'তে পারে না। আর একটা কিছু ঘটবেই ; এমন একটা কিছু—যাতে ওলট্-পালট্ হয়ে যাবে সব।

নইলে, নইলে পাগল হয়ে যাবেন যে তিনি।

তা কখনও হ'তে পারে ?

কখনও সম্ভব ?

কাল যে ছিল সকলের মাথার উপরে, আজ সে-ই, দৈহিক সম্পূর্ণ সুস্থ থেকেও—এমন ক'রে অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত জীবন্ত সমাধিতে সমাহিত হবে চিরদিনের মতো ?··

কিন্তু দিন, সপ্তাহ, মাস—বৎসর চলে যায়। কিছুই হয় না, কোন অঘটনই ঘটে না। ক্রমশ আরও বুঝতে পারেন যে অঘটন কিছু ঘটলেও তাঁর কোনও পরিবর্তনই আর হবে না। বাদ্শা বদল হ'তে পারে, উজীর বদল হ'তে পারে,—কিন্তু তাতে তাঁর আর কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধিই নেই। তাঁর অবস্থার কোন পরিবর্তনই আর হওয়া সম্ভব নয়। হলেও—আরও খারাপ কিছু হওয়াই সম্ভব। আরও অসহ কোন জীবন হয়তো যাপন করতে হবে তখন।

পাগল ?

না, পাগল হবার হ'লে সেই দিনই হয়ে যেতেন। ত্রিপোলিয়া ফাটকের সেই সাংঘাতিক ঘটনার সময়েই।

চরম সর্বনাশে, সেই মর্মান্তিক দুঃসহ আঘাতেও যখন মাথা খারাপ হয়ে যায় নি—তখন এই সামান্য দৈহিক দুঃখেও হবে না !

লালকুঁয়র হাসেন।

ওরে সর্বনাশী, শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে তোর পাপের শাস্তি এড়াতে চাস ? এত সহজে অব্যাহতি পাবি ?

বিশ্বাস হয়েছে। সয়েও গেছে। তবু এখনও এক একদিন এমন হাঁফ ধরে কেন ?

এক একদিন যেন মনে হয়, দুর্ভাগ্য বুকে চেপে বসে গলা টিপে ধরেছে। মনে হয় এই কুশ্রী পরিবেশ ঘৃণ্য ক্লেদাক্ত আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছে তাঁকে, সে নাগপাশের মতো বাহুপাশে নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছে তাঁর !

এই রকম মুহূর্তগুলিতে আর এই জানলা-দরজাহীন কোটরের মতো ঘরে কিছুতেই আবদ্ধ থাকতে পারেন না তিনি—ছুটে বেরিয়ে চলে যান একেবারে যমুনার ধারে। কয়েকটা ক্ষেত পার হয়ে, বড় দুটো আম-বাগান পেরিয়ে অনেকটা যেতে হয়—তবু যান। আর কেউ এখানকার পাঁচিল পার হয় না—বেওয়া-মহলের কোন বাসিন্দা। লজ্জা ও পূর্ব গৌরবের এই অভিমানটুকু এখানে এসেও ছাড়তে পারে নি কেউ।···তারা লালকুঁয়রের এই আচরণে হাসাহাসি করে। নাম দিয়েছে ওর 'পাগলী বাঁদী'। বলে, 'হাজার হোক, পথে পথে নাচার অভ্যেস ছিল তো এককালে, পর্দা আর আব্রু শিখলে কোথায় ?'

তা বলুক। লালকুঁয়রের তাতে কিছু আসে যায় না। তিনি মেশেনও না কারুর সঙ্গে। কথাও বলেন না। ওদের বাঁকা মন্তব্য এবং চোখে-চোখে হাসি যে গোচরে আসে না তা নয়—উপেক্ষা ক'রে চলে যান তিনি। কোন-দিনই অপরের মতামত নিয়ে মাথা ঘামান নি, সে মতামতকে বরং দ'লে মাড়িয়ে চলে গেছেন—তবু তখন জীবনে আশা ছিল, আনন্দ ছিল, ভবিষ্যৎ ছিল। আশা ও ভবিষ্যৎ থাকলেই আশঙ্কার কারণ থাকে। আজ যখন কিছুই নেই—সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে সব অন্ধকার—সেই চরম অন্ধকারে মিশে যাওয়ার দিনটি পর্যন্ত, তখন আর ওদের মন্তব্যকে গ্রাহ্য করতে যাবেন কী দুঃখে, কোন্ আশঙ্কায় ?

অবশ্য বে-আব্রু হবার মতো, বে-ইজ্জৎ হবার মতো কেউই থাকে না ওখানে—নদীর ধারে। আশে-পাশে গ্রামই বিরল, সে গ্রামও আবার জনবিরল। যারা আছে—তারা কদাচিৎ নদীর ধারে আসে। নির্জন বলেই ছুটে যান সেখানে লালকুঁয়র। নিস্তব্ধ শান্ত মুক্তির মধ্যে গিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন। নদী আর তিনি—ধু-ধু বালুবেলা আর গাঢ়-নীল জল—আর কিছু নেই সেখানে, কেউ নেই। এইখানে বসে আশ মিটিয়ে চোখের জল ফেলেন লালকুঁয়র—চোখের জল ফেলে বাঁচেন। ওখানে চোখের জল ফেলতে লজ্জা করে—এখানে করে না। কারণ এখানে সে অশ্রুর কোন সাক্ষী থাকে না। শুষ্ক তৃষার্ত বালু সে জল নিঃশেষে শুষে নেয়,—নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয় লজ্জার সেই ইতিহাসকে।

কেঁদে শান্ত হয়ে—আবার ঐ অন্ধকার কোটরে ফিরে যান একদা-মহিষী মহামান্য ইমতিয়াজ-মহল। ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণে যাত্রা করার পাথেয় সঞ্চয় করে নিয়ে যান ঐ নদীর ধার থেকে।

এখানে মধ্যে মধ্যে আসে আর একটি প্রাণী। এক যাযাবর বেদের মেয়ে।

নাম বলে না সে, নাম জিজ্ঞাসা করলে হাসে। বলে, 'আমার আবার নাম। আমার নামে কি হবে ? কেউ হয়তো কোনকালে নাম রাখেই নি আমার। আমি বেদেনী।'

সুশ্রী তরুণী মেয়ে—তবু যেন লালকুঁয়রের মনে হয়—সেও অকালে বুড়িয়ে গেছে তাঁর মতো। তাঁরই মতো কোন সুগভীর দুঃখ বহন করছে সে।

প্রশ্ন করলে হাসে হা-হা ক'রে। বলে, 'হায় হায়—বেদেনীর আবার দুঃখ ! আমাদের কোন দুঃখ থাকতে পারে নাকি ? ভিখিরী ভবঘুরে—আমাদের কী আছে যে দুঃখ থাকবে।'

এটুকু বোঝেন লালকুঁয়র যে সে একা। একাই ঘুরে বেড়ায়, যেখানে-সেখানে। সে নাকি হাত দেখে বেড়ায়, হাত দেখাই তার পেশা। সেই জন্যেই নাকি মাঝে মাঝে শহরে যায়, আগ্রা দিল্লী লাহোর—সব জায়গাতেই যায় সে। তবে দিল্লীতেই যায় বেশী, রাজধানী জায়গা, বড় বড় 'রইস' লোকেরা থাকেন, রোজগার হয় বেশী। কিন্তু বেশীদিন থাকে না কোথাও, কিছুদিন চলবার মতো দু-চার-পয়সা কামাতে

পারলেই পালিয়ে আসে এদিকে। গাঁয়ে-পাহাড়ে, নদীর ধারে ঘুরে বেড়ায় একা।

কেন?

প্রশ্ন করলে আবারও সেই হাসি হাসে, 'কেন কি? ভাল লাগে তাই।'

'ভয় করে না?'

'ভয়? বেদের মেয়ের আবার ভয় কি?'

বুকের কাছ থেকে একটা ছোরা বার ক'রে দেখায়, 'এই দোস্ত্ থাকতে বেদেনী আমরা কাউকে ভয় করি না!'

পাৎলা লিক্‌লিকে তার পাত্‌টা বিদ্যুতের মতো ঝিলিক্ দিয়ে ওঠে বাইরের আলোয়।

'এখানে আসো কেন?'

'এই বেওয়া-মহল দেখতে। খুব মজা লাগে আমার!'

'কতকগুলো বিধবা বেওয়ার দুঃখ দেখতে কী এমন মজা?'

'তা নয়, এদের দেখি আর অতীত দিনের কথা মনে পড়ে। কত শক্তি ছিল এদের, কত দম্ভ। তখন কেউ এই দিনটার কথা ভাবে নি। কেউই ভাবে না বোধ হয়।'

তারপর হঠাৎ হয়তো বলে বসে, 'খুব বেঁচে গিয়েছি, জানো? আমিও চাই কি এই সোহাগপুরার বাসিন্দা হ'তে পারতুম।...বিশ্বাস হয়?'

হয় বৈকি! খুবই হয়। ওর দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলে সংশয়ের কোন কারণই থাকে না। বোধ হয় আর্মানী রক্ত গায়ে আছে মেয়েটার—কিম্বা ইরাণী। খুবই সুশ্রী। কোমল একহারা ভঙ্গুর দেহ। ময়লা ঘাঘরা ও ছেঁড়া কাঁচুলিতে সে রূপ ঢাকা পড়ে না।

'কোন বাদ্‌শার নজরে পড়েছিলে বুঝি? না কোন শাহ্‌জাদার?'

কিন্তু সে কথার কোন উত্তর দেয় না। পীড়াপীড়ি করলে হঠাৎ উঠে পালিয়ে যায় হাসতে হাসতে।

এই বেদেনীর কাছেই মাঝে মাঝে রাজধানীর খবর পান লালকুঁয়র। এই মেয়েটি যেন ওঁর অন্ধ কারাজীবনে, এই জীবন্ত মৃত্যুর মধ্যে এসে প'ড়ে মাঝে মাঝে জীবনের দিকের বাতায়নটা খুলে দিয়ে যায়।

শুধু রাজধানীরই খবর নয়—রাজপ্রাসাদেরও।

শুনতে যে তিনি ঠিক চান তা নয়—বেদেনী নিজেই বলে। কিন্তু একেবারে সে দিকে উদাসীন থাকতেও পারেন না। মনে আগ্রহ ও কৌতূহল চাপতে পারেন না কিছুতেই। এই জীবনই তো ওঁর জীবন। সে জীবন তিনি বেশী দিন ভোগ করেন নি এটা ঠিক—কিন্তু বাইরে থেকেও ঐ জীবনেরই তো সাধনা করেছেন তিনি। বলতে গেলে সারাজীবনই—আশৈশব। এখনও তাই সিংহাসন আর তার চারপাশে যারা আছে, তাদের কথা শুনলে প্রায়-নিভে-যাওয়া মনের আগুন আবার নতুন করে জ্বলে ওঠে। রক্তে জাগে নতুন চেতনা, নতুন উন্মাদনা।

বেদেনী বলে, 'পচে গেছে. বুঝলে? মুঘলদের ঐ শাহী বংশের মূলেই পচ ধরেছে। ডাল পালা পাতা—সব শুকিয়ে ঝরে যাবে। কেউ থাকবে না। ওর ফুল আর ফুটবে না, ফলও ধরবে না। শুধু পচে গলে পড়ে যাবে অতবড় গাছটা। শুধু পাপ, ওর প্রতিটি পল্লবের শিরায় পাপের বিষ জড়ো হয়েছে যে!···কিছুই থাকবে না।···আর হলও তো অনেকদিন। যাবার সময় এমনিই হয়।

আবার বলে, 'ঐ পচনের ছোঁয়াচ লাগছে যাদের, ঐ পাপের সংস্পর্শে যারা আসছে তারাও মরবে। মরাই ভাল, স্তূপাকার হয়ে উঠেছে যে পাপ! পাহাড়ের মতো জমে উঠেছে—'

কথাটা ঠিক। তা লালকুঁয়রও বোঝেন।

পাপের সংস্পর্শে যারা আসবে তারাই মরবে। এ-পচনের সাংঘাতিক বিষ।

পাপ তাঁরও জমা হয়েছিল, স্তূপাকার হয়ে উঠেছিল। সে পাপের পাহাড়ে যে পা দিয়েছে সে-ই মরেছে। বিষের সরোবর কাটিয়েছিলেন তিনি, তাতে ছিল সোনার সিঁড়ি, ফুটেছিল মরীচিকার পদ্মফুল। সেই লোভে যারা ঝাঁপ দিয়েছে তারাই মরেছে। বাদ্‌শা থেকে শুরু ক'রে তাঁর খান-সামান পর্যন্ত।

নতুন বাদ্‌শা—জাহান্দার আর তাঁর উজীর জুলফিকরের রক্তে স্নান ক'রে সিংহাসনে বসেছেন, সে রক্তস্নান আজও বন্ধ হয় নি। বহুলোকই প্রাণ দিয়েছে, তার মধ্যে ফকীর বা নারীও বাদ যায় নি। সেই সঙ্গে—

সাদুল্লা খাঁও—!

হ্যাঁ, সাদুল্লা খাঁ। অথচ জাহান্দারের মৃত্যুর পর সেবা ও তোশামোদে লোকটা নতুন বাদ্‌শাকে প্রায় বশ ক'রেই ফেলেছিল। একমাস। সবে বোধ হয় একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিল সে। তারপর হঠাৎ একদিন তাকে কারাগারে পাঠানো হ'ল, তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল—বেচারীর স্ত্রী-পুত্ররা পথের ভিখারী হয়ে গেল। কিন্তু তাতেও আক্রোশ মিটল না বাদ্‌শার—কারাগারের মধ্যেই তাকে মেরে দেহটা বাইরের মাঠে ফেলে দেওয়া হ'ল—প্রাক্তন বাদ্‌শা ও তাঁর উজীরের মতো। সেদিক দিয়ে অবশ্য সম্মান মন্দ পায় নি লোকটা।

অপরাধ?

জালিয়াতি করেছিল। বাদশা-বেগমের চিঠি নাকি জাল করেছিল। ভেবেছিল কেউ কোনদিন জানতে পারবে না। খুবই মাথা খাটিয়েছিল। একটি মাত্র অক্ষর মুছে দিয়ে জুলফিকর খাঁর মুক্তির সুপারিশ-পত্রকে মৃত্যুর পরোয়ানা ক'রে বাদ্‌শার হাতে দিয়েছিল। ভেবেছিল বাদ্‌শার কাজের কৈফিয়ত নিতে স্বয়ং বাদশা-বেগমও সাহস করবেন না। কিন্তু সম্রাট আলমগীরের দুহিতা পৌত্রকে ভয় করবেন না, এটা ভাবা উচিত ছিল তার।···আর তাই-ই-তো হ'ল—

রাজগী শুরু করার মাত্র মাসখানেক বাদেই পিতামহীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন বাদ্‌শা।

প্রাথমিক অভিবাদন সম্ভাষণ ইত্যাদি সারা হবার পরই জিন্নতউন্নিশা সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিলেন বাদ্‌শাকে, 'তুমি জুলফিকরকে মারলে কেন?···সে থাকলে আজ

আর এমন ক'রে সৈয়দদের হাতের পুতুল সাজতে হ'ত না তোমাকে। তারা সাহস করত না বাদ্‌শার ওপর এই ভাবে বাদ্‌শাহী চালাতে। সিংহাসনে বসতে এসেছ—রাজনীতির অ-আ-ক-খ জানো না?…কাঁটায় কাঁটা তুলতে হয় তাও বোঝো নি? অত বড় একটা শক্তিমান লোক, তোমার তাঁবে থাকলে কত সুবিধা হ'ত বল দেখি! ওরা দু'দলই দু'দলকে ভয় করত, সেই সুযোগে বাদ্‌শা নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন!'

এক নিঃশ্বাসে বলে গিয়েছিলেন কথাগুলো। প্রথমটা জবাব দেবার সুযোগই পান নি বাদ্‌শা, তারপরই সবিস্ময়ে বলে উঠেছিলেন, 'কী মুশকিল, যা করেছি আপনার মত নিয়েই তো করেছি!'

'কখনও না। আমি কী বলেছিলুম!'

বাদ্‌শা-বেগমের চিঠিখানা নাকি সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিলেন বাদ্‌শা—জেব্ থেকে বার ক'রে দিয়েছিলেন ও'র হাতে। আর তখনই ধরা পড়েছিল সাদুল্লা খাঁর কারসাজী! বাদ্‌শা-বেগম আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে বাদ্‌শার নজরে পড়েছিল—'ন' শব্দটি ছুরি দিয়ে চেঁচে তোলা।

মেঘের মতো মুখ ক'রে ফিরে এসেছিলেন বাদ্‌শা। এসেই হুকুম দিয়েছিলেন সাদুল্লা খাঁর গ্রেপ্তারীর। এক দণ্ডও দেরি সয় নি তাঁর!

এ ইতিহাস অবশ্য লালকুঁয়র জানতেন। এই জালিয়াতির ইতিহাস। হিদায়ৎ কেশ খবর দিয়েছিল।

হিদায়তেরও পরিণাম শুনলেন এই বেদেনীর মুখে।

হিদায়ৎ জানত সাদুল্লার এই ইতিহাস, চোখেই দেখেছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে কাজে লাগাবে বলে চেপে রেখেছিল কথাটা। সে ভেবেছিল জুলফিকর বাঁচলে তার কোন আশা নেই কিন্তু সাদুল্লা যদি কখনও উজীর হয় তো সে উজীরের উজীর হ'তে পারবে—এই একটি মন্ত্রে। এই মন্ত্রে চিরদিনের মতো বশীভূত থাকবে সাদুল্লা।

অদূরদর্শী, মূর্খ।

বড়ই লোভ ছিল লোকটার, বড় বেশী লোভ!

অপেক্ষা করতে পারে নি। দু-চার দিন দেখেই, সাদুল্লা খাঁ বাদশার সুনজরে পড়েছে দেখা মাত্রই, ও সেই মন্ত্র প্রয়োগ করতে গিয়েছিল। ধূর্ত সাদুল্লা তখনকার মতো মিষ্টবাক্যে ওকে তুষ্ট ক'রে বাদ্‌শাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল—মির্জা মহম্মদ করিমের মৃত্যুর কথাটা।

তারপর আর কয়েক দণ্ড মাত্র বেঁচে ছিল হিদায়ৎ!

এক পাপ আর এক পাপকে আশ্রয় করে। এক মিথ্যা আর এক মিথ্যাকে ডেকে আনে।

পরিণাম একই। বিধাতা সামনে বসে আছেন নিক্তি নিয়ে। নিক্তির তৌলে চলে তাঁর বিচার। যার যেটুকু প্রাপ্য সুদসুদ্ধ উশুল দেন তাকে।

একটি মাত্র প্রাণীর বিষাক্ত রোগের ছোঁয়াচ যেমন বহুদূরে ছড়ায়—বহুলোকের

মৃত্যুর কারণ হয়, একটি মানুষের পাপও তেমনি।···

লালকুঁয়র নিজের ললাটে করাঘাত করেন বার বার। মাঝে মাঝে যমুনা তটের বালিতে মাথা কোটেন!

॥ এগারো ॥

আরও বহু খবর দেয় বেদেনী।

প্রাসাদ-দুর্গের নানা বিচিত্র সংবাদ।

হাত-দেখার দৌলতে অবাধ গতিবিধি তার। এক এক সময়ে শুধু চুপ ক'রে বসেও থাকে। তার ফলে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বহু কাহিনীতে তার ঝুলি ভরে ওঠে। সে সব তুচ্ছ কথা একমাত্র নারীই সংগ্রহ করতে পারে এবং নারীতেই তা শোনে আগ্রহ ক'রে।

এমনিই একটি কাহিনী অকস্মাৎ লালকুঁয়রের রক্তে বহুদিন পরে জ্বালা ছড়িয়ে দিয়েছে। শীতল রক্তে আগুন ধরেছে আবার। আর তার ফলে বহুদিনের হিম-আবাস ছেড়ে সর্পিণী আবার মাথা তুলেছে তাঁর মনের গোপন গুহায়।

ফররুখশিয়ারের এক প্রিয়তমা জুটেছে।

পার্বতী, হিমালয়-দুহিতা। নগাধিরাজের একেবারে পাদ-পীঠে কিস্তোয়ার* রাজ্য। পাহাড়ী দেশ, পাহাড়ী রাজা। তাঁরই কন্যা। তুষার-মণ্ডিত হিম-গিরির মতো তার গাত্র-বর্ণ। পার্বত্য-কুসুমের পেলবতা তার ত্বকে, হিমালয়ের অন্তহীন রহস্য তার দৃষ্টিতে।

অপূর্ব রূপসী সেই মেয়েকে—মেয়ের বাবা স্বেচ্ছায় এসে পেঁৗছে দিয়ে গেছেন বাদশার তাঁবুতে।

তা নইলে নাকি উপায় ছিল না আর। শৃগালের ভক্ষ্য হওয়ার চেয়ে সিংহের ভক্ষ্য হওয়াই ভাল এই ভেবে মরীয়া হয়েই এ কাজ করেছিলেন। নইলে লাহোরের সুবাদার আবদুস সামাদ খাঁর লুব্ধ দৃষ্টি থেকে নাকি কিছুতেই বাঁচানো যেত না সে মেয়েকে। সেই পার্বত্য-দুহিতার অপরূপ লাবণ্যের খ্যাতি বহু শত যোজন পার হয়েও তাঁর কানে পেঁৗছেছিল, তিনি শিকারের নাম ক'রে স্বয়ং গিয়েছিলেন কিস্তোয়ারে। মেয়েকে দেখতে পান নি নাকি, আড়াল থেকে শুধু দেখেছিলেন তার দুখানি হাত, আর দেখেছিলেন তার গতিভঙ্গী—তাইতেই প্রায় ভূতগ্রস্তের মতো আচ্ছন্ন হয়ে ফিরে এসেছিলেন সুবাদার। তারপর কিস্তোয়ারের রাজার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ঐ দেবদুর্লভ দুখানি হাত ধরবারই অধিকার। হ্যাঁ, পাণিগ্রহণ করতেই চেয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু ঐটুকু পার্বত্য দেশের রাজা হ'লেও তিনি সামান্য সুবাদারের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে রাজী হন নি। বাদানুবাদ ও কয়েকবার দূত প্রেরণের পর আবদুস সামাদ খাঁ ভয় দেখিয়েছিলেন সমস্ত কিস্তোয়ার রাজ্য ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে

*চর্মন্বতী বা চেনাবের পাড়ে, সমুদ্রতীর থেকে ৫000 ফুট উঁচুতে এক উপত্যকার ওপর অবস্থিত ক্ষুদ্র শহরকে কেন্দ্র ক'রে ছোট একটি রাজ্য।

চেনাবের জলে ধুয়ে সমভূমি ক'রে দেবেন তিনি। সেখানে আপেলের চাষ করাবেন।

ঠিক সেই সময় শিকার করতে দিল্লী ছেড়ে কর্নালের সীমানা পার হয়ে কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন বাদ্‌শা। সেই সংবাদটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা মন স্থির ক'রে ফেললেন। তরুণ, রূপবান, উদার বাদ্‌শা ফররুখশিয়র। যদি মুসলমানের হাতে দিতেই হয় তো সর্বশ্রেষ্ঠ পাত্রের হাতেই দেবেন তিনি। সূর্য হাতের কাছে থাকতে খদ্যোতের কাছে কোন্‌ কমলিনী আত্মসমর্পণ করে?

পাছে সংবাদটা ছড়ায় এবং সুবাদার বাধা দেন—এই ভয়ে কাউকেই তিনি জানান নি, এমন কি কন্যার মাকেও নয়। এক সন্ধ্যারাত্রিতে চুপিচুপি মেয়েকে আর জন-পাঁচেক মাত্র সশস্ত্র বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়েছিলেন। এবং সেদিন সারারাত এবং পরের দুটো দিন ও রাত শুধু মধ্যে মধ্যে সামান্য বিশ্রামের সময় বাদ দিয়ে—ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁরা বাদশাহী তাঁবুতে এসে পেঁাছে-ছিলেন। তৃতীয় দিন শেষ রাত্রিতেই।

তখনও বাদ্‌শা রাত্রির বিশ্রাম গ্রহণ করেন নি, মধ্যরাত্রির প্রমোদ বিলাস সবেমাত্র তখন শেষ হচ্ছে—এমন সময় দূত এসে জানাল স-কন্যা কিস্তোয়াররাজ দর্শন-প্রার্থী। এখনই যদি অনুগ্রহ হয় তো—

বিস্মিত বাদ্‌শা তখনই দরবারী তাঁবুতে এসে দেখা দিলেন। রাজা অভিবাদনে শির নত ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন, বাদ্‌শার আশ্বাস ও অভয় পেয়ে এখন মাথা তুলে চাইলেন। তারপর নিঃশব্দে কন্যাকে সামনে এনে তার মুখের ওপর ওড়নাটা সরিয়ে দিয়ে শুধু বললেন, 'আমার বংশের ও আমার দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কুসুম আপনাকে নিবেদন করতে এনেছি জাহাঁপনা, দয়া ক'রে গ্রহণ করুন!'

হোক্‌ দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত ব্যসন ও সুরাপানে আরক্ত চক্ষু—তবু তাঁর দৃষ্টি এত ক্ষীণ হয় নি যে সেই অপরূপ লাবণ্য তাঁর অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করবে না। তিনি এই পূজা গ্রহণ করেছিলেন প্রসন্ন চিত্তেই।

কৃতজ্ঞ বাদ্‌শা তখনই খাবাসদের ডেকে রাজার বিশ্রামের ব্যবস্থা করবার আদেশ দিলেন। পরের দিন সকালে তাঁকে খিলাৎ ও খেতাব উপহার—এবং সেই সঙ্গে কিছু জায়গীর দেবারও প্রতিশ্রুতি দিলেন। সুরা ও রূপে উন্মত্ত বাদ্‌শা প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছিলেন।

বিবাহ?

না, বিবাহের প্রশ্ন তখন ওঠে নি কোন পক্ষেই।

স্থান কাল ও পাত্র হয়তো কোনটাই সে রকম ছিল না।

নিবেদিত পুষ্পার্ঘ্য বাদ্‌শা তখনই—সেই মুহূর্তেই গ্রহণ করেছিলেন। কোন অনুষ্ঠানের বিলম্ব তাঁর সহ্য হয় নি।

আদর ক'রে বাদ্‌শা তাঁর পার্বতী প্রিয়ার নাম রেখেছিলেন নূরমহল!

নূরমহল নামেই তিনি প্রাসাদ আলো ক'রে অধিষ্ঠান করছেন। আজও তাঁর

সেই অলোক-সাধারণ রূপের ঘোর বাদ্শার দৃষ্টি থেকে মুছে যায় নি। তাঁর অসংখ্য দাসী, একাধিক মহিষী এবং আরও নানা প্রমোদ-সহচরের মধ্যে আজও নূরমহলই প্রধান এবং তাঁর প্রিয়তমা।

নূরমহল!

জাহাঙ্গীর বাদ্শা আদর ক'রে তাঁর প্রেয়সীর ঐ নাম রেখেছিলেন। কিছু-দিন পরেই নূরমহল হয়েছিলেন নূরজাঁহা!

হয়তো এই নূরমহলও সেই আশা পোষণ করে মনে-মনে। অন্তত তার গর্বিত আচরণে ও বাক্যে—সেই কথাটাই প্রকাশ হয়ে পড়ে।

হায় বুদ্ধিহীনা নারী!

ভুলে গেছে যে সে-কাল পাল্টেছে। সে বাদ্শাও আর নেই।

জাহাঙ্গীরের মতো শক্তিধর বাদ্শার পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল অজ্ঞাত-কুলশীলা এক নারীকে, শের আফগানের বেওয়াকে এতবড় সাম্রাজ্যের সমস্ত লোকের মাথার ওপর বসাবার।

ফররুখশিয়ার জাহাঙ্গীর নয়। এ বাদ্শার বাদ্শাহী শুধু কল্পনাই।

কিন্তু নূরমহলের অত বুদ্ধি নেই।

কিছু বুদ্ধি থাকলেও সে মাত্র পাঁচবছর আগের অপর এক স্পর্ধিতা নারীর পরিণাম দেখে সতর্ক হ'তে পারত।

তারও তো ঐ শখ ছিল, দ্বিতীয় নূরজাহাঁ হবার।

তবু বাদ্শা জাহান্দার শা ঠিক তাঁর অমাত্যদের হাতের পুতুল ছিলেন না!

লালকুঁয়রের পরিণাম থেকে সতর্ক হতে পারে নি এ বালিকা—কিন্তু সে তাঁর কথা শোনে নি বলে নয়। ভাল ক'রেই শুনেছে। অসম্ভব আগ্রহ ও কৌতূহল তার সেই নাচওয়ালী মহিষী সম্বন্ধে। সমস্ত কাহিনী শুনতে চায় সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

প্রাসাদ-দুর্গের তাতারী প্রহরিণীদের ডেকে সে পদসেবা করতে বলে—আর তাদের কাছে প্রশ্ন ক'রে ক'রে জানে। ওর সমস্ত কৌতূহল শুধু যেন লালকুঁয়র সম্বন্ধেই।

শোনে আর হেসে লুটিয়ে পড়ে!

এই বেদেনীর সামনেই এ দৃশ্য অভিনীত হয়েছে অনেক বার।

লালকুঁয়রের অপদার্থ ভাইরা এসে জুটেছিল তাঁর সৌভাগ্যের সময়। তাদের খেতাব ও জায়গীর দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল সম্ভ্রান্ত ওমরাহ্দের সমান অধিকার। মূর্খ অপদার্থ ভাই তিনটিকেই ইমতিয়াজ-মহল প্রশ্রয় ও দাক্ষিণ্যে উন্মত্ত ক'রে তুলেছিলেন!

আজ তারা কোথায়?

এই প্রশ্ন নিজেই করে নূরমহল, নিজেই তার উত্তরে তীক্ষ্ন বিদ্রূপে ফেটে পড়ে!

'আমি কিন্তু এত বোকা নই তা ব'লে বাপু। ইচ্ছে করলে সারা কিল্লেয়ারের লোকদের ডেকে এনে মসনদ বিলোতে পারতুম—কিন্তু তা করি নি। অবশ্য আমার মালিকও তাঁর জ্যাঠামশাইয়ের মতো অত নির্বোধ নন। তিনি এমন একটা কিছু করবেন না—যাতে হাস্যাস্পদ হন।'

এমনি ছোট ছোট প্রসঙ্গ। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথা।

কোন্ পরিচিত এক সারেঙ্গীকে সুপারিশ ক'রে পাঠিয়েছিল লালকুঁয়র জুলফিকর খাঁর কাছে, বড় একটা চাকরির জন্যে। পথে পথে বাজিয়ে বেড়ায় যে—হুকুম হয়েছিল তাকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা মাইনের চাকরি দিতে হবে। জুলফিকর খাঁর সাহস হয় নি সোজাসুজি তাকে প্রত্যাখ্যান করবার। তিনি বলেছিলেন, 'বাপু হে, বড় চাকরি পেতে হ'লে সরকারে নজর দিতে হয়, তা জানো তো? তুমি কি নজর দেবে?' সে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'কী দিতে হবে বলুন? আমার সম্পত্তি বলতে তো এই সারেঙ।' 'তাই তো! তা'হলে কী আর দেবে। বরং তুমি হাজার খানেক সারেঙই জমা দাও সরকারী খাজাঞ্চীখানায়।' মুখ টিপে হেসে বলেছিলেন জুলফিকর খাঁ। সে লোকটি অনেক চেষ্টা ক'রেও বহু লোককে প্রলোভন দেখিয়ে চড়া-সুদে টাকা ধার করেও শ-খানেকের বেশী সারেঙ কিনতে পারে নি। বহু কষ্টে অর্জিত সেই সারেঙ সরকারী খাজাঞ্চীখানায় জমা দিয়ে জুলফিকর খাঁর সঙ্গে দেখা করলে। কিন্তু উজীর বললেন, 'বাকী ন'শও জমা দিতে হবে—নইলে ও চাক্‌রি পাওয়া যাবে না!' বেচারী হতাশ হয়ে ফিরে গিয়ে নালিশ করেছিল লালকুঁয়রের কাছে। লালকুঁয়র ক্রুদ্ধ হয়ে কথাটা জানিয়েছিলেন স্বয়ং বাদ্‌শাকে। কিন্তু উন্মত্ত হলেও জাহান্দার শা আলমগীরের পৌত্র। জুলফিকর খাঁ মৃদু হেসে যখন ঐ পদের দায়িত্ব ও পদপ্রার্থীর যোগ্যতার কথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—তখন বাদ্‌শাও লজ্জাবোধ না ক'রে পারেন নি।

ঘটনাটা নিয়ে তখনও শাহী দফতরে অনেক হাসাহাসি হয়েছিল। কিন্তু সেটা তখন অত আঘাতের কারণ হয় নি। কারণ তখনও সর্পিণীর যথেষ্ট বিষ ছিল। শক্তিমানরা সামান্য উপহাসে বিচলিত হয় না! শক্তি হারালে বেশী লাগে।

তাই—এতকাল পরে, সব হারিয়ে যখন সমস্ত ভবিষ্যৎ অন্ধকার একাকার হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যে ইহলোকের কোন কিছুই আর আঘাত করবে না—তখন এই সংবাদটা উত্তপ্ত ছুরির ফলার মতোই একসঙ্গে কেটে ও পুড়িয়ে চলে গেল বুকের মধ্যে—অনেকখানি পর্যন্ত।

এই সারেঙ্গীর কাহিনী সবিস্তারে শুনে এমন হেসেছে নূরমহল যে প্রায় একদণ্ডকাল সে-হাসি থামাতে পারে নি, তার ফলে নাকি তার শরীর খারাপ হয়ে গেছে।

অনেক কষ্টে, অনেক পরিচারিকার অনেক চেষ্টার ফলে হাসি থামতে প্রশ্ন করেছিল নূরমহল 'ঐ বদ্ধ পাগলীর মধ্যে কি দেখেছিলেন জাহান্দার শা? অবশ্য মেয়েটার খুব দোষ দেওয়াও যায় না, ছিল পথের ভিখিরী, একেবারে বাদ্‌শার

হারেমে এসে পড়ল, রাখা তো খারাপ হতেই পারে।...এই জন্যেই বলে বাদশার অন্তঃপুরে বাঁদী আনতে হ'লেও খানদানী ঘর থেকে আনা উচিত।'

খানদানী ঘর।

লালকুঁয়রের মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। তাই বটে। মিয়া তানসেনের সাক্ষাৎ বংশধর তাঁর বাবা। তিনিই কি পথের ভিখিরী ছিলেন? পথে বেরোনো যে তাঁর সাধনা—তাঁর ব্রত। সিংহাসনের জন্যে তিনি সাধনা করেছিলেন।

লালকুঁয়র শুনেছেন হিন্দুদের এক দেবী তাঁর স্বামীকে পাবার জন্যে অ-পর্ণা হয়ে তপস্যা করেছিলেন। লালকুঁয়রেরও যে তাই। অজ্ঞান মূর্খ পাহাড়ী মেয়ে—কী বুঝবে তাঁর তপস্যার কথা।

ঐ হিন্দুদেরই পুরাণে নাকি এমন কাহিনী অনেক আছে। সুকঠোর সাধনার বর-স্বরূপ প্রচণ্ড শক্তি পেয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে বহু সাধক, তার ফলে তাদের পতনেরও দেরি হয় নি—প্রায় লালকুঁয়রের মতোই পতন ঘটেছে।

পতনটা সত্যি হ'তে পারে কিন্তু সাধনাটাও কম সত্যি নয়।

কানে গেল বেদেনী তখনও নূরমহলের সেই হাসির গল্প বলে যাচ্ছে।

পদসেবিকা তাতারিণীকে নাকি তারপর আবার প্রশ্ন করেছেন নূরমহল, 'তা সেই দ্বিতীয় নূরজাহাঁ বেগমের পরিণামটা কি? তিনি এখন কোথায় রাজত্ব করছেন?'

'ও মা, তাঁকে তো সোহাগপুরায় চালান করা হয়েছে।'

'সোহাগপুরা? সেটা আবার কি?'

'কেন, মুঘল বাদশাদের বেওয়া-মহল—জানেন না? ওঁর মতো মহিষীদের ঐখানেই চালান করা হয় যে! খেতে পায় আর থাকতে পায়—একখানা ঘরে। কিন্তু তাই-ই তো ঢের। ঐটুকুও যদি না মিলত তো কি দশা হ'ত ভাবুন দেখি।'

'তা বটে। বেচারী। তাহলে এই পরিণাম হয়েছে মহামান্যা বেগম ইমতিয়াজ-মহল সাহেবার? ভাল, ভাল!'

আর শুনতে পারেন নি লালকুঁয়র।

দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন বেদেনীকে, 'তুই যা, তুই যা! সরে যা তুই, চলে যা!'

হাসতে হাসতে উঠে চলে গিয়েছে বেদেনী। সে হাসি নির্জন নদীতীরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রতিধ্বনিতহয়েছে—'হা-হা-হা-হা।'

॥ বারো ॥

ফিরিঙ্গিরা সত্যিই জিনিসটা তৈরী করতে জানে। এই আয়না জিনিসটা। এতে যে প্রতিচ্ছবি ফোটে তা যেমন উজ্জ্বল, তেমনি স্পষ্ট। আর হয়তো ঠিক সেই কারণেই—কিছুটা নিষ্ঠুরও।

আয়নাতে ফুটে-ওঠা নিজের মুখখানার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে

রইলেন লালকুঁয়র। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক রকম ক'রে দেখলেন। তারপর খাটিয়া থেকে উঠে খোলা দরজাটার সামনে এসে আরও ভাল ক'রে চাইলেন।

না। ভুল দেখেন নি তিনি। ঘরে আলোর অভাব আছে ঠিকই, ঝরোকা বা জানলাহীন ঘরে বাইরের মতো আলো থাকা সম্ভব নয়—কিন্তু তাতে যে অসুবিধাটা হচ্ছিল, সেটা দূর হওয়াতেও ওঁর কোন সুবিধা হ'ল না। সেটাকে তিনি দৃষ্টির অস্পষ্টতা বলে মনে করছিলেন—আসলে সেটা ওঁর জরা-চিহ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। উজ্জ্বল আলোয় বরং আরও স্পষ্ট, মর্মান্তিক ভাবেই স্পষ্ট হয়ে উঠল—মিলিয়ে গেল না একটুও। ললাটে রেখা পড়েছে। চোখের নিচে, কপালেও সামান্য—তবু অস্বীকার করা চলে না।

সেই উজ্জ্বল মসৃণ ত্বক্—যা দেখে একদা শাহজাদা মির্জা মুইজ্-উদ্দীনের দৃষ্টি মোহমদির হয়ে উঠেছিল এবং সে মোহ আমরণ লেগেই ছিল তাঁর দৃষ্টিতে—সে ত্বকেও কেমন একটা কর্কশ আস্তরণ যেন। পূর্বের সে আশ্চর্য মসৃণতা আর একটুও অবশিষ্ট নেই। চোখের কোণেও পড়েছে কালি। যতটা কালি সুর্মা কি কাজলে ঢাকা যায়—তার চেয়ে অনেকটাই বেশী। চোখের কোলে সামান্য কালিমা কি কালিমার আভাস অনেক সময় পুরুষের চিত্তকে কামনা-চঞ্চল ক'রে তোলে, দৃষ্টিকে ক'রে তোলে বহ্নিশিখার মত দীপ্ত। কটাক্ষকে তোলে শানিয়ে। কিন্তু এ আরও কালো। অল্প বয়সের উচ্ছৃঙ্খলতা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখে যেটুকু ছাপ রাখে তা নয়, অস্বাস্থ্য বা বয়সের চিহ্ন বহনকারী গভীর কালিমা এ।

দীর্ঘদিনের কান্নায় চোখের পাতা উঠে গিয়েছে। ভাল ক'রে আয়নায় তাকাতে গিয়ে এটাও চোখে পড়ল। সেই সুদীর্ঘ পক্ষ্ম—যা বহুদূর অবধি কপোলে ছায়া বিস্তার করত—তা এখন হৃত-গৌরব। একদা যা পুষ্পাচ্ছাদিত বনভূমির মতো ছিল, আজ তা মরু-প্রান্তরের মতো তৃণবিরল।

তা হোক—ভাল ক'রে কাজল টেনে দিলে এ দৈন্য হয়তো ঢাকা পড়বে—কিন্তু মুখের এই দাগগুলো, চোখের কোলের এই কালি?

আয়নাখানা নামিয়ে লালকুঁয়র আবার ফিরে এসে খাটিয়ায় বসলেন। সংকীর্ণ অপ্রশস্ত ঘর, আসবাব নেই বললেই চলে। হাতীর-দাঁতের-মীনাকরা আবলুশ কাঠের পালঙ্ক এবং ভেলভেটের শয্যা আজ স্বপ্নের মতো দুর্লভ এবং অবাস্তব মনে হয়। মনে হয় এই খাটিয়া এবং সামান্য শয্যাতেই তিনি আজীবন অভ্যস্ত।

তাই-ই তো ছিল। সামান্য ব্যবসায়ীর মেয়ে তিনি, নিজে বেছে নিয়েছিলেন রাস্তায় অতি সাধারণ নাচওয়ালীর জীবিকা। শুনেছেন তানসেনের রক্ত আছে তাঁর ধমনীতে। সেই রক্তই নাকি তাঁর কণ্ঠস্বরকে দিয়েছে অফুরন্ত সুরৈশ্বর্য। কিন্তু আজ সে কথা ওঁর বিশ্বাস হয় না। পথের মেয়ে তিনি, পথের নাচওয়ালী। এই ধরণের শয্যাতেই অভ্যস্ত তিনি চিরকাল। বরং এমন দিন ঢের গেছে যখন এটুকুও জোটে নি তাঁর। পথেই কেটেছে—সত্যি-কারের আকাশের নিচে। পাকা বাড়ির নিরাপদ আশ্রয় এবং নিশ্চিন্ত

নিরুদ্বিগ্ন জীবন যখন সুখস্বর্গ বলে মনে হ'ত। তার চেয়ে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য ছিল কল্পনাতীত।

তার পর এল জোয়ার। সৌভাগ্যের জোয়ার। সামান্যা বাঁদী, চেয়েছিলেন ময়ূর-সিংহাসনে বসতে, চেয়েছিলেন দ্বিতীয় নূরজাহাঁ হ'তে। দুনিয়ার বাদ্‌শার তাজ পরলে চলবে না শুধু—সে তাজ পায়ে লোটানো চাই। এই ছিল তাঁর স্বপ্ন।

তাঁর এই দুঃসাহসিকতার, এই দুরাশার চরম পরীক্ষা হিসেবেই ভগবান বুঝি জীবনে দিয়েছিলেন সেই পরম সুখের দিনগুলি। প্রতিষ্ঠা, যশ, অর্থ, প্রতাপ—সবই দিয়েছিলেন তিনি, দিয়ে মনটা বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন।

ওঃ, তখনও যদি থামতেন উনি, তখনও যদি খুশী থাকতেন। উনি চাইলেন আরও বেশী, আরও ঢের। বিধাতা হেসেছিলেন সেদিন ওঁর ধৃষ্টতায়, ক্রূর হাসি। দুনিয়ার বাদ্‌শা, রাজ্যেশ্বরকে ক'রে দিলেন ওঁর পদানত, পদাশ্রিত। সৌভাগ্যের নেশায় মাতাল হয়ে উঠলেন উনি, পাগল হয়ে গেলেন। ছিনিমিনি খেললেন তখ্‌ৎ নিয়ে, তাজ নিয়ে। চোখের ইঙ্গিতে কত ভিখারী হ'ল রাজা—রাজা হ'ল ভিখারী। তর্জনীহেলনে কত নির্দোষ নিরপরাধ মানুষের প্রাণ গেল, উন্মত্ত খেয়ালে খুনী আসামীরা পেল পরিত্রাণ। এত গোস্তাকী কি খোদা সইতে পারেন?

তাছাড়া ময়ূর-সিংহাসন এবং কোহ-ই-নূর—বাঁদীর কপালে সইবে কেন? মিলিয়ে গেল এক নিমেষেই, যেন চোখের পলক না ফেলতে ফেলতেই। পরিপূর্ণ সুখের তীব্র স্মৃতিই রইল শুধু। হিন্দুদের পৌরাণিক রাক্ষস রাবণের চিতার মতোই তা জ্বলতে লাগল বুকে। অনির্বাণ সে আগুনের পরিসমাপ্তি নেই—চিতাভস্মের স্তূপেও ঢাকা পড়ে না সে অনল।

যে জীবন ঈপ্সিত—আজ তা-ই দুর্বহ। ওঁর জন্য—শুধু ওঁর জন্যই ওঁর বাদশা ওঁর প্রেমিক, স্নেহাতুর মালিক প্রাণ দিলেন। আর—হে খোদা, অতিবড় শত্রুরও যেন অমন মৃত্যু না হয়! অমন পৈশাচিক, ভয়াবহ মৃত্যু!

যেন ছট্‌ফট ক'রে দাঁড়ালেন লালকুঁয়র। ছুটে বাইরে এলেন।

হাওয়া কি দুনিয়ায় কোথাও নেই? থাকলে—তিনি নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না কেন। সোহাগপুরা—বেওয়া-মহলের এই সংকীর্ণ ঘরে হাওয়া ঢোকে না—তাই? কিন্তু এর চেয়েও কদর্য, ঢের বেশী সংকীর্ণ ঘরেও তো তিনি এককালে থাকতে অভ্যস্ত ছিলেন। কৈ, তখন তো এমন ক'রে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে নি তাঁর।

না কি—তাঁরই দুর্ভাগ্য, তাঁরই কৃতকর্মের ফল এসে তাঁর চারিদিকের হাওয়া বন্ধ ক'রে ঘিরে দাঁড়িয়েছে—তাই?

আঃ! না, এই যে বাইরে হাওয়া আছে। বেশ ঠাণ্ডা বাতাস। ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো। এই তো কি অফুরান ঐশ্চর্য! কৈ, এর জন্য তো কেউ মারামারি হানাহানি করে না। কেউ তো কেড়ে নিতে চায় না। অথচ এটুকু না থাকলে আর সবই তো অর্থহীন হয়ে যায়।

লালকুঁয়র সেই ঠাণ্ডা বাতাসে বার বার মাথাটায় ঝাঁকানি দিয়ে যেন

প্রকৃতিস্থ হ'তে চেষ্টা করেন। না, অনুশোচনা আর হাহাকারে তিনি এমন ক'রে দিন কাটাবেন না। জীবন নিয়ে তিনি যখন খেলা করতেই চেয়েছিলেন—তখন একবার হেরেই আত্মসমর্পণ করবেন না দুর্ভাগ্যের কাছে।

আর একবার খেলবেন তিনি। খেল্ দেখাবেনও। না হয় আবারও হারবেন। এই চিতার আগুনের কথাটা ভাবতেই আজ প্রথম ওঁর কথাটা মনে পড়েছে। আগুন।—বেশ তো। এ আগুনে শুধু উনিই জ্বলবেন—জ্বালাতে পারবেন না? কেন, ওঁর প্রাণশক্তির বহ্নি কি নিভে গেছে একেবারে? আবারও আগুন জ্বালবেন। জ্বালাবেন আবারও।

কিন্তু—ঐ কিন্তুটাই যে মস্ত সমস্যা হয়ে উঠেছে। সংশয়টা মনে দেখা দিয়েছিল বলেই বহুদিন পরে দাসীকে দিয়ে এই আয়নাটা কিনে আনিয়েছেন।

তবু এত সহজে হাল ছাড়তে রাজী নন লালকুঁয়র।

শুনেছেন এই ফিরিঙ্গিদেরই কি সব প্রসাধন আছে, যা মাখলে চর্মের রুক্ষতা মিলিয়ে পেলবতা আসে, অকাল-জরার দাগ নিশ্চিহ্ন হয়- শুক্নো গালে আবার গোলাপ ফোটে। পাওয়া যায়, এই দিল্লী শহরেই পাওয়া যায়। কিন্তু নাকি বড় বেশী দাম।

বেওয়া-মহলের অধিবাসিনী তিনি, সোহাগপুরার বাসিন্দা। একটি ঘর, মাসিক দশ তঙ্কা নগদ আর দুজনের মতো, আটা, ডাল, ঘি, এই তাঁর বরাদ্দ। পরিত্যক্ত জুতোর মতোই বাদশাহী হারেমের বাড়তি স্ত্রীলোক তাঁরা—এটুকু যে তাঁদের মেলে, পথে বসে ভিক্ষা করতে হয় না, এই তো যথেষ্ট, এর জন্যই তাঁদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আরও কি চান তিনি? তিনি তো বিবাহিতা স্ত্রীও নন। নতুন বাদ্শা সোজাসুজি তাঁকে তাড়িয়ে দিতেও পারতেন—অথবা কোতল করাতে। তাঁর অপরাধ তো কম নয়। না, বাদ্শা অনুগ্রহই করেছেন।

তবু দশ টাকা দশ টাকাই। তার মধ্যে থেকে একটি ঝিয়ের মাইনে এবং খরচাও চালাতে হয়। এখনও এটুকু বিলাস ছাড়তে পারেন নি তিনি। একেবারে সোজাসুজি নিজের পোশাক নিজে কাচা—নিজের বিছানা নিজে রোদে দেওয়া—এটা এখনও অভ্যাস হয় নি।

আনতে পারতেন অনেক কিছুই - হয়তো শেষ মুহূর্তেও। কয়েকটা মোতির মালা আনলেও তার ঢের দাম পাওয়া যেত। কিন্তু তা তিনি পারেন নি। তাঁর মালিকের শেষ মুহূর্তগুলিকে সুধায় ভরে দিতে তিনিও যে ত্রিপোলিয়া ফটকের ফাটকে আটকা ছিলেন। অবশ্য তাঁর কাছ থেকে হয়তো কেউ অলংকার কেড়ে নিত না—কিন্তু সে সব কথা মনেও হয় নি সেদিন। সামান্য যা তাঁর গায়ে ছিল তাই নিয়েই সর্বহারা সর্বনাশিনী সেদিন পথে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন। তারও অনেক কিছুই গেছে সেদিন পথে আসতে আসতে এবং এই ক'দিনে। একেবারে ধুলিগুঁড়ি যা আছে—সেটা তিনি রেখে দিয়েছেন শেষ দিনের জন্যে। যদি কোন দিন বাদ্শাহী খেয়ালে একেবারে পথেই দাঁড়াতে হয়—সেই দিনের সম্বল! অসুখ-

বিসদৃশ অনেক কিছুই আছে তো।

সেই শেষ পুঁজি ভেঙেই আজকের এই খেয়াল মেটাবেন নাকি? ক্ষতি কি? আর একবার শেষবারের মতো জ্বলে উঠতে না হয় ইহকালের সব পুঁজিই শেষ হবে। তবু সেই-ই হবে বাঁচার মতো বাঁচা।

বাইরে অপরাহ্নের আলো ম্লান হয়ে আসছে। এখনই দাসী আসবে চেরাগ নিয়ে। তার আগেই সেই গোপন তহবিল থেকে কিছু বার করতে হবে।

শুধুই ফিরিঙ্গি প্রসাধন-দ্রব্য নয়। আরও অনেক কিছু চাই। সাজ-পোশাক, অলংকার—ঝুটো হ'লেও তার দাম পড়বে কিছু—আর দিল্লী যাওয়ার রাহাখরচ। দিল্লীতে থাকতেও হবে ক'দিন। অন্তত পঞ্চাশটি মোহর খরচ হবে। তা হোক। আজ আর কিছু ভাববেন না।

লালকুঁয়র উঠে অন্ধকারের মধ্যেই বিছানার তলায় হাতড়ান। উত্তেজনায় হাত কাঁপছে তাঁর। কাঁপছে তাঁর সর্বাঙ্গ। কাঁপছে তার মনও।

আবার বয়েল-গাড়ির যাত্রা। লালকুঁয়র আর দাসী। আবার দিল্লী। ধূলিধূসরিত ক্লান্ত দেহে আবারও একদিন শাহ্‌জাহানাবাদের এক সংকীর্ণ গলিতে এসে পেঁছিনো। আজও তাঁর এ পথঘাটগুলো মনে আছে, এটাই আশ্চর্য! আসলে ক'দিনেরই বা কথা। এতগুলো বিপর্যয়, ভাগ্যের এমন বিচিত্র উত্থান-পতন—এত দ্রুত ঘটে গেছে তাঁর জীবনে যে, সেই জন্যেই মনে হচ্ছে বহুদিনের কথা হ'ল। বয়সই বা কত তাঁর? এরই মধ্যে বেওয়া-মহলে সর্বস্বান্ত নির্বাপিত সমাহিত জীবন যাপন করার কথা নয়।

ফাতিমা নাচওয়ালীর বাড়ি খুঁজে বার করা গেল বৈ কি!

সে বুড়ী আজও তেমনি আছে। চোদ্দ-পনেরো বছর আগেও যেমন দেখেছিলেন লালকুঁয়র—ঠিক তেমনিই। পাকাচুলে তেমনিই মেহেদীর ছোপ, চোখের পাতায় 'তেমনি গাঢ় কাজলের দাগ, ভাঙ্গা দাঁতে পানের কষ এবং মুখে কড়া তামাকের গন্ধ। সব ঠিক ঠিক—তেমনি আছে। আজও যে সে তার পুরোনো ব্যবসা—ছোট ছোট মেয়েদের কিনে এনে পুষে নাচ শিখিয়ে বিক্রি করা বা বাদশা-নবাব-ওমরাহ্‌দের হারেমে সরবরাহ করা—ছাড়ে নি, তা তার বাড়ির বাইরে থেকেই, ঘুঙুরের আওয়াজে এবং কিশোরীদের কলকণ্ঠে টের পাওয়া যায়।

দাসী মারফৎ খবর পেয়ে বুড়ী বেরিয়ে এল। চেরাগের আলোতে ভুরু কুঁচকে চেয়েও চিনতে একটু দেরি হ'ল—কিন্তু সেই ক্ষীণ দৃষ্টি এবং বিস্মৃতির কুয়াশা কাটিয়ে পরিচয়টা মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠতেই, যেন ভূত-দেখার মতো ভয় পেয়ে তিন পা পেছিয়ে গেল সে। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় একটা দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে কোনমতে কম্পিত হাতে কুর্নিশ করার একটা ভঙ্গী করতে করতে বহু কষ্টে উচ্চারণ করলে, 'মা-মা-মালেকা! আপনি! সত্যিই আপনি?'

লালকুঁয়র এগিয়ে এসে হাতটা চেপে ধরলেন ফাতিমার—'চুপ চুপ। মালেকা নয়। বেগম নয়। বেওয়া, বাঁদী। আজ কিছুই নেই আমার। না ক্ষতি

করার ক্ষমতা, না উপকার করার। অর্থ-সামর্থ্য সব গেছে। আজ আমিই তোমার সাহায্যপ্রার্থী। দ্যাখো—আশ্রয় দেবে, না পথের মানুষ পথে গিয়ে দাঁড়াব?—মন খুলে বলো। এতটুকু ক্ষোভ রাখব না, এতটুকু অভিযোগ করব না। চক্ষুলজ্জার কোন কারণ নেই। বলো—।'

ফাতিমা ততক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে। আর কোন সংশয় নেই। গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গী—পরিচিত যে তার, অতি পরিচিত।

সে 'লালী'র হাত ছাড়িয়ে আভূমি-নত হয়ে সেলাম করলে ওঁকে। বললে, 'এ বুড়ী আজও আপনার বাঁদী মালেকা। এ গরীবখানা আপনারই বাঁদী মহল। আসুন, ভেতরে আসুন।'

'তোমার বাড়িতে আমাকে গোপনে আশ্রয় দিতে পারবে তো ফাতিমা? আমার পরিচয়, আমার অস্তিত্ব কেউ না জানতে পারে—এমন ভাবে?'

ফাতিমা আবারও একবার অভিবাদন করলে—'এ কাজ বাঁদীর কাছে প্রথমও নয়, নতুনও নয় হজরৎ।'—সে লালকুঁয়রের হাত ধরে ভেতরে নিজস্ব নিভৃত ঘরটিতে নিয়ে গেল।

স্নান ও বিশ্রামের পর লালকুঁয়র তাঁর ইচ্ছাটা জানালেন ফাতিমাকে। ফাতিমা অনেকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল ওঁর মুখের দিকে। সে কি ভুল শুনছে, না ভুল বুঝছে? অতিকষ্টে অবশেষে উচ্চারণ করল সে, 'আপনি? আপনি যাবেন?' স্পষ্ট অবিশ্বাস তার কণ্ঠে।

'হ্যাঁ। আমিই যাব ফাতিমা। আমি যে সব পারি—তা কি আজও তুমি জানো না?—একদিন রাস্তার নাচওয়ালীদের সঙ্গে তোমার দোরে এসে দাঁড়িয়েছিলুম—সেদিনও তুমি দেখেছিলে আমাকে। আবার যেদিন দুনিয়ার বাদ্‌শার সঙ্গে তোমাকে দেখা দিতে এসেছিলুম—সেদিনও দেখেছ। আবার আজ এই—ভিখিরীর বেশে এসে দাঁড়িয়েছি—কিন্তু তাতে কি, আমি সেই আমিই—আজও চেষ্টা করলে অঘটন ঘটাতে পারব।'

'কিন্তু মালেকা' শুক্‌নো ঠোঁটে জিভটা বুলিয়ে নিয়ে বলে ফাতিমা, 'ফররুখশিয়ার বড় কড়া বাদ্‌শা। সিংহাসনে বসার দিন থেকেই রক্তপান শুরু করেছে সে—তবু তার তৃষ্ণা যেন মিটছে না। আর তেমনি তার যোগ্য সহচর হয়েছে—রাক্ষসের বন্ধু পিশাচ—মীরজুমলা।—যদি ধরা পড়ো মালেকা, মেয়েছেলে বলে, চাচী বলে রেয়াৎ করবে না।'

'তা জানি ফাতিমা। সে জন্য প্রস্তুত হয়েই যাচ্ছি! আর তাতে ক্ষতিই বা কি, কটা দিন বাঁচতুম—নাই বা বাঁচলুম! জীবনটাকে নিয়ে একটু খেলেই দেখি না। সোহাগপুরার এ জীবন, এ তো সমাধির নিচে বেঁচে থাকা। এর ওপর আমার লোভ নেই।'

'কিন্তু মালেকা'—আবারও বলতে যায় ফাতিমা।

লালকুঁয়রও বাধা দিয়ে বলেন, 'জানি। তাও জানি। ধরা পড়লে শুধু

আমার নয়, তোমারও প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। কিন্তু এমন একটা ব্যবস্থা করতে পারো না—যাতে তুমি নিজেকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রাখতে পারো? আর কারুর সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে—কোনমতে খোজা জাবিদ খাঁর চোখ এড়িয়ে পারো না লালকিল্লার ঐ নরককুণ্ডে, ঐ শাহী-হারেমে ঢুকিয়ে দিতে?'

'তা হয় তো পারি মালেকা। আজও তোমার মেহেরবানিতে সে ক্ষমতা হয়তো রাখি। কিন্তু কি দরকার? মিছিমিছি আর কেন এ সাংঘাতিক ঘূর্ণির মধ্যে এসে পড়ছ?'

সোজা হয়ে বসেন লালকুঁয়র—'ভুলতে পারি না যে ফাতিমা, কিছুতেই যে ভুলতে পারি না! আমার মালিক, আমার বাদ্‌শাকে কি নিষ্ঠুর ভাবে মেরেছে ওরা, কি অপমান করেছে। বাহাদুর শার বড় ছেলে সে—এ তখ্‌তের ন্যায্য মালিক। আমার অপরাধ যাই হোক, তারই তো তখ্‌ৎ। তবু ফররুখশিয়ারের রাগ বুঝতে পারি, জাহান্দার শা তার বাপের মৃত্যুর কারণ। কিন্তু ঐ সৈয়দ আবদুল্লা, ঐ সৈয়দ হুসেন—ওরা কেন এ কাজ করলে? কি অনিষ্ট করেছিল জাহান্দার শা তাদের? ওদের এই বেইমানীর শোধ দেবই আমি ফাতিমা। আজ কিছুই নেই হয়তো—তবু এই দেহটা তো আছে। এই দেহটাতেই তিনি ভুলেছিলেন—আমার শাহান্‌শাহ্‌। এর জন্যেই তিনি ইহকাল, ভবিষ্যৎ, রাজ্য সিংহাসন, মান সম্মান—সমস্তই ভুলেছিলেন। সে দেহে এখনও, আজও কিছু আগুন আছে—হয়তো খুবই সামান্য, হয়তো নিতান্ত স্ফুলিঙ্গ, তবু স্ফুলিঙ্গ থেকেও তো বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড হয় ফাতিমা। দেখাই যাক না। যদি এ চেষ্টায় মরি, তবু আমার দুঃখ নেই। বুঝব এ দেহটা তাঁর কাজেই দিতে পেরেছি। মালিকের অফুরন্ত স্নেহের ঋণ কিছু তো শোধ হবে।'

দুটো কাঁধের বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে ফাতিমা বললে, 'সে দ্যাখো মালেকা, তোমার মর্জি!'

॥ তের ॥

অবাক হয়ে চেয়ে আছেন বাদ্‌শা ফররুখ্‌শিয়ার। চোখে পলক পড়ছে না তাঁর। তাঁর বয়স অল্প হ'লেও—নাচ তিনি অনেক দেখেছেন এই বয়সেই—অনেক নাম-করা নর্তকীর নাচ দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর। কিন্তু এমন নাচ সত্যিই তিনি দেখেন নি। পা দু'টি যেন বাতাসে ভেসে আছে, পরীদের পাখনার মতো হালকা হাত দু'টি বিচিত্র লীলায় আন্দোলিত হচ্ছে তাঁর চোখের সামনে। পুষ্পদণ্ডের মতো নিখুঁত সুঠাম দেহযষ্টি কি অপূর্ব ছন্দেই না লীলায়িত হচ্ছে।

এ রূপ, এ কসরৎ, এ শিক্ষা, এতদিন ছিল কোথায়? কেউ এতদিন খোঁজ দেয় নি এ রত্নের?···তাতারী রক্তে আগুন লাগে ফররুখ্‌শিয়ারের। বিহ্বল হয়ে ডাকেন তিনি—'পিয়ারী, পিয়ারী কাছে এসো, আর একটু কাছে।'

বীণানিন্দিত কণ্ঠে উত্তর আসে, 'আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন শাহান্‌শাহ্‌!'

তা বটে। বিরক্তির সঙ্গে মনে পড়ে তাঁর। বন্ধু ও পার্ষদ উবেদুল্লা যখন

এই মেয়েটির কথা বলে, তখন এই কথাই বলে যে—'অপূর্ব এক নর্তকীরর পাঠাব শাহানশাহ্ আপনার কাছে—এমন কখনও দেখেন নি, কল্পনাও করেন নি—কিন্তু দুটি শর্তে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার গায়ে হাত দিতে পারবেন না, তার মুখও দেখতে পাবেন না। আর সে নাচ দেখাবে একা, তার নিজস্ব তবল্‌চী নিয়ে যাবে সে!'

'বলো কি মীরজুমলা!' ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন সম্রাট, 'কী এমন বেহেস্তের হুরী তিনি যে, এত শর্ত ক'রে নাচ দেখতে হবে? আর এমনই বা কি সতী যে, স্বয়ং বাদশাও হাত দিতে পারবেন না গায়ে!'

'হ্যাঁ শাহান্‌শাহ্, আমারও তাই মনে হয়েছিল কথাটা শুনে। তবে নাকি আমাকে যে বন্ধু এই রত্নের সন্ধান দিয়েছিল তার মতামতের ওপর আমার বিশ্বাস আছে বলেই আমি রাজী হয়েছিলুম। এই ভাবেই আমিও দেখেছি তার নাচ। কিন্তু সে অপূর্ব জিনিস শাহান্‌শাহ্, দেখে পর্যন্ত আপনার কথাই মনে হয়েছে খালি, আপনাকে না দেখিয়ে শান্তি নেই।'

অগত্যা রাজী হয়েছিলেন নবীন বাদ্‌শা। কৌতূহল শুধু, হয়তো বা একটু কৌতুকও বোধ হয়েছিল। তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। সত্যিই এমন জিনিস দেখার আশা করেন নি। কখনও কল্পনাও করেন নি। এ যেন সকল অভিজ্ঞতার বাইরে—

ঘরে 'শেজ্'-এর স্তিমিত আলো। দূরে এক কোণে তবল্‌চী বসে আছে—কিংখাবের পর্দার সঙ্গে মিশে—ইঙ্গিতমাত্র পর্দার আড়ালে চলে যাবে। শাহী হারেমে যারা বাজাতে আসে তাদের সকলেরই এ সহবৎ শেখা আছে। সেই স্বপ্নের মতো স্নিগ্ধ আলোতে পরীর মতো মেয়েটি নাচছে। মাথায় মুখে সুক্ষ্ম মসলীনের অবগুণ্ঠন। তাতে ঐ সুঠাম সুন্দর দেহের মতোই স্বর্গসুষমায় গড়া একখানা মুখের আভাস মাত্র পাওয়া যাচ্ছে, বেশী কিছু নয়। তার ফলে বাদ্‌শার তুরাণী রক্তে আরও বেশী কৌতূহল আরও বেশী লালসা বাড়ছে—ঐ অবগুণ্ঠন জোর ক'রে সরিয়ে ফেলে সুন্দর মুখের পরিপূর্ণ শোভা দেখবার এবং মুখের যে ডালিমফুলি অধর তিনি কল্পনা করছেন, তার সুধা পান করার বাসনা উদগ্র হয়ে উঠছে।

জীবনে ইচ্ছা-মাত্র রমণী সম্ভোগ করেছেন তিনি, বাদ্‌শা হবার আগেও। একে শাহ্‌জাদা—তায় রূপবান স্বাস্থ্যবান পুরুষ তিনি। সব তরুণীরই কাম্য। আজ বাদ্‌শা হবার পরও সামান্যা নাচওয়ালী তাঁকে এমনি অবহেলা ক'রে চলে যাবে?

অধীর অসহিষ্ণু ভাবে বলে ওঠেন বাদ্‌শা, 'হ্যাঁ, মনে আছে পিয়ারী। জোর ক'রে নেব না। কিন্তু কিনতে পারব না, এমন প্রতিজ্ঞা তো করি নি। কী কীমৎ তোমার বলো পিয়ারী—বাদ্‌শা—আমি, তার জন্যে আটকাবে না।'

হাসল মেয়েটি। মুক্তাঝরার মতোই খিলখিলিয়ে হাসল সে। হাসির শব্দ রক্তের উন্মত্ততা এমন বাড়ায়—তা এতদিন জানতেন না তরুণ বাদ্‌শা ফররুখশিয়ার!

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। অসহ্য ক্রোধে তাঁর কপালের শিরা ফুলে উঠেছে। ইচ্ছে করছে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলেন ফুলের মতো ঐ সামান্য দেহটা।

কিন্তু—মনে পড়ে গেল মীরজুমলার সতর্কবাণী। 'সাংঘাতিক মেয়ে শাহান্‌শাহ্‌। আমি প্রশ্ন করেছিলুম: "ধরো যদি আমার কথার ঠিক না রাখি।' সঙ্গে সঙ্গে—বোধ হয়, আমার শেষ কথা মুখ থেকে বেরোবার আগেই—বুক থেকে বের করেছিল ইরাণী কিরীচ। বলেছিল: "দুজনকে মারবার পক্ষে এই ছোরাই যথেষ্ট—কি বলেন নবাব সাহেব? আগে আপনি, তারপর আমি।" —খুব হুঁশিয়ার থাকবেন। জোর করার মেয়ে সে নয়!'

কথাটা মনে প'ড়ে ক্রোধটাকে আরও দুঃসহই ক'রে তোলে; শুধু অধীর ভাবে নিজের ঠোঁট নিজে কামড়ে রক্তাক্ত করেন বাদ্‌শা। হাত মুঠো করতে করতে নখ বিঁধিয়ে দেন নিজেরই হাতের তালুতে—

'তুমি মেয়েছেলে না হ'লে তোমার গোস্তাকীর জবাব এখনই দিতুম! কেন, কেন হাসছ তুমি? কী এমন তোমার দাম যা হিন্দুস্তানের বাদ্‌শা দিতে পারেন না!'

হাসি বন্ধ হ'ল না। বরং আরও খিলখিলিয়ে উঠল সেই কলকণ্ঠ। হাসতে হাসতেই বললে সে, 'গোস্তাকীর জবাব কি দেবেন আলিজা, ক্ষমতার মধ্যে আপনার তো আছে জান নেবার ক্ষমতা শুধু—তাও আমার মতো অবলা জীবের, কিন্তু জানের পরোয়া যে করে না তাকে নিয়ে কি করবেন? আপনি হুকুম দিলে অকারণেই এই ছুরি নিজের বুকে বসিয়ে দিতে পারি, এতটুকু দুঃখ তার জন্যে করব না। দেখুন, দেব বসিয়ে?'

বিদ্যুতের মতো ঝিলিক্‌ দিয়ে উঠল বাঁকা কিরীচখানা। হাতির-দাঁতের-কাজ-করা হাতলে এতটুকু সুরু একটু জিনিস—কিন্তু তার দিকে চাইলেই বোঝা যায়—সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতোই শাণিত আর অব্যর্থ।

ফররুখশিয়ার যেন কঠিন একটা আঘাত পেয়ে খানিকটা প্রকৃতিস্থ হলেন। হতাশ হয়ে বসে পড়লেন দিওয়ানে। বললেন, 'কিন্তু আমাকে এত অবহেলা তোমার কিসের? আমাকে বিদ্রূপ করার মতো এত সাহস আসে কোথা থেকে?'

এবার স-রব হাসি বন্ধ হ'ল। নৃত্যারতা আগেই থেমেছিল, এবার অভিবাদন ক'রে স্থির হয়ে বসল। ইঙ্গিতে তবল্‌চী নিঃশব্দে অদৃশ্য হ'ল পর্দার আড়ালে।

নর্তকী হাসি-মুখেই বলল, 'অপরাধ নেবেন না শাহান্‌শাহ্‌। অবহেলা ক'রে, বিদ্রূপ ক'রে হাসি নি। হেসেছি আপনার ছেলেমানুষিতে। কী শাহী তখ্‌তে আপনি বসেছেন, তা আপনি এখনও বুঝতে পারেন নি আলিজা? কতটুকু ক্ষমতা আপনার? এই হারেমের বাইরে আপনি আর কোথায় যা খুশি-তাই করতে পারেন? বাদ্‌শাহী করছে তো আপনার উজীর-এ-আজম, কুতুব-উল-মুলুক আর তার ভাই!—আপনি দাম দেবার কথা বলছিলেন শাহান্‌শাহ্‌—কী দাম দেবেন আপনি? বেশ, ধরা আমি দেব। এক ক্রোর টাকা আর সাতনরী মোতির মালা। দেবেন?'

মুখ শুকিয়ে ওঠে বাদ্‌শার। প্রতিকারহীন অপমানে রাঙা হয়ে ওঠেন।

ললাটে স্বেদবিন্দুর আভাস দেখা দেয়।

এক ক্রোর টাকা আর সাতনরী মোতির মালা! এত টাকা শাহী খাজানায় নেই। এর শতাংশও আছে কিনা সন্দেহ।

যুদ্ধের ফলে তাঁর কোষাগার নিঃশেষ। সিপাহীরা বহুদিনের বেতন পায় নি, রোজই গোলমাল করছে! বহু ঋণ সরকারের। আছে এক বেগমদের অলঙ্কার। সোনা-রুপোর বাসনগুলো পর্যন্ত লুঠ হয়ে গেছে। কৃপণ আজিম-উশ-শান বহু টাকা জমিয়েছিলেন কিন্তু সেই সর্বনাশা রাত্রিতেই, তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে, লুঠ-পাঠ হয়ে গেছে—এক কপর্দকও পান নি আজিম-উশ-শানের ছেলে ফররুখশিয়ার।

শুকনো ঠোঁটে জিভটা বুলিয়ে নিয়ে অসহায় ভাবে বাদশা বললেন, 'এ তুমি একেবারেই অসম্ভব দাম চাইছ। মাল না বেচবারই দাম এ তোমার। আমি কেন—আর কেউই দিতে পারবে না!'

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বেজে ওঠে সেই রজত-ঝরা কণ্ঠে, 'কে বলেছে আপনাকে শাহানশাহ্! এই শহরেরই একটি মানুষ রাজী হয়েছে এ দাম দিতে। আপনারই কুতুব-উল-মুলুক! সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ ঢের বেশী শাঁসালো লোক আপনার চেয়ে। নির্বোধ আপনি শাহানশাহ্, গোস্তাকী মাফ করবেন, না বলে পারলুম না—জাফর খাঁর বাড়ি আর জুলফিকর খাঁর বাড়ি পেয়েছে তারা, ঐ দুটো বাড়িতে জহরৎ কত ছিল তা জানেন? জুলফিকর খাঁর আগে ও বাড়িতে থাকতেন সায়েস্তা খাঁ—দু'জনেরই বহু পুরুষের ঐশ্বর্য ওখানে জমানো ছিল। বাহাদুর শার চার ছেলেরই বিষয় লুঠ করেছে বা করিয়েছে ওরা, সব ছিল ওখানে। শাহানশাহ্ এ জমানাতে টাকা যার, রাজত্ব তার। একথা ওরাও জানে, তাই ওরা বলে বেড়াচ্ছে যে, বাবরশাহী তখ্‌ৎ এবার ওদেরই—দু ভাই ভাগ ক'রে নেবে তখ্‌ৎ-এ-তাউস!—তাই, ধরা যদি দিতেই হয় তো তাদের হাতেই দেব। কি বলেন?'

নিরুদ্ধ রোষে আবীরের মতোই লাল হয়ে উঠেছিল বাদশার মুখ—সে রক্তিমা কেটে এক রকমের রক্তহীন বিবর্ণতা ফুটে উঠল। যা সূক্ষ্ম বাষ্পের আকারে ছিল, এখন তা-ই বড় বড় জলবিন্দুতে পরিণত হ'ল। ফররুখশিয়ারের আশ্চর্য সুন্দর শুভ্র ললাট ক্রমে সে জলবিন্দুতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তিনি কি যেন বলতে গেলেন কিন্তু তাঁর শুষ্ক কণ্ঠ ভেদ ক'রে তখনই কোন স্বর বেরোল না। বার দুই ঢোক গিলে অতি কষ্টে বললেন, 'নাচওয়ালী, তুমি কে তা আমি জানি না। কিন্তু তুমিই আমার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষিণী। আমার চোখ খুলে দিয়েছ তুমি। কিন্তু ভয় নেই, ওদের ষড়যন্ত্রের যোগ্য ফল পাবে ওরা।'

নর্তকী অভিবাদন ক'রে উঠে দাঁড়াল। কুর্নিশ ক'রে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই আকুল কণ্ঠে বাদশা আবার বলে উঠলেন, 'পিয়ারী পিয়ারী, তুমি এখনই চলে যেও না। আমি ঐ সৈয়দ আবদুল্লা আর হোসেন খাঁকে দলিত পিষ্ট করব, ওদের ঐ চুরি-করা ঐশ্বর্য সমস্ত এনে তোমার পায়ের তলায় ঢেলে দেব—তুমি প্রসন্ন হও, তুমি ধরা দাও।'

'যেদিন তা পারবেন সম্রাট, সেদিন যথাসময়ে এসে আপনার চরণে আশ্রয় নেব। আজ মাফ করবেন। এখন শুধু বখশিশটা পেলেই খুশী হবো!'

যেন প্রাণপণ চেষ্টায় বাদশা সামলে নিলেন নিজেকে। অপমানিত প্রত্যাখ্যাত হৃদয়াবেগের জ্বালায় দুই চোখও বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল—সেই বাষ্পের মধ্য দিয়ে সামনের এই মোহিনী নারীকে সর্পিণীর মতোই মনে হ'ল—তাকে সহ্য করাও যায় না, অথচ তার প্রভাবের বাইরেও যাওয়া যায় না যেন। কোনমতে গলা থেকে, সাতনরী নয়, একনরী এক মোতির মালা খুলে নর্তকীর গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টলতে টলতে আবার এসে দিওয়ানে বসে পড়লেন—একান্ত অবসন্ন ভাবে।

অন্ধকার রাত্রে দ্রুতপায়ে মহলের পর মহল পেরিয়ে চলল নর্তকী। তার অবারিত, নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত গতি দেখে মনে হ'ল এখানে সে নবাগতা নয়—এ প্রাসাদের পথ-ঘাট অলি-গলি তার পরিচিত। একেবারে ত্রিপোলিয়া ফটকের সামনে সে দাঁড়াল স্তব্ধ হয়ে।

এইখানকার ফাটকেই বাদশার বাদশা জাহান্দারকে বন্দী ক'রে রেখেছিল ওরা। তার পর এই মীরজুমলার পরামর্শে আর এই ফররুখশিয়ারের হুকুমে—কুৎসিত, অপমানকর ভাবে মেরেছে। লাথি মেরে মেরে মেরেছে ওরা—কুত্তার কুত্তা বেইমান নোকর একটা, জুতোসুদ্ধ লাথি মেরেছে তাঁকে।

অস্ফুটকণ্টে শুধু একবার একটা 'উঃ' শব্দ ক'রে উঠল নাচওয়ালী। সামান্য অব্যক্ত কাতরোক্তি, কিন্তু তবু দূর থেকে শান্ত্রীদের পদচারণা সে-শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। একজন বলে উঠল—'কে? কে ওখানে?'

এখনও এরা জেগে থাকবে এবং সত্যিই পাহারা দেবে—তা আশা করে নি। ত্বরিত বিদ্যুৎগতিতে নাচওয়ালী সরে এল সেখান থেকে।

পরোয়ানা আছে তার কাছে ঠিকই—নিরাপদে লালকিলা থেকে বেরিয়ে যাবার, কিন্তু কী দরকার হাঙ্গামা বাধাবার!

অশিক্ষিত বর্বর পাহারাদার ওরা—এই দূর নির্জনতার মধ্যে সুসজ্জিতা তরুণী মেয়ে পেলে এখনই হয়তো নিমেষে পাগল হয়ে উঠবে।

বাদশাকে ঠেকানো যায়, কারণ তাঁর সম্মানবোধ আছে। এরা পশু—এদের ঠেকানো শক্ত!...

ওদিক দিয়ে ঘুরে নর্তকী একসময় দিল্লী ফটকের সামনে এসে পৌঁছল। বোধ হয় আগে থাকতে তাই বলা ছিল—তবলচী এইখানেই অপেক্ষা করছিল। সে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে ওর সঙ্গ নিল।

তখন রাত শেষ হয়ে এসেছে। উষার খুব বেশী দেরিও নেই। ঘুমচোখে বিরক্ত মুখে পাহারাদার পরোয়াখানা খুলে দেখল। স্বয়ং মীরজুমলার হাতে লেখা পরোয়ানা—যে কোন সময় ফটক খুলে দিতে হবে। নাচওয়ালী ও তার তবলচী কোন সময়ই বাইরে যেতে বাধা না পায়। জরুরী, বিশেষ পরোয়ানা।

লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোতে পরোয়ানা চিনতে দেরি হয় না। বন্দুক নামিয়ে কোমর থেকে চাবির গোছা বার ক'রে ফটকের ছোট কাটা-দোরটা খুলে দেয় পাহারাদার। তার সঙ্গীরাও তন্দ্রাতে আচ্ছন্ন, এত রাত্রে দোর খুলে দেওয়ায় তারা বিস্মিত হলেও কোন প্রশ্ন করল না কেউ। একবার মাত্র চোখ খুলে দেখেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

নাচওয়ালীরা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই কাটা দোরটুকুও বন্ধ হয়ে গেল। নিশ্চিন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নর্তকী!

রুক্ষ বালুময় মরুপ্রান্তরের মতোই পড়ে আছে সমস্তটা। শেষরাত্রের বাতাস যমুনার তীর থেকে আরও বালি উড়িয়ে নিয়ে আসছে। হু হু ক'রে হাওয়া বইছে নদীর দিক থেকে—একটা হাহাকার, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতোই শোনাচ্ছে শব্দটা। ধু ধু করছে মাঠ। সেই অস্পষ্ট আবছায়ায় জায়গাটা খুঁজে বার করা শক্ত। তবু মেয়েটি খুঁজে পায় জায়গাটা।

হ্যাঁ। তার অন্তত কোন সন্দেহ নেই। এই—এইখানেই শাহানশাহের কাটা কবন্ধ এবং মুণ্ডুটা পড়ে ছিল। গলিত দুর্গন্ধ শব—শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য—তবু তা এককালে, তার বাদশা তার প্রিয়তমেরই দেহ ছিল। নদীর বালি উড়ে এসে ঢাকা পড়েছে তবু চিনতে অসুবিধা নেই। ঐ বালি সরালে এখনও হয়তো রক্তের আভাস, পচা মাংসের সঙ্গে জট-পাকানো বালির ডেলা মিলবে—

এই তো—এইখানে—

ছুঁড়ে ফেলে দিল নর্তকী তার ওড়না মুখ থেকে! ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সমস্ত অলঙ্কার গা থেকে! বহুমূল্য সাটিনের কামিজও খুলে ফেলে দিল। তার ভিতরে সামান্য সুতীর যে জামাটা ছিল—সেইটে রইল শুধু, তারপর সেই সাধারণ দীনবেশে দীনা হৃতসর্বস্বা রমণী বালির উপর লুটিয়ে পড়ল—ভগ্ন হৃদয়ের আর্ত হাহাকারে। বালি—রুক্ষ, শুষ্ক, তীক্ষ্ণ বালিতে মুখ রগড়ে রাজ্যেশ্বরেরও লোভনীয় সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুলল—

'শাহানশাহ্—জাহাঁপনা—মাপ করো আমাকে, মাপ করো। যেন আল্লার দরবারে পেঁছে তোমাকে পাই আবার, যেন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার অবসর পাই।'

বুক-ফাটা কান্না। নদীর ধার থেকে আসা বাতাসের হাহাকারের সঙ্গে মিশে সেই নিস্তব্ধ নির্জন রাত্রের অন্ধকারে সে কান্নার শব্দ বহুদূর প্রান্তরকে প্রতিধ্বনিত ক'রে তুলল। সে প্রতিধ্বনি ঘুরতে ঘুরতে লাল-কিলার পাষাণ-প্রাচীরে ঘা খেয়ে অদ্ভুত বিচিত্র আর এক শব্দের সৃষ্টি করতে লাগল। যেন কোন পিশাচ সেই রাত্রির বুক চিরে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে চাইছে—

তবলচী তার বাঁয়াতবলার পুঁটলি নামিয়ে দ্রুত ছুটে এসে বালির ওপরই নর্তকীর পাশে বসে পড়ল। জোর ক'রে তার মুখটা তুলে নিল নিজের কোলের ওপর।

'মালেকা, মালেকা—এ কি ক'রছেন! এখনই সকলে জানতে পারবে যে। এতক্ষণের এত চেষ্টা সব ব্যর্থ ক'রে দেবেন? শান্ত হোন, চুপ করুন!'

অনেকক্ষণের অনেক চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিলেন লালকুঁয়র। উঠে বসে মুখের ওপর থেকে বিস্রস্ত কেশভার সরিয়ে কেমন এক রকমের বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, 'ঠিক বলেছ ফাতিমা। আর কাঁদব না। কাঁদলে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর কাঁদবার দরকারও নেই। আমার শাহানশাহের মৃত্যুর শোধ নিয়েছি আমি। ফররুখশিয়ারের সিংহাসন টলিয়ে দিয়ে এসেছি। সৈয়দদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে পারবে না ও—তা আমি জানি। কেউই পারবে না। মুঘল সিংহাসনকে জাহান্নমে পাঠাতেই এসেছে ওরা। ফাতিমা, আমি আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ফররুখশিয়ারের পরিণাম। কেউ বাদ যাবে না। খোদার বিচার নিক্তির তৌলে নামে। জুলফিকর খাঁ আসাদ খাঁ তাদের বিশ্বাসঘাতকতার দেনা শোধ দিয়েছে কড়ায় ক্রান্তিতে। ফররুখশিয়ারও তার পাপের দেনা শোধ দেবে। ঐ ত্রিপোলিয়ার ফাটকে ঠিক ঐ রকম ভাবেই প্রাণ দেবে—অকারণ নৃশংসতা আর অপমানের দাম উশুল হবে। না, আর আমি কাঁদব না।'

ফাতিমার কাঁধে ভর দিয়েই উঠে দাঁড়ান লালকুঁয়র। কিন্তু যেতে গিয়েও কি মনে পড়ে যায় আবার।

খুঁজে খুঁজে কুড়িয়ে নিয়ে আসেন বাদশার দেওয়া মোতির মালা—আর কুড়িয়ে নিয়ে আসেন দুটো পাথর। তার পর পাথরের ওপর পাথর ঠুকে পাগলের মতো রেণু রেণু ক'রে গুঁড়িয়ে ফেলেন সেই বহুমূল্য মোতির মালা।

গুঁড়োনো শেষ হ'লে সেই চূর্ণ দুহাতে মিশিয়ে দেন সেইখানকার বালির সঙ্গে। আর অস্ফুট-কণ্ঠে বিড় বিড় ক'রে বলেন, 'প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও শাহানশাহ্—তৃপ্ত হও!

পূবের আকাশে তখন রক্তিমাভা জেগেছে, দূরে এরই মধ্যে দু-একজন স্নানার্থীকে দেখা যাচ্ছে যমুনার চড়া ভেঙ্গে চলতে। অসহিষ্ণু ফাতিমা এক-রকম জোর ক'রেই টেনে তোলে ওঁকে।—'চলুন মালেকা। বেলা হয়ে যাচ্ছে।'

আবার বয়েল গাড়ি। ধীর মন্থর তন্দ্রাতুর গতি তার! তেমনি কষ্টকর। তেমনি বৈচিত্র্যহীন।

আবার সেই সোহাগপুরা সামনে। জীবন্ত-সমাহিত সেই জীবন। দশ টাকা মাসোহারা এবং দুজনের মতো আটা-ডাল-ঘি।

তা হোক। লালকুঁয়র এবার পরিতৃপ্ত। তিনি তাঁর মালিকের শেষকৃত্য ক'রে আসতে পেরেছেন। আর কোন ক্ষোভ নেই।

॥ চৌদ্দ ॥

১১৩১ হিজিরাঃ ১০ই জমাদি-অল* দিল্লীর নাগরিক ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে।

সকাল হওয়ার আগেই খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের বাদ্‌শা—দরাজ-দিল, মুক্তহস্ত, দয়ালু বাদ্‌শা—রূপ এবং স্বাস্থ্যের জন্য বিখ্যাত তৈমুর বংশের মধ্যেও সর্বাপেক্ষা রূপবান ও শক্তিমান ফররুখশিয়ার আর ইহলোকে নেই। রক্তলোলুপ নরপিশাচরা তাঁকে শেষ পর্যন্ত হত্যাই করেছে।

খবরটা বাতাসে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর নাগরিকরা পথে বেরিয়ে পড়েছে। সকলের মুখেই শোকের ছায়া; আত্মীয়বিয়োগের ব্যথা অনুভব করছে এরা। শাসন-ব্যাপারে তিনি যতই অপটু হোন, আকবর-আলমগীর বাদ্‌শার সিংহাসনে বসবার তিনি যতই অনুপযুক্ত হোন—দিল্লীর নাগরিকদের কাছে তিনি প্রায় আত্মীয়ের মতোই ছিলেন। সেই ফররুখশিয়ার নিহত হয়েছেন, তাঁরই, উজীর-অমাত্যদের আদেশে, নিজের শ্বশুরের চক্রান্তে। এর চেয়ে শোকাবহ ব্যাপার আর কি হ'তে পারে?

অবশ্য এটা ঠিক যে, আজকের এ পরিণাম দু'মাস আগেই অদৃশ্য লিপিতে ভবিষ্যতের আকাশপটে লিখিত হয়ে গিয়েছিল—যেদিন সৈয়দদের পিশাচ অনুচররা হারেমের বিশ্রামকক্ষ থেকে টেনে বার ক'রে আবদুল্লা খাঁর আদেশে খাঁয়েরই সুর্মা-আঁকা-কাঠি দিয়ে তাঁকে অন্ধ করে এবং ত্রিপোলিয়া ফটকের অন্ধ কারাগৃহে পাঠিয়ে দেয়—সেই দিনই।

কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা ক্ষীণ আশা ছিল।

বাদ্‌শা বেঁচে আছেন এখনও। চোখে কাঠি বিঁধিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি নাকি একেবারে অন্ধ হন নি। এমন কি তাঁকে বিষ দিয়েও নাকি মারা যায় নি।

অতএব যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ!

নিত্য নানা গুজবও শোনা যাচ্ছিল। ওধারে নাকি 'সওয়াই-রাজা' জয়সিংহ এসে পড়েছেন প্রায়—তাঁর সঙ্গে আছেন তায়বর খাঁ আর রুদুল্লা খাঁ—দুজন দুর্ধর্ষ সেনাপতি। এদের মিলিত বাহিনীর সামনে নাকি উড়ে চলে যাবে সৈয়দদের সম্মিলিত শক্তি। প্রায়শ্চিত্তের আর বেশী দেরি নেই ওদের।

আবার এ-ও শোনা যাচ্ছিল যে সৈয়দরাও না কি ওঁদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়েছেন। আবদুল্লা ও হুসেন—এঁরা দুজনেই নাকি সে অনুতাপকে কার্যকরী করতে দৃঢ়-সংকল্প—তাঁরা নতুন রুগ্ন বাদ্‌শাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আবার ফররুখশিয়ারকেই সেখানে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবেন—তারপর দু ভাই ফকীর হয়ে বেরিয়ে যাবেন মক্কায়।

এমনি অসংখ্য গুজব। নিজেদের ইচ্ছা কল্পনায় মেশা দিবাস্বপ্ন সব।

সে গুজব সৈয়দদের কানেও উঠেছিল বৈ কি!

---

* ২৯শে এপ্রিল, ১৭১৯

আর তাঁরা যদি সে গুজবে শঙ্কিত হয়ে থাকেন তো, তাঁদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। ফররুখশিয়ার উদার, মুক্তহস্ত, রূপবান—কিন্তু অকৃতজ্ঞ। সৈয়দদের-শৌর্যে-কেনা সিংহাসনে বসার পর তাঁদের প্রতি ঈর্ষাই তাঁর বাদ্‌শাহীকে কণ্টকিত ও বিষাক্ত ক'রে তুলেছিল। আর সেই ঈর্ষায় ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র করেছিলেন তিনি, সে কণ্টক দূর করতে। কিন্তু পারেন নি, কারণ তৈমুরশাহী বংশের সাহস, বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি,—যা তাঁর পূর্বপুরুষদের একেশ্বর নিঃশত্রু করেছিল, তার কোনটাই ছিল না তাঁর। নির্বোধ, দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত ঃ কিন্তু তবু জনসাধারণের প্রিয়। যদি এই গুজবে দিল্লীর জনসাধারণ উত্তেজিত হয়—অথবা অপর কোন আমীর কি সেনানায়কের পুরাতন প্রভুভক্তি জাগ্রত হয় তো ফররুখশিয়ারের আবার তখ্‌ৎ-এ তাউসে বসতে খুব বিলম্ব হবে না।

আর সেক্ষেত্রে—আর যার বা যাদেরই অব্যাহতি থাক—সৈয়দদের নেই। নিষ্ঠুর ভয়ংকর প্রতিশোধ নেমে আসবে—অব্যর্থ, অব্যাহত গতিতে, শুধু ঐ দু' জনের ওপর নয়, ও'দের সমস্ত বংশের ওপর।

সুতরাং—

সে সম্ভাবনার মূলোৎপাটন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সৈয়দরাও তাই করেছেন।

কিন্তু দিল্লীর জনসাধারণ এত জানে না। তারা জানে তাদের প্রিয় বাদ্‌শাকে।

সেই বাদ্‌শা নিহত হয়েছেন কাল। তাঁর বিকৃত ক্ষতবিক্ষত শব একটা চাটাইয়ের ওপর ফেলে রাখা হয়েছিল ত্রিপোলিয়া ফটকের সামনে। আজ তাঁকে সমাধি দিতে নিয়ে যাওয়া হবে হুমায়ুঁ বাদ্‌শার সমাধি-ক্ষেত্রে। যেখানে মাত্র সাত বছর আগে ওঁর পিতা আজিম-উশ-শানের দেহ সাময়িকভাবে সমাহিত করা হয়েছিল—মৃত্তিকার সেই বিশেষ ক্রোড়েই চির-বিশ্রাম নেবেন উনি।

ভোর থেকে দলে দলে লোক জমেছে রাস্তায়। সকলেরই মুখ শুষ্ক, চোখ অশ্রুসজল। চাপা গলায় কথা বলছে সবাই। ধিক্কার দিচ্ছে নিজেদের অসহায়তাকে, অভিসম্পাত দিচ্ছে সৈয়দদের আর বাদ্‌শার শ্বশুর মহারাজা অজিত সিং রাঠোরকে।

ভিড়টা ফৈজ-বাজার এলাকাতেই বেশী। লালকিলার দিল্লী ফটক দিয়েই বেরোবে 'জানাজা' বা শবযাত্রা। এই পথ। এইখানকার আকবরাবাদী মসজিদ—যেখানে বিজয়ী ফররুখশিয়ারের আদেশে একদা ঘণ্টার পর ঘণ্টা হৃতসর্বস্ব বৃদ্ধ আসাদ খাঁকে বসে থাকতে হয়েছিল পথের ধুলোর ওপর—এইখানেই নাকি শেষ-কৃত্য সমাধা করা হবে, তারপর সে শব যাবে হুমায়ুঁ বাদ্‌শার সমাধিক্ষেত্রে।...

যথাসময়ে সে শবযাত্রা এসে পেঁছিল। শেষ-যাত্রার নমাজ পড়া হ'ল আকবরাবাদী মসজিদে। তারপর চলে গেল তা নগরের সীমানা ছাড়িয়ে—দূর পল্লীপ্রান্তে। কিন্তু ভিড় কোথাও কম নেই। এমন ভিড় যে বাদ্‌শাহী ফৌজেও পথ করতে পারে না কাফন নিয়ে যাবার। পথের দুধারে নিরন্ধ্র জনতা। দুপাশের বাড়ি ও ছাদ লোকে পরিপূর্ণ আর সেই বিপুল জনতা

থেকে—নরনারী-বাল-বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে—অবিরত ধিক্কার উঠছে। সে ধিক্কারের সামনে সৈয়দদের কর্মচারীরা বিব্রত, নতমস্তক। তারা যেন কোনমতে পালাতে পারলে বাঁচে। দু-চারটে ইট-পাটকেলও এসে পড়ছিল মধ্যে মধ্যে। কিন্তু সে ধৃষ্টতার জবাব দেবার দুঃসাহস শাহী ফৌজের নেই। হোক তারা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত, আর হোক এরা নিরস্ত্র। লক্ষ লোকের সামনে ক-টা অস্ত্রের মূল্য কি ?...

হ্যাঁ! বাদশাহী শবযাত্রার যোগ্য আয়োজনও কিছু কিছু ছিল বৈকি! তাতে কোন ত্রুটি হয় নি। ছিল সঙ্গে সঙ্গে উটের পিঠে রুটির বস্তা, মিঠাই এবং তাম্র-মুদ্রার বড় ধামা। কিন্তু রুটির বস্তা তেমনিই পূর্ণ রইল, মিঠাই কেউ স্পর্শও করলে না। পয়সা কিছু কিছু ছড়ানো হ'ল বটে—তবে তা তেমনি অনাদৃত ধুলোতেই পড়ে রইল—কেউ তার একটাও তুলে নিলে না।

না, ভিখারীর অভাব ছিল না। সেই বিপুল জনতার মধ্যে বহু সহস্র ভিক্ষুক ও দরিদ্র ছিল—কিন্তু তারা কেউ তাদের প্রিয় বাদশা ফররুখশিয়ারের রক্তের মূল্যে ঐ দান গ্রহণ করতে রাজী হ'ল না। শুধু সেদিন নয়—তার পর বহুদিন পর্যন্ত, ফররুখশিয়ারের মৃত্যুর সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট ছিল এমন কোন রাজপুরুষের কোন দান কেউ গ্রহণ করে নি।

আশ্চর্য—সেদিন আকবরাবাদী মসজিদের সেই দুঃসহ ভিড়ের মধ্যে কালো বোরখা-মুড়ি দেওয়া একটি রমণী-মূর্তিও এসে দাঁড়িয়েছিল পথের পাশে। চারিদিকের ঠেলাঠেলি পেষাপিষির মধ্যেও এতটুকু সংকুচিত হয় নি সে নারী, সরে পিছনে যায় নি। বরং সাগ্রহে সবাইকে ঠেলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার সে আচরণে বিস্মিত হয়েছিল চারিদিকের পুরুষরা—কিন্তু তখন তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কারুর সময় ছিল না।

আরও আশ্চর্য, শবযাত্রা দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতার বুক ফেটে যে হাহাকার উঠেছিল, তা এতটুকু প্রতিধ্বনি জাগায় নি এই রমণীর বুকে। কান্নার শব্দ তো পাওয়া যায়ই নি—বোরখার মধ্যে দৃষ্টি পেঁছিলে দেখা যেত যে তার দু চোখই আছে শুষ্ক, মুখের ভাব প্রশান্ত, নির্বিকার! বরং—বরং আরও লক্ষ্য করলে দেখা যেত যে একটা প্রচ্ছন্ন আত্মতৃপ্তির প্রসন্নতাই ফুটে উঠেছে সে মুখে।

বহু দূর থেকে এসেছে এই নারী।

এক যাযাবর বেদেনীর মুখে, ফররুখশিয়ারের প্রাণ নেওয়ার পরামর্শ চলেছে, এই খবর পেয়েই চলে এসেছে। একদিন আগেই পেঁচেছে, একদিন আগে থেকেই বসে আছে এই মসজিদের পাশে, অনাহারে, অনিদ্রায়। তা হোক, তাতে দুঃখ নেই তার। বরং তার সমস্ত দুঃখের অবসান হয়েছে। এখন আর বাঁচা না বাঁচা দুই-ই তার কাছে সমান।...

শবযাত্রা চলে গেল দূরে, তার লক্ষ্যপথে। সেই সঙ্গে অনুগমনকারী বিপুল জনতাও আকাশের বহু উর্ধ্ব পর্যন্ত ধূলির মেঘ সৃষ্টি ক'রে একসময় চোখের

আড়াল হয়ে গেল। মিলিয়ে গেল দূর থেকে দূরান্তরে সেই বহু সহস্র বুক-ফাটা হাহাকার এবং স্বতঃ-উৎসারিত রোদনের ধ্বনি।

কিন্তু সেই রমণী তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল সেখানে, বৈশাখ মধ্যাহ্নের খররৌদ্র মাথায় ক'রে। আর কৌতূহল নেই তার, নেই কোন ঔৎসুক্য। তৃপ্ত হয়েছে সে। মিটেছে তার তৃষ্ণা। কিন্তু সেই সঙ্গে বুঝি হারিয়ে গেছে তার জীবনের সহজ অনুভূতিগুলোও।

এখানে এসে অনেক সংবাদই সংগ্রহ করেছে সে রমণী।

যে ঘরে জাহান্দার শা ছিলেন—সেই গহ্বরেই রাখা হয়েছিল ফররুখশিয়ারকে। কিন্তু ঢের—ঢের বেশী লাঞ্ছনার মধ্যে। অখাদ্য খেয়ে উদরাময় হয়েছে—জল পান নি একটু শৌচ করবার। অতিরিক্ত লবণাক্ত খাদ্য দেওয়া হয়েছে, দেওয়া হয়েছে বিষতিক্ত খাদ্য। তবুও মরেন নি—কিন্তু মৃতের অধিক মৃত অবস্থায় ছিলেন তিনি। সান্ত্বনার মধ্যে ছিল মনে মনে কোরান-আবৃত্তি কিন্তু অশুচি অবস্থায় তাও নিষিদ্ধ বলে সেটুকুও শেষের দিকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জামা নেই, জুতো নেই, শয্যা নেই, আলো নেই—অন্ধ পাষাণ-কারায় এইভাবে দিন কাটিয়েছেন—শাহান্‌শাহ্‌।

তবুও মরেন নি ফররুখশিয়ার।

অবশেষে গতকাল রাত্রে ঘাতক পাঠানো হয়েছিল। শ্বাসরোধ ক'রে মারা হয়েছে তাঁকে। গলায় দড়ির পাক দিয়ে দিয়ে। প্রাণপণে তবু শেষ অবধি বাঁচবার চেষ্টা করেছেন—চেষ্টা করেছেন এ অপমান এড়িয়ে পাষাণ-প্রাচীরে মাথা ঠুকে মরতে—কিন্তু কিছুই হয় নি।...শ্বাসরোধ হয়ে মরবার পরও তাঁর মৃত দেহটা অব্যাহতি পায় নি, অসংখ্য অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত বিকৃত করা হয়েছে—রূপবান ও স্বাস্থ্যবান ফররুখশিয়ারের দেহ!

'জাহান্দার শা, জাহান্দার শা—তুমি কি তৃপ্ত হয়েছ? শান্ত হয়েছে তোমার আত্মা?'

বার-বার অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করে সেই অবগুণ্ঠিতা নারী।

কিন্তু না ভেতরে আর না বাইরে—বুঝি জবাব মেলে না।

তারপর বহুদূর পথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় শিউরে ওঠে সে। সাগ্রহে বলে, 'কিন্তু তবু তোমার মুখ ম্লান কেন বাদ্‌শা, তুমি কি এ চাও নি? বলো, বলো। চুপ ক'রে থেকো না!'

'বেগমসাহেবা?'

চমকে ফিরে চান লালকুঁয়র। বেদেনী কখন নিঃশব্দে এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

'সোহাগপুরায় ফিরবে না? যাবে না এখান থেকে?...তোমার নতুন সঙ্গিনী যাচ্ছে যে একজন!' হাসে বেদেনী। অদ্ভুত বিচিত্র আনন্দ তার সে হাসিতে।

বিষাক্ত? তির্যক? হিংস্র? না—কিছুই না। বিচিত্র শুধু।

'কে রে? কে যাচ্ছে?'

'নূরমহল বেগম সাহেবা।' আবারও হাসে বেদেনী।
'হ্যাঁ, হ্যাঁ। যাবো। এখনই যাবো। সে কি বেরিয়েছে?'
'সন্ধ্যায় রওনা হবে—রোদ একটু পড়লে।'

দিল্লী দরওয়াজা দিয়েই 'বহল'খানা বেরোয়—নূরমহল বেগম সাহেবার। পর্দা-দিয়ে-ঘেরা গাড়িখানা দিল্লী শহরের রাজপথ ছেড়ে এক সময় শহরের উপান্তেও পেঁছিয়।

কোন তফাৎ নেই লালকুঁয়রের যাত্রার সঙ্গে। তেমনিই দুজন সশস্ত্র রক্ষী সঙ্গে। হয়তো নূরমহল বেগমের সঙ্গে কিছু মণিমাণিক্য বেশী আছে—হয়তো তাও নেই। সবই এক।

শহরের ফটক পার হয়ে গাড়ি দাঁড়ায় একবার। অতিরিক্ত কান্নার ফলে বেগম সাহেবার গলা শুকিয়ে গেছে, জল চাই একটু। রক্ষীদের একজন যায় জলের খোঁজে।

'মালেকান।' বোরখায় মুখ ঢাকা এক রমণীমূর্তি গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়।

'কে?' চমকে প্রশ্ন করে নূরমহল।

'আমি আপনার বাঁদী।' বোরখা খুলে অভিবাদন ক'রে দাঁড়ান লালকুঁয়র।

দুই রূপসী নারী দুজনের মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে।

'কে কে তু—আপনি?' আবারও বিহ্বল ভগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করে নূরমহল।

'আমি আপনার বাঁদী। আমিও সোহাগপুরায় থাকি—এ বাঁদীর নাম লালকুঁয়র!'

'ইমতিয়াজ-মহল?' সব ভুলে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে নূরমহল।

লালকুঁয়র এসে ওর হাত দুটো চেপে ধরেন। মিনতির সুরে বলেন, 'সে অভাগী মরে গিয়েছে! আমি সত্যিই বাঁদী। একদিন বিদ্বেষে ও ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে তোমার অনিষ্ট কামনা করেছিলাম—প্রত্যক্ষে না হ'লেও পরোক্ষে। প্রতি-হিংসায় অন্ধ হয়ে চেয়েছিলাম ফররুখশিয়ারের সর্বনাশ। আজ আমার ভুল ভেঙ্গেছে।···প্রতিহিংসায় মানুষের নিজের অনিষ্টের প্রতিকার হয় না, শুধু পাপ বাড়ে। এক প্রতিহিংসা সহস্র প্রতিহিংসার পথ খুলে দেয়। পাপ পাপকে ডেকে আনে—হিংসায় হিংসার বৃদ্ধি হয়। আজ সহস্র লোকের অশ্রুতে ফররুখশিয়াবের কলঙ্ক ধুয়ে গিয়েছে—কিন্তু আমার কলঙ্ক বুঝি রয়েই গেল। তাই, তাই আজ চাইছি তোমার সেবার অধিকার। বড় কষ্ট সেখানে, যদি নিজের প্রাণপণ চেষ্টায় তোমার সেই কষ্ট কিছু লাঘব করতে পারি, তা'হলেই বোধ হয় আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।'

কান্নায় ভেঙ্গে আসে ওঁর কণ্ঠ।

গাড়ি থেকে নেমে এসে লালকুঁয়রের বুকে মুখ রেখে আবাবও হু-হু ক'রে কেঁদে ওঠে নূরমহল!

বহু রাত্রে দূর থেকে আজও একটি আলো দেখা যায়। আজ আর কোন প্রশ্ন

করেন না লালকুঁয়র, জানতে চান না স্থানটার নাম। শুধু আঙুল দিয়ে আলোটা দেখান নুরমহলকে, বলেন, 'ঐ যে আলো দেখছ—একটি দম্পতি বসে ওখানে এতরাতেও দশ-পঁচিশ খেলছে। ওরা দুজন দুজনকে শুধু ভালবেসেই সুখী। কে রাজা হ'ল আর কে বাদশা হ'ল, সে খবর ওরা রাখে না—পরোয়াও করে না। ওদের ঐ বাড়িতে আমি গেছি—ঐ ভাঙ্গা কুটিরটিই পৃথিবীর মধ্যে আসল সোহাগপুরা—ওদের জীবনে প্রত্যেকটি রাতই সোহাগরাত!* যাবে, যাবে বেটি ওদের দেখতে?'

নুরমহল ঝাপসা বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকায় একবার, তারপর প্রবল ভাবে ঘাড় নাড়ে। বলে, 'না চাচীজি, আমাদের চারিদিকে বিষ আছে, পাপ আছে। আছে অভিশাপ। আমরা গেলে ওদের সোহাগপুরাতেও হয়তো আগুন লাগবে—দরকার নেই!'

লালকুঁয়র স্তব্ধ হয়ে যান। একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন সেই আলোটার দিকে। তারপর চারিদিকের গাঢ় অন্ধকারে একসময় সে আলোটাও মিলিয়ে যায়।

---

* ফুলশয্যার রাত

এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরিত্র ও স্থানের পরিচয় সংকেত

মুইজ-উদ্দীন : মুঘল বাদশা ঔরংজেব বা প্রথম আলমগীরের পৌত্র, প্রথম বাহাদুর শা'র জ্যেষ্ঠপুত্র। পরে জাহান্দার শা নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মির্জা মহম্মদ করিম : বাহাদুর শার মধ্যম পুত্র আজিম-উশ-শানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ; জাহান্দার শার ভ্রাতুষ্পুত্র। কথিত আছে সত্য-সত্যই নাকি ইনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইতে গিয়া পথ খুঁজিয়া পান নাই। নিজের তাঁবুর চারিপাশেই সারারাত ঘুরিয়াছিলেন।

ফররুখশিয়ার : আজিম-উশ-শানের মধ্যম পুত্র।

আসাদ খাঁ : তরুণ বয়সে ঔরংজেবের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁহার আস্থাভাজন হন। কার্যত স্বল্পকালমধ্যে ইনিই প্রধান উজীর হইয়া ওঠেন—যদিচ অপর সম্ভ্রান্ত-বংশীয় আমীরগণের বিরাগ সৃষ্টির ভয়ে ঔরংজেব দীর্ঘকাল ইঁহাকে নামে প্রধান উজীর করিতে পারেন নাই। ইনি শাহজাহানের রাজত্বকালেই শাসক শ্রেণীভুক্ত হন।

জুলফিকর খাঁ : আসাদ খাঁর পুত্র। সেনাপতি হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। আজিম-উশ-শান বাহাদুর শার প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই বাদশা হইবেন ইহাই কতকটা স্বতঃসিদ্ধ ছিল। মুইজ-উদ্দীন মধ্যম ভ্রাতার হাতে নিহত হইবার ভয়ে পিতার মৃত্যুর পর যখন পলায়ন করেন তখন তাঁহার সঙ্গে সামান্য কয়েকজন মাত্র অনুচর ছিল। অন্য সমস্ত ওমরাহ্ই আজিম-উশ-শানকে অভিবাদন জানাইতে যান—সে সময় জুলফিকরও আনুগত্য জানাইয়া একটা চিঠি লেখেন। আজিম-উশ-শানের জনৈক কেরানী সেই চিঠির উত্তরে অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ এক পত্র দেন। তাহাতেই মর্মাহত হইয়া জুলফিকর সসৈন্যে জাহান্দারের সঙ্গে যোগ দেন। জুলফিকরের তখন এত খ্যাতি যে তিনি যোগ দিয়াছেন জানিয়া আরও বহু আমীর সেই পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। জুলফিকরের পরামর্শে ও তাঁহারই মধ্যস্থতায় মুইজ-উদ্দীন অপর দুই ভ্রাতাকে স্ব-দলে আনয়ন করেন। আগ্রার যুদ্ধে (১০ই জানুয়ারী, ১৭১৩ খৃঃ) জাহান্দার শার হস্তী আহত হইলে তিনি যখন ঘোড়ায় চাপিয়া পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিবেন, তখন লালকুঁয়র তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করেন এবং জোর করিয়া তাঁহাকে লইয়া পলাইয়া যান। জুলফিকর তাঁহাকে খুঁজিবার অনেক চেষ্টা করেন, সে সময়ে বাদশাকে পাইলে হয়তো তখনও যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হইত।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় : সৈয়দ আব্দুল্লা খাঁ ও সৈয়দ হুসেন খাঁ। ইঁহারা বংশানুক্রমিক যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর বাহাদুর শার পক্ষে যুদ্ধ করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু বাহাদুর শা ইঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই। জাহান্দারের সিংহাসন আরোহণের সময় আবদুল্লা এলাহাবাদের শাসনকর্তা ও হুসেন পাটনার সহকারী শাসনকর্তা ছিলেন। জাহান্দারের দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া ইঁহারা ফররুখশিয়ারের সহিত যোগ দেন—এবং প্রধানত ইঁহাদের সাহায্যেই ফররুখশিয়ার সিংহাসন লাভ করেন। তাহার পর ইঁহারাই সর্বময় কর্তা হইয়া ওঠেন। ফররুখশিয়ার সহসা ইঁহাদের উপর সন্দিগ্ধ ও বিদ্বিষ্ট হইয়া ওঠেন ও অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ আচরণ করিতে থাকেন। শেষে বিরক্ত হইয়া ইঁহারা ফররুখশিয়ারকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করেন। প্রথমে তাঁহাকে অন্ধ করিয়া পরে জাহান্দার শার অনুরূপ অবস্থাতেই বধ করা হয়। তাহার পরও ইঁহারা ইচ্ছামতো পর পর কয়েকজনকে বাদশা করেন; কিন্তু সে নামেমাত্র, আসলে ইঁহাদেরই কর্তৃত্ব অটুট থাকে। মহম্মদ শার রাজত্বকালে ইঁহারা প্রধানত নিজাম-উল-মুলুকের ষড়যন্ত্রে নিহত হন।

লালকুঁয়র : নর্তকী! জাহান্দার শা ইঁহার রূপমুগ্ধ হন এবং একান্তভাবে বশীভূত হইয়া পড়েন। আদর করিয়া 'ইমতিয়াজ মহল' উপাধি দেন। ইনি নাকি সঙ্গীত-সাধক তানসেনের বংশোদ্ভূতা। জাহান্দার বাদ্‌শা হওয়ার পর লালকুঁয়র যথেচ্ছাচার করিতে থাকেন। নুরজাহাঁর মতো নিজের নামে নাকি মুদ্রাও ঢালাই করাইয়াছিলেন। ইঁহার ভাই ভগিনপতি তো বটেই, পূর্ব-পরিচিত বাজনদার, এমন কি সামান্য সব্‌জীওয়ালীকেও জায়গীর, খেতাব ও খিলাৎ বিতরণ করিয়াছিলেন। সামান্য পথের নর্তক ও বাজনাদাররা নিমন্ত্রিত হইয়া বাদ্‌শার সহিত মদ্যপান করিত—সময়ে সময়ে পানোন্মত্ত অবস্থায় বাদ্‌শাকেও যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিত, প্রহারও করিত। লালকুঁয়রের বিরাগ-ভাজন হইবার ভয়ে তিনি প্রতিবাদ মাত্র করিতেন না।…জাহান্দার জীবনের শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত ইঁহার প্রেমে মুগ্ধ ছিলেন।

সোহাগপুরা : 'বেওয়া-মহল'। মৃত বাদ্‌শাদের অসংখ্য পত্নী ও উপপত্নীদের জন্য নির্মিত একটি মহল। Irvine-এর Later Mughals-এ আছে—Suhagpura (Hamlet of Happy wives) or the Bewa-khana (Widow-house) was one of the establishments (karkhanajat) attached to the Court, "where in the practice of resignation they pass their lives receiving rations and a monthly allowance"। Dastur-ul-aml)। ইহার অবস্থান পরিষ্কার জানা যায় না। এ বিষয়ে আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়কে পত্র লিখিলে তিনি

জানান,—"সোহাগপুরা—যতদূর বুঝা যায়, কয়েকটি ঘর, বাহিরে প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া, ছোট একটি স্বতন্ত্র অন্তঃপুর গঠিত করা হয়। বাদশাহী প্রাসাদের অঙ্গ। আগ্রাতেও সোহাগপুরা ছিল, এরূপ মনুচী লিখিয়াছেন (যদি দিল্লী বলিতে ভুল করিয়া না থাকেন)। দিল্লীর লালকিলার একটি অংশে (নাম 'সালাতীন') বন্দী রাজকুমারগণ থাকিতেন অত্যন্ত দুর্দশায়। এটা যমুনাতীরের দেওয়ালের ভিতর। ২য় শাহ আলমের সময় দুবার ঐ স্থান হইতে কুমাররা পালায়। ব্রিটিশ সৈন্য মিউটিনির পর দিল্লী দুর্গে বসতি করে এবং ঐসব 'সালাতীন' জীর্ণ ঘরগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া, পরিষ্কার খোলা জায়গা ও ব্যারাক প্রস্তুত করে লালকিলার অনেক দক্ষিণে যমুনার পশ্চিম তীরে খাওয়াসপুরা নামক এক মহল্লা ছিল, সেটাকে সোহাগপুরা ভাবিবার কোন কারণ নেই—যদিও দাসদাসীরা সেখানে বাস করিত। (when off-duty or retired on account of age)।" বর্তমান গ্রন্থে সোহাগপুরাকে লালকিল্লা ও দিল্লী হইতে কিছু দূরে একটি স্বতন্ত্র উপনিবেশ কল্পনা করা হইয়াছে।

মনে ছিল আশা

এইটি লেখকের প্রথম উপন্যাস

[এই গ্রন্থের রচনাকাল : ১৯২৯-৩০, ১৯৩৯-৪০]

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস

করকমলেষু—

॥ এক ॥

বর্তমানকালের সামান্য একটু সুযোগের অভাবে আগামীকালের অনেকখানি সুবিধা মানুষের হাতছাড়া হইয়া যায়, ইহা মানব-জীবনের অতি সাধারণ ঘটনা। ঠিক এমনই একটা বিয়োগান্ত ব্যাপার ঘটিয়া গেল অমলের জীবনে, যেদিন দেশ হইতে ঐ টেলিগ্রামটি আসিয়া পেঁছিল। টেলিগ্রামের ভাষা খুব সংক্ষিপ্ত, কারণ শব্দের ন্যূনতম নির্দিষ্ট সংখ্যাকে লঙ্ঘন না করিবার একটা অদম্য চেষ্টা তাহার মধ্যে ছিল, সুতরাং 'অন্নদা মরিতেছে। এস।' এইটুকু ছাড়া তাহার ভিতর হইতে আর কোন সংবাদই সংগ্রহ করা গেল না।

কিন্তু ওইটুকু সংবাদই যথেষ্ট। অন্নদা অমলের মাসী, ছেলেবেলায় তিনিই অমলকে মানুষ করিয়াছিলেন। স্নেহও যথেষ্ট করেন। তাহার মাসতুতো ভাইয়েরা যে টেলিগ্রামের কয়েক আনা পয়সা খরচা করিয়াছেন, তাহা ও-পক্ষের অনেকখানি তাড়াতেই; এবং হয়ত শেষ সময়ে উপস্থিত হইতে পারিলে কিছু পাওয়াও যাইত। কিন্তু অমল ভাবিয়া দেখিল, দেশে পেঁছিতে গেলে দু'টাকা এগার আনা শুধু ট্রেন ভাড়াই লাগে, তাহা ছাড়া আরও অন্তত দুই-চারি আনা সঙ্গে থাকা প্রয়োজন। সে জায়গায় আছে তাহার কাছে মাত্র সতেরটি পয়সা। সুতরাং মাসীকে শেষ দেখার আশা সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত ত্যাগ করিল।

আর যাহাই হউক, অমলের অবস্থাটা ঠিক ঈর্ষার বস্তু নয়। দেশের কথা ভাবা সে ছাড়িয়া দিয়াছে, কারণ সেখানে ফিরিবার আর পথ নাই। বাবা আছেন, মাও আছেন এবং সাধারণ বাঙালী সংসারের মতই ভাইবোনেরও অভাব নাই। কিন্তু অভাব একটা বড় রকমের আছে, সেটা অবশ্য বলাই বাহুল্য, টাকার। বাবা গ্রামের 'মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের' তৃতীয় শিক্ষক। মাহিনা ত্রিশ বৎসরে বাইশে পেঁছিয়াছে, অবশ্য সই করিতে হয় ত্রিশ টাকার রসিদে। জমি-জায়গা যৎসামান্য আছে, তাহার ব্যয় আয়ের অপেক্ষা বিশেষ কম নয়। সুতরাং ম্যাট্রিক পাস করার পরই অমলের বাবা যদি তাহার জন্য উক্ত 'মধ্য ইংরেজী'তেই আর একটি মাস্টারির ব্যবস্থা করেন তো অন্যায় কিছু হয় না, বরং ভবিষ্যতের দিকে চাহিলে, ভবিষ্যৎ কেন সেটা তাহার বর্তমানই, খুব ভাল ব্যবস্থা। হয়তো এতদিনে অমল বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়া বসিতে পারিত, হয়তো বা ছেলে-মেয়েদের দোহাই দিয়া সেক্রেটারিবাবুকে ধরিয়া পড়িলে তাহার কুড়ি টাকা মাহিনাটা বাড়িয়া একুশ টাকাও হইয়া যাইত।

কিন্তু অমলের এ ব্যবস্থা ভাল লাগে নাই, যেমন ভাল কথা অনেকেরই ভাল লাগে না। তাই সে একদা বাপের অতিকষ্টে জমানো টাকার মধ্য হইতে তিয়াত্তরটি টাকা মাত্র সম্বল করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল। তিয়াত্তরটি টাকা অবশ্য

তিয়াত্তর পয়সায় পৌঁছিতে অনেকখানি সময় লাগে নাই, কিন্তু অমলের অদৃষ্টক্রমে দশ টাকা মাহিনার একটি টুইশন ইতিমধ্যেই সে পাইয়াছিল। পাঁচটি ছেলেমেয়ে, সকালে ঘণ্টা-দুই করিয়া পড়াইতে হয়।

তারপর বিস্তর চেষ্টা করিয়াও সে আর একটি কাজও জুটাইতে পারে নাই। টুইশন করিয়া পড়াশুনা করিবার আশা তো সে অনেককালই ছাড়িয়া দিয়াছে, এখন ভাত জুটাইবার আশাও ছাড়া ভিন্ন গত্যন্তর দেখা যাইতেছে না।

ইতিমধ্যে পূর্বেকার মেসের অনেকগুলি টাকা বাকী পড়ায় অমল সে মেস ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে। এবারে বুদ্ধির কাজ করিয়া সুধ চার টাকা দিয়া একটি সীট ভাড়া লইয়াছিল, আহারাদি দুই পয়সার ভাত, এক পয়সার দাল হিসাবে নগদ হোটেলেই সারিত। কিন্তু তাহাতে গ্রাস চলিলেও আচ্ছাদন চলে না, অথচ আচ্ছাদনটাও প্রয়োজন। সুতরাং একখানা কাপড়, একটা জামা ও এক-জোড়া চটি কিনিতেই হইল, আর তাহাতে খরচও পড়িল প্রায় চার টাকা। ফলে এ মাসে সীটরেণ্ট বাবদ ম্যানেজারকে সে এক টাকার বেশী আর দিয়া উঠিতে পারে নাই। মেসের ম্যানেজার প্রকারান্তরে সীট ছাড়িয়া দিতেই বলিয়াছেন, কিন্তু উপায় নাই বলিয়াই সে চোখ-কান বুজিয়া পড়িয়া আছে, বাঁকা কথার সরল অর্থ বুঝিবার চেষ্টা-মাত্র করিতেছে না।

আরও একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে অমল টেলিগ্রামের কাগজখানা গুটি পাকাইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া জীর্ণ অতি মলিন বিছানাটাতেই আবার শুইয়া পড়িল। সাবানের অভাবে বিছানাটা বহুকাল পরিষ্কার হয় নাই, অথচ সেটা এতই ময়লা হইয়াছে যে পাশের সীটের ভদ্রলোকটি তাহার দিকে চাহিলেই অমলের মনে হইত যে তিনি বিশেষ করিয়া তাহার বিছানাটার দিকেই চাহিতেছেন। সতেরটা পয়সা আজও হাতে আছে সত্য, কিন্তু মাহিনা পাইবার তখনও তিন দিন দেরি। ধার করিবার চেষ্টা সে অনেকদিনই ছাড়িয়াছে, মেসে কেহ কাহাকেও ধার দেয় না, চারিটি পয়সা চাহিলেও হয় খালি মনিব্যাগ দেখায়, নয়তো সে যে এইমাত্র নিজেই পাশের ঘরে পয়সা ধার করিতে গিয়াছিল, শপথ করিয়া এই সংবাদটি ঘোষণা করে।

ভাগ্যে সে যেখানে পড়ায় তাঁহারা নিয়মিত দু' তারিখে মাহিনাটা দেন। কিন্তু তাহাতেই বা সুবিধা কি। দশ টাকার মধ্যে অন্তত পাঁচটি টাকা এ মাসে ম্যানেজারকে দিতেই হইবে। বাকী থাকে পাঁচ—তাহারই মধ্যে খাওয়া, তেল, সাবান, নাপিত, সব আছে। তবু ধোপার খরচা নাই। এই অবধি হিসাব করিলেই মাথা খারাপ হইয়া যায়, অথচ আরও একখানা কাপড় না কিনিলেও লজ্জা নিবারণ হয় না।

অর্থ উপার্জনের যত রকম পন্থা আছে, সবগুলিই সে ভাবিয়া দেখিয়াছে কিন্তু কোনটাতেই কিছু সুবিধা হয় নাই। এক পকেট কাটা ছাড়া আর সব ব্যবসাতেই মূলধনের প্রয়োজন হয়, যেটার একান্ত অভাব তাহার। আর পকেটমার হওয়ার মত যথেষ্ট 'স্মার্ট'ও সে নয়,—অন্তত এই তাহার বিশ্বাস।

টাকা কেহ দেয় না বটে, কিন্তু উপদেশ দেওয়ার লোকের অভাব নাই। পাশের সীটের কার্তিকবাবু প্রায়ই বলেন, ওহে, একটা টাকা তুমি বিশ্বাস ক'রে আমার হাতে দিয়ে দেখ দেখি, কাল এসে পাঁচটি টাকা পকেটে ফেলে দিয়ে যাব।

কার্তিকবাবু কাজ করেন কী যেন একটা সরকারী অফিসে, কিন্তু সেটা তাঁহার গৌণ ব্যাপার। মুখ্য পেশা তাঁহার জুয়া খেলা। ঘোড়দৌড়ের মাঠের যাবতীয় সংবাদ তাঁহার কণ্ঠস্থ—কোন্ ঘোড়ার নাকের মধ্যে কবে ঘা হইয়াছিল, কোন্ ঘোড়া দৌড়ের সময় একবারও নাক ঝাড়ে না, এসব সংবাদ তাঁহার ডায়েরিতে নোট করা আছে। 'সানস্টার' কবে তিন পায়ে দৌড়িয়া ডার্বি জিতিয়াছিল আর কবে গৌরীশংকর কুয়াশার সুযোগে বিচারকদের চোখে ধুলা দিয়াছিল, সেই সব সরস কাহিনী প্রত্যহই আহারের সময় তিনি সকলকে শোনান। মেসের অনেককে 'সিওর টিপ'ও তিনি মধ্যে মধ্যে দিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আজকাল কেহই প্রায় বিচলিত হয় না।

স্ত্রী-পুত্র কার্তিকবাবুর আছে, কিন্তু সে তাঁহার দাদার উপর বরাত দেওয়া। মাঝে মাঝে দেখা দিতে যান বটে, তবে সে দৈবাৎ। শনিবার হইলে মাঠ আছে, মাঠের ফেরত ট্রামভাড়া পর্যন্ত থাকে না, দেশে যাইবার ট্রেনভাড়া তো দূরের কথা। যে-সব শনিবারে কোনও মাঠে কিছু থাকে না, কিংবা সহসা কিছু পকেটে আসিয়া যায়, সেই সব শনিবারে তিনি বাড়ী যান। যাইবার সময় ছেলেমেয়েদের জন্য খাবার, স্ত্রীর জন্য সাবান এবং দাদার ছেলেমেয়েদের জন্য খেলনা—এ তাঁহার কখনও লইতে ভুল হয় না এবং প্রতিবারেই প্রতিশ্রুতি দিয়া আসেন যে, এইবার ফিরিয়াই তিনি একটি বাসা ঠিক করিবেন। এসব কথা অবশ্য শোনা কার্তিক-বাবুর কাছেই।

কার্তিকবাবুর পাশে আর এক ভদ্রলোক থাকেন, অবিনাশবাবু। মাথাটি ওলের মত কামানো, গলায় কণ্ঠি, নাকে তিলক, এক-কথায় ঘোর বৈষ্ণব। কফ-ওয়ালা জামা এবং স্প্রিং-এর জুতা পরেন। খুব উঁচু বংশ, মহারাজা প্রতাপাদিত্যের আমলে তাঁহার পূর্বপুরুষরা জমিদার ছিলেন। তাহারই কিছু অংশ লইয়া প্রায় সেই সময় হইতেই মামলা চলিতেছে, যা হোক একটা কিছু হেস্তনেস্ত হইয়া গেলেই তিনি অমলকে একটা চাকরি দিবেন—একথা তিনি প্রায়ই বলেন। কিন্তু এখন কি আর তাঁহার কিছু করিবার সাধ্য আছে ? তিনি যে মরমে মরিয়া আছেন।

দোতলার কোণের ঘরের নগেনবাবু বলেন, ওহে আইনটা পড়ে ফেল দেখি কোনও রকম ক'রে, তার পর নিদেন দরখাস্ত লিখেও দৈনিক দশ গণ্ডা, বারো গণ্ডা পয়সা কামাতে পারবে।

তিনি নিজেও উকিল। কিন্তু ওই 'কোনও রকম'টা যে কি, তাহা বলিতে পারেন না। পয়সা-কড়ি সম্বন্ধে তাঁহার কথা না ভাবাই ভাল। প্রত্যহ মেসে ফিরিয়া ট্রাঙ্ক হইতে টাকার গেঁজেটা বাহির করিয়া গনিয়া দেখেন যে, কত পয়সা ইতিমধ্যে চুরি গেল। রাস্তায় বাহির হইলে সারাক্ষণ একটা হাত বুক-পকেটে দিয়া রাখিতে হয়, বলা বাহুল্য 'পার্স'টা তাঁহার ঐ পকেটেই থাকে। জবাকুসুম তেলের

শিশিতে কাগজ কাটিয়া দাগ করা আছে, প্রত্যহ সকালে-বিকালে গণিয়া দেখেন, কেহ চুরি করিয়া মাখিল কিনা। তৎসত্ত্বেও প্রায়ই বলেন, আর একটা ট্রাঙ্ক না কিনলে চলছে না, এইসব খুচরো জিনিসগুলো যেখানে-সেখানে ফেলে রাখা ঠিক নয়।

নগেনবাবুর চায়ের নেশার কথা মনে পড়িলে অতিরিক্ত দুঃখের মধ্যেও অমলের হাসি পায়। ভদ্রলোক ভোরবেলা উঠিয়াই লক্ষ্য করেন কোন্ ঘরে চা তৈয়ারী হইতেছে, কিংবা চাকরকে কে পয়সা দিয়া বাজারে পাঠাইতেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি সেই ঘরে গিয়া হাজির হন এবং অনুরোধ করিলেই বলেন, তাই তো, আবার চা দেবে? আচ্ছা দাও, কম ক'রে কিন্তু। চা-টা বেশী খাওয়া ঠিক নয়।

নগেনবাবুর ঘরের অপর ভদ্রলোকটি, কী যেন গালভরা তাঁহার নাম, অমলের কিছুতেই মনে থাকে না—একটু বেশী রকমের ভোজনপ্রিয়। কিন্তু নগেনবাবুর জন্য প্রায়ই তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হয়। আহার্য সম্মুখে দেখিলেই নগেনবাবুর দৃষ্টি নাকি এত লোলুপ হইয়া ওঠে যে তখন তাঁহাকে ভাগ না দিয়া থাকা যায় না। নগেনবাবুর চা খাইতে যাওয়ার ফুরসুতে কোন-রকমে স্টোভ জ্বালিয়া ভদ্রলোক হয়তো একটু হালুয়া কিংবা দুখানা মামলেট তৈরী করিয়া লন, কিন্তু তাও এক-একদিন নগেনবাবু ইতিমধ্যেই চা শেষ করিয়া চিলের মত আসিয়া পড়েন। ভদ্রলোক প্রায়ই আফসোস করিয়া অমলের কাছে বলেন, খেয়ে সুখ নেই মশাই, বলেন কি! এমন জায়গাতে মানুষ থাকে?

এই মেসে একটিই মাত্র লোক আছে, যাহার কাছে পয়সা ধার চাওয়ার আশা দুরাশা হইত না, যদি না তাহার অবস্থাও প্রায় অমলের সমান হইত। ছেলেটির নাম ইন্দু, স্কটিশ চার্চে পড়ে। একটা গোটাদশেক টাকার স্কলারশিপ ও আরও একটা দশ-বারো টাকার টুইশনি সম্বল করিয়া সে কলেজে পড়িতেছে। তেতলার চিলের ঘরটিতে সে মাথা গুঁজিয়া থাকে এবং অতি কষ্টে বাহিরের সম্ভ্রম এবং ভিতরের প্রয়োজনের তাগিদ বজায় রাখে। তবুও ইহারই মধ্যে এক-একদিন সে অমলকে নিজের ঘরে ডাকিয়া লইয়া মুড়ি ও ছোলার ছাতু এক জায়গায় মাখিয়া খাইতে বসে এবং লেখাপড়ার কথা আলোচনা করে। এক-একদিন দেশ হইতে আরও দরিদ্র এক মামা ইন্দুর সংবাদ লইতে আসেন, সঙ্গে প্রায়ই নারিকেলের নাড়ু বা চন্দ্রপুলি থাকে, তাহাও কাগজে মুড়িয়া কোন এক ফাঁকে সে অমলের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া যায়। এই একটিমাত্র ছেলের কাছেই নিজের দারিদ্র্যের স্বরূপ প্রকাশ করিতে অমল কোনদিন লজ্জাবোধ করে নাই, তবে যতদূর জানা আছে, এ মাসে তাহার অবস্থাও রীতিমত শোচনীয়, সুতরাং পয়সাকড়ি চাওয়ার কথা ভাবাই চলে না।

তবুও খানিকটা চুপ করিয়া শুইয়া থাকিবার পর অমল উঠিয়া তাহারই উদ্দেশে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। একটু আগেই ইন্দু উপরে উঠিয়াছে, তাহা সে জানিত। অন্তত মিনিট দশেক তাহার সহিত গল্প করিলেও মনটা সুস্থ হইতে পারে, এই আশায় সে উপরে চলিল। কিন্তু সিঁড়ির কোণেই যে ভদ্রলোকের

সহিত সাক্ষাৎ হইল তিনি নগেনবাবুদের পাশের ঘরে থাকেন, নাম শৈলেনবাবু। ছোট ছোট চোখ এবং বড় বড় দাঁত, মুখের দিকে চাহিলে প্রথমেই এই দুইটা জিনিস চোখে পড়ে। মাথার অধিকাংশ স্থানই কেশ-বিরল তবু তাহাতেই মহা-ভৃঙ্গরাজ ঘষিতে তাঁহার পুরো এক ঘণ্টা সময় লাগে। এখনও মাথায় তিনি তেলই ঘষিতেছিলেন, অমলকে দেখিয়া কহিলেন, এই যে অমলবাবু, চুপ ক'রে শুয়ে ছিলেন বুঝি? আমি ভেবেই পাই না মশাই, যে আপনার মত ইয়ং-ম্যান কি ক'রে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন! খাটুন মশায়, খাটুন—যা হোক একটা কিছু নিয়ে পরিশ্রম করুন। Time is money! অমূল্য সময়কে অর্থে রূপান্তরিত করুন, পয়সা কি আর এমনি আসে?

অমল প্রথম প্রথম এসব কথার জবাব দিবার চেষ্টা যে করে নাই এমন নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝিয়াছিল যে, শৈলেনবাবু সেই শ্রেণীর লোক, যাঁহারা শুধু উপদেশ দিবার আনন্দেই উপদেশ দেন, এমন কি না দিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং এখন সে আর জবাব দেয় না। আজও সে তাই পাশ কাটাইয়া উপরে উঠিয়া গেল। উঠিতে উঠিতে শুনিল যে তখনও পিছনে শৈলেনবাবু অলসতার উপর বক্তৃতা দিয়া চলিয়াছেন।

ইন্দুর ঘরে ঢুকিয়া অমল সোজা তাহার বিছানাটার উপর শুইয়া পড়িল। ইন্দু মুখ তুলিয়া চাহিল বটে, কিন্তু ভয়ে কোনও প্রশ্ন করিল না, পাছে খুব অপ্রিয় কিছু শুনিতে হয়। একটু পরে অমলই কথা কহিল, আর তো পারি না ভাই ইন্দুবাবু। দেশে ফিরে গেলে সেই মাস্টারিটা পাব এমন সম্ভাবনা যদি থাকত, তা হ'লে আমি পায়ে হেঁটেই দেশে চলে যেতুম, এমনিই আমার অবস্থা।

ইন্দু সভয়ে কহিল, ফ্রেশ কিছু হ'ল নাকি?

অমল জবাব দিল, হ'ল না—সেইটাই তো অসহ্য। কিছুই হচ্ছে না যে।··· আর একটু থামিয়া কহিল, বিছানাটার এমন অবস্থা হয়েছে যে কেবলই আমার মনে হয়, বারান্দা দিয়ে যত লোক যাচ্ছে, সকলকারই নজর বিশেষ করে আমার বিছানাটার ওপর।

ইন্দু একটু যেন অপ্রস্তুতভাবে কহিল, আমার কাছে যে কাপড়কাচা সাবানটা আছে, তাতে খুব না হোক, খানিকটা ফরসা হবে বোধ হয়, একবার চেষ্টা ক'রে দেখলেন না কেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অমল কহিল, তা না হয় দেখব, আর দেখতেই হবে; কিন্তু এমন জোড়াতালি দিয়ে আর ক'দিন চলবে? কিছুতেই যেন আর কূল কিনারা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্দু সহসা লাফাইয়া উঠিল; কহিল, আচ্ছা অমলবাবু, আসুন না একটা কাজ করা যাক।

ইন্দুর প্ল্যানগুলি সাধারণত কোন্ শ্রেণীর তাহা অমলের জানা ছিল, সুতরাং সে একটু সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কি বলুন দেখি?

ততক্ষণে ইন্দু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, সে জবাব দিল, আমরা তো রোজ

ভোরবেলা বেড়াতেই যাই, সেই সময়টা যদি খবরের কাগজ বেচি ত হ'লে কি হয় ?

অমল কিছুক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তার মানে ?···খবরের কাগজ ?

তাহার বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া ইন্দু একটু দমিয়া গেল, ভয়ে ভয়ে কহিল, হ্যাঁ, তাতে দোষ কি ?

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া অমল কহিল, দোষ অবশ্য কিছু নেই, কিন্তু আপনি তা পারবেনই বা কেন, আর আপনার দরকারই বা কি ? তা ছাড়া, ধরুন আপনার কলেজের বন্ধুরা যদি কোন দিন দেখেই ফেলে ? তা হ'লে কি আর আপনি ও কলেজে কোন দিন মুখ দেখাতে পারবেন ?

ইন্দু জবাব দিল, তা বটে। কিন্তু কলেজেব বন্ধুরা তো সবাই এই দিকের, আমরা যদি একটু অন্যত্র যাই ? ধরুন, ধর্মতলা, কিংবা চৌরঙ্গী, কিংবা ভবানীপুর ? তা ছাড়া টাকার আমারও দরকার, সত্যিই দরকার। কী কষ্টে যে আছি তা আর কি বলব। চলুন দুজনেই যাওয়া যাক।

অমল কহিল হ্যাঁ, দুজনে দুদিকে গেলে হয় বটে।

বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি ইন্দু কহিল, না. না, দুদিকে নয়। একটা মোড়েই দুজনকে থাকতে হবে। নইলে নার্ভাস হয়ে পড়ব, কাজ হবে না। এখন নতুন তো। আপনাকে দেখে আমি ভরসা পাব, আপনি আমাকে দেখে বুক বাঁধবেন, তবেই তো হবে।

অমল কহিল, কিন্তু পড়াশুনো ? আমার না হয় ও বালাই নেই, আপনার তো আছে।

ইন্দু ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, সে ঠিক হবে'খন। সকালে ঘণ্টা দুই ক'রে খাটলে এমন কি আব ক্ষতি হবে ? রাত্তিবে পুষিয়ে নেব এখন।

অমল চোখ বুজিয়া খানিকক্ষণ ভাবিযা কহিল, তা না হয হ'ল, কিন্তু টাকাটা ? অবস্থা তো আমাদের দুজনেরই সমান, টাকাটা কোথা থেকে আসবে ইন্দুবাবু ? অন্তত দু তিন টাকা মূলধনও তো চাই।

এই প্রবল ধাক্কাটা সামলাইতে ইন্দুর কিছু দেরি লাগিল। তাহার ক্যাশেব অবস্থা অমলেরই মত, হয়তো সামান্য কিছু ভালো ; কিন্তু আনা আণ্টেক পযসা যাহাদের সম্বল, তাহাদের কাছে দু-তিন টাকা মূলধন লিমিটেড কোম্পানীর মঞ্জুরীকৃত মূলধনেব মতই দুরাশা মাত্র। বেচাবী অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিযা বসিয়া রহিল। অমলও প্রথম যখন কথাটা বলিয়াছিল. তখনও পর্যন্ত তাহার মনে একটা ক্ষীণ আশার আভাস ছিল যে, হয়তো এ সমস্যার মীমাংসাও একটা কিছু ইন্দু করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু বহুক্ষণ ওদিক হইতে কোন সাড়া-শব্দ না আসায় সে হতাশ হইয়া আবার চোখ বুজিল। অর্থাৎ অন্ধকার কিছুক্ষণ পূর্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনিই রহিল।

নীচের তলায় কয়েকটি বাবুর আস্ফালনের শব্দ শোনা যাইতেছিল। তাহার সহিত পাশের বাড়ির পোষা কোকিলটার ভাঙ্গা ভাঙ্গা আওয়াজ মিশিয়া এক বিচিত্র

আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। সেইদিকে খানিকটা কান পাতিয়া থাকিবার পর সহসা ইন্দু কথা কহিল ; বলিল, আচ্ছা, সেখানে কোনও মহাজন আছে ? গহনা বাঁধা রেখে টাকা ধার দেয় ?

অমল বিস্মিত হইয়া জবাব দিল, না, কিন্তু কেন ?

ইন্দু একটুখানি সলজ্জভাবে হাসিয়া কহিল, আংটিটার এখন আর কিছু নেই বটে, কিন্তু এককালে ওটা খাঁটি সোনাই ছিল। শুধু সোনার দামে বিক্রী হ'লেও অন্তত ছ-সাত টাকা দাম হবে। অবশ্য বিক্রী করার আমার ইচ্ছে নেই, কারণ মা ওটা অনেক কষ্টেই গড়িয়ে দিয়েছিলেন, তবে বাঁধা রেখে যদি গোটা-দুই টাকাও পাওয়া যেত তাহলে মন্দ হ'ত না।

অমল কহিল, তার পর ? টাকাটা শোধ হবে কি ক'রে ?

ইন্দু বলিল, কেন, কাগজ বেচে কি কিছুই হবে না ? আর না হয় যেমন ক'রে হোক শোধ করব।

একটু ভাবিয়া অমল কহিল, কি জানি, আমার ছাত্রদের বাড়ি জিজ্ঞেস করলে হয়তো হদিস পাওয়া যায়।

ইন্দু বইটা মুড়িয়া রাখিয়া কহিল, তা হলে চলুন এখনই যাওয়া যাক। আমার ক্লাস সেই বারোটায়, এখনও ঢের সময় আছে।

অমলও "চলুন" বলিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার পর তাহার সেই অতি মলিন জামাটাই গায়ে চড়াইয়া মেস-সুদ্ধ লোকের দৃষ্টি এড়াইবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিল।

॥ দুই ॥

অমল যেখানে ছেলে পড়াইত সে বংশের অর্থের খ্যাতি এককালে খুবই ছিল। বাহিরের বৃহদাকার থামগুলি ভগ্নপ্রায় হইলেও তাহারা সেই খ্যাতির সাক্ষ্য দিতেছে। প্রকাণ্ড বাড়ি, অনেকগুলি শরিক ; এবং সকলেই কিছু কিছু উপার্জন করে। কিন্তু এমন কিছু করে না যাহাতে ঐ বৃহদায়তন বাড়িটিকে সারানো চলে। হয়তো কোনও শরিকের হাতে সামান্য কিছু আছে, কিন্তু সে পয়সা তাঁহারা পাঁচ ভূতের সম্পত্তিতে খরচ করিতে প্রস্তুত নন। সুতরাং বাড়িটি আজও সেই ভঙ্গুর অবস্থায় দাঁড়াইয়া অতীতের গৌরব এবং বর্তমানের লজ্জা ঘোষণা করিতেছে।

অমলের আহ্বানে ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন একটি পাঁচ-হাতি ধুতি পরিয়া তেল মাখিতে মাখিতে। অফিসের সময় হইতেছে, সুতরাং ভ্রূ কুঞ্চিত।

আরে মাস্টার যে! কি খবর বলুন দেখি ?

অমল বিনীতভাবে কহিল, একটা সোনার আংটি রেখে গোটা দুই টাকা ধার দিতে পারেন ? আপনার কাছে সুবিধে না হ'লে যদি আর কাউকে ব'লে দেওয়াতে পারেন তা হ'লেও ভাল হয়।

ভদ্রলোক অকারণ পেটে হাত ঘষিতে ঘষিতে মুহূর্ত-কয়েক ছোট ছোট চোখ মেলিয়া অমলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর কহিলেন, বেশভূষার তো

ওই ছিরি, অবস্থাও শুনেছি অদ্য-ভক্ষ-ধনুর্গুণঃ, তবে আবার এত রেসের শখ কেন ?

মুহূর্ত-মধ্যে যেন অমলের কান হইতে আগুন ছুটিতে লাগিল ; ইন্দুর অবস্থা কল্পনা না করাই ভাল। কিন্তু তবুও অমল প্রাণপণে সংযত হইয়া জবাব দিল, আজ্ঞে না, রেস নয়।

ভেংচি কাটিয়া ভদ্রলোক কহিলেন, আজ্ঞে না, রেস নয় ! আজ শনিবার ; আংটি বাঁধা রেখে টাকা ধার করতে এসেছেন কি জন্যে শুনি ? হয় রেস, নয় শ্বশুরবাড়ি, নইলে শনিবারে গয়না বাঁধা রেখে কেউ টাকা ধার করে ? শ্বশুর-বাড়িও তো নেই শুনেছি,—তবে ?

অমল প্রায় মরীয়া হইয়াই জবাব দিল, আমার এই বন্ধুটির বিশেষ দরকার, যদি দিতে পারেন তো দিন, আমার আর অপেক্ষা করবার সময় নেই।

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর হঠাৎ আশ্চর্য রকম নরম হইয়া গেল। পেটে তেল-ঘষা মিনিটখানেকের জন্য বন্ধ রাখিয়া একবার ইন্দুর আপাদমস্তক চোখ বুলাইয়া লইলেন, তারপর কহিলেন, তা আমি খারাপ কথাটা কি বলেছি ? আজকাল ওই ক'রে সবাই উচ্ছন্নয় যাচ্ছে, তাই একটু সাবধান ক'রে দিচ্ছিলুম—। টাকা আপনাকে না হয় দিচ্ছি, কিন্তু ওসব আংটি-ফাংটিতে আমার দরকার নেই।

সামান্য একটু বিদ্রূপের সুরে অমল কহিল, না না, আংটিটা নিয়েই রাখুন, যদি পালিয়ে যাই ?

ভদ্রলোক আবার উষ্ণ হইয়া উঠিলেন, ওসব ঠাট্টা-তামাশা বোঝবার মত বয়স আমার হয়েছে, ওসব আমি বুঝি। টাকার দরকার থাকে তো নিয়ে যান, আংটি বাঁধা রাখতে আমি পারব না। টাকা ধার দেওয়া আমার পেশা নয়।

তাহার পর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই প্রাণপণে চেঁচাইতে শুরু করিলেন, পচা, এই পচা, হতভাগা মরেছ ? ডাকাত পড়লেও শুনতে পাও না ?

ভিতর হইতে প্রায় সমান সুরেই জবাব আসিল, কি, হয়েছে কি ? আমি কি বাতাসে উড়ে যাব নাকি ? কি চাই ?

ভদ্রলোক দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহিলেন দেখেছেন, আঁটকুড়ীর ব্যাটার তেজ দেখেছেন ?—ওগো নবাবপুত্তুর, শিগ্‌গির তোমার মায়ের কাছ থেকে দুটো টাকা চেয়ে এনে মাস্টারমশাইকে দাও। আমাব নাম করে চাইবি, বুঝেছিস ?

তারপর অমলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, টাকাটা নিয়ে যাবেন, আমার চান করার টাইম পেরিয়ে গেল, আমি চললুম।—শালা ছোটসাহেব এবার বিলেত থেকে ফিরে এসে এস্তক যা পেছনে লেগেছে, একটি মিনিট লেট হবার জো নেই।

অল্পক্ষণ পরেই ভিতর হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতে লাগিল, নিয়ে গেলি তাড়াতাড়ি ? বাবুরা আবার হয়তো এক্ষুনি রাগ ক'রে চলেই যাবেন। এক কড়ার মুরোদ নেই, পাছাভরা ঝাল আছে খুব। ইঃ !

ইন্দুর মুখ লাল হইতে হইতে ক্রমশঃ পাংশুবর্ণ ধারণ করিতেছিল। অমল তাহার দিকে চাহিতেই সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, চলুন অমলবাবু অন্য জায়গায় যাই, এখান থেকে টাকা নিয়ে দরকার নেই।

অমল একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, এইতেই নার্ভাস হচ্ছেন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাগজ বেচবেন কি ক'রে ?

ইন্দু সহসা জবাব দিতে পারিল না। ইতিমধ্যে পচা আসিয়া অমলের হাতে টাকা দুইটি দিয়া গেল। রাস্তায় নামিয়া অমল আংটিটা ইন্দুর হাতে দিয়া কহিল, এটা রেখে দিন তা হ'লে, ভালই হ'ল, আপনার মায়ের আংটিটা বাঁধা পড়ল না।

ইন্দু একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, কিন্তু আংটিটা আর কোথাও বাঁধা রেখে আর দুটো টাকা নিলে হয় না ?

আশ্চর্য হইয়া অমল কহিল, কেন ?

ইন্দু জবাব দিল, টাকা দুটো ইনি এমনিই দিলেন যখন, তখন আপনার মাইনে থেকেই কেটে নেবেন তো ? আপনি কি ক'রে আসছে মাসে আপনার খরচ চালাবেন ?

অমল একটু ভাবিয়া জবাব দিল, বোধ হয় তা করবে না, ঠিক সে প্রকৃতির লোক নয়। আর যদিই করে, আমরা দু-একদিনের মধ্যে কি আর এ দুটো টাকা তুলে নিতে পারব না ?

ইন্দু চুপ করিয়া রহিল, বোধ করি তাহার উৎসাহ ইতিমধ্যেই কমিয়া আসিয়াছিল। অমল তাহা লক্ষ্য করিয়া খানিক পরে কহিল, এরই মধ্যে যেন দমে গেছেন বলে মনে হচ্ছে। দেখুন, এখনও পেছোবার সময় আছে।

ইন্দু প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, শেষ পর্যন্ত আমি দেখবই।

অমল আর কোনও কথা না কহিয়া সোজা বড়বাজারের রাস্তা ধরিল। কারণ স্থির হইল যে প্রথম প্রথম একরকমের কাগজ লইয়া চেষ্টা করাই উচিত এবং তাহা আনন্দবাজার পত্রিকা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আনন্দবাজার অফিসে টাকা দুইটি জমা দিয়া বাহির হইয়াই ইন্দু কহিল, তা হ'লে কাল রাত তিনটেয় উঠতে হবে, কি বলুন ?

অমল কহিল, না, সাড়ে চারটেয় উঠলেই হবে, এখানে তো পাঁচটার আগে কাগজ দেবে না।

ইন্দু বাধা দিয়া কহিল, না না, আপনি বুঝছেন না, ভয়ানক ভিড় হবে, শেষকালে হিন্দুস্থানীদের ভিড় ঠেলে আমরা কাগজ নিতেই পারব না। তা ছাড়া এতটা পথ হেঁটে যেতে হবে তো ?

আরও অনেক অনেক আলোচনার পর দুইজনে মেসে ফিরিল ; উত্তেজনায় সেদিন সারা রাত্রের মধ্যে ইন্দু একবারও বই খুলিতে পারিল না। সারারাত অমলেরও ঘুম হইল না। দুইজনেই রাত্রি সাড়ে চারটার সময় বাহির হইয়া পড়িল এবং কম্পিত বক্ষে আনন্দবাজার অফিসে উপস্থিত হইল। পথে কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলিল না, দুজনেরই মনের বোধ করি এমন অবস্থা যে টাকা দুইটির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া যেন পলাইতে পারিলেই তাহারা বাঁচে।

কাগজের অফিসে গিয়াও দেখে সে এক বিশ্রী কাণ্ড। ঠেলাঠেলি, মারামারি, যত হিন্দুস্থানীর গোলমাল। তাহার মধ্যে শার্টপরা বাঙালী যুবকের অগ্রসর

হওয়াই মুশকিল। প্রায় আধ ঘণ্টা তাহাদের একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল, কেহ যে বক্র কটাক্ষ বা পরিহাস করিল না এমন নয়, কিন্তু তখন আর উপায় কি। অবশেষে একটি হিন্দুস্থানীর দয়া হইল, সে কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, কি চাহি বাবু আপনাদের ?

অমল ঢোক গিলিয়া শুষ্ককণ্ঠ পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে করিতে কথাটার জবাব দিল। লোকটি একটু হাসিয়া কহিল,কাগজ কি আপনারা বিচতে পারেন বাবুজী, কেন মিছিমিছি তকলিফ করেন ?

অমল বলিল, তবুও একটু চেষ্টা না করলে তো চলবে না।

সে কহিল, আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি দাঁড়ান, হামি দেখছি।

সে ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই অমলদের কাগজ বাহির করিয়া দিল। অমল ও ইন্দু তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া তাড়াতাড়ি রাস্তায় বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু ততক্ষণেই আকাশ বেশ ফরসা হইয়া গিয়াছে, এমন কি কাগজ বিক্রীও শুরু হইয়াছে। সেই দিবালোকের মধ্য দিয়া প্রথমত কাগজ বহিয়া লইয়া যাওয়াই কঠিন। তাহার উপর গন্তব্যস্থানে পেঁছিতে বেলা হইলে কাগজ বিক্রীই বা হইবে কখন ? দুজনে যথাসম্ভব সত্বর পা চালাইয়া চলিল। অতগুলি কাগজ ঢাকিয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব, সুতরাং কোনও মতে ঘাড় নিচু করিয়া দুজনে উর্ধশ্বাসে ছুটিল।

চৌরঙ্গী পার হইয়া যখন তাহারা ভবানীপুরে পড়িল, তখন প্রায় সাতটা। রাস্তায় লোকজনের বেশ ভিড় শুরু হইয়াছে, হিন্দুস্থানী কাগজওয়ালারা ছুটাছুটি করিয়া কাগজ বেচিতেছে, ট্রাম ও বাসের সঙ্গে সঙ্গেই ছুটিতেছে, যাত্রীদের পিছনে পিছনে তাড়া করিতেছে, কেহ বা তারস্বরে চীৎকার করিতেছে।

প্রথম দুটি তিনটি মোড় তাহারা ফেলিয়া চলিয়া গেল এই ভরসায় যে হয়তো আগে কাগজওয়ালা অপেক্ষাকৃত কম ; কিন্তু কিছু দূর গিয়াই বুঝিল সর্বত্র সমান।

তখন অমল কহিল, আর গিয়ে লাভ নেই ইন্দুবাবু আসুন এখানেই আরম্ভ করি।

কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া ইন্দুর মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছে, সে যেন আর কোনও মতেই ঘাড় তুলিতে পারে না। শুষ্ককণ্ঠে কি বলিতে গেল তাহাও স্পষ্ট বোঝা গেল না। ইতিমধ্যেই তাহার কপালে ঘাম দেখা দিয়াছে।

এধারে অমলের অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। সে কিছুতেই ট্রাম বা বাসের কাছে গিয়া কাগজ দেখাইতে পারিল না। এ শহর তাহার জন্মভূমি নয়, এখানে পরিচিতের সংখ্যা অতি অল্প, তাহাকে কাগজ বেচিতে দেখিয়া বিস্মিত হইবে এমন লোক কেহই নাই বলিলেও চলে, তথাপি বিশ্বের সমস্ত লজ্জা যেন আজ তার মাথায় চাপিয়া বসিতে লাগিল। সে কিছুক্ষণ একটা থামের পাশে কাগজগুলি উঁচু করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; কিন্তু কোনও ক্রেতাই তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিল না।

মিনিট পনেরো পরে অমলই কহিল, ইন্দুবাবু বেলা বেড়ে যাচ্ছে, আসুন দুজনেই একসঙ্গে বাসগুলোতে কাগজ দেখাই।

ইন্দু একবার ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলিয়া রাস্তার দিকে চাহিল, তারপর কোনও মতে বুকে সাহস সঞ্চয় করিয়া অমলের সহিত নামিয়া আসিল। কিন্তু ঠিক যে মুহূর্তে একটা বাস কাছে আসিয়া দাঁড়াইবার জন্য গতি মন্থর করিল, সে মুহূর্তেই সে পিছাইয়া যতটা সম্ভব অমলের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার সব সহপাঠী ও তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের মুখগুলি মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহাদের ভবানীপুরের দিকে বাসে চড়িয়া আসিবার সহস্র সম্ভাবনার কথা মাথার মধ্যে ভিড় করিয়া উঠিল। ফলে তাহার বুক টিপটিপ করিতে লাগিল, ঘামে কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গেল।

অমল বাসের কাছে গেল বটে, কিন্তু ঘাড় নিচু করিয়া একখানা কাগজ একটা জানালার দিকে মেলিয়া ধরা ছাড়া আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। ভদ্রসন্তান দেখিয়া এক ভদ্রলোক দুইটি হিন্দুস্থানী কাগজওয়ালার প্রসারিত হস্ত ঠেলিয়া দিয়া তাহারই হাত হইতে কাগজখানি টানিয়া লইলেন এবং একটি দু'আনি বাহির করিয়া কহিলেন, ফেরত পয়সা বার কর শিগ্‌গির।

অমল বিষম বিব্রত হইয়া মূঢ়-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পকেটে একটি পয়সাও নাই। বাসও ততক্ষণে ছাড়িয়া দিয়াছে। ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া কহিলেন, পয়সা নেই? তা হ'লে আর কি হবে, কাগজ নিয়ে নাও তোমার।

এই বলিয়া চলন্ত বাস হইতে কাগজখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। কাগজটা ফুটপাথের ধারে নর্দমার উপরে গিয়া পড়িল। অমল লজ্জায় মুখ-চোখ লাল করিয়া কাগজখানা তুলিয়া লইল; কিন্তু মানসিক ধিক্কারে তাহার দেহ তখন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে. আর একখানি বাস সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া পড়া সত্ত্বেও সে কাগজ বেচিবার আর কোন চেষ্টা করিতে পারিল না।

একটি হিন্দুস্থানী কাগজওয়ালা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, বাবু, ইয়ে আপলোগ্‌কা কাম নেহি, হামকো সব দে দিজিয়ে, হাম এক এক পয়সা করকে দাম দে দেগা।

ইন্দু ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মাথা না তুলিয়াই কহিল, অমলবাবু চলুন বাসায় ফিরি, এ আমি কিছুতেই পারব না।

তাহার গলায় কান্নার সুর!

অমলেরও কথা কহিবার মত অবস্থা ছিল না। সে তখন অশিক্ষিত কাগজ-ওয়ালা ও সমবেত দুই-চারিজন পথিকের দৃষ্টি হইতে কোনও মতে ছুটিয়া পলাইয়া যাইতে পারিলে বাঁচে। পয়সা উপার্জন না হয়, আত্মহত্যার পথ তো কেহ ঘোচায় নাই। তাহার দুই কান দিয়া তখন যেন আগুন বাহির হইতেছিল।

কাগজওয়ালাটা নিজেই কাগজ গুনিয়া পয়সা হিসাব করিয়া দিল, সেগুলি দেখিবার বা মিলাইবার চেষ্টা না করিয়া অমল ও ইন্দু প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসেই মেসের পথ ধরিল।

॥ তিন ॥

পথে কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিল না। দৈহিক ক্লান্তি, পরাজয়ের গ্লানি, নৈরাশ্য ও লোকসানের চিন্তা দুজনকেই রীতিমত মুহ্যমান করিয়া ফেলিয়াছিল।

মেসের সামনে আসিয়া ইন্দুই প্রথমে কথা কহিল। বলিল, আপনার বিশেষ দরকার বলছিলেন, ওই খুচরো পয়সাগুলো আপনিই রেখে দিন, পরে যখন আপনার সুসময় আসবে দেবেন। আর ও দুটো টাকা আমি যেমন ক'রে পারি শোধ ক'রে দেব।

তাহার পর উত্তরের অবসর মাত্র না দিয়ে সে নিজের ঘরে উঠিয়া গেল। অমলেরও তখন উত্তর দিবার মত অবস্থা নয়। এই পয়সাগুলি কিছুতেই তাহার এভাবে লওয়া উচিত নয় তাহা সে অনুভব করিলেও সেগুলি সে ছাড়িতেও পারিল না। কোনও মতে ক্লান্ত পা দুইটা টানিয়া লইয়া নিজের বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। কাল ইন্দুর উৎসাহে এবং প্ররোচনায় যেটুকু আশার আলো মনে দেখা দিয়াছিল, আজ তাহা আরও অন্ধকাব করিয়া দিয়া নিভিয়া গেল। ভদ্র-সন্তানের এই মুখোশটা না খুলিয়া ফেলিলে তাহাদের দ্বারা ওসব কাজ হইবে না, কাজেই অনর্থক চেষ্টা করিয়া কোন লাভ নাই—তাহা সে আজ পরিষ্কার বুঝিল।

মেসের ঠাকুর কি একটা কাজে উপরে উঠিতেছিল। অমলের ঘরেব সামনে আসিয়া তাহার অতিশয় শুষ্ক ও মলিন মুখ দেখিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। তখন মেসের প্রায় সকলেই বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, নিচে শুধু ঝি ও চাকরের কলহের একটা শব্দ হইতেছে, তাছাড়া সমস্ত বাড়িটাই নির্জন। ঠাকুর মিনিটখানেক ইতস্তত করিয়া ডাকিল, বাবু!

অমল চোখ মেলিয়া ঠাকুরকে দেখিয়া রীতিমত বিস্মিত হইয়া গেল। কহিল, কি গো, ঠাকুর?

ঠাকুর একবার মাথা চুলকাইয়া কহিল, ভাত-তরকারি অনেক বেঁচেছে বাবু, আপনি যদি বাইরে থেকে খেয়ে না এসে থাকেন তো এখানেই খেয়ে নিন না। ফেলা যাবে বই তো না।

অন্তত ছয়টি পয়সা বাঁচিয়া যায় বটে। কিন্তু অমলের ভিতরকার ভদ্রসন্তান ধিক্কার দিয়া উঠিল। সে যথাসাধ্য লজ্জা গোপন করিয়া স্বাভাবিক সুরে কহিল, ঠাকুর আজ যে আমার উপোস, আজ তো খাবার জো নেই।

ঠাকুর কহিল, ওঃ, তাই মুখ অত শুকনো দেখাচ্ছে। তা বাবু, গ্রহ-ফাঁড়াকে তুষ্টু রাখা ভাল। ওঁয়ারাই দুঃখু দেবার মূল কিনা।

ঠাকুর নামিয়া গেল। অমলের দুই কান অপমানে তখনও জ্বালা করিতেছে। এই লোকটি যে নিতান্তই দয়া করিয়া ভাত তরকারির প্রাচুর্যের কাহিনী তাহাকে শুনাইল, তাহাতে সংশয়মাত্র ছিল না। এত দিন এই মেসে আছে, প্রথম সহানুভূতির কথা সে শুনিল অশিক্ষিত এক পাচকের কাছে। ভদ্রলোকের চেয়ে

ইহারা অনেক ভাল।

অনেক দিক দিয়াই ভাল। খাওয়া ও দশটাকা মাহিনা তো এই ঠাকুরই পায়। ইহা ছাড়া গামছা, জলখাবার, তামাকের খরচা, ধোপা-নাপিত সমস্তই মেসের। নিচের ঘরে শুইতে হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতিই বা কি? সীটরেন্ট দিয়াই বা সে কি বেশী সুখে আছে?

অমল অকস্মাৎ সোজা হইয়া বসিল। তাহার নিমীলিত চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল। যে পথে সে চলিয়াছে সে পথে তো কোথাও কোন আশার আলো দেখা যায় না। এই দীর্ঘ দিনের চেষ্টার পরে সে আজ ক্লান্ত, অবসন্ন। বেশ তো, এই ভদ্রসন্তানের মুখোশ ঘুচাইয়া দিয়াই দেখা যাক না, ফল কি হয়।

বাল্যকালে অমল বেশী সময় মায়ের কাছে-কাছেই থাকিত, অনেক দিন তাঁহাকে রন্ধনে সাহায্যও করিতে হইয়াছে, মোটামুটি রান্নার ব্যাপার সে খানিকটা জানে, তাহার বিশ্বাস ছেলে ঠ্যাঙ্গানোর অপেক্ষা এ কাজ অনেক বেশী আরামদায়কও।

নূতন প্ল্যানের উত্তেজনায় অমল আর বিছানায় শুইয়া থাকিতে পারিল না। উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। এখান হইতে অনেক দূরে, পরিচিত সমস্ত গণ্ডীর বাহিরে সে নূতন করিয়া জীবনযাত্রা শুরু করিবে; অদৃষ্টের কাছে সে মাথা নোয়াইবে না, কোনমতেই না। ...

তিনদিনের দিন সে মাহিনা পাইল। মাহিনার টাকা হইতে সে দুইটি টাকা কাটাইয়া দিতে গেল, কিন্তু ভদ্রলোক কিছুতেই রাজী হইলেন না। কহিলেন, মাস্টার, সবই তো বুঝি, মাইনে তো এই দশ টাকা। একসঙ্গে দুটো কাটিয়ে দিতে গেলে গায়ে লাগবে। দেবেন'খন পরে পশ্চাতে, সুবিধে মত।

অগত্যা অমলকে কথাটা ভাঙ্গিতে হইল। সে মাথা নিচু করিয়া কহিল, হয়তো আমি কলকাতা থেকে চ'লে যেতে পারি।

ভদ্রলোক একরকম ঠেলিয়াই তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন, বেশ, বেশ, তাই হবে। আমার ওই অকালকুষ্মাণ্ড ছেলেকে পড়াতে যে কী মেহনত তা তো আমি জানি। বুঝব যে ওই দুটো টাকা আপনাকে সন্দেশ খেতে দিলুম। এখন টাকাটা পাচ্ছেন, নিয়ে বাড়ি যান—অত সাধুপনা কেন?

অমল আর দ্বিরুক্তি করিল না। সাধুপনা দেখাইবার শক্তি বা প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। সে মেসে ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যেই কাগজ বিক্রির ফেরত পয়সা হইতে অত্যাবশ্যক কাপড়জামা সে কাচাইয়া লইয়াছিল। অবশ্য সে বেশীও নয়। পাশের সীটের ভদ্রলোক কাগজ কিনিতেন, তাঁহারই শেল্‌ফ হইতে একখানা পুরাতন কাগজ টানিয়া লইয়া খান তিন-চার কাপড়জামা জড়াইয়া লইল, তাহার পর ইন্দুকে একখানা চিঠি লিখিতে বসিল। কাগজ ও খাম সে আগেই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল।

লিখিল—

ইন্দুবাবু, এভাবে আর কিছুতেই চলল না: নতুন চেষ্টায় চললুম। বলে যাওয়া সম্ভব হ'ল না, কারণ মেসের অনেক পাওনা রইল। সে টাকা দিতে

গেলে এখনই ভিক্ষায় বেরুতে হবে, নইলে উপবাস। যদি সম্ভব হয় তো এর পরে পাঠিয়ে দেব। আপনার সে টাকা দুটো আমি শোধ ক'রে এসেছি; তার জন্যে কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা করবেন না। তবে যদি আপনার কিছু দেয় আছে ব'লে মনে করেন তো রাঘব ঠাকুরকে চার আনা পয়সা আমার নাম ক'রে দেবেন।—ইতি—

খামের মধ্যে কাগজখানি আঁটিয়া ঠিকানা লিখিয়া চুপি চুপি মেসের লেটার-বক্সে ফেলিয়া দিল। খুব সম্ভব ইন্দু এখন তাহার ঘরেই আছে, হয়তো পড়িতেছে; কিন্তু তাহার সহিত মুখোমুখি দেখা না করাই ভাল।

তখন আটটা বাজিয়াছে। দুই একজন ফিরিয়াছেন বটে কিন্তু বহু লোকই এখনও বাহিরে। ঠাকুর-চাকররা রান্নাঘরে ব্যস্ত। খবরের কাগজে জড়ানো প্যাকেটটি হাতে করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে সে চুপিচুপি বাহির হইয়া পড়িল। একবার বাহিরে দাঁড়াইয়া মেসের দিকে চাহিয়া লইল, তাহার পর ধরিল সোজা হাওড়ার পথ।

ইচ্ছা করিয়াই সে ময়লা কাপড় জামা পরিয়াছিল; কারণ ভদ্রসন্তান বলিয়া পরিচয় সে আর দিবে না। উচ্চবংশ এবং শিক্ষার সম্মান রাখিবার জন্য এই তো সে প্রাণান্ত করিল, আর ও পরিচয়ে কাজ নাই।

॥ চার ॥

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিয়া অমল কিন্তু রীতিমত দ্বিধায় পড়িল। পশ্চিমে যেখানে হউক চলিয়া যাইবে এবং সেখানকার বাঙালী অধিবাসীদের কাছে বাঙালী পাচক বলিয়া পরিচয় দিবে এই ছিল তাহার ইচ্ছা; কিন্তু সে পশ্চিমটি যে ঠিক কোথায় হইবে তাহা সে এখনও ভাবিয়া দেখে নাই। খুব বেশী শহরের নামও তাহার জানা নাই; পাটনা কাশী এলাহাবাদ এইগুলিরই নাম সচরাচব শুনিযা থাকে।

কোথায় বেশী বাঙালী থাকে, তাহাও ভাল জানা নাই। তবে মনে হয় কাশী যাওয়াই ভাল।

তাহার মনে পড়িল যে পকেটে তাহার মাত্র দশটি টাকা আছে। সেদিকটাও বিবেচনা করা কর্তব্য। একেবারে হাতখালি করা উচিত নয। কারণ যাওয়া মাত্রই যে কাজ পাওয়া যাইবে তাহারই বা ঠিক কি? এই সব ভাবিতে ভাবিতে সে ব্যাকুলভাবে এদিক-ওদিক চাহিতেছে, এমন সময নজর পড়িল একদিকে বড় করিয়া Enquiry office লেখা রহিযাছে। সে আস্তে আস্তে সেইখানেই উপস্থিত হইল।

তিন-চারিটি লোক তখন যথেষ্ট হুড়াহুড়ি করিতেছে—

ও মশাই, আঁদুলের গাড়ি কটায়?

পুরুলিয়ার গাড়ি ক নম্বর প্ল্যাটফর্ম মশাই?

আচ্ছা, নাগপুরের গাড়ির কটায় art val বলতে পারেন ?

তাহারই মধ্যে অতি কষ্টে মাথা গলাইয়া সে প্রশ্ন করিল, পাটনার ভাড়া কত বলতে পারেন মশাই ?

বার-তিনেক প্রশ্নটি আবৃত্তি করার পর জবাব আসিল, পাটনা সিটি না জংশন ?

কী বিপদ ! অমল কতকটা ইতস্তত করিয়া কহিল, আজ্ঞে বাঁকিপুর।

বাঁকিপুরের নামটা সহসা মনে পড়িয়া গেল ; কোথায় যেন শুনিয়াছিল বাঁকিপুর জায়গাটাই পটনার মধ্যে বড়।

বাঁকিপুর, ও, পাটনা জংশন ! চার টাকা তের আনা।—হাঁ, মেচাদা লোকাল ? দশ নম্বর। বর্ধমান যাবার গাড়ি ? ছ নম্বরে,—যাও না, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

বলা বাহুল্য শেষোক্ত ধমকটি অমলকেই দেওয়া হইল। তখন সে ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলিয়া কহিল, কাশীর ভাড়া কত ?

লোকটি যেন এক পাক নাচিয়া লইল, তারপর কহিল, কোথায় যাবে তাই এখনও ঠিক কর নি, খামকা ভাড়া জিগ্‌গেস করতে এসেছ ? এতগুলো লোক জবাব পাচ্ছে না, তুমি মিছিমিছি ভিড় বাড়াচ্ছ কেন বাপু, সরে যাও—আমাদের এখন রসিকতা করবার সময় নেই।

সেইখানেই এক বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি কহিলেন, বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছ বুঝি হে ! কই এসো তো এদিকে, দেখি !

ভয়ে অমলের কপালে ঘাম দেখা দিল। সে মৃদুস্বরে "আজ্ঞে না" বলিয়াই ভিড়ের মধ্যে সরিয়া পড়িল। তাহার পর মরীয়া হইয়া তিন-চারিটি মেমসাহেবের মুখ-নাড়া খাইয়া এবং বহু হিন্দুস্থানী বেয়ারার কনুই-এর গুঁতো খাইয়া পাটনা জংশনের টিকিটই একখানা কিনিয়া ফেলিল। কিন্তু গাড়ি কোথায় এবং কটায় ? সে প্রশ্ন করিতে গেলেও আবার ঐ রগ-চটা বাবুগুলির কাছে যাইতে হয় ; কিন্তু তাহাতে সে একান্ত নারাজ। অগত্যা সে রেল-কোম্পানির জামা পরা লোক দেখিয়া দেখিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম জনতিনেক লোকের কাছে জবাব পাওয়া গেল না বটে কিন্তু তাহার পরই একজন দয়া করিয়া বলিয়া দিল, চার নম্বরে যে গাড়ি আছে, সেটি পাটনা জংশন পর্যন্তই যাইবে এবং ছাড়িবারও মাত্র আর আধ ঘণ্টা দেরি আছে।

এই প্রথম অমল হাওড়া স্টেশনে আসিয়াছে। এই বিপুল জনতা এবং বিরাট কোলাহলে তাহার মাথার মধ্যে যেন সব গোলমাল হইয়া যাইতেছিল। এত বড় স্টেশন যে এই কলিকাতায় আছে তাহা এতদিন কলিকাতাতে থাকিয়াও সে কখনও অনুমান করিতে পারে নাই। খানিকটা বৃথা ঘুরিয়া আর একজনকে প্রশ্ন করিল, মশাই, চার নম্বর প্ল্যাটফর্মটা কোথায় বলতে পারেন ?

সে একবার তাহার আপাদমস্তক চোখ বুলাইয়া লইল, তাহার পর কহিল, ওই ওদিকে। টিকিট কিনতে হবে না ? দিন না কেটে এনে দিই। এই ভিড়ের মধ্যে আপনি কি কিনতে পারবেন ? আমিও পাটনা যাব কিনা।

এই আত্মীয়তার অর্থ অমল বুঝিল। এরূপ জুয়াচুরির বহু বিবরণই সে শুনিয়াছে। সে মুচকি হাসিয়া কহিল, না, টিকিট আমার কেনা আছে; আপনি অন্য লোক দেখুন।

সে কি ভাবিল কে জানে, হাসি চাপিতে চাপিতে চলিয়া গেল। অমল ভিড় ঠেলিয়া কোনও মতে চার নম্বরের গেট পর্যন্ত পেঁছিল, কিন্তু খাঁচার মত দ্বারের মধ্য দিয়া পার হইতে গিয়া ভয়ঙ্কর গোলমাল বাধিল। পিছন হইতে একটি অর্বাচীন হিন্দুস্থানী ধাক্কা দিয়া তাহাকে সামনে ঠেলিয়া দিল। ফলে সামনের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। খিঁচাইয়া উঠিয়া কহিলেন, চোখে দেখতে পাও না ছোকরা? মানুষের গায়ের ওপর এসে পড় কেন? তুমি টিকিট কিনেছ, আমরা কিনি নি?

ভদ্রলোক ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন, ফলে পিছন হইতে আরও ধাক্কা আসিতে লাগিল অমলের উপর, সে কোনও মতে তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া এক ফাঁক দিয়া গলিয়া ভিতরে গেল বটে, কিন্তু কিছু দূর গিয়াই বুক পকেটে হাত দিয়া দেখিল যে টাকা কয়টি নাই, ইতিমধ্যেই কোথা দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে।

তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিল, ললাটে ঘাম দেখা দিল। ভাল করিয়া সব পকেটগুলি দেখিল। পাশের পকেটে খুচরা পয়সাগুলি ছিল, গুনিয়া দেখিল সেই তের আনা পয়সাই আছে। কিন্তু টাকাগুলির কোনও চিহ্ন নাই। হাতের মধ্যে টিকিটটা ধরা ছিল বলিয়া সেটা বাঁচিয়া গিয়াছে।

যে পথে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়াছিল সেই পথ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, যদি কোথাও পড়িয়া গিয়া থাকে। ফটকের কাছে গিয়াও ভিড়ের মধ্যে যতটা সম্ভব পায়ের ফাঁক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। তাহার পর ব্যাকুলভাবে ঠিক পাশেই যে টিকিট কলেক্টারটি ছিলেন, তাঁহাকে কহিল, আমার পকেট মারা গেছে, এইমাত্র।

তিনি একটুও বিচলিত না হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কত ছিল?

অমল জবাব দিল, পাঁচ টাকা।

তিনি তাচ্ছিল্যের সুরে কহিলেন, ও, সরি! সাবধান করে রাখতে না পারলেই যায়।

আর একটি টিকিট কলেক্টার ইতিমধ্যে আসিয়া জুটিলেন। তার পর আর একটি।

কি হয়েছে হে সাণ্ডেল?

আগেকার টিকিট বাবুটি জবাব দিলেন, এঁর পকেট মারা গেছে।

কত টাকা?

পাঁচ টাকা।

প্রশ্নকর্তা একবার অমলের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া কহিলেন, নতুন বুঝি কলকাতায়?

অমল কতকটা ভয়ে-ভয়েই জবাব দিল, আজ্ঞে হাঁ।

তা হ'লে তো হবেই। এরকম হামেশাই হচ্ছে, একটু সাবধানে রাখতে হয়, টাকাকড়ি।

তৃতীয় ব্যক্তিটি চুপ করিয়া ছিলেন এতক্ষণ, এইবার আড়চোখে চাহিয়া বলিয়া বসিলেন, টাকা ছিল তো পকেটে?

সাণ্ডেল কৃত্রিম ভর্ৎসনার স্বরে জবাব দিল, ওয়েল, ওয়েল, দ্যাট্‌স্ ব্যাড। ভদ্রলোক টিকিট কিনেছেন দেখছ, টাকা ছিল না বলতে চাও? যাই হোক, ইফ ইউ লাইক, পুলিসে ইনফর্ম করতে পারেন, তবে তাতে যে কোন ফল হবে, এমন কিছু য়্যাশ্যুর‍্যান্স দিতে পারি না।

অমল সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। পুলিসে সংবাদ দিলে ফল যে কি হইবে সে তাহার জানাই ছিল, মিছিমিছি পাটনার ট্রেনটিও হয়তো চলিয়া যাইবে। ইহারই মধ্যে ফিরিয়া যাওয়ার সম্ভাবনাটা সে মনে মনে ভাবিয়া লইল; কিন্তু মেসের ম্যানেজারের ক্রুদ্ধ মুখ, অন্যান্য অধিবাসীদের বিদ্রূপের দৃষ্টি মনে পড়িয়া যাওয়ার সে চিন্তা সে একেবারেই ত্যাগ করিল। তা ছাড়া খাইবেই বা কি? আরও এক মাস কাটিবার পূর্বে মাহিনা পাইবার সম্ভাবনা নাই। ভিক্ষা যদি করিতে হয় বিদেশে গিয়া করাই ভাল।

অগত্যা সে অবসন্ন মনে ট্রেনের দিকেই অগ্রসর হইল। কিন্তু ট্রেনের অবস্থা দেখিয়া তাহার মুখ আবার শুকাইয়া উঠিল। থার্ড ক্লাস কামরাগুলি মানুষে ও মালে বালিশে তুলা-ঠাসার মত বোঝাই হইয়া আছে; এবং প্রত্যেক গাড়ির দ্বারের সামনে তখনও রীতিমত মারামারি চলিতেছে। সে এদিকের ট্রেনে কখনও আসে নাই, নহিলে বুঝিত যে যতগুলি লোক যাইবে, ঠিক ততগুলি কিংবা আরও বেশী লোক তাহাদের তুলিয়া দিতে আসিয়াছে, সুতরাং কোনও রকমে পথের গণ্ডীটা ছাড়াইতে পারিলে ভিতরে বসিবার স্থান মিলিলেও মিলিতে পারে।

অবশ্য সে যে কোথাও উঠিবার চেষ্টা করিল না তাহা নয়, কিন্তু কোথাও বিপুলদেহ পাঞ্জাবী, কোথাও ষণ্ডামার্কা হিন্দুস্থানী, কোথাও বা হাফপ্যাণ্ট পরিহিত বাঙ্গালীরা পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কোনও অর্বাচীন উঠিবার চেষ্টা মাত্র করিলেই তাঁহারা চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিতেছেন, আরে, কাঁহা উঠ্‌তা হ্যায়' দেখ্‌তা নেহি হামলোক খাড়া হোকে যাতা হ্যায়?

কেহ হয়তো বিনয় করিয়া বলিতেছে, থোড়া উঠনে দিজিয়ে, হামলোক ভি খাড়া হোকে যায়গা—

তাহার জবাবে ধাক্কা দিয়া তাহাদের সরাইয়া দিয়া জানানো হইতেছে যে, খাড়া হোনেকো ভি জায়গা নেহি, কেয়া বাউরা আদমী হ্যায় ই সব। বাত মানতা নেহি।

যাহারা কোনও গতিকে নিজেরা ঢুকিতে পারিতেছে, তাহারা গাড়িতে উঠিবামাত্র ওই দলে মিশিয়া যাইতেছে এবং প্রবেশ রোধ করিবার চার্জটা অগ্রবর্তীদের হাত হইতে বুঝিয়া লইয়া চক্ষু দ্বিগুণ রক্তবর্ণ করিয়া কিছুক্ষণ পূর্বেকার সহধর্মীদের তাড়না করিতেছে।

যাহাই হউক, বামচারেক সমস্ত ট্রেনের সামনেটা ঘুরিয়া আসিয়া প্রায় ট্রেন ছাড়িবার পূর্ব মুহূর্তে সে মরীয়া হইয়াই একটা গাড়িতে উঠিয়া পড়িল।

সামনের লোকগুলি যথারীতি হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল। কেহ কহিল, দরজাটা খুলতে দিলে কেন? কেহ কহিল, ওধারে দেদার গাড়ি খালি পড়ে আছে, সেখানে কেউ যাবে না! কেহ বা বলিল, চড়ছেন কোথায় মশাই, মাথার ওপর বসে যাবেন নাকি? কেহ বিশুদ্ধ হিন্দী বাত ছাড়িল, নিকাল দেও না উসকো—

কিন্তু অমল তখন উঠিয়া পড়িয়াছে। কোনও রকমে কনুই-এর গুঁতা দিয়া উঠিয়া ঠেলিয়া-ঠুলিয়া একটু জায়গা করিয়া লইয়া সে দাঁড়াইল। ততক্ষণে ট্রেনও ছাড়িয়া দিয়াছে। কামরাটি বড়, সেই অনুপাতে লোকও কম নয়। ওধারের দুটি বেঞ্চের মাঝে খানিকটা জায়গা মাল বোঝাই করিয়া তাহার উপর বিছানা বিছাইয়া জনকতক মাড়োয়ারী মহিলা পুত্র-কন্যা লইয়া বসিয়াছেন। সকলেরই মুখে ঘোমটা কিন্তু বুক ও পেটের অনেকখানিই অনাবৃত। তাঁহাদের পুরুষগুলি বেঞ্চি-দুইটির সামনের দিকে বসিয়া মহড়া সামলাইতেছেন, অর্থাৎ ভিতরের স্থানে কেহ যাহাতে নজর না দেয় সে সম্বন্ধে নানা প্রচেষ্টা করিতেছেন। তিন-চারিটিতে মিলিয়া বৃদ্ধ যুবা নির্বিশেষে গাঁজা খাইতেছেন এবং অবিরাম বকিতেছেন। কামরার মধ্যে অন্য অধিবাসী আছে কিনা এবং কি তাহাদের অবস্থা সে সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তা তাঁহাদের নাই, প্রত্যেকেই অপরকে নিজের বক্তব্য দ্রুত কণ্ঠে বলিয়া যাইতেছেন।

তাঁহাদের পাশের বেঞ্চ-জোড়াটিতে কয়েকটি গুজরাটি মালপত্র লইয়া বহু আগে হইতে দখল করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটি কাবুলী হুড়মুড় করিয়া তাহাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ফলে একজনের রসগোল্লার হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে এবং আর একজনের ফাইবারের সুটকেসটা যে আকৃতি ধারণ করিয়াছে তাহার বর্ণনা না করাই ভাল। উভয়পক্ষই হিন্দীতে ঝগড়া চালাইতে গিয়া বিপন্ন হওয়ায় বিবাদটা প্রায় হাতাহাতির কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এধারে ছোট বেঞ্চগুলির দুইটিতে কয়েকটি পশ্চিমা মুসলমান প্রচুর মালপত্র এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধময় মলিন কাপড়-চোপড় লইয়া উঠিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই একটা ন্যাকড়া বিছাইয়া খবরের কাগজে জড়ানো মোটা রুটি কাঁচা পিঁয়াজ রসুন সহযোগে খাইতে শুরু করিয়াছে। আর দুটিমাত্র বেঞ্চির একটিতে গুটি-দুই শিখ ও জন-দুই সাঁওতাল অতিকষ্টে ঠাসাঠাসি করিয়া কোনও মতে বসিয়াছে এবং আর একটি একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক স্ত্রী ও কন্যা লইয়া দখল করিয়াছেন। মধ্যের গমনাগমনের স্থানটি, একে মাল বোঝাই তাহার উপর পাঁচ-ছয়জন বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ভিতরের আবহাওয়াকে অন্ধকূপ করিয়া তুলিয়াছেন।

বলা বাহুল্য গাড়িতে উঠিয়া তাহার অভ্যন্তর ভাগের অবস্থাটা দেখিয়া লইতে অমলের বেশী দেরি লাগিল না। কাবুলীদের গাত্রবাসের সৌরভ, গাঁজার ধোঁয়া এবং রসুনের গন্ধ সমস্তটা মিলিয়া ভিতরের হাওয়াটাকে এমনই দুঃসহ করিয়া

তুলিয়াছে যে, মিনিটখানেকের মধ্যেই তাহার গা ঘামি ঘামি করিতে লাগিল ; সে বারকতক এদিক ওদিক চাহিয়া নড়িবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া ঠিক দ্বারের পাশেই বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির বেঞ্চে যে ইঞ্চিতিনেক স্থান ছিল, সেইখানে কোন মতে অঙ্গ ঠেকাইয়া বসিয়া পড়িল।

ভদ্রলোক গৃহিণীকে কোণ দিয়া, মেয়েটিকে মধ্যে শোয়াইয়া নিজে শেষের দিকে বসিয়া বেঞ্চটাকে একরকম রিজার্ভ করিয়াই লইয়াছিলেন ; সহসা এই উপদ্রবে তিনি দারুণ চটিয়া গেলেন। মুখ-চোখ রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, কি রকম অসভ্য লোক হে তুমি ছোকরা ? বলা-কওয়া নেই, ভদ্রলোকের মেয়েছেলেদের ঘাড়ের উপর এসে বোস ?

অমল যদিও হাওড়া স্টেশন এবং পশ্চিমের গাড়ি ইতিপূর্বে কখনও চোখে দেখে নাই, তাহার হতভম্ব হইয়া যাওয়ারই কথা, কিন্তু গত এক ঘণ্টাকাল উপর্যুপরি লাঞ্ছনায় সে মরীয়া হইয়া গিয়াছিল, ইতিমধ্যেই বুঝিয়াছিল যে, এই কঠিন স্থানে বিনয়ের অবসর নাই, এখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় চোখ-রাঙানির জোরে।

সে জবাব দিল, আপনি কি মেয়েছেলে ? কই, সে রকম তো মনে হয় না।

ভদ্রলোক প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, উচ্চৈঃস্বরে জবাব দিলেন, কী, আমাকে আবার ঠাট্টা ? ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে জান না ? এ বেঞ্চে মেয়েছেলে নেই ?

অমল এবার রীতিমত রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, মেয়েছেলে আছে তো কি হয়েছে ? তাঁকে আড়াল করে আপনি তো বসে আছেন। তাতেও কি ছোঁয়াচ লাগে ? অতই যদি সম্ভ্রম-বোধ তো মেয়ে-গাড়িতে দেন নি কেন ?

ভদ্রলোক রাগের চোটে এবার তোৎলা হইয়া গেলেন, কহিলেন, তু—তুমি কা—কার স— সঙ্গে ক—কথা কইছ, জানো ? অসভ্য, জানোয়ার কোথাকার !

অমল জবাব দিল, তা জানিনে, তবে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই নন। আপনি আমাকে 'তুমি' বলেন কোন্ সাহসে ? আমিও থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনেছি, আপনিও তাই। আমি আপনার কাছে ভিক্ষেও চাই নি, চাকরিও করি না, তবে কোন্ অধিকারে আমায় 'তুমি' বললেন শুনি ?

গাড়ির লোকেরা মজার গন্ধ পাইয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। এমন কি ওধারের গুজরাটী ও কাবুলীর বিবাদও যেন এই গোলমালে দ্রুত মিটিয়া আসিল। ভদ্রলোক কিন্তু এইবার কিছু দমিয়া গেলেন। সহসা তাঁহার মুখে কথা যোগাইল না, প্রায় মিনিট-খানেক অমলের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তিনি অন্য পথ ধরিলেন, কহিলেন, জান আমি বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসর ?

অমল কখনও বঙ্গবাসী কলেজের অঙ্গনে পর্যন্ত পা দেয় নাই, কিন্তু কি রকম তাহার মাথায় রোখ চাপিয়া গেল কে জানে, সে জোর করিয়া কহিল, মিছে কথা। আমি নিজে বঙ্গবাসী কলেজে পড়ি, আপনাকে সেখানে কখনও দেখি নি।

সে ভদ্রলোক এতটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, ভাবিয়াছিলেন যে এ কথার পরে আর ছোঁড়াটা কথা কহিতে পারিবে না। এইবার তিনি রীতিমত নরম হইয়া

গেলেন। একটু পরে ঢোক গিলিয়া কহিলেন, আমি ঠিক নই, তবে আমার দাদার ভায়রাভাই যে ও কলেজে পড়ায় এটা তো সত্যি কথা।

অমল অতিকষ্টে হাসি দমন করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনিও আর কথা কহিলেন না।······

গাড়ি হু-হু করিয়া একটির পর একটি স্টেশন ফেলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহারই মধ্য দিয়া বাঙলার বাঁশঝাড়, কুটীর ও পানাপুকুরের যেটুকু ছবি চোখে পড়িতেছিল, অমল একদৃষ্টে যেন তাহা পান করিতেছিল। দেশ ছাড়িবার পর বহুদিন এ দৃশ্য আর তাহার নজরে পড়ে নাই, আজ এতদিন পরে যদিবা তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, নিজের অবস্থার কথা। সহায়-সম্বলহীন হইয়া সে অকূলে ভাসিল, বহুদিন—হয়তো বা চিরকালের জন্য—সে চিরপরিচিত বাঙলাদেশকে ছাড়িয়া চলিল; হয়তো আর কখনই এই সবুজ কলাগাছের পাতা, এই নিবিড় শ্যামলতা সে এমন করিয়া দেখিতে পাইবে না।

।। পাঁচ ॥

বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বোধ করি তন্দ্রাই আসিয়াছিল, সহসা চমক ভাঙিল পাশের ভদ্রলোকটির ডাকে—

ও মশাই, শুনছেন?

মশাই? তবে কি সে ভুল শুনিতেছে? অমল বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, জবাব দিতে পারিল না।

তিনি পুনশ্চ কহিলেন, রাগের মাথায় কি বলতে কি ব'লে ফেলেছি ভাই, রাগ করবেন না যেন।

অমলের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু তবুও সে যতদূর সম্ভব মনোভাব দমন করিয়া সৌজন্য দেখাইয়া কহিল, না না, সে কি কথা। ও-সব মনে ক'রে সঙ্কোচ বোধ করবেন না।

তিনি গলার স্বর অকারণে খাটো করিয়া কহিলেন, আমার নাম শ্রীভবেশচন্দ্র দাসঘোষ. মশায়ের নাম?

অমল নাম বলিল। তিনি কহিলেন, ব্রাহ্মণ? প্রাতঃপ্রণাম। আপনার বসতে বোধ হয় খুবই কষ্ট হচ্ছে, একটু স'রে এসে ভাল ক'রে বসুন না।

বলা বাহুল্য, অমল এ সুযোগের অসদ্ব্যবহার করিল না। সে যতটা স্থান অধিকার করিয়া বসা সম্ভব, ততটাই দখল করিল। একটু পরে ভবেশবাবু কহিলেন, কতদূর যাওয়া হবে?

পাটনা। আপনি?

আমি যাব দ্বারভাঙ্গা। মোকামাঘাটে নামব। সেখানে আমার মামাশ্বশুর থাকেন, মহারাজের দপ্তরের বড় চাকুরে।

অমল বুঝিল, এইদিকে তাঁহার একটু দুর্বলতা আছে; সে চুপ করিয়া রহিল

এবং মনে মনে প্রাণপণে ভবেশবাবুর ভাব পরিবর্তনের কারণ চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু বেশীক্ষণ তাহাকে ভাবিতে হইল না, একটু পরে ভদ্রলোক নিজেই কারণটা ব্যক্ত করিলেন। গলা নিচু করিয়া চুপিচুপি কহিলেন, আচ্ছা, ওই কাবলেগুলো কি-রকম ক'রে চাইছে দেখছেন আমার দিকে ? ওরা ডাকাত নয় তো ?

অমল বিস্মিত হইয়া জবাব দিল, ডাকাত ? ডাকাত কেন হবে ? আর হ'লেই বা আপনার দিকে বিশেষ ক'রে চাইবে কেন ?

তিনি আরও ফিসফিস করিয়া কহিলেন, কারণ আছে ; আমার কাছে অনেক-গুলো টাকা রয়েছে, প্রায় চারশ' টাকা।

অমল মৃদু হাসিয়া কহিল, চারশ' টাকার জন্যে কেউ ডাকাতি করে না, অন্ততঃ ট্রেনে।

না, করে না ! জানেন প'চিশটা টাকার জন্যে ডাকাতি করে ?

আর কথা না বাড়াইয়া অমল কহিল, তা ছাড়া আমরা একগাড়ি লোক রয়েছি, ডাকাতি অমনি করলেই হ'ল ?

ভবেশবাবু অগত্যা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু একটু পরেই আবার কহিলেন, এক্সারসাইজ করেন ? ব্যায়াম ?

অমল কহিল, না। কিন্তু এমনিই গায়ে যথেষ্ট জোর আছে।

ছাই আছে। ও জোরে কিছু হয় না। পারবেন কাবুলের সঙ্গে লড়াই করতে ? ঐ ক'রেই তো বাঙালী জাতটা মরতে বসেছে।

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর সহসা বাহুমূলে সজোর চিমটি খাইয়া অমল সচকিত হইয়া উঠিল, ভবেশবাবু ফিসফিস করিয়া কহিলেন, মশাই সামনের বেঞ্চির মোচলমানগুলো কি করে চাইছে এদিকে দেখছেন ? নিশ্চয় ওদের সঙ্গে ওই কাবুলেগুলোর ষড় আছে।

ওপাশের বেঞ্চির মুসলমানগুলি সত্যই এদিকে চাহিতেছিল, কিন্তু সে ভবেশ-বাবুর জন্য নয়। ভবেশবাবুর দিকেই বর্ধমান স্টেশনের প্লাটফর্ম পড়িয়াছিল, তাহাদের দৃষ্টি ছিল প্লাটফর্মের উপর অসংখ্য ফেরিওয়ালার খাদ্যসম্ভারের দিকে।

অমল সেই কথাই ভবেশবাবুকে বুঝাইতে গেল। কিন্তু তিনি তাহাতে বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে যখন সত্যসত্যই তাহারা জন-তিনেক একটা মিঠাইওয়ালা ডাকিয়া অন্য যাত্রী মারফৎ মিহিদানা কিনিল, তখন তিনি অগত্যা চুপ করিলেন।

ক্রমশঃ রাত্রি গভীর হইল, গাড়িসুদ্ধ সব ঢুলিতে শুরু করিয়াছে, অমলও বসিয়া বসিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল ; তাই গাড়ি কখন যে আসানসোলের কাছাকাছি আসিয়াছিল, তাহা টের পায় নাই। সহসা এক প্রবল ঝাঁকুনিতে সে উঠিয়া বসিল ; এবারেও ভবেশবাবু।

মশাই দেখছেন একবার কাণ্ডখানা। সবাই ঘুমুচ্ছে, আর ও ব্যাটা ড্যাব ড্যাব ক'রে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। তবু আপনি বলবেন ও ব্যাটারা ডাকাত নয় ?

অমল চারিদিকে চাহিয়া দেখিল যে, একটি কাবুলীর বোধ করি ঘুম আসে নাই ; সে উহাদের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। এবার সে বিরক্ত হইয়া কহিল,

কেন মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন আপনি, বলছি তো যে ডাকাতি করা অত সহজ নয়।

ভবেশবাবু তাহার ঝাঁজ লক্ষ্য করিয়া আর কিছু বলিলেন না, কিন্তু সে শান্তি যে ক্ষণিক, তাহা অল্পক্ষণ পরেই বোঝা গেল। ততক্ষণে আসানসোল স্টেশনে গাড়ি আসিয়াছে, ভবেশবাবু প্ল্যাটফর্মের দিকে মুখ বাহির করিয়া একাগ্রদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন এবং একটু পরেই একজন টিকিট কলেক্টারকে দেখিয়া রীতিমত চেঁচামেচি করিয়া উঠিলেন, ও মশাই শুনছেন, ও মশাই—

টিকিট কলেক্টারটি কাছে আসিতে কহিলেন, মশাই এ গাড়িতে একদল ডাকাত যাচ্ছে, পুলিসে ইনফর্ম করুন।

টিকিট কলেক্টার ভদ্রলোক অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কিছু নিয়েছে?

ভবেশবাবু কহিলেন, নেয় নি কিছু কিন্তু নেবার চেষ্টা করছে। আমার কাছে অনেকগুলো টাকা আছে, সেইজন্য ওরা দল পাকিয়ে এই গাড়িতেই উঠেছে; বার বার আমাদের দিকে চাইছে, আর নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে।

টিকিট কলেক্টার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অমলের দিকে চাহিতে সে ভবেশবাবুর অলক্ষ্যে নিজের মাথাটা দেখাইয়া দিল। তিনি ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, যাক, এখনও কিছু নেয় নি তো? আপনি চুপচাপ শুয়ে থাকুন, ডাকাতি যখন করবে, তখন গার্ডকে জানাবেন কিংবা পরের স্টেশনের মাস্টারকে—চাই কি চেন ধরেও টানতে পারেন।

তিনি চলিয়া গেলেন। ভবেশবাবু কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া কহিলেন, সব ব্যাটাদের নামে রিপোর্ট ক'রে দেব। তা নইলে জব্দ হবে না। পাবলিকের টাকা খেয়ে পাবলিককেই হেনস্তা—!

অমল তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া পুনরায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইল। এবার ঘুম ভাঙ্গিল একেবারে মোকামাঘাটে। তখন সকাল হইয়াছে, ভবেশবাবু মালপত্র বার বার গুনিয়া মুটের মাথায় চাপাইতেছেন। চারিদিকে কোলাহল, বহু লোক নামিতেছে, উঠিতেছে। ভবেশধাবুরও রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যেন ভয়-ডর সব চলিয়া গিয়াছে। তিনি প্রচুর হাঁক-ডাক করিতেছেন। অমল চোখ মেলিয়া চাহিতেই একেবারে আত্মীয়তার সুরে কহিলেন, তুমি এবার বেশ হাত-পা মেলে বোস ভাই. সারারাত কষ্ট হয়েছে।

তাহার পর সহসা ফিরিয়া কহিলেন, পাটনায় কি জন্যে যাচ্ছ, বললে না তো? অমল একটুখানি ইতস্তত করিল, তাহার পর কথাটা বলিয়াই ফেলিল, আজ্ঞে কাজকর্মের চেষ্টায়।

তখন ভবেশবাবু নামিয়াই পড়িয়াছেন। তিনি মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, বাঁকিপুরের কদমকুঁয়ায় আমার এক ভায়রা থাকেন. ওখানকার এক ইস্কুলের হেডমাস্টার, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পার, ভুবনবাবু তাঁর নাম।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। ততক্ষণে তাহার কামরা অনেক খালি হইয়া গিয়াছে; হাত-পা মেলিয়া সে শুইয়া পড়িল। বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া তাহার মেরুদণ্ডে যন্ত্রণা শুরু হইয়াছে, হাত-পা কনকন করিতেছে; শুইয়া একটু আরাম হইল বটে,

কিন্তু ঘুম আর আসিল না। গত রাত্রের সামান্য খাদ্য বহুক্ষণ পরিপাক হইয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় এখন যেন তাহার নাড়ীতে পাক দিতেছে। কিন্তু পকেটে সামান্য কয়েক আনা পয়সা সম্বল, খাবার কিনিয়া খাইতে তাহার সাহস হইল না। পাটনায় গিয়া কোথায় আশ্রয় পাইবে, কত দিনে পাইবে কিছুই জানা নাই, কোনও পরিচিত লোক পর্যন্ত সেখানে নাই। কাজ যদি না জোটে তো সত্য-সত্যই ভিক্ষা করিতে হইবে, কিংবা শেষ পর্যন্ত নাটকীয়ভাবে আত্মহত্যা!

এমনিই সব এলোমেলো কথা ভাবিতে ভাবিতে কোন্ এক সময়ে দেখা গেল গাড়ি পাটনা জংশনে থামিয়াছে। অমলের এই প্রথম বিদেশে আসা নয়, কলিকাতায় যেদিন প্রথম আসে, সেদিনই সে অভিজ্ঞতা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবুও সে খানিকটা বিহ্বলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। চারিদিকের এই অপরিচিত জনতা আজ তাহার চোখে একান্ত নির্মম বলিয়া বোধ হইল। ইহাদের কাছ হইতে কোনও প্রকার দয়ামায়া পাইবার আশা করাও হাস্যকর।

মিনিট পাঁচেক পরে সে অবশিষ্ট যাত্রীদের পিছনে পিছনে পুল পার হইয়া স্টেশনের বাহিরে আসিল। তার পর একাওয়ালা ও বাসওয়ালাদের ভিড় ঠেলিয়া শেষ পর্যন্ত শহরের পথে আসিয়া পড়িল। সেখানে জন তিন-চার লোককে জিজ্ঞাসা করিতে কদমকুঁয়ার খবরও পাওয়া গেল। সেখানে গিয়া যে কি করিবে, কোথায় কাহার কাছে কী সাহায্য চাহিবে, সে ধারণা তাহার মাথার মধ্যে ছিল না—কিন্তু তবুও এই সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে যাহা হউক একটিমাত্র লোকের সন্ধান যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন সেইটিকেই সে প্রাণপণে অবলম্বন করিল।

কদমকুঁয়ায় ভুবনবাবুর বাসা খুব অপরিচিত নহে, একটি ভদ্রলোককে প্রশ্ন করিবামাত্র তিনি বলিয়া দিলেন। সে কম্পিতবক্ষে বাড়িটির সামনে আসিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল। সাধারণ একটি দোতলা বাড়ি, সম্মুখে একটুখানি মাত্র হাতা। কিন্তু ইতস্তত করা তাহার সেজন্য নয়, বাগানের সামনে বারান্দায় খুব সম্ভব গৃহস্বামী নিজেই বসিয়া আছেন, তাঁহাকে দেখিয়াই সে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। প্রথমে গিয়াই কি বলিবে, তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারিল না। অন্য কোনও সাহায্যের কথা বলিবে, না সোজাসুজি গৃহস্থালীর চাকুরির কথা পাড়িবে, মিনিট খানেক সেই কথা চিন্তা করিয়া শেষে একপ্রকার মরীয়া হইয়াই ঢুকিয়া পড়িল।

অত্যন্ত ক্ষীণজীবী একটি ভদ্রলোক, দেখিলেই মনে হয়, বছর ত্রিশেকের ডিস্‌পেপসিয়া তাঁহার দেহে পোষা আছে, নাকে চশমা লাগাইয়া একটা বেতের চেয়ারে বসিয়া কাগজ পড়িতেছেন। অমল শুষ্কমুখে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইবামাত্র তিনি কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, কোন্ সাবজেক্টে ফেল করেছ? এত দেরিই বা কেন?

অমল প্রথমটা কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আজ্ঞে ফেল তো করি নি!

ভুবনবাবু অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। কহিলেন, কর নি কী রকম? এক-

জমিদারেরা সব অমনি ফেল করিয়ে দিলে বুঝি ? হিংসে ক'রে ?

অমল আরও আশ্চর্য হইয়া গেল, বার-কতক ঢোক গিলিয়া বলিল, তাঁরাও ফেল করান নি তো !

ভুবনবাবু ধমক দিয়া বলিলেন, ইডিয়ট ! তুমিও ফেল কর নি, এক্‌জামিনাররাও ফেল করিয়ে দেন নি, তবে তুমি আবার ভর্তি হ'তে এসেছ কেন শুনি ?

অমল ঘামিয়া নাহিয়া উঠিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তাহার সৌভাগ্যক্রমে ওধারের চিকের পর্দাটা সরাইয়া বারন্দায় অবতীর্ণা হইলেন ভুবনবাবুর স্ত্রী। মাস্টার মহাশয় যেমন রোগা, তাঁহার গৃহিণী তেমনি মোটা। অমল মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, অন্ততঃ সাড়ে তিন মণের কম হইবে না। গৌরবর্ণ, মুখশ্রী ভাল, চশমার মধ্য দিয়া চোখ দুটি ডাগরই দেখায়, কিন্তু বিপুল মেদভারে তাঁহার সমস্ত শ্রী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভদ্রমহিলার ধোপদস্ত শাড়ীর দিকে চাহিলে মনে হয় না যে, কখনও তিনি নড়িয়া কোনও কাজ করেন, কিন্তু গলার সুর তাঁহার সর্বদাই ক্লান্ত, কথা শুনিলে বোধ হয় সারাদিন ধরিয়া বিশ্বের সমস্ত কাজ করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে ওই একটিমাত্র মানুষকে !

তিনি কহিলেন, তোমার যত বয়স বাড়ছে, তত ভীমরতি ধরছে নাকি ? দুনিয়ার সব মানুষ কি তোমার কাছে আসে শুধু ইস্কুলের কাজে ? খামকা একটা লোককে ধমকাচ্ছ কেন ? কি কাজে, কেন এসেছে খোঁজ কর আগে !···খালি ইস্কুল, আর ইস্কুল ! তোমার ইস্কুলের জ্বালায় আমায় একদিন আত্মহত্যা করতে হবে, এ আমি বেশ জানি !

আঘাত পাইবামাত্র কচ্ছপ যেমন মুহূর্ত-মধ্যে হাত-পা গুটাইয়া খোলার মধ্যে প্রবেশ করে, স্ত্রী বাহির হওয়া মাত্র মাস্টার মহাশয়ের সমস্ত বিক্রম তেমনি করিয়া হাত-পা গুটাইয়া তাঁহাকে বেতের চেয়ারের মধ্যে যেন আরও কুণ্ডলী পাকাইয়া ছিল। ভয়ে ভয়ে মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, তা, তা,—তবে ও কি জন্যে এসেছে ?

মাস্টার-পত্নীর ক্লান্ত সুর আবার ফিরিয়া আসিল ; কহিলেন, কি জন্যে এসেছেন, খোঁজ কর না ?

তার পর তিনি নিজেই একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিলেন, কি চান আপনি ?

অমল ততক্ষণে প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে ; সে কোনমতে মরীয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, আমি কাজের জন্যে এসেছিলুম।

কাজ !

মাস্টার-পত্নীর নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ভুবনবাবুও এতক্ষণে আবার সোজা হইয়া বসিলেন, কহিলেন, কাজ ? কাজ কি আর বাঙালীর পাবার জো আছে ? ইন্সপেক্টারের হুকুম, সমস্ত কাজেই বিহারীকে রাখতে হবে। এমন কি, মাস্টার পর্যন্ত বাঙালী রাখতে গেলে, অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়। তা নইলে—

ভুবনবাবুর স্ত্রী আবার ধমক দিলেন, ফের ইস্কুল !···তা কি কাজ চাও ?

তিনি অমলের দীন বেশভূষা ও শুষ্ক মুখ দেখিয়া এবং কাজের কথা শুনিয়া 'আপনি' হইতে 'তুমি' করিয়া ফেলিলেন।

অমল ঘাড় হেঁট করিয়া সহসা জবাব দিল, আজ্ঞে, আমি রান্নার কাজ কিছু কিছু জানি।

সহসা ভুবনবাবুর স্ত্রী সোজা হইয়া বসিলেন, জান রান্নার কাজ? সত্যিই জান? কি জাত তুমি?

অমল পৈতাটা জামার মধ্য হইতে বাহির করিয়া দেখাইল; তারপর কহিল, খুব ভাল জানি না, তবে আপনারা দেখিয়ে শুনিয়ে দিলে পারি হয়তো।

ভুবনবাবুর স্ত্রী একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বাঁচালে বাবা তুমি! বাবাজীটা কাল হঠাৎ অসুখ ক'রে বাড়ি চ'লে গেল, কী বিপদে যে পড়েছিলুম বলবার কথা নয়। ছেলেমেয়ে নিয়ে আটজন লোক, দুবেলা রান্না কি সোজা কথা? আজই তো হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। তাহ'লে তুমি যাও, স্নানটান ক'রে নাও, আজ রবিবার ব'লে এখনও রান্না চাপে নি, তুমিই চাপিয়ে দাওগে। পান্নাকে ডাকছি, সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিক!

ভুবনবাবু বহুক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, এইবার ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিলেন, কোথায় ওর বাড়ি, কি বৃত্তান্ত কিছুই খোঁজ নিলে না, এখানে কেউ চেনে কিনা—

পাছে ঠাকুরটি হাতছাড়া হইয়া যায় এই ভয়ে মাস্টার-পত্নী রাজবালার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল কিন্তু ভুবনবাবুর কথাগুলা নাকি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত, তাই তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। অমলেরও মুখ শুকাইয়া উঠিল। সে খানিকটা মাথা চুলকাইয়া জবাব দিল, বাড়ি আমার বাংলা দেশেই। কলকাতায় অনেক দিন ছিলুম।

রাজবালা কহিলেন, এখানকার খবর দিলে কে?

ভুবনবাবু কহিলেন, কোনও ইস্কুলের মাস্টার-টাস্টার বোধ হয়, কিংবা কোথাও ছাত্র।

আবার ইস্কুল!

ভুবনবাবু ভয়ে চুপ করিয়া গেলেন। অমল কহিল, ভবেশবাবু আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তিনি আমাকে চেনেন।

রাজবালা যেন ধড়ে প্রাণ পাইলেন। কহিলেন, হ'ল তো? জামাইবাবু চেনেন, তিনিই পাঠিয়েছেন। তোমার সব তাতেই—

।। ছয় ।।

অর্থাৎ অমল বাহাল হইল!

চাকর পান্নু কলঘর দেখাইয়া দিল, তার পর রান্নাঘর। উনানে সকালেই আগুন পড়িয়াছিল, খুব সম্ভব চায়ের জন্য; কিন্তু গৃহিণীর অত্যধিক আলস্যবশত তাহাতে বার দুই-তিন শুধু কয়লাই পড়িয়াছে, রান্না এখনও চাপে নাই।

একে অচেনা ঘর, তাহাতে ঠিক রান্না করা বলিতে যাহা বোঝায় রীতিমতভাবে

তাহা অমল কখনও করে নাই। সুতরাং সে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। ব্যাপারটা যত সহজ বলিয়া পূর্বে বোধ হইয়াছিল এখন আর ততটা সহজ লাগিল না। কিন্তু একটু পরেই স্বয়ং রাজবালা আসিয়া রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন। তিনি মিনিটখানেক এটা-ওটা নির্দেশ দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'ও হরি, তুমি যে কিছুই জান না দেখছি!'

কিন্তু তাহাতে তিনি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন বলিয়াও বোধ হইল না, বরং তাঁহাকে যে উনানের ধারে আগুন-তাত সহ্য করিতে হইল না, এই কৃতজ্ঞতায় তিনি ধৈর্য সহকারে বসিয়া বসিয়া সমস্তই দেখাইয়া দিলেন। এমন কি ছেলেমেয়েদের ও স্বামীর খাওয়ার সময়ও বসিয়া থাকিয়া কিভাবে পরিবেশন করিতে হয় তাহা বলিয়া দিলেন। অমল কোনও মতে সমস্ত কাজ সারিয়া বেলা তিনটার সময় আর একবার স্নান করিয়া নিজে দুইটি মুখে দিল। তার পর নিজের নির্দিষ্ট স্থানটিতে একটা মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল।

গত তিন-চার ঘণ্টার পরিশ্রমেই যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল, কি করিয়া যে এইখানে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি কাটাইবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। অথচ কপর্দকশূন্য অবস্থায় এই নিরাপদ আশ্রয় এবং নিশ্চিত আহার্য ছাড়িয়া অপর কোথাও যাইবার কথা সে কল্পনা পর্যন্ত করিতে পারিল না! নিজের এই অদ্ভুত-জীবনযাত্রা ও পরিণতির কথা ভাবিতে ভাবিতে একটা নিদারুণ মানসিক অবসাদের মধ্যেই তাহার চক্ষু দুইটি একসময় বুজিয়া আসিল।

বেলা পাঁচটা বাজিতে না বাজিতেই আবার তাহার ডাক পড়িল। চা করিতে হইবে, তৎসহ হালুয়া ও পাঁপর ভাজা; তার পর রাত্রির খাবার। একদিন সে ভাবিত যে তাহার বাবা মাসিক প'চিশ টাকা মাহিনাতে গ্রামের মাইনর স্কুলে সারাজীবন কাটাইলেন কি করিয়া, আজ সে পাঁপর ভাজিতে ভাজিতে ভাবিতে লাগিল যে গ্রামের স্কুলের সে মাস্টারিটা এখনও খালি আছে কিনা, এবং কোনও মতে এখনও দেশে ফিরিয়া যাওয়া যায় কিনা।

কিন্তু সে দুরাশা! এখানকার এই জীবনই তাহাকে যাপন করিতে হইবে। হউক তাহা কষ্টসাধ্য, কিন্তু নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত তো বটে।

দিন-দুই কাজ করিবার পরই অমল পরিবারটিকে চিনিয়া লইল। ভুবনবাবু বেচারী স্কুলের বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হইবার কোনও সুযোগ জীবনে কখনও পান নাই, আর কিছুই তিনি জানেন না। তাঁহার নিজের অত্যাবশ্যক জিনিসগুলি সম্বন্ধেও তাঁহার ধারণা অস্পষ্ট। পরিধেয় পেণ্টুলুনটা ময়লা হইয়াছে, কি আরও একদিন তাহা পরিয়া স্কুলে যাওয়া যাইবে তাহা রাজবালাকে দেখাইয়া লইতে হইত, কবে তাঁহার শরীর খারাপ বোধ হইতে পারে এ কথাটা পর্যন্ত স্ত্রীর নিকট হইতে না জানিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি যতই দুর্বল হউন, স্কুলের ব্যাপারে তিনি অতিশয় দৃঢ় ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে একটি দিনও যদি তিনি স্কুলে অনুপস্থিত থাকেন তো স্কুলটি সেই দিনই অচল হইয়া যাইবে এবং সেইটিই হইবে পৃথিবীর

ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ঘটনা। সুতরাং তিনি রাজবালার সমস্ত অনুজ্ঞাই নির্বিচারে পালন করিতেন, কেবল স্কুলে কামাই করিবার কথা ছাড়া। ভদ্রলোক সংসার ও পৃথিবীর কোনও খবর রাখিতেন না। বাড়িতে যখন থাকিতেন, স্কুলের কাজেই ব্যস্ত থাকিতেন এবং কোনও লোক আসিলে তাহার বক্তব্য প্রায় জোর করিয়া থামাইয়া দিয়া স্কুলের উন্নতিকল্পে সম্প্রতি তিনি যে সব নূতন পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাই শুনাইতে বসিতেন।

সুতরাং সংসার ও সাংসারিক যাহা কিছু, সে সকলেরই সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন রাজবালা। তিনি সত্যসত্যই অলস নন, স্বামী ও পুত্রকন্যার স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত ব্যবস্থাই সুচারুরূপে করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। কিন্তু একটিমাত্র দুর্বলতাকে তিনি কিছুতেই ছাড়িতে পারেন না। সেটা তাঁহার আভিজাত্য প্রদর্শন। কদম-কুঁয়ার অতি আধুনিকা অ্যাডভোকেট-পত্নীদের সহিত তাই সমানভাবে গলা মিলাইয়া ক্লান্ত সুরে তাঁহাকে কথা কহিতে হয় এবং কিছুতেই তিনি রান্নাঘরে যাইতে চান না। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার ছেলেমেয়েদের মানুষ করিবার যে প্রণালী তিনি অনুসরণ করেন তাহার মধ্যেও ওই শ্রেণীর একটা বাহ্য আভিজাত্যের সুরই হইতেছে প্রধান।

ছেলেমেয়েদের সংখ্যা তাঁহার খুব কম নয়, সর্বসুদ্ধ সাতটি। বড় মেয়েটি ক্লাস নাইনে পড়ে, বয়স পনের-ষোল, তাহার পরে তিনটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে। সর্বকনিষ্ঠটি দুগ্ধপোষ্য।

লোক বেশী হইলেও ঝঞ্ঝাট খুব বেশী নয়। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণ পারিবারিক যত্নের মধ্যে মানুষ হইয়াছে যে ছেলে এবং লেখাপড়া শিখিয়াছে, তাহার পক্ষে আগুনের তাতে গিয়া প্রত্যহ দুইবেলা রান্না, দশ-বারোটি লোককে খাওয়ানো, অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাহাও হয়তো সহ্য হইত কিন্তু তাহার সহিত রাজবালার আভিজাত্যের ঠেলা একেবারেই অসহ্য। কিন্তু দিন-পনেরো কাজ করিবার পরে, একমাসের মাহিনা হস্তগত হইবামাত্র কাজ ছাড়িবার একটা কল্পনা যখন মাথায় আনাগোনা করিতেছে, তখন সহসা এক অঘটন ঘটিয়া গেল। ব্যাপারটা বলি—

ভুবনবাবুর বড় মেয়ে জ্যোৎস্না একদিন ভিতরের উঠানে একটা টেবিলে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছিল। সেই সময় কী একটা তরকারি চাপাইয়া অমলও সেখানে পায়চারি করিতেছে, হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল জ্যোৎস্না য়্যাল্‌জেবরার সামান্য একটা প্রবলেম লইয়া হিমশিম খাইতেছে। অঙ্কশাস্ত্রটা অমলের কাছে চিরদিনই সহজ এবং প্রিয়। সুতরাং ঐ উত্তরটা বলিয়া দিবার জন্য যে সে চঞ্চল হইয়া উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক। সে বহুক্ষণ নিজেকে সামলাইয়া রাখিয়া শেষ পর্যন্ত এক সময়ে ভুলিয়া গেল যে সে পাচক-ব্রাহ্মণ মাত্র—তাই জ্যোৎস্না বারে বারে যে ভুলটা করিতেছিল টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া একসময় সেই ভুলটাই আঙুল দিয়া সে দেখাইয়া দিল।

জ্যোৎস্না কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া অমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার-

পান্নাই মুখে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া বাহিরের ঘরের দিকে গেল। তখন ভুবনবাবু বসিয়া পরীক্ষার খাতা দেখিতেছিলেন এবং রাজবালা স্কুলের অপর একটি মাস্টারের সহিত যতদূর সম্ভব ক্লান্তভাবে কথাবার্তা চালাইতেছিলেন। জ্যোৎস্না ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়াই কহিল, বাবা, আমাদের বামুনঠাকুর লেখাপড়া জানে।

রাজবালা কহিলেন, তা কি হয়েছে তাতে? তুমি অত হাঁপাচ্ছ কেন? আজকালকার দিনে একটু লেখাপড়া জানে না কে? মেথর মুদ্দোফরাশ পর্যন্ত আজকাল নামসই করছে!

জ্যোৎস্না কহিল, একটু লেখাপড়ার কথা বলছি নাকি আমি! আমি একটা অ্যালজেবরার প্রবলেম কিছুতেই করতে পারছিলুম না, ঠাকুর মুখে মুখে বলে দিলে।

এবার সকলেই রীতিমত বিস্মিত হইলেন। এমন কি ভুবনবাবু পর্যন্ত তাঁহার পরীক্ষার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রাজবালাই কিছুক্ষণ পরে কথা কহিলেন। বলিলেন, এখনি ওকে বিদেয় ক'রে দাও! আর এক মিনিটও রাখা চলবে না।

ভুবনবাবু আরও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কেন গো? রান্না তো আর খারাপ করে না!

রাজবালা অগ্নিস্রাবী দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, তুমি থাম।··· পলিটিক্যাল সাসপেক্ট, বুঝতে পারছ না? বোমা!

যে শিক্ষকটি বসিয়া ছিলেন, এখানে তাঁহার পত্নী-স্থানেই প্রতিষ্ঠা, তিনি বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, নিশ্চয়ই, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।

ভুবনবাবু বোধ করি জীবনে এই দ্বিতীয়বার কি তৃতীয়বার স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করিলেন। কহিলেন, না না, বোমার চেহারা আলাদা। এর পলিটিক্স্-এ যাবার মত চেহারাই নয়।

রাজবালা জবাব দিলেন, হ্যাঁ, নয়! তুমি তো সবই জান, আচ্ছা কই ডাক দেখি ওকে, জিগ্গেস ক'রেই দেখা যাক!

সেদিনটা কি একটা ছুটির দিন, রান্নার খুব বেশী তাড়া ছিল না। পান্নুকে দিয়া বলিয়া পাঠানো হইল, হাতের রান্নাটা নামাইয়া উনানে কয়লা দিয়া অমল যেন একটু বাহিরের ঘরে আসে।

অমলের পক্ষে কারণটা অনুমান করা অসম্ভব নয়, এমন কি সে ঠিক এইটিই আশা করিতেছিল বলিলেও ভুল করা হইবে না। সে প্রস্তুত হইয়াই দেখা দিল।

আমাকে ডাকছিলেন?

কথাবার্তা রাজবালাই চালাইবেন ইহা পূর্বাহ্নেই স্থির ছিল বা বহু পূর্ব হইতেই স্থির হইয়া আছে। কারণ যাহা কিছু কথাবার্তার ভার স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারই উপর ছাড়িয়া দিয়া ভুবনবাবু নিশ্চিন্ত আছেন। সুতরাং রাজবালাই কথা কহিলেন—খুকী বলছিল, তুমি নাকি তাকে পড়া বলে দিয়েছ?

অমল বিনত ভাবে কহিল, আজ্ঞে না, পড়া ঠিক নয়, একটা প্রবলেম পারছিল না, তাই।

তুমি য়্যালজেব্রা জান ?

কিছু কিছু জানি।

তুমি কত দূর পড়াশুনো করেছ ?

ম্যাট্রিক পাস করেছিলুম।

কই, এতদিন সে কথা বল নি তো !

আপনারা তো কোনও দিন পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করেন নি !

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন, সহসা যে এভাবে অমল জবাব দিবে তাহা বোধ হয় কেহই আশা করেন নাই। একটু পরে ভুবনবাবু প্রশ্ন করিলেন, কোন্ ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাস করেছিলে ?

ফার্স্ট ডিভিসনে। তিনটে লেটার ছিল।

কোন্ ইস্কুল থেকে দিয়েছিলে ?

রাজবালা এইবার পুনরায় নিজের হাতে রশি তুলিয়া লইলেন, স্বামীকে ধমক দিয়া কহিলেন, ফের ইস্কুল ? কাজের কথার সময় যদি তুমি আবার ইস্কুলের কথা তোল, আমি মাথা খুঁড়ে মরব !···তা তুমি লেখাপড়া শিখে এ কাজ করতে এলে কেন ?

অমল তেমনি আনত মুখেই জবাব দিল, কি কাজ করব বলুন ? অন্য কোনও কাজের জন্য এলে কি আপনারা অত সহজে দিতেন ? না লেখাপড়া কোনও কাজে আসত ? ম্যাট্রিক পাস ক'রে দেশ থেকে এসেছি প্রায় বছর দুই তিন হ'ল। কলকাতায় থেকে টিউশনি ক'রে বা অন্য কোনও কাজ করে পড়াশুনো করব এমনিই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারলুম না। শেষে যখন দু মুঠো ভাতও বন্ধ হ'ল তখনই বাধ্য হয়ে এই চেষ্টা করলুম। কলকাতায় থেকে এ কাজ করতে গেলে লজ্জা করত ব'লে এখানে চলে এলুম।

ভবেশবাবুর সঙ্গে কোথায় আলাপ হ'ল ?

ট্রেনে। কাজ খুঁজছি শুনে তিনিই এই সন্ধান দিলেন।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া রাজবালা পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, পলিটিক্যাল ব্যাপারে কোনও দিন মাতামাতি করেছ ? মানে বোমা, বোমা তৈরি করেছ ?

আজ্ঞে না।

তুমি যে সত্যি কথাই বলছ তার প্রমাণ কি ? কি ক'রে জানব আমরা ?

কলকাতায় যেখানে-যেখানে পড়াতুম তাঁদের ঠিকানা দিচ্ছি, চিঠি লিখে দেখুন। মেসের ঠিকানাও দিতে পারি, তবে সেখানে একটা বিপদ আছে, তাঁরা কিছু টাকা পাবেন আমার কাছ থেকে, আমার ঠিকানাটা তাঁদের না জানানোই ভাল।

রাজবালা আরও খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া আদেশ করিলেন, আচ্ছা, তুমি যাও।

তাহার পর প্রশ্ন উঠিল, এখন কর্তব্য কি ?

অমল এই সকল জবাবদিহির জন্য পূর্বেই প্রস্তুত হইয়া মনে মনে রিহার্সাল দিয়া আসিয়াছিল বলিয়া কথাগুলি ঠিক বিশ্বাসের উপযোগী করিয়াই বলিয়াছিল। সুতরাং অল্প একটু বাদানুবাদের পরই স্থির হইল যে, আর যাহাই হউক, ছোকরার কথাবার্তা শুনিয়া সে সত্য কথা বলিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহাকে দিয়া রান্না করানোই বা চলে কি করিয়া ?

ভুবনবাবু তখন কহিলেন, আমাদের ছেলেমেয়েগুলোকে পড়ানোর জন্য যে একজন মাস্টার রাখব ভাবছিলুম, সেই কাজটাই ওকে দিলে কি হয়।

যে শিক্ষকটি বসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখ কালি হইয়া উঠিল, কারণ তিনি ওই উদ্দেশ্যেই কিছুকাল যাবৎ রাজবালার কাছে হাঁটাহাঁটি করিতেছিলেন। কিন্তু রাজবালা খুশী হইয়া কহিলেন, সেই বেশ কথা। সকাল বিকেল পড়াতেও পারবে, ছেলেমেয়েগুলোকে চোখেও রাখবে এখন! খাওয়া থাকা, আর সামান্য কিছু দিলেই চলবে।

সেই ব্যবস্থাই স্থির হইয়া গেল। সেইদিনই পূর্বেকার 'বাবাজী'কে ডাকিয়া, পাঠানো হইল এবং অপরাহ্নকালে অমলকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, আগামীকল্য হইতে সে যেন ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ভার গ্রহণ করে এবং সেজন্য তাহাকে আহার ও বাসস্থান ছাড়াও মাসিক দশটি করিয়া টাকা দেওয়া হইবে।

নূতন ব্যবস্থায় অমলের দিন ভালই কাটিতে লাগিল। আহার ও জলযোগের ব্যবস্থা ভাল। ছেলেমেয়েগুলি খুব গাধা নয়, সুতরাং পরিশ্রম করিতে হয় কম। পড়ানো ছাড়া অবশ্য আর একটি কাজ তাহার বাড়িয়াছে, সেটি রাজবালার জন্য কিছু কিছু শৌখিন বাজার করা। তাহার পছন্দ ভাল এবং দরদস্তুর করিতে পারে, এই দুইটি মহৎ গুণের পরিচয় পাইয়া রাজবালা এই কাজের ভারটি সম্পূর্ণরূপে তাহার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তাহাকে সত্য-সত্যই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতে শুরু করিয়াছেন।

প্রথম প্রথম দুই-চারি দিন অসুবিধা হইয়াছিল পাড়ার মেয়েদের জন্য; রাজবালার মারফৎ এমন রসাল সংবাদটা প্রচার হইবামাত্র প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে অসংখ্য নারী-সমাগম হইতে লাগিল। পাটনা সিটি হইতে শুরু করিয়া গর্দানিবাগ পর্যন্ত বোধ হয় কোনও মহিলাই বাকী রহিলেন না এবং রাজবালার অনুরোধে প্রত্যহই তাহাকে মিনিট কতকের জন্য 'কিউরিও' হিসাবে তাঁহাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। লজ্জায় অমলের মাথা কাটা যাইত বটে, কিন্তু এতদিনে সে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের মর্ম বুঝিয়াছিল সুতরাং এসব দৌরাত্ম্যই নীরবে সহিয়া যাইত।

যাক, সে অল্প কয়েকটা দিন, তার পর যতদূর সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়াই তাহার দিন কাটিতেছিল। কিন্তু মাস দুই পরে আবার তাহার দুশ্চিন্তার কারণ দেখা দিল। সহসা সে একদিন লক্ষ্য করিল যে জ্যোৎস্না তাহার দিকে একটু বেশী মনোযোগ দিতে শুরু করিয়াছে।

সন্দেহ জিনিসটা এমনই যে, প্রথমটা আসিতেই যা একটু দেরি কিন্তু মনে একবার দেখা দিলে অচিরেই তাহা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়, তাহার প্রমাণ-প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। অমলেরও প্রায় সেই ব্যাপার ঘটিল। প্রথম সন্দেহের পর এক সপ্তাহ কাটিতে না কাটিতে অমলের মনে সুনিশ্চিত বিশ্বাস দেখা দিল যে, জ্যোৎস্না দস্তুরমত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে।

অবশ্য সে বিশ্বাসের কারণও ছিল। জ্যোৎস্না পড়ার সময় অন্য ভাইবোনদের সহিত বিবাদ করিয়া অমলের পাশে বসিত এবং জলখাবারের থালা কিছুতেই সে পান্নু কিংবা মথুরাকে লইয়া আসিতে দিত না। তাহাতেও আপত্তির কোনও কারণ ছিল না, কিন্তু সহসা একদিন সে ফস্ করিয়া নিজের আঁচল দিয়া তাহার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিল এবং মায়ের অসাক্ষাতে আহারের সময় তাহাকে বাতাস করিতে শুরু করিল।

কুড়ি-বাইশ বছরের তরুণের পক্ষে এই ধরনের রোমান্স ঈপ্সিত ও রোমাঞ্চকর, বিশেষত, আধুনিক বাঙালী তরুণদের। কিন্তু অমলের বয়সটা বাইশ হইলেও, মনটা অনেকখানি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যে তরুণ প্রেমে পড়িতে চায়, যে তরুণ দিন রাত রোমাঞ্চের স্বপ্ন দেখে, কিশোরীর আঁচলের হাওয়ায় যে তরুণের মনের পাপড়িগুলি বিকশিত হইয়া ওঠে, অমলের মনের মধ্যে সে তরুণ বহুকাল মরিয়া গিয়াছিল। অভাব, নৈরাশ্য এবং আর একটি অত্যন্ত স্থূল অথচ অত্যাবশ্যক জিনিস—ক্ষুধা, তাহার বয়সকে পুরা দশটি বৎসর বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছে। তাই যে কিশোরীর প্রেমের আভাসে তাহার মন লঘু দখিনা হাওয়ার মত চঞ্চল হইয়া ওঠার কথা, সেই প্রেমেরই অস্ফুট ইঙ্গিত পাইয়া সে রীতিমত ভীত হইয়া উঠিল।

কিন্তু ইঙ্গিতটা চিরকালই অস্ফুট রহিল না। সহসা একদিন সকলে স্কুলে চলিয়া যাইবার পর দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করিতে আসিয়া সে বালিশের তলায় একটা চিঠি পাইল। স্কুলের রুলটানা খাতা হইতে একখানা পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া দুই পৃষ্ঠায় সুদীর্ঘ চিঠি লেখা হইয়াছে। জ্যোৎস্নার হাতের কদর্য লেখা চিনিতে অমলের বিলম্ব হইল না। কিন্তু এ যে রীতিমত প্রেমপত্র! নভেলী ঢং-এ নভেলী ভাষাতেই প্রেম নিবেদন করা হইয়াছে, যদিও বানান ও ব্যাকরণের ভুলে তাহা কণ্টকিত।

চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়িয়া তাহার গা জ্বলিয়া গেল। এত দিন পরে যদিবা ভাল আশ্রয় একটা মিলিয়াছে, এই হতভাগা মেয়েটার অকালপক্কতার জন্যই বুঝি তাহা যায়। সে অসহ্য ক্রোধে মনে মনে তাহাকে গালি দিতে লাগিল। কেন রে বাপু, এই তো সবে তোর ষোল বছর বয়স, ইহারই মধ্যে এত বাড়াবাড়ি কেন? সে ব্রাহ্মণ, ভুবনবাবুরা কায়স্থ, বিবাহের কোনও সম্ভাবনা নাই। তাহা ছাড়া ভুবনবাবু তাহার মত পাত্রকে দিবার জন্য নিশ্চয়ই মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতেছেন না, সুতরাং এ পথে আর অগ্রসর হইলেই একদিন মার খাইয়া এ বাড়ি হইতে বাহির হইতে হইবে।

সে চিঠিখানা কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। আর

কিছু টাকা হাতে জমাইতে পারিলে সে এ স্থান ত্যাগ করিত, কিন্তু পাইয়াছে আজ অবধি মাত্র কুড়িটি টাকা! তাহার মধ্য হইতে জামাকাপড় ও শতরঞ্জি চাদর প্রভৃতিতে প্রায় আটটি টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। বারো টাকা সম্বল করিয়া কোথায় যাওয়া যায়? আর তিনটি দিন কাটাইতে পারিলে আরও দশটি টাকা পাওনা হয় বটে। কিন্তু তাহাতেই বা কয় দিন?

সেদিন অপরাহ্নে পড়াইতে বসিয়া নিজে ডাকিয়া সে দুটি ছোট ছেলেকে দু-পাশে বসাইল এবং সামান্য একটা ছুতা করিয়া জ্যোৎস্নাকে কঠিন তিরস্কার করিল। জ্যোৎস্নাও, চিঠি দিবার লজ্জাতেই হউক, অথবা জবাব বা উৎসাহ না পাইবার গ্লানিতেই হউক, একবারও চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল না, কিংবা গায়ে পড়িয়া ভালবাসা দেখাইতে চেষ্টা করিল না। অমল ভাবিল, যাক বাঁচা গেছে।

কিন্তু তিন-চারিটি দিন যাইতে না যাইতে বোঝা গেল মেয়েটিকে সে এখনও চিনিতে পারে নাই।

সেদিন গভীর রাত্রে শয়নের জন্য ঘরে ঢুকিয়া সহসা সে অনুভব করিল কে তাহার বিছানায় বসিয়া আছে। তাড়াতাড়ি সুইচ টিপিতে যাইবে কিন্তু তাহার পূর্বেই জ্যোৎস্না আসিয়া হাত চাপিয়া ধরিল, ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল, চুপ! ভালয় ভালয় এসে ব'স বলছি, নইলে ভাল হবে না। গোটাকতক কথা আছে তোমার সঙ্গে।

তাহার স্পর্ধা ও অসমসাহসিকতায় অমল স্তম্ভিত হইয়া গেল। ভয়ে তাহার সারা অঙ্গে ঘাম দেখা দিল কিন্তু কোন রকম প্রতিবাদ করিতেও ভরসায় কুলাইল না। আস্তে আস্তে তাহার সহিত আসিয়া বিছানাতেই একধারে বসিয়া পড়িল।

জ্যোৎস্না কহিল, আমার চিঠির জবাব দাও নি কেন?

রাগে অমলের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল, কহিল, আমার তো মাথা খারাপ হয় নি!

জ্যোৎস্না জবাব দিল, তার মানে আমার হয়েছে? কিন্তু কেন তাই শুনতে পাই সাধুপুরুষ? আজকালকার ছেলেদের চিনতে আমার বাকী নেই। তার মানে আমি কালো, কুচ্ছিত, আমাকে দেখলে তোমার ঘেন্না হয়, এই তো? নিজে কি? আয়নায় একবার চেহারাটা দেখেছ?

এইবার অমলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল, সে কহিল, সে-জমাখরচে তোমার তো দরকার নেই! একরত্তি মেয়ে, এত ডেঁপোমি কেন? লুকিয়ে লুকিয়ে নভেল পড় আর এই সব কর। প্রেম বানান করতে শেখবার আগেই প্রেম করতে চাও। এখনও ঢের বয়স পড়ে আছে, এর পর যত পার প্রেম ক'রো। এখন পড়াশুনায় মন দাও গে!

কোনও কথার জবাব না দিয়া জ্যোৎস্না উঠিয়া দাঁড়াইল। অমল তখনও রাগে ফুলিতেছিল, সে পুনশ্চ কহিল, ফের যদি এসব মতলব দেখি, তোমার বাপ-মা কিছু বলুন আর না বলুন, আমিই চাবকে তোমায় লাল ক'রে দেব।

রাগে এবং অপমানে জ্যোৎস্নার মুখের চেহারাটা কি রকম দাঁড়াইয়াছিল, তাহা অন্ধকারে বোঝা গেল না, কিন্তু গলার আওয়াজটা সাপের মতই হিস্‌হিস্‌ করিয়া উঠিল। সে বাহির হইয়া যাইবার আগে দাঁতে দাঁত চাপিয়া শুধু বলিয়া গেল, আচ্ছা, দেখা যাক!

সে চলিয়া যাইবার পর অমল বহুক্ষণ চুপ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ এইভাবে বসিয়া থাকিবার পর উপরের ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজার শব্দ শুনিয়া শুইয়া পড়িল, কিন্তু ঘুম আসিল না। এই মেয়েটির যে অসমসাহসের পরিচয় সে এইমাত্র পাইল, তাহাতে সে নিশ্চিত বুঝিতে পারিল যে, ইহার অসাধ্য কিছুই নাই। তাহার উপর শেষের কথাগুলি যতই মনে পড়িতে লাগিল ততই তাহার বুকের রক্ত হিম হইয়া যাইতে লাগিল। সে যে আরও কি করিবে, প্রতিহিংসা সাধনের জন্য আরও কত আয়োজন করিবে, তাহার স্থির কি? এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের দোষ কেহই দেখে না, যাহা কিছু অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্নাম সব পুরুষদের। এই অপরিচিত স্থান হইতে শেষ পর্যন্ত কি মার খাইয়া যাইতে হইবে?

তাহার গায়ে ঘাম দেখা দিল। সে আতঙ্কে ও দুশ্চিন্তায় বহুক্ষণ ছটফট করিয়া রাত্রি আড়াইয়া নাগাদ উঠিয়া পড়িল। না, এস্থানে থাকা আর চলিবে না, চলিয়া যাইতে হইবে এবং আজই। সেই দিনই মাহিনার দশটি টাকা হাতে আসিয়াছে; তের আনা পয়সা সম্বল করিয়া সে যখন পাটনায় আসিতে পারিয়াছিল, তখন কুড়ি-বাইশ টাকা লইয়া যে-কোনও স্থানে যাইতে পারিবে, কিন্তু এখানে থাকা আর কোনও মতেই সমীচীন নহে। জ্যোৎস্নার সহিত গোপনে সন্ধি করিয়া লইলে সে এখনও অনেকদিন স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু যে ভদ্রলোক তাহাকে একান্ত দুঃসময়ে আশ্রয় ও আহার দিয়াছিলেন তাঁহার অনিষ্টসাধন সে কিছুতেই করিতে পারিবে না। তাহার চেয়ে এতদিন যেভাবে কাটিয়াছে আরও কিছুদিন না হয় সেইভাবেই কাটুক।

সামান্য বিছানা ও তাহার নিজের অল্প দুই-একখানি জামা-কাপড়ের একটি পুঁটুলি লইয়া ভুবনবাবুর নামে দুই-ছত্র চিঠি লিখিতে বসিল। তারপর বাহিরে তাঁহার লেখাপড়ার টেবিলের উপর চিঠিখানি রাখিয়া সে অন্ধকারেই বাহির হইয়া পড়িল।

তখনও রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয় নাই বটে, কিন্তু ময়দানের কাছাকাছি যাইতে তত রাত্রেই দুই-একখানি টমটম নজরে পড়িল। সে একটি টমটম ডাকিয়া তাহাকে চারিটি পয়সা কবুল করিয়া উঠিয়া বসিল। কারণ জনহীন পথে পুঁটুলি হাতে করিয়া গেলে অকারণে গোলমাল বা জবাবদিহির মধ্যে পড়িবার সম্ভাবনা।

স্টেশনে পৌঁছিবার সময়ও সে কোথায় যাইবে কিছুই স্থির করিতে পারে নাই। সেখানে টমটম হইতে নামিয়া একটা কুলীকে ডাকিয়া আন্দাজে ঢিল মারিল, কহিল, আভি যো গাড়ি আতা হয়, উ কাঁহা যায়গা?

সে জবাব দিল, দিল্লী যায়গা, দিল্লী।

দিল্লী, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দিল্লী, ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী! তাহাই হউক।

সে টিকিটঘরের কাছে গিয়া দিল্লীরই একখানি টিকিট কিনিয়া ফেলিল। ততক্ষণে গাড়িও প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আসিয়া ঢুকিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি একটা খালি গাড়ির মধ্যে উঠিয়া টিকিট দেখিয়া হিসাব করিতে বসিল যে সে জ্যোৎস্নার নিকট হইতে কতটা দূরে চলিয়া যাইতেছে।

পরদিন সকালে চিঠিখানা ভুবনবাবুর নজরেই আগে পড়িল; চিঠিতে লেখা ছিল—

'সবিনয় নিবেদন,

কোনও বিশেষ কারণে আপনার আশ্রয় ছাড়িয়া আমাকে চলিয়া যাইতে হইল। ইহাতে আমিই সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম; কিন্তু আমি থাকিলে হয়তো আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন। আমার নমস্কার জানিবেন। ইতি,—'

ভুবনবাবু রাজবালাকে চিঠিটা পড়িয়া শুনাইয়া বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, তার মানে? এ আমি তো কিছুই বুঝলাম না?

রাজবালা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিলেন, আমি সন্দেহ করেছিলুম, কিন্তু এতটা বুঝতে পারি নি!

ভুবনবাবু কহিলেন, কি সন্দেহ, ব্যাপার কি?

কিছু না। দেখ, আজ জ্যোৎস্নার ইস্কুলের গাড়ি এলে তুমি ফিরিয়ে দিও, ওকে আমি আর ইস্কুলে পাঠাব না।

॥ সাত ॥

ট্রেন স্টেশন ছাড়িয়া যাইবার পর অমল নিশ্চিন্ত হইয়া কামরার ভিতর দিকটায় দৃষ্টিপাত করিল। গাড়িতে আর দুটিমাত্র আরোহী তখন; তাহাদের একজন মাড়োয়ারী, সারা বেঞ্চ জুড়িয়া বিছানা পাতিয়া আরামে নিদ্রা যাইতেছেন। যতক্ষণ ঘরে থাকেন, ততক্ষণই ইঁহারা অর্থচিন্তা করেন বলিয়া ঘুমাইবার অবসর পান না। সেটা পুষাইয়া লন ট্রেনে। যেখান হইতেই উঠুন এবং যতটুকুই যান না কেন, গাড়িতে উঠিলেই ঘুমাইতে শুরু করেন। আর একটি বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি ভোরবেলা উঠিয়াই একটি পকেট-গীতা পাঠ করিয়া বোধ করি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া লইলেন। এইবার বেঞ্চির নিচে হইতে তামাকের সরঞ্জাম বাহির হইল। ভদ্রলোকের দীর্ঘ দেহ, রং হয়তো এককালে গৌরবর্ণই ছিল, এখন পুড়িয়া গিয়াছে; ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি, তাহার অধিকাংশই পাকা; পরণে উকিলদের মত চোগা-চাপকান। অমল মনে মনে ভাবিল যে হয়তো ভদ্রলোক উকিলই হইবেন।

কলিকাতে ফুঁ দিতে দিতে সহসা মুখ তুলিয়া অমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি দেখছেন, তামাক খাচ্ছি তাই? বড় বদ অভ্যেস হয়ে গেছে, বিড়ি সিগারেটে আর চলে না।

তারপর স্মিত প্রসন্ন মুখে হুঁকোর মাথায় কলিকাটি বসাইয়া দুই চারিটি টান দিয়া কহিলেন, কত দূর যাবে বাবা তুমি? তুমিই বলি, তুমি আমার নাতির বয়সী।

অমল জবাব দিল, আজ্ঞে টিকিট কেটেছি তো দিল্লীর, তার পর এখন কোথায় গিয়ে পেঁছুই, কে জানে।

ভদ্রলোক মুখ হইতে হুঁকাটা নামাইয়া একবার অমলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন, তারপর কহিলেন, বাড়ি থেকে পালিয়ে আসছ বুঝি বাবা? কিন্তু এ পথ তো ভাল নয়, ওতে শুধু কষ্ট পাওয়াই সার হয়।

অমল লজ্জিতভাবে কহিল, আজ্ঞে এখন পালিয়ে আসছি না, এসেছি অনেক দিন আগে, সেই থেকেই পথে আছি।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া তামাক টানিবার পর পুনশ্চ কহিলেন, দিল্লীতে যাচ্ছ কাজকর্মের চেষ্টায়, না কি?

অমল ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, হাঁ।

সুবিধে হবে?

কি ক'রে বলব বলুন। তবে শুনেছি অনেক বাঙালী আছেন, হয়তো কিছু হ'লেও হ'তে পারে।

কিচ্ছু হবে না। এ কি মাড়োয়ারী পেয়েছ যে মাড়োয়ারী দেখলেই একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবে? তা ছাড়া তোমার বাড়ি পূর্ববঙ্গে হ'লেও বরং কথা ছিল, তবু বাঙালদের আশ্রয় পেতে, ওদের ওই গুণটা আছে।

আরও কিছুক্ষণ তামাক টানিবার পর কহিলেন, আর ওদের দোষই বা কি। সকলেরই আবদার—চাকরি ক'রে দাও, নিদেন ভাল টিউশনি দাও। ব্যবসা কেউ করবে না; যদি বা ধ'রে বেঁধে ব্যবসাতে নামিয়ে দেওয়া হ'ল, তো কিছু দিন থেকে, পাঁচজনকে ডুবিয়ে, বাঙালীর মুখ পুড়িয়ে একদিন ডুব মারবে। তুমি জান না বাবা, কিন্তু আমি জানি, সকাল-সন্ধ্যেয়, অফিসে প্রত্যহ কত বাঙালীর ছেলেকে তাড়াতে হয়। তার ওপর দুপুরবেলায় মেয়েদের কাছেও এক দফা আবেদন-নিবেদন আছে। কারুর পথ-খরচা হারিয়ে গেছে, কোন বিধবা মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না, কেউ বা রুগ্ণ স্বামীর ওষুধ-পথ্যের জন্য বেরিয়ে পড়েছে ভদ্রভাবে ভিক্ষে করতে। তার পরেও আর কি ক'রে সহানুভূতি থাকে লোকের বলো!

অমল রীতিমত দমিয়া গেল। শুষ্কমুখে একবার মনে মনে স্মরণ করিয়া দেখিল তাহার আর কয়টি টাকা মাত্র সম্বল আছে। এই সামান্য অর্থের উপর নির্ভর করিয়া দূরে বিদেশে কত দিন চলিবে কে জানে। তাহার পর?

অনেকক্ষণ ভাবিয়াও যখন কোনও হদিস পাওয়া গেল না, তখন সে জোর করিয়া প্রসঙ্গান্তরে যাইবার চেষ্টা করিল। প্রশ্ন করিল, আপনি কি করেন?

ততক্ষণে তাঁহার তামাক খাওয়া শেষ হইয়াছে। তিনি কলিকার ছাইটা ফেলিয়া দিয়া হুঁকাটি নামাইয়া রাখিলেন, তাহার পর অল্প কিছুক্ষণ স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, জুচ্চুরি।

কথাটা এতই অপ্রত্যাশিত যে তাহার মুখের ভাবটা কিরূপ হওয়া উচিত, অর্থাৎ কথাটা পরিহাস কিংবা তাহার প্রশ্নের ধৃষ্টতার জন্য তিরস্কার, কিংবা

সত্য, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অমল বোকার মত হাসিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত তিনিই বাঁচাইলেন, এতে তোমার অপ্রতিভ হবার কিছুই নেই বাবা, সত্যিই আমার পেশা জুচ্চুরি।

অমল কহিল, তার মানে?

তিনি যেন একটু করুণভাবে হাসিলেন, কহিলেন, ষোল বছর বয়স থেকে ওই পথই ধরেছি, আর ছাড়তে পারি নি। টাকা আসে বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তাও কম নয় বাবা। কিন্তু এখন উপায় কি? যে জাল নিজে বুনেছি, তার মধ্যে নিজেই এমনভাবে জড়িয়ে গেছি যে আর বেরুবার উপায় নেই। আমার বাবা ছিলেন নামকরা উকিল, দাদাও তাই হলেন, কিন্তু আমি গেলুম অন্য পথে। মায়ের অত্যধিক আদরে পড়াশুনো হ'ল না বটে, কিন্তু তাই ব'লে আহাম্মক ছিলুম না, শুরু করলুম লোকজনকে ঠকাতে। মাকে আর ভাইকে দিয়ে আরম্ভ করলুম; তারপর বাইরের লোককে।

কিছুক্ষণ থামিয়া কহিলেন, বছর ত্রিশেক বয়সের সময়—তখন আমি দাদারই মুহুরীগিরি করি, আইনেও একটু একটু দখল হয়েছে—একদিন দাদার এক মফঃস্বলের কেস এল। মোটা টাকা, কিন্তু দাদা বললেন, লিখে দে, আমি যেতে পারব না, অন্য কাজ আছে। আমি দাদাকে কিছু না ব'লে চলে গেলুম দাদারই পোশাকে আর দাদারই নাম লেখা এক পুরনো ব্যাগ নিয়ে। কেস করলুম। শুধু তাই নয় মক্কেলের মামলা জিতলুম! মোটা টাকা নিয়ে ফিরছি এমন সময় যে পক্ষ হেরেছে তারা কোথা থেকে খবর পেয়ে পুলিসে খবর দিলে। ধরা পড়ে একেবারে শ্রীঘর!

উপন্যাসের মত এই বিচিত্র কাহিনী অমল রুদ্ধনিশ্বাসে শুনিতেছিল, সে প্রশ্ন করিল, তার পর?

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, অনেকেই এটা জানে না—বছরে দুজন ক'রে কয়েদীকে ছেড়ে দেওয়া হয় মিশনারী সাহেবদের অনুরোধে। অর্থাৎ নিজের অপরাধের জন্যে সত্যিই অনুতপ্ত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে স্বর্গীয় প্রভুর শরণাপন্ন হ'তে চায়—এমন কোনও লোক দেখে তাঁরা সুপারিশ করলে সরকার খ্রীষ্টধর্মের মর্যাদা রক্ষা করেন। খবরটা আমি জানতুম। কিছুদিন ধ'রে এমন নিটোল অভিনয় শুরু করলুম যে মাস ছয়েক যেতে না যেতে দাগী বিভাস রায় অন্তর্হিত হলেন—জেল থেকে বেরিয়ে এলেন আলেকজাণ্ডার বিভাস রায়। বলা বাহুল্য ঘরে স্ত্রী ছিল, পুত্রকন্যাও দেখা দিয়েছে, কিন্তু তাঁরা আর আমার সঙ্গে বাস করতে রাজী হলেন না। আমারও শাপে বর হ'ল, এক খ্রীষ্টানী বিধবার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ ক'রে বুড়ীর প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার মালিক হয়ে বসলুম। তারপরও যে সৎপথে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার চেষ্টা করি নি তা নয়, কিন্তু হ'ল না। তিন চার রকম ব্যবসা করতে গেলুম কিছুই হ'ল না, শাশুড়ী ঠাকুরুণের যে কটি টাকা ছিল, সে কটিই শুধু গেল। তখন আবার জুচ্চুরি ধরলুম। দেশে একটা ইস্কুল খুলেছি, 'সমস্ত রকম শিল্প ও সাধারণ লেখাপড়া' শেখাবার জন্য।

এখন কাজ শুধু তারই নাম ক'রে সাহেব-সুবোদের কাছ থেকে মোটা চাঁদা আদায় করা।

অমল এতক্ষণ পরে কথা কহিল ; প্রশ্ন করিল ; চাঁদা পাচ্ছেন ?

পাচ্ছি বই কি। দেখ বাপু, নিজের জন্যে ভিক্ষে করতে গেলে মাথা হেঁট ক'রে যেতে হয়, সেখানে মেলেও কচু। কিন্তু পরের জন্যে ভিক্ষে করতে নিজের তো কোনও লজ্জাই নেই, বরং যে দিতে না পারে, সে-ই লজ্জিত হয়। বেশ আছি, আমি রেক্টর আর আমার স্ত্রী লেডি সুপারিনটেন্ডেণ্ট। মোটা মাইনে দুজনের নামে। চীফ জাস্টিস ম্যাকগ্রেগর সাহেব বলতেন, পরোপকারের নামে জুচ্চুরি করাও ভাল ; তবু যারা দেয় তাদের উপকার হয়।

ভদ্রলোক আবার তামাক ধরাইলেন। তার পর পাঁচটা এ-কথা সে-কথা কহিবার পর কহিলেন, তুমি লেখাপড়া কতদূর শিখেছো বাবা ?

অমল একটু লজ্জিতভাবে কহিল, ম্যাট্রিক পাস করেছিলুম, তারপর আর অর্থাভাবে পড়া হয় নি। তবে দিনকতক দুপুরবেলা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়ে ইংরেজী সাহিত্য আর ইতিহাস একটু আধটু নাড়াচাড়া করেছিলুম।

ভদ্রলোক সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, ইংরেজী চিঠি পড়তে বা জবাব লিখতে পারবে ? অবিশ্যি আমি বলে দেব—

অমল কহিল, কেন পারব না! প্রেসিরাইটিং আর ড্রাফটিং, দুটোই আমি শিখেছিলুম যে।

ব্যস্। তুমি এক কাজ কর। দিল্লীতে আমি মাসখানেক থাকব। হোটেলে একটা বড় ঘর নিয়েই থাকব। ইচ্ছেই ছিল ওখানে গিয়ে চাকর আর সেক্রেটারি রাখব এক মাসের জন্যে—মিছিমিছি দেশ থেকে নিয়ে এলে খরচা বাড়ত—তা তুমিই ঐ সেক্রেটারির কাজটা নাও না! কাজ আমার সামান্য, ওটা শুধু লোক দেখানো রাখা, অথচ এক মাস তোমার খাবার আর থাকবার ভাবনা থাকবে না, সেই এক মাসে তুমি কাজকর্ম খুঁজে নিতে পারবে। দেখ, রাজী আছ ?

রাজী! অমল কহিল, তা হ'লে তো আমি বেঁচে যাই।

বিভাসবাবু খুশী হইয়া কহিলেন, তা হলে ওই কথাই থাক। একটা চাকর শুধু খুঁজে নেওয়ার মামলা, তা চাকর ঢের পাব, কি বল ?

একটু থামিয়া কহিলেন, এখানে এই অবস্থা দেখছ, তামাক নিজেই সেজে খাচ্ছি আর যাচ্ছি থার্ড ক্লাসে, দিল্লীতে পেঁছে কিন্তু চিনতে পারবে না। এই যে দেখছ আমার ট্রাঙ্ক, ওতে যা পোশাক আছে তা আধাদামে বেচলেও তোমার এক বছরের খরচ চলে যাবে। ওটা চাই, বুঝলে ? ভেক না হলে ভিক্ষে মিলে না। সোনার বোতাম আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরে যারা চার পয়সা চাঁদা নিতে আসে, তাদের ফিরতে হয় না কারও কাছ থেকেই।

বেলা যত বাড়িতে লাগিল, ততই ভুবনবাবুদের কথা মনে পড়িয়া অমলের মন খারাপ হইতে লাগিল। শুধু নিরাপদ আশ্রয় নয়, একটু স্নেহও সেখানে পাইয়াছিল বৈকি। এমনভাবে অকৃতজ্ঞের মত তাঁহাদের ছাড়িয়া আসা বোধ হয়

উচিত হইল না। এই কথাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। শুধু কি তাহাই? আবার এই যে সে অকূলে ভাসিল, এ ভাসার শেষ যে কবে হইবে, কোথায় হইবে তারই বা ঠিক কি। স্রোতের মুখে কুটার মত ভাসিয়া বেড়ানো জীবন আর ভাল লাগে না।

বিভাসবাবু মোগলসরাই-এ খাবার কিনিলেন, শুধু তাঁহার মত নয়, অমলের মতও। আশ্চর্য তাঁহার দৃষ্টি, খাইতে খাইতে কহিলেন, মন খারাপ লাগছে, না? বাড়ির জন্যে, না এখন যেখান থেকে আসছ তাঁদের জন্যে?

লজ্জিতভাবে হাসিয়া অমল কহিল, দুই-ই বোধ হয়।

বিভাসবাবু কহিলেন, উঁহু, ওটা ভাল নয়। এ পৃথিবীর মুসাফিরিতে পিছনের দিকে ফিরে কখনও চাইবে না, বুঝলে? তা হ'লেই দুঃখ পেতে হবে। মহাভারত পড়েছ তো—যুধিষ্ঠিরের মহাযাত্রা মনে আছে? তিনি পিছনে ফিরে চান নি ব'লেই নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে স্বর্গে গিয়ে পেঁছিলেন, বাকী সকলের পতন হ'ল। এই দেখছ তোমার জন্য খাবার কিনলুম, তোমাকে আশ্রয় দেব বললুম, কিন্তু এই মুহূর্তে রেলে কলিশন হয়ে যদি তোমার মৃত্যু হয় আর আমি বেঁচে থাকি, তা হ'লে তোমার জন্য একটুও দুঃখিত হব না, নিজের জন্যেই অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দেব।

অমল কথাটা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া বিভাসবাবু হাসিলেন মাত্র। তাঁহার প্রশান্ত মুখে লজ্জা বা দুঃখের কোন স্থান নাই, কহিলেন, দুঃখ পাবে বাবা তুমি। ঘর ছেড়ে যখন বেরিয়েছ তখন পথকেই তোমার আপন বলে চিনে নিতে হবে। পথে তো আত্মীয় নেই।

॥ আট ॥

দিল্লীতে পেঁছিয়া বিভাসবাবু হাঁক-ডাক করিয়া কুলি ডাকিলেন। কুলির সঙ্গে হোটেলের প্রতিনিধিরা চারিদিক হইতে আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল। তিনি কিন্তু কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া একটা হোটেলকে বাছিয়া লইলেন এবং দৈনিক চার টাকা ভাড়ায় একটা ঘর লইবেন জানাইলেন। ট্যাক্সিতে চাপিয়া হোটেলে যাইতে যাইতে পক্ষপাতের কারণটা খুলিয়া বলিলেন, প্রথম যখন দিল্লীতে আসি তখন এই ব্যাটারা ভয়ানক ঠকিয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছিল। আমিও তার পরের বছর এসে এদের প্রায় দেড়শ টাকার বিল্ করে দিয়ে স'রে পড়েছিলুম। সেইজন্যই এবার যাচ্ছি, আহা—বেচারাদের কিছু পাওয়া উচিত, নয় কি?

অমল বিস্মিত হইয়া কহিল, কিন্তু এখন যদি সেবারের টাকা চেয়ে বসে?

কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বিভাসবাবু কহিলেন, তারপর বছর সাতেক কেটেছে, সে এতদিনে তামাদি হয়ে গেছে।

দিল্লীর সর্বপ্রধান বাজার চাঁদনী চকের উপরেই হোটেল। রাস্তার দিকে বাথরুম সমেত প্রকাণ্ড একটা ঘর বিভাসবাবুকে দেওয়া হইল। তাহারই মধ্যে দুটি খাট, একটিতে বিভাসবাবু থাকিবেন ও একটি অমলের। আলো-পাখা সমেত দৈনিক চার টাকা ভাড়া—আহারাদি স্বতন্ত্র।

বিভাসবাবু স্নানের পর যখন পোশাকের বাক্স খুলিলেন তখন অমল রীতিমত বিস্মিত হইল। বহুমূল্য শালের চোগা-চাপকান, দামী সাহেব-বাড়ির স্যুট হইতে আরম্ভ করিয়া গরদের ধুতি-পাঞ্জাবি সবই তাহাতে ছিল। ইহাদের মূল্য সম্বন্ধে তাহার স্পষ্ট কোনও ধারণা নাই সত্য কথা, কিন্তু তাহা যে কম নয় এ কথাটা সেদিকে একবার মাত্র চাহিলেই বোঝা যায়।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া তিনি একটা সাহেবি পোশাকই পরিলেন। তারপর কতকগুলি ছাপানো আবেদনপত্র বাহির করিয়া ছোট্ট একটি চামড়ার হাণ্ডব্যাগের মধ্যে ভরিয়া লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আবেদনপত্র বিশেষ কিছুই নয়, বিভাসবাবুর স্কুল যেখানে, সেখানে একটি গির্জা প্রস্তুত করা বিশেষ প্রয়োজন এবং সেই মহৎ উদ্দেশ্যে সামান্য কিছু সাহায্য প্রার্থনা করা হইতেছে মাত্র।

ঘণ্টা হিসাবে একটা গাড়ি ঠিক করিয়া বিভাসবাবু বাহির হইয়া পড়িলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, তুমি এখন ঘণ্টা দু-তিন বিশ্রাম কর, নয়তো ঘুরে ফিরে শহরটা দেখে এস ; আমি সেই বেলা একটা নাগাদ ফিরব।

অমল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নিচে পর্যন্ত নামিয়া আসিল। এবং সবিস্ময়ে দেখিল যে তিনি গাড়িতে বসিয়া পকেট হইতে পূর্বদিনকার গীতাটি বাহির করিয়া নিবিষ্টচিত্তে পড়িতে পড়িতে চলিলেন—গির্জা-নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে!

প্রকৃতপক্ষে অমলের বিশেষ কোন কাজই ছিল না। কোনদিন হয়ত কোথাও চিঠি লিখিয়া পাঠাইবার দরকার হইলে কিংবা একই সময়ে দুই জায়গায় 'ইন্টারভিউ' থাকিলে বিভাসবাবু অমলকে ডাকিতেন ; নচেৎ সে সমস্ত সময়টা নিজের ভাগ্যান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু একমাস সময় দ্রুত শেষ হইয়া আসিল, অমলের কোনও উপায়ই হইল না।

ম্যাট্রিক-পাস বাঙালী যুবককে সরকারী অফিসে চাকুরি দেওয়া সাধ্যাতীত, এই কথাই সকলে সবিনয়ে জানাইলেন। অনেকেই পরামর্শ দিলেন, ব্যবসা কর। কিন্তু তাহার মূলধন কোথা হইতে আসিবে এ সন্ধান কেহই দিতে পারিলেন না। কেহ কেহ বলিলেন যে, তাঁহারা অল্প-স্বল্প মূলধন দিয়াও বহুলোককে সাহায্য করিয়াছেন কিন্তু প্রত্যেকেই তাহাদের ঠকাইয়াছে, সুতরাং—ইত্যাদি। নিউ দিল্লীর জনহীন, মরুভূমিতুল্য রাজপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অমল প্রথম বুঝিল, কেন তাহার বাবা সামান্য পঁচিশ টাকা বেতনেই সারা জীবন কাটাইয়া দিলেন, তবু বড় কিছু করিবার চেষ্টা করিলেন না।

শেষ পর্যন্ত সে ট্যুইশনের চেষ্টা দেখিল, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কিছু সুবিধা হইল না। প্রায় প্রত্যেক কেরানীর গৃহেই দুই-একজন বেকার যুবক আছে, যাহারা লাইফ ইন্সিওরেন্স ও ছেলে পড়ানোর দ্বারা সিনেমার খরচা চালাইতে চায়। হয়তো গান জানা থাকিলে (তা হউক· না কেন তৃতীয় শ্রেণীর রেকর্ডের বেসুরা পুনরাবৃত্তি) কিছু সুবিধা হইত, কিন্তু সে কথা ভাবিয়া ফল কি!

অমল মন স্থির করিবার পূর্বেই কিন্তু বিভাসবাবুর ফিরিবার সময় হইল। তিনি কোনও দিনই কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া ফলটা

অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন।। যাত্রার আগের দিন রাত্রে তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, হোটেল-ওয়ালাদের বলে দিয়েছি যে আমার সেক্রেটারী আরও দু-চার দিন এখানে থাকবেন, দৈনিক এক টাকার একটা ঘর দেখে দেবে তাঁকে। এক সপ্তাহের ভাড়া ব'লে সাতটা টাকাও দিয়েছি, বলেছি বাকীটা কিছুদিন পরে মনি-অর্ডার ক'রে পাঠাব। সুতরাং মাসখানেক তুমি আরও সময় পাবে; তার আগে তোমাকে এরা উত্ত্যক্ত করবে না। আমার ঠিকানা দিও না, তবে যদি তার মধ্যে কিছু সুবিধা না হয়, একদিন স'রে প'ড়। মালপত্র তো নেই বিশেষ, কোনও অসুবিধা হবে না!...না, না, ওসব উচিত-অনুচিতের কথা তোমার সঙ্গে আলোচনা করে লাভ নেই, যা বললুম মনে রেখো। আর এই সাহেবটা অনেকদিন ধরে ঘোরাচ্ছে, যদি ডোনেশন কিছু সত্যিই দেয় তো ওটা আদায় ক'রে নিতে পার, ওটা তোমারই রইল। একটা নাম ঠিকানা লেখা কাগজও হাতে দিলেন।

তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া কহিলেন, যদি কোনদিকে কিছু না হয়, আর আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় তো আমার কাছে যেতে পার, মাস্টারী একটা দিতে পারব। থাকবার বাসা পাবে আর খাবার মত যৎসামান্য কিছু পাবে। মাইনে আমি দিই না—লিখিয়ে নিই বটে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা। যাক—

অমল কথা কহিল না, সে এই এক মাসেও মানুষটিকে চিনিয়া উঠিতে পারে নাই। লোকটির কথাবার্তায় এবং কোন কোন কার্যে ঘোরতর পাষণ্ড বলিয়াই বোধ হয়—অথচ তাহাকে যে তিনি দয়াই করিয়াছেন তাহাতে তো সন্দেহ নাই! শুধু তাহাকেই নয়, রাস্তার ভিখারীদেরও কখনো বিমুখ করেন নাই, সে নিজেই তাহার সাক্ষী আছে। এই এক মাসে লোকটা কি অজস্র মিথ্যা কথাই না বলিয়াছে, কত রকম মিথ্যা বলিয়া, কতরকম মুখোশ পরিয়া অজস্র অর্থ লুটিয়াছে, তাহার বোধ করি হিসাব-নিকাশ নাই; কোন রকম ন্যায়-অন্যায়ের বোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তবু অমলের মনে হইল, এখনও ইহার মধ্যে কিছু একটা আছে, যাহা বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে—

যাক গে সে-সব কথা—

বহুদিনের হতাশায় অমলের মন যেন কেমন পাথর হইয়া গিয়াছে, কোন কথাই সে তলাইয়া ভাবিতে পারে না, অধিকাংশ সময় সে ভাবেই না কোন কিছু, মন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অলস স্বপ্নের জাল বুনিয়া যায়। বাল্যকালের কথা এলোমেলোভাবে মনে পড়ে, জীবনে যে সব আশা ছিল, সেই সব স্বপ্নের কথা মনে হয়—এইমাত্র।

দিল্লীতে আর কিছু সুরাহা হইবার সম্ভাবনা নাই তাহা সে বুঝিয়াছে, কিন্তু তবু কী-ই বা করিবে? অভ্যাসের বশে প্রত্যহ-সকাল-সন্ধ্যায় বাহির হয়, কোনও কোনও দিন কাহাকেও খুঁজিয়া বাহির করে, চাকুরি কিংবা ট্যুইশনের আবেদন জানায়, কোনও দিন বা এমনি লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। কোনও আশা নাই, আশঙ্কাও যেন সে ছাড়িয়া দিয়াছে,—

হোটেলের বিল বাড়িতে লাগিল। থাকা এবং খাওয়া—সে বিভাসবাবুর

পরামর্শ অনুসারে খাওয়াটাও হোটেলেই চালাইত—দুই টাকার কম হয় না। এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ পড়িতে হোটেলওয়ালারা কিছু চঞ্চল হইয়া পড়িল ; তখনও অমল ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই কি করিবে, সেই মানসিক নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেই সহসা এক কাণ্ড করিয়া বসিল। ভুবনবাবুর দরুন যে টাকাগুলি কাছে ছিল তাহার বিশেষ কিছু খরচা হয় নাই, তাহারই মধ্য হইতে পনেরটি টাকা হোটেলের অফিসে জমা দিয়া জানাইল যে সে দেশে জরুরী চিঠি দিয়াছে টাকার জন্য, দুই একদিনের মধ্যেই আসিয়া যাইবে। আরও কিছুদিন সময় পাওয়াই ছিল তাহার উদ্দেশ্য, কিন্তু টাকাটা জমা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিল। এখানে থাকার কোনও ব্যবস্থা হইল না, অথচ আর কোথাও যাইবার পথও একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি করিয়া সে ভয়ে কাঠ হইয়া উঠিল।

সর্বনাশের সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া তাহার মনের জড়তা অনেকখানি কাটিয়া গেল। তারপর সাতটা দিন সে দিল্লীর প্রতিটি গলি চষিয়া ফেলিল। যা হোক কিছু কাজ চাই, যত সামান্যই হউক। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়া সপ্তম দিনের দিন যখন দুইটি গোটা পাঁচ-ছয় টাকা হিসাবের ছেলে-পড়ানোর কাজ সংগ্রহ করিতে পারিল তখন হোটেলওয়ালারা রীতিমত রূঢ় হইয়া উঠিয়াছে। কাজ একটি টিমারপুর ও একটি নিউ দিল্লীতে—অর্থাৎ সকালে বিকালে হাঁটিয়া যাইতেই শুধু ঘণ্টা তিন চার সময় বাজে নষ্ট হইবে। কিন্তু তাহাতেও ক্ষতি ছিল না, যদি এক মাস আর কোথাও কাটাইবার উপায় থাকিত। হোটেলওয়ালারা থাকিতে দিবে না, অথচ আর কোথাও বাসা করিয়া থাকিয়া এক মাস কাটাইবার মত পয়সা কোথায় হাতে ? এক মাসের পর মাহিনা আদায় হইবে হয়তো আরও দুই চারি-দিন পরে, তাহা ছাড়া হোটেলের টাকা মারিয়া দিল্লীতেই যদি সে বাসা লইয়া থাকে, একদিন না একদিন হোটেলওয়ালাদের চোখে পড়িবেই, তাহার পরের অবস্থাটা কল্পনা করিয়া সে ঘামিয়া উঠিল। ভুবনবাবুর বাড়ি ছাড়িয়া আসা তাহার পক্ষে কতদূর মূর্খতার কাজ হইয়াছে, তাহা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া ধিক্কারে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

সেদিন সে অনেক রাত্রে হোটেলে ফিরিল। ইচ্ছা ছিল যে সকলের অলক্ষ্যে কোনমতে ঘরে ঢুকিয়া শুইয়া থাকিবে, আহারাদির নামও করিবে না ; কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিবে কিনা স্থির করিবার পূর্বেই ম্যানেজারও দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দেখা দিলেন, বোধ করি তাহার অপেক্ষায় এই বাহিরেই কোথাও দাঁড়াইয়া ছিলেন। অগত্যা অমলকে আলো জ্বালিতে হইল। তিনি ঘরে ঢুকিয়াই প্রশ্ন করিলেন, কেঁও বাবুজী, তারকা জবাব মিলা ?

অমল তাহার আগের দিনই বলিয়াছিল যে সে মনিবের কাছে টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছে, সুতরাং ঢোক গিলিয়া জবাব দিল, নেহি, ফিন্ কাল একঠো ভেজেঙ্গে—

ম্যানেজারের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল ; কহিলেন, হামকো পাত্তা লিখ্ দিজিয়ে,

হাম খুদ্ ভেজ দেঙ্গে কাল—

অমলের মুখ শুকাইয়া উঠিল। সে কহিল, আচ্ছা, কাল লিখ্ দেঙ্গে।

কিন্তু ম্যানেজার নাছোড়বন্দা। তিনি কহিলেন, আজ লিখ্ দেনেমে কেয়া হরজা হ্যায়? লিজিয়ে পেন্সিল, কাগজ ভি হ্যায় হামারা পাশ।

বিভাসবাবুর অনুরোধ অমলের মনে পড়িল। যে লোকটা দুদিনের জন্যও তাহার উপকার করিয়াছে, তাহার অপকার করা কিছুতেই উচিত হইবে না। বরং তাহাতে যদি নিজেকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয় তো সে-ও ভাল। সে কাগজটা লইয়া মরীয়া ভাবে যে ঠিকানাটা পেন্সিলের ডগায় বাহির হইল তাহাই লিখিয়া দিল, তাহার পর ম্যানেজার বিদায় লইলে আলো নিভাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

কিন্তু ঘুমের কল্পনা সেদিন একেবারেই দুরাশা। ভয়ে বিভ্রান্ত হইয়া এইমাত্র সে যে মিথ্যা ঠিকানাটি লিখিয়া দিল, তাহার জবাবদিহি করিবার সময় আসিবে কাল সন্ধ্যার পূর্বেই, যখন হোটেলওয়ালাদের টেলিগ্রামখানি ফিরিয়া আসিবে। তাহার পরে যে লাঞ্ছনা তাহাকে সহিতে হইবে, সে কথা সে ভাবিতেও পারিল না। হয়তো বা পুলিসেই দিবে। এতদিন যে তাহারা সহ্য করিয়াছে এবং নিজেদের খরচে তার পাঠাইতে চাহিতেছে, সে শুধু বিভাসবাবু সম্প্রতি অনেকগুলি টাকা দিয়া গিয়াছেন, সেই কথাটা মনে করিয়াই। কিন্তু তাহার পর? অতি দ্রুত জেল ও হাতকড়ার একটা অস্পষ্ট ছবি তাহার চোখের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কপালে ঘাম দেখা দিল। সে স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে না পারিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

কাল মধ্যাহ্নের পূর্বেই তাহাকে পলাইতে হইবে, যেমন করিয়াই হউক। কিন্তু কোন উপায়ের কথাই তাহার মনে পড়িল না। পকেটে কয়েক আনা মাত্র পয়সা অবশিষ্ট আছে, তাহাতে কোথাও যাওয়া তো দূরের কথা, দুইদিনের বেশি খোরাকিই চলে না। যতদিন সে বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে এমন অবস্থায় তাহাকে কোনদিন পড়িতে হয় নাই।

ঘণ্টাখানেক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর সে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন পথ—কোনও রাস্তা খোলা নাই, শেষ পর্যন্ত হয়তো আত্মহত্যাই করিতে হইবে—

কতকটা স্বপ্নাবিষ্টের মত সে দুই এক পা অগ্রসর হইল। তাহার পাশের ঘরের দুইখানি ঘর পরেই বড় একটা চার-টাকাওয়ালা ঘর, সেই ঘরে কোথাকার এক ছোকরা রাজা আসিয়াছেন আজ দুইদিন, এ সংবাদ সে পূর্বেই পাইয়াছিল। অকস্মাৎ সেই ঘরের সামনে আসিয়া সে দাঁড়াইয়া গেল। ঘরের বারান্দার দিকের এবং ভিতরের দিকের দুটি দরজাই খোলা। নেয়ারের খাটে রাজা বাহাদুর ঘুমাইতেছেন, আর দ্বিতীয় কোন প্রাণী নাই। ঘরে সামান্য যে রাস্তার আলোর আভাস আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার অস্পষ্টতার মধ্যেও পরিষ্কার নজরে পড়িল রাজা বাহাদুরের কোটটা দুয়ারের পাশেই আলনাতে টাঙ্গানো এবং তাহার বুক-পকেটে মনিব্যাগের মত কী একটা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আছে। সহসা অমলের বুকের মধ্যে ধ্বক্

ধবক্ করিয়া উঠিল ; তাহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। যে চিন্তা তখনও তাহার মাথায় আসে নাই, শুধু মনের মধ্যে আকার ধারণ করিতেছে মাত্র, তাহারই ইঙ্গিতে সে মূর্ছাতুর হইয়া উঠিল। একথা যে কোনও দিন তাহার মনে আসিতে পারে, তাহা সে মুহূর্ত-কয়েক পূর্বেও বিশ্বাস করিতে পারিত না এবং হয়তো দুঃস্বপ্নের মত কয়েক মুহূর্ত পরেও অবিশ্বাস্য হইয়া থাকিবে, কিন্তু এই ক্ষণটিতে অকস্মাৎ সেই অতি হীন প্রবৃত্তিই মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল। সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত বিবেক ছাড়াইয়া একটা চিন্তা মনের মধ্যে সর্বপ্রধান হইয়া উঠিল যে, আত্মহত্যা ছাড়া আর এই একটিমাত্র পথই এখনও খোলা আছে।

মানুষের নিজের জীবনরক্ষার যে দুর্নিবার ইচ্ছা মানুষের সহজাত, সেই ইচ্ছারই জয় হইল এবং কি করিয়া কোন্ যুক্তিতে তাহার আজীবনের শিক্ষা ও জীবনের বহু পূর্বেকার সঞ্চিত পূর্বপুরুষদের সংস্কারকে ঐ অতি অল্পক্ষণ সময়ের মধ্যে জয় করিয়া সত্যসত্যই রাজবাহাদুরের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল নিঃশব্দ, তস্করগতিতে—তাহা আজও তাহার কাছে অবোধ্য হইয়া আছে ; তবে সত্যসত্যই সে সেই জামাটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

ঘরের আবহাওয়ায় প্রচুর মদের গন্ধ, মদ্যপ গৃহস্বামীর গভীর নিদ্রার কথা জানাইয়া দিল। তবু অমলের বুকে হাতুড়ির ঘা পড়িতেছিল, হাত কাঁপিতে-ছিল থর থর করিয়া। সে কোনমতে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া খুলিয়া ফেলিতেই ভিতরে একতাড়া নূতন নোট খস্ খস্ করিয়া উঠিল। সে আন্দাজে খান তিন-চার নোট বাহির করিয়া কোনমতে নিজের জামার পকেটে পুরিল এবং ব্যাগটি আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল।

সেখান হইতে নিজের ঘরে পেঁাছিতে মনে হইল যেন এক যুগ সময় লাগিল। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নোট কখানা হাতের মধ্যে মুঠা করিয়াই সে বিছানায় অর্ধ-মূর্ছিতভাবে শুইয়া পড়িল।

।। নয় ।।

যখন তাহার মনের এবং দেহের আবার সক্রিয় অবস্থা ফিরিয়া আসিল তখন ভোর হওয়ার আর বিলম্ব নাই। আর সম্বিৎ ফিরিবার পর প্রথমেই যে চিন্তা তাহার মনে দেখা দিল, তাহা হইতেছে অপরিসীম ধিক্কার ও আত্মগ্লানি। দেহের প্রতি রক্তকণা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, ছিঃ, তুমি চোর!

সে ভদ্রসন্তান, দরিদ্র হইলেও উচ্চবংশে তাহার জন্ম, আজীবন সে শুনিয়া আসিয়াছে যে চুরি করার মত হীন কাজ ভদ্রসন্তানের পক্ষে আর নাই। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা ভাল, মোট বওয়া ভাল, কিন্তু চুরি করা কিছুতেই, কোনমতেই শ্রেয় নহে। কিন্তু আজ সে সেই সমস্ত শিক্ষা, পূর্বপুরুষদের সমস্ত কৃচ্ছ্রসাধনের গৌরবকে হেলায় তুচ্ছ করিল। তবু তাহার আগে মরিতে পারিল না।

একবার ভাবিল ফিরাইয়া দিই, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিল, নিঃশব্দে চুরি করা বরং সম্ভব, কিন্তু এখন গিয়া পুনরায় সকলের অজ্ঞাতসারে ফিরাইয়া দেওয়া

আরও কঠিন। বহুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে সে বিছানার উপরেই বসিয়া রহিল; তারপর মুখ-হাত ধুইবার অছিলায় সে একবার রাজা বাহাদুরের ঘরের সম্মুখ দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া গেল।

রাজা বাহাদুর তখনও ঘুমাইতেছেন। খুব সম্ভব আরও দুই-তিন ঘণ্টা ঘুমাইবেন। এখনও সরিয়া পড়িতে পারিলে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিবার আগেই পূর্ব-গামী ট্রেন হয়তো একটা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার চুরি ধরা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অদৃশ্য হওয়াটা কি দুই আর দুইয়ে যোগ করার মতই সকলের চোখে সহজে ধরা পড়িবে না?

মানুষ যখন একবার একটা পাপ কাজ করিয়া ফেলে, তখন তাহার আনুষঙ্গিক চিন্তা বা কাজগুলিকেও সহজে মানিয়া লয়। অমলেরও তাহাই হইল। ইতি-মধ্যেই সে তাহার মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিল যে, দশ টাকার নোটের নম্বর থাকে না, সুতরাং সে যদি হোটেলে বলিয়া থাকে তাহা হইলে চুরি ধরা পড়িলেও তাহাকে ধরিবে কি করিয়া? এবং এমন কথাও তাহার মনে আসিতে বাধিল না যে, ঐ মদ্যপের হাতে টাকাটা থাকিলে তো বাজে খরচ হইতই, বরং তাহার হাতে টাকাটা পড়িলে একটা মানুষের জীবন-রক্ষার কাজে লাগিবে বলিয়াই ভগবান তাহাকে দিয়া এই কাজ করাইয়াছেন।

কিন্তু তবুও সে ঘরে আসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না, কম্পিতবক্ষে রাজা বাহাদুরের ঘুম ভাঙ্গিবার অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার সেই সময়কার পাংশু, বিবর্ণ মুখ ও অস্থির ভাব দেখিলে যে কোনও পুলিসের লোক বুঝিতে পারিত যে, সে কোনও একটা অত্যন্ত গর্হিত কার্য করিয়া প্রতি মুহূর্তেই তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলের আশা করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে রাজা বাহাদুরের ঘুম ভাঙ্গিল। তাঁহার হাঁকডাক, চাকর-বাকরের ছুটাছুটি এবং হোটেলওয়ালাদের সন্ত্রস্ত ভাবেই সেই মহা ঘটনাটি বিজ্ঞাপিত হইল। সেই সময়কার প্রতি মুহূর্ত অমলের কাছে এক একটি যুগ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এক এক সময় এমনও বোধ হইতে লাগিল যে, আশঙ্কায় তাহার হৃদপিণ্ডের ক্রিয়াই বন্ধ হইয়া যাইবে। চুরি করা যে এত কঠিন কাজ, তাহা সে জীবনে কোনদিন কল্পনা করিতে পারে নাই।

যাহা হউক—রাজা বাহাদুর দাড়ি কামাইয়া, স্নান সারিয়া, গাড়ি ডাকাইয়া বাহির হইয়া গেলেন। পকেটের অনেকগুলি নোটের সবগুলি আছে কিনা সে হিসাব করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবও ছিল না, তিনি সে চেষ্টাও করিলেন না। কেবল অমলের পরমায়ুর অনেকখানি শুধু দুশ্চিন্তায় ক্ষয় হইয়া গেল।

কিন্তু সে একটু সুস্থ হইয়াই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। স্নান সারিয়া শেষবার হোটেলের অন্ন গ্রহণ করিল। বিভাসবাবুর মত-ই যে সর্বাপেক্ষা সার, ইহা সে এই ক'দিনে নিজের মনের মধ্যে অনুভব করিয়া লইয়াছিল, সেই জন্য হোটেলের চাকর-বাকরদের স্পষ্ট অবজ্ঞা হজম করিয়াও অনায়াসে সে সেদিনও সেখানের খাবারই আনাইয়া লইল। নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন সে আর একটি পয়সাও খরচ

করিবে না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল।

দ্বিপ্রহরে হোটেলে যখন সকলে কাজে ব্যস্ত তখন নিজের পরিধেয় কাপড়-জামাগুলি একটা খবরের কাগজে জড়াইয়া, যথারীতি ঘরে তালা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। রাস্তায় বাহির হইয়া ট্রামে চড়িয়া বসিতে কিছুটা নিশ্চিন্ত হইল বটে—কিন্তু তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও বাহির হইয়া আসিল। জীবনে যে সব আশা তাহার ছিল, আজ তাহার কোনটারই পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই, বরং এই বিপুল শহর, এই রাজধানীতে আসিয়া কলঙ্কের গভীরতম পঙ্কে সে নামিয়া গেল। জীবনে যদি কখনও সে প্রচুর অর্থও উপার্জন করে, তাহা হইলেও এ কলঙ্ক কখনই মুছিবে না।

স্টেশনে পেঁাছিয়া দেখিল যে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কলিকাতাগামী একটা ট্রেন ছাড়িবে। সে কম্পিতবক্ষে একখানা টিকিট কিনিয়া কোনমতে একটা থার্ড ক্লাস কামরায় ঢুকিয়া পড়িল। ভয় তাহার হোটেলওয়ালাদের ; যদি কোনও গাইড্ তাহাকে কলিকাতাগামী গাড়িতে চড়িয়া বসিতে দেখে, তাহা হইলে কি অবস্থা হইবে তাহা কল্পনা করিয়াই অমলের ললাটে ঘাম দেখা দিল। লাঞ্ছনার তো অবধি থাকিবে না, উপরন্তু হয়তো হাজতে যাইতে হইবে।

কিন্তু কোনমতে সে এক ঘণ্টা সময়ও কাটিয়া গেল এবং এক সময়ে, সত্যই ট্রেনখানা দিল্লীর প্লাটফর্ম পার হইয়া চলিতে শুরু করিল। একটা লোক একটা বড় শহরে প্রাণপণ চেষ্টায় ঘুরিলেও অন্নসংস্থান করিতে পারে না, একথা কিছুদিন আগে পর্যন্ত বোধ হয় সে বিশ্বাস করিতে পারিত না, কিন্তু আজ আর সে বিষয়ে সংশয় নাই, আজ সেই ক্রমবিলীয়মান শহরের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ দুই চোখ জ্বালা করিয়া জলে ভরিয়া আসিল, আজ মনে হইল, মা-বাপ, ভাইবোনের মধ্যে থাকিয়া পঁচিশ টাকা আয়ও অনেক সুখের হইত।

কলিকাতায় ট্রেন পেঁাছিল পরদিন সন্ধ্যায়। হাওড়ার বিপুল জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া আশ্রয়ের চিন্তাটা তাহাকে বিপন্ন করিলেও সে যেন অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইল। মনে হইল যে এ তবু স্বদেশ, এখানে হয়তো উপবাস করিয়া মরিতে হইবে না। সে অন্যমনস্কভাবে বাহির হইয়া বাস-এর আড্ডার নিকট পর্যন্ত আসিয়া দ্বিধায় পড়িল, তারপর অভ্যাসবশত হ্যারিসন রোডের বাস-এই উঠিয়া পড়িল। কলেজ স্কোয়ারের পাড়া ছাড়া আর কোথাও আশ্রয়ের কথা সে মাথায় আনিতে পারিল না। কিন্তু ক্লাইভ স্ট্রীটের মোড়ে পেঁাছিতেই যে লোকটি এই বাসে উঠিল, তাহাকে দেখিয়া আশঙ্কায় অমলের মুখ শুকাইয়া উঠিল। লোকটি আর কেহ নয়, আগের মেসের কার্তিকবাবু। তিনি উঠিয়াই অমলকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, আরে ভায়া যে! কোথায় থাক আজকাল? কি করছ?

কার্তিকবাবু তাঁহার পাশে আসিয়া বসিলেন। অমল অপ্রতিভ হইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, কাজকর্মের চেষ্টায় একটু পশ্চিমের দিকে গিয়েছিলাম, সুবিধে হল না, তাই চলে আসছি—

কার্তিকবাবু অনুকম্পার সুরে কহিলেন, কি আর বলব ভাই, ছেলেমানুষ তোমরা, মিথ্যে হাঁকড়-পাঁকড় কর। কলকাতা ছাড়া পয়সা রোজগারের জায়গা আর কোথাও নেই, যতই দিল্লী লাহোর যাও না কেন।...তা মালপত্র তো নেই, সে সব কি রেখে আসতে হ'ল নাকি?

শেষের কথাগুলি নিম্নস্বরে বলিলেও অমলের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সেদিকে চাহিয়াই কার্তিকবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, আরে কী আশ্চর্য, এতে লজ্জা পাবার কি আছে? এ কাজ আমার জীবনেই কি কম করেছি? বলি জুয়া তো আর আজ থেকে খেলছি না! ওতে লজ্জা পেও না ভায়া—ওতে লজ্জা পেও না।

ততক্ষণে গাড়ি কলেজ স্কোয়ারের মোড়ে আসিয়াছে; উভয়েই বাস হইতে নামিয়া পেভমেণ্টে দাঁড়াইলেন।

কার্তিকবাবু কহিলেন, তারপর কোথা যাবে এখন?

অমল নতমুখে কহিল, তাই তো ভাবছি, কোথায় যাই—

কার্তিকবাবু কহিলেন, ইস্ তাই তো, সঙ্গে তো দেখছি বিছানাপত্রও নেই। তা এক কাজ কর, আজকের মত আমার এক ফ্রেণ্ডের কাছ থেকে একটা শতরঞ্জি আর বালিশ চেয়ে দিই, কোন ধর্মশালা কি হোটেলে গিয়ে থাকো। কাল সকালে বাসা-টাসা খুঁজে নিও—। এই এখানেই, নবীন কুণ্ডু লেনে—

তাঁহার সহিত যাইতে যাইতে অমল প্রশ্ন করিল, ইন্দু আছে আপনাদের মেসে?

কার্তিকবাবু জবাব দিলেন, আছে বৈকি? পাস করেছে, কিন্তু স্কলারশিপটা পেলে না, চাকরি খুঁজছে—

অমল কহিল, কাল আমার সঙ্গে সকালে দেখা করতে বলবেন? আমি যেখানেই থাকি আজ রাত্রে, কাল সকালে হেঁদোতে যাব—সকাল সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে।

কার্তিকবাবু কহিলেন, বিলক্ষণ, তা বলব না কেন? এক ফাঁকে চুপি চুপি ভোরবেলাই জানিয়ে দেব এখন।

অমল আর কথা কহিল না, ভাবিতে লাগিল ইন্দুর কথা, বেচারী স্কলারশিপটা পাইল না তাহা হইলে! ইন্দুর উচ্চশিক্ষার আশা এইখানেই শেষ, পড়াশুনা আর চলিবে না! বেচারা!

নবীন কুণ্ডু লেনের এক জরাজীর্ণ বাড়ির দ্বারে আসিয়া কার্তিকবাবু কড়া নাড়িলেন। বহুক্ষণ কড়া নাড়িবার পরে গৃহস্বামী একটি ভাঙা হ্যারিকেন-হাতে দেখা দিলেন; বয়স কার্তিকবাবুর মতই, যদিচ চুল কিছু বেশী পাকিয়াছে। ছেঁড়া কাপড় পাট করিয়া পরিয়াছেন, তবু লজ্জা নিবারণ হওয়া কঠিন। কিন্তু কার্তিকবাবুকে দেখিয়াই স-কলরবে অভ্যর্থনা করিলেন, আরে কার্তিক যে, এস, এস, ইটি কে ভাই?

কার্তিকবাবু কহিলেন, এর জন্যেই এসেছি রে, একটা শতরঞ্চি, আর একটা বালিশ দিতে পারিস? এই ভদ্রলোক আজই দিল্লী থেকে আসছেন, বিছানা বাক্স সব পথে চুরি গেছে; আজ রাত্রে শুতে হবে তো!...কী, পারবি দিতে?

বোধ হয় মুহূর্তকালের জন্য ভদ্রলোকের মুখ মলিন হইয়া উঠিল ;— খুব সম্ভব বালিশের অবস্থাটা চিন্তা করিয়াই। পরক্ষণেই কিন্তু আবার মুখে হাসি ফুটিল। কহিলেন, বিলক্ষণ, তা আর পারব না ! আসুন ভাই, ভেতরে আসুন— আয় কার্তিক !

যেটি বাহিরের ঘর, সেটিরও অবস্থা শোচনীয় ; একটি জীর্ণ তক্তপোশের উপর মসিমলিন শতরঞ্চি, তাহার উপর অজস্র কালি-মাখা বইখাতা ছড়ানো ; ছেলেরা ইহারই উপর বসিয়া পড়াশুনো করে বোঝা গেল ; গৃহস্বামী লজ্জিতমুখে কহিলেন, বসতে বলব কি, ঘরের যা ছিরি !···আ ম'ল, আবার ঘুঁটেগুলোও দেখছি ঝি-মাগী ঘরের মধ্যে তুলে রেখেছে।

শুধু ঘুঁটে নয়, এক বস্তা ছোবড়াও তোলা আছে। আর আছে এক পুঁটলি তুলা ; ইঁদুরে কাটার ফলে ঘরময় ছড়াইয়া আছে। বইখাতাগুলা সরাইয়া একপাশে জড়ো করিয়া রাখিয়া বলিলেন, বসুন ভাই, ভেতর থেকে আসছি একটু, বোস্ কার্তিক,···চা খাবি ?

কার্তিকবাবু সম্মতি জানাইয়া বিড়ি ধরাইলেন। কহিলেন, এহ'ল গঙ্গাধর, আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, এমন ভাল মন মানুষের মধ্যে দুর্লভ ! কিন্তু অবস্থা খারাপ. এই পৈতৃক বাড়ি তাও বাঁধা পড়েছে। মাইনে তো পায় মোটে বায়াত্তর টাকা !···পথে বসতেই হবে একদিন,···তবু এমনি করে যে কটা দিন যায় !

অমল বিস্মিত হইয়া কার্তিকবাবুর দিকে চাহিল, এই লোকটিকে এতদিন সে শুধু পাকা জুয়াড়ী বলিয়াই জানিত. কিন্তু ইহার মধ্যেও যে হৃদয় আছে, তাহা সে বোধ হয় কল্পনা করে নাই। মিথ্যাকথা সত্যকথার মতই অনায়াসে বলিয়া যায়, মানুষের চরম সর্বনাশের বার্তাও সহজকণ্ঠে প্রকাশ করে, নিজের স্ত্রী-পুত্র সম্বন্ধে লোকটি সম্পূর্ণ নির্বিকার, কিন্তু তবুও কোথায় একটু হৃদয় এখনও আত্মগোপন করিয়া আছে। নহিলে তাহাকে পথ হইতে ধরিয়া আনিবে কেন ?

গঙ্গাধরবাবু ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, ওরে, মলিনার মা বলছিল যে ভদ্র-লোকটি আজ থাকবেন কোথায় ? তোর বাসায় নিয়ে যাবি ?

কার্তিকবাবু কহিলেন, না, সেখানে একটু অসুবিধা আছে।···আজ রাত্রে কোনও ধর্মশালায়, নয়তো হোটেলে থাক্, কাল বাসা খুঁজে নেবে এখন—

গঙ্গাধরবাবু কহিলেন, তাতে দরকার কি, উনি আজকের রাতটা এখানেই থাকুন না, অবিশ্যি অসুবিধে হবেই একটু, কিন্তু ধর্মশালার চেয়ে তো ভাল হবে—

কার্তিকবাবু অমলের মুখের দিকে চাহিলেন, অমল ইতস্তত করিয়া কহিল, একটা রাত বৈ তো নয়, খামকা ভদ্রলোকের বাড়িতে উৎপাত করে লাভ কি ?

গঙ্গাধরবাবু প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না না, উৎপাত কিছু না, একটা রাত গরীবের ঘরে কোনরকমে থাকুন, কাল ধীরে-সুস্থে বাসা খুঁজে নেবেন এখন।

অমল তবুও ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া কার্তিকবাবু কহিলেন, না না, কিছু ভয় নেই। সে রকম লোক হ'লে এখানে টেনে আনতুম না !···তুমি এখানেই থাক, কাল সকালে ইন্দুকে বরং এখানেই আসতে বলব। আচ্ছা আসি তাহলে গঙ্গাধর—

ইতিমধ্যে বছর-দশেকের একটি শ্যামবর্ণ মেয়ে চায়ের বাটি হাতে প্রবেশ করিল। কার্তিকবাবু কহিলেন, ওহো, চায়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

চা খাইতে খাইতে কার্তিকবাবু চুপি চুপি কহিলেন, কোথায় বাসা পাও আমাকে জানিও ভায়া, আসছে শনিবার একটা নির্ঘাত খবর পাওয়া গেছে; বেশী নয়, দুটি টাকা দিও, বরাত ঘুরিয়ে দেব!

চা খাইয়া কার্তিকবাবু প্রস্থান করিলেন।

গঙ্গাধর কহিলেন, ভায়া কি চান করবে? তাহলে সেটা এই বেলা সেরে নাও। যা অন্ধকার বাড়ি, কলতলাও ভাঙ্গা, আমি আলো ধরে নিয়ে যাই, সাবধানে চলে এসো, আস্তে আস্তে—

॥ দশ ॥

স্নান আহার সারিয়া অমল আবার বাহিরের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল ইতিমধ্যেই শতরঞ্জির উপর একটা ধোয়া শাড়ী বিছানো হইয়াছে এবং ময়লা বালিশের উপর একটি ফরসা তোয়ালে বিছাইয়া ভদ্রলোকের মত করা হইয়াছে। ইঁহাদের যত্নে বহুদিন পরে অমলের মা-বাবার কথা মনে পড়িয়া গেল। গঙ্গাধর-বাবুর স্ত্রী তাহার মায়ের মতই বসিয়া জোর করিয়া খাওয়াইলেন এবং মাথার দিব্য দিয়া বলিলেন যে, কাল যেখানেই বাসা ঠিক করুক না কেন, দ্বিপ্রহরের আহার সারিয়া তবে যেন যায়, আজ কিছুই খাওয়া হইল না।

ছেলেমেয়েগুলিও ভাল। যেমন শান্ত, তেমনি ভদ্র। দেখিলেই স্নেহের উদ্রেক হয়। গঙ্গাধরবাবু একটা তাকের উপর এক গ্লাস জল একটা খাতা চাপা দিয়া রাখিয়া আলো নিভাইয়া চলিয়া গেলে অন্ধকারে শুইয়া শুইয়া অমল ইঁহাদের কথাই ভাবিতে লাগিল। কার্তিকবাবুর কথাগুলি বড়ই মর্মান্তিক। এই অমায়িক পরিবারটিকে হয়ত সত্যই একদিন পথে বসিতে হইবে; ইঁহাদের দয়া-স্নেহ-মমতার জন্য পৃথিবীর নিকট হইতে একবিন্দু করুণাও পাইবার সম্ভাবনা নাই—। সমস্ত বিশ্বের সহিত মানুষের দেনা-পাওনার সম্পর্ক, পাওনার চেয়ে দেনা বেশী হইলেই আর তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না।

পরদিন সকালে উঠিয়া মুখ ধুইতে ধুইতেই ইন্দু আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রায় তেমনই আছে, শুধু মুখে দুশ্চিন্তার কয়েকটি গভীর রেখা পড়িয়াছে মাত্র।

সে নীরবে আসিয়া অমলের পাশে বসিয়া পড়িল। কি হইল, কেন অমল এমন শুধু হাতে ফিরিল, কোন কথাই জানিতে চাহিল না। নিজের দুর্ভাগ্য দিয়া পরের দুঃখের গভীরতা সে মাপিতে শিখিয়াছে, নীরব সহানুভূতিতে এই কথাটিই শুধু বুঝাইয়া দিল।

একটু পরে অমলই কথা কহিল, বলিল, স্কলারশিপটা রাখতে পারলেন না?

ইন্দু একটা ছোট রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া জবাব দিল, না, বড্ড অভাব অমলদা, ক্ষিধেতে পেট জ্বলত, মাথা ঘুরত—পড়াশুনো আর মাথায় ঢুকত না। কিন্তু তবুও এতটা যে খারাপ হবে, তা ভাবি নি। শেষদিনটা পরীক্ষা

দিতে গিয়ে কী যে মন খারাপ হয়ে গেল, মনে হল সব বৃথা, জীবনে এ-সবের কোন দাম নেই।—আর কিছু লিখতে পারলুম না।

অমল প্রশ্ন করিল, এখন কি করবেন ভাবছেন?

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দু কহিল, আমাকে আর পড়াবার ক্ষমতা মামার নেই; এখন চাকরি খোঁজা ছাড়া আর উপায় কি? কিন্তু তাই বা পাচ্ছি কৈ? এই দু-তিন মাস কলকাতার মেসে থেকে চাকরি খুঁজছি, মামাকে তো কিছু পাঠাতে হচ্ছে, সেই কটি টাকা পাঠাতেই তাঁর যে কি কষ্ট হচ্ছে তাও বুঝছি। কিন্তু উপায় কি বলুন! একটি দশ টাকার ট্যুইশনি, এই তো ভরসা।

অমল চুপ করিয়া রহিল, কী-ই বা জবাব দিবে!

অমল কহিল, একটা বাসা-টাসা খুঁজে নিতে হবে। তারপর যাব আমার সেই পুরনো ছাত্রের বাড়িতেই—কিন্তু সে কি আর এখনও আমার জন্যে বসে আছে?

ইন্দু কহিল, আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না? আমরা যদি একটা খুব সস্তার ঘর দেখে নিয়ে দুজনে একসঙ্গে থাকি? আর নিজেরা রেঁধে খাই? তাহলে বোধ হয় আমাদের এই আয়েতেই চলে যায়।

অমলের মুখ নিমেষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, সে তো বেশ হয়। আমি তাহলে বেঁচে যাই ইন্দুবাবু, একলা এত অসহায় মনে হয় নিজেকে—। দুজন হ'লে তবু একসঙ্গে ফাইট করা যায় দুর্ভাগ্যের সঙ্গে—

ইন্দু একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তাহলে চলুন এখনই বেরিয়ে পড়ি। আজই একটা বাসা ঠিক ক'রে ফেলা যাক—

এই সময়ে গঙ্গাধরবাবুর কন্যা দুইটি রেকাবীতে কিছু মুড়ি, বাতাসা আর দুই কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিল। অমলের বন্ধু আসিয়াছে, এ কথাটি গঙ্গাধর-বাবুর স্ত্রীর দৃষ্টি এড়ায় নাই।

ইন্দু বিস্মিত দৃষ্টিতে অমলের মুখের দিকে চাহিল, অমল কহিল, অনেকদিন —মানে সেই বাড়ি থেকে বেরোবার পর আবার মা খুঁজে পেয়েছি ইন্দুবাবু। কিন্তু আমারই মা—দুর্ভাগ্যের দিক দিয়ে অন্তত।

তাহার পর মুড়ি খাইতে খাইতে অমল গতকল্যকার ইতিহাস ইন্দুকে সব খুলিয়া বলিল। ইন্দু কহিল, কার্তিকবাবু লোকটিকে আমারও খুব খারাপ বলে মনে হয় না। আজ ভদ্রলোক রাত থাকতে গিয়ে ডেকে তুলে আপনার খবরটি দিলেন। কিন্তু সব কথা সেরে বেরোবার সময় ঐ এক কথা—আসছে শনিবার একটা সিওর টীপ আছে ভাই, দুটি টাকা উইনে ফেলে দিও, দশটি টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরবে। আশ্চর্য, না?

অমল উন্মনা হইয়া কহিল, আশ্চর্য কিছুই না ইন্দুবাবু—সমস্ত রকমের দোষ আর গুণ মিলিয়েই প্রত্যেকটি মানুষ তৈরী, এর মধ্যেই সব আছে!…

জলযোগের পর দুই বন্ধু বাহির হইয়া পড়িল বাসা খুঁজিবার জন্য। কিন্তু শহরের প্রায় তাবৎ সরকারী প্রস্রাবখানা ও গ্যাসপোস্ট দেখিয়াও তাহাদের মনের মত বাসা পাওয়া গেল না। ঘরের ভাড়া তাহাদের আয়ের তুলনায় অনেক

বেশী। সজ্জার মেসের সজ্জার সীটও পছন্দ হয় না। শেষ পর্যন্ত বেলা দ্বিপ্রহরের পর তাহারা ছুতারপাড়ার নিকট একখানা মাটির ঘর ভাড়া করিয়া ফেলিল। সিমেণ্টের মেঝে, মাটির দেওয়াল এবং খোলার চাল। কিন্তু ঘরটির রাস্তার দিকে একটা দরজা এবং জলকলের সুবিধা আছে ; ভাড়া চার টাকা। শুধু তাহাই নয়, পূর্ববর্তী কোন এক ভাড়াটিয়া দুইটি আমকাঠের চৌকি ফেলিয়া গিয়াছে, সে দুটিরও দখল পাওয়া গেল।

অমল নিজের পকেট হইতে চার টাকা অগ্রিম দিয়া ঘর সেইদিন হইতেই ভাড়া করিল এবং আহারাদির পর সামান্য শয্যা কিনিয়া আনিয়া রাত্রিবেলাই নূতন ঘরে চলিয়া আসিল। গঙ্গাধরবাবু ও তাঁহার স্ত্রী বার বার বলিয়া দিলেন, যখনই অসুবিধা হবে, এখানে চলে এস বাবা, লজ্জা ক'রো না।

গঙ্গাধরবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যা বিপুল দেনা, রাত্রে দেনার চিন্তায় ঘুম হয় না ; মরমে মরে রয়েছি। নইলে তোমার মত ছেলেকে দুটো দিন থাকতে বলতে কি ইচ্ছে করে না ? কি করব—ভগবান মেরে রেখেছেন !…

ইন্দুও পরের দিন মেসের দেনা-পাওনা চুকাইয়া দিয়া চলিয়া আসিল। অতঃপর দুজনে কোনমতে অপটু হস্তে রান্না করিয়া খাইতে লাগিল এবং আশা করিতে লাগিল যে, এ-দিন হয়তো শীঘ্রই কাটিবে।

দীর্ঘ দিন এবং দীর্ঘ রাত্রি।

অতি মন্থরগতিতে তাহাদের দুঃসহ দিন-রাত্রি কাটিতে লাগিল। কিছুই হয় না। কোনদিনই দৈবাৎ তাহাদের কোন সুসংবাদ আসে না। অতি কষ্টে উপার্জিত এবং আত্মাকে বঞ্চিত করা পয়সা হইতে শুধু মধ্যে মধ্যে স্ট্যাম্পের পয়সা বাজে খরচ হয় মাত্র। কেরানীর কাজ; ট্যুইশন, ভদ্রভাবে অর্থ উপার্জনের যত পথ আছে, সবগুলিতে মাথা তো ঠুকিলই, এমন কি থিয়েটার ও বায়স্কোপের গার্ডের চাকরির জন্যও দরখাস্ত করিতে ত্রুটি করিল না ; কিন্তু পরে বুঝিল সেখানেও সুপারিশের প্রয়োজন হয়। অমলের পুরাতন ট্যুইশনটি পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই শুধু গ্রাসাচ্ছাদন সম্ভব হইতেছিল।

অবশেষে ইন্দুর মুখে স্পষ্ট হতাশা ফুটিয়া উঠিল। সে আর পারে না। মাঝে মাঝে অমলকে বলে, অমলদা, ভাল খাবারের অভাবে যে এত কষ্ট হয়, তা আগে কখনও ভাবতে পারি নি ! ভাবতুম যে, ওটা ছেলেবেলাকারই ব্যাপার, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের লোভটা অন্য লোভে দাঁড়ায়। কিন্তু এখন দেখছি ভাল খাবারের জন্যে পরিণত বয়সের লোকের মনও ঠিক শিশুর মত চঞ্চল হয়ে ওঠে। এক এক সময়ে আমি খাবারের দোকানের সামনে দিয়ে চলতেই পারি না।

অমল চুপ করিয়াই শোনে। তাহার লোভ ও কামনার উৎস-মুখ কে যেন নিরেট পাথর দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তবু তাহারও মনে হয় তাহার আত্মা যেন বহুদিন উপবাসী, ক্ষুধার্ত হইয়া আছে।

একদিন, কি একটা লগনসা সেদিন, অমল সহসা সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া

কহিল, এই ইন্দুবাবু, ফরসা কাপড় আছে ?

ইন্দু বিস্মিত হইয়া কহিল, আছে, কেন ?

অমল কহিল, কাপড়-জামা পরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন, চলুন কোথাও নেমন্তন্ন খেয়ে আসা যাক—

ইন্দু আরও বিস্মিত হইয়া কহিল, তার মানে ?

অমল কহিল, আজ অনেক বিয়ে, কোনখানে একটু ভিড় বেশী দেখে ঢুকে পড়া যাক, কে আর চিনবে ?

নিমন্ত্রণ অর্থে সুখাদ্য ; লোভে ও ভয়ে বিবর্ণ হইয়া ইন্দু প্রশ্ন করিল, যদি ধরে ফেলে ?

অমলও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, কহিল, কে ধরবে ? পাগল ! বরযাত্রীরা মনে করবে কন্যাপক্ষের লোক, আর কন্যাপক্ষরা মনে করবে বরপক্ষের—চলুন চলুন!

সত্য-সত্যই দুজনে বাহির হইয়া পড়িল। খানিকটা ঘুরিয়া একটা বড় বাড়ির সম্মুখে ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। উৎসবের সমারোহ দেখিয়া মনে হইল বড়লোকের বাড়ি, অভ্যর্থনার বিশেষ ঝঞ্ঝাট থাকিবে না, কিন্তু খানিকটা যাইতেই একটি মোটা গোছের ভদ্রলোক সহাস্যবদনে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, আসুন, আসুন···এই যে এদিকে—

ইন্দুর মুখের অবস্থা কল্পনা করিয়া অমল তাহার হাত ধরিয়া একরকম টানিয়া লইয়া একটু ভিড়ের মধ্যে গিয়া বসিল। তার পরের ঘটনা নিতান্তই সাধারণ এবং স্বাভাবিক। গোলাপ জল, গোলাপের 'বোকে' ; প্রীতি-উপহার ও সর্বশেষে ভোজ। আহার্যের সুগন্ধে ইন্দুর মুখে হাসি ফুটিল, সে একাগ্রমনে খাইয়া যাইতে লাগিল।

আহারাদির পর রাস্তায় বাহির হইয়া পথ চলিতে চলিতে ইন্দু কহিল, এরা খাইয়েছে বেশ, না ?

অমল অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, হুঁ।

তাহার পর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমি শুধু ভাবছি অভাবে মানুষ কতখানি নিচেই না নেমে যেতে পারে। এই রকম চুরি ক'রে খাওয়ার কথা কি আর তিন বছর আগেও ভাবতে পারতেন ?

ইন্দুর মনে তখনও বিবিধ সুখাদ্যের একটা মিলিত মধুর রেশ ছিল। অমলের কথায় অকস্মাৎ কে যেন চাবুকের বাড়ি মারিল তাহাকে। সে কিছুক্ষণ বিবর্ণমুখো রাস্তার দিকে চাহিয়া চলিবার পরে ঈষৎ ক্ষুন্ন-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু ওদের তো এমনই অনেক ফেলা যেত ! আমরা দুজন আর কতই বা খেয়েছি ?

অমল কহিল, তা বটে। কিন্তু তাতে আমাদের অপরাধ কমে না। যাক গে, ওসব ভেবে আর এখন লাভ নেই।

ইন্দু আর কথা কহিল না। তাহার পেটের মধ্যে লুচি আর মিষ্টান্ন তাল পাকাইয়া পাথরের মত ভারী হইয়া উঠিতেছিল।

॥ এগারো ॥

আরও মাস-কতক পরে সহসা একদিন ইন্দু কহিল, অমলদা, আমি বিয়ে করছি !

অমল আশ্চর্য হইয়া কহিল, তার মানে ?

ইন্দু চৌকিটার উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, আর এ-রকম করে পারি না, একটু বৈচিত্র্য দরকার। যা অদৃষ্ট আছে হোক—

অমল একটু অসহিষ্ণুভাবেই কহিল, তার মানে কি ? কী ব্যাপার ?

ইন্দু কহিল, আমার এ টিউশনিটিও তো যাবে-যাবে হয়েছে, আমি ভদ্রলোককে খুব কাকুতিমিনতি ক'রে বলেছিলুম আর একটা টিউশনির জন্যে। অবশ্য নিজের অবস্থাও খুলে বলেছিলুম। তিনি আজ আমাকে ডেকে বললেন যে, তাঁর এক বন্ধু আছেন, কোথাকার পাটকলের বড়বাবু, তাঁর একটি মেয়ে আছে ; মেয়েটি শ্যামবর্ণ—

অমল কহিল, তারপর ?

ঈষৎ লজ্জিত নতমুখে ইন্দু কহিল, সে ভদ্রলোকের মেয়েটিকে যদি আমি বিয়ে করি তো তিনি আমায় টাকা-চল্লিশেকের মত একটা চাকরি ক'রে দেবেন। তা ছাড়াও বিয়ের খরচ বলে মামার হাতে হাজার-খানেক টাকা দিতে রাজী আছেন, গয়না দান-সামগ্রী আলাদা—

অমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু চল্লিশ টাকা মাইনেতে কি হবে, এ দারিদ্র্য কি আর ঘুচবে ? তা ছাড়া বিয়ে করলেই ছেলেপুলে হবে, তখন ? শেষকালে ঐ গঙ্গাধরবাবুর মতই তো হবে।

ইন্দু সারা পথ একটা সুখস্বপ্নের জাল বুনিতে বুনিতে আসিয়াছিল, সহসা বাস্তবের আঘাতে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে কহিল, আপনি বড্ড সব জিনিসের ডার্ক সাইড দেখেন।—সে মেয়েটি তার বাপের একমাত্র মেয়ে, তার স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ চেয়েও ভদ্রলোক নিশ্চয় প্রাণপণে চেষ্টা করবেন আমার উন্নতির জন্যে।

অমল উঠিয়া বসিয়া কহিল, তা বটে, ভালও হতে পারে ; তবে ঘরপোড়া গরু আমি, কোনওটাতেই যেন ভাল কিছু দেখতে পাই না।

ইন্দু উৎসাহিত হইয়া কহিল, চাই কি, আমি যদি আপিসে ঢুকি তো সুবিধে মত আপনাকেও ঢুকিয়ে নিতে পারি। কি বলেন ?

অমল মনে মনে বিশেষ উৎসাহ না পাইলেও মুখে বলিল, তা বটেই তো।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দু খামকা বলিয়া ফেলিল, আমি তাদের কথা দিয়ে এসেছি।

অমল দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, কথা দিয়ে এসেছেন একেবারে ?

মুখ নিচু করিয়া ইন্দু জবাব দিল, হ্যাঁ, ভেবে দেখলুম ইতস্তত ক'রে বিশেষ লাভ নেই। যা হয় হোক—। কাল মামাকে চিঠি দেব।

আরও কিছুক্ষণ পরে ইন্দু কহিল, মামার যে কি দারিদ্র্য তা আপনি জানেন না অমলদা, কিন্তু আমি জানি। বেচারি আমার খরচ যোগাতে গিয়ে ভিটেটি

সুদ্ধ দেড়শ' টাকার বাঁধা দিয়েছেন, তার ওপরে চালে আজ তিন বছর খড়ের কুটোটি ওঠে নি। হাজার টাকায় তাঁকে নিঋণী ক'রে ঘরদোরগুলো যদি ভাল ক'রে একবার ছাইয়ে দিতে পারি তো তাই আমার লাভ! ইহজীবনে তো আর কোন কাজে এলুম না!

অমল যেন নিজের মন হইতেই দুশ্চিন্তা ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য গলায় জোর দিয়া কহিল, না মিছে ভাববেন না। সত্যিই তো, এর চেয়ে আর কি খারাপ অবস্থা আমাদের হতে পারে?

দিন-পাঁচেক পরেই ইন্দুর মামা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার দুই চোখে জল, মুখে হাসি। ইন্দুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, কী শান্তি যে আমাকে দিলি বাবা, তা আর কি বলব। তুই বিয়ে-থা করে ঘরবাসী হলি, এইটুকু যে আমি দেখে যেতে পারলুম, এই ঢের।

তার পর একটু দম লইয়া কহিলেন, রাঙা টুকটুকে বউ আনব, ইন্দু আমার ঘরসংসার করবে, এই দেখে বুড়ো-বুড়ী চোখ বুজব! তা মানুষের সব সাধ পোরে না। বড়লোকের মেয়ে আমার মাটির ঘরে ঘর করবে না, কিন্তু তবু তুই তো সুখী হবি!—না-ই করলে সে আমার ঘর!

ভাঙা ছাতিটায় চোখের জল মুছিয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু বিয়ের নিয়ম-কর্মগুলো আমার ওখান থেকেই হবে তো? তা নইলে তোর মামী বড় দুঃখু পাবে।

ইন্দু ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল, বোধ করি তাহার চোখও শুষ্ক ছিল না। সে কহিল, কেন মিছে ভাবছেন মামা। তা নইলে আমি রাজী হবো কেন?

মামা শুধু নীরবে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন, কথা কহিলেন না। অমল একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমার অবস্থাটা এবার কাহিল হ'ল আর কি।

ইন্দু যেন নিমেষে ম্লান হইয়া উঠিল, কহিল, সত্যি দাদা, আপনি একলা এই ঘরে—তাই তো!—আচ্ছা, আমি কয়েক মাস আমার শেয়ারটা যদি চালিয়ে যাই, আপনি রাগ করবেন?

অমল জবাব দিল, সবই তো জানেন ইন্দুবাবু, অতখানি শৌখিন ভদ্রতার অবস্থা কৈ?···

ক্রমশ ইন্দুর বিবাহের দিন অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহার এক অতি দূর-সম্পর্কের ভগ্নীর বাড়ি হইতে পাকা দেখার কাজটা সারা হইল, মামা তাহার পর দেশে গিয়া দুই-একজন আত্মীয়স্বজনকে কথাটা জানাইয়া আসিলেন এবং ইন্দু তাহার দুই-একজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিল মাত্র, কিন্তু মামা এমন কাণ্ড বাধাইয়া তুলিলেন যে, বিবাহের পর খরচার অঙ্কটা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে ভাবিয়া ইন্দু ও অমল শঙ্কিত হইয়া উঠিল। পাকা দেখার দিন পাত্রীপক্ষ পাঁচশ টাকা দিয়া-ছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি আড়াইশ টাকায় গায়ে-হলুদেরই বাজার করিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দু তাঁহাকে কতকটা জোর করিয়াই বাকি টাকাটা দিয়া দেশে

পাঠাইয়া দিল এবং মাথার দিব্য দিয়া দিল যেন তিনি দেনাটা শোধ না করিয়া কোনমতেই টাকাটা অন্য বাবদে খরচ না করেন।

ইন্দু অমলকে ধরিয়া বসিল তাহার বিবাহে অমলকে তাহাদের দেশে যাইতে হইবে। অমলেরও বিশেষ আপত্তি ছিল না, সে সহজেই রাজী হইল। ছাত্রদের নিকট হইতে সাত দিনের ছুটি লইয়া সে প্রস্তুত হইল এবং বিবাহের পরদিন একেবারে বরকন্যার সঙ্গে দেশের ট্রেনে চাপিয়া বসিল।

দেশে আসিয়া ইন্দু মামীমার নিকটে দেনার খবর লইল। শোনা গেল, মামা সুদ ও আসলের পঞ্চাশটি টাকা মাত্র শোধ করিয়াছেন, সামান্য কিছু ঘরদোর মেরামতি কার্যে ব্যয় হইয়াছে—বাকী সমস্ত টাকাটাই তিনি ভোজের আয়োজনে জেলে, গোয়ালা প্রভৃতিকে বায়না দিয়া দিয়াছেন।

ইন্দু মামাকে ধরিয়া তিরস্কার করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি তখন দিশাহারা। ইন্দুর শ্বশুররা জিনিসপত্র ভালই দিয়াছিলেন, কন্যার গায়ে গহনাও খুব কম দেন নাই। মামা গ্রামসুদ্ধ লোককে ডাকিয়া সেই সব জিনিস দেখাইতে লাগিলেন এবং পাগলের মত প্রত্যেককে বলিতে লাগিলেন, ইন্দু আমার রাজকন্যা বিয়ে করবে একথা বলি নি তোমাদের? সাক্ষাৎ রাজার মেয়ে বিয়ে ক'রে এনেছে, আশীর্বাদ কর যেন বেঁচে-বর্তে থেকে ভোগ করতে পারে—

ইন্দুর অনুরোধে অমলও তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, এসব কি করছেন মামা? এখন কি এসব শোভা পায়? দিন-কতক যাক না—

মামা হাত-পা নাড়িয়া তাহাকে জবাব দিলেন, তুমি বোঝ না বাবা অমল, ইন্দুর শ্বশুর আমার সাক্ষাৎ দেবতা, তাঁরা যেমন প্রাণ পুরে দিয়েছেন, তার মর্যাদা রাখতে হবে তো? আর তা ছাড়া ইন্দুর একটা চাকরি হলে কিসের অভাব বাবা আমাদের? এমন দিনে আমোদ না করলে কবে করব?

অমল কহিল, কিন্তু চাকরি হোক আগে, আগে থাকতেই তার টাকার হিসেব ধরা কি উচিত?

বৃদ্ধ সোৎসাহে কহিলেন, চাকরি ক'রে দেবে না? নিশ্চয় দেবে! কি বলছ অমল, এ নিজের মেয়ে-জামাইয়ের সুখদুঃখের কথা যে! এ না দিয়ে যাবে কোথায়? সে সব তুমি কিছু ভেবো না।

তিনি পুনশ্চ উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া দ্রুত অন্য কাজে চলিয়া গেলেন। ইন্দু হতাশ হইয়া কহিল, কি হবে দাদা, মামা হয়তো গ্রামসুদ্ধ লোকই নিমন্ত্রণ করে আসবেন।

অমল কহিল, খুব সম্ভব।

তাহাদের আশঙ্কা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল সন্ধ্যাবেলায়। স্বগ্রামের লোক তো সকলেই আসিলই, নিমন্ত্রণের উদারতা দেখিয়া ভিন্ন গ্রামের লোকও বিনা-দ্বিধায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আয়োজন যাহা হইয়াছিল তাহা নিঃশেষে উড়িয়া গেল, তারপর সম্মান রক্ষার জন্য ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ির অন্ত রহিল না।

[illegible] খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে ক্লান্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ইন্দু যখন [illegible]
রজনীর অপেক্ষায় ফুলশয্যার দিকে অগ্রসর হইল তখন সূর্যদেব পূর্বাকাশে দেখা দিয়াছেন এবং এদিকে বরপক্ষের সমস্ত টাকা নিঃশেষে উড়িয়া গিয়া টাকা ত্রিশ-চল্লিশ বাজারে ধার পড়িয়াছে।

ইন্দু ফুলশয্যার নিয়মকর্ম শেষ করিয়া বিছানায় না শুইয়াই বাহিরে চলিয়া আসিল এবং শুষ্কমুখে অমলকে ডাকিয়া লইয়া বাহি॰র বাগানে একটা আমগাছ-তলায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

কি হবে অমলদা ?

অমল তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, কি করবেন বলুন ! মামা আপনার জন্য অনেক কষ্টই করেছেন, একটা দিন না হয় জীবনে তাঁকে আনন্দ করতে দিলেনই ! আর সেও তো আপনারই জন্য !

ইন্দু ভয়ে ভয়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, আচ্ছা, চাকরি ওরা ক'রে দেবে বোধ হয়, কি বলেন ?

অমল কহিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবে বৈকি ! নিজের জামাই যদি কষ্ট পায় তাহ'লে মেয়েরও তো কষ্ট হবে !

ইন্দু ট্যাঁকের মধ্য হইতে গোটা-বাইশ টাকা বাহির করিয়া কহিল, এই কটা কাল যৌতুকের বাবদ পাওয়া গিয়েছিল, এ কটা টাকা আর মামার হাতে পড়তে দিই নি। দশটা টাকা আপনার কাছে রাখুন, মাস পাঁচেকের জন্য অন্তত ঘরটা রাখতে পারবেন। কিছু নিজের কাছে না রাখলেও নয়; শ্বশুরবাড়ি যাওয়া-আসা আছে, কলকাতায় যাওয়ার খরচা আছে, মামার হাতে বোধ হয় একটি পয়সাও নেই আর।

দুজনেই খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ইন্দু কহিল, কাজটা ঝোঁকের মাথায় ক'রে ফেলে যা ভাবনা হচ্ছে ! এখনই যদি চাকরি না পাওয়া যায় তাহলে যে কি করব ভেবে পাচ্ছি না।

অমল কহিল, বিয়ের ঐ দিকটাই শুধু দেখছেন ইন্দুবাবু, তাতে আপনার স্ত্রী-বেচারীর ওপর কি একটু অবিচার করা হচ্ছে না ?

লজ্জিত হইয়া ইন্দু কহিল, তা বটে। কিন্তু উপায় কি বলুন !···আচ্ছা, বৌ কেমন দেখলেন অমলদা ?

অমল একটু ভাবিয়া কহিল, মন্দ কি ! রংটা ময়লা বটে কিন্তু বেশ শ্রী আছে।

সত্যই ইন্দুর বৌ মন্দ হয় নাই। কালো রং কিন্তু অল্প বয়স ও মুখশ্রী ভাল বলিয়া ভালই দেখায়। তাহার চোখে যে চমৎকার একটি বুদ্ধির আভা আছে তাহাও নজরে পড়ে।

ইন্দুর মুখ নিমেষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল, তাহলে এ পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে তাতে আমি ঠকি নি। এখন শেষ রক্ষা হলে হয়।

অমল প্রসঙ্গান্তরে যাইবার জন্য প্রশ্ন করিল, মামা কোথায় গেলেন ?

ইন্দু জবাব দিল, কাল ফুলশয্যার তত্ত্বে যে মিষ্টি এসেছে, তাই পাড়ায়

বিলোতে গেছেন। সেটা অকথ্য নামে ।ওরা মামীমাকে জো গয়নের শাড়ী-অলংকারী দিয়েছেই, উপরন্তু ওঁকেও একখানা তসরের ধুতি দিয়েছে ; আসল কাজ হ'ল সেই দুটোই পাড়ায় দেখাতে যাওয়া—

বাগানের অসংখ্য গাছের পাতায় পাতায় সোনালী রোদ ঝিকমিক করিতেছে, পাখীদের প্রভাতী গানে সুনিবিড় শান্তির আভাস। সেদিকে এবং আলো-ঝলমল সুদূর আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিলে মনে হয়, এ পৃথিবীতে কোথাও বুঝি কোন অভাব, কোন অশান্তি নাই। এই তরুণ যুবক দুটিও বহুক্ষণ নিঃশব্দে বহিঃ-প্রকৃতির সেই অপূর্ব রূপভাণ্ডারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ইন্দু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যাই, আবার ওদিকের একটু গোছগাছ করা দরকার। বাড়ির যা অবস্থা হয়ে আছে, যেন চাওয়া যাচ্ছে না · তা ছাড়া হিসেবটাও একটু দেখা দরকার—কোথায় ঠিক দাঁড়ালুম এসে, না জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

সে চলিয়া গেল। অমল আর উঠিল না, একটু পরেই ক্লান্তিতে তাহার চোখের পাতা দুইটি বুজিয়া আসিল।

॥ বারো ॥

মামা সন্ধ্যাবেলা অমলকে ডাকিয়া কহিলেন, মোটে সাতচল্লিশটি টাকা বাকী পড়েছে। এটা কি একটা দেনা হ'ল ? এত বড় একটা বৃহৎ কাজে এই ক'টি টাকা ধার পড়বে না ?·· ইন্দু তো ভয়ে মুখ শুকিয়ে অস্থির ; আবার বলে বৌমার একখানা ছোটখাটো গয়না বেচে ধারটা শোধ ক'রে দিতে। ছি' ছিঃ, এই কি একটা কথা ?···তুই বেঁচে থাক, চাকরি-বাকরি হোক্—টাকাটা শোধ দিতে কতক্ষণ ? কি বল বাবা ?

অমলকে অগত্যা বলিতে হইল, তা বটেই তো !

ইন্দুর ঋণ-শোধের স্বপ্নকে অদৃষ্ট কি নিষ্ঠুরভাবে পরিহাস করিলেন, সেই কথাটা ভাবিয়া তাহার দুঃখ হইল। অথচ উপায় কি ?

কিন্তু ইন্দুর মনের মধ্যে তখন তারুণ্যই জয়ী হইয়াছে। সে সন্ধ্যাবেলা চুপি চুপি অমলকে ডাকিয়া কহিল, শেষ রাত্তিরে একবার বাগানের দিক দিয়ে ঘুরে আমার ঘরের জানালায় যাবেন, ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব, কেমন ?

তাহার চোখে মুখে রোমান্সের রঙ্। অকস্মাৎ সেদিকে চাহিয়া অমলের মনটাও যেন দুলিয়া উঠিল, সে কহিল, নিশ্চয় যাব, কিন্তু আমার সঙ্গে কথা কইবে তো আপনার বৌ ?

তাহার হাত দুইটা ধরিয়া ইন্দু জবাব দিল, সে আমি কওয়াব নিশ্চয়। আপনাকে যেতে হবে কিন্তু।

রাত্রে শুইয়া অমলের ঘুম হইল না। মনে হইযাছিল এ জীবনে বাসা বাঁধিবার স্বপ্নকে সে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে,—তাহার মনের মধ্যে অন্তত আর কোন প্রকার রস বা রঙের স্থান নাই—কিন্তু আজ তাহার এ কিসের উত্তেজনা ?

তবে কি মানুষের স্ত্রী-পুত্র লইয়া ঘর বাঁধিবার আশা কোনদিনই যায় না ?

বহুক্ষণ বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিবার পর সে বাগানে বাহির হইয়া পড়িল। চাই, রোমান্স চাই, ভাবাবেগ চাই, জীবনের কাব্য চাই—নহিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না।

ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে এক সময় সত্য-সত্যই সে যখন ইন্দুর শয়নঘরের জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল তখন তাহার নিজেরই বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অপরে নবোঢ়া কিশোরী বধূর সহিত প্রেমালাপ করিতেছে, সেখানে তাহার স্থান কোথায় ? সে নিজে এ সব ব্যাপারের ঊর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে এই তো তাহার বিশ্বাস, তবে আজ এ কৌতূহল কেন ? এ প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল ?

ইন্দু জাগিয়াই ছিল, সে জানালাটা ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়া কহিল, এসেছেন অমলদা, উঃ কী ভীষণ লোক এ, আমার সঙ্গেই কিছুতে কথা কইবে না! কত সাধ্য-সাধনা ক'রে, কত হাতে পায়ে ধ'রে তবে কথা বলিয়েছি—এই আবার পালাচ্ছে!

ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহারই ম্লান আলোতে কমলার মুখখানি বড় ভাল লাগিল। গত রাত্রেও কে তাহাকে চন্দন পরাইয়া দিয়াছে, তাহারই কিছু কিছু চিহ্ন তখনও তাহার মুখে ; সলজ্জ হাসিতে ঠোঁট-দুইটি ঈষৎ কম্পিত, চোখে লজ্জা ও সুখের আবেশ মাখানো।

তাহার হাত ধরিয়া জোর করিয়া জানালার কাছে টানিয়া আনিয়া ইন্দু কহিল, ইনি আমার বন্ধু অমলবাবু, আর এটি আমার স্ত্রী কমলা—। এই শোন, অমলদা'র সঙ্গে আলাপ কর।

কমলা লজ্জিতভাবে মৃদু হাসিতে লাগিল এবং স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, কথা কহিতে পারিল না। সেদিকে চাহিয়া ক্ষণকালের জন্য অমল নিজের জীবনের সমস্ত বেদনা যেন ভুলিয়া গেল এবং মনে হইল পৃথিবীতে সেদিন ইন্দুর অপেক্ষা কেহ সুখী নাই। সেও আবদারের সুরে কহিল, কথা কইবে না তো ?

কমলা বিষম বিপন্নভাবে মাথা নিচু করিয়া রহিল ; হাতের মধ্যে তাহার স্বেদাসিক্ত হাতখানি থর-থর কাঁপিতেছে দেখিয়া ইন্দু সস্নেহে কহিল, ভয় কি, লক্ষ্মীটি কথা কও, নইলে অমলদা কী ভাববেন বল দেখি!

কমলা তবুও কথা কহিতে পারিল না, একবার মাত্র চোখ তুলিয়া অমলের দিকে চাহিয়াই পুনরায় দ্বিগুণ লজ্জায় মুখ নামাইয়া লইল। অমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়াছিল ; সে কহিল তাহ'লে আমি যাই ইন্দুবাবু, উনি যদি কথা না কন্‌ তো কি দরকার ও'কে বিরক্ত করার ?

ইন্দু কহিল, দেখ—উনি চলে যেতে চাইছেন—

অমলও খানিকটা ঘুরিয়া দাঁড়াইল। এই বিপদে কমলা ঘামিয়া নাহিয়া উঠিয়াছে, অথচ সত্যসত্যই অমল কিছু মনে করিবে ভাবিয়া সে কোনমতে জড়িত কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, কথা কইছি তো!

ছোট্ট দুটি কথা। কিন্তু অমলের মনে হইল যেন এত মিষ্ট কণ্ঠ সে কখনও শোনে নাই। তাহার বুকের সব কটা তারে যেন সেই কণ্ঠস্বর ঝঙ্কার দিয়া

উঠিল ; সে বলিল, ইন্দুবাবু, উনি বড্ডই বিপন্ন বোধ করছেন, ওঁকে আর টানাটানি করবেন না, আমার মান যে উনি রেখেছেন এতেই ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি এখন যাই—

আসল কথা সে নিজের এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতাটাকে একটু নির্জনে অনুভব করিতে চায়। সে আর ঘরে না ফিরিয়া প্রথম উষার অস্পষ্ট আলোতেই বাগানে পায়চারি করিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া এই কথাটাই সে বার বার নিজেকে বুঝাইতে লাগিল যে, রোমান্স কিছুতেই মানুষের মন হইতে মুছিয়া যায় না, সে চিরদিন থাকে এবং চিরদিনই তাহার থাকা দরকার। নহিলে পৃথিবীতে জীবনের কোন মূল্যই থাকিত না।

পরের দিন বেলা বাড়িতেই সে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব করিল, কিন্তু ইন্দুর মামা ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন ; যে মানুষটিকে অমল ইন্দুর মামা বলিয়া জানিত, সে মানুষটি যেন আর নাই, এ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক। অর্থাৎ ইন্দুর বিবাহের যে অভাবনীয়ত্ব, তাহার ঘোর তখনও তাঁহার মন হইতে কাটে নাই ; সেই রেশটুকু তখনও তাঁহার গলার সুরে। তিনি প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া তাহার পিঠে চাপড় মারিয়া কহিলেন, পাগল নাকি? আজ কিছুতে হ'তে পারে না। না, সে আমি কোন মতেই শুনব না। এ ক'দিন তোমার মোটে খাওয়া দাওয়া হয় নি, বড় অযত্ন হয়েছে, আমরা তো নজর দিতেই পারি নি।

ইন্দুকে কথাটা বলিতে গেল কিন্তু সেদিকেও বিশেষ সুবিধা হইল না। সে কহিল, কী দুর্ভাবনা আর কী অবস্থায় রয়েছি,বুঝছেন তো? আপনি চলে গেলেই যেন বিভীষিকার মত সেগুলো ঘাড়ে এসে পড়বে। আর একটা দিন অন্তত থেকে যান্—আপনি আছেন তবু একটু রঙ্গীন নেশায় আছি যেন। না, আজকের দিনটা না থাকলে সব মাটি হয়ে যাবে—

শেষের দিকে তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল। সুতরাং অমল আর কথাটায় জোর দিতে পারিল না কিন্তু মনে বুঝিল তাহার যাওয়াই উচিত। এখানে বেশী দিন থাকিলে হয়তো ঘর বাঁধার নেশা তাহাকেও পাইয়া বসিবে।

কিন্তু সারাদিন ইন্দুর দেখা নাই। সে নানা ছুতায় রান্না-ভাঁড়ার ঘরের মধ্যেই ঘুরিতেছে। মাঝে মাঝে যখন খেয়াল হয় যে, অতিথিকে বোধ করি অবহেলা করা হইতেছে, তখন দুই মুহূর্তের জন্য আসিয়া বসে এবং খাপ-ছাড়া দুই-একটা কথা বলিয়া আবার একটা ছুতায় উঠিয়া যায়। অমল ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে হাসে।

কিন্তু তবু যে ঐ যৌবন-লীলার মধ্যে কী মাদকতা আছে, অমল চেষ্টা করিয়াও তাহার হাত এড়াইতে পারে না। সে দুপুর বেলা মাদুরটা টানিয়া লইয়া আসিয়া বাগানের মধ্যে একটা নভেল পড়িতে বসিল কিন্তু সেই অতি আধুনিক নভেলেও তাহার মন বসিল না। দৃষ্টি কখন বইয়ের পাতা হইতে সরিয়া দূর দিগন্তরালে চলিয়া যায় তাহা সে বুঝিতেই পারে না।

সন্ধ্যার খানিক আগে ইন্দু একফাঁকে ফিসফিস করিয়া বলিয়া গেল, আসবেন একটু বাগানের ধারে রাত্তির বেলা ? আমিও চুপি চুপি বেরোব'খন ওকে নিয়ে !

অমল মৃদুস্বরে একটা আপত্তি করিতে গেল কিন্তু তাহা টিঁকিল না, হয়তো তাহার কণ্ঠস্বরে তেমন জোরও ছিল না। ইন্দু সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না না, চলে আসবেন একটু—প্লিজ্, নইলে আমার ভাল লাগবে না।

অমল চুপ করিয়া রহিল। ঘর ছাড়িয়া আসিয়া সে দুঃখ পাইয়াছে প্রচুর, আত্মীয়-স্বজন বিরহও তাহাকে কম আঘাত করে নাই, কিন্তু এ সমস্তর মধ্যেও তাহার স্বাধীনতার একটা সুখ ছিল বলিয়া তাহা দুঃসহ হইয়া ওঠে নাই। আজ কিন্তু সে মনের মধ্যে নূতন করিয়া একটা ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল। অন্তরের মধ্যে কে যেন হাহাকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল, ব্যর্থ হইল, সব ব্যর্থ হইল ! জীবনটা তাহার একেবারে নষ্ট হইয়া গেল !

রাত্রে সেদিন একটু সকাল সকালই আহারাদি শেষ হইয়া গেল। তাহার প্রথম কারণ আত্মীয় যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ ইন্দুর মামারও শরীর ভাল ছিল না। অপরাহ্নে গ্রামের-কয়েকজন মহিলা নববধূর সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহারাও সকাল সকালই বিদায় লইয়াছিলেন।

আহারাদির পর বিছানায় শুইয়া অমলও প্রথমটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু খানিকটা পরেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, ঘড়িতে দেখিল তখন এগারোটা। জাগিয়া থাকিবার প্রবল ইচ্ছা ছিল বলিয়াই অত গাঢ় ঘুমের মধ্যেও অমন করিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার কেমন যেন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। সে জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

কিন্তু খানিকটা পরেই ইন্দু ও কমলার প্রণয়লীলা তাহাকে অজ্ঞাত-বন্ধনে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কৌতূহলের যেন শেষ নাই, তাহাকে শেষ পর্যন্ত দেখিতেই হইবে। সে নিঃশব্দে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিল এবং অস্তোন্মুখ চন্দ্রের ম্লান আলোতে বাগানের পথ দেখিয়া সে ইন্দুর ঘরের দিকেই চলিল।

কিন্তু ইন্দুও ইতিমধ্যে কখন কমলাকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা অমলের ঘরের দিকেই আসিতেছিল। মধ্য-পথে দেখা হওয়াতে ইন্দু ইঙ্গিতে অমলকে ডাকিয়া লইয়া একেবারে পুকুরের পাড়ে গিয়া বসিল। এককালে চত্বরটা বাঁধানো ছিল, এখনও তাহার খানিকটায় শান্ আছে, বসা চলে। কমলা লজ্জিত ভাবে আড়ষ্ট হইয়া বসিল, ইন্দু তাহার এক পাশে বসিয়া অমলকে জোর করিয়া আর এক পাশে বসাইল।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ। অপ্রত্যাশিত সুখে ইন্দুর মন কানায় কানায় ভরা আর অমল চুপ করিয়া ছিল সঙ্কোচে। কিছুক্ষণ পরে সে-ই কথা পাড়িল, আমরা তো দিব্যি সকলে বেরিয়ে এলুম, চোর ঢুকবে না তো ?

ইন্দু কহিল, না, না, আমরা তিন-তিনটে লোক এখানে জেগে বসে রয়েছি,

চোর ঢুকতে সাহস করে কখনও ?

তাহার পর কতকটা অসংলগ্নভাবেই কহিল, একে নিয়ে কিন্তু মহামুস্কিলে পড়লুম অমলদা, আপনার সঙ্গে আলাপ করবে মনে ক'রে আপনাকে বেরোতে বলেছিলুম বটে কিন্তু এখনও তো আমার সঙ্গেই ভাল ক'রে কথা বলছে না।

অমল মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, কেন ?

কৃত্রিম কোপের সহিত ইন্দু কহিল, কে জানে। বোধ হয় লজ্জা।

কমলা অপাঙ্গে একবার অমলের মুখের দিকে চাহিয়া আরও বেশী করিয়া ঘাড় নামাইল।

ইন্দু কহিল, অমলদার সঙ্গে কথা কও না, লক্ষ্মীটি, কাল উনি চলে যাবেন, আবার কতদিনে তোমার সঙ্গে দেখা হবে কে জানে।...শুনছ, কথাবার্তা বলো না—

নেশা একটু যেন অমলের মনেও ধরিয়াছিল, সে কহিল, কথা কইবেন কি, মনে মনে আমার ওপর চটে রয়েছেন যে! দিব্যি এমন ফাঁকা জায়গাতে নির্জনে স্বামী-স্ত্রীর আলাপ জমবে, তা নয় আমি এক আপদ-বালাই কোথা থেকে এসে হাজির হলুম!

ইন্দু কমলার মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, তাই নাকি, সত্যি ?

কমলা নতমুখেই মাথা নাড়িল, কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা গেল যে, পরিহাসটুকু সে বেশ উপভোগ করিতেছে।

ইন্দু কহিল, তবে কথা কইছ না কেন ও'র সঙ্গে ? উনি কি ভাবছেন বল দেখি। দেখছ তো কত দুঃখ করছেন!

অমল উঠিবার উপক্রম করিয়া কহিল, না আমি যাই, উঠি, উনি যখন আমার ওপর প্রসন্ন হলেনই না, মিছিমিছি ও'কে বিরক্ত ক'রে লাভ কি—

ইন্দু কহিল, ঐ দেখলে তো ?

সত্যসত্যই অমল উঠিতেছে দেখিয়া কমলা কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া হাতটা বাড়াইয়া তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল, কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিগুণ লজ্জা পাইয়া আবার টানিয়া লইল। অতি অল্পক্ষণ, বোধ করি এক মুহূর্তকাল মাত্র, কিন্তু সেইটুকু সময়ের জন্যই সেই স্বেদসিক্ত লজ্জাকম্পিত কোমল হাতের স্পর্শটুকুতে অমলের সর্বাঙ্গ যেন জুড়াইয়া গেল। মনের মধ্যে এক ঝলক দক্ষিণা বাতাস বহিয়া তাহাকে যেন মাতাল করিয়া দিল। সে বসিয়া পড়িয়া এবার নিজেই কমলার ডান হাতটা জোর করিয়া নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, বেশ, বসছি কিন্তু কথাও কইতে হবে!

কমলা এবার কথা কহিল ; অত্যন্ত মৃদুস্বরে, জড়িত কণ্ঠে কহিল, কী কথা বলব ?

অমল কহিল, যা খুশি, আপনার বাপের বাড়ির কথা কিছু বলুন না।

ক্রমে আলাপ জমিয়া উঠিল। কমলা শুধু সংক্ষেপে দুই একটি কথার জবাব দেয়, বকিয়া যায় ইহারাই বেশী। অমলের হাতের মধ্যে কমলার হাতখানি ঘামিয়া সপ-সপে হইয়া উঠিল, কিন্তু তবু অমল ধরিয়াই রহিল। অবশেষে এক সময়ে

পূর্বাকাশে ঊষার আভাস লাগিতেই তাহার চেতনা হইল, সে কহিল, ইস্‌, আপনাদের এমন রাতটাই মাটি করে দিলুম দেখছি ; ভোর হয়ে গেল যে !—যান, যান—শুতে যান।

ইন্দুরা উঠিয়া পড়িল। অমল কিন্তু আর শুইতে গেল না, গ্রামের পথে বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িল। যে স্বপ্ন এতক্ষণ ধরিয়া সে দেখিল, তাহাকেই মনের মধ্যে সে তখন ভাল করিয়া অনুভব করিতে চায়।

॥ তেরো ॥

পরের দিনই অমল কলিকাতায় চলিয়া আসিল। সেই ছুতারপাড়ার ধূমপরিপূর্ণ গলি এবং সেই নিচু খোলার চালের ঘর। এতদিন ইহা ক্লেশকর হইলেও এমন করিয়া গলা চাপিয়া ধরে নাই।

সে আসিয়া স্নান সারিয়াই বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু ঘর অসহ্য বোধ হইয়া থাকিলেও পথ তো আরও অসম্ভব। সে সেই দ্বিপ্রহরেই গোলদীঘির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া অপেক্ষাকৃত ছায়াশীতল একটা বেঞ্চিতে গিয়া বসিল এবং দূরের ট্রাম ও বাসের গতির দিকে চাহিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অলস দিবাস্বপ্নের জাল বুনিয়া চলিল।

ক্রমে অপরাহ্ণও মলিন হইয়া আসিল, সন্ধ্যার আর দেরি নাই। এমন করিয়া বসিয়া থাকাও অসহ্য। ইন্দুর কথা, তাহার মামার কথা, কমলার কথা—যেন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। স্বপ্ন বটে কিন্তু বড় মধুর সে স্বপ্ন ; তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া কিছুতেই আর বাস্তবে মন বসিতেছে না। বিশেষত, সহসা আজ সে এতদিন পরে অনুভব করিল, কলিকাতা শহর অসহ্য। নিজের দেশ হইতে আসিয়া একদা যে এই শহর ভাল লাগিয়াছিল, সেই অকৃতজ্ঞতার শোধ দ্বিগুণ আদায় করিয়া লইয়াছেন পল্লীজননী তাহাকে দুই দিনের জন্য ইন্দুদের দেশে লইয়া গিয়া।···

একেবারে সন্ধ্যার মুখে উঠিবে উঠিবে করিতেছে এমন সময় যেখানে ছেলে পড়ায় সহসা সেই মনিবের সহিত সাক্ষাৎ। আর যেখানেই হউক, গোলদীঘির মত স্থানে সে তাঁহাকে দেখিবার আশা করে নাই, খানিকটা বিস্মিত, খানিকটা অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, কথা কহিতে পারিল না।

কথা তাহাকে কহিতেও হইল না, দেবেশবাবু নিজেই কথা কহিলেন। সশব্দে বসিয়া পড়িয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন, ইস্‌, এই সবে ফাগুন মাসের প্রথম, এইতেই ঘামিয়ে দিলে ! আর শালা কাপড়ের দোকানে ভিড়ও কি তেমনি। অতখানি গুঁতোগুঁতি ক'রেও ঢুকতে পারলুম না !

অমল এবার সাহসে ভর করিয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কাপড় কিনতে এসেছিলেন বুঝি ?

না, মশলা কিনতে ! কাপড়ওলার দোকানে আবার কী কিনতে ঢোকে হে ছোকরা ! ইস্‌, কাল-ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছে !

অমল সভয়ে চুপ করিয়া গেল। দেবেশবাবু কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হইয়াই তাহার দিকে মনোযোগ দিলেন, সেই অস্পষ্ট আলোতেই ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার মুখটা নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, তারপর মাস্টার, বিয়ের নেমন্তন্ন খাওয়া হল? পড়াতে যাও নি যে আজ? আজ অবধি ছুটি নেওয়া ছিল, বলে ছুটিটা পুষিয়ে নিচ্ছ, না?...ভাল, ভাল।

ইঁহার কাছে কোনরূপ প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করাই আহাম্মকি তাহা অমল জানিত, তবু সে একবার কহিল, আজ্ঞে না, এই কিছুক্ষণ আগেই এসেছি মোটে—

তিনি বিরাট এক হাস্য করিয়া কহিলেন, ওহে আমরাও জানি, জানি! চাকরি করার আগে আমিও তিনটি বচ্ছর ছেলে পড়িয়েছি; একবার ছুতো পেলে আর ও-মুখোটি হতুম না।...যাক্ গে, যাও নি ভালই করেছ, পচারা আবার কাল মামার বাড়ি গেছে, আসছে কাল বিকেলে ফিরবে, কাল পর্যন্ত তোমার ছুটি! ও হতভাগার কিছু হবে না, বুঝলে মাস্টার, শুধু শুধু অদেষ্টে আছে কতকগুলো অর্থদণ্ড তাই হচ্ছে!

অমল কহিল মাথাটা ওর তো খুব খারাপ নয়, তবে মোটে পড়ায় মন দেয় না এই যা, একটু মন দিলেই করতে পারে। আপনার ক্ষুদের মাথাটা কিন্তু বেশ সাফ, ওর পড়াতেও বেশ মন। ওর ফিউচার দেখবেন খুব ভাল হবে।

দেবেশবাবু প্রায় ধমক দিয়া উঠিলেন, গোবর, গোবর! আমার ছেলেমেয়ে আমি জানি নে? ও সব বেটা-বেটির মাথাতেই গোবর পোরা আছে, কিচ্ছু হবে না ওদের! হুঁ!!

মিনিটখানেক রুমালটা নাড়িয়া হাওয়া খাইয়া পুনশ্চ কহিলেন, ওসব কথা থাক, এখন তোমার খবর বল! বলি কাজ-কর্মের কিছু হ'ল?

অমল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে কিছুই হয় নাই। দেবেশবাবু কহিলেন, জানি আমি, যা দিনকাল পড়েছে বিচ্ছুটি হবার জো নেই! আমার ছেলেগুলোকে তো তাই বলি মাস্টার, যতদিন আছি যা পাস্ খেয়ে নে, এর পর হয় ভিক্ষে করতে হবে নয় জেল খাটতে হবে!...তা দেখ মাস্টার, একটা অল্প টাকা মাইনের চাকরি খালি আছে আমার অফিসে, করবে নাকি?

নাকি? অমল একেবারে দেবেশবাবুর হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, পাঁচটা টাকা পেলেও আমার জীবন রক্ষে হয় এখন, আমি এমন উপোস করে আর পারি না।

দেবেশবাবু তাঁহার মোটা ভারী হাতখানা অমলের কাঁধে রাখিয়া কহিলেন, সবই বুঝি মাস্টার! বড় ছাপোষা মানুষ আমি, নইলে আমিই দু টাকা বাড়িয়ে দিতুম।

যে কাজটার কথা দেবেশবাবু উল্লেখ করিলেন সেটা তাঁহাদের অফিসেই—লাইব্রেরীর কাজ। এক ভদ্রলোক অফিসের কাজ করিয়া লাইব্রেরীর কাজ করিতেন কিন্তু তিনি একা আর পারিয়া উঠিতেছেন না বলিয়া সাহেবকে ধরিয়া আর একটা লোক রাখিবার বরাদ্দ মঞ্জুর করানো হইয়াছে। অবশ্য অফিসেরই কর্মচারীদের

কাহাকেও উপরি হিসাবে রাখিবার কথা কিন্তু যদি দেবেশবাবুদের বড়বাবুকে ভাল মতে 'পাকড়ানো' যায় তবে তিনি হয়তো সাহেবকে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, ছুটির পরে অন্য বাবুদের দিয়া কাজ করানো অপেক্ষা বাহিরের কোন লোককে ঐ মাহিনাতে পাওয়া গেলে অনেক সুবিধা হইবে।

দেবেশবাবু পরদিন তাহাকে অফিসে যাইতে বলিয়া যাইবার সময় আশ্বাস দিয়া গেলেন, কিছু ভেবো না মাস্টার, সে আমি বড়বাবুকে এ্যায়সা পাকড়ান পাকড়াবো যে আর 'না' করতে পারবে না। আর বড়বাবু ভিজলেই সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে যাবে, শালা ছোট সাহেব তো ওর কথায় ওঠে বসে!

তিনি পুনশ্চ কাপড়ের দোকানের দিকে যাত্রা করিলেন কিন্তু অমলের সেদিন রাত্রে ঘুম হইল না। আশা ও আশংকায় সারা রাত্রি বিনিদ্র কাটাইয়া অমল অপেক্ষা করিতে লাগিল শুধু ঘড়িতে এগারোটা বাজার, কারণ দেবেশবাবু তাহাকে বারোটার সময় হাজির হইতে বলিয়া দিয়াছেন। মাত্র বারো টাকা মাহিনা, কিন্তু তাহা হউক, মাসিক পনেরোটা টাকা আয় হইলেও সে অন্তত একটু স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। সুখে থাকিবার আশা সে আর করে না, স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারাই এখন তাহার কাছে সুদূর কল্পনা!

অবশেষে বারোটাও এক সময়ে বাজিল। অফিসের বাবুদের সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা তাহার দিল্লীতেই হইয়াছিল কিন্তু তবু সে এখানকার ব্যাপারগতিক দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারিল না। অধিকাংশ বাবুই নিজেদের স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া আড্ডা দিতেছেন, যাঁহারা নিজের সীটে আছেন তাঁহাদের অবস্থাও বিশেষ খারাপ নয়, অপেক্ষাকৃত যাঁহারা প্রবীন তাঁহারা খবরের কাগজ পড়িতেছেন, ছোক্‌রার দল লাইব্রেরী হইতে আনা প্রকাণ্ড নভেল কিম্বা আধুনিক নাটকে মন দিয়াছে। অত বড় হলটার মধ্যে যাঁহারা ঠিক অফিসের কাজ করিতেছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা বোধ হয় পাঁচ-ছয়ের বেশী হইবে না।

ঠিক সামনেই যে বাবুটি বসিয়া ঘাড় গুঁজিয়া কিএকটা লিখিয়া যাইতেছিলেন, বয়স কম দেখিয়া অমল তাঁহার ডেস্কের কাছেই গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কাছে গিয়া দেখিল, তিনি অফিসের কাগজ ব্যবহার করিলেও লিখিতেছেন বাঙলায় এক সুদীর্ঘ চিঠি। বোধ করি প্রেম-পত্রই হইবে, কারণ লেখক সহসা মুখ তুলিয়া উগ্রস্বরে কহিলেন, বাইরে লেখা রয়েছে দেখছেন না, No Vacancy—তবু ভেতরে কেন আসেন জ্বালাতন করতে?

অমল ভয়ে ভয়ে কহিল, আজ্ঞে না—

আজ্ঞে না আবার কি? এখানে চাকরি পেতে হলে বড়বাবুদের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকার দরকার হয়, তা আপনার নিশ্চয়ই নেই, নইলে এমন ক'রে আমাকে জ্বালাতন করতে আসতেন না, একেবারে চাকরি পেয়ে নিজের টুলে গিয়ে বসতেন—আগে বাইশ টাকা তারপর একেবারে বিয়াল্লিশ টাকায় কন্‌ফার্মেশন্‌! ঐ যে নো ভেকেন্সি বোর্ডটি দেখছেন, ওটি কমসে কম তের বচ্ছর টাঙানো আছে, ওর মধ্যে অন্তত

সাড়ে তিনশ' লোক নেওয়া হয়ে গেল, তবু শালা বোর্ড আর নড়ছে না। বাড়ি যান মশাই, বাড়ি যান্। কেন মিথ্যে সময় নষ্ট করবেন, এখানে এমনি যদি এলে সুবিধে হ'ত তাহ'লে আর আমার ভাইটা এতদিন বসে থাকত না।

বাধা দেওয়ার চেষ্টা করাও বৃথা জানিয়া অমল এতক্ষণ চুপ করিয়াই শুনিয়া যাইতেছিল। এইবার বক্তৃতা বন্ধ হওয়াতে প্রায় মরীয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, আমি দেবেশবাবুকে খুঁজছি।

ভেংচি কাটিয়া ভদ্রলোক জবাব দিলেন, দেবেশবাবুকে খুঁজছি।⋯ তা আমি কি করব? আমি কি Director General of Information? জ্যালা জ্বালা হয়েছে এই এক দোরের কাছে সীট হয়ে দুনিয়াসুদ্ধ লোকের ভগ্নিপতির খোঁজ দিতে দিতেই দিন চলে গেল। ছোঃ⋯একটু স্বস্তিতে যে একখানা চিঠি লিখব তার জো নেই!

বলিয়া, বোধ করি অমলের উপরে রাগ করিয়াই, অতখানি লেখা চিঠিটা কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে স্বয়ং দেবেশবাবুই কোথা হইতে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি কহিলেন, মাস্টার ইন্দরের কাছে আমার খোঁজ করছিলে বুঝি? আব লোক পেলে না জিজ্ঞাসা করবাব বাবা! ইন্দর বুঝি আজ টিফিনের আগেই বৌকে চিঠি লিখতে শুরু করছিলে?

তারপর গলাটা নিচু করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কহিলেন, বৌ বুঝি মাস তিনেকের জন্যে চেঞ্জে গেছে, তা তাকে রোজ একখানা ক'রে চিঠি দেওয়া চাই, সেই সময়ে কেউ এসে পড়ল তো আর রক্ষে নেই, একেবারে তেলে-বেগুন!⋯ অফিসের কাজ-কর্ম এই তিন মাস একদম বন্ধ আর কি।

ইন্দ্রবাবু সব কথাই শুনিতে পাইয়াছিলেন, তিনি রাগে তোৎলা হইয়া গেলেন, দে-দেখুন দে-দেবেশবাবু, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি—

দেবেশবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, আমি কিছুই বলব না দাদা, তবে এই বাবুটি যে বড়বাবুর কে তা তো জান না, কথাটা যদি কানে ওঠে তাহ'লে ছোটসাহেব ডেকে তোমাকে মোয়া খাইয়ে দেবে'খন। যত বলি ইন্দর বৌকে চিঠি লেখা একটু কমাও, তা তো শুনবে না—

দেবেশবাবু অমলের হাত ধরিয়া ভিতরের দিকে চলিতে শুরু করিলেন কিন্তু অমল তাহারই মধ্যে একবার ইন্দ্রবাবুর দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেল, যেন জোঁকের মুখে নুন পড়িয়াছে, সে মানুষটিকে আর চিনিবার উপায় নাই।

দেবেশবাবু ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিয়া দিলেন, ঐ ওধারে যে বড় টেবিলটা দেখছ, ঐ যে টেলিফোন রয়েছে—হ্যাঁ, উনিই আমাদের সেক্শনের বড়বাবু; দূর থেকে চোখো-চোখি হ'লেই একটা নমস্কার করবে, আবার কাছে গিয়ে আর একটা। নমস্কারগুলো দেখিয়ে করবে, এমনভাবে ক'রো না যেন যে তুমিও করলে অথচ উনিও দেখতে পেলেন না!

তাহাকে দুইবার নমস্কার করিবার উপদেশ দিলেও দেবেশবাবু নিজে বোধ হয় ঐটুকুর মধ্যে বার-চারেক নমস্কার সারিয়া ফেলিলেন, তাহার পর কাছে গিয়া ফিস্

বিনয় করিয়া কহিলেন, এই সেই ছোকরাটি বড়বাবু, বড় ভাল ছেলে ; দিন না হয় একটা সদ্‌গতি ক'রে এখন, আপনার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হলুম !

বড়বাবুর নামডাক যতটা, তাঁহার চেহারা তাহার ঠিক বিপরীত। মানুষটি যেমন বেঁটে তেমনি রোগা। ভদ্রলোকের মাথায় পাতা কাটিবার ধরনে টেরিকাটা, গায়ে অলেস্টার কোট এবং সেই ফাল্গুন মাসেও পায়ে পশমের মোজা। তিনি ভ্রূকুটি করিয়া অমলের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, কলেজে পড়োছিলে ?

অমল জবাব দিবার পূর্বেই দেবেশবাবু কহিলেন, রামচন্দর ! ওর কি সেই অবস্থা ? তা ছাড়া ও প্রায়ই বলে, দেবেশবাবু, চাকরি করেই যখন খেতে হবে, তখন আর বি-এ এম-এ পাস ক'রে কি হবে মিছিমিছি ?

বড়বাবু যেন প্রসন্ন হইলেন বলিয়াই বোধ হইল। কহিলেন, তবু ভাল ! বি-এ পাস ক'রে যে আমাকে জ্বালাতে আসো নি এই আমার বাবার ভাগ্যি। বুঝলে দেবেশ, মুখ্য হয়ে যারা আসে তবু তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি ক'রে নিতে পারি, আর ঐ তোমার যাঁরা বি-এ পাস, কোন জন্মে ওদের আফিসের কাজ শেখাতে পারবে ? ওরা এক-একটি আস্ত বাঁদর তৈরি হয়ে আসে !

দেবেশবাবু মাথা নাড়িয়া জবাব দিলেন, ঠিক কথা ! এই দেখুন না কেন আপনি তো সেকালের এণ্ট্রেন্স পাস, আপনি যেমন করে আফিসের কাজ চালিয়ে গেলেন, পারচেজ সেকশানের বড়বাবু একদিনও তা পারলে ! আজ এখানে ভুল, কাল ওখানে গলতি লেগেই আছে। অথচ শুনি তো ওধারে এম্‌-এতে ফার্স্ট না কি হয়েছিলেন !

বড়বাবু এবারে হাসিলেন। কহিলেন, অত কথায় কাজ কি দেবেশ ? এই তো তুমি, তুমি তো ম্যাট্রিক পাসও দাও নি, অথচ তোমাকে একটা কাজের ভার দিয়ে আমি যেমন নিশ্চিন্তে হই, তেমন কি কাউকে দিয়ে হতে পারি ? রাধেমাধব। বি-এ পাস ! হুঁ !!···এই দেখ না মুকুন্দ কাল একটা চিঠির ড্রাফ্‌ট্‌ ক'রে নিয়ে এল, আমার বড্ড তাড়া ছিল বলে দেখতে পারলুম না, একেবারে সাহেবের কাছেই পাঠিয়ে দিলুম। ভাবলুম ইংরেজিতে অনারওলা ছেলে ওসব, আর যাই হোক ভুল করবে না। ওঃ হরি, ছোটসাহেব ডেকে শুধু আমাকে বললেন, আজই মুকুন্দকে এক মাসের নোটিশ দাও, অমন কেরানীতে আমার দরকার নেই।

ছোট ছোট চোখ-দুইটি যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত করিয়া দেবেশবাবু কহিলেন, বলেন কি ? একেবারে নোটিশ দিতে বললে ?

বলবে না ? একটা চিঠিতে সাতাশটি ভুল !···মুকুন্দকে ডেকে চিঠিটা দিয়ে বললুম, মুকুন্দ, এসব কি ? তাই কি ভুল বুঝতে অবধি পারে, বলে, কেন বড়বাবু, ঠিকই তো আছে !·· গেল তোরই চাকরি, আমার কি ?

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া অমলকে প্রশ্ন করিলেন, সাহেবের কাছে নিয়ে গেলে ইংরেজীতে কথা কইতে পারবে তো ?

দেবেশবাবু তাঁহার জুতার ডগাটা দিয়ে সজোরে অমলের পা মাড়াইয়া দিলেন। অমল জবাব দিল, আজ্ঞে বোধ হয় পারব না, সাহেবদের সঙ্গে কথা

কওয়া অভ্যেস নেই তো।

বড়বাবু আবার হাসিলেন। মুখে তাঁহার বরাভয়, কিন্তু কণ্ঠে উদ্বেগ টানিয়া আনিয়া কহিলেন, তাও পারবে না? মাটি করেছে, আচ্ছা দেখি কি করতে পারি—

তিনি ছোটসাহেবের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। দেবেশবাবু অমলের পিঠে চাপড় মারিয়া কহিলেন, আর ভয় নেই মাস্টার, চাকরি তোমার হয়েই গেল ধরে রাখো—

তাঁহার অনুমান যে মিথ্যা নয় তাহা মিনিট দশেক পরেই বোঝা গেল, বড়বাবু উদ্ভাসিত মুখে আসিয়া কহিলেন, যাক্—শেয়াল বাহাতি ক'রে বেরিয়েছিলে বটে, সাহেব বললে, তুমি যখন রেকমেণ্ড করছ বাবু, তখন আর আমি কি দেখব, যাও একেবারে বসিয়ে দাও গে—

দেবেশবাবু সমস্ত দাঁত বাহির করিয়া কহিলেন, সে তো আমি জানতুমই সার, সাহেব আর কবে আপনার ওপর কথা বলেছে?

তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বড়বাবু জবাব দিলেন, না সাহেব আমার তেমন নয় অবশ্য, যদি দিনকে রাত বলি তাহলেও একবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখবে না, সত্যি কি মিথ্যে। যাও তাহলে দেবেশ, ভাল ক'রে একটা দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়ে একেবারে ওকে লাইব্রেরী ঘরে বসিয়ে দাও গে—

দেবেশবাবুকে আর দ্বিতীয়বার বলিতে হইল না, তিনি অকারণে বারকতক নমস্কার ঠুকিয়া অমলকে সঙ্গে করিয়া সোজা লাইব্রেরীতে লইয়া গেলেন এবং অফিসেরই একখানা কাগজ বাহির করিয়া কহিলেন, লেখো দেখি মাস্টার একখানা দরখাস্ত, মোদ্দা সব যেন ঠিক ঠিক লিখো না, অন্তত গোটা-ছয়েক ভুল যেন থাকে—

অমল বিস্মিত হইয়া কহিল, ভুল? ভুল থাকবে?

দেবেশবাবু জবাব দিলেন, হ্যাঁ, ঐ বানান ভুল, গ্রামার ভুল সব মিলিয়ে অবিশ্যি! এমন ভুল রাখবে যেন বড়বাবু ধরতে পারেন।

তাহার পর কহিলেন, এ একরকম মন্দ হল না মাস্টার, কাজ এমন কিছু নয়—অফিসের লাইব্রেরী, তুমিও যেমন, ওর কি মা-বাপ আছে? ও আপনি চলে—

দরখাস্ত লিখাইয়া লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। এতক্ষণে অমল তাহার নূতন অফিসের দিকে ফিরিয়া চাহিবার অবসর পাইল। অনেকগুলি আলমারি, বইয়েরও অভাব নাই। অভাব সেগুলির ভাল রকম রক্ষণাবেক্ষণের শুধু। বই যেগুলি ফেরত আসিয়াছে, তাহাদের কোনখানিই পুনরায় আলমারিতে ঢোকে নাই, মেঝের উপর স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছে। অমল সেইগুলি নম্বর মিলাইয়া পুনরায় আলমারিতে তুলিতে তুলিতেই অফিসের ছুটির সময় হইয়া গেল। এইবার আসিলেন স্বয়ং লাইব্রেরীয়ান বাবু। ঘরে ঢুকিয়াই কহিলেন, নতুন য়্যাসিস্ট্যাণ্ট এলে বুঝি হে? কতটি দিতে হ'ল বড়বাবুকে?…থাক্ থাক্ বলতে হবে না, আন্দাজ করে নিতে পারব'খন—

তাহার পর চেয়ারে বসিয়া টেবিলটায় পা তুলিয়া দিয়া কহিলেন, বইগুলো ভুল নম্বরে তুলছ না তো হে? শেষকালে আর খুঁজে পাবে না, বেয়ারাটাকে

ডেকে দাও নি কেন, ও সব জানে শোনে ! আমি আর ও আলমারিতে তুলি না, বাবুদেরই বলি বেছে নিতে—

তাহার পর একটা বিড়ি ধরাইয়া কহিলেন, কোন্‌টার কি আছে দেখে শুনে রাখ ভাল ক'রে, আর পার যদি তো missing list একটা তৈরী করো। ধীরে-সুস্থে করলেই চলবে, এমন কিছু তাড়া নেই।···দাও দিকি আমাকে একখানা ভাল দেখে বই বেছে—যা হয় হ'লেই হবে। আমার গিন্নীকে বই যোগানো ভারি সুবিধে, তিনি পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ভুলে যান, এক বই তিনবার নিলেও অসুবিধে হয় না—

মিনিট পাঁচেক পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আজ আর কেউ বই নিতে আসবে না, আজকে আমাদের বই মিলিয়ে আলমারিতে তোলবার ছুটি। আমি তা'হলে চল্লুম, তুমিও বরং আজ বাড়ি যাও, কাল যা হয় ক'রো—

তাহার পর গলা নামাইয়া কহিলেন, যোন্দা একটা কথা সাফ্ বলে দিচ্ছি, এখানে যদি বনিয়ে কাজ করতে চাও তাহ'লে আসছে মাসের মাইনে থেকে পাঁচটি টাকা আমাকে দিতে হবে। আর যদি না দাও কিম্বা ঐ দেবেশ হতভাগাকে বলো, তাহলে কিন্তু তিনটি মাসও টিকতে পারবে না তা বলে দিলুম—

তিনি বাহির হইয়া গেলেন। অমল পাথরের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার কাজে মন দিল। মোটে বারোটি টাকা মাহিনা, তাহার মধ্য হইতেও পাঁচটি টাকা চলিয়া গেল !

আরও প্রায় আধ-ঘণ্টা কাজ করিবার পর বেয়ারাকে চাবি দিতে বলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল ইন্দ্রবাবু তখনও পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া বোধ করি তাহারই অপেক্ষা করিতেছেন। কাছে আসিতেই হাত কচ্‌লাইয়া কহিলেন, কী দাদা কাজ সারা হ'ল, বাড়ি যাচ্ছেন বুঝি ? চলুন আমিও যাব ঐ পথে—

তাহার পর প্রায় ফটকের কাছাকাছি আসিয়া অকারণেই অমলের কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিলেন, ন'মাস প্রেগন্যান্সির পর প'ড়ে গিয়ে মরা ছেলে ডেলিভারি হ'ল, যমে-মানুষে টানাটানি—ডাক্তার বললে, এর পরেও যদি চেঞ্জে না পাঠাও তাহ'লে তোমার নামে ক্রিমিনাল কেস করব। শালাদের কাছে ছুটি চাইলুম, শালারা ছুটি দিলে না, বললে, স্পেয়ার করা চলবে না ! সেটা কি আমার অপরাধ ?

অমল তাঁহার মূল বক্তব্যের আভাসমাত্র না পাইয়া কতকটা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। ইন্দ্রবাবু তখন নিজেই আবার শুরু করিলেন, অগত্যা আমাকে চেঞ্জে পাঠাতে হ'ল ; একা তিনটে ছেলে-মেয়ে নিয়ে সেই বিদেশ বিভুঁয়ে প'ড়ে, কাজেই আমাকে দৈনিক খবরও নিতে হয়।···আছে অবিশ্যি আমার ছোট শালা, কিন্তু সে মানুষ বললেও চলে ভূত বললেও চলে।···যদি বলেন যে 'চিঠি তো রোজ আসে না তোমার নামে—তুমিই বা রোজ লেখো কেন'—আচ্ছা সে রোগা মানুষ, রোজ কখনও চিঠি লিখতে পারে ? কিন্তু আমার চিঠি না পেলেই ভয়ঙ্কর ভাবতে শুরু করবে, তাতে 'চেঞ্জ' হওয়া চুলোয় যাক আরও রোগ বেড়ে যাবে, বুঝলেন না ?

এতক্ষণে অমল যেন আঁধারে কূল পাইল। সে কহিল, ঠিকই তো। এ অবস্থায় মোটে ভাবানো উচিত নয়—

সোৎসাহে ইন্দ্রবাবু জবাব দিলেন, এই দেখুন আপনি ইয়ংম্যান, আপনি যেমন কথাটা বুঝলেন তেমন কি আর কেউ বুঝবে? অফিসের সব বাবুরা যেন এক-একটি ঢেঁকি অবতার, পেছনে লেগেই আছে! কেউ মানুষ নয়, বুঝলেন, সব জানোয়ার! আর ঐ দেবেশ শালা আরও বেশী—

বলিয়াই পরমুহূর্তে জিভ কাটিয়া বলিলেন, ইস! কী বলতে কি বলে ফেললুম —দেবেশবাবু লোক ভাল, পেছনে লাগে বেশী ঐ কিংকরবাবু, সত্যকিংকর!

তাহার পরই সহসা অমলের হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কান্নার সুরে কহিলেন, দোহাই দাদা, বড়বাবুকে কিছু বলবেন না, তাহ'লে মারা যাব একেবারে। একেই ওর মেয়ের বিয়েতে পরিবেশন করব না বলেছিলুম ব'লে— মরুক গে, দাদা আপনি ইয়ংম্যান, আমাদের দুঃখটা একটু বুঝুন, আর এই কুড়ি-পঁচিশটা দিন, তারপরই আনিয়ে নেব—

এত দুঃখের মধ্যেও হাসি চাপা দায় হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়া অমল কহিল, না না, সেসব কিছু ভাববেন না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি কাউকে কিছু বলব না—

ইন্দ্রবাবু আকস্মাৎ পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহির করিয়া অমলের হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিলেন, বহু ধন্যবাদ দাদা, না না, আমি কোন কথা শুনব না, ছোট ভাই সন্দেশ খেতে দিচ্ছে মনে করুন—

এবং পরক্ষণেই, প্রতিবাদের অবসর মাত্র না দিয়া ইন্দ্রবাবু একরকম ছুটিয়া গিয়া একটা ট্রামে উঠিয়া পড়িলেন। টাকা দুইটা অমলের হাতের মধ্যেই রহিয়া গেল।

॥ চৌদ্দ ॥

বিচিত্র ব্যাপার!

অনেকদিন পরে অমল সারাটা পথ আপন মনে হাসিতে হাসিতে বাসায় ফিরিয়া আসিল। টাকা দুইটা তাহার ফিরাইয়া দেওয়াই হয়তো উচিত, কিন্তু তাহার তখন যা অবস্থা, তাহাতে টাকা হাতে পড়িলে আর ফিরাইয়া দেওয়া চলে না। আর, সে ভাবিয়া দেখিল, যখন তাহাকে ঘুষ দিয়া চাকরি বজায় রাখিতে হইবে, তখন লইতেই বা বাধা কি? সে পথেই একটা খাবারের দোকানে ঢুকিয়া বহুদিন, বোধ করি একযুগ পরে, নিজের ইচ্ছামত খাবার কিনিয়া লইল। যদিও পথে আসিতে আসিতে আবার ঐ সাত আনা পয়সা দমকা খরচ করার জন্য মনে মনে একটু অনুশোচনাও হইতেছিল।

ঘরের চাবি খুলিতেই নজরে পড়িল একখানা খামের চিঠি মেঝের উপর পড়িয়া আছে। পিওন চাবি বন্ধ দেখিয়া দরজা গলাইয়া দিয়া গেছে। তাহাকে আবার এ ঠিকানায় কে চিঠি দিল? সে বিস্মিত হইয়া খামটা তুলিয়া লইয়া দেখিল হাতের লেখা ইন্দুর; অর্থাৎ অমল চলিয়া আসিবার পরই ইন্দু চিঠি লিখিয়াছে।

অমল মনে মনে হাসিল, নববিবাহিতদের কাণ্ডই আলাদা।

মুখ হাত ধুইয়া কেরোসিনের আলো জ্বালিয়া সে সোজা বিছানায় শু পড়িল। তাহার পর ধীরে-সুস্থে খামটা ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিল। ই বড় চিঠির মধ্য হইতে আর একটা একফালি কাগজের টুকরা বাহির হইয়া পড়িল, অত্যন্ত কাঁচা হাতের লেখা, আঁকাবাঁকা বড় বড় হরপে দুইটি মাত্র লাইন। শব্দ জোড়া-তাড়া দিয়া পাঠোদ্ধার করিলে দাঁড়ায়,—

অমলবাবু,

কেমন আছেন? আপনার জন্য বড়ই মন খারাপ বোধ হইতেছে। চিঠি দিবেন। নমস্কার জানিবেন। ইতি—

কমলা

কমলা চিঠি দিয়াছে! ইন্দুর বৌ!

অমল সেই দুই ছত্র লেখাই বার-তিনচার পড়িল, তাহার পর চোখ বুজিয়া কমলাকে ভাবিবার চেষ্টা করিল। তাহার কথা মনে আসিতেই চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে সেই চন্দনলিপ্ত লজ্জানত মুখ, আর মনে পড়ে তাহার থরথর-কম্পিত স্বেদাসক্ত কোমল হাতখানি! আর তাহার আশ্চর্য কণ্ঠস্বর। সেই প্রথম দিনের কোনমতে বলিয়া ফেলা তিনটি শব্দ—কথা কইছি তো!

অকস্মাৎ অমলের সারাদেহ যেন কোন্ এক অদ্ভুত পুলকানুভূতিতে বার বার শিহরিয়া উঠিল। বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া থাকা যেন অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল তাহার। সে চিঠিটা সযত্নে বালিশের তলায় রাখিয়া দিয়া উঠিয়া বসিয়া একবার চারিদিকে চাহিল। মনে হইল যে, এই আশ্চর্য সংবাদটা কাহাকেও দেওয়া প্রয়োজন, কাহাকেও ডাকিয়া যেন সে শোনাইতে পারিলে বাঁচে যে, একটি নব-বিবাহিতা কিশোরী তাহাকে চিঠি লিখিয়াছে। ইহা নিতান্তই সৌজন্য, হয়ত ইন্দুর বিশেষ অনুরোধেই তাহাকে লিখিতে হইয়াছে খুব সম্ভব কথাগুলি ইন্দুরই বলিয়া দেওয়া, কিন্তু তবু চিঠি তো! অমল কল্পনায় তাহার লিখিবার সময়কার অবস্থাটা ভাবিয়া লইল। সংকোচে, লজ্জায় কমলার মুখ আরক্ত হইয়াছে খারাপ হাতের লেখা বলিয়া লিখিতে রাজী হইতেছে না, অথচ ইন্দুর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত কলম ধরিতে হইয়াছে। হাত কাঁপিতেছে, কিন্তু মুখে কৌতুকের হাসি এবং বোধ হয় মনের মধ্যে লিখিবার ইচ্ছাও আছে—

খানিক পরে অমল যেন নিজে-নিজেই লজ্জিত হইয়া উঠিল—এ কি? তাহার, কি এখন কিশোরী মেয়েকে লইয়া দিবাস্বপ্ন দেখা উচিত? এমন কথাও একবার যেন মনের মধ্যে কে প্রশ্ন করিল, সে কি ঐ শ্যামা মেয়েটির প্রেমে পড়িতেছে? কিন্তু পরক্ষণেই মনের মধ্যে যতটা দেখা যায়, একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া বুঝিল যে, সে আশংকা নাই, ইহা নিতান্তই কিশোরী মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষের সহজাত দুর্বলতা।

মনে পড়িয়া গেল যে, ইন্দুর চিঠিটাই সে এখনও পর্যন্ত পড়ে নাই। বেচারীর উপর ঘোর অবিচার করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, চিঠিটা কখন মাটিতে পড়িয়া

গিয়াছে, তাহাও দেখিতে পায় নাই। সে তাড়াতাড়ি চিঠিটা কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে শুরু করিল—

ভাই অমলদা,

আপনি চলে যাবার পরই এমন মন খারাপ হয়ে গেল যে, আর যেন কিছুই ভাল লাগছে না। রাজ্যের দুর্ভাবনা এসে ঘিরে ধরেছে। মনে হচ্ছে আপনাকে কাছে পেলে তবু একটু বল-ভরসা পেতুম। সে উপায় তো আর নেই, এই মুহূর্তে আপনাকে কোথায় পাই বলুন? তাই চিঠি লিখতে বসলুম।

আপনার নতুন বন্ধুটিও আপনাকে চিঠি দিচ্ছে, জবাব দেবেন। লিখতে কি চায়? বলে আমার বিশ্রী হাতের লেখা, বানান ভুল, তোমার অমলদা কি ভাববেন বলো তো? আজ আবার কি কাণ্ড করেছে জানেন? সকালবেলা উঠেই টিপ করে এক প্রণাম। বলে পিসীমা শিখিয়ে দিয়েছিল, এতদিন মনে ছিল না। কী অদ্ভুত বলুন তো!

আমরা বোধ হয় রবিবার নাগাদ ফিরব। ওঁরা তাই লিখেছেন। সোজা গিয়ে ওঁদের বাড়িই (মানে আমার শ্বশুরবাড়ি) উঠতে হবে।

আমার ভালবাসা ও নমস্কার নেবেন। ইতি—

আপনার ইন্দু।

চিঠিটা পড়িয়া অমলের হাসি পাইল।

একেবারেই ছেলেমানুষ! যৌবনের রঙ্গীন স্বপ্ন এবং বাস্তবের দুশ্চিন্তা—এই দুই বিপরীত স্রোতের মধ্যে পড়িয়া কিশোর মনটি টলমল করিতেছে। এ বয়সে মন সাধারণত আনন্দের দিকেই ঝুঁকিয়া থাকে সুতরাং দুর্ভাবনাকে আপাতত ইন্দু ঠেকাইতে পারিবে, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া অমল চিন্তিত না হইয়া পারিল না।...

বাহিরে গিয়া কাগজ কলম সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রাত্রেই অমল চিঠি লিখিতে বসিল। ইন্দুকে কয়েক লাইন এবং কমলাকে দুই ছত্র; কী-ই বা লিখিবে? কিন্তু তবুও ছোট দুইখানি চিঠি শেষ করিয়া শুইতেই রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেল। রাত্রে ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল, সে যেন কোন এক দুর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে, অন্ধকার রাত্রি, শুধু সেই বনের মধ্যেও কোথা হইতে ভাসিয়া আসিতেছে সানাইয়ের সুর, সে সুর যেন আর থামে না—

পরদিন বারোটার সময় অফিসে গিয়াই সে কাজে লাগিয়া গেল। এতদিন পরে একটা কাজ পাইয়া সে বাঁচিয়াছে। মাহিনা না পাক্, তবু কাজ। আরও একটা সুবিধা এই যে লাইব্রেরী ঘরটি অফিসের অন্যান্য বিভাগ হইতে দূরে এবং একেবারে আলাদা। কেরানীবাবুদের যা নমুনা সে পাইয়াছে, তাঁহাদের সঙ্গে একত্র বসিয়া কাজ করিতে হইলে বিষম বিব্রত হইতে হইত।

কিন্তু মনটা খারাপ হইয়া গেল তাহার দরখাস্তের মঞ্জুরীপত্রটা পাইতে। তাহার দরখাস্তের উত্তরে কোম্পানী জানাইয়াছেন যে, লাইব্রেরীয়ানবাবুকে সাহায্য

রাখিবার জন্য লেখাপড়া-জানা বেয়ারার কাজটি তাহাকে দেওয়া হইল।

এতদিন পরে কাজ যদি বা মিলিল তো সে বেয়ারার। কিন্তু দেবেশবাবু পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়া গেলেন, ও নিয়ে মিছিমিছি মন খারাপ ক'রো না ভায়া, বারো টাকা মাইনেতে কেরানী রাখা যায় কি ক'রে বল দেখি? সেইজন্যই ও কথাটা লিখেছে। তাছাড়া চিরদিনই কি তুমি এই বারো টাকা মাইনেতে কাজ করবে? ঢুকতে বেরোতে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা হলেই ভাল ক'রে নমস্কার ক'রো, আর নতুন বই কেনা হলেই ভাল ভাল বইগুলো আগে থাকতে খাতায় লিখে বড়বাবুর পরিবারের জন্যে গছিয়ে দিও—ব্যস্। হঠাৎ একদিন দেখবে যে চল্লিশ টাকা মাইনেতে পোঁছে গেছ—।

যাক্—ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া! দুই বেলা ভাল করিয়া আহার জোটে না যাহার, তাহার কাছে বেয়ারার চাকরিও অবহেলার বস্তু নয়।

অমল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাজে মন দিল। কাজও খুব কম নয়। বই জমা করা, বই বাছিয়া দেওয়া, পুনরায় সেগুলি মিলাইয়া তোলা, খাতাপত্র ঠিক করা—কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাহার যেন আর নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় রহিল না। লাইব্রেরীয়ান বাবু সেদিনও একবার মিনিট-পনেরোর জন্য দেখা দিয়া সরিয়া পড়িলেন, বলিলেন, একটা এস্টিমেট করতে করতে উঠে এসেছি, বুঝলে না, এখন যদি এখানে দেখতে হয় তো ওধারে রাত আটটা বেজে যাবে বাড়ি ফিরতে। তুমি চালিয়ে নিতে পারবে না আজকের দিনটা?

অমল রাজী হইতেই তিনি গৃহিণীর জন্য আর একখানা মোটা বই সংগ্রহ করিয়া নিমেষ মধ্যে সরিয়া পড়িলেন। অমল একলা থাকিতে মোটেই অনিচ্ছুক নয়, বরং ঐ মানুষটি থাকিলেই সে অস্বস্তি বোধ করিত। সব কাজ শেষ করিয়া যখন সে খাতাপত্র গুছাইয়া তুলিয়া রাখিল, তখন সন্ধ্যার খুব বেশী দেরি নাই। অফিসেব প্রায় সব বাবুই চলিয়া গিয়াছিলেন, শুধু যাঁহারা ক্যাশে কাজ করেন তাঁহারাই কয়েকজন তখনও হিসাব মিলাইতে ব্যস্ত। আর বসিয়াছিল তাহার বেয়ারাটা—সে আসিয়া ঘরের জানালা বন্ধ করিতে করিতে বলিল, বাবু আপনি তো ভূতের মত খাটছেন দেখছি, বারো টাকা মাইনেতে অত খাটেন কেন? আর ও-বাবু পঁচিশ টাকা বাড়তি পায় এই কাজের জন্যে—অথচ দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছে।

তাহার বারো টাকা মাহিনার সংবাদটা তাহা হইলে এই বেয়াবাটাও রাখে। লজ্জায় অমলের দুইটা কান হইতে যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল, সে কহিল, কী-ই বা করব ভাই, কাজ না ক'রে। শুধু শুধু বসে থেকেই বা লাভ কি?

বেয়ারাটা কহিল, কেন এলেন আপনি অত কম মাইনেতে? এত লেখাপড়া জানেন, অন্য কোন কাজ পেলেন না? আমিই তো আপনার চেয়ে বেশি মাইনে পাই।

অমল ম্লান হাসিয়া কহিল, অন্য কোন কাজ পেলে কি এখানে কেউ আসে জগন্নাথ? বারো টাকায় অন্তত দুটি খেতে পাবো তো?

জগন্নাথ বোধ হয় এতটা আশা করে নাই। সে লজ্জিত হইয়া কহিল, তা

বটে বাবু, মাপ করবেন, ওটা আমার বলাই অন্যায় হয়েছে।...আপনি কিছু ভাববেন না বাবু, বড়বাবুর জামাই রেসের দিন হলেই আমার কাছে টাকা ধার চাইতে আসে, ওকে দিয়েই আমি আপনার মাইনে ঠিক করিয়ে দেব—

অমল মোটা বই একখানা বগলে করিয়া অতি ধীরে ধীরে অফিসের সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিল। আজ সারাদিন ধরিয়াই তাহার মায়ের কথা মনে হইতেছে, কেমন আছেন তাঁহারা কে জানে। দশ-বারো দিন পরেই এ মাস কাবার, অন্তত অর্ধেক মাসের মাহিনা তো সে পাইবে, সেই টাকাটা একেবারে বাবার নামে মণিঅর্ডার করিয়া দিয়া সে মাকে চিঠি দিবে, মনে মনে সংকল্প করিল।

॥ পনেরো ॥

একটু অন্যমনস্কভাবেই অমল পথ চলিতেছিল, সহসা পিছন হইতে ডাক শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল গঙ্গাধরবাবু। সে একটু লজ্জিতই হইল কারণ সেই রাত্রির আশ্রয়ের পর আর একটি দিন মাত্র সে তাঁহার বাড়ি গিয়াছিল, আর কোন খবরই লওয়া হয় নাই। কিন্তু গঙ্গাধরবাবু কোনপ্রকার ভর্ৎসনার ধার দিয়াও গেলেন না, কাছে আসিতেই একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, কেমন আছ ভাই? ...নানা রকমে এমন জড়িয়ে রয়েছি, তোমার একদিন যে খবর নেব তাও পারি নি। বড্ড লজ্জিত আছি।

অমল হেঁট হইয়া, গঙ্গাধরবাবুর বাধা সত্ত্বেও, তাঁহার পায়ের ধুলা লইল, তাহার পর কহিল, অপরাধ আমারই দাদা, আমার মত বেইমান কেউ নেই—। আমারই যাওয়া উচিত ছিল।

জিভ কাটিয়া গঙ্গাধরবাবু কহিলেন, ছি ছি ওকথা কি বলতে আছে! আর তা ছাড়া তুমি যাও নি ভালই করেছ, আমরা এখন এই বৌবাজারেই আছি যে—

অমল বিস্মিতও হইল, ভীতও হইল, কহিল তার মানে? ও বাড়ি—

গঙ্গাধরবাবু জবাব দিলেন, না ভাই, সে আর নেই—মাস-তিনেক হ'ল গেছে।

অমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দেনাটার জন্যেই কি—

বেশ সহজভাবেই গঙ্গাধরবাবু উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ওরা নিলাম ক'রে নিলে। একরকম ভালই হয়েছে ভাই, একটু একটু ক'রে দগ্ধে মরার চেয়ে ও আপদ গেছে ভালই হয়েছে। কি বলব ভাই, রাত্রে দুশ্চিন্তায় ঘুম হ'ত না। বরং দেনা শোধ হয়েও ছশ' টাকা নগদ পেয়েছি, মেজ মেয়েটাকে যদি ওর মধ্যেই পার ক'রে দিতে পারি তো মন্দ হয় না—

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পথ চলিবার পর গঙ্গাধরবাবু কহিলেন, আমাদের কার্তিকের কি হয়েছে শুনেছ?

অমল ব্যস্ত হইয়া কহিল, কৈ না, কি হয়েছে?

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া গঙ্গাধরবাবু জবাব দিলেন, ওর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। শেষ ছেলেটা হবার পর থেকেই নানা অসুখে ভুগছিল, শেষে বাড়াবাড়ি হ'তে কলকাতায় নিয়ে আসতে হ'ল। বেচারীর ভয়ানক সাধ ছিল কলকাতায়

বাসা ক'রে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দিনকতক বাস করবে; বাসা জোগাড় হ'ল শেষ পর্যন্ত, কিন্তু ঘর করতে আর হ'ল না। চেয়ারে চড়ে বাড়িতে ঢুকল আর একেবারে খাটে চেপে বেরিয়ে গেল।

অমল নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিল। কী-ই বা কথা কহিবে সে! তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, বেচারী কার্তিকবাবু! একমাত্র রেসের নেশাতেই লোকটির সব গেল, কিন্তু মানুষটির যে হৃদয়ের পরিচয় সে পাইয়াছে, তাহার পর আর তাঁহাকে অবজ্ঞা করা চলে না। ভদ্রলোক এখন কি অবস্থায় আছেন কে জানে, স্ত্রীর জন্য তাঁহার যে গভীর আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রেসে বড়লোক হইয়া একেবারে ভাল বাড়িতেই স্ত্রী-পুত্রকে লইয়া আসিবেন, এই ইচ্ছা ছিল বলিয়াই কিছুতে আগে বাসা করিতে পারেন নাই। এখন নিশ্চয়ই তাঁহার অনুতাপের অবধি থাকিতেছে না।

গঙ্গাধরবাবুই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পুনশ্চ বলিলেন, শুধু কি তাই? আবার বিপদের ওপর বিপদ দেখ না, রেস খেলে খেলে একেই দেনাপত্তরে জড়িয়ে ছিল, তার ওপর এই দমকা খরচার মধ্যে এসে পড়ল। বিশেষ করে শেষের দিকটায় ওর তো আর জ্ঞান ছিল না, পাগলের মত হয়ে পড়েছিল একেবারে—ডাক্তার আর ওষুধ যেখানে যত ছিল, সব এনে জড়ো করেছিল—ব্যস্। সেই সময়টায় কোথা দিয়ে কি হয়ে অফিসের কতকগুলো টাকা ভেঙে ফেলে চাকরিটিও গেল।

অমল চকিত হইয়া কহিল, চাকরিও গেল? বলেন কি? তাহ'লে এখন উপায়?

গঙ্গাধরবাবু ম্লান হাসিয়া কহিলেন, উপায় ভগবান ভাই, আমাদের আর কি উপায় আছে বলো? সাহেব ভালবাসত বলে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকাটা পুরোই পেয়েছিল, এখনও তাইতে চলছে। তবে একটা বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছে, এখানকার বাসা তুলে ওর ভাইয়ের কাছে ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দেবার সময় ভাইয়ের হাতে বৌয়ের গয়নাগুলো আর হাজার টাকা নগদ দিয়ে দিয়েছে। বড় মেয়েটা মাথায় মাথায় হয়েছে, সেটাকে পার করতে পারবে, আর যাই হোক, বাকী ছেলেমেয়েগুলোকেও ভাই ফেলবে না। তাদের জন্য ভাবি না, ভয় ওর জন্যেই। সেই মেসেই আছে, হাতেও চার-পাঁচশ' টাকা ছিল জানি, হিসেব ক'রে চললে বছর দুই চলতে পারে, কিন্তু রেস না খেলে কি থাকতে পারবে?

সে সংশয় আর যাহারই থাক অমলের ছিল না। রেস তিনি খেলিবেনই এবং আগে যতটুকু বাধ ছিল এবারে বোধ করি তাহাও থাকিবে না। হয়তো ইতিমধ্যেই সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। সে কহিল, এর মধ্যে কতদিন কার্তিকবাবুর খবর পান নি দাদা?

গঙ্গাধরবাবু মনে মনে হিসাব করিয়া কহিলেন, প্রায় মাস দেড়েক হ'ল। বড্ড অন্যায় হয়ে যাচ্ছে বুঝি, কিন্তু মোটে সময় ক'রে উঠতে পাচ্ছি না। আজ যাবে ভাই? চল না বাসাটা ঘুরে আসি—

অমল ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, আমার ও মেসে যেতে একটু বাধা আছে দাদা।

নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া গঙ্গাধরবাবু কহিলেন, ঠিক ঠিক—আমারই ভুল বটে।···আচ্ছা আমি কাল যাব এখন। তুমি এখন চলো আমার বাসায়, একটু চা-টা খেয়ে যাবে—

তাঁহারা ততক্ষণে গঙ্গাধরবাবুর নূতন বাসার কাছেই আসিয়া পড়িয়াছেন। একটা তেতালা বাড়ির নিচে দুইটি ঘর লইয়া উঁহারা থাকেন, কতকটা ফ্ল্যাটের মতই, তাহারই ভাড়া মাসে আঠারো টাকা। তবু উহা আগেকার বাড়ির চেয়ে অনেকখানি পরিষ্কার, আলো-বাতাসও ঢের বেশী। তাহাকে দেখিয়া গঙ্গাধরবাবুর স্ত্রী স-কলরবে অভ্যর্থনা করিলেন, চা-জলখাবার তো দিলেনই, রাত্রের খাবারও না খাওয়াইয়া ছাড়িলেন না এবং বাহিরের রাস্তা পর্যন্ত আসিয়া বার বার মাথার দিব্য দিয়া দিলেন যে রবিবার যেন সে নিশ্চয়ই আসে এবং এইখানে আহার করে। আজ কোন যোগাড়ই ছিল না, কিছুই খাওয়া হইল না, ইত্যাদি ইত্যাদি—

পথে আসিয়া অমলের আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, এই জন্যই মানুষের ঘরের এত মায়া, বাসা বাঁধিবার ইচ্ছা তাহার এত প্রবল! গঙ্গাধরবাবুর স্ত্রী পৃথিবীতে অসংখ্য নাই সত্য কথা, কিন্তু ঐ যে দৈবাৎ এক-আধবার জীবনে ইঁহাদের সাক্ষাৎ মিলে, সেই কথাই মানুষ আর ভুলিতে পারে না, ইঁহাদের মায়া দুর্নিবার বেগে মানুষকে ঘরের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে।

গঙ্গাধরবাবু উপদেশ দিয়া দিলেন, ভায়া, বারো টাকা মাইনে মার্চেণ্ট অফিসে বাহাত্তর টাকা হতে বেশী দেরি হয় না, শুধু বড়বাবুর দিকে নজরটা রেখে যেও, আর সাহেব দেখলেই সেলাম ক'রো—

অমল যখন বাসায় পেঁ'ছিল, তখন প্রায় বারোটা বাজে, কিন্তু দূর হইতে নিজের ঘরে আলো জ্বলিতে দেখিয়া তাহার ভয় ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে প্রায় দৌড়িয়া ঘরে আসিয়া দেখিল, ইন্দু দ্বার খুলিয়া আলো জ্বালিয়া তাহারই বিছানাতে চুপ করিয়া শুইয়া আছে। ঘরের দ্বিতীয় চাবিটা যে এখনও তাহার কাছে আছে, অমল ভুলিয়াই গিয়াছিল।

ইন্দু ক্লান্ত সুরে কহিল, আপনি অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছেন অমলদা—

গলার আওয়াজটা অমলের ভাল লাগিল না, ইহা অন্তত ঠিক নববিবাহিত তরুণের মত নয়। সে বসিয়া পড়িয়া কহিল, কিন্তু আমি তো আপনাকে আশাই করি নি এর মধ্যে।

ইন্দু জবাব দিল, আজই সকালে এসেছি। বিকেলবেলা বেরোবার আগে ওখানে বলেই এসেছিলুম, আজ রাত্রে আমি আপনার কাছে থাকব। একটু থাকব অমলদা?

কী আশ্চর্য! আপনি পাগল হলেন নাকি? নিশ্চয় থাকবেন। কিন্তু আপনার খাবার ব্যবস্থা যে তার আগে করা দরকার।

ইন্দু হাত বাড়াইয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, থাক্ থাক্, আমার খাবার ইচ্ছাও নেই, দরকারও নেই বিশেষ। শ্বশুরবাড়িতে জলখাওয়া হয়েছে প্রচুর। কিন্তু আপনি?

অমল সংক্ষেপে গঙ্গাধরবাবুর কাহিনী বিবৃত করিয়া কহিল, কিন্তু তা হোক,

সামান্য কিছু নিয়ে আসি আপনার জন্যে।

ইন্দু কহিল, আনুন! বেশী কিছু আনবেন না কিন্তু, সত্যিই আমার খাবার ইচ্ছে নেই—

অমল খাবার আনিয়া খাবার ও জল সাজাইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিল। ছোট হ্যারিকেনের সামান্য আলোতে ইন্দুর মুখের যে চেহারাটা নজরে পড়িল, তাহাতে দুঃসংবাদের আভাস। ইন্দুও কথা কহিল না, নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করিয়া মুখ ধুইয়া আসিয়া আবার শুইয়া পড়িল। অমলও আলোটা নিভাইয়া দিয়া তাহার পাশে শুইয়া কহিল. তারপর, ব্যাপার কি বলুন দেখি—?

ইন্দু অনেকক্ষণ পর্যন্ত জবাব দিল না। সামনের দড়ির আলনায় খানকতক কাপড় টাঙানো ছিল, তাহার উপর রাস্তার গ্যাসের আলোর একটা রেখা আসিয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণের বাতাসে কাপড়টা মধ্যে মধ্যে দুলিতেছে, আর ফলে তাহার ছায়াটা যেন পিছনের দেওয়ালে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। দুজনেই কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিবার পরে অমল ইন্দুর দিকে পাশ ফিরিয়া তাহার বুকে একটা হাত রাখিয়া আবারও কহিল, কি হ'ল বলুন দেখি শেষ পর্যন্ত? কোনো মনোমালিন্য ঘটেছে কি?

ইন্দু আরও মুহূর্ত-দুই নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, সে সব কিছুই নয় অমলদা, আপনি যে মনোমালিন্যের কথা ভাবছেন, আপাতত তার কোন সম্ভাবনা নেই। ওরকম স্ত্রী বহু-ভাগ্যে মেলে—

তবে?

ইন্দু জবাব দিল, শ্বশুরমশায় যে বহুদিন ধরে লুকিয়ে রেস খেলছেন, সেটা অনেকেই জানত না। কিন্তু তার ফলে তাঁর হাতের নগদ টাকা সমস্তই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। টাকাটা গেলেও মেজাজটা যায় নি, মেয়ের বিয়েতে খরচার হাতটা কিছুতে কমাতে পারলেন না। কিন্তু সেটা কোথা থেকে নিতে হয়েছিল তা জানেন কি? অফিস থেকে।

অমল কথা কহিল না। এখনও সমস্তটা শোনা হয় নাই, কিন্তু যেভাবে মেঘ জমিয়াছে তাহাতে দুর্যোগটার পরিমাণ অনুমান করা কঠিন নয়। ইন্দুই একটু পরে পুনরায় কথা কহিল, তাতেও বিশেষ অসুবিধা হ'ত না, কারণ বহুকাল ধরেই অফিসের বাড়তি টাকা ওঁর জিম্মাতে থেকে আসছে, আর নগদ চার পাঁচ হাজার টাকার কম কোনও দিনই থাকে না।...সে টাকা কেউ দেখতেও চায় না, শুধু কাগজে কলমে তার হিসাবটা দেখেই সাহেবরা ছেড়ে দেন। সেই ভরসাতেই শ্বশুরমশায় তা থেকে তিন হাজার টাকা নিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, ভরসা ছিল যে এর মধ্যে কিছু কিছু ক'রে টাকাটা আবার শোধ ক'রে দেবেন, কেউ জানতে পারবে না।

ইন্দু চুপ করিল। অমল কহিল, তার পর?

ইন্দু একটু ম্লান হাসিয়া কহিল, তারপর আর কি, আমার বরাত। কখনও যা হয় নি আমার অদৃষ্টে তাই ঘটল। গত শনিবার হঠাৎ বড়সাহেব এসে টাকাটা

দেখতে চাইলেন। হয়তো তার মধ্যে আর কারুর হাতও ছিল, হয়তো কেউ খবরই দিয়ে এসেছিল সাহেবকে, যাই হোক—টাকাটা যখন সব দেখা গেল না, তখন তাঁরা মাত্র তিনটি দিনের সময় দিলেন। আর কোনও উপায় ছিল না ব'লেই শাশুড়ীর অসুখের খবর দিয়ে আমাদের আনানো হয়েছে ; শাশুড়ী ঠাকরুণের সব গহনা বিক্রী ক'রেও পাঁচশ টাকা কম পড়েছিল, আমার কাছে কমলার খানকতক গহনা ধার ব'লে চাওয়া হ'ল। সুতরাং আর্মলেট আর নেকলেস, দুটিই বেচারীকে খুলে দিতে হ'ল। আমারই চোখের সামনে পোদ্দার এসে ওজন ক'রে নিয়ে টাকা দিয়ে চলে গেল—

অমল খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া সান্ত্বনার সুরে বলিল, তা হোক, গেলই বা না হয় দুখানা গয়না। মনে করুন তাঁরা ও দুটো গয়না দেন নি—

ইন্দু হাসিল। অন্ধকারে সে হাসি ভাল দেখা গেল না, নিঃশব্দ হাসি, কিন্তু তবু অমল তাহা অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিল। ইন্দু বলিল, সবটা এখনও শোনেন নি যে!...টাকাটা শোধ ক'রে দিয়ে চাকরি যাবারই কথা। সাহেব ভালোবাসেন ব'লে সেটা কোনরকমে এড়ানো গেছে কিন্তু বড়বাবুর চাকরি আর ওঁকে করতে হবে না। মাইনেটাও একশ প'চাত্তরে নেমে এসেছে। সুতরাং যদিচ শ্বশুরমহাশয় এখনও মুখে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, কিন্তু ও-অফিসে কারুর চাকরি করে দেওয়া যে আর ওঁর পক্ষে সম্ভব হবে, এ বিশ্বাস আমার নেই—

আবারও বহুক্ষণ দুজনে নিস্তব্ধ হইয়া শুইয়া রহিল। মনে হইল যেন ঘরের মধ্যকার বাতাসটা ডেলা পাকাইয়া দুজনের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে, কাহারও কথা কহিবার সাধ্য নাই—

অনেকক্ষণ পরে অমলই ভাষা খুঁজিয়া পাইল। কহিল, দেখুন এখন নামিয়ে দিলেও সাহেবরা যে সব বাবুকে ভালবাসে, চট্ ক'রে তাদের ওপর থেকে স্নেহটা যায় না, আপনার শ্বশুরমশায় আবার রাইজ করবেনই। তা ছাড়া তাঁর নিজের প্রোমোশন পাওয়া সম্ভব না হ'লেও ব'লে ক'য়ে তাঁর জামাইকে কি আর কোথাও ঢুকিয়ে দিতে পারবেন না? আমার তো মনে হয় সেটা এমন কিছু অসম্ভব হবে না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইন্দু জবাব দিল, কে জানে কি সম্ভব হবে আর কী হবে না! কিন্তু আমি তো মনে কোন বল পাচ্ছি না।

তাহার পর সহসা অমলের দিকে পাশ ফিরিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, কী হবে অমলদা। আমার যে কী ভয় হচ্ছে কী বলব আপনাকে। কেন এ কাজ ক'রে বসলুম তাই ভেবে অনুশোচনায় মরে যাচ্ছি, সুবিধে কিছুই হ'ল না বরং আরও দুর্ভাবনা বাড়ল। বেশ ছিলুম আপনার কাছে, কেন এ দুর্মতি হ'ল কে জানে! পেলুম না কিছু—উপরন্তু, আগে স্বাচ্ছন্দ্য না থাক শান্তি ছিল, এখন সে শান্তিটুকুকেও বিদায় দিতে হ'ল।

অমল সান্ত্বনা দিবার জন্যই কতকটা তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, কিছুই কি পেলেন না? একটি মেয়ের ভালবাসা কি তাহ'লে এতই তুচ্ছ জিনিস ইন্দুবাবু?

লজ্জিত হইয়া ইন্দু জবাব দিল, তা বটে। সেটা তুমি করবার জিনিস নয় মানি, আর ভগবানের ইচ্ছেয় সেটা পেয়েছিও অজস্র। কিন্তু বড্ড দুর্ভাবনা অমলদা—

আর কেহই কথা কহিল না।

ঘরের মধ্যে নিবিড় নিস্তব্ধতা, বাহিরেও প্রায় তাহাই; শুধু একটা রাস্তার কল কে দড়ি বাঁধিয়া খুলিয়া রাখিয়াছে, সারারাত্রি ধরিয়া তাহারই একটা একটানা জল পড়ার শব্দ, আর দূরে, প্রশস্ততর রাজপথে কদাচিৎ এক-আধখানা গাড়ি চলার আওয়াজ, ইহা ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নাই; সমস্ত শহর যেন মরিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তবুও সেই দুটি তরুণের কিছুতেই নিদ্রা আসিল না, সেইরূপ আলিঙ্গনাবন্ধ অবস্থাতেই দুজনে সারারাত জাগিয়া কাটাইয়া দিল।

॥ ষোলো ॥

পুরা মাস কাজ করে নাই বলিয়া অমল সে মাসে মাহিনা পাইল মাত্র নয় টাকা সাত আনা। ইহার মধ্য হইতেই লাইব্রেরীয়ানকে পাঁচ টাকা দিবার কথা, কিন্তু সে সাহসে ভর করিয়া তিনটি টাকা তাঁহার সামনে রাখিয়া কহিল, এই তিনটি টাকাই নিন মনোমোহনদা, বড্ড টানাটানি, এর বেশী দিলে আর খেতে পাব না।

কিন্তু মনোমোহনবাবু কি কারণে সেদিন বেশ খোশমেজাজেই ছিলেন, প্রসন্ন মুখে টাকা তিনটি পকেটে তুলিয়া বলিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তার জন্যে কি হয়েছে। তা ছাড়া তুমি আসায় আমার ঝঞ্ঝাটও অনেক কমেছে। কিছু ভেবো না তুমি ভায়া, নেক্‌স্‌ট্‌ ইনক্রিমেণ্টের সময়ে অন্তত তিনটে টাকা মাইনে যাতে তোমার বাড়ে, তার জন্যে প্রাণপণে ফাইট করব।

পরের দিন অফিসে আসিবার সময় পোস্ট অফিসে ঢুকিয়া অমল পাঁচটি টাকা বাবার নামে মণি অর্ডার করিয়া দিল। তাহার পর সেইখানে দাঁড়াইয়াই পেন্সিল দিয়া মাকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিল। এতদিন পরে সে বড় অফিসে চাকুরি পাইয়াছে সে কথা জানাইয়া লিখিল, এখন কিছুদিন শিক্ষানবিশ থাকতে হবে বলে মাইনে খুবই কম, এরপর ভাল মাইনে পাব, আশা আছে।

একদা তাঁহাদের অল্প মাহিনার মাস্টারীকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়া আজ বারো টাকা মাহিনাতে শিক্ষিত বেয়ারার কাজ করিতেছে, সে কথাটা জানাইতে তাহার লজ্জা বোধ হইল।· ·

দিন পাঁচেক পরে বাসায় ফিরিয়া দেখিতে পাইল একখানা খামে-আঁটা চিঠি মেঝেতে পড়িয়া আছে। এতদিন পরেও তাহার বাবার সুন্দর হাতের লেখা চিনিতে দেরি হইল না। সে তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া সেই অবস্থাতেই খাম ছিঁড়িয়া চিঠিটা বাহির করিয়া পড়িতে বসিল; সামান্য কয়েক ছত্র চিঠি—কিন্তু তাহারই মধ্যে বহুদিনের ইতিহাস, বহু বেদনা ও অভিমান জমিয়া আছে নিশ্চয়ই!

চিঠিতে লেখা ছিল—

"কল্যাণীয়বরেষু—

তোমার পত্র এবং টাকা দুইই পাইয়াছি। কিন্তু তুমি চিঠি যাঁহাকে লিখিয়াছ, তাঁহার কাছে সে চিঠি পৌঁছানো আর সম্ভব নয়, কারণ আজ তিন মাসেরও অধিক হইল তিনি স্বর্গে গিয়াছেন।”

অকস্মাৎ অমলের চোখের সম্মুখে সমস্তটা লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। তাহার মা নাই! মা মারা গিয়াছেন? সে লাইনটি আবারও একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিল, না ভুল তো হয় নাই। তাহার বাবা পরিহাস করিবারও লোক নহেন, সত্যই তাহার মা আর নাই।

নিস্তব্ধভাবে কেরোসিনের আলোটার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার মন ফিরিয়া গেল একেবারে তাহার বাল্যকালে। দারিদ্র্যের মধ্যেই চিরকাল তাঁহাকে সংসার করিতে হইয়াছে, চতুর্দিকে অভাব অনটন, তাহার উপর দিনরাত হাড়ভাঙা খাটুনি সুতরাং খুব একটা কিছু লোক-দেখানো স্নেহ তিনি অমলকে কোন দিনই দেখাইতে পারেন নাই ; আরও পাঁচটা ছেলেমেয়ে তাঁহার ছিল, সকলের সঙ্গেই তিনি অমলকে মানুষ করিয়াছেন। সকলের প্রতি নিছক কর্তব্যটুকু পালন করিতেই দিনেরাতে কুড়ি ঘণ্টা সময় চলিয়া যাইত, কাজেই বিশেষ স্নেহের দাবি অমল করিতেও পারে না—কিন্তু তবু, তবু সে ভালবাসার কি তুলনা আছে?

ম্যাট্রিক পরীক্ষার দিন বারো-চৌদ্দ আগে হঠাৎ অমলের প্রবল জ্বর হয়, সেই সময়ে সংসারের কাজও ছিল খুব বেশী, তবু অমলের বেশ মনে আছে, প্রতিটি কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে তিনি পাঁচ-সাত মিনিট অন্তরই কাছে আসিয়া বসিয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া যাইতেন, সাগু খাওয়ানো হইতে শুরু করিয়া বারে বারে তৃষ্ণার জল দেওয়া অবধি তাহার সেবার কোন কাজই তিনি অপর কাহাকেও করিতে দেন নাই। শুধু কি তাহাই? যে দুই দিন অমলের বেশ জ্বর ছিল, সেই দুই দিনই রাত্রে তিনি তাহাকে ছেলেমানুষের মত বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া সারারাত বসিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন, সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরও একটি মিনিটের জন্য চোখ বোজেন নাই।

আরও ছেলেবেলাকার প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনা মাথার মধ্যে যেন ভিড় করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ এতদিন পরে সে যেন অনুভব করিল, তাঁহার মায়ের স্নেহ তাঁহার প্রথম সন্তানের প্রতিই বোধ হয় একটু বেশী ছিল।

ততক্ষণে তাহার প্রথম স্তম্ভিত অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে, বুক হইতে একটা কি যেন ঠেলিয়া চোখ দিয়া মুখ দিয়া বাহির হইতে চায়। তাহারই অব্যক্ত বেদনায় কপালের শিরাগুলা টন টন করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। তবুও সে প্রাণপণে চোখ মেলিয়া চিঠিটার বাকী অংশটুকু পড়িয়া ফেলিল।

“তুমি নিরুদ্দিষ্ট হইবার পর হইতেই তাঁহার মন ভাঙ্গিয়া পড়ে—সঙ্গে সঙ্গে দেহও। তাহার পর তোমার মাসীমার নিকট হইতে যখন তোমার সংবাদ পাওয়া গেল তখন তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেও সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক অবস্থায় আর কিছুতেই ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না। সেই সময় হইতে নানারূপ রোগে

ভুগিয়া অবশেষে গত অগ্রহায়ণ মাসে সকল জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন। মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে একবার দেখিবার জন্য তাঁহার খুবই ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তোমাকে সে সংবাদ জানানো সম্ভব হয় নাই। তোমার পূর্ব ঠিকানার চিঠি দিয়াছিলাম, সে চিঠি ফেরত আসায় বুঝিলাম, তুমি ওখানে নাই। তোমার মায়ের শেষ-কৃত্য অগত্যা খোকাকেই করিতে হইয়াছে।

প্রায় বৎসর খানেক হইল আমি চাকরি ছাড়িয়া ঘরে বসিয়া আছি। আমার মাথার মধ্যে খুবই যন্ত্রণা হইত, বোধ হয় তোমার মনে আছে, সেই যন্ত্রণাই ইদানীং এত বাড়িয়াছে যে, ছেলেপড়ানো আর আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এখানে সরকার বাবুরা হাটের কাছে একটা চাল-ডাল-কড়াইয়ের গোলা খুলিয়াছেন, খোকা সেইখানেই কাজ করে, কুড়ি টাকা মাহিনা হইয়াছে। তাহাতেই সংসার চলে। পুঁটি, বুড়ী দুইজনেই ভাল আছে ; টাকার অভাবে কাহারও বিবাহের ব্যবস্থা করা যায় নাই। ঘেঁটু এখানকার স্কুলে পাস করিয়া বসিয়া আছে, অর্থাভাবে তাহাকেও আর স্কুলে দিতে পারি নাই।

আশা করি তুমি কুশলেই আছ। যদি সম্ভব হয় একবার বাড়িতে আসিও, কারণ আমারও যাবার আর দেরি নাই বলিয়াই বোধ হয়। আমার আশীর্বাদ জানিও, তোমার মাতাও মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে আশীর্বাদ জানাইয়া গিয়াছেন। ইতি—

আশীর্বাদক
তোমার বাবা"

চিঠিখানা পড়া শেষ হওয়ার পরেও বহুক্ষণ অমল ঠিক সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর গভীর রাত্রে কোনমতে উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। এতক্ষণ পরে তাহার দুই চক্ষু প্লাবিয়া বহুক্ষণের নিরুদ্ধ বেদনা অশ্রুর আকারে বাহির হইতে শুরু করিয়াছে। সে বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল—নিঃশব্দ, কিন্তু বুকফাটা কান্না। এ শুধু তাহার মাতৃবিয়োগের ব্যথা নয়, তাহার জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা, সমস্ত বেদনা এই উপলক্ষে আবার নূতন করিয়া তাহাকে যেন পীড়া দিতে লাগিল।

পরের দিন সকালে উঠিয়াই অমল গঙ্গার ধারে চলিয়া গেল। সে শুনিয়াছিল যে, যতদিন পরেই হউক, কানে শুনিলেই মহাগুরু নিপাতের অশৌচ লাগে। সে নাপিত ডাকিয়া মাথা গোঁফ সব কামাইয়া গঙ্গাস্নান করিল, তাহার পর ঘাটের ধারে হইতে একজন ব্রাহ্মণ ডাকিয়া তাঁহার হাতে একটা টাকা দিয়া একটা ভোজ্যের ব্যবস্থা করিয়া যথারীতি মায়ের পারলৌকিক কার্য সম্পন্ন করিল। এটুকু না করিলে কিছুতেই তাহার শান্তি হইত না ; ইহার কোন ফল আছে কি না আছে, তাহা লইয়া সে মাথা ঘামাইতে চাহে না, তবে জীবিতকালে তো মায়ের সে কোন উপকারেই আসিল না, সে ভাবিয়া দেখিল, মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতির প্রতি এই শেষ সম্মানটুকু না দেখাইলে মনে মনে একটুও স্বস্তি পাইবে না।

সেদিন আর রান্না করার সময়ও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না ; সামান্য কিছু ফল ও এক প্লাস শরবৎ খাইয়াই সে আফিসে বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু সেই দিনই আফিসের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে সহসা তাহার বড়বাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। ইনি দেবেশবাবুর সেকশনের বড়বাবু বটে, কিন্তু ছোট সাহেবের পেয়ারের লোক বলিয়া আফিসে ইঁহার প্রতিপত্তিটাই বেশী। সেই-জন্যেই হউক, আর চাকরি করিয়া দিবার কৃতজ্ঞতাতেই হউক, অমল দেখা হইলেই তাঁহাকে ভক্তিভরে নমস্কার করিত। সে নমস্কার করিয়াই উঠিয়া যাইতেছিল, সহসা তাহার মুণ্ডিত মস্তক, শুষ্ক মুখ ও আরক্ত চক্ষুর দিকে দৃষ্টি পড়ায় বড়বাবু তাহাকে ডাকলেন, কহিলেন, এসব কি ব্যাপার হে ?

মুহূর্ত কয়েক ইতস্তত করিয়া অমল আসল কথাটাই বলিয়া ফেলিল, মা মারা গেছেন।

তারপর বড়বাবুর চোখে বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া সে নিজেই বলিল, অনেকদিন আগেই চাকরির খোঁজে কলকাতাতে এসেছিলুম কিন্তু কাজকর্ম কিছুই জোটাতে পারি নি ব'লে আর দেশে খোঁজ-খবর দিই নি। এতদিন পরে এ মাসের মাইনে পেয়ে মায়ের নামে পাঁচটি টাকা পাঠিয়েছিলুম, তারই জবাবে কাল দেশ থেকে চিঠি এসেছে যে মা মাস-তিনেক হল মারা গেছেন।

কথাটা বলিতে বলিতেই তাহার দুইচোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। বড়বাবুরও দৃষ্টিটা কোমল হইয়া আসিল, তিনি কহিলেন, তাই বুঝি ঘাটে গিয়ে অশৌচটা কাটিয়ে এলে। তা ঠিকই করেছ। এখন তোমার দেশে রইলেন কে কে ?

অমল জবাব দিল, বাবা আছেন, তিনি সামান্য ইস্কুলমাস্টারী করতেন, তাও অথর্ব হয়ে পড়ায় ছেড়ে দিতে হয়েছে। মেজো ভাইটি একটা মুদীর দোকানে খাতা লিখে যা পায় তাইতেই সংসার চলে। আর আছে দু-দুটি বোন, আরও একটি ভাই। কিন্তু না-বোনদের বিয়ে, আর না-ভায়ের লেখাপড়া, কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না।

বড়বাবু একবার অস্ফুটস্বরে শুধু বলিলেন, ইস !……

তাহার পর মিনিটখানেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। অমলও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া লাইব্রেরীতে আসিয়া ঢুকিল। সেদিন তাহার আর কোনও কাজে মন লাগিল না, চুপ করিয়া নিজের চেয়ারটায় বসিয়া খোলা জানালার মধ্য দিয়া দূর আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। বেয়ারাটা তাহাকে ঐ অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল, কিন্তু তাহার চোখের দিকে চাহিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। বহুক্ষণ, প্রায় দুই ঘণ্টাকাল, সে সেইভাবেই বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

বেলা আড়াইটা নাগাদ দেবেশবাবু প্রায় লাফাইতে লাফাইতে ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার মুখে চোখে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে। কহিলেন, কি বলেছ হে মাস্টার, বড়বাবুকে ?

অমল চমকাইয়া উঠিল। একটু ভীতভাবেই বলিল, বড়বাবুকে ? কী বলেছি ?

দেবেশবাবু কহিলেন, আরে নাও, কি বলেছ তাই তো জিজ্ঞেস করছি। হঠাৎ বড়বাবু তোমার ওপর এত সদয় হয়ে উঠল কেন?

তাহার পর সহসা তাহার চেহারার দিকে নজর পড়ায় কহিলেন, এ কি, এসব কি ব্যাপার হে?

অমল সংক্ষেপে তাঁহাকে কথাটা খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া দেবেশবাবুর ছোট ছোট চোখ দুটি করুণার্দ্র হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, ইস! আহা বেচারী! তাই তুমি আজ সকালে পড়াতেও যাও নি বটে। আমার অতটা খেয়াল ছিল না। আর ছেলেগুলোও হয়েছে তেমনি। সেজন্যে তো ওদের মাথা-ব্যথা নেই! মাস্টার আসে নি তো ওরা বেঁচেছে, সেকথা আমাকে একবার বলেও না!

...তা তোমার সঙ্গে বড়বাবুর দেখা হয়েছিল বুঝি, এই অবস্থায়?

অমল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হ্যাঁ। তিনিও ব্যাপারটা কি জানতে চাইলেন, তাই তাঁকে সব কথাই খুলে বলেছিলুম।

পিঠে একটা চাপড় মারিয়া দেবেশবাবু কহিলেন, ভালই করেছ ভায়া; মা মরে তোমার শাপে বর হল!...বড়বাবু গিয়েই ছোট সাহেবের ঘরে ঢুকেছিল, আর তার ফলে কি ব্যবস্থা হয়েছে জান?

অমল বিস্মিত হইয়া কহিল, কৈ না তো!

দেবেশবাবু কহিলেন, আজ থেকে তুমিই লাইব্রেরীর সমস্ত চার্জ পেলে, আর সেইজন্যে তোমার মাইনেও বেড়ে একেবারে ত্রিশ টাকা হয়ে গেল। এ মাসের পয়লা থেকেই বাড়তি মাইনের হিসেব ধরা হবে।

অমল উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু মনোমোহনবাবু?

দেবেশবাবু বলিলেন, ঐ মনোমোহনেরই যা একটু অসুবিধা হল। অবিশ্যি খুব বেশী অসুবিধা হতে বড়বাবু দেয় নি, বাড়তি যে পঁচিশটে টাকা পাচ্ছিল সেটা গেল বটে, কিন্তু তেমনি পনেরো টাকা স্পেশ্যাল ইন্‌ক্রিমেণ্ট পেলে। মরুক গে, মনোমোহনের ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, ও অনেক টাকা মাইনে পায়। তুমি এখন চল, বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে আসবে।

বাড়বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়া কিন্তু অমলের কণ্ঠে কোন কৃতজ্ঞতার ভাষা আসিল না। সে শুধু একটা নমস্কার করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তবে তাহার দৈন্য সম্পূর্ণরূপেই ঢাকিয়া লইলেন দেবেশবাবু; কহিলেন, ছোকরা শুনেই কেঁদে ফেলে দিলে, বললে, বড়বাবু গেল-জন্মে আমার কেউ ছিলেন দেবেশবাবু, নইলে এমন উপকার কেউ করে না!...তা আজ যা করলেন বড়বাবু, এ শুধু আপনাতেই সম্ভব। একটা ফ্যামিলিকে বাঁচালেন।

বড়বাবু হাসিলেন; কহিলেন, কী জান দেবেশ, আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, বি. এ, এম. এ পাস তো করি নি, কেউ কষ্টে পড়েছে শুনলেই আমরা আর স্থির থাকতে পারি না। তা যাও হে ছোকরা, মন দিয়ে কাজকর্ম কর গে! দেশে বাপকে চিঠি লিখে দাও বরং—তিনি যেন ভাইগুলোর লেখাপড়ার একটা ব্যবস্থা করেন।

অমল লাইব্রেরী ঘরে গিয়া সর্বাগ্রে তাঁহারই আদেশ পালন করিল। বাবাকে

চিঠি লিখিয়া দিল, তিনি যেন পত্রপাঠ ঘেঁটুকে হাইস্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। অতঃপর হইতে সে প্রতি মাসেই দশ-বারো টাকা পাঠাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। তাহাতে ঘেঁটুর পড়ার খরচটা অন্তত চলিয়া যাইবে।...আর আগামী মাসের মাহিনা পাইলে সে দেশে গিয়া বাবাকে দেখিয়া আসিবে, সে কথাও লিখিয়া দিল।

চিঠি লেখা শেষ করিয়া চোখ বুজিয়া চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিতেই তাহার মনের সামনে ভাসিয়া উঠিল তাহার মায়ের স্নেহমাখানো চক্ষু দুইটি। তাঁহার সে দৃষ্টি হইতে যেন করুণা ও আশীর্বাদ ঝরিয়া পড়িতেছে। ঘেঁটু মায়ের শেষ সন্তান, তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিলে মা স্বর্গে থাকিয়াও প্রসন্ন হইয়া উঠিবেন নিশ্চয়।

॥ সতেরো ॥

ইতিমধ্যে কয়েকদিন আর ইন্দুর খোঁজখবর পায় নাই। এ কথাটা বরাবরই অমলের মনকে পীড়া দিতেছিল। কিন্তু আরও তিন চার দিন পরে সে রীতিমত চিন্তিত হইয়া উঠিল। সেদিন রাত্রে সেই যে সে আসিয়াছিল, তাহার পর আর দেখা করে নাই কিংবা কোন চিঠিও দেয় নাই। এক্ষেত্রে কী করা উচিত তাহা অমল ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার শ্বশুরবাড়ির ঠিকানাটা সে জানিত, কিন্তু সেখানে খোঁজ করিতে যাওয়া উচিত হইবে কিনা ভাবিয়া পাইতেছিল না। অবশেষে রবিবার দিন পর্যন্ত যখন কোন খবর মিলিল না, তখন আর সে স্থির থাকিতে পারিল না, ইন্দুর শ্বশুরবাড়ীর উদ্দেশ্যেই যাত্রা করিল।

পানিহাটির কাছাকাছি একটা কলে তিনি চাকরি করিতেন, আর তাহারই কাছাকাছি তাঁহার বাড়ি—এইটুকু শুধু তাহার জানা ছিল, এবং কলটার নামও সে জানিত। সেই ঠিকানা সম্বল করিয়াই বহু পথ হাঁটিয়া এবং কিছু বাস ভাড়া দিয়া অপরাহ্ণ নাগাদ সে ইন্দুর শ্বশুরবাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিল।

শ্বশুর মহাশয় বাহিরেই বসিয়াছিলেন, অন্তত অমলের তাঁহাকেই ইন্দুর শ্বশুর বলিয়া মনে হইল। বাগানের মধ্যে একটি ইজিচেয়ার পাতিয়া তিনি চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিলেন। অমলের প্রশ্নের উত্তরে তিনি একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চাহিলেন, তাহার পর পুনশ্চ জবাব দিলেন, সে এখন বাড়ি নেই।

অমল বোধ হয় ঠিক এটা আশা করে নাই। সে খানিকটা ইতস্তত করিয়া কহিল, কখন আসবে বলতে পারেন?

তিনি এবারেও চোখ চাহিলেন না, সেই অবস্থাতেই জবাব দিলেন, আমি কেমন ক'রে জানব, সে কি আর কাউকে বলে যায়?

আরও মিনিটখানেক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অমল ধীরে ধীরে চলিয়া আসিতেছে, এমন সময় তিনি চোখ মেলিয়া চাহিলেন, অকস্মাৎ উত্তপ্ত-কণ্ঠে কহিলেন, সে মশাই দয়া ক'রে এখানে বাস করে, বুঝলেন? যেটুকু না থাকলে নয় সেইটুকু থাকে, বাকি সময় কোথায় যায়, কী করে তা সেই জানে। আমরা সব

হয়েছি তার শত্রু, জানেন—জীবন শত্রু।

এ কথার আর কি জবাব দিবে, সে চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। আরও খানিকটা পরে তিনি অমলের মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত নরম সুরে কহিলেন, আপনি কি তার বন্ধু?

অমল নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িল।

তিনি কহিলেন, আপনার মুখটাও যে চেনা-চেনা বলে বোধ হচ্ছে। বোধ হয় বিয়েতেই দেখে থাকব। বসুন!

তাঁহার পাশের টুলটা দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, শ্বশুর বুঝলেন, আগাগোড়াই চোর! পান থেকে চুন খসেছে কি অমনি জামাইয়ের হয়ে গেল মেজাজ খারাপ।··· কার দোষ দেব বলুন, কালের ধর্মই হ'ল এই।···একটু চা আনতে বলি, কী বলুন?

অমল কহিল, থাক—আমি চা খাই না।

বিলক্ষণ। চা না হয় না-ই খেলেন, আমি তো আপনাকে এমনি ছেড়ে দিতে পারি না। এক মিনিট বসুন, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। একেই তো জামাইয়ের মন পাওয়া দায়, তার ওপর—

আপন মনেই বকিতে বকিতে তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং মিনিট দুই পরে ফিরিয়া আসিয়াই আবার বলিতে শুরু করিলেন, ছেলে বলুন, জামাই বলুন, মেয়ে বলুন—সবই টাকার সঙ্গে সম্পর্ক! আপনি টাকা রোজগার ক'রে তাদের খাওয়ান, পরান, দেখবেন সবাই আপনাকে ভালবাসবে, যে মুহূর্তে হাত গুটোবেন অমনি সবাই পর!

অমল চুপ করিয়াই রহিল। ভদ্রলোক কী গভীর বেদনায় এতটা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা অনুভব করিয়া তাহার বসিয়া থাকিতেও কষ্টবোধ হইতেছিল, কিন্তু উঠিয়া যাইবারও উপায় ছিল না। সে একটু পরে বলিল, কিন্তু হাত গুটোবার অবস্থা তো আপনার নয়, আপনার আর সেজন্যে চিন্তা কি বলুন!

অকস্মাৎ তিনি যেন জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, তার মানে? আমাকে ঠাট্টা করছেন?

ব্যাকুল হইয়া অমল কি প্রতিবাদ করিতে গেল, কিন্তু তিনি সে অবসরই দিলেন না, আপনি তার বন্ধু, আপনি কি শোনেন নি সব বলতে চান? এই যে সে দুবেলা দুমুঠো খেয়েই কোথায় কোথায় ঘোরে তা কি আমি জানি না মনে করেন? যেখানে যত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আছে সকলের কাছেই কি আমার নিন্দে করে বেড়াচ্ছে না বলতে চান? কী করব বলুন, অদৃষ্টদোষে আজ জোচ্চোর হয়ে পড়েছি—সবই সইতে হয়! আর আপনাদের দোষ দেব কি, যে বেটারা চোখের দিকে চোখ তুলে চাইতে সাহস করত না, তারাই কত টিটকিরি মেরে যাচ্ছে—হুঁ!

ততক্ষণে জলখাবারের থালা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আয়োজন প্রচুর, সেদিকে চাহিয়া অমল ভীত হইয়া উঠিল। সে করজোড়ে কহিল, দেখুন, এত কি কখনও খাওয়া যায়? আপনিই বলুন।

তিনি যেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। তারপর কহিলেন, নিজের মেয়ে জামাইয়ের কাছে জোচ্চোর বনে গেছি এতে কি আমার কম কষ্ট হচ্ছে মনে করেন? আমি কি চেষ্টা করছি না কিছু—কিন্তু মেয়ে জামাই-ই যদি প্রতিনিয়ত এমন ভাবে গঞ্জনা দেয়, তাহ'লে কেমন ক'রে বাঁচি বলুন দেখি?

অমল হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া কহিল, আমাকে মাপ করবেন, আপনি আমারও বাবার মত, আমি না বুঝেই একটা কথা বলে ফেলেছি, এতটা ভাবি নি কিছু! ও নিয়ে আর মিথ্যে মিথ্যে মন খারাপ করবেন না—

তিনি তাহার হাত দুইটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, ছিঃ ছিঃ বাবা, তুমি কেন 'কিন্তু' হচ্ছ, আমারই মাথার ঠিক নেই—যা তা বলছি। বড় অন্যায় হ'ল কিন্তু—

তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছিল। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া কহিলেন, জামাইয়েরও আমি দোষ দিচ্ছি না বাবা! তবে তাকে বুঝিয়ে ব'লো যে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি, সে যেন আর ক'টা দিন আমাকে মাপ করে—সে আর কমলা দু'জনেই মুখ ভার ক'রে ঘুরে বেড়ায়, কি কষ্টই যে হয় বাবা আমার কি বলব, যেন বুক ফেটে যায়!

এতক্ষণে তাঁহার জলখাবারের থালাটির দিকে নজর পড়িল, তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন দ্যাখো, আবোল-তাবোল কি বকে মরছি, তুমি যে খেতে শুরুই করো নি এখনও। না-না, ওসব কোন কথা আমি শুনব না, ও সমস্তগুলোই তোমাকে খেতে হবে। কমলাই সব নিজে হাতে সাজিয়ে দিয়েছে।

অমল নতমুখে খাবারগুলি খাইতে লাগিল। কমলার সহিত দেখা করিতে পারিলে মন্দ হইত না, ইন্দুর খবর হয়তো পাওয়া যাইত, কিন্তু লজ্জায় সে কথা সে ইঁহার কাছে বলিতে পারিল না। খাবার সে প্রায় সবগুলিই খাইল, কমলা, নিজ হাতে সাজাইয়া দিয়াছে শুনিয়া আর কোনটাই যেন তাহার ফেলিতে ইচ্ছা হইল না।

খাওয়া শেষ করিয়া পুনশ্চ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে তিনিও উঠিয়া পড়িলেন, তাহার দুই কাঁধে দুটি হাত রাখিয়া অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে কহিলেন, তুমি তাহ'লে ওকে একটু বুঝিয়ে ব'ল বাবা! কমলা বলছিল তুমি নাকি তার বিশেষ বন্ধু, তোমাকে সে খুব ভক্তি করে।

নিশ্চয়ই বলব।

অমল তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা পার হইয়া বড় রাস্তায় পড়িয়া সে বাসের অপেক্ষা করিতেছে এমন সময় একটি বছর আষ্টেক-দশের ছেলে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তাহার হাতে একটি চিঠি দিল, কহিল, দিদি এই চিঠিটা আপনাকে দিতে বললে।

অমল চাহিয়া দেখিল অবিকল কমলার মুখ, তাহারই ছোট ভাই নিশ্চয়। তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলিতে গিয়া তাহার হাতটা যেন একটু কাঁপিয়া গেল। কিন্তু দেখিল সামান্য দুই-ছত্র মাত্র চিঠি—

"সে কাজকর্মের চেষ্টায় চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনার কথা তাকে

“বলবে, আপনার সঙ্গে দেখাও করতে বলবে। ব্যস্ততার জন্য কিছু মনে করবেন না। প্রণাম নেবেন।”

কোন সম্বোধন নাই, অন্য কোন সম্ভাষণও নাই ; কিন্তু সেই আঁকাবাঁকা হাতের লেখা। তাহার মন মুহূর্তের জন্য সেই প্রথম চিঠিখানি আসার দিনে চলিয়া গেল। সে অন্যমনস্কভাবে শুধু কহিল, আচ্ছা। কিন্তু কমলার ভাই চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল তাহাকে কোন কুশল সম্ভাষণ পর্যন্ত করা হইল না কিংবা কমলার কথাও কিছু জিজ্ঞাসা করা হইল না। ফিরিয়া দেখিল ছেলেটি অনেকদূরে চলিয়া গিয়াছে, তখন আর তাহাকে ডাকা যায় না।

চিঠিখানা বুক পকেটে গুঁজিয়া আবার পথ চলিতে শুরু করিল। সে যে ‘বাস’-এর জন্য দাঁড়াইয়া ছিল, সে কথাও সে ভুলিয়া গেল। সে ভাবিতেছিল কমলার কথা, যতদূরে দৃষ্টি যায় কোন আসক্তির চিহ্ন তো সে মনের মধ্যে খুঁজিয়া পায় না, তবে তাহার চিঠি খুলিতে গিয়া এমন হাত কাঁপে কেন? কেন তাহার কথা শুনিলে বুকের রক্ত এমন করিয়া চঞ্চল হইয়া ওঠে? এ তাহার কী অদ্ভুত অবস্থা?

হাঁটিতে হাঁটিতে শ্যামবাজারের মোড়ে যখন উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তখন আর হাঁটিবার ইচ্ছাও ছিল না, শক্তিও ছিল না। সে সেইখান হইতেই বৌবাজারগামী একটা বাসে উঠিয়া পড়িল। ভাগ্যক্রমে বাসে উঠিয়া সে যাঁহার পাশে বসিল তিনি তাহার সেই আগেকার মেসের নগেনবাবু উকিল ; তিনি থাবার মত একটা হাত তাহার কাঁধে রাখিয়া উপর্যুপরি প্রশ্ন করিয়া চলিলেন, কী হে ভায়া, কতদূর যাবে? এখন আছ কোথায়? কি করছ? চাকরি-বাকরি করছ নাকি কোথাও?

অমল বিস্মিত হইয়া দেখিল, ইতিমধ্যে তিনি যেন অনেকটা বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। বেশভূষার অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়, কোটটি তো প্রায় শতছিন্ন। সে তাঁহার অন্য সমস্ত প্রশ্নগুলি এড়াইয়া গিয়া কহিল, হ্যাঁ, মাস কতক হল একটা বিলিতি ফার্মে কাজ পেয়েছি। আপনার খবর সব ভাল তো? এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন?

নগেনবাবু কহিলেন, এদিকে এই পাইকপাড়া এস্টেটে একটা কাজ করছি যে।

অমল বিস্মিত হইয়া কহিল, সে কি? ওকালতি ছেড়ে দিলেন?

নগেনবাবু কহিলেন, হ্যাঁ। বড্ড কম্পিটিশান, সুবিধে হ'ল না। কিন্তু তাই বলে বসে নেই একটি দিনও। চাকরি পেয়ে তবে কাজ ছেড়েছি। সময় অমূল্য —বাপ রে, সময় নষ্ট করতে আছে! বুঝলে হে অমলবাবু, একটা কথা বলে রাখি ; বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আমি, আমার কথাটা শুনে চ'ল, চুপ ক'রে বসে থাকবে না একটি মিনিটও⋯ ⋯

এ সবই পুরানো কথা। অমল অন্যমনস্ক হইয়া তাহার মেসের দিনগুলির কথা ভাবিতেছিল, সহসা কানে গেল নগেনবাবু বলিতেছেন, এই দেখ না কার্তিক-

বাবু চাকরি গেল, কিছু টাকা হাতে ক'রে এসে চুপচাপ বসলেন। আমি তখনই পই-পই ক'রে বলেছিলুম, কার্তিকবাবু, অমন কাজটি করবেন না ; চাকরি না থাকে, অন্তত সকাল-বিকেল গোটাকতক ট্যুইশান শুরু করে দিন—তাও না জোটে নিদেন, শুধু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, —সেও ভাল। তা আমার কথা তো শুনলেন না, এখন তেমনি হ'ল—

আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া অমল কহিল, কী হ'ল কার্তিকবাবুর ? ওখানেই আছেন তো ? অসুখবিসুখ কিছু—

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া নগেনবাবু কহিলেন, আরে না, না, সে তো বরং ভাল ছিল। টাকা যা ছিল সব তো রেসে উড়িয়ে দিলেন, তার পর মন গুমরে গুমরে চুপচাপ এক জায়গায় বসে থাকতেন আর ভাবতেন, ফলে যা হবার তাই হ'ল। এখন তো দস্তুরমত মাথা-খারাপের লক্ষণ।

অমল কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে কহিল, তারপর, এখন আছেন কোথায় ?

নগেনবাবু কহিলেন, আছেন ঐ মেসেই। তা সে আর কতটুকু থাকেন বলো। তিন দিন চার দিন কোথায় উধাও হয়ে যান, তার পর আবার হয়তো একবেলা এসে থাকেন, খাওয়া দাওয়াও করেন। আমরা ভাইকে চিঠি দিয়েছিলুম, সে বেচারা নিতেও এসেছিল, কিন্তু উনি গেলেন না। আমাদেরও এতদিনের জানা-শোনা, বাবুদের চক্ষুলজ্জায় বাধছে। কিন্তু আমি এবার হরিবাবুকে বলে দিয়েছি যে এমন ক'রে আমরা আর কাঁহাতক টানি, যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন মশায় !

ততক্ষণে বাস কলুটোলার মোড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। অমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনি নাববেন না ?

ঈষৎ লজ্জিত মুখে নগেনবাবু জবাব দিলেন, বৌবাজারে আবার একটা টিউশানি আছে কি না !···চালানি কারবার করেছিলুম দিন কতক, তাতে অনেক গুলো টাকা লোকসান গেছে, সেটা তুলে নিতে না পারলে—বসে থাকা তো ঠিক নয় চুপ ক'রে, বুঝলে না ?

অমল নামিয়া পড়িল। তাহার কার্তিকবাবুর কথাটাই মনে পড়িতে লাগিল বার বার, বেচারীর দোষের মধ্যে ছিল দুর্দান্ত রেস খেলিবার নেশা, কিন্তু সেটা বাদ দিলে মানুষটি যে কত অমায়িক তাহা তো সে নিজেই দেখিয়াছে। অমন দিল-খোলা লোকটার এই পরিণাম !······কে জানে কেন এমন হইল, স্ত্রী-বিয়োগের জন্য অনুতাপই হয়তো ইহার কারণ। কিম্বা স্ত্রী-বিয়োগের ব্যথা। কে জানে !

একবার তাহার মনে হইল গঙ্গাধরবাবুর বাসায় গিয়া খোঁজখবর করে, কিন্তু তখন যেন আর পা চলিতেছিল না। সে সোজাসুজি নিজের ঘরের দিকেই চলিল।

॥ আঠারো ॥

বাসার কাছাকাছি আসিয়া অমল দেখিল কে একজন তাহার ঘরের সম্মুখের সঙ্কীর্ণ রকে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে একটু বিস্মিত হইল, অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে

ঘরের কাছাকাছি আসিয়া দেখিল আগন্তুক আর কেহ নহে—ইন্দু স্বয়ং। আগের বারে যখন সে আসিয়াছিল দ্বিতীয় চাবিটি এখানেই রাখিয়া গিয়াছিল, সুতরাং আর ঘরে ঢুকিয়া অপেক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

অমল বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, আরে! আমি যে আপনারই শ্বশুরবাড়ি থেকে আসছি।

এবার বিস্মিত হইবার পালা ইন্দুর। সে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যেন ঈষৎ ভীত কণ্ঠেই প্রশ্ন করিল, আমার শ্বশুরবাড়ি, সে কি? তাঁরা কি বললেন? কার সঙ্গে দেখা হ'ল?

বলছি। বলিয়া অমল চাবি খুলিয়া আলো জ্বালিল, তাহার পর জামাটা খুলিয়া আলনায় টাঙ্গাইয়া রাখিয়া মুখে হাতে জল দিতে দিতে কহিল, দেখা আপনার খাস শ্বশুরমশায়ের সঙ্গেই হ'ল। আর, আর একজনের সঙ্গেও দেখা হ'ল বলতে হবে, তবে সে নেপথ্যে।

সে সমস্ত কথাই আনুপূর্বিক খুলিয়া বলিল। ইন্দু নিস্তব্ধভাবে বসিয়া সব কথা শুনিল, কিন্তু বহুক্ষণ পর্যন্ত কোন জবাব দিল না, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, আমাদের আর আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন উপায় নেই অমলদা, আর তাই-ই এবার করতে হবে।

অমল যেন শিহরিয়া উঠিয়া তাহার দুইটা হাত চাপিয়া ধরিল, ছিঃ, ও কি কথা ইন্দুবাবু, ওকথা মুখে উচ্চারণও করতে নেই।

ইন্দুর দুটি চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে কহিল, উচ্চারণ করতে নেই তা তো বুঝি, কিন্তু এমন ক'রে বাঁচিই বা কি ক'রে বলুন দেখি। দুঃখ তো নিজে পাচ্ছিই, আমার জন্যে আরও কতগুলো লোক অনর্থক দুঃখ পাচ্ছে।···আমার যে কী অবস্থা তা তো শ্বশুরমশাই বুঝছেন না, ভাবছেন যে আমি তাঁর ওপর রাগ ক'রেই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু তা নয়, বলছি আপনাকে অমলদা, এ ক'দিন শুধু পাগলের মত পরিচিত অপরিচিত সমস্ত জায়গায় চাকরি খুঁজে বেড়িয়েছি। মামার আর্থিক অবস্থা যে কী তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। তা ছাড়া শ্বশুরবাড়ি প'ড়ে থাকার গ্লানিই কি কম? যা হোক্ কিছু একটা পেলে বাঁচি—

এই পাওয়ার আশাটা যে কতদূর অমল তাহা জানিত। সে কহিল, এর ভেতর কি কোথাও কিছু ভরসা পেলেন?

ইন্দু জবাব দিল, ভরসা! আপনি কি ক্ষেপেছেন? এই বাজারে কেউ কাউকে ভরসা দেয়, বিশেষ ক'রে আমার মত সহায়-সম্বলহীন লোককে?

তা বটে। অমল চুপ করিয়া রহিল। খানিকটা পরে ইন্দু কহিল, একটা ছোট রকম টিউশনির আশা আছে, সেটা যদি পাই তাহলে ভাবছি এখানে এসেই থাকব।

এখানে এসে? অমল বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, সে কি ক'রে হবে? কমলা তাহ'লে থাকবে কোথায়?

হঠাৎ কমলার নামটা বাহির হইয়া গেল। ইন্দু লক্ষ্য করিল না, কিন্তু অমলের কানটা আপনা-আপনিই গরম হইয়া উঠিল।

ইন্দু কহিল, ও ওখানেই থাকবে। আমার মামার কাছে রাখাই উচিত, কিন্তু মামা কেমন মানুষ জানেন তো, আরও জড়িয়ে পড়বেন—

অমল সহসা ইন্দুর হাতটায় চাপ দিয়া কহিল, কিন্তু তিনি তাহ'লে বড্ড কষ্ট পাবেন!

বিস্মিত কণ্ঠে ইন্দু কহিল, কে, কমলা?…তা হয়ত পাবে; তবে সে খুব অবুঝ নয়, আমার কথা সে বুঝবে।

অমল আর কথা কহিতে পারিল না। এ সম্বন্ধে আর কথা বলাও তাহার অনধিকার চর্চা তাহা বুঝিল, কিন্তু তবু মনটা কমলার জন্যই কেমন খারাপ হইয়া গেল।

ইন্দু প্রশ্ন করিল, আপনার এবেলা খাওয়া দাওয়ার কী ব্যবস্থা?

অমল কহিল, খাওয়া? না, যা খাইয়েছেন আপনার শ্বশুরমশাই আর এবেলা কিছু খেতে হবে না—

কিন্তু কথা কহিতে কহিতেই তাহার নজরে পড়িল ইন্দুর মুখের অপরিসীম শুষ্কতা, সে ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, আপনি ক'টায় বেরিয়েছেন?

আমি? ইন্দু ম্লান হাসিয়া জবাব দিল, সে সেই বেলা এগারোটায়।

ইস্! তাই অত মুখ শুক্‌নো। আপনি এক মিনিট বসুন, আমি আপনার জন্যে চট্ ক'রে কিছু খাবার নিয়ে আসি—

ইন্দু বাধা দিয়া কহিল, কিচ্ছু দরকার নেই অমলদা, আমি এখনই ফিরে যাব।

কিন্তু ততক্ষণে অমল উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কোঁচার খুটটা গায়ে টানিয়া দিয়া পকেট হইতে কয়েকটি পয়সা বাহির করিয়া একেবারে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। সেখান হইতেই হাঁকিয়া বলিয়া গেল, এক মিনিট, আমি যাব আর আসব।

কিন্তু সদর রাস্তা হইতে খাবার কিনিয়া যেমন সে পুনরায় গলিতে ঢুকিবে মনে হইল পিছন হইতে কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল, একটা খোলা ফিটন গাড়ি হইতে সত্যই তাহাকে কে ডাকিতেছেন, আরও একটু কাছে গিয়া দেখিল বিভাসবাবু! প্রায় তেমনিই আছেন, হয়তো একটু বেশী বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, মাথার চুলগুলি প্রায় সবই সাদা হইয়া গিয়াছে—কিন্তু মুখের প্রশান্তি এতটুকু নষ্ট হয় নাই, তেমনিই প্রসন্ন হাসিমুখ—

অমল তাড়াতাড়ি গিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইল। তিনিও সস্নেহে মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমার কথাই ভাবছিলুম ক'দিন ধরে, কিন্তু সত্যি-সত্যিই যে দেখা হবে এ আশা আর ছিল না। তোমার বাসা কোথায়? খালি গায়ে যখন বেরিয়েছ তখন নিকটেই কোথাও বোধ হয়?

অমল কহিল, হ্যাঁ, এই গলিটার মধ্যেই—

তিনি কহিলেন, তাহ'লে চল, তোমাব ওখানে গিয়েই কথাবার্তা কওয়া যাক্—

গাড়ি সেইখানেই রাখিয়া তিনি অমলের সহিত তাহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত

হইলেন এবং তাহারই অদ্বিতীয় বিছানাতে ইন্দুর পাশে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, এখানে তুমি একলাই থাক বুঝি ?···কী করছ এখন ?

অমল প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করিতেছিল যে বিভাসবাবু হয়তো দিদীর কথা তুলিবেন। কিন্তু তিনি খুব সম্ভব ইচ্ছা-পূর্বকই সে প্রসঙ্গ এড়াইয়া গেলেন। অমল খুশী হইয়া কহিল, অনেক দুঃখে একটা চাকরি পেয়েছি। মার্চেণ্ট অফিস ···টাকা ত্রিশেক পাচ্ছি !

বিভাসবাবু হাসিয়া কহিলেন, তাহ'লে তো তুমি বড়লোক হে।···কিন্তু এ ছেলেটিকে চিনতে পারছি না তো !

অমল তাড়াতাড়ি ইন্দুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে বিভাসবাবু তাহার কাহিনীও প্রায় সবটা বাহির করিয়া লইলেন। এমনই তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠ যে কিছু গোপন করিতে ইচ্ছাই হয় না, তা ছাড়া তিনি শোনেন যতটা, অনুমান করিয়া লন তাহার চেয়ে অনেক বেশী - গোপন রাখা চলেও না।

সবটা শুনিবার পর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিভাসবাবু কহিলেন, সাহেব-সুবোর সঙ্গে আমার ঢের আলাপ আছে, তবে সাধারণত আমি কারুর চাকরির কথা বলি না কারণ একই লোকের কাছে অনেক রকম অনুগ্রহ চাইতে নেই, তাতে লোকে বিরক্ত হয়। কাজেই ওদিক দিয়ে কোন উপকার করতে পারব না। তবে ছোটখাটো একটা অফার হয়তো দিতে পারি—

এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি থামিলেন। অমল আর ইন্দু নিঃশ্বাস রোধ করিয়া আর একটু তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া বসিল। খানিক পরে বিভাসবাবু প্রশ্ন করিলেন, তোমার বৌ লেখাপড়া কেমন জানে বাবা ?

ইন্দু বিস্মিত হইল, একটু লজ্জিতও হইল। অপ্রস্তুত ভাবে জবাব দিল, সে বিশেষ কিছু নয়।

বাঙলা অক্ষর পরিচয় আছে তো ?

ইন্দু কহিল, হ্যাঁ, তা আছে। বাড়িতে কিছু কিছু পড়েছিল, ইংরেজী অক্ষরও চেনে। বোধ হয় নামতাও দু-একটা মুখস্থ আছে।

বিভাসবাবু জবাব দিলেন, ওতেই হবে। চেষ্টা করলে আর একটুখানি শিখিয়ে নিতে পারবে তো ?

অপ্রতিভভাবে মাথা নীচু করিয়া ইন্দু জবাব দিল, তা পারবো বোধ হয়।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিভাসবাবু কহিলেন, আমার স্ত্রী ছিলেন ইস্কুলের লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি মারা গেছেন, তাতে বড় অসুবিধায় পড়েছি।

এমন স্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি কথাটা বলিলেন, বোধ হয় যেন স্কুলের সাধারণ কেরানী কেহ মরিয়াছেন। অমল বিস্মিত হইয়া কহিল, মারা গেছেন ? কবে ?

এই মাস তিনেক হ'ল। তার সঙ্গে ছেলেটাও। তাতেই তো আরও বিপদে পড়েছি।

মুহূর্ত কয়েক সকলেই চুপচাপ। অমল একটু পরে প্রশ্ন করিল, তাহ'লে কি আপনি ওখানে একলাই আছেন?

সহজ কণ্ঠে বিভাসবাবু জবাব দিলেন, হ্যাঁ, তা বৈ কি।…হিন্দু ছেলেমেয়েরা কেউ ওখানে যেতেও চায় না, তা ছাড়া ছেলে দুটি বেশ ভাল চাকরি করছে এখানে, ওখানে গিয়ে থাকাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তাহার পর একবার গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া বলিলেন, যাক্—যা বলছিলুম ইস্কুলের কথা! এতদিন জন-দুই লোকাল মাস্টার দিয়েই কাজ চালাচ্ছিলুম, তাদের গোটাদশেক করে মাত্র মাইনে দিলেই চলে যায়। দুজনেই বৃদ্ধ, কাজের বার, সুতরাং তার বেশী তারা আশাও করে না। কিন্তু এখন একজন লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আর একজন হেডমাস্টার না হলে চলছে না। আমি নিজে রেক্টর, হেডমাস্টারের কাজ আমাকে দিয়ে চলবে না। ঐ দুটো অফার তোমাকে দিতে পারি। তুমি যদি হেডমাস্টার হও আর তোমার বৌ লেডী সুপারের কাজ করতে রাজী থাকে তো যেতে পার। বাড়ি অমনি পাবে, একটা ঝি আছে আমার, সে-ই কাজকর্ম সব ক'রে দিতে পারবে। আর ফসল যা আমার বাগানে হয় তা তোমরা খেয়ে ফুরোতে পারবে না। চালও আমার চাষে কিছু হয়—তাতেই চলে যাবে। এ ছাড়া যা তোমাদের আমি ম্যাক্সিমাম দিতে পারি তা হচ্ছে কুড়ি টাকা আর পনের টাকা, মোট পঁয়ত্রিশ। অবশ্য তোমাদের দুজনকেই ষাট টাকার রসিদ সই করতে হবে! সাফ কথা বলে দিলুম, এখন তুমি যা ভেবে ঠিক করতে চাও করো—

ইন্দু ঝোঁকের মাথায় একবারে বিভাসবাবুর হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, নিশ্চয় যাবো, পেলে আমি বেঁচে যাই—!

অমলের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল ইন্দুর শ্বশুরের মুখ, তাঁহার সেই অপরিসীম লজ্জা ও বেদনার ছবি! সে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল, অত তাড়াতাড়ি করছেন কেন, ভাল করে সব কথা ভেবে দেখুন আগে।

ইন্দু প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না অমলদা, ভেবে দেখবার আমার আর কিছু নেই। যে অবস্থায় আছি, তার থেকে anything is better!…তা ছাড়া ইনি যা বলেছেন তাতে আমাদের গোটা-পনের টাকা হলেই সব খরচা চলে যাবে। গোটা দশেক টাকাও যদি আমি মাসে মাসে মামাকে পাঠাতে পারি তাহ'লেও তাঁরা বেঁচে যান। আর দশটা টাকা করে জমাবো।

সামান্য একটু স্নেহ-মেশানো বিদ্রূপের সুরে বিভাসবাবু জবাব দিলেন, বাঃ, এই তো দিব্যি হিসেব হয়ে গেল। এ হিসেবটা অবিশ্যি তুমি মিছে ধর নি কিন্তু টাকা আনা পাইয়ের হিসেবটাই তো সব নয় বাবা! ভাল ক'রে ভেবে দ্যাখো, স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করো, আত্মীয়-স্বজনকে জানাও, এরই মধ্যে মন ঠিক করবার কিচ্ছু দরকার নেই। আমি ক্যালকাটা হোটেলে আছি, তিন দিন থাকব। ছাপ্পান্ন নম্বর ঘর, এই তিন দিনের মধ্যে যে কোন দিন সকাল আটটায় আগে গেলেই দেখা পাবে। বেশ ক'রে ভেবেচিন্তে জানিও—

ইন্দু কহিল, কিচ্ছু ভাববার নেই আমার। আমি যাবই। তাতে যার যা

আপত্তি থাকে থাক—!

অমল কহিল, অন্তত আপনার স্ত্রীর মতটা তো নেওয়া দরকার!

ইন্দু জবাব দিল, তার অমত হবে না।

বিভাসবাবু একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, আমি এখন যাই। ভালো ক'রে ভেবে দেখো, আমি এখন জবাব নেবো না তোমার কাছ থেকে। তবে একটা কথা বলে রাখি, এখন ঝোঁকের মাথায় যাচ্ছ, এর পর শ্বশুরমশাই একটা চাকরি ঠিক ক'রে ডেকে পাঠালেই যদি সেইদিন চলে এসো তো আমি বড্ড বিপদে পড়ব। অন্তত কয়েক দিন আগে নোটিশ দিতে হবে—

ম্লান হাসিয়া ইন্দু কহিল, সে আশা সুদূরপরাহত।

দুজনেই বিভাসবাবুর সঙ্গে রাস্তায় বাহির হইয়া আসিল। অমল গলির মোড়ের কাছাকাছি আসিয়া মরীয়া হইয়াই প্রশ্নটা করিয়া ফেলিল, কিন্তু—ঐ কি ওদের ভবিষ্যৎ, না আরও কিছু আশা-ভরসা আছে?

বিভাসবাবু সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, গ্যাসের আলোতে মনে হইল যেন দৃষ্টি তাঁহার জ্বলিতেছে। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অমলের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন, আশা-ভরসা ভিক্ষে করা যায় না, এ জ্ঞান যদি আজও তোমার না হয়ে থাকে তাহ'লে বৃথাই তুমি পথে পথে ঘুরলে এতদিন অমল। হয় অদৃষ্ট মানো, তাহ'লে তো কিছুতেই আপত্তি নেই, কারণ যদি ঐ কুড়ি টাকাতেই ওর জীবন কেটে যায় তবে বুঝবে যে তাই ওর নিয়তি; আর নইলে মানো পুরুষকার—তাতেও কোন অবস্থাতেই ভয় নেই। আমি মানি আশাভরসার পথ নিজেকে সৃষ্টি ক'রে নিতে হয়, ওর কোন রাস্তা বাঁধা নেই!···

তাহার পর ইন্দুর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, আমি নিরেট পাষণ্ড, অর্থে আমার বড় মায়া। আমি সহজে কিছু দেব তা ভেবো না, তবে যদি আদায় ক'রে নিতে পারো তো অনেক কিছুই পাবে। সে তোমাদের ক্ষমতা—

ইন্দু হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া কহিল, অদৃষ্টে আমার যা আছে তাই হবে, আমি যাবই।

বিভাসবাবু তখন গাড়িতে উঠিতেছিলেন, জবাব দিলেন না। তবে অদ্ভুত এবং অতি ক্ষীণ একটা হাসির রেখা তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল মাত্র। গ্যাসের আলো তাঁহার মুখে চোখে আসিয়া পড়িয়াছিল, সে মুখের দিকে চাহিলে তাঁহার প্রসন্ন শান্তভাবে শ্রদ্ধা আসে; কিন্তু অস্ফুট বিদ্রূপময় দুর্জ্ঞেয় সে হাসির দিকে চাহিলে মনে মনে কেমন ভয়ও করে। অমল একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। গাড়ি ততক্ষণে চলিতে শুরু করিয়াছে।

॥ উনিশ ॥

পরের মাসে মাহিনা হাতে পাইবার পরই অমল বড়বাবুকে ধরিয়া দিন-কয়েকের ছুটি লইয়া দেশে গেল। দেশ, কিন্তু কতকাল পরে! তাহার যেন কেমন লজ্জা বোধ করিতেছিল। চেনা লোকের সহিত দেখা হইলে কত রকম যে প্রশ্ন হইতে

থাকিবে তাহার ঠিক নাই। সে-সব প্রশ্ন হয়তো প্রশ্নকর্তাদের স্নেহেরই পরিচায়ক কিন্তু তাহার পক্ষে যেমন অপমানকর তেমনি কষ্টদায়ক। তাহার পর বাবা, তাঁহার সহিত প্রথম চোখোচোখি হওয়ার কল্পনাতেও সে বার বার ঘামিয়া উঠিতেছিল। অথচ না গেলেও নয়। বহুদিন আগে কোন এক ইংরেজী উপন্যাসে এমনিই এক প্রডিগ্যালের গৃহ প্রত্যাবর্তনের কাহিনী পড়িয়াছিল, সেই কথাটাই বারংবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

দুশ্চিন্তা তাহার যতই থাক, স্টেশনে যখন ট্রেন পেঁছিল তখন নামিয়া পড়িতেই হইল। ইহার পরও প্রায় দুই মাইল পথ তাহাকে হাঁটিতে হইবে এবং একেবারে গ্রামের মধ্য দিয়াই। গাড়ি যে একেবারে না পাওয়া যায় তা নয়, কিন্তু তাহাতে আরও সকলের তাকাইয়া দেখিবার সম্ভাবনা, এ বরং মাঠের পথ ধরিলে হয়তো বেশী লোকের সহিত দেখা হইবে না। সে কোন মতে গোবিন্দর চায়ের দোকান এবং নিবারণের খাবারের দোকানের পাশ কাটাইয়া মাঠের পথই ধরিল।

কলিকাতা হইতে আসিবার সময় সে বাবার জন্য খানিকটা ফৌজদারী বালাখানার তামাক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—ছেলেবেলায় কে একবার শহর হইতে ঐ বস্তুটি আনিয়া দেয়, সেই সময়কার তাঁহার সেই আনন্দের চেহারাটি সে আজও ভোলে নাই—আর ছিল ছোট ভাই-বোনদের জন্য কিছু সন্দেশ। জিনিসগুলি একটি ছোট পুঁটুলি বাঁধিয়া হাতে ঝুলাইয়া লইয়াছিল, নিজের খান-দুই কাপড়-জামাও একটা খবরের কাগজ জড়ানো অবস্থায় সেই পুঁটুলির মধ্যে পোরা ছিল, সুতরাং মালপত্রের বিশেষ কোন বোঝা হয় নাই। মালপত্র বেশী থাকিলেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর তা ছাড়া কীই বা আছে তাহার ?

বাড়ির মধ্যে যখন সে ঢুকিল তখন তাহার বুক গুর গুর করিতেছে। এ ভয় নয়, কিংবা দুঃখও নয়—এ যেন কী একটা স্নায়বিক দুর্বলতা, যাহার বর্ণনা দেওয়া চলে না। বাড়ি তাহাদের এমনিই যথেষ্ট পুরাতন, এই কয় বৎসরে যেন আরও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চতুর্দিকেই শ্রীহীনতার চিহ্ন, তাহার মা যে আর নাই সে কথা কাহাকেও বলিতে দিতে হয় না। তিনি যতদিন ছিলেন, যতই তাঁহার শরীর খারাপ হউক, সমস্ত বাড়িটা পরিষ্কার করা একদিনও বাদ যায় নাই।

একেবারে কোলের ভাইটি উঠানে খেলা করিতেছিল, সে তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল না; সহসা একটা অপরিচিত লোককে ভিতরের উঠানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। বাবাও জুতার আওয়াজ পাইয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কে ?

অমলের কণ্ঠ দিয়া কোন উত্তরই বাহির হইল না, সে শুধু কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি চশমার মধ্য দিয়া বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু তবুও চিনিতে পারিলেন না। অমল বুঝিল যে তিনি চশমা সত্ত্বেও আর ভাল দেখিতে পান না, তখন সে কোন মতে গলা ঝাড়িয়া ডাকিল, বাবা !

অকস্মাৎ ভদ্রলোক তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সে কান্নার মধ্যে কোন তিরস্কারের কথা ছিল না, শুধুই বুকফাটা কান্না! এতদিনের সঞ্চিত বেদনা ও অভিমান সমস্ত বাধা ভাঙ্গিয়া যেন একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে। অমল সান্ত্বনার কোন ভাষাই খুঁজিয়া পাইল না, অপরাধীর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে হরনাথবাবুই প্রকৃতিস্থ হইলেন, অমলের মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, আর বার বার বলিতে লাগিলেন, তোর দেহে আর কিছু নেই বাবা, কলকাতায় বোধ হয় ভাল ক'রে তোর খাওয়াই হয় না!

বাহিরের পৃথিবী তাহাকে যত অপমান, নৈরাশ্য আর দুঃখের আঘাতে জর্জরিত করিয়াছিল, তাহার সব গ্লানিই যেন ঘুচিয়া গেল। একটি তিরস্কার নাই, একটি অভিমানের ভাষা নাই, শুধুই স্নেহ, অপরিসীম ভালবাসা! এই বস্তুটিরই লোভে বোধ হয় সমস্ত বাঙালী জাতি গৃহগতপ্রাণ হইয়া পড়িয়াছে। বাহিরে তাহার কোথাও স্থান নাই।

ছোট ভাই-বোনরা ছুটিয়া আসিল। সেদিন স্কুল বন্ধ ছিল বলিয়া সকলেই বাড়ির কাছাকাছি ছিল। ছোট বোনটিও তাহাকে সহজেই চিনিল, সে এবং বুড়ী আসিয়া প্রণাম করিল। কিন্তু অমল প্রথমটা কিছুতেই তাহাদের কাছে সহজ হইতে পারিল না, কী একটা অপরাধের দুর্নিবার লজ্জা যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। অনেকক্ষণ একথা-সেকথার পর লেখাপড়ার কথা তুলিতে তবু কথাবার্তার ধারা কতকটা স্বচ্ছন্দ হইয়া আসিল। দেখিল লেখাপড়া হইতে শুরু করিয়া তাহাদের খাওয়া-পরা সব বিষয়েই একটা শৈথিল্য আসিয়াছে, মাথার উপর নজর রাখিবার কোন লোক না থাকিলে যাহা হয়; মেজ ভাইটি দুপুরবেলা দোকান হইতে ফিরিয়া তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বসিল। তাহার মুখে বিড়ির গন্ধ, এই কয়দিনেই সে যেন দোকানদারের দলে মিশিয়া গিয়াছে। অমল প্রাণপণে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া লইল। ইহার জন্য সে-ই দায়ী। সে নিজের জীবনেও বড় কিছু করিতে পারিল না, অথচ মাঝখান হইতে দিল ইহাদের জীবনগুলি নষ্ট করিয়া। তখন হইতে যদি সে বাড়িতে থাকিয়া চাকরি করিত তাহা হইলে হয়তো ইহাদের লেখাপড়াটা হইত। সুগভীর আত্ম-গ্লানিতে তাহার বুকের ভিতরটা পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

রাত্রে আহারাদির পর সে বাবার কাছেই শুইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা কথা আলোচনা হইবার পর হরনাথবাবু এক সময়ে বলিলেন, তাহলে এইবার তোর একটা বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে ফেলি খোকা! আর দেরি ক'রে লাভ নেই।

অমল চমকিয়া উঠিল। কহিল, বিয়ে? সে কি! ক'টাকা মাইনে পাই বাবা, তা আপনি ভুলে যাচ্ছেন?

হরনাথবাবু যে ম্লান হইয়া গেলেন তাহা অন্ধকারের মধ্যেই অমল অনুভব করিল। খানিকটা পরে তিনি কহিলেন, তা বটে, তবে এখানে আমাদের খরচা তো কম। তুই যা পারিস আর তার সঙ্গে খোকার টাকা ক'টা পেলে এক রকম

ক'রে কুলিয়েই যাবে। গেরস্ত ঘরের মেয়ে আনলে কত আর খরচা বাড়বে, পেটে এক মুঠো খাবে বৈ তো নয়। অথচ এদিকেও যে আর ঘর-দোরের দিকে চাওয়া যায় না। একটা লোক না হ'লে কি চলে?

কথা কয়টি যে খুবই সত্য তাহা এই দুই বেলাতেই অমল অনুভব করিয়াছে। হরনাথবাবু চোখে ভাল দেখেন না, কিন্তু তবু তাঁহাকেই রান্না করিতে হয়। বুড়ী যোগাড় দেয় মাত্র, উনানের কাছে যাইবার মত বয়স তাহার হয় নাই। লোক একটা চাই-ই। ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া সে বাপ-মাকে ঢের কষ্ট দিয়াছে; মা তো চলিয়াই গিয়াছেন, বাপও মৃতপ্রায়, অথচ, সে ভবিষ্যৎ তো—এই। মিছামিছি সকলকে আর বেশী কষ্ট দিয়া লাভ কি? যাহা হইবার হউক, সে আর কাহারও ইচ্ছায় বাধা দিবে না।

খুব মৃদুস্বরে সে বলিয়া ফেলিল, আপনি যা ভাল বোঝেন করুন!

তখন ভরসা পাইয়া হরনাথবাবু আসল কথাটা ভাঙ্গিয়া বলিলেন, মেয়ে তিনি ইতিমধ্যেই দেখিয়া রাখিয়াছেন। এই গাঁয়েরই মেয়ে, বেশ সুন্দরী এবং সেয়ানা। একেবারে আসিয়াই গৃহিণী হইতে পারিবে। অবশ্য অমল দেখিয়া পছন্দ না করিলে পাকা কথা দেওয়া যাইবে না তাহা তিনি বলিয়াই রাখিয়াছেন—তবে তাঁহার মনে হয় অমলের খুব অপছন্দ হইবে না।...

আরও অনেক কথাই তিনি বলিয়া চলিলেন, কিন্তু অমলের কানে আর তাহার সবগুলি পৌঁছিল না। বিবাহের কথা মনে হইতেই তাহার মন চলিয়া গিয়াছিল ইন্দুর বিবাহের দিনটিতে। বন্ধু-বান্ধবের বিবাহে সে বিশেষ আর যোগ দিবার সুযোগ পায় নাই, ইন্দুর বিবাহই বোধ হয় একমাত্র।... এ মেয়েটি কেমন দেখিতে হইবে কে জানে, কমলার মত কি আর হইবে! কমলাকে অবশ্য সুন্দরী বলা যায় না, কিন্তু তবুও নিজের মনের মধ্যে বধূরূপ কল্পনা করিতে গেলে আগেই সেই চন্দনলিপ্ত সুকুমার শ্যামল মুখখানিই মনে পড়ে, আব সেই স্বেদসিক্ত, কম্পিত হাত।...তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, আর কোন মেয়ের সহিত ওভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পায় নাই,—কিংবা, আর কিছু, কে জানে।

বিবাহ!...উৎসব, শাঁখ বাঁশী, হাস্য-পরিহাস, লজ্জা-আনন্দের সেই উচ্ছল প্রবাহ। এ সম্ভাবনা যে কোন দিন তাহার জীবনে উপস্থিত হইবে তাহা সে ভাবে নাই। সমস্ত জীবনটাই যেন দুস্তর মরুভূমি হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে চলিতে হয় শুধু অভ্যাস বশে, কিন্তু মনের মধ্যে চলিবার প্রেরণা থাকে না। আবার কোথা হইতে এই সুবিপুল সম্ভাবনা তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল? সে কি পারিবে তাহার অতীতের সব গ্লানি দূর করিতে? আবার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাসাদ কি তাহার গড়িয়া উঠিবে?

হরনাথবাবু ততক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু অমলের কিছুতেই ঘুম আসিল না। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া বসিল। উঠানের বড় বেলগাছটার ফাঁক দিয়া যেখানে অস্তগামী চন্দ্রের এক টুকরো আলো আসিয়া

পড়িয়াছে, সেইখানে মাটির উপরই বসিয়া পড়িল। বাল্যকালের কত কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল। কত আশাই ছিল প্রাণে,—এম. এ. পাস করিয়া, ভাল চাকরি করিবে কিংবা ওকালতী। দেশের বাড়ি ভাঙ্গিয়া এইখানে গড়িয়া উঠিবে প্রাসাদ, বাবা-মা দেশেই থাকিবেন, সে ছুটির দিনগুলিতে মোটরে চড়িয়া দেশে আসিবে। তাহাকে অবশ্য কলিকাতাতেই থাকিতে হইবে, সেখানেও একটা বড় বাড়ি করিবে, কিন্তু তাই বলিয়া দেশের সঙ্গে সে সম্পর্ক লোপ করিবে না।……

কিন্তু সে সব কল্পনার কথা মনে পড়িলে এখন শুধু হাসিই পায়। সে আশার আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। আজ নিঃসংশয়ে সে বুঝিতে পারিয়াছে যে এই ত্রিশ টাকার চাকরিটা যদি বজায় থাকে তাহা হইলেই যথেষ্ট সৌভাগ্য মনে করিতে হইবে। এমন কি লটারীতে কিছু টাকা পাইয়া হঠাৎ কোন দিন যে বড়লোক হইতে পারে, সে কথাও সে ভাবে না। আশাও নাই, আশা-ভঙ্গের দুঃখ অনুভব করিতেও সে ভুলিয়া গিয়াছে।

তাহার চেয়ে এই দরিদ্র গৃহস্থ-জীবনই ভাল। অভাব আছে কিন্তু সান্ত্বনাও আছে ঢের। আশা নাই কিন্তু শান্তি আছে। যে মেয়েটি আসিবে তাহার বধূরূপে, তাহার ভালবাসা তো আছে। অন্তত তাহার হৃদয়ে তো অমলই রাজা!

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন কল্পনার জাল বুনিতে শুরু করিল। একটি তন্বী কিশোরী—নাই-বা হইল সুন্দরী, কুৎসিত না হইলেই চলিবে—অমলেরই বুকের মধ্যে ধীরে ধীরে তাহার যৌবনের দলগুলি মেলিবে, তাহার অন্তরটি অমলেরই প্রেমের আলোতে বিকশিত হইতে থাকিবে একটু একটু করিয়া। বাহিরের সমস্ত আঘাত, সমস্ত বেদনা ভুলিবে সে সেই কিশোরীর স্নিগ্ধ প্রেমের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়া। প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ সেই সোনার কাঠির স্পর্শে অমৃত হইয়া উঠিবে!

ভাবিতে ভাবিতে তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বহুদিন আগেকার পড়া, রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার দুটি লাইন—

—প্রাণের গভীর ক্ষুধা,
পাবে তার শেষ সুধা—
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালবাসা!

সেই ভাল। যদি সে সেই সুধাই পায় তো আর তাহার কোন ক্ষোভ নাই। ধন-মান সব কিছুরই শোক সে ভুলিতে রাজী আছে।

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের মধ্যে বহুদিনের শুষ্ক বনভূমির উপর দিয়া যেন এক ঝলক মিঠা দখিনা হাওয়া বহিয়া গেল। যে ডাল-পালাগুলি চির-কালই শুষ্ক, চিরকাল নিষ্ফলা, তাহারই প্রতিটি লোমকূপ যেন ভাবী সুখস্বপ্নে মঞ্জরিত হইয়া উঠিল।

সহসা তাহার চমক ভাঙ্গিল পাখীর ডাকে। ভোরের আর বিলম্ব নাই, পূর্বা-কাশ ইতিমধ্যেই ফরসা হইয়া আসিয়াছে। ভোরাই হাওয়াও দিতে শুরু করিয়াছে। অমল যেন নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

॥ কুড়ি ॥

পরের দিনই অমল নিজে গিয়া মেয়ে দেখিয়া আসিল। তাহার নিজের তত ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বাবা জোর করিয়া পাঠাইলেন। আজকালকার ছেলে, নিজে দেখাই ভাল, বিশেষ তিনি যখন চোখে ভাল দেখিতে পান না।

মেয়েটি মন্দ নয়। নাম পারুল, রংটা ফর্সার দিকেই, মুখ-চোখও খারাপ নয়। সুন্দরী না হইলেও আপত্তি করার মত কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে, অমলের মনে হইল, যেন একটু বেশী সপ্রতিভ। যে বস্তুটি কমলাকেও তাহার চোখে সুশ্রী করিয়া তুলিয়াছিল সেই লজ্জা-নম্র ভঙ্গুর ভাবটির বড় অভাব। কিন্তু সে কথা তো আর বাবাকে বলা চলে না; বাবাকে কেন, যে কোন লোককে বলিলেই সে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে, সুতরাং তাহাকে বলিতেই হইল যে মেয়ে পছন্দ হইয়াছে।

ইহার পর হরনাথবাবু মহা উৎসাহে কথাবার্তা চালাইতে শুরু করিলেন। পারুলের এক ভাই রেলে কাজ করে, অবশ্য সামান্য টাকা বেতনে, তবু পাত্র হিসাবে লোভনীয়। হরনাথবাবু সুযোগ বুঝিয়া পারুলের বাপকে চাপিয়া ধরিলেন যে, তিনি বিনা পয়সাতেই পারুলকে লইতে রাজী আছেন, যদি পারুলের বাবা তাঁহার বুড়ীকে গ্রহণ করেন। প্রথমটা পারুলের বাবা রাজী হন নাই, ছেলের বেশী মূল্য পাইবেন বোধ হয় এই আশাই ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হরনাথ বাবুর জেদই বজায় রহিল।

খবরটা শুনিয়া অমল অবাক হইয়া গেল। একবার বাবাকে কহিল, থাক না বাবা, এখনই বুড়ীর এমন কি বয়স হয়েছে?

কিন্তু হরনাথবাবু যখন জবাব দিলেন, এমনি হয়ে যাচ্ছে, হয়ে যাক। তুমি আর খোকা পারবে দু-দুটো বোনকে পার করতে? ঐ তো তোমাদের সামান্য আয়!

তখন তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। হরনাথবাবু বুঝাইয়া দিলেন, এ ভালই হ'ল। আমি কেষ্টবাবুকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে আমাদের যার যা কিছু দেয়, তত্ত্ব-তাবাস, কিছুই আমরা দেব না, শুধু নিয়মকর্ম করার মত করলেই হবে। উভয় পক্ষেরই তাতে সুবিধে।

অমল কহিল, কিন্তু ঘরখরচা তো আছে। তা ছাড়া একেবারে কাঁচের চুড়ি পরিয়ে তো আর মেয়েকে পাঠানো যাবে না!

হরনাথবাবু জবাব দিলেন, না, তা যাবে না। তাঁরাও চুড়ি হার দেবেন, আমরাও তাই দেব কথা আছে। আর ঘরখরচাও শ'-খানেক লাগবে অন্তত।

তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন, কিছুই ছিল না তোমার মায়ের, শুধু গাছকতক চুড়ি আর একটা বালা, তাই ভেঙ্গে যা হয় দেব। বাবুদের কাছ থেকেও হয়তো কিছু পাওয়া যাবে। একে তো পার করি, তার পর রইল শুধু পুঁটু, সে তোমরা যা হয় ক'রো।

অমল চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু এই দুই দিন তাহার মন যে বসন্তবাতাসে মাতামাতি করিতেছিল, অকস্মাৎ যেন তাহাকে হিম-শীতল বলিয়া বোধ হইল। বিবাহের সময় কিছু অর্থ সে হাতে পাইবে আশা ছিল, সামান্য কিছু উৎসব, দু-একটা দিন অন্তত আনন্দে কাটিবে মনে করিয়াছিল—কিন্তু সে সম্ভাবনা আর একেবারেই রহিল না। কোন মতে টানাটানি করিয়া নিয়মরক্ষা করিতে হইবে। অথচ কীই বা বলিবার আছে। সত্যই, দুইটি বোনের বিবাহের ভার লইবে সে কোন্ সাহসে? তাহার চেয়ে এই ব্যবস্থাই ভাল·· এইভাবেই সে মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল।

কিন্তু তবু দিন পাঁচ-ছয় পরে সে একটা আশাভঙ্গের বেদনা লইয়াই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে আগামী মাসে, সুতরাং এখন আর দেশে থাকিবার প্রয়োজন নাই; কথা রহিল, তখনই সে দিন-চারেকের ছুটি লইয়া কাজটা সারিয়া যাইবে।

বাসায় পেঁছিয়াই ইন্দুর একখানা সুদীর্ঘ চিঠি হস্তগত হইল। দিনতিনেক হইতে আসিয়া পড়িয়া আছে। সে ইতিমধ্যেই সস্ত্রীক বিভাসবাবুর দেশে চলিয়া গিয়াছে; স্থানটি তাহাদের দুজনেরই পছন্দ হইয়াছে, কাজও এমন কিছু নয়—বাসা, লোকজন সব ব্যবস্থাই বিভাসবাবু করিয়া দিয়াছেন। সে সম্বন্ধে বহু উচ্ছ্বাস করিয়া শেষে লিখিয়াছে—

আমি নাকি হেডমাস্টার আর আপনার কমলা লেডী সুপ্রারিন্টেন্ডেন্ট, হেসে বাঁচি না। যাই হোক্—এ যেন বেঁচে গেলাম অমলদা, এখানে খরচা কিছুই নেই, যা পাব দুজনে, সব খরচা চালিয়েও মামাকে মাসে মাসে দশ-বারো টাকা পাঠানো চলবে। তা ছাড়াও এখানকার পোস্ট অফিসে মাসে মাসে দু-এক টাকা ক'রে জমাবো। বিভাসবাবু বলেছেন সামান্য কিছু জমলেই কিছু ধানজমি কিনে দেবেন। ব্যস—তাহ'লে আর ভাবনা কি?

ঠিক সেই ইন্দু। এতটুকু বদলায় নাই। সোনালি স্বপন সে দেখিবেই।

চিঠির শেষে সে লিখিয়াছে—

আসবার সময় শুধু শ্বশুরমশাইকে নিয়েই বিপদ বেধেছিল। তিনি এটাকে তাঁর প্রতি অপমান ব'লে ধ'রে নিয়ে গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিলেন। কান্নাকাটি, সে ভয়ানক ব্যাপার। শেষে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি গেলেছি যে, তিনি চাকরি ক'রে দিতে পারলেই আবার ফিরে যাব। অবশ্য, আমার আর যাবার ইচ্ছেও নেই, আর তিনিও পারবেন কিছু করতে কি না সন্দেহ।— তবু, তাঁর ঐতেই সান্ত্বনা।

চিঠির মধ্যে দুই লাইন কমলারও লেখা ছিল—

আপনি কেমন আছেন? ওঁর মুখে শুনলুম, আপনার দয়াতেই, এখানকার কাজ পাওয়া গেছে, আমাকে ধন্যবাদ জানাতে বলছেন। কী ধন্যবাদ জানাবো বলুন? আমাদের জীবন রক্ষা করলেন আপনি। সময় পেলে আসবেন একদিন। একটা রবিবার দেখে আসুন না! বেশ জায়গা, ভাল লাগবে খুব। নমস্কার

নেবেন। ইতি—অপনার কমলা।

চিঠিখানা সে হাতে করিয়াই বসিয়া রহিল। যাক্—ইহারা বাসা বাঁধিতে পারিল শেষ পর্যন্ত। ভালই হউক আর মন্দই হউক, শেষের জন্য যাহাই তোলা থাক—এখনকার মত নিরাপদ বাসা তো পাইল। দুদিনের সুখ, এ-ই যথেষ্ট। সে ঠেকিয়া শিখিয়াছে যে, তাহার অধিক আশা করিতে নাই।

সে কল্পনা নেত্রে দেখিতে লাগিল কমলা তাহার সেই নগণ্য এবং ক্ষুদ্র গৃহস্থালী পাতিতেই ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করিতেছে। তাহারই মধ্যে ইন্দুর জন্য সহস্র ছোট ছোট স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন চলিতেছে—সেই ঈষৎ লজ্জিত অথচ প্রসন্ন আনত মুখখানি সে চোখের সামনে পরিষ্কার দেখিতে পাইল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মনটা যেন কোন্ এক গোপন ঈর্ষায় কাঁটা দিয়া উঠিল।

পরক্ষণেই মনে পড়িল নিজের বিবাহের কথা। তাহার স্ত্রীও কি অমনি করিয়া তাহার সেবা ও তাহার স্বাচ্ছন্দ্যকেই জীবনের ব্রত করিয়া লইতে পারিবে? কে জানে! কমলার স্থানে সে যেন কিছুতেই পারুলকে কল্পনা করিতে পারে না।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ খেয়াল হইল যে অফিসের আর বেশী দেরি নাই। খাওয়া আর হইয়া উঠিল না, কোন মতে স্নান সারিয়া সে ডালহাউসী স্কোয়ারের দিকে দৌড় দিল। দেশে গিয়া প্রায় কপর্দকশূন্য হইয়া আসিয়াছে, এই ক'দিন চালানোই শক্ত, সুতরাং একদিন ট্রাম ভাড়া দেওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব।

যতদূর সম্ভব দ্রুত চলিতেছে, এমন সময় সহসা ছানাপটির মোড়ে পিছন হইতে সজোরে কে জামাটা ধরিয়া টান্ দিল। এই আকস্মিক বাধায় বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া চাহিতেই একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। আরে এ যে কার্তিকবাবু!

কিন্তু এ কী অবস্থা। যৎপরোনাস্তি ময়লা একটা কাপড, তাও বাঁ হাঁটুর কাছে অনেকখানিই ছেঁড়া, গায়ে একটা আরও জীর্ণ জীনের কোট, চক্ষু কোটরগত, চুলগুলিতে জট পড়িয়াছে, কতদিন যে স্নান হয় নাই, বোধ হয় কল্পনাও করা যায় না!

—এ কী অবস্থা আপনার কার্তিকদা?

কার্তিকবাবু অকস্মাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কী ভায়া, চিনতে পেরেছ তা হ'লে? কোথায় যাচ্ছ? অফিসে? যাও যাও!…আমাকেও যেতে হবে এখুনি…

অমল প্রশ্ন করিল, কোথায় যেতে হবে?

কোথায়? কার্তিকবাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।—কোথায়? দাঁড়াও, নোট করা আছে ডায়েরীতে, দেখে নিই।

তাহার পর ব্যস্তভাবে ছেঁড়া পকেটের মধ্যে আঙ্গুল চালাইয়া দিয়া কহিলেন, ঐ যা, কোথায় পড়ে গেছে নোটবুকটা! আচ্ছা, যাও তুমি; আমি একবার লালবাজারে খোঁজ ক'রে আসি ডায়েরীটা পেয়েছে কিনা!

এ যে একেবারে উন্মাদ অবস্থা!…অমলের চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে

কোন মতে চোখের জল চাপিয়া কহিল, কার্তিকদা, আপনার শরীর মোটে ভাল নেই, দিনকতক দেশ থেকে ঘুরে আসুন। আর এখন একবার বাসায় যান—

কার্তিকবাবু আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, ভাবছ আমি পাগল হয়ে গেছি, না? তা তোমারই বা দোষ কি, সবাই ভাবছে। এখন টাকা হাতে নেই, সবাই পাগলই ভাববে। রোসো, টার্ফক্লাবের চেকখানা হাতে পাই আগে, আবার সবাই এসে পায়ে তেল দেবে—

বলিয়াই তিনি দ্রুতপদে ধর্মতলার দিকে হাঁটিতে শুরু করিলেন। অমলও কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া অফিসের দিকে চলিল। সময় থাকিলে সে জোর করিয়া কার্তিকবাবুকে মেসে পেঁছাইয়া দিয়া আসিত, কিন্তু এখন এমনিই দেরি হইয়া গিয়াছে।…এই লোকটি একদিন তাহার কী যে উপকার করিয়াছিল, তাহা কোন দিন সে ভুলিতে পারিবে না—

কিন্তু খানিকটা চলিবার পরই আবার পিছন হইতে ডাক শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল কার্তিকবাবুই দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিতেছেন। কাছে আসিয়া চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, ছ'টা টাকা দিতে পারিস্ ভাই, অনেকদিন মাঠে যাই নি; ঢোকার খরচ আর তিনটে টাকা টোট্—বেশী নয়। পারবি না? তাই তো!…আচ্ছা থাক্—

বলিয়াই তিনি যেমনভাবে আসিয়াছিলেন, তেমনিভাবেই ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া গেলেন।

অমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার অফিসের পথ ধরিল।

অনেকটাই দেরি হইয়াছে—পা আরও জোরে চালানো দরকার।

॥ একুশ ॥

অমলের বিবাহের দিন আসন্ন হইয়া আসিল। মধ্যে আর একটি রবিবার বাকী, তাহার পরের রবিবারেই বিবাহ। ইন্দুকে সে চিঠি লিখিয়াছিল, ইন্দু বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া জবাব দিয়াছে, কিন্তু সে বা কমলা আসিতে পারিবে না, সে কথাও জানাইয়াছে। কারণ বিভাসবাবুর নাকি ভীষণ বাত বাড়িয়াছে, এখানে দ্বিতীয় লোক নাই, ইস্কুল ছাড়িয়া যাওয়া অসম্ভব।

অর্থাৎ একমাত্র তাহার যে বন্ধু, যাহার আগমন সে একান্তমনে চায়, সে-ও তাহার বিবাহে উপস্থিত হইতে পারিবে না। বিবাহ সম্বন্ধে যত স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল তাহার সবগুলিই তো প্রায় বাস্তবের রূঢ় আলোকে মিলাইতে বসিয়াছে, শেষটা কি হইবে কে জানে! ক্রমশঃ তাহার উৎসাহ যেন কমিয়া আসিতেছে।

শনিবার সে এই কথাগুলিই ভাবিতে ভাবিতে অফিস হইতে বাহির হইতেছে এমন সময় আর একটি পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। লালবাজারের কাছাকাছি আসিয়া দেখিতে পাইল চীৎপুরের মোড়ের কাছে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন পাটনার ভুবনবাবু। সে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া নমস্কার

করিয়া দাঁড়াইতেই ভুবনবাবু একেবারে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।—এই যে বাবা অমল। কেমন আছ, কি করছ আজকাল! তোমাকে দেখে বড় আনন্দ হ'ল। ইস্কুলে কাজকর্মের মধ্যে একটু ফাঁক পেলেই প্রায় তোমার কথা ভাবি। কি যে হ'ল, কেনই বা অমন হঠাৎ চ'লে এলে কিছুই বুঝতে পারলুম না, ও'কে জিজ্ঞাসা করলেও উনি কোন জবাব দেন না, খালি ঘাড় নাড়েন।···তা কি করছ আজকাল ?

অমল অফিসের নাম করিয়া কহিল, ঐখানে চাকরি করছি। আপনাদের সব-খবর কি ? কোথায় এসেছিলেন ?

ভুবনবাবু কহিলেন, আমাদের খবর তো মোটের ওপর ভালই ছিল—হঠাৎ—হ্যাঁ, ভাল কথা, জোৎস্নার এই গত বৈশাখে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। জামাই বর্ধমানে থাকেন, সরকারী ডাক্তার। মেয়েকে আর উনি কিছুতেই ইস্কুলে যেতে দিলেন না, কাজেই বিয়ের চেষ্টা দেখতে হ'ল। মেয়েদের এমনি বাড়িতে বড় ক'রে রেখে দেওয়া ভাল না। তা জামাইটিও বেশ মনের মত পেয়েছি—

কথা কহিতে কহিতে যেন খেই হারাইয়া ফেলিয়া ভুবনবাবু চুপ করিয়া গেলেন। তখন অমলই কহিল, কলকাতায় এসেছিলেন কি ওদের দেখতে ?

হঠাৎ যেন আলো দেখিতে পাইয়া ভুবনবাবু কহিলেন, না-না, ঠিক ওদের দেখতে নয়, ইস্কুলের একটু কাজও ছিল। কতকগুলো সায়েণ্টিফিক্ এপারেটাস্ দরকার কিনা—নিজে দেখেশুনে কেনাই ভাল, বুঝলে না, নইলে শুধু ক্যাটালগ দেখে অর্ডার দিলে বড় ঠকতে হয়। আমাদের ওখানকার অন্য সব হেডমাস্টাররা তাই দেন বটে, কিন্তু আমি ও পছন্দ করি না।···হ্যাঁ, কি বলছিলুম, অর্ডার দেওয়া আমার হয়ে গেছে, যাবার সময় একবার বর্ধমানে নেমে মেয়েটাকে দেখে যাব সেই ইচ্ছেই ছিল। সেই জন্যে একঘর বাজারও ক'রে ফেলেছি, এমন সময় দেখ না এই বিপত্তি !

উদ্বিগ্নভাবে অমল কহিল, কী হয়েছে ? কোন অসুখ-বিসুখ—

ভুবনবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, না না, অসুখ-বিসুখ কেন হবে। ইস্কুল থেকে আমাদের জয়েণ্ট হেডমাস্টার মশাই তার করেছেন যে ক্লাস টেনের একটি ছেলের সঙ্গে আমাদের পণ্ডিত মশাই-এর নাকি মারামারি হ'য়ে গেছে।···ছি ছি, দেখ দেখি বাবা, কি কেলেঙ্কারি। এর পর পাটনায় আমি কি করে মুখ দেখাব বল দেখি। আমার স্কুলে কখনও তো এ-রকম হয় না। আমি যেন লজ্জায় মরে যাচ্ছি !

নিশ্চিন্ত হইয়া অমল কহিল, ও, ইস্কুলের কাজ ! তা সে তো আপনার সোমবার পেঁছুলেই হবে। আপনি আজ বর্ধমানে নেমে কাল সকালেও তো রওনা হ'তে পারেন।

ভুবনবাবু কহিলেন, সোমবার পেঁছব ? কী বলছ তুমি ! আমাকে এই মুহূর্তে যেতে হবে। সে'ছেলের গার্জেনের সঙ্গে দেখা ক'রে পণ্ডিতকে ডাকিয়ে সকালের মধ্যে এর একটা হেস্তনেস্ত না করলে চলে কখনও ? কালকের মধ্যে স্টেটমেণ্ট তৈরী ক'রে টাইপ করিয়ে মেম্বারদের কাছে পাঠাতে হবে না ? ছেলেটাকে দিয়ে য়্যাপলজি চাওয়াতে হবে, পণ্ডিতের স্টেটমেণ্ট চাই, ওদের আণ্ডারটেকিং

চাই—এর ঝামেলা কি কম !…কত বড় দায়িত্ব আমার মাথার ওপর তা ভুলে যাচ্ছ ? সোমবারের আগে আমাকে ক্লীন হ'তে হবে যে !

তা বটে। অমল বুঝিল যে একটি কেন, শত কন্যার আকর্ষণও আর তাঁহাকে ইস্কুল হইতে দূরে রাখিতে পারিবে না। সে অপরাধীর মত মাথা হেঁট করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, তা বাজার-হাটগুলো কি করবেন? সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন ?

তাই তো ভাবছি ! সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া বড্ড ঝঞ্ঝাট, তা ছাড়া মেয়েটার জন্যে কিনলুম—

অকস্মাৎ তাঁহার চোখ-মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অমলের হাত দুইটা ধরিয়া কহিলেন, একটা উপায় আছে বাবা, যদি তুমি রাজী হও ! তোমার তো আজ শনিবার, একবার যদি বর্ধমানটা ঘুরে আসতে পার তো আমার বড্ড উপকার হয় !

অমল ঘামিয়া উঠিল। জ্যোৎস্নার সহিত সাক্ষাৎ করা ! সে যে তাহার পক্ষে অসম্ভব। অথচ সে কথা ভুবনবাবুকে বলাই বা যায় কি করিয়া !…

এধারে যে লোকটি একদিন তাহাকে নিরন্ন অবস্থায় আশ্রয় দিয়া আদর-যত্নেই রাখিয়াছিল তাহার বিশেষ উপকার হয় জানিয়াও চুপ করিয়া থাকা যায় না। এই উভয় সংকটে পড়িয়া সে এমনই বিহ্বল হইয়া গেল যে পাশ কাটাইবার মত একটা কৈফিয়তও খুঁজিয়া পাইল না।

ভুবনবাবু অবশ্য তাহাকে বিশেষ অবসরও দিলেন না, তাহার হাতটা ধরিয়া টানিতে টানিতে কহিলেন, তাহ'লে সেই কথাই ভাল। চল একটা ট্যাক্সি-নিই, আমার হোটেল থেকে মালপত্রগুলো তুলে নিয়ে এই চারটের এক্সপ্রেসেই রওনা দিই। কেমন ? তোমায় বাসাই কেউ আছেন না কি, খবর দিতে হবে ?

অমল শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। তাহার পর কতকটা মন্ত্রমুগ্ধের মতই ভুবনবাবুর পিছু পিছু ট্যাক্সিতে চড়িল, তাঁহার হোটেলে গিয়া তদ্বির করিয়া মালপত্র নামাইল এবং সেই গাড়িতেই শেষ পর্যন্ত হাওড়া স্টেশনেও পৌঁছিল; ভুবনবাবু এমনই প্রবলভাবে তাহার সম্মতিকে অনুমান করিয়া লইলেন যে সে এই সমস্ত সময়টার মধ্যে একবারও তাঁহাকে কথাটা জানাইবার অবকাশ পাইল না যে জ্যোৎস্নার কাছে যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া ঘটনাগুলি এতই দ্রুত ঘটিয়া গেল যে ইহার মধ্যে সে একটা ভাল রকম অজুহাতও গড়িয়া লইতে পারিল না।

একেবারে ট্রেনে আসিয়া সে হাঁফ ছাড়িল। অবশ্য ভুবনবাবু তখনও তাহাকে বিশেষ কিছু বলিবার মত ফাঁক দিলেন না, নিজেই অনর্গল স্কুলের কথা গল্প করিয়া যাইতে লাগিলেন। তবে সে ওদিকে বিশেষ কান না দিয়া ব্যাপারটা একটু ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইল বটে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষকালে যখন বর্ধমানের কাছাকাছি গাড়ি আসিয়া পড়িয়াছে, তখন, সে স্থির করিয়া ফেলিল যে দূর হইতে কুলীকে বাড়িটা দেখাইয়া দিয়া কুলীটা বাড়িতে ঢুকিয়াছে দেখিয়াই সে সরিয়া পড়িবে, জ্যোৎস্নার সহিত দেখা করিবে না। ভুবনবাবুর চিঠিখানা সে

কুলীর হাতেই দিয়া দিবে—সুতরাং মালটা কোথা হইতে আসিয়াছে তাহাও জ্যোৎস্নার বুঝিতে কিছুই অসুবিধা হইবে না।

এই সিদ্ধান্তে পেঁছিয়া এতক্ষণে সে একটু সুস্থ হইল এবং বর্ধমানে গাড়ি পেঁছিতে বেশ প্রফুল্ল মুখেই ভুবনবাবুকে প্রণাম করিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। তাহার পর মুটের মাথায় মাল চাপাইয়া সে স্টেশন হইতে হাঁটিয়াই চলিল, ভুবনবাবু বাসার ঠিকানা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, বাসা কাছেই —খুঁজিয়া বাহির করিতেও দেরি হইল না।

তখন সন্ধ্যার বড় বেশী দেরি নাই, আলো ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং সে সাহস করিয়া কাছে গিয়া কুলীকে বাড়িটা দেখাইয়া দিল এবং কি কি বলিবে সে, সে সম্বন্ধে ভাল রকম নির্দেশ দিয়া আবার স্টেশনের রাস্তা ধরিল। দূর হইতে শুধু চাহিয়া দেখিল যে কুলীটা বাড়ির মধ্যে ঢুকিতেছে।

কিন্তু একটু পরেই পিছন হইতে ডাক শুনিয়া ফিরিতে হইল, দেখিল একটি ভদ্রলোক তাহাকেই ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়াছেন।

'মাস্টারমশাই! মাস্টারমশাই!'

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তখন জনবিরল, সুতরাং সে 'মাস্টারমশাই' যে অমলই, সে বিষয়ে সংশয়মাত্র রহিল না। সে দাঁড়াইয়া গেল—এবং ঘামিয়া উঠিল। একটু পরেই ভদ্রলোকটি হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেশ সুশ্রী চেহারা, ঈষৎ স্থূল, বয়স ত্রিশের কাছেই। অমল অনুমানে বুঝিল যে, ইনিই ভুবনবাবুর ডাক্তার জামাতা।

ডাক্তারবাবু ঠাণ্ডাতেও ঘামিয়া উঠিয়াছিলেন, ঘাম মুছিতে মুছিতে এবং দম লইবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে কহিলেন, বাঃ, বেশ লোক তো আপনি! কুলীর হাতে মালগুলো পাঠিয়ে দিয়ে চুপিচুপি স'রে পড়ছিলেন? চলুন, চলুন—

অমল একটা ঢোক গিলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, এই জন্যে আপনি ছুটতে ছুটতে এলেন?

না এসে কি করি বলুন! যা কাণ্ড আপনার! আমি না ছুটলে আপনার ছাত্রীই ছুট্‌ত। সে জানালা দিয়ে আগেই আপনাকে দেখতে পেয়েছিল—

এই ঝাপ্‌সা আলোতেও সে চিনতে পারলে আমাকে? প্রশ্নটা হঠাৎ অমলের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

ডাক্তার সগর্বে জবাব দিলেন, পারবে না। ভারি সাফ চোখ মশাই, কিচ্ছুটি নজর এড়াবার জো নেই—

অগত্যা অমলকে ফিরিতে হইল। চলিতে চলিতে ডাক্তারবাবু কহিলেন, বলতে নেই মশাই, কিন্তু ছাত্রী আপনার চৌকশ একেবারে! বয়স তো বেশী নয়, কিন্তু একলা এখানে আছে, সমস্ত সংসার ওর হাতে, একেবারে পাকা গিন্নীর মত চারিদিকে নজর রেখে চালায়। আমাকে মশাই কিচ্ছুটি ভাবতে হয় না, শুধু টাকাটা এনেই খালাস—

বলিয়া অকস্মাৎ কি কারণে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

অমল কহিল, এখানে আপনি একলাই থাকেন বুঝি ?

ডাক্তার জবাব দিলেন, হ্যাঁ, কি করি বলুন, আমার আবার বদ্‌লির চাকরি, বাবা-মা বুড়োমানুষ, ওঁদের ঘোরাঘুরি করা পোষায় না। তাছাড়া ছোট ভাইদেরও পড়াশুনোর অসুবিধা হয়। তাঁরা দেশেই থাকেন। তা মশাই, শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, আমাদের দেশের লোক অত পাজী তো, কিন্তু যে কদিন ও শ্বশুর-ঘর করেছে তাইতেই সবাই ধন্যি-ধন্যি ! বলতে নেই, স্ত্রীভাগ্য আমার ভালই। হা-হা-হা !

ভদ্রলোক পত্নীগর্বের উল্লাসে যত স্ফীত হইয়া উঠিতেছিলেন অমল ততই সংকুচিত হইয়া পড়িতেছিল—তাহার দুই কান আগুন হইয়া উঠিতেছিল। যত লজ্জা যেন তাহারই। ঠাণ্ডার দিনেও তাহার ভিতরের গেঞ্জি ঘামে ভিজিয়া সপ্‌সপে হইয়া উঠিয়াছে।

বেশী দূর সে যাইতে পারে নাই, সুতরাং শীঘ্রই বাসার কাছে আসিয়া পড়িল। ডাক্তার গলা খাটো করিয়া কহিলেন. আপনি এলেন একরকম ভালই হ'ল, বুঝলেন মাস্টারমশাই ! কেন না ভালমন্দ কিছু রান্না হবে।···হা-হা-হা ! বলতে নেই মশাই, রাঁধে যা, এতখানি বয়সে আমি অমন চমৎকার রান্না খাই নি। আপনিও খাবেন তো, খেয়ে বলতে হবে যে ডাক্তার যা বলছিল তা ঠিক !

ততক্ষণে তাহারা বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্না দ্বারের কাছেই অপেক্ষা করিতেছিল, ভিতরে পা দিতেই সে মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল। তাহার পর ঈষৎ নীচু গলায় অনুযোগের সুরে বলিল, ছি, ছি, কী লোক আপনি বলুন তো ! অমন ক'রে চুপিচুপি পালিয়ে যাচ্ছিলেন যে বড় !···ভাগ্যিস্ আপনাকে ধরতে পারলে—

কিন্তু অমলের সেদিকে কান ছিল না। সে অবাক হইয়া, এমন কি বোধ হয় একটু অভদ্রভাবেই, জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া ছিল। মাত্র বছর-দুই আগে সে যাহাকে দেখিয়া আসিয়াছিল তাহার কি কোন চিহ্নই নাই ? এ যেন সম্পূর্ণ নূতন মানুষ। যৌবন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাহাকে যে অধিকতর সুশ্রী দেখাইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই, কিন্তু বিস্মিত হইল সে আরও অন্য কারণে। কোথায় গেল তাহার উগ্র ঔদ্ধত্য, কোথায় বা গেল তাহার চাপল্য। এমন একটি সুকুমার সলজ্জ ভাব তাহার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া বিরাজ করিতেছে যে সেই কল্যাণী মূর্তির দিকে চাহিয়া অমল চোখের নিমেষে মুগ্ধ না হইয়া পারিল না। ডাক্তারবাবু সত্যই বলিয়াছিলেন, যেন কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে রাতারাতি সে বালিকা হইতে নারীতে রূপান্তরিত হইয়াছে, প্রেয়সী হইবার পূর্বে গৃহিণী হইয়া উঠিয়াছে। এই যে কমনীয় শ্রী, এ তো পরিপূর্ণ রমণীত্বেরই আভাস দিতেছে।

বোধ করি তাহার মুগ্ধনেত্রের দিকে চাহিয়াই জ্যোৎস্না সহসা লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিল, আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।···কী কাণ্ড !

বাড়িটা ছোট এবং একতলা। কতকটা বাংলোর মতন। ভিতরের বারান্দায় দুই তিনটা বড় বড় বেতের চেয়ার পাতা ছিল, সেইগুলি দেখাইয়া সে তেমনি চাপা গলাতেই কহিল, বসুন ঐখানে লক্ষ্মীছেলের মত, আমি হাত-পা ধোবার জল আনছি। চায়ের জল চাপানো আছে, সে বোধ হয় এতক্ষণ ফুটে ফুটে মরে গেল—

সে ত্বরিত-লঘু গতিতে নামিয়া গেল। সেই দিকে চাহিয়া প্রদীপ্তমুখে ডাক্তার কহিলেন, দেখছেন তো মাস্টারমশাই, আপনার সে ছোট্ট ছাত্রীটি আর নেই— পাকা গিন্নী হ'য়ে গেছে একেবারে। বলতে নেই মশাই, আদর অভ্যর্থনা লৌকিকতায় কোথাও একফোঁটা খুঁত পাবেন না।

একজন ঝি উঠানের কোণে কলতলায় বসিয়া কি কাজ করিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি গাড়ু ও গামছা লইয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু জ্যোৎস্না তাহার হাত হইতে গাড়ুটা কাড়িয়া লইয়া কহিল, তুই যা, আলোগুলো সব জেবলে দিয়ে চৌকাঠে জলটা দিয়ে দে। আর অমনি শাঁখটা বাজিয়ে দিস, আমার আজ আর সময় হবে না।

সে গাড়ুটা ও গামছাটা বারান্দার ধারে নামাইয়া কহিল, ও হরি এখনও বুঝি জুতোই খোলা হয় নি—

বলিয়াই বিদ্যুৎ বেগে—অমল ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার কিম্বা বাধা দিবার পূর্বেই,—হাঁটু-গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া জুতার ফিতা খুলিতে শুরু করিল। অমল বিষম বিব্রত হইয়া বাধা দিতে গেল, কিন্তু বাধা দেওয়া মুশকিল। স্বামীর সামনে পরস্ত্রীর হাত ধরিয়া টানাটানি করা সঙ্গত হইবে কি না ঠিক করিতে না পারিয়া উপুড় হইয়া নিজের পা-টাই চাপিয়া ধরিতে গেল এবং তাহার ফলে জ্যোৎস্নার সহিত মাথাটা গেল সজোরে ঠুকিয়া।

জ্যোৎস্না তিরস্কারের সুরে অথচ তেমনি চাপা গলাতেই কহিল, কেন মিছিমিছি ছেলেমানুষি করছেন বলুন তো, চুপ ক'রে ব'সে থাকুন। দিলেন তো আমার মাথাটা ঠুকে, তারপর শিঙ্ বেরোক্ আর কি!

অগত্যা অমলকে হার মানিতে হইল। ডাক্তারবাবু পরমপুলকিত হইয়া কহিলেন, কেমন মশাই, জব্দ হয়েছেন তো! ওর কাছে সবাইকে হার মানতেই হবে, ও আমি জানতুম। তার চেয়ে চেপে যান মশাই, যা বলে শুনে যান—

জ্যোৎস্না কোপ-কটাক্ষে স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, আচ্ছা, আচ্ছা, ঢের হয়েছে। এখন আর এক কাপ চা খেয়ে চট ক'রে একটু মাংস কিনে আনো দিকি, আর ভাল মিহিদানার অর্ডার দিয়ে এস। 'খাস্-খাস্' তৈরি ক'রে দেয় যেন—

জুতা খোলা হইলে সে গাড়ুটা লইয়া আসিয়া সেইখানেই অমলের পা ধোয়াইয়া দিল, তাহার পর কপালে ঘাড়ে জল-হাত বুলাইয়া দিয়া গামছা করিয়া মুখ-হাত-পা পর্যন্ত মুছাইয়া দিল। অমল বাধা দিতে পারিল না; মনের সংকোচও তাহার যেন কতকটা কমিয়া আসিয়াছিল জ্যোৎস্নার এই মূর্তি দেখিয়া, সুতরাং সে বাধা দিবার চেষ্টাও করিল না।

ঘরের ভিতর হইতে স্বামীরই একটি ধোয়া গেঞ্জি আনিয়া অমলের হাতে দিয়া কহিল, যে রকম ঘেমেছেন, নিশ্চয়ই গেঞ্জি ভিজে গেছে, ভিজে জামা এখনকার দিনে প'রে থাকলে অসুখ করবে। জামাটা খুলে ওটা ছেড়ে ফেলুন, ততক্ষণ আমি জলখাবার নিয়ে আসি—

এই বলিয়া সে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। ডাক্তার পত্নীগর্বে স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলিয়া অমলের পাঁজরায় একটা খোঁচা দিয়া কহিলেন, দেখছেন কী সাফ চোখ! নজরে কিচ্ছুটি এড়াবার জো নেই! বেশ আছি দাদা, বুঝলেন, বলতে নেই, আমি নিজের সম্বন্ধে কিছু ভাবিই না, যা ভাববার আপনার ঐ ছাত্রীটিই ভাবে আজকাল।

ঝি সন্ধ্যা দিয়া বোধ হয় জ্যোৎস্নারই নির্দেশ মত ছোট একটা টিপয় সামনে রাখিয়া গেল। একটু পরেই জ্যোৎস্না নিজে একটা ট্রেতে করিয়া দুই ডিস খাবার ও দুই কাপ চা লইয়া আসিয়া পরিপাটি করিয়া সামনে সাজাইয়া দিল। লুচি, হালুয়া, রসগোল্লা, আলুভাজা, নিমকি, আরও কত কি—

ডাক্তার প্রথমেই একটা আস্ত রসগোল্লা মুখে পুরিয়া কহিলেন, সব ঘরে তৈরি মশাই! একটিও বাজারের নয়।

বিস্মিত হইয়া অমল কহিল, কিন্তু এ সব কি জাদু-মন্ত্রে হ'ল নাকি?

হা হা করিয়া ডাক্তার আবার হাসিয়া উঠিলেন কিন্তু জবাব দিলেন না। জ্যোৎস্না ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, কী আদিখ্যেতা করো!...মন্তরে হবে কেন, উনিও যে এই এলেন। জলখাবার তৈরিই ছিল। আর রসগোল্লা তো আপনিই নিয়ে এলেন।

সে অমলের ভিজা গেঞ্জিটা লইয়া কলঘরে চলিয়া গেল এবং কাচিয়া আনিয়া দালানের আলনাতে শুকাইতে দিয়া কহিল, তুমি চট্ করে বাজারটা ঘুরে এস, আবার যেন কোথাও গল্প করতে বোস না।...আর আপনি জল খেয়ে নিয়ে আসুন ঐ রান্নাঘরের সামনে বসবেন, আমি কাজ করতে করতে বাবার গল্প শুনব।

ডাক্তার আদেশ পাইবা-মাত্র তাড়াতাড়ি চা শেষ করিয়া বাজারের দিকে ছুটিলেন। একটা চাকরও আছে, সে বোধ হয় বাহিরে কোথাও আড্ডা দিতেছিল, এখন গৃহিণীর ধমক খাইয়া ব্যস্ত হইয়া ঝাড়ন লইয়া বাবুর সহিত বাজারে ছুটিল। আর অমলও জলযোগ শেষ করিয়া রান্নাঘরের সম্মুখের দাওয়ায় একটা বেতের মোড়াতে গিয়া বসিল।

॥ বাইশ ॥

ঝি ওধারে কাজে ব্যস্ত, রান্নাঘরের মধ্যে জ্যোৎস্না এবং বাহিরে সে। নির্জনে দেখা তাহাদের এই প্রথম। কিসের একটা সংকোচে অমল আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার বুকও যেন একটু কাঁপিতে লাগিল।

জ্যোৎস্না ভিতর হইতে তাহার মুখ দেখিতে না পাইলেও বোধ হয় তাহার অবস্থাটা অনুমান করিতে পারিল, সে তাড়াতাড়ি কতকটা সহজ হইবার জন্য

কহিল, তারপর, বাবার সঙ্গে কোথায় দেখা হ'ল আপনার ?

অমল আনুপূর্বিক সমস্ত খুলিয়া বলিল। কথা কহিতে কহিতে সত্যই তাহার সংকোচ এবং একটা অজ্ঞাত ভয়, দুইটাই অনেকখানি কাটিয়া গেল।

জ্যোৎস্না হাসিয়া কহিল, বাবাকে তো চেনেনই। চিরকালই ওঁর ঐ একরকম গেল। ইস্কুল আর ইস্কুল। ইস্কুলের কাছে ওঁর ছেলেমেয়ে কেউ নেই। আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল তাই, নইলে জিনিসপত্রগুলো ফেলে দিতেন সেও ভাল, তবু এখানে নামবার কথা ভাবতেও পারতেন না।

ইহার পর উভয়েই কিছুক্ষণ চুপচাপ। জ্যোৎস্না হেঁট হইয়া কি একটা রান্না চাপাইতেছিল, মিনিট কয়েক কথা কহিবার অবসরই পাইল না। অমলও বেতের মোড়াটার ওপর নড়িয়া- চড়িয়া বসিল। কিন্তু উঠিয়া যাইবে কি না ঠিক বুঝিতে পারিল না। উঠিয়াই বা কোথায় যাইবে! অগত্যা বসিয়াই রহিল।

রান্নাঘরের দাওয়ায়, ছাদে, ওধারের গা আলমারিটায় চোখ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার একসময় জ্যোৎস্নার দিকেই ফিরিয়া আসিল। তখন উনানে গন্‌গনে আঁচ, তারই একটা জোর আভা আসিয়া পড়িয়াছে জ্যোৎস্নার মুখে। সেই লাল আলোতে জ্যোৎস্নার আতপ্ত মুখের যতটুকু দেখা গেল সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া অমল যেন অকস্মাৎ মুগ্ধ হইয়া গেল। নাক, চোখ, ওষ্ঠ, কপোল যতটা তাহার দিকে ফেরা ছিল সবগুলিই যেন অত্যন্ত সুকুমার এবং সুশ্রী। সুন্দর ললাটের সমস্তটাই ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত জড়াইয়া কয়েকটি অবাধ্য চুল, আর তাহারই মধ্যে রক্তবিন্দুর মত শোভা পাইতেছে একটি ছোট্ট সিন্দুরের টিপ—সবটা জড়াইয়া তাহার চোখে কেমন একটা মোহের সৃষ্টি করিল। ...সুগোল, যৌবনপুষ্ট শুভ্র হাতখানা ব্যস্ত হইয়া নড়িতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের আভা ও বিদ্যুতের আলো ছুটাছুটি করিয়া যেন সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছে। জ্যোৎস্না যে সুন্দরী, সত্যকার রূপসী, তাহা এই সে প্রথম সহসা উপলব্ধি করিল!

অথচ একদিন, একদিন কেন বোধ হয় আজিকার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত, এই মেয়েটিকে সে বরাবর অবহেলাই করিয়া আসিয়াছে। তাহার স্বভাবকে তো সে ঘৃণা করিয়াছেই, রূপটার কথা কোনদিন চিন্তা পর্যন্ত করিয়া দেখে নাই। অথচ আজ সেই মেয়েটিই তাহার রূপে ও ব্যবহারে এমন মোহের সৃষ্টি করিল কেমন করিয়া! এ শুধু বিবাহেরই ফল? বিবাহের পরে কি এম্‌নি করিয়া সব মেয়েরাই বদ্‌লাইয়া যায়? এ কি সেই বৈদিক জাদুমন্ত্রেরই প্রভাব, না পুরুষের বাসনার সোনার কাঠির স্পর্শ!

মিনিট কয়েক পরে কড়ায় জল ঢালিয়া জ্যোৎস্না অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিতেই অমলের মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে চোখ পড়ায় আরও লাল হইয়া উঠিল। বাঁ হাতে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া অকারণে আবার কড়া-খুন্তী লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল তাহার পর কণ্ঠস্বরকে প্রাণপণ চেষ্টায় সহজ করিয়া লইয়া কহিল, আপনি এখন কি করেন মাস্টারমশাই? কিছু মনে করবেন না, চিঠিতে বাবা আপনাকে

নিয়ে খুব উচ্ছ্বাস করেছেন বটে কিন্তু কাজের কথা কিছুই লেখেন নি!

অমল আগেই লজ্জিত হইয়া চোখ নামাইয়াছিল। এখন কথা কহিতে গিয়া যেন গলাটাও কাঁপিয়া গেল। সে সেইভাবেই জবাব দিল, তার কারণ যে তিনি আমার সম্বন্ধে নিজেই বিশেষ কিছু জানেন না। জিজ্ঞেস করবার সময় কোথায় পেলেন বলো।

তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমি অনেক চেষ্টায় এই মাসকতক হ'ল একটা বিলিতি আফিসে চাকরি পেয়েছি।

জ্যোৎস্না বোধ হয় প্রশ্নটা করিয়া ফেলিয়া কিছু অপ্রস্তুত হইয়াছিল, সেও নতমুখে কহিল, দেশ থেকেই যাওয়া আসা করেন, না কলকাতাতে থাকেন?

অমল জবাব দিল, দেশ থেকে আনাগোনা করা চলে না। অনেক খরচা, সময়ও লাগে বেশী। কলকাতাতেই একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া ক'রে থাকি।

জ্যোৎস্না কহিল, আর কে থাকেন সেখানে?

ম্লান হাসিয়া অমল কহিল, আর কেউ থাকেন না। আমার একজন বন্ধু থাকতেন আগে, এখন তিনিও থাকেন না।

জ্যোৎস্না সব ভুলিয়া মাথা তুলিয়া প্রশ্ন করিল, তাহ'লে খাওয়া-দাওয়া?

নিজেই রেঁধে খাই। যেদিন পারি না, সেদিন হয় বাজার, নয় উপোস ভরসা!

ইস্!······ব্যথিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জ্যোৎস্না কহিল, তাহলে তো বড্ড কষ্ট হয় আপনার!

অমল শুধু একটু হাসিল, জবাব দিল না।

এই সময় ডাক্তারবাবু শোরগোল করিতে করিতে আসিয়া ঢুকিলেন। পিছনে চাকরের হাতে মাংস, আরও মাছ, বাজার। নিজের হাতে দই, মিষ্টান্ন। সবগুলি উঠানে নামাইয়া কহিলেন, অর্ডারি মাল কিছু ছিল, আনে মিহিদানা—নিয়ে এসেছি, বুঝেছ? আর কিছু অর্ডারও দিয়েছি।······আর দেখ, তুমি রান্না-বান্না সারো ততক্ষণ; মাস্টারমশাইকেও দেখতে হবে তোমাকেই—আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

জ্যোৎস্না কহিল, তার মানে, এখন আবার কোথায় চললে?

ডাক্তার পাঞ্জাবিটা খুলিয়া কোটটা গায়ে চড়াইতে চড়াইতে কহিলেন, কী করব বল দেখি, 'এস-ডি-ও'র মেয়ের অসুখ, ডেকে পাঠিয়েছে, না গেলেই নয়।······আপনি কিছু মনে করবেন না মাস্টারমশাই, আমি যাব আর আসব—ঘণ্টাখানেকও লাগবে না। ওরে, ব্যাগটা নে—

যেমন ব্যস্তভাবে আসিয়াছিলেন, চাকরের হাতে ব্যাগটা দিয়া তেমনি ব্যস্তভাবেই তিনি বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু দ্বারের কাছাকাছি গিয়াও একবার মুখটা বাড়াইয়া কহিলেন, কিছু মনে করবেন না, বুঝলেন? অবিশ্যি উনি যখন আছেন, সামনে বলতে নেই, অতিথি সৎকারের ত্রুটি হবে না। তবে আমারও বড় অন্যায় হ'লো। কিন্তু চাকরি, বোঝেন তো?······

এত দ্রুত হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনি কথাগুলি কহিয়া গেলেন যে, অমলের আর অভয় দিবার অবসর হইল না, সে চুপ করিয়াই রহিল। একটু পরে জ্যোৎস্না কহিল, মেয়েটা আজ তিন দিন ধরে জ্বরে ভুগ্‌ছে। বোধ হয় বাঁকাই দাঁড়াবে, উনি কালকেই বলছিলেন।

অমল প্রশ্ন করিল, এসব ব্যাপার তো?

ঠিক ব্যাপার নয়, টাকা দেয়, তবে এসব জায়গায় খাটুনি বেশী। যতই উনি বলে যান—'যাব আর আসব', দুটি ঘণ্টার আগে ছাড়া পাবেন না। এই এক অসুবিধে এ কাজের, রাত নেই, দুপুর নেই ডাকলেই যেতে হবে।

অমল কহিল, তাহ'লে তো তোমার বড় কষ্ট হয়! রাতবিরেতে একলা থাকতে হয় তো?

কি আর করছি বলুন! একটু হাসিয়া জ্যোৎস্না জবাব দিল, তবে ঐ ঝিটা থাকে বাড়িতেই—, তা ও যা হাবা-গোবা, থাকাও যা, না থাকাও তা!

ইহার পর মাংস বাছা, ঝিকে বাট্‌না দেখাইয়া দেওয়া, কুট্‌না কোটা প্রভৃতি কাজে অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে দুই-একটা খুচরা প্রশ্ন দুজনেই করে, অপর পক্ষ জবাব দেয়। অমল প্রশ্ন করে, জ্যোৎস্নার ভাই-বোনের কথা। জ্যোৎস্না প্রশ্ন করে তাহার কলিকাতার বাসা সম্বন্ধে। হঠাৎ এক ফাঁকে সে কহিল, বিয়ে করেছেন আপনি?

অমল সংক্ষেপে কহিল, না। আসন্ন বিবাহের সংবাদটা দিতে কে জানে কেন, ঠিক মন চাহিল না।

সে মুগ্ধ-নেত্রে বসিয়া দেখিতেছিল, জ্যোৎস্নার গৃহিণী-রূপ। কতখানি শ্রদ্ধা কতখানি আগ্রহের সহিতই না এই কাজগুলি সে করিয়া যাইতেছে! এত নৈপুণ্যই বা তাহার আসিল কোথা হইতে? রাজবালার সেই ক্লান্ত সুর ও অবসন্ন অবস্থার কথা আজও মনে পড়িলে অমলের হাসি পায়। অথচ এ মেয়েটি যেন একসঙ্গে দশটি হাত বাহির করিয়া খাটিতেছে—কোথাও তাহাতে ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নাই চারিদিকেই দৃষ্টি, প্রত্যেকটি কাজ যাহাতে নিপুণভাবে সম্পন্ন হয়, সে সম্বন্ধে কত সতর্কতা!

শেষে আর থাকিতে না পারিয়া সে কহিল, এত সব কোথা থেকে শিখলে? ওখানে তো কিছুই করতে না!

ঝি তখন কলঘরে, তবুও গলা খাটো করিয়া জ্যোৎস্না জবাব দিল, এসব কি আর আলাদা ক'রে শিখতে হয়, করতে করতেই শেখা হ'য়ে যায়। আমার সংসার, আমারই স্বামী, তাঁর আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব খাবে, সেটা যদি আমি ভাল ক'রে না করি তাহ'লে কে করবে বলুন তো! যতই ঝি-চাকর থাক, এসব কাজ ভাড়াটে লোক দিয়ে হয়? পাটনায় থাকতে দেখেছি তো, কোনদিন যদি মা নিজে হাতে কিছু করতেন তো বাবার আহ্লাদের সীমা থাকত না। অত ভুলো মানুষ, কিন্তু খেতে বসলে মায়ের হাতের রান্না কোন্‌টা—মুখে পড়লেই ঠিক টের পান!

তাহার পর একটু থামিয়া কহিল, ওখানে আমার শাশুড়ীও কোনদিন কিছু করতে দেন নি, এখানেও ইনি বামুন চাকর ঠিক ক'রে তবে আমাকে এনেছিলেন।

কিন্তু দুদিন থেকেই দেখলুম যে সে রান্না কেউ মুখে দিতে পারে না। একে উনি একটু খেতে-দেতে ভালবাসেন, তার ঐ অখাদ্য রান্না, অর্ধেক দিন ওঁকে উপোস ক'রে থাকতে হ'ত। হপ্তাখানেক দেখে একদিন দিলুম ঠাকুরকে জবাব দিয়ে। উনি শুনে ভেবে অস্থির, আমারও ভয় হয়েছিল প্রথমে, কিন্তু দেখলুম যে সব ঠিকই চলল, কোন অসুবিধা হ'ল না। আর তা ছাড়া কি নিয়ে থাকি বলুন তো, এই একলা একলা? সবই যদি ঝি-চাকরে করবে তো আমি করব কি? হয় বই নিয়ে বসে থাকতে হয়, নইলে বোনা। আমি আবার ঐ ছাইভস্ম বোনা দু-চক্ষে দেখতে পারি না। এখানে সব দেখি বড় বড় অফিসারদের বৌ-রা, খালি ব'সে ব'সে মোটা আর কদাকার হচ্ছেন অথচ কেউ ন'ড়ে ঘাস খাবেন না। কাজের মধ্যে তো কার্পেটের ওপর আঁকা-বাঁকা ছবি তোলা,—সেগুলোর নিচে বড় বড় ক'রে "Dog" কিংবা "কালীয় দমন" লেখা না থাকলে বোঝাবার জো নেই যে, কোনটা "কুকুর" আর কোনটা "কালীয় দমন"!

কথার ফাঁকে ঝি আসিয়া পড়িয়াছে, সে কহিল, বৌদির আমার কি হাতে পায়ে কাজ লাগে দাদাবাবু? নিজের পঞ্চাশ রকমের খাটুনি তো আছেই তার ওপর যদি আমার একটু শরীর খারাপ হ'ল তো আমার সব কাজগুলো পর্যন্ত নিজে করবে, আমাকে নড়তে দেবে না—বৌদি আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-ঠাকরুন!

বাধা দিয়া লজ্জিত কণ্ঠে জ্যোৎস্না কহিল, আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে হরির মা, তোমাকে আর ব্যাখ্যানা করতে হবে না।

তাহার পর কহিল, এবারে উনুনে কয়লা দেব যে মাস্টারমশাই, এখানে ধোঁয়া হবে। আপনি দালানে গিয়ে একটু বসুন, আমি মাংসটা চড়িয়েই আসছি। কিংবা দালানে ব'সে আর দরকার নেই, ঠাণ্ডা লাগবে, আপনি একেবারে ঘরে গিয়ে বসুন—

অমল উঠিল। কিন্তু ভিতরের দালানে বা ঘরে কোনখানেই বসিল না, ঘরের মধ্য দিয়া একেবারে বাহিরের বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানেও কয়েকটি বেতের চেয়ার পাতা, বেশ নির্জন এবং অন্ধকার—সামনে দুই একটা ফুলের গাছও আছে। একটা পুষ্পিত রজনীগন্ধার শীষ হইতে চমৎকার গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল—সুন্দর স্নিগ্ধ নির্জনতা, শরীর এবং মন দুইই জুড়াইয়া গেল। তাহার সমস্ত চৈতন্যকে যেন জ্যোৎস্না ইতিমধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, সে-মোহ কাটাইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে গেলে এমনি নির্জনতাই দরকার! সে ক্লান্তভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া চোখ বুজিল।

কিন্তু এখানে আসিয়াও সে জ্যোৎস্নার চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইল না। আশ্চর্য, অদ্ভুত মেয়েটি! তাহার সমস্ত মন যেন বার বার এই মেয়েটির পায়ের কাছে শ্রদ্ধায় অবনত হইতে লাগিল। এই মেয়েটিকে সে ইতিপূর্বে মনে মনে কতই না গালি দিয়াছে, কত অশ্রদ্ধাই না করিয়াছে। অথচ আজ! বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের আঘাতে তাহার মন যেন আজ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, পূর্বেকার অশ্রদ্ধা যেন সমস্ত একসঙ্গে ভিড় করিয়া অনুশোচনার রূপে তাহার মনে ফিরিয়া

আসিতে শুরু করিয়াছে। কিছু পূর্বে স্ত্রী সম্বন্ধে ডাক্তারবাবুর উচ্ছ্বাস শুনিয়া সে হাসিয়াছিল, এখন সে বুঝিতে পারিল যে এক্ষেত্রে উচ্ছ্বাস না করাই অসম্ভব।...

জ্যোৎস্নার কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন চলিয়া গেল নিজের বিবাহে। মনে হইল, পারুল সম্বন্ধে তাহার মনে যে খুঁত আছে সেটা হয়তো নিতান্তই তাহার নিজের অজ্ঞতা, বিবাহের পূর্বে মেয়েরা যেমনই থাক্—বিবাহের পরে সমস্ত ত্রুটি ঢাকিয়া যায় নিশ্চয়ই!

বিবাহের পরে পারুল ঠিক কেমনটি হইবে, কল্পনা করিতে করিতে একসময় দেখিল যে তাহার সে ধ্যানমূর্তির মধ্যে কখন পারুল অন্তর্হিত হইয়াছে—সেখানে কমলা ও জ্যোৎস্নায় মিলিয়া এমন একটা স্বপ্ন রচিত হইয়াছে যে, তাহাকে মনে মনেও ভালো করিয়া দেখিতে গেলে সে মিলাইয়া যায়, অথচ অনুভব করিতে বাধে না। হাওয়ার মতই অধীর, হাওয়ার মতই লঘু, দখিনা হাওয়ার মতই মিষ্ট সে স্বপ্ন!

তাহার এই অর্ধজাগ্রত অবস্থাতে কতটা সময় কাটিয়া গেল তাহা সে বুঝিতে পারিল না, মনের অনেকখানি আশা ও বাসনা দিয়া রচিত এক মধুর স্বপ্ন হইতে যখন সে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে জাগিয়া উঠিল, তখন দেখিল যে জ্যোৎস্না ঠিক তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিমধ্যে সে সমস্ত রান্না শেষ করিয়া ফেলিয়াছে, সম্ভবত গা-ধোয়া শেষ করিয়া—আগেকার কাপড়টা বদলাইয়া কিছু কিছু প্রসাধনও করিয়া আসিয়াছে বোধ হয়, কারণ তাহারই একটা মৃদু সুগন্ধ অকস্মাৎ নাকে আসিয়া অমলকে পূর্ণজাগ্রত করিয়া তুলিল।

জ্যোৎস্না প্রশ্ন করিল, অমন নিঃশ্বাস ফেললেন যে?

তাহার পরই তাহার একখানা ঠাণ্ডা হাত অমলের ললাটের উপর রাখিয়া কহিল, ইস্, আপনার মাথা কি গরম! যেন আগুন ছুটছে, জ্বর-টর হয়নি তো?

অমল হাত বাড়াইয়া তাহার দুইখানা হাতই নিজের মাথার উপর চাপিয়া ধরিয়া কহিল, না। ও আমার ছেলেবেলা থেকেই আছে, একমনে ব'সে কিছু ভাবলেই কান-মাথা গরম হয়ে ওঠে। কিন্তু তুমি কি আবার এত রাত্রে গা ধুয়ে এলে?

জ্যোৎস্না জবাব দিল, হ্যাঁ, রান্নার পর গা না ধুলে বিশ্রী লাগে আমার; কিন্তু আপনি একমনে এত কি ভাবছিলেন বলুন তো?

জ্যোৎস্নার কণ্ঠস্বরে কোথায় যেন একটু ক্ষীণ আগ্রহের সুর ফুটিয়া উঠিল।

অমল একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া জবাব দিল, কে জানে, হয়তো তোমার কথাই ভাবছিলুম।...বোস।

জ্যোৎস্না তাহার পাশের চেয়ারখানাতেই আসিয়া বসিল। সে একখানা আশমানী রঙের ঢাকাই শাড়ী পরিয়া আসিয়াছিল, তাহারই নূতন জরিগুলার উপর দূর রাস্তার আলো আসিয়া পড়িয়া ঝিক্ ঝিক্ করিতে লাগিল। সেই দিকে চাহিয়া অমল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পাছে নূতন করিয়া কোন নেশা লাগে এই ভয়ে সে কিছুতেই ভালো করিয়া জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চাহিতে

পারিল না।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ বসিয়া থাকিবার পর অমল আস্তে আস্তে কহিল, তোমার কাছে আমার একটা মাপ চাইবার আছে জ্যোৎস্না—

ঠিক তেমনিই মৃদুকণ্ঠে, প্রায় স্বপ্নজড়িত সুরে জ্যোৎস্না জবাব দিল, কী বলুন তো ?

অমল আর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তোমার প্রতি আমি বড় অবিচার করেছিলুম, মনে মনে তোমাকে বড়ই অবজ্ঞা করতুম। তুমি আমাকে মাপ করো।

জবাব দিতে গিয়া জ্যোৎস্নার গলা কাঁপিয়া উঠিল। সে প্রাণপণে কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া কহিল, কিন্তু সে তো আপনি ঠিকই করেছিলেন। আমি বাস্তবিকই বড় ছোট ছিলুম যে! আপনি গুরু, আমাকে অপমানের চাবুক মেরে বুঝিয়ে দিলেন মানুষের কি হওয়া উচিত।

এই বলিয়া সে গলায় আঁচল দিয়া অমলকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। তাহার পর কহিল, যেদিন আপনি বাঁকীপুর থেকে অমনভাবে চলে গেলেন সেদিন যে আমার কি ক'রে কেটেছে তা বলতে পারব না। আমার জন্যেই আপনাকে পথে বেরোতে হ'ল—হয়তো পথে পথেই ঘুরতে হচ্ছে, হয়তো বা কোথাও আশ্রয় পান নি—একথা যতই মনে পড়েছে, ততই যেন বুকের ভেতরটা মুচড়ে মুচড়ে উঠেছে। সেদিন সারারাত কেঁদে কেঁদেই কাটিয়েছি!…যদি কোন দিন পারেন তো আপনিই আমাকে ক্ষমা করবেন!

অমল তাহার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপিচুপি কহিল, ও কথা এখন থাক—

তাহার পর তেমনি করিয়াই দুজনে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। জ্যোৎস্নার হাতখানা অমলের দৃঢ়বদ্ধ মুঠির মধ্যে ঘামিতে লাগিল। তবু সে হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল না। কিংবা আর কথাও কহিল না। নির্জন নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে পাশাপাশি বসিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত দুইজন শুধু দুইজনের সঙ্গ অনুভব করিতে লাগিল—যতক্ষণ না ডাক্তারবাবু ফিরিয়া আসিলেন।

॥ তেইশ ॥

পরের দিন সকালেই অমল কলিকাতা রওনা হইল। জ্যোৎস্না রবিবার দিনটা থাকিয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল, ডাক্তারবাবুও যথেষ্ট অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে রাজী হইল না ভয়ে। ভয় তাহার নিজেকেই, পাছে এখানে বেশীক্ষণ থাকিলে নেশা লাগে। জ্যোৎস্নার মোহ তাহাকে আচ্ছন্ন করিবার পূর্বেই সে চলিয়া যাইতে চায়।

ডাক্তারবাবু স্টেশনে তুলিয়া দিতে আসিয়াও আবার বলিতে লাগিলেন, এমন গেরো হ'ল যে, কাল রাত বারোটার আগে ছুটিই পেলুম না! না হ'ল আপনার সঙ্গে আলাপ করা ভাল ক'রে, আর না হ'ল একটু ভাল রকম খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করা, ভারি অন্যায় হ'য়ে গেল!

অমল কহিল, আপনার সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ করা হ'ল না, সে দুর্ভাগ্য আমারই। তবে আদর-যত্নের কোন ত্রুটি হওয়া যে সম্ভব নয় আপনার স্ত্রীর কাছে, সে তো আপনি জানেনই !

ডাক্তারবাবুর মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, তা অবিশ্যি বটে। বলতে নেই, ওর আদর-অভ্যর্থনায় ভুল ধরবে এমন লোক জন্মায় নি।···তা যাই হোক মাস্টারমশাই, আপনি কিন্তু একেবারে ওকে ভুলে যাবেন না। বড্ড একলা থাকে, তবু আপনারা এলে দুদিন কাটে ভাল। বিশেষ ক'রে আপনাকে ও বড্ডই শ্রদ্ধা করে। আপনার আঁক-কষে-দেওয়া, নাম-লিখে-দেওয়া খাতাগুলো এখনও ওর বাক্সে আছে—

ট্রেন আসিয়া পড়িল। অমল ডাক্তারবাবুর হাত দুইটি ধরিয়া তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাইয়া ট্রেনে উঠিয়া পড়িল। তাহার পর ট্রেন ছাড়িয়া দিতে একটা জানালায় মাথা রাখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, খুব বাঁচিয়া গেলাম ! জ্যোৎস্নার জীবন সুখী হউক—আমার দ্বারা তাহার এমন সোনার সংসারের কোন অনিষ্ট না হয়। যে সুর সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে তাহাকে আর নূতন করিয়া জাগাইয়া লাভ নাই—

কিন্তু কলিকাতাতে আসিয়া দেখিল যে জ্যোৎস্না একটি খুব বড় অনিষ্ট তাহার করিয়াছে ; সে আর কোন কাজেই মন দিতে পারে না। অবাধ্য মনকে যতই শাসন করে, ততই কখন আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সে জ্যোৎস্নার কাছেই গিয়া উপস্থিত হয়। অফিসের খাতা খুলিয়া রাখিয়া অন্যমনস্ক হইয়া কী ভাবে, অন্য বাবুরা ঠাট্টা করেন। শেষে জোর করিয়া সে নিজের বিবাহের কথা ভাবে, পারুলকে চিন্তা করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন মনটা আড়ষ্ট হইয়া ওঠে। কমলার মত কি জ্যোৎস্নার মত করিয়া তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই পারুল নানা কাজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এ কথাটা যেন কিছুতেই কল্পনা করা যায় না, কেমন যেন স্বপ্ন-ভঙ্গ হয়। অবশেষে কোন এক সময়ে, সে আশ্চর্য হইয়া লক্ষ্য করে, পারুলকে বাদ দিয়া সে সোজাসুজি কমলা বা জ্যোৎস্নাকেই স্বপ্ন দেখিতে শুরু করিয়াছে। ইহা পাপ, মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, ইহার মধ্যে ভবিষ্যৎ অশান্তির বীজ লুকানো আছে—এই সব বলিয়া মধ্যে মধ্যে সে মনকে শাসন করিতে বসে, কিন্তু ফল হয় না—

মঙ্গলবার পর্যন্ত দেখিয়া সে অফিসে বসিয়াই ইন্দুকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিল। লিখিল, 'বিয়ের সমস্তই ঠিক, কিন্তু মনে যেন কোন উৎসাহ পাচ্ছি না। এখন বন্ধ করতে গেলেও কেলেঙ্কারি বাধবে। অথচ কী করি ভেবে পাচ্ছি না। আপনারা কি কোন রকমেই আসতে পারেন না ? আপনারা এলে তবু একটু বল পাই।'

জবাব আসিল বৃহস্পতিবার দিনই। চিঠির উত্তর ইন্দু দেয় নাই, দিয়াছে কমলা। সে লিখিয়াছে—

'উনি আমাকেই জবাব দিতে বললেন। বললেন, এ ব্যাপার নাকি আমারই

ভাল ক'রে বোঝানো উচিত।...আপনি কেন মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন? আপনাকে যে পাবে, তার তো জন্মজন্মান্তরের সৌভাগ্য—সে কি তা বুঝবে না বলতে চান? আর সে তা বুঝলেই আপনাকে সুখী করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করবে। এই চেষ্টাই যে মেয়েমানুষের নিজের ভবিষ্যৎ—সুখশান্তি, সব কিছু। আপনি কিছু ভাববেন না, সে আপনাকে শান্তি দিতে পারবে নিশ্চয়ই।

যাওয়ার কথা যা লিখেছেন, এখন তো তার কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছি না। বিভাসবাবুর ভয়ানক অসুখ, তিনি স্কুলের ভার আপনার এই দুই বন্ধুর হাতে তুলে দিয়েছেন—এক্ষেত্রে যাওয়া মুশকিল। তবে যদি কোনমতে যাওয়া সম্ভব হয়, শেষ পর্যন্ত বৌ-ভাতের দিনও গিয়ে উপস্থিত হবো, এ আপনি জানবেন। কিছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

চিঠিখানা পাইয়া ভরসা কিছুই পাইল না সত্য কথা, কিন্তু তবু যেন খানিকটা আশ্বস্ত হইল।

অফিসে কিছু জানাইবে কিনা, ক'দিন ধরিয়াই ভাবিতেছিল। শেষে ভাবিয়া দেখিল যে পরে অন্য লোকের মুখে শোনা অপেক্ষা আগে তাহার মুখে শোনাই শ্রেয়। সে সেই দিনই ছুটির পর বড়বাবুর টেবিলের কাছে গিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। বড়বাবু মুখ তুলিয়া কহিলেন, কি বাবা অমল?

ইদানীং তিনি তাহার সঙ্গে খুব স্নেহের সুরেই কথা কহিতেন। অমল মাথাটা চুলকাইয়া লইয়া কহিল, আপনার কাছে একটা অনুমতি নেবার আছে—

তিনি জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। অমল প্রায় মরীয়া হইয়াই বলিতে শুরু করিল, এবার ছুটি নিয়ে বাড়ি গেলে বাবা আমাকে বিয়ে করবার জন্য বড্ড ধ'রে পড়েছেন। আমি অবিশ্যি কিছুতেই রাজী হই নি, কিন্তু তাঁদেরও যে খুব কষ্ট হচ্ছে এ-ও সত্যি কথা। বাবা একেবারেই অথর্ব হয়ে পড়েছেন, চোখে দেখতে পান না; ভাই-বোনেরাও খুব ছোট। সংসারে লোকের অভাব খুবই—। তার ওপর বাবা বলছেন যে, যে মেয়েটি তিনি দেখেছেন তাকে আমি বিয়ে করলে তার ভায়ের সঙ্গে আমার এক বোনেরও বিয়ে দেওয়া চলতে পারে।

সে চুপ করিয়া গেল। বড়বাবু কতকটা শুষ্কস্বরেই কহিলেন, তা আমার কাছে কিসের অনুমতি?

তাঁহার সেই কণ্ঠস্বরে অমল দস্তুরমত ভয় পাইয়া গেল। তবু কোনমতে সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, আমার আর মাথার ওপর কে আছে বলুন, আপনারা একটু স্নেহ করেন, আপনারা ছাড়া উপদেশই বলুন আর পরামর্শই বলুন আর কে দিতে পারে?

অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বড়বাবু জবাব দিলেন, তা বটে।

তাহার পরই কিন্তু যেন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, ভাগ্যিস্ কলেজে বেশী লেখা-পড়া করো নি, তাই আমাদের কাছে পরামর্শ চাওয়ার যে দরকার আছে এ কথাটা মানলে! কিন্তু ঐ সব গ্রাজুয়েট ছোকরাবাবুরা যদি একথা শুনতে পায় তো তোমার গায়ে ধুলো দেবে। ওরা বলে, বড়বাবু আছে, অফিসেই আছে, বাড়ির

কথায় কি ? একেবারে ডোণ্ট-কেয়ার—বুঝলে না ! ঐ যে নকুল, বোশেখ মাসে বিয়ে করলে তা আমাদের জানালে না পর্যন্ত ! অফিসের বন্ধুবান্ধবদের পরে একদিন খাওয়ালে তাও আমাকে একবার বলা দরকার বিবেচনা করলে না ! তা তুমিও আর ইতস্তত ক'র না, বুঝলে ? কিন্তু এ মাসে আর বিয়ের দিন কৈ ?

অমল কহিল, এই আসছে রবিবার শেষ দিন—

বড়বাবু যেন লাফাইয়া উঠিলেন, আর তুমি এখনও এখানে ? যাও, যাও, আজই বাড়ি চলে যাও, আমি কাল থেকেই এক হপ্তার ছুটি দিলুম তোমাকে। গিয়ে সব ঠিকঠাক ক'রে ফেল গে। অত ভাবলে কি চলে ? পুরুষস্য ভাগ্যম্—তাছাড়া তোমার স্ত্রীও তো একটা বরাত নিয়ে আসবে গো !

অমল কহিল, মাইনে যে পাই মোটে তিরিশটি টাকা, বড্ড‌ই ভয় করে—

বড়বাবু কহিলেন, পনেরো টাকা ! বুঝলে, আমি যখন বিয়ে করেছি তখন পনেরো টাকা মাইনে পাই আমি। তাতে কি ? ও সব ঠিক হয়ে যাবে—। বরং এক কাজ করো না কেন, তোমার তো বিকেলে সময় থাকে, আমার ছোট দুটো ছেলেমেয়েকে, আর নাতিটাকে পড়াও না কেন ? অবিশ্যি বেশী দিতে পারব না বটে—

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া অমল কহিল, আপনার ছেলেমেয়েকে পড়াবো তার জন্যে টাকা নেবো ?…না না, ও কথা বলবেন না, আমি যাব নিশ্চয়ই—

কৃত্রিম ধমক দিয়া বড়বাবু কহিলেন, তুমি থাম হে ছোকরা, জ্যাঠামি করতে হবে না। টাকা, আমি পুরনো মাস্টারকে ছ'টাকা দিতুম, তা তোমাকে না হয় পুরোপুরি আট টাকা ক'রেই দেবো।…তোমার খরচ যা বাড়বে তার ব্যবস্থা ক'রে দিলুম আর কি ! তা ছাড়া, সুবিধে পেলেই আমি এদিকের ব্যবস্থাও ক'রে দেবো এখন। তুমি এখন যাও, আজই যাতে রাত্তিরের গাড়িতে বাড়ি যেতে পারো, তার ব্যবস্থা করো গে। ছুটির দরখাস্ত দিয়ে যেও, আর কিছু ভাবতে হবে না।

অমল হেঁট হইয়া একেবারে তাঁহার পদধূলি লইল। তিনি 'থাক্ থাক্ হয়েছে, কর-কি কর-কি ছোকরা', বলিয়া যথারীতি বাধা দিলেন, তাহার পর মনিব্যাগ হইতে দুইটি টাকা বাহির বরিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিলেন, যাবার সময় বৌমার জন্যে একটা রুপোর সিঁদুর কৌটা কিনে নিয়ে যেও, বুঝলে। নাও, নাও, আমার কথা অমান্য করতে নেই—

সেখান হইতে দেবেশবাবুর টেবিলে গিয়ে তাঁহাকেও চুপি চুপি কথাটা জানাইল, সঙ্গে সঙ্গে অপরকে জানাইতে বারণ করিয়া দিল। দেবেশবাবুর ছোট ছোট চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, থাবার মত তাঁহার ডান হাতখানা দিয়া প্রবল এক ঝাঁকুনি দিয়া কহিলেন, ভালই হ'ল মাস্টার, ঘুরে তো ঢের দিন বেড়ালে, এবার সংসারী হও গে। আর বড়বাবুর সুনজরে যখন পড়েছ তখন আর চিন্তা কি, মাইনে বাড়তে বেশী দেরি হবে না।

তাহার পরই তিনি তাহাকে বসাইয়া চট করিয়া পাশের টেবিলে চলিয়া গেলেন, সেখানে এক বাবুর কাছ হইতে দুইটা টাকা ধার করিয়া আনিয়া তাহার হাতে

গুঁজিয়া দিয়া কহিলেন, তোমার জন্য একখানা ধোয়া কাপড় কিনে নিও, আইবুড়ো ভাতের কাপড়। যেতে আমি পারব না, শালা ছোট সাহেবের স্টেটমেণ্ট তৈরী হয় নি এখনও, একটি বেলার ছুটিও দেবে না। মোক্তা, কাপড়টা কিনে নিও মাস্টার ঠিক, নইলে মনে বড় দুঃখ করব।

॥ চব্বিশ ॥

দুই একটা খুচরা বাজার সারিয়া লইয়া পরের দিন সকালের গাড়িতেই অমল দেশে গেল। আয়োজন সামান্য. সতরাং হৈ-চৈ বিশেষ কিছু নাই। তবু দূরসম্পর্কের দুই একজন আত্মীয় ইতিমধ্যে আসিয়া হাজির হইয়াছেন বলিয়া অনেক দিন পরে বাড়ি যেন একটু সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মায়ের যাহা কিছু ছিল সব বিক্রয় করিয়া বোনের দুইটি অলঙ্কার তৈয়ারী হইয়াছে, গৃহের সামান্য সংস্কার হইয়াছে এবং এই সব খরচ চলিতেছে। হরনাথবাবু চুপিচুপি শুনাইয়া দিয়াছেন যে পুঁটির বিবাহের ও তাহার বৌ-ভাতের দিনে খাওয়ার খরচা খুব কম করিয়া সারিলেও একশ' টাকা পড়িবে এবং সেই টাকাটা বোধ হয় ধার করিতে হইবে। তাঁহার পুরাতন মনিব অর্থাৎ ইস্কুলের সেক্রেটারী ও গ্রামের জমিদার কিছু দিবেন বলিয়াছেন, কিন্তু সে যে কত তাহা এখনও জানা যায় নাই। মেজ ভাই যেখানে কাজ করে সেই সরকার বাবুরাও বোধ হয় গোটা-দশেক টাকা দিবেন আশা করা যাইতেছে। বাকী যাহা লাগিবে তাও তাঁহারাই ধার দিবেন, খোকার মাহিনা হইতে মাসে মাসে কাটা যাইবে।

প্রায় ভিক্ষা করিয়াই বিবাহ করা। অপমানে অমলের কান-মাথা আগুন হইয়া ওঠে, কিন্তু নীরবেই তাহা পরিপাক করিতে হয়, উপায় কি ?···

আর একটি দিন মাত্র আছে, কিন্তু তবু কে জানে কেন মনে উৎসাহ আসে না। সে নির্জনে ঘুরিয়া বেড়ায়, বাগানে বা মাঠে। কোন কাজেই যোগ দিতে পারে না। সধবা স্ত্রীলোক দরকার বলিয়া এক পিসতুতো বোনকে আনা হইয়াছে, সে ঠাট্টা করিয়া বলে, কী দাদা, সুন্দরী বউ আসবে ব'লে কি এখন থেকেই আমাদের ত্যাগ করলে ?

অমল হাসিবার চেষ্টা করে, কিন্তু না ফোটে হাসি, আর না দিতে পারে জবাব। তাড়াতাড়ি বাগানে গিয়া একটা আমগাছের তলায় মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়ে।

দুপুর বেলা নাগাদ মেজ ভাই আসিয়া কাছে বসিল। কহিল দাদা, বাবা বলছিলেন, ওর কি মেয়ে পছন্দ হয় নি ? সবাই তো বলছে সুন্দর মেয়ে, তবে অমনভাবে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন ?

অমল তাড়াতাড়ি জবাব দিল, না, না, সে সব কিছু নয়। একে খরচা বাড়ল, তায় এতগুলো টাকা দেনা চাপল—কত রকম ভাবনা হয় বুঝছিস্ তো !

সেও ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, তা বটে। আমার মাইনেতে তো এখন পাঁচ-ছ মাস হাত দেওয়াই যাবে না।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া অমল কহিল, তুই এদের চিনতিস্ ভাল করে ?

বিমল জবাব দিল, কাদের ? বৌদিদের ?

অমল ঘাড় নাড়িল।

বিমল কহিল, চিনতুম বৈকি। ওদের বাড়িতে আমি কতবার গেছি। পঁটুর বর হবে যে শান্তিপদ, ওর কাছে পড়া ব'লে নিতে যেতুম আগে।···বৌদি বেশ সুন্দরই হবে দাদা, তুমি কিছু ভেবো না।

লজ্জায় অমল লাল হইয়া উঠিল। কহিল,·দূর! সে কথা কে জিগ্‌গেস করছে। কেমন কুটুম্ব হবে তাই ভাবছিলুম। ওরা লোক কেমন ?

বিমল অত বোধ হয় কোন দিন ভাবিয়া দেখে নাই। সে খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, লোক ভালই হবে, খারাপ হবে কেন ?

অমল আর কথা কহিল না। খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বিমলও উঠিয়া গেল। যাক্—মেয়ে খুব সুন্দরী না হইলেও ভালই দেখিতে। নিজের দেখার অপেক্ষা এসব ব্যাপারে বাহিরের লোকের কথাতেই যেন ভরসা পাওয়া যায় বেশী। যত দুঃখের আঘাতই পাক্ তবু অমলের বয়স কাঁচা, সুন্দরী বধূ আসিতেছে একথা বার বার শুনিলে, এ বয়সে যে কোন অবস্থাতেই লোভে মন দুলিয়া ওঠে। তাহারও মন দুলিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অনেকদিন আগে পারুলকে দেখিয়াছে, তাও ভাল করিয়া চাহিতে পারে নাই, সুতরাং চেহারাটার স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে মনের ভিতর, তবু যতটা মনে পড়ে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সে কল্পনায় একটা মূর্তি গড়িয়া লইল।

এতক্ষণে তাহার বিবাহের নেশা লাগিয়াছে। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। অপরাহ্ন বেলায় মাইল দুই মাঠ পার হইয়া ক্ষীণকায়া নদীর ধারে উপস্থিত হইল এবং সেখানে বহু রাত্রি পর্যন্ত নির্জনে বসিয়া ভাবিতে লাগিল পারুলের কথা···। পারুলও হয়তো তাহার কথা ভাবিতেছে, তাহাকে সেও কি একবার চুরি করিয়া দেখিয়া লয় নাই ? কে জানে পছন্দ হইয়াছে কি না। তবে ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছে যে চেহারাটা তাহার মন্দ নয়, বরং অনেকে ভালই বলিয়াছে। হয়তো পারুলের অপছন্দ হয় নাই, হয়তো বা সেও বিবাহবাড়ির সহস্র গোলযোগের মধ্যে সখী ও আত্মীয়াদের অজস্র পরিহাসের অবসরে অমলের কথাই ভাবিতেছে, ভাবিতেছে হয়তো যে অমলের ঠিক কতটা পছন্দ হইল !

অমল আপন মনেই হাসিয়া উঠিল। দু'টি সর্বাধিক নিকট লোকের এই একই দুশ্চিন্তা—মজা মন্দ নয় !······তাহার মনে পড়িল ইন্দুর ফুলশয্যার'পরের রাত্রির কথাটা। এমনিই হয়, দুটি লোকেরই পরস্পরকে ভালবাসিবার ইচ্ছা, সর্বস্ব অর্পণ করিবার ইচ্ছা, অথচ কি দুর্নিবার লজ্জা ! সে কল্পনা করিতে লাগিল পারুলও অমনি লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া এক পাশে বসিয়া আছে ঘাড় গুঁজিয়া, আর সে সাধ্য-সাধনা-করিতেছে কথা কওয়াইবার জন্য। সুন্দর ললাটের চন্দন-বিন্দুগুলি স্বেদবিন্দুর সহিত মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছে, তাহার হাতের

মুঠার মধ্যে নরম ফুলের মত হাত দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, মুখে সলজ্জ হাসি একটুখানি, চোখ দুইটি নত। সেই দীর্ঘ পক্ষ্মের মধ্য হইতে এক-একবার অপাঙ্গে চাহিয়া লইতেছে, কথা কহিবার ইচ্ছা—কিন্তু কিছুতেই কথা ফুটিতেছে না। হয়তো বা এইভাবেই ফুলশয্যার সেই অবশিষ্ট সামান্য রাত্রিটুকু কাটিয়া যাইবে, পারুলের কথা কওয়াই হইবে না।

কিন্তু তা না হউক, তাহাতে অমলের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই—সেই সাধনাতেই তাহার বুক ভরিয়া যাইবে। বহুদিনের তৃষাতুর বক্ষ তাহার খুঁজিয়া পাইবে এ জীবনের অমৃত!

অমল উত্তেজনায় স্থির থাকিতে পারিল না। উঠিয়া নদীর ধারে পায়চারি করিতে লাগিল। পরের দিনও আবার তেমনি সাধ্যসাধনা করিতে হইবে, সেদিন কথা ফুটিবে, কিন্তু সে সামান্য দুই-একটা। তবু তাহাতেই রাত্রি ভোর হইয়া যাইবে, নিদ্রার অবকাশ মিলিবে না। পরের দিন আত্মীয়ারা আরক্ত চক্ষু ও নেত্রকোণের কালিমা দেখিয়া উপহাস করিবেন। সেই উপহাস আর তাহারই ফাঁকে ফাঁকে চুরি করিয়া চাওয়া, ছল করিয়া দুই জোড়া চোখের দৃষ্টি বিনিময়—এ ক'দিনের এইটুকু গোপন মধুই তাহাদের অবশিষ্ট জীবনের পাথেয় হইয়া থাকিবে।

এইটুকু সম্বল করিয়াই ইন্দু আর কমলা কি সুদূর পল্লীগ্রামে অতি সামান্য আয়েই সুখের সংসার পাতিয়া বসে নাই? না-ই বা রহিল ভবিষ্যতের আশা এবং বর্তমানের স্বাচ্ছন্দ্য—ঐ অমৃতই তাহাদের অজেয় ও অমর করিয়া তুলিবে, ভুলাইয়া দিবে এ জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা।

।। পঁচিশ ।।

সেদিন সারারাত্রি অমল ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না। উত্তেজিত চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে টুকরা-টুকরা ভাবে যেটুকু ঘুম হইল তাহাও কমলা জ্যোৎস্না পারুলের স্বপ্নে ভরিয়া রহিল। কিন্তু পরের দিন অতৃপ্ত নিদ্রা লইয়া উঠিলেও তাহার কোন গ্লানি বোধ হইল না, কারণ মানস-চোখে তখন দস্তুরমত রঙ ধরিয়াছে।

সেদিন আর তাহাকে মাঠে আশ্রয় লইতে হইল না। সে নানা কাজে ব্যস্ত হইয়া বাড়ির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং কল্পনা করিতে লাগিল যে, এই বাড়িরই কক্ষে কক্ষে তাহার সুন্দরী বধূ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মুখে সলজ্জ হাসি, এবং আনতদৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে তাহার চোখের সহিত মিলাইয়া আবার নামিয়া যাইতেছে।

পারুলকে যে বিবাহের পরে খুবই সুন্দর দেখাইবে সে বিষয়ে আর তাহার সংশয়মাত্র ছিল না। যেটুকু খুঁত এখন চোখে পড়িতেছে তাহা বিবাহের পরে যে নিশ্চিহ্নভাবে ঢাকিয়া যাইবে, সে বিষয়েও সে নিশ্চিন্তই ছিল। জ্যোৎস্না ও কমলাকে তাহার চোখে সুন্দর লাগিয়াছে—সুতরাং সে এই কথাটাই ধরিয়া

লইয়াছে যে, বিবাহের পর সব মেয়েকেই সুন্দর দেখায়।

আসন্ন উৎসবের আভাসে বাড়ি মুখরিত। এই কয়টা দিন দারিদ্র্য তাহার ম্লান ছায়া লইয়া বিদায় লইয়াছে। বন্ধুবান্ধব কেহ তাহার নাই—এই গ্রামে যে-সব বাল্যবন্ধু তাহার ছিল, তাহাদের কাহারও সহিত সে আর মিশিতে পারে না—এই অভাবটা মধ্যে মধ্যে পীড়া দিতে থাকিলেও অমল ভাই-বোনদের লইয়াই মাতিয়া উঠিয়াছে। হাস্য-পরিহাসের জোয়ার আসিয়াছে, এমন কি হরনাথবাবুরও অথর্বতা যেন কতকটা চলিয়া গিয়াছে। আসন্ন বিবাহের আনন্দে বুড়ীও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার যে কৈশোর আসিয়াছে, এ কথাটা এই প্রথম অমল উপলব্ধি করিল। মোটের উপর সবটা মিলিয়া অমলের ভালই লাগিতেছিল।

জমিদারবাবুরা কুড়িটি টাকা দিয়াছেন, সরকারবাবুরা দিয়াছেন দশ টাকা। তবু হরনাথবাবু সরকারদের গদী হইতে পুরা একশটি টাকাই ধার লইলেন, বলিলেন, এমন আনন্দের দিনে অত টেনেটুনে চালাতে পারব না। না হয় দু-দশ টাকা বেশীই ধার হবে!

তাঁহার এক প্রাক্তন ছাত্র আধ মণ মাছ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, সেই ভরসাতে তিনি লোকও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন বিস্তর। দুই দিনই যে পরিমাণ লোক খাইবে তাহাতে ঐ মাছ এবং একশ' ত্রিশ টাকায় কুলাইবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তবু অমল বাধা দিল না। তাহারও মন এই কয়দিনের জন্য যেমন সমস্ত দুর্ভাবনা ও দুঃখের উপরে উঠিয়াছে, উহারাও না হয় তেমনি ভুলুক অতীতের সব দুঃখ এবং ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা!

শনিবার রাত্রিও কাটিল খানিকটা হল্লা করিয়া এবং খানিকটা টুক্‌রা-টুক্‌রা ঘুমে। অবশেষে শেষরাত্রে তাহার পিসতুতো বোন সুহাস যখন দধিমঙ্গলের জন্য ডাকিয়া তুলিল তখন আর সে বিছানাতে ফিরিয়া গেল না, প্রথম ঊষার অস্পষ্ট আলোতে মাঠ পার হইয়া নদীর ধারে গিয়া উপস্থিত হইল।

সেখানে পারচারি করিতে করিতে কত কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল। সেই প্রথম যৌবনে উন্নতির আশায় রাত্রের নিঃশব্দ অন্ধকারে গৃহত্যাগ, তাহার পর কলিকাতার বিভিন্ন মেসে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অদৃষ্টের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ। তখনকার প্রতিটি দিনের সেই দারিদ্র্য ও উঞ্ছবৃত্তির কথা মনে পড়িলে আজও সে শিহরিয়া উঠে।···তাহার পর সেই সুদূর প্রবাসে যাত্রা করা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে মনে মনে বলিল, পারিলাম না, কিছুই করিতে পারিলাম না! এ জীবনে কোথাও কোন উন্নতি আমার অদৃষ্টে নাই। তাহার চেয়ে এই ভাল, পিতৃ-পিতামহের মত নিজের দারিদ্র্যের কাছে আত্মসমর্পণ করাই ভাল। এই সংসার, এই অভাব-অনটনের মধ্য হইতে যেটুকু মধু পাওয়া যায় সেইটুকুই ভাল······

বৃহস্পতিবার দিন অফিস হইতে বাহির হইয়া সে জ্যোৎস্নাকে একখানা চিঠি দিয়াছিল। তাহার বিবাহের কথাটা যে সে অজ্ঞাত সঙ্কোচে তাহাকে জানাইতে পারে নাই তাহার জন্য ক্ষমা চাহিয়া তাহার শুভেচ্ছা প্রার্থনা করিয়াছিল।

নিতান্তই একটা আকস্মিক আবেগের ফলে এই চিঠি লেখা—এবং সেজন্য তাহার লজ্জারও অবধি ছিল না। জ্যোৎস্নার সহিত পত্র-ব্যবহার করাও তাহার পক্ষে উচিত হইয়াছে কি না, এ প্রশ্নও মনে মনে খোঁচা দিতেছিল।

নদীর ধার হইতে আটটা নাগাদ বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, জ্যোৎস্নার নিকট হইতে উত্তর আসিয়াছে। ছোট চিঠি, আর তিনখানি দশটাকার নোট।

চিঠিতে সে লিখিয়াছে—

মাস্টারমশাই,

আপনার চিঠি পেয়ে যে কি আনন্দই হ'ল, তা লিখে জানাতে পারব না। আপনি যে সেদিন আমার কাছ থেকে পালিয়েই গেলেন তা আমি বুঝেছিলুম, আর সেই জন্যে মনে একটু কষ্ট ছিল। কিন্তু এখন আপনার চিঠি পেয়ে সব গ্লানি মুছে গেল। বুঝলুম যে আপনি আমাকে সত্য-সত্যই মার্জনা করেছেন, নইলে এ চিঠি দিতেন না।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনি এবার সুখী হোন—যথার্থ শান্তি পান। আপনাদের জীবন যেন নিষ্কণ্টক হয়।

একটি ভিক্ষা আছে। ত্রিশটি টাকা পাঠালুম, দয়া ক'রে ভাল দুটো চুনি বসানো দুল তৈরী ক'রে দেবেন আপনার বৌকে। সে দুল দুটো যেন তিনি বারোমাস পরেন। যখনই তিনি কাজকর্ম ক'রে বেড়াবেন, দুলগুলো নড়তে থাকবে আর সেই চুনির লাল আভা তাঁর সুন্দর গালে প'ড়ে আরও ভাল দেখাবে। তখন কি একবার মনে পড়বে না জ্যোৎস্নার কথা? বিয়ে ক'রে তো আমাদের ভুলে যাবেনই, মনে করিয়ে দেবার জন্যে তাই এত ফন্দী।

বড় ভয় হচ্ছে কিন্তু আপনার জন্যে। যে মন আপনার, যিনি আসছেন তিনি তার হদিস পাবেন তো? শান্তি দিতে পারবেন তো? কে জানে!

যাক—চিঠির জবাব দিতে বলব না। এমন কি, 'আসবেন' এ কথাও বলব না। তবে সুদূর ভবিষ্যতে যদি কখনো কোন কারণে জ্যোৎস্নার কথা মনে পড়ে, তবে নিশ্চয় তার কাছে আসবেন, একটুও দ্বিধা করবেন না। এইটুকুই প্রার্থনা জানানো রইল। নমস্কার নেবেন। ইতি—

আপনার জ্যোৎস্না

অমল চিঠিখানি ও নোটগুলি সযত্নে জামার বুকপকেটে তুলিয়া রাখিল। জ্যোৎস্নার চিঠি পাইয়া আনন্দ হইল বটে, কিন্তু কোথায় যেন একটু বিষাদের সুরও বাজিতে লাগিল। কোথায় যেন একটা গোলমাল রহিয়াছে, সেই কথাটাই হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল।

বিবাহের সময় আসন্ন হইয়া আসিল। গোলমাল, লোকজন, কোথাও একটু কান্না তাহার মৃতা জননীর উদ্দেশ্যে, পরক্ষণেই কোথাও পরিহাস। তাহারই মধ্যে একসময় বরবেশে অমল গিয়া পাল্কিতে উঠিল। সে এক পথ দিয়া যাইবে, তবে অপর পথে আসিবে তাহার ভাবী ভগ্নীপতি।

বিবাহ বাসরে যখন পারুলকে আনা হইল তখন অমলের সমস্ত মন একাগ্র হইল উঠিল কৌতূহলে, আশঙ্কায় ও আশায়। বহুদিন আগেকার দেখা, সে স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। কে জানে কেমন দেখিতে হইবে সে। কিন্তু কৌতূহলের অপেক্ষাও তখন লজ্জা প্রবল, শুভদৃষ্টির সময় প্রাণপণ চেষ্টাতেও যেন চোখ তোলা যায় না সেদিকে—

ওমা, এ কী বর গো, চোখ চায় না কেন। চাও, চাও, দেখ একবার মুখ তুলে—

বহু চেষ্টায় অমল চোখ তুলিল। পারুল কিন্তু তাহার আগেই চোখ মেলিয়া চাহিয়া ছিল, তাহার সহিত চোখোচোখি হইতেই ফিক্ করিয়া হাসিয়া চোখ নামাইল।

অকস্মাৎ যেন কে একটা চাবুক মারিল অমলকে। কোথায় যেন একটা রূঢ় আঘাতে তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইয়া গেল। এ যেন বড় বেশী স্পষ্ট, বড় বেশী প্রগল্ভ। ইহার মধ্যে সেই লজ্জাটি কোথায়, যাহা কুৎসিত মেয়েকেও রমণীয় করিয়া তোলে?

সামান্য ব্যাপার! কিন্তু তবুও তাহার কাছে যেন সমস্তটা বিস্বাদ ঠেকিল। সে মনকে ধমক দিতে লাগিল, এ কিছু নয়, তোমারই দৃষ্টির ভ্রম। এ তোমার নিতান্তই বাড়াবাড়ি।

যাহা হউক—বিবাহ-বাড়ির একটা মাদকতা আছে, যাহাতে বেশীক্ষণ দুশ্চিন্তা থাকে না। রেশমী শাড়ীর খসখসানি, কারণে অকারণে চাপা ও সশব্দ হাসি, চোখে চোখে কটাক্ষবিনিময়, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও নানা আচার-অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের মনেই নেশা লাগে। বিশেষত অমল বর, সে উৎসবের সে-ই নায়ক, তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই সব কিছু—সুতরাং শীঘ্রই আশঙ্কা কাটাইয়া আশার দিকেই তাহার মন ঝুঁকিল। সে আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। যেটুকু আশঙ্কা থাকিতে পারিত, সেটুকুই চলিয়া গেল, যখন অপরের অন্যমনস্কতার ফাঁকে সে বারকতক পারুলের দিকে চুরি করিয়া চাহিয়া লইল। মুখে অবগুণ্ঠন, সেটা ভাল করিয়া দেখা গেল না বটে, তবে শুভ্র সুন্দর যে হাতখানি লাল বেনারসী কাপড়ের উপর পড়িয়া ছিল তাহা সত্যই দেখিবার মত। না, সে ঠকে নাই।

সে নিশ্চিন্ত হইয়া দিদি-শাশুড়ীর সহিত রসিকতায় যোগ দিল। আজিকার রাত্রি জীবনে আর আসিবে না, এ রাত্রির সমস্ত আনন্দটা উপভোগ করিয়া লওয়া চাই।

॥ ছাব্বিশ ॥

পরের দিনকার অনুষ্ঠান সারিয়া শ্বশুরবাড়ি হইতে গৃহে ফিরিল সন্ধ্যার অল্প মাত্র আগে। কিন্তু ফিরিবার পথেও অমলের আর একটা খটকা লাগিল। পাল্কি করিয়া যখন তাহারা ফিরিতেছে, সেই অল্প সময়ের মধ্যেই পারুল দুই-তিনবার ফিস ফিস করিয়া কি কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই চেষ্টাটা তাহার ভাল

লাগে নাই, এ যেন তাহার স্বপ্নের সঙ্গে মেলে না।

কিন্তু তখন আর সেদিকে মন দিবার সময় ছিল না, পরের দিনই বৌ-ভাত ও ফুলশয্যা! তাহার আয়োজন করিতে করিতে গভীর রাত্রি হইয়া গেল, তাহার পর শুইবামাত্র ক্লান্তিতে তাহার চোখ বুজিয়া আসিল। কিছু ভাবিবার বা স্বপ্ন দেখিবার অবসরও পাইল না।

তবে পরের দিন সকাল হইতে তাহার বার বার মনে পড়িতে লাগিল যে, সেদিনটা তাহার ফুলশয্যা। ফুলশয্যার কথা মনে হইলেই কমলা ও ইন্দুর কথা মনে পড়ে, কারণ আর কোন বিবাহের অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না, আর কোন ছবিও মনে আসে না। সে স্বপ্ন দেখে সেই চন্দনচর্চিত, স্বেদসিক্ত লজ্জাতুর একখানি মুখ, অর্ধনিমীলিত দৃষ্টি এবং মুখের একটি অপূর্ব লজ্জাজড়িত প্রসন্নভাব; স্বপ্ন দেখে কথা কওয়ানোর জন্য সেই একান্ত সাধাসাধি, বধূর প্রেমকে জয় করিবার সেই বাঞ্ছিত তপস্যা!···দেখে, আর আগ্রহে অধীর হইয়া ওঠে সেই পরম মুহূর্তটির জন্য। সমস্ত যৌবন তাহার দেহের মধ্যে উন্মুখ, চঞ্চল হইয়া ওঠে এক পরম প্রতীক্ষায়। অকারণে সে ছুটাছুটি করে।

সামান্য আয়োজন, বেশী দেরি হইবার কথা নয়, তবুও রাত্রি একটা বাজিল। তারপর নানা অনুষ্ঠান শেষ করিয়া যখন জীবনের দুর্লভতম আনন্দের সম্মুখীন হইল সে, তখন আরও এক ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, রাত প্রায় দুইটা। কিন্তু ভগ্নী ও অন্যান্য আত্মীয়রা যখন তাহাদের বিছানার উপর বসাইয়া রাখিয়া একে একে বিদায় লইলেন, তখনও বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল যে, তাঁহারা একেবারে চলিয়া গেলেন না, কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করিতেছেন। নিঃশব্দ কৌতুকে বাতাস ভারী হইয়া আছে, এখনই, সামান্য কারণেই তাহাতে বর্ষণ শুরু হইবে।

কপাট তাঁহারা ভেজাইয়া দিয়াই গিয়াছেন, কি করিয়া উঠিয়া গিয়া এখন সেটা একেবারে বন্ধ করা যায়, সেই কথাটা অমল ভাবিতেছে, এমন সময় চকিত হইয়া উঠিয়া সে দেখিল যে নববধূ নিজেই উঠিয়াছে। পারুল চট্ করিয়া উঠিয়া গিয়া নিজেই দরজায় খিল লাগাইয়া দিল, তারপর পিলসুজসুদ্ধ প্রদীপটা কোণে একটা তোরঙ্গের আড়ালে সারাইয়া রাখিয়া আসিল, যাহাতে বিছানার দিকটায় ছায়া পড়ে।

অমলের মনে হইল অকস্মাৎ যেন একটা হিমশৈত্য তাহার মাথা হইতে মেরুদণ্ড বাহিয়া নিচে নামিতেছে। নিমেষের মধ্যে সে যেন পাথর হইয়া গেল।

পারুল বিছানায় ফিরিয়া আসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, ওরা কেউ যায় নি. সব এখানে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আমিও তেমনি, আড়াল থেকে দেখা ওদের ঘুচিয়ে দিয়েছি।

তাহার পরই আবার একবার উঠিয়া তক্তপোশের নিচেটায় উঁকি মারিয়া কহিল, দেখি নিচে আবার কেউ সেঁধিয়ে বসে আছে কিনা! না, কেউ নেই।

তাহার পর নিজের গলা হইতে ফুলের গহনাগুলি খুলিয়া একপাশে সরাইয়া রাখিল; বিছানাতেও কে ফুলের পাপ্‌ড়ি ছড়াইয়াছিল, সেগুলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া

দিতে দিতে কহিল, বিছানাতে আবার ফুল দেওয়া! দু'চোক্ষে দেখতে পারি না।

তাহার পর অমলকে উদ্দেশ্য করিয়া ঈষৎ চাপা সুরে কহিল, অমন কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্ট হয়ে ব'সে রইলে কেন? মালা-ফালা খোলো।...আহা, লজ্জা দেখে আর বাঁচি না!

অমল ক্লিষ্টকণ্ঠে কহিল, না মাথাটা বড্ড ধরেছে, শরীরটাও ভাল নেই।

পারুল জবাব দিল, বেশ! আজকের দিনেই তোমার মাথা ধরল?...আমার বরাত!

ইহারই জন্য এত স্বপ্ন দেখা, এত কল্পনা!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অমল চাদর ও মালাটা খুলিয়া ফেলিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার তখন সত্যই শোওয়া প্রয়োজন, তবে সে অন্য কারণে। পারুলও বেশ সপ্রতিভভাবে উঠিয়া আসিয়া পাশে শুইয়া পড়িল।

বাহিরে তখনও যে তরুণীর দল প্রথম-মিলন-রজনীর রসালাপের মধু আস্বাদ করিবার লোভে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা ভিতর হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়। তাহাদের সেই শাড়ীর খসখসানি ও চাপা হাসির অতি মৃদু শব্দের দিকে কান পাতিয়া সে শুইয়া রহিল।

একটু পরেই পারুল তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিল, তারপর, আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে কবে?

অমল বোধ হয় তখন কমলার কথা ভাবিতেছিল। চমকিয়া উঠিয়া কহিল, কোথায়?

কলকাতায়? জেঠাইমা বলছিল যে এখানে ওদের লোকের অভাব, তাই তাড়াতাড়ি তোকে বিয়ে করছে। এইখানেই থাকতে হবে তোকে। আমি বলেছি যে, হ্যাঁ, বয়ে গেছে আমার, বলে কতদিনের সাধ কলকাতায় বিয়ে হবে!

অমল খানিকটা বাদে জবাব দিল, কিন্তু কলকাতার যে বাসায় আমি থাকি সেখানে তো মেয়েছেলে নিয়ে গিয়ে রাখা যায় না। তা ছাড়া আমার এখন এমন অবস্থাও নয় যে একটা বড় বাসা ভাড়া করি—

পারুল বেশ একটু ঝাঁজের সঙ্গেই কহিল, বেশ তো!...তুমি দিব্যি কলকাতায় থেকে মজা মারবে আর আমি এখানে তোমার ঐ ঢরঢরে বুড়ো বাপের সেবা ক'রে দিন কাটাব—না! ভারী চমৎকার ব্যবস্থা!...ওসব বেশীদিন চলবে-টলবে না ব'লে দিলুম, আমি তা'হলে অনর্থ বাধাব।

অমলের নিকট হইতে কোন জবাব না পাইয়া একটু পরে নিজেই আবার কহিল, তুমি রাগ করলে? না, তা নয়, তবে নতুন বিয়ে হলে কে আর বরকে ছেড়ে থাকতে চায় বলো? আমার নতুন বৌদিকে অমনি প্রথমে নতুনদা নিয়ে যেতে চায় নি, আফিং খাবার ভয় দেখাতে তবে নিয়ে গেল।...বোধ হয় দু-তিন মাস নতুনদা একলা ছিল, তাইতেই বৌদি রোজ একখানা ক'রে চিঠি লিখত। তবু ফি শনিবার রবিবার নতুনদা বাড়ি আসত!

পরক্ষণেই সহসা নিবিড়ভাবে অমলকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, তুমিও ফি

শনিবারে বাড়ি আসবে তো ?

অমল অতি মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, চেষ্টা করব।

ওমা. ও আবার কি কথার ছিরি! নিয়েও যাবে না, আবার শনিবার-শনিবারেও আসবে না, তবে আমি থাকব কি ক'রে? সে হবে না, তাহ'লে আমি সত্যিসত্যিই গলায় দড়ি দোব—

আরও খানিকটা পরে কহিল, নতুনদা ফি শনিবারে যখন বাড়ি আসত, তখনই যা হোক একটা কিছু বৌদির জন্য নিয়ে আসত। তুমি কি আনবে আমার জন্যে ?

অমল কোন উত্তর দিল না। কিন্তু তাহাতে পারুলের উৎসাহ বিন্দুমাত্র কমিল না ; সে কহিল, আমার বাপু অত বাজে জিনিস চাই না, তোমায় এমনি কিছু আনতে হবে না, তুমি বরং যত তাড়াতাড়ি পারো আমায় একটা আর্মলেট গড়িয়ে দিও, বেশ মিনের কাজ করা। আমার ভারী শখ—

অমল সহসা নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। কহিল, আমার সত্যিই বড় মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। আমাকে একটু ঘুমোতে দাও।

পারুল অপ্রতিভ হইয়া কহিল, ও তাই তো, বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে,—মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেব ?

অমল তাড়াতাড়ি কহিল, না, না, তুমিও ঘুমোও। একটু চুপ ক'রে থাকলেই আমি ঘুমিয়ে পড়ব এখন।

পারুল একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল এবং বোধ করি একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু অমলের চোখে ঘুম আসিল না। তাহার সত্যই রীতিমত মাথার যন্ত্রণা শুরু হইয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন মাথাটা ফাটিয়া যাইবে।

অনেকক্ষণ ছটফট করিবার পর সে আস্তে আস্তে খিল খুলিয়া বাহিরে আসিল। আড়ি পাতিবার দল তখন হতাশ হইয়া সকলে ঘুমাইতে গিয়াছে। বাহিরে সব নিস্তব্ধ এবং অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে অমল বহুক্ষণ নিঃশব্দে পায়চারি করিল। কিন্তু বাহিরের সে অন্ধকারের অপেক্ষাও তাহার মনের অন্ধকার যেন আরও নিবিড়। তাহার যেন কোথাও কোন দিশা নাই, কোন আলোর রেখামাত্র নাই।

অকস্মাৎ অমলের মনে হইল যে, তাহার জীবনের সবটা একাকার হইয়া গিয়াছে। কোন অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই—এমন কি বর্তমানও নাই। এই একটা অপরিসীম শূন্যতা-বোধ যেন তাহার গলা চাপিয়া ধরিল, মনে হইল এখনি নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে।

সে ছুটিয়া ঘরে গিয়া তাহার জামাটা খুঁজিয়া গায়ে দিল। পকেটে হাত দিয়া দেখিল জ্যোৎস্নার চিঠিখানা এখনও সেখানে আছে, তাহার সহিত টাকাগুলাও। সে আর দ্বিধা না করিয়া পুনরায় বাহির হইয়া পড়িল।

হরনাথবাবু তখন ঘুম ভাঙ্গিয়া সবে পাইখানায় যাইতেছিলেন, অন্ধকারে

পদশব্দ শুনিয়া কহিলেন, কে রে ওখানে ?

অমল কাছে আসিয়া কহিল, বাবা আমি।···আপনাকে সেদিন বলি নি, অফিস থেকে খুব জরুরী চিঠি এসেছিল—আজই জয়েন করতে হবে। শুনলে সবাই হৈ-চৈ করত ব'লে বলি নি, আমি এখনই কলকাতায় যাচ্ছি।

বিস্মিতকণ্ঠে হরনাথবাবু কহিলেন, কিন্তু এই ভোরের ট্রেনেই যাবি ? খেয়ে গেলে হ'ত না ?

না বাবা, সে মিছিমিছি অনেক জবাবদিহি করতে হবে, সবাই হয়তো পীড়াপীড়ি করবে—

অকস্মাৎ হরনাথবাবু গাড়ুটা নামাইয়া রাখিয়া তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, আমার কাছে লুকোস নি বাবা, সত্যি ক'রে বলু—বৌমাকে কি তোর পছন্দ হয় নি ?

অমল হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া কহিল, না না, সে সব ঠিক হয়ে যাবে বাবা, আপনি কিছু ভাববেন না, তবে আজকে আমার না গেলেই নয়।

সে আর দাঁড়াইল না। দ্রুত বাহির হইয়া পড়িয়া মাঠের রাস্তা ধরিল।

ভোরের আর বিশেষ দেরি ছিল না, কিন্তু তখনও অন্ধকার তরল হয় নাই। দূরস্থিত নক্ষত্রের ম্লান আলোকে কোনমতে অস্পষ্টভাবে পথটা দেখা যায় মাত্র। সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেই অমল স্টেশনের দিকে চলিতে লাগিল।

উৎসর্গ

অরুণ তাহার প্রকাশকের নিকট হইতে বাড়ি ফিরিল নয়টারও পরে। ক্লান্ত পদে তিনতলার সিঁড়ি ভাঙিয়া যখন নিজের ছোট ফ্ল্যাটটিতে সে চাবি খুলিয়া ঢুকিল, তখন যেন আর আলো জ্বালিবার মতোও দেহের অবস্থা নাই। অবশ্য আলো জ্বালিবার খুব বেশী প্রয়োজনও ছিল না, পূবের জানালায় শুধু সার্শি দেওয়া ছিল, তাহারই মধ্য দিয়া প্রচুর চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, ঘরের মধ্যে প্রায় সব কিছুই আবছা দেখা যায়। সে পাঞ্জাবী ও গেঞ্জিটা খুলিয়া টাঙাইয়া রাখিল, তাহার পর ঘরের জানালাগুলি সব খুলিয়া দিয়া একটা ক্যাম্বিসের চেয়ারের উপর দেহ এলাইয়া দিল।

নিচে তখনও কর্মমুখর কলিকাতা ঘুমাইয়া পড়ে নাই। তখনও ট্রাম-বাস পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছে, দোকানপাটও সব বন্ধ হয় নাই। শহরের কর্মব্যস্ততার এই মিলিত কোলাহল এতটা উপরে আসিয়া কেমন যেন মধুরই লাগে। নিচেকার উজ্জ্বল আলো এখানের চন্দ্রালোককে ম্লান করিতে পারে না, কিন্তু তাহার একটা রেশ এ পর্যন্ত পেঁছায়। বেশ লাগে অরুণের এ ব্যাপারটা। সে নিজের একান্ত কাছে কলরব পছন্দ করে না, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে নির্জনবাসেও তাহার প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে। সেই জন্য ইচ্ছা করিয়াই শহরতলীতে যায় নাই, শহরের জনতামুখর, এই বিশেষ ব্যস্ত রাজপথটিতেই আসিয়া ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়াছে।

ফ্ল্যাট তো ভারী! মোট দেড়খানা ঘর। ঘর বলিতে এই একটি, পাশে যে স্থানটি আছে তাহাকে আধখানা ঘর বলিলেও বেশী সম্মান করা হয়—চলন মাত্র, একটি ছোট টেবিল পড়িলেই আর নড়িবার উপায় থাকে না। অন্যান্য ফ্ল্যাটগুলি হইতে তিল তিল করিয়া স্থান বাঁচাইয়া এই অদ্ভুত তিলোত্তমা তাহার অদৃষ্টে গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য এক পক্ষে তাহা ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে, নহিলে পনেরো টাকা ভাড়ায় একটা পৃথক ফ্ল্যাটই বা মিলিত কোথায়? অরুণের এখন যা মানসিক অবস্থা, মেসের বাসা সে কল্পনাও করিতে পারে না। অথচ শুধু একজন পুরুষকে ঘরও বড় একটা কেহ ভাড়া দিতে চায় না। আর যদি বা পাওয়া যায়ও, সে বড় গোলমাল।

তার চেয়ে এই-ই বেশ। পনেরোটি টাকা ভাড়া দেয়, আর এই বাড়িরই দারোয়ানকে দেয় সাতটি টাকা, সেই দুই বেলা রান্না করিয়া দিয়া যায়। হিন্দুস্থানী দারোয়ান, সুতরাং মাছ মাংস সে খায় না, দিতেও পারে না; কিন্তু তাহাতে অরুণের বিশেষ অসুবিধা হয় না, নিরামিষই তাহার ভাল লাগে। আর একটি ঠিকা ঝি আছে, সে প্রত্যহ সকালে আসিয়া ঘরের কাজ করিয়া দিয়া যায়। এই তাহার সংসার।

ইহার বেশি আজ আর সে চায়ও না, বরং এইটুকু স্বাচ্ছন্দ্য বরাবর বজায় থাকিলেই সে খুশী। মাস ছয়েক আগে এই ব্যবস্থার কথাও সে কল্পনা করিতে পারিত না। দুইটি কি তিনটি গোটা পাঁচ-ছয় টাকার টিউশনি সম্বল করিয়া যাহাকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইত, মেসের দুই বেলা ভাত এবং কোন-মতে কোথাও একটু মাথা গুঁজিবার স্থান, এইটুকুই ছিল তাহার পক্ষে বিলাস। --একেবারে সম্প্রতি, মাত্র ছয় মাস আগে, ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, চল্লিশ টাকা মাহিনার একটা মাস্টারি মিলিয়াছে, এবং চাকরিটা টিকিয়া যাইবে বলিয়াই সে আশা করে। অন্তত সেই ভরসাতেই সে মাস তিনেক আগে এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া লইয়াছে।

অবশ্য শুধু মাস্টারিই আজ আর তাহার একমাত্র অবলম্বন নয়, প্রায় বছর-দুয়েক আগে, গভীর বেদনা এবং নৈরাশ্যের মধ্যে, উপার্জনের আর একটা পথও হঠাৎ সে খুঁজিয়া পাইয়াছিল। খুব ছোটবেলায় স্কুলের ম্যাগাজিনে সে কবিতা গল্প লিখিত, এতদিন পরে মানসিক অবসাদে যখন একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন সে সেই পুরাতন অভ্যাসের মধ্যেই আবার সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইল। এবার আর কবিতা লিখিবার চেষ্টা করে নাই, শুধু গল্প। একে একে দুই-একটি সাময়িক-পত্রে সে গল্প ছাপাও হইল, ক্রমে তাহার দরুন পাঁচ টাকা সাত টাকা দক্ষিণাও মিলিতে লাগিল। সেদিন যাহা ছিল অঙ্কুর, আজ তাহাই মহীরুহে পরিণত হইয়াছে—বাংলা দেশের এক বিখ্যাত প্রকাশক একেবারে আড়াই শত টাকা দিয়া তাহার একখানি উপন্যাস লইয়াছেন, এবং সেটি ছাপাও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আজ তাহারই শেষ কয় পৃষ্ঠার প্রুফ, এবং বাকী এক শত টাকার চেক প্রকাশক দিয়াছেন।

অরুণ একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল। প্রুফটা দেখিতে হইবে, আলোটা জ্বালা দরকার। প্রকাশক মোহিতবাবু অনুরোধ করিয়াছেন, 'ইস্কুল যাবার পথেই তো প্রেস পড়বে, যদি কিছু মনে না করেন, তা হ'লে যাবার পথে প্রুফটা প্রেসে ফেলে দিয়ে গেলে বড্ড ভাল হয়। দশটার আগে পেঁছিলে কাল ছাপা শেষ হয়ে পরশু বইটা বেরিয়ে যেতে পারে।'

প্রথম উপন্যাস বাহির হইবে। তাহার নিজের আগ্রহও বড় কম নয়। সে আলোটা জ্বালিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল মোহিতবাবুর আর একটা কথা, 'টাই-টেলের চার পাতা বাদ দিয়েও আর দুটো পাতা বাঁচছে। 'উৎসর্গ' করার যদি কাউকে থাকে তো লিখে দিন না। প্রথম বই আপনার, কাকে 'উৎসর্গ' করবেন ভেবে দেখুন।'

কথাটা খুবই সাধারণ। কিন্তু ইহার পিছনে কতখানি অপ্রীতিকর চিন্তা এবং স্মৃতিই না জড়াইয়া আছে!

অরুণ আর আলো জ্বালিবার চেষ্টা করিল না। নিচে কোলাহল মুখর

আলোকোজ্জ্বল রাজপথের দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর আবার চেয়ারেই আসিয়া বসিল। তাহার প্রথম বই কাহাকে উৎসর্গ করিবে—এই প্রশ্নটার সামনাসামনি দাঁড়াইয়া আজ এই সত্যটাই সে গভীর-ভাবে উপলব্ধি করিল যে, পৃথিবীতে তাহার কেহ নাই। আত্মীয় বন্ধু, স্নেহ-ভাজন, কোথাও এমন কেহ নাই যাহার হাতে তাহার বহু বিনিদ্র রজনীর ফল, বহু সাধনার বস্তু, এই বইখানি তুলিয়া দেওয়া যায়।

অথচ আজ তাহার সবই থাকিবার কথা। মা খুব অল্প বয়সে মারা গিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু বাবা সে অভাব জানিতে দেন নাই কখনই। অতি যত্নে মানুষ করিয়া, বি-এ পাশ করাইয়া অফিসেও ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন এবং সংসারে লোকের অভাব বলিয়া অনেক খুঁজিয়া সুন্দরী পুত্রবধূও ঘরে আনিয়াছিলেন। সেদিন জীবনকে রঙিন বলিয়াই বোধ হইয়াছিল।

কিন্তু একটি বৎসর কাটিতে না কাটিতে কি কাণ্ডটাই না হইয়া গেল! বাবা মারা গেলেন, তাহারই মাস কয়েকের মধ্যে হঠাৎ অফিসটিও উঠিয়া গেল। সেই যে চাকরি গেল—আর কিছুতেই, কোথাও কোন কাজ মিলিল না। এক মাস, দুই মাস, বৎসর, দুই বৎসর কাটিয়া গেল। বাবা বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, সুতরাং একে একে নীলিমার গহনাগুলি সব গেল, তাহার পর ঘরের আসবাব-পত্র, সবশেষে বাসনকোসন। মধ্যে মধ্যে দুই-একটি ছোটখাটো টিউশনি হয়তো পায়, কিন্তু সে পাঁচ-সাত টাকার, তাহাতে খাওয়া-পরা বাড়ি-ভাড়া সবগুলি চলে না। বাড়ি ছাড়িয়া ফ্ল্যাটে আসিল, সেখান হইতে ভাড়াটে বাড়ির একখানা ঘর, নিচের তলার অন্ধকার ঘর। তবু ভাড়া দেওয়া যায় না। অপমানের ভয়টা বড় বেশী ছিল বলিয়া বেশী ধার করিতে সে পারিত না। যাহা কিছু সামান্য পাইত কোনমতে ঘর ভাড়াটা দিয়া দিত, সুতরাং নিজেদের ভাগ্যে দিনের পর দিন চলিত উপবাস।

উঃ, সেদিনের কথা মনে করিলে আজও বুকের রক্ত হিম হইয়া যায়। শুধু নৈরাশ্য ও তিক্ততা। এতটুকু আশা, এতটুকু আনন্দের আলোও কোথাও নাই! সারা দিনই প্রায় কাজের চেষ্টায় ঘুরিত, গভীর রাত্রে ক্লান্ত দেহ ও মন লইয়া বাড়ি ফিরিয়া দেখিত, হয়তো নীলিমা তখনও শুষ্ক মুখে তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। আগে আগে সে প্রশ্ন করিত, নয়তো একটু ম্লান হাসিত, ইদানীং তাহাও আর পারিত না। উপর্যুপরি উপবাসে তাহার প্রাণশক্তি গিয়াছিল ফুরাইয়া। দিনের পর দিন এই একই ঘটনা ঘটিয়াছে, তবু একটা কুড়ি টাকা মাহিনার চাকরিও সে জোটাইতে পারে নাই।

আত্মীয়স্বজনরা অরুণের অবস্থা দেখিয়া বহুদিনই ত্যাগ করিয়াছিলেন, নীলিমারও বিশেষ কেহ ছিল না; অসামান্য রূপ দেখিয়া নিতান্ত গরিবের ঘর হইতেই অরুণের বাবা তাহাকে আনিয়াছিলেন। সুতরাং এক বেলা আশ্রয় দিতে পারে, খাদ্য দিতে পারে, শেষ পর্যন্ত এমন কেহই যখন আর রহিল না, তখন কোন প্রকার ধার করা বা সাহায্য চাওয়ার চেষ্টাও অরুণ ছাড়িয়া দিল। তখন

চলিতে লাগিল শুধু উপবাস। দুই দিন, তিন দিন অন্তর হয়তো ভাত জোটে, তাও এক বেলা।

অবশেষে নীলিমা আর সহিতে পারিল না। আশ্রয় দিবার আত্মীয় ছিল না বটে, কিন্তু রূপ যথেষ্ট ছিল বলিয়া সর্বনাশ করিবার লোকের অভাব ঘটিল না। অরুণের চরম দুর্দিনে, তাহার ভার বহন করিবার দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিয়া নীলিমা একদিন চলিয়া গেল। যাইবার সময় শুধু এক ছত্র চিঠি রাখিয়া গেল—

'আমি আর সইতে পারলুম না। আমাকে মাপ ক'রো। আমার ভার ঘুচলে তুমিও হয়তো এক বেলা খেতে পাবে।'

অরুণ অকস্মাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথা দিয়া তখন যেন আগুন বাহির হইতেছে। সে বাথরুমে গিয়া মাথায় খানিকটা জল থাবড়াইয়া দিল, তাহার পর মুখ-হাত মুছিয়া জোর করিয়া আলোটা জ্বালিয়া প্রুফ দেখিতে বসিল। কাজ সারিতেই হইবে, বৃথা চিন্তা করিবার সময় নাই।

কিন্তু প্রুফ তো সামান্যই, শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। আবার সেই 'উৎসর্গে'র প্রশ্ন। সামনে কাগজগুলা খোলাই পড়িয়া রহিল, টেবিল ল্যাম্পের আলোটা নিঃশব্দে জ্বলিতে লাগিল, সে জানালার মধ্য দিয়া রাস্তার ওপারে আর একটা বাড়ির কার্নিস, যেখানে এক ফালি চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মন তাহার চলিয়া গিয়াছে তখন বহু দূরে, অতীতের এক কুৎসিত কর্দমাক্ত মেঘ-ঘন দিনে। সেখানে আলোর রেখা মাত্র নাই, সেদিনের কথা মনে পড়িলে আজও আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করে—

সেদিন হয়তো তাহার মরাই উচিত ছিল। নিজের স্ত্রীর ভরণপোষণের অক্ষমতার জন্য যাহাকে ত্যাগ করিয়া যায়, সে আবার সেই কালামুখ লইয়া বাঁচিয়া থাকে কি বলিয়া? কিন্তু মরিতে সে পারে নাই। হয়তো স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু আসিলে সে আদর করিয়াই বরণ করিত, কিন্তু স্বেচ্ছায় জীবনটাকে বাহির করিতে সে পারে নাই, অত দুঃখের পরেও না। বরং গৃহস্থালীর সামান্য যে দুই-একটা তৈজস অবশিষ্ট ছিল, তাহাও বেচিয়া একটা মেসে গিয়া উঠিয়া ছিল, এবং —নিজের মনেও স্বীকার করিতে তাহার লজ্জা হয়, দুই বেলা ভাত খাইতে পাইয়া সে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলিয়াছিল।

সেই হইতে সে নিশ্চিন্ত এবং নিঃসঙ্গ।

তাহার পর আবার একটু একটু করিয়া সে নিজের জীবিকার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে, আজ বরং তাহার অবস্থা সচ্ছলই, কিন্তু এই সচ্ছলতা একদিন যাহার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল, দুঃখের ঘূর্ণাবর্তে তাহার সেই জীবনসঙ্গিনীই গিয়াছে হারাইয়া। আজ আর এ স্বাচ্ছন্দ্যের যেন কোন মূল্যই নাই। কোথায় সে কে জানে, সুখে আছে কি আরও দুঃখে আছে! কাহার আশ্রয়ে আছে তাই বা কে জানে, সে কেমন লোক! হয়তো বা বাঁচিয়াই নাই। দুঃখে, কষ্টে, দারিদ্র্যে— হয়তো অকালেই এ পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছে।

কথাটা ভাবিতেই অরুণের দুই চোখ অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া আসিল। বেচারী অত দুঃখই সহিল, আর কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরিয়া থাকিলে হয়তো আর ইহার প্রয়োজনই হইত না। আজ এই স্বাচ্ছন্দ্যের সে-ও অংশ লইতে পারিত। আজ আর তাহার প্রথম উপন্যাস কাহাকে উৎসর্গ করিবে, এ প্রশ্ন উঠিত না। সে হয়তো আজও বাঁচিয়া আছে, অথচ এ সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিতেছে না অরুণ কিছুতেই—

নীলিমাকেই সে উৎসর্গ করিবে নাকি শেষ পর্যন্ত? কুলত্যাগিনী স্ত্রীকে?

দোষ কি?

চিন্তাটা মাথায় আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন অস্থির হইয়া উঠিল। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে না পারিয়া সংকীর্ণ ঘরের মধ্যেই পায়চারি শুরু করিয়া দিল।

বেচারী নীলিমা, তাহারই বা অপরাধ কি? কি কষ্টটাই না করিয়াছে সে! দিনের পর দিন নিরম্বু উপবাস করিয়াছে, লজ্জা-নিবারণের কাপড় পর্যন্ত জোটে নাই। বহুদিন তাহাকে গামছা পরিয়া একমাত্র ছেঁড়া কাপড় শুকাইয়া লইতে হইয়াছে। তবু—তবু সে গঞ্জনার একটি শব্দও মুখ দিয়া উচ্চারণ করে নাই, কোন প্রকার অনুযোগ করে নাই। আগে হাসিমুখেই সব সহিয়াছে, ইদানীং হাসিতে পারিত না, তবু সহিয়াছে—নীরবে, নিঃশব্দে। জুটিলেও সে ভরসা করিয়া পুরা খাইতে পারে নাই, আবার স্বামী খাইবে বলিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। শেষ পর্যন্ত যদি সে একদিন দুর্বল হইয়া পড়িয়াই থাকে তো সে এমন কিছু অপরাধ নয়।

অরুণ তাহার মনের মধ্যে বহু দূর পর্যন্ত দৃষ্টি মেলিয়া দিয়া, আজ বোধ করি প্রথম লক্ষ্য করিল যে, সেখানে নীলিমার সম্বন্ধে কোন অভিমান, কোন অনুযোগই আর অবশিষ্ট নাই। হয়তো আছে বেদনাবোধ কিন্তু তাহার জন্য দায়ী তাহার নিজেরই অদৃষ্ট। যতদিন নীলিমাকে সে পাইয়াছে, কখনও কোন অভিযোগের কারণই তো সে ঘটিতে দেয় নাই। স্নেহে, প্রেমে, সেবায় লীলা-চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ তাহার সেই কিশোরী বধূর কথা মনে পড়িলে আজও সারা দেহে রোমাঞ্চ হয়। না, যতদিন সে পাইয়াছে, আশ মিটাইয়া পাইয়াছে। এমন দুর্ভাগ্য খুব অল্প লোকেরই হয় বটে, কিন্তু এমন সৌভাগ্যও কদাচিৎ দেখা যায়। প্রথম যৌবনের সেই নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার এক-একটি বিনিদ্র রজনীর যে মধুস্মৃতি তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত আছে, শুধু সেইগুলি অবলম্বন করিয়াই তো একটা জীবন স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইতে পারে। তবে, তাহার কি কোন মূল্যই নাই, সেজন্য কোন কৃতজ্ঞতা নাই? অরুণের নিজের দোষে, অসীম দুঃখের ফলে একটি মুহূর্তের দুর্বলতায় যদি তাহার পদস্খলনই হইয়া থাকে তো সেইটাই কি সে মনের মধ্যে বড় করিয়া রাখিবে, আর অতখানি প্রেম, অতটা নিষ্ঠা, সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে?

না, মনের এই দুর্বলতা, এই অন্যায় সংস্কারকে সে কিছুতেই প্রশ্রয় দিবে না, নীলিমাকেই সে তাহার প্রথম বই উৎসর্গ করিবে।

নিচে তখন রাজপথ জনবিরল হইয়া গিয়াছে, দোকানপাটগুলি বন্ধ হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার আলোও হইয়া উঠিয়াছে ম্লান। শহরের অশান্ত বিক্ষুব্ধতার উপরে যেন চমৎকার একটি সুষুপ্তি নামিয়া আসিয়াছে, সমস্তটা মিলিয়া একটা করুণ অথচ মধুর শান্তি।

সে খানিকটা যেন কিসের আশায় কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পাশের ফ্ল্যাটে তখনও স্বামী-স্ত্রীর আলাপের গুঞ্জন শোনা যাইতেছে, নিচে কোথায় একটা ছেলে কাঁদিতেছে একটানা সুরে। আর সব শান্ত, স্তব্ধ।

সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া আবার চেয়ারে বসিল, তাহার পর দৃঢ় হস্তে প্রুফের কাগজগুলো টানিয়া লইয়া উৎসর্গ-পৃষ্ঠাটি লিখিয়া দিল। বেশী কিছু নয়, শুধু—"শ্রীমতী নীলিমা দেবী, কল্যাণীয়াসু"।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলাই বই বাহির হইয়া গেল। প্রকাশক মোহিতবাবু এক কপি হাতে করিয়া রাত্রে আসিলেন তাঁহার রক্ষিতার বাড়ি। উপরে উঠিয়া তাহার সামনে বইখানা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, 'এই নাও, তোমার সেই বই বেরিয়েছে।'

সে বসিয়া কি একটা বুনিতেছিল, তাড়াতাড়ি সেগুলি নামাইয়ারাখিয়া সাগ্রহে বইটা তুলিয়া লইল। চমৎকার বাঁধাই, উপরে রঙিন ছবি, তাহারই মধ্যে ঝকঝক করিতেছে বই ও লেখকের নাম। খানিকটা নাড়িয়া-চাড়িয়া বইটা বিছানার পাশে একটা টিপয়ের উপর সযত্নে রাখিয়া দিয়া সে উঠিয়া মোহিতবাবুর স্বাচ্ছন্দ্যের তদ্বিরে মন দিল। চাদর ও জামাটা খুলিয়া তাহার হাতে দিতে দিতে মোহিতবাবু বলিলেন, 'বাবা বাঁচলাম ! যা তাগাদা তোমার, ওই বইটা যেন আমার সতীন হয়ে উঠেছিল।'

তাহার পর নিচের ঢালা বিছানাটায় দেহ এলাইয়া দিয়া কহিলেন, 'রামটহল গেল কোথায় ? একটু তামাক দিতে বলো।···বেরুল তো, এখন খরচাটা উঠলে বাঁচি। তোমার কথা শুনে একগাদা টাকা দিয়ে বইটা নিলাম, ওর অর্ধেক টাকাও কেউ দিত না।'

ও পক্ষ তখন কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল, মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, 'নিশ্চয়ই উঠবে। অত ভাল লেখা, লোকে নেবে না ?'

মুখটা বিকৃত করিয়া মোহিতবাবু কহিলেন, 'কে জানে কি লেখা, আমি কি আর কোনটা পড়েছি ছাই ! তুমিই খালি ওর নাম করতে গ'লে পড়ো।'

'হ্যাঁ গো মশাই, শুধু বুঝি আমি ? ভালই যদি না হবে, তা হ'লে অতগুলো মাসিক-পত্র ওঁর লেখা ছাপে কেন ?'

মোহিতবাবু একটা তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ করিয়া কহিলেন, 'হ্যাঁ, ওদের তো ভারী বুদ্ধি, ওরা যা পায় তাই ছাপে।·· তোমারও যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, যতগুলো কাগজ অরুণ বাবুর লেখা ছাপে, সবগুলোই তো তুমি নিতে শুরু করেছ দেখছি।'

'কি করব, একলা একলা সময় কাটে কি ক'রে আমার ? তুমি কিচ্ছু ভেবো

না, ও বই নিশ্চয়ই ভাল বিক্রি হবে। সব কাগজে পাঠিয়ে দাও, দেখবে, ভাল সমালোচনা বেরুলেই বিক্রি হ'তে শুরু হবে।'

'হ'লেই বাঁচি। একেবারে নতুন লেখক, ভয় করে বড্ড।'

মোহিতবাবু খানিকটা চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন। একটু পরে রামটহল তামাক দিয়া যাইতে উঠিয়া বসিয়া গড়গড়ার নলটা হাতে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, 'হ্যাঁ, আর একটা ভারী মজার ব্যাপার বলতে ভুলে গেছি। শুনেছ, ওর বউয়ের নামও নীলিমা।'

নীলিমা হেঁট হইয়া জল-খাবারের থালা রাখিতেছিল, অকস্মাৎ তাহার হাতটা কাঁপিয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল, 'কে বললে?'

মোহিতবাবু জবাব দিলেন, 'ওই দেখ না বইটা খুলে, উৎসর্গ করেছে তার নামে।'

নীলিমা তাড়াতাড়ি বইটা খুলিয়া উৎসর্গ-পৃষ্ঠাটা বাহির করিল। মিনিট-খানেক সেদিকে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, 'কিন্তু ও যে ওঁর বউয়েরই নাম, তা কেমন ক'রে জানলে?'

মোহিতবাবু মুখ হইতে নলটা সরাইয়া কহিলেন, 'বললে যে। নামটা দেখে ভারী মজা লাগল। বলতে তো পারি না কিছু, 'ওঁকেই জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে মশাই? অরুণবাবু জবাব দিলেন, আমার স্ত্রী। অদ্ভুত মিল, না?'

নীলিমা কোন উত্তর দিল না। তখনও তাহার চোখের সামনে সেই উৎসর্গ-পৃষ্ঠাটা খোলা, কিন্তু অক্ষরগুলি তখন আর চোখে পড়িতেছিল না, সব যেন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল।

আরও মিনিট-দুই পরে বইটা বন্ধ করিয়া ঈষৎ রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, 'দেখি, তোমার চা-টা নিয়ে আসিগে—'

কিন্তু তখনই সে নীচে গেল না। ওপাশের বারান্দায় দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ গলির উপরের এক ফালি অন্ধকার আকাশের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর কে জানে কাহার উদ্দেশে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

মোহিতবাবু ততক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।